আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

ত্রয়োদশ খণ্ড

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

ত্রয়োদশ খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিয ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

ড. আহমদ আবূ মুলহিম
ড. আলী নজীব আতাবী
প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১৩শ খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিয ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদ : মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ দ্দীন, মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান
[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৯৬
ইফা অনুবাদ ও সংকলন : ৪১৬
ইফা প্রকাশনা : ২৯১২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 978-984-06-1704-4
গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রথম প্রকাশ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০২০
চৈত্র ১৪২৬
শাবান ১৪৪১

মহাপরিচালক
আনিস মাহমুদ

প্রকাশক
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১৮১১৯১

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আবুল কালাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৮০.০০ (চারশত আশি) টাকা

AL-BIDAYA WAN NIHAYA, 13th Vol. (Islamic History : First to Last, Vol. XIII): Written by Abul Fidaa Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (Rh.) in Arabic, translated into Bangla under the supervision of the Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books Publication Project-2nd phase, Islamic Foundation, Agargaon Sher-e Bangla Nagar, Dhaka- 1207, Phone : 02-8181191. March 2020

E-mail : ifapublicationproject@gmail.com
Website : islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 480.00, US Dollar : 18.00

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশ্‌র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্‌ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌উদী ও ইব্‌ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের ত্রয়োদশ খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটি 'ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় অত্র বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

আনিস মাহমুদ
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। মূল গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত, তবে অনূদিত গ্রন্থের কলেবর সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাংলায় অনূদিত ত্রয়োদশ খণ্ড। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত'।

গ্রন্থটি 'ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, প্রুফ রিডার এবং প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
- মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন
- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক
- ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
হিজরী ৫৫৬ সন	৩৫
হামযা ইবন আলী ইবন তাল্‌হা	৩৭
হিজরী ৫৫৭ সনের ঘটনাবলী	৩৭
শাহয়খুল হানাফিয়া সুজা	৩৮
সদকা ইবন উজীর আল ওয়ায়ীজ	৩৮
হিজরী ৫৫৮ সনের ঘটনাবলী	৩৯
হিজরী ৫৫৯ সনের ঘটনাবলী	৪১
হারেম যুদ্ধ	৪২
জামাল উদ্দিন	৪৩
ইবনুল খাযীম আল কাতীব	৪৪
হিজরী ৫৬০ সনের ঘটনাবলী	৪৪
উমর ইবনে বালহীকা	৪৪
মারদান আল খাদিম	৪৫
ইবনুল তিলমিযী	৪৫
উজীর ইবনে হুবায়রা	৪৫
হিজরী ৫৬১ সনের ঘটনাবলী	৪৬
আল হাসান ইবনুল আব্বাস	৪৭
আবদুল আজীজ ইবনুল হাসান	৪৭
শায়খ আব্দুল কাদের আল জিলানী	৪৭
হিজরী ৫৬২ সনের ঘটনাবলী	৪৮
আসাদুদ্দীন শেরকোর হাতে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়	৪৯
আমীর আলহাজ্ব বরগশ	৫০
আবুল মা'আলী আল কাতীব	৫০
আল রশিদ আল ছাদাফী	৫০
হিজরী ৫৬৩ সনের ঘটনাবলী	৫০
আবু সাদ সামআলী	৫১
আবদুল কাছের ইবন মুহাম্মদ	৫১
মুহাম্মদ ইবন আবদুল হামীদ	৫১
ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ	৫২

হিজরী ৫৬৪ সনের ঘটনাবলী	৫২
সালাহউদ্দিনের পরিধেয় খিলাত	৫৪
হিজড়াদের হত্যার ঘটনা	৫৫
সুদানের ঘটনা	৫৬
সা'দউল্লাহ ইবনে নসর ইবনে সাঈদ আল দুজাজী	৫৭
শেরকোহ ইবন সাদী	৫৮
মুহাম্মদ আল ফারেকী	৫৯
আল মুয়াম্মার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ	৫৯
হিজরী ৫৬৫ সনের ঘটনাবলী	৫৯
বাদশা কুতুবউদ্দীন মওদুদ ইবন জঙ্গী	৬১
হিজরী ৫৬৬ সনের ঘটনাবলী	৬১
আল মুসতাযীর খিলাফত	৬২
কাহের ইবন মুহাম্মদ ইবন তাহের	৬৪
ইউসুফ আল কাযী	৬৪
ইউসুফ ইবনুল খলীফা	৬৪
হিজরী ৫৬৭ সনের ঘটনাবলী	৬৪
ওবাইদিদের শেষ খলীফা আল আযীদের মৃত্যু	৬৫
আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ	৭২
মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ	৭২
নাসির ইবনুল জাওলী আল সূফী	৭২
হিজরী ৫৬৮ সনের ঘটনাবলী	৭৩
ইলদাকুস তুর্কী আতাবুকী	৭৪
আমীর নাজমুদ্দিন আবু শাকার আইউব ইবন সাদী	৭৪
হিজরী ৫৬৯ সনের ঘটনাবলী	৭৭
আমারা ইবন আবুল হাসান এর হত্যাকাণ্ড	৭৯
আমরা আল ইয়ামানী আল শায়ের	৮১
ইবন কারুল	৮৪
পরিচ্ছেদ	৮৪
নূরুদ্দীন (র)-এর পরিচয়	৯৬
অনুচ্ছেদ	৯৬
আল হাসান ইবনে আল হাসান	৯৮
আল-আহওয়াযী	৯৮
আল খিজির ইবন নসর ইনি হলেন	৯৯
হিজরী ৫৭০ সনের ঘটনাবলী	৯৯
পরিচ্ছেদ	১০০
অনুচ্ছেদ	১০১

রাওহা ইবন আহমদ	১০৬
সিমলা আল তুর্কী মানি	১০৬
কিমায ইবন 'আব্দুল্লাহ	১০৬
হিজরী ৫৭১ সনের ঘটনাবলী	১০৬
পরিচ্ছেদ	১০৭
আলী ইবনুল হাসান ইবন হিবাতুল্লাহ	১০৯
হিজরী ৫৭২ সনের ঘটনাবলী	১১১
আলী ইবন কাসাকির	১১৩
মোহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ	১১৩
আল খতীব শামসুদ্দিন	১১৪
হিজরী ৫৭৩ সাল	১১৪
সাদাকা ইবনুল হুসায়ন	১১৬
মুহাম্মাদ ইবন আস'আদ ইবন মুহাম্মাদ	১১৭
মাহমুদ ইবন তাতাশা শিহাবুদ্দীন আল-হারিসী	১১৭
ফাতিমা বিনত নাসর আল-আত্তার	১১৭
হিজরী ৫৭৪ সাল	১১৭
আস'আদ ইবনে াবলদারাক আল-জিবরীলী	১২০
আল- হায়স বায়স	১২০
মুহাম্মাদ ইবন নাসীম	১২২
হিজরী ৫৭৫ সাল	১২২
আহমান দুর্গ বিধ্বংস	১২৩
মুসতাযী বি- আমরিল্লাহর মৃত্যু ও সংক্ষিপ্ত জীবনী	১২৫
এ বছর মৃত্যুবরণকারী কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম	১২৬
ইবরাহীম ইবন 'আলী	১২৬
ইসমাঈল ইবন মাওহূব	১২৬
আল মুবারাক ইবন আলী ইবন হাসান	১২৬
নাসির লি দীনিল্লাহ আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবন মুসতাযীর খিলাফত	১২৬
হিজরী ৫৭৬ সাল	১২৭
সুলতান তুরাগ শাহ-এর মৃত্যু	১২৮
হাফিয আবু তাহির সালাফী	১৩০
হিজরী ৫৭৭ সাল	১৩২
হালবের অধিপতি মালিক সালিহ ইবন নুরুদ্দীন শহীদের ইনতিকাল ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ	১৩২
শায়খ কামালুদ্দীন আবুল বারাকাত	১৩৫

হিজরী ৫৭৮ সালের আগমন	১৩৫
পরিচ্ছেদ	১৩৬
মানসুর ইয়যুদ্দীন এর মৃত্যু	১৩৬
যেসব উল্লেখযোগ্য লোক এ বছর মারা যান তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল	১৩৭
শায়খ আবুল আব্বাস	১৩৭
"আল্লামা কুতুবুদ্দীন আবুল মা'আলী	১৩৮
হিজরী ৫৭৯ সালের আগমন	১৩৮
পরিচ্ছেদ	১৪১
হিজরী ৫৮০ সালের আগমন	১৪২
হিজরী ৫৮১ সালের আগমন	১৪৩
এ বছর মৃত্যুবরণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম	১৪৫
আবদুল্লাহ ইবন আস'আদ আল মাওসিলী	১৪৫
আমীর নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে শিরকূহ	১৪৫
আল-মাহমূদী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন ইসমাঈল	১৪৫
আমীর সা'দুদ্দীন মাসউদ	১৪৫
আস-সিত্তু খাতুন ইসমতুদ্দীন	১৪৬
হাফিযুল কাবীর আবূ মূসা আল-মাদীনী	১৪৬
সুহায়লী আবুল কাসিম	১৪৬
হিজরী ৫৮২ সালের আগমন	১৪৭
যেসব গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা যান তাদের পরিচয়	১৪৯
আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আবুল ওহাশ	১৪৯
হিজরী পাচশ তিরাশি সালের আগমন	১৫০
বায়তুল মুকাদ্দাস জয়	১৫৪
বিজয়ের পর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রথম জুমআ	১৫৬
একটি অভিনব সূক্ষ্ম তত্ত্ব	১৫৯
পরিচ্ছেদ	১৬১
শায়খ আবদুল মুগীছ ইবন যুহাযর আল–হারবী	১৬৩
"আলী ইবন খিতাব ইবন খালফ	১৬৩
আমীর শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মুকাদ্দাস	১৬৪
মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ	১৬৪
নাসর ইবনে ফিতইয়া ইবন মাতার	১৬৪
আবুল হাসান আদ-দামিগানী	১৬৪
হিজরী পাঁচশ চুরাশি সালের আগমন	১৬৪
পরিচ্ছেদ সাফাদ ও কাওকার দুর্গ বিজয়	১৬৬
এ বছর যে সব বিশিষ্ট লোক ইনতিকাল করেন তাদের বর্ণনা	১৬৮
আল-আমীরুল কবীর সুললাতুন মূলক ওয়াসসালাতীন	১৬৮
আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী	১৬৯
আল-হাযিমী আল-হাফিয	১৬৯

হিজরী পাঁচশ পঁচাশি সালের আগমন ১৬৯
আক্কার ঘটনা ও পরিণতি ১৭০
যে সব গুরুত্বপূর্ণ লোক এ বছর ইনতিকাল করেন তাঁদের বিবরণ ১৭১
কাযী শরফুদ্দীন আবু সা'দ ১৭১
আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন উহবান ১৭২
আল-ফকীহুল আমীর যিয়াউদ্দীন ঈসা আল-হাকারী ১৭২
আল-মুবারক ইবন মুবারাক আল-কারখী ১৭৩
হিজরী পাঁচশ ছিয়াশি সালের আগমন ১৭৩
পরিচ্ছেদ ১৭৭
পরিচ্ছেদ ১৭৯
পরিচ্ছেদ ১৮০
পরিচ্ছেদ ১৮১
পরিচ্ছেদ ১৮১
পরিচ্ছেদ ১৮২
জার্মান সম্রাট ১৮৩
মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ১৮৪
পাঁচশ সাতাশি সালের আগমন ১৮৪
সুলতানের দখল থেকে শত্রুদের আক্কা অধিকার ১৮৫
ফিরিংগীদের আক্কা দখলের পরবর্তী ঘটনা ১৯০
আল-মালিকুল মুযাফফার ১৯৩
আমীর হুসামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন লাশীন ১৯৩
আমীর আলামুদ্দীন সুলায়মান ইবন হায়দার আলী-হালবী ১৯৩
আস্ সাফী ইবনুল ফায়িয ১৯৪
প্রখ্যাত চিকিৎসক আস'আদ ইবন মাতবান ১৯৪
আল-জুয়ূশানী শায়খ নাজমুদ্দীন ১৯৪
হিজরী ৫৮৮ সালের আগমন ১৯৪
এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের বিবরণ ২০২
সায়দুদ্দীন আলী ইবন আহমদ আল-মাশতূব ২০২
ইয়যুদ্দীন কালাজ আরসালান ইবন মাসঊদ ২০৩
নাসর ইবন মানসূর আন-নুমায়রী ২০৩
৫৮৯ হিজরী সন (১১৯৩) ২০৪
পরিচ্ছেদ ২১০
এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ ২১০
সুলতান সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইব্‌ন আইয়ূব ২১০
আমীর বাকতামুর ২১১
আতাবেগ ইজ্জুদ্দীন মাসঊদ ২১১
জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ পাটিরা ২১১
সাইয়েদা যুবায়দা ২১২
পূণ্যবতী শায়খা সালেহা ফাতেমা খাতুন ২১২

৫৯০ হিজরী সন (১১৯৪ খ্রি.)	২১৩
৫৯০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২১৫
আহমদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ	২১৫
ইবনুশ শাতিবী	২১৫
৫৯১ হিজরী সন (১১৯৫ খ্রি.)	২১৬
৫৯১ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২১৮
আলী ইব্ন হাসসান ইব্ন সাফির	২১৮
৫৯২ হিজরী সন (১১৯৬ খ্রি.)	২১৯
মুআয়্যিদুদ্দীন আবুল ফযল	২২০
ফখর মাহমূদ ইব্ন আলী	২২০
আবুল গানাইম মুহাম্মদ ইব্ন আলী	২২০
ফকীহ আবুল হাসান আলী ইব্ন সাঈদ	২২১
শায়খ আবূ শুজা'	২২১
৫৯৩ হিজরী সন (১১৯৭ খ্রি.)	২২১
৫৯৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২২৪
সাইফুল ইসলাম তুগতুগীন	২২৪
আমীরুল কবীর আবূ হায়জা আল সামীন কুর্দী	২২৪
কাযী আবূ তালিব আলী	২২৪
তালিবীন নেতা সৈয়দ শরীফ	২২৫
ইলসতি আযরা বিনত শাহেনশাহ	২২৬
৫৯৪ হিজরী সন (১১৯৮ খ্রি.)	২২৬
৫৯৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২২৭
আওয়াম ইব্ন যিয়াদাহ	২২৭
কাযী আবুল হাসান আলী ইব্ন রাজা ইব্ন যুহায়র	২২৮
আমীর ইযযুদ্দীন জারদীল	২২৮
৫৯৫ হিজরী সন (১১৯৯ খ্রি.)	২২৯
সুলতান আযীযের মৃত্যু	২২৯
৫৯৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২৩১
সুলতান আবূ মুহাম্মদ ইয়াকুব ইবনে ইউছুফ ইবনে আবদুল মুমিন	২৩১
আমীর মুজাহিদুদ্দীন কীমায রূমী	২৩১
আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর	২৩৪
শায়খ জামালুদ্দীন আবুল কাসিম	২৩৪
৫৯৬ হিজরী সন (১২০০ খ্রি.)	২৩৪
৫৯৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২৩৬
সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিযম শাহ	২৩৬
নিযামুদ্দীন মাসঊদ ইব্ন আলী	২৩৬
আবুল ফারাজ ইব্ন আবদুল মুন'ইম ইব্ন আবদুল ওহহাব	২৩৭
ফকীহ মাজদুদ্দীন	২৩৭

আমীর সারিমুদ্দীন কাইমায ২৩৭
আমীর লু'লু ২৩৭
শায়খ শিহাবুদ্দীন তূসী ২৩৭
শায়খ যহীরুদ্দীন আব্দুস সালাম ফারসী ২৩৮
শায়খ আল্লামা বদরুদ্দীন ইব্ন আসকার ২৩৮
কবি আবুল হাসান ২৩৮
আবূ আলী আবদুর রহীম ইব্ন কাযী আশরাফ ২৩৮
৫৯৭ হিজরী সন (১২০১ খ্রি.) ২৪২
এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৪৪
আবদুর রহমান ইব্ন আলী ২৪৪
সুসাহিত্যিক ইমাদ ইস্পাহানী ২৪৮
আমীর বাহাউদ্দীন কারাকূশ ২৪৯
মাকলাবাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ মুসতানজিদী ২৪৯
আবূ মনসূর ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ২৫০
আবূ তাহির বারাকাত ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন তাহির ২৫১
৫৯৮ হিজরী (১২০২ খ্রি.) ২৫১
৫৯৮ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় ২৫১
কাযী ইব্ন যাকী ২৫১
শায়খ আলী ইব্ন আলী ইব্ন আলীশ আল ইয়ামানী ২৫৩
আবূ ছানা হাম্মাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ ২৫৩
সিত্তুল জালীলাহ্ ইয়ানফাছা বিনত আবদুল্লাহ্ ২৫৩
কবি আবূ বকর ইব্ন মুহতাসিব ২৫৩
৫৯৯ হিজরী সন (১২০৩ খ্রি.) ২৫৪
৫৯৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৫৪
সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরী ২৫৪
আমীর আলামুদ্দীন আবূ মনসূর ২৫৪
কাযী জিয়া শাহারযুরী ২৫৫
আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন নাসর ইব্ন হামযাহ ২৫৫
ইব্ন নাজা ২৫৬
সিততুল জালীলাহ যামরাদ খাতুন ২৫৭
৬০০ হিজরী সনে (১২০৪ খ্রি.) ২৫৭
৬০০ হিজরী সনে আরো যারা ইনতিকাল করেন ২৬০
আবুল কাসিম বাহাউদ্দীন ২৬০
হাফিয আবদুল গণী মুকাদ্দেসী ২৬০
৬০০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৬২
আবুল ফাতুহ আস'আদ ইব্ন মাহমূদ আজালী ২৬২
কবি আল বুনানী ২৬২
আবূ সাঈদ হাসান ইব্ন খালিদ ২৬৩

ইরাকী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইরাকী ২৬৩
৬০১ হিজরী সন (১২০৫ খ্রি.) ২৬৪
৬০১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৬৫
আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আনতার ইব্‌ন ছাবিত হুল্লী ২৬৫
আবূ নসর মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদুল্লাহ ২৬৫
আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন মাসঊদ ২৬৬
আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন বুরতাইস সিনজারী ২৬৬
আবুল ফযল ইব্‌ন ইলয়াস ইব্‌ন জামি আরাবলী ২৬৭
আবূ সাআদাত হুলিয়্য ২৬৭
আবূ গালিব ইব্‌ন কামনূনাহ ইয়াহূদী ২৬৭
৬০২ হিজরী সন (১২০৬ খ্রি.) ২৬৭
৬০৩ হিজরী সনে (১২০৭ খ্রি.) ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৬৮
ঈসা ইব্‌ন ইউসুফ নকী ২৬৯
আবুল গানাইম বাগদাদী ২৬৯
আবুল হাসান আলী ইব্‌ন সুআদ ফারসী ২৬৯
আল খাতুন ২৭০
আমীর মুজীরুদ্দীন তাশতুগীন মুসতানজিদ ২৭০
৬০৩ হিজরী সন (১২০৭ খ্রি.) ২৭১
৬০৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৭২
ফিক্‌হবিদ আল-মনসূর ২৭২
আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন শায়খ আবদুল কাদের ২৭২
আবুল হায্‌ম মক্কী ইব্‌ন ২৭২
ইকবাল আল খাদিম ২৭৩
৬০৪ হিজরী সন (১২০৮ খ্রি.) ২৭৩
৬০৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৭৭
আমীর বিনয়ামীন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ২৭৭
হাম্বল ইব্‌ন আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইব্‌ন ঈসা ২৭৮
আমীর যায়নুদ্দীন কুরাজা সিলাহী ২৭৮
ডাক্তার আবদুল আযীয ২৭৮
আফীফ ইব্‌ন দারাহী ২৭৯
আবূ মুহাম্মদ জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ২৭৯
৬০৫ হিজরী সন (১২০৯ খ্রি.) ২৭৯
৬০৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২৮১
মিসরের প্রধান বিচারপতি ২৮১
৬০৬ হিজরী সন (১২১০ খ্রি.) ২৮১

৬০৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২৮২
কাযী আসআদ ইব্ন মামাতী	২৮২
আবূ ইয়াকুব ইউসুফ ইব্ন ইসমাঈল	২৮২
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান	২৮৩
আবুল মাওয়াহিব মাতূক ইব্ন মানি	২৮৩
ইব্ন খারাফ	২৮৩
আবূ আলী ইয়াহ্য়া ইব্ন রাবী	২৮৩
ইব্নুল আছীর	২৮৪
৬০৬ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়েছে	২৮৫
আল মাজদ আল মুতরিযী খাওয়ারিযমী	২৮৫
সুলতান আল মুগীছ	২৮৫
সুলতান মাসঊদ ইব্ন সালাহুদ্দীন	২৮৫
ফখরুদ্দীন রাযী	২৮৫
৬০৭ হিজরী সনে (১২১১ খ্রি.)	২৮৭
মুসেল সম্রাট নূরুদ্দীনের মৃত্যু	২৮৮
৬০৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২৯০
শায়খ আবূ উমার	২৯০
শায়খুল হাদীছ ইব্ন তাবারযাদ	২৯৪
সুলতান আরসালান শাহ	২৯৪
ইব্ন সাকীনা আবদুল ওহাব ইব্ন আলী	২৯৪
মুযাফফর ইব্ন সাসীর	২৯৫
৬০৮ হিজরী সন (১২১২ খ্রি.)	২৯৫
৬০৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ	২৯৬
শায়খ ইমাদুদ্দীন	২৯৬
তাজুদ্দীন ইব্ন হামদূন	২৯৬
রোমান সম্রাট খসরু শাহ	২৯৬
আমীর ফখরুদ্দীন সারাকুস	২৯৭
শায়খ আবুল কাসিম আবূ বকর	২৯৭
কাসিমুদ্দীন তুর্কম্যানী আল আকীবী	২৯৭
৬০৯ হিজরী সন (১২১৩ খ্রি.)	২৯৭
৬০৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২৯৮
সুলতান আল আওহাদ	২৯৮
নাজমুদ্দীন আইয়ূব	২৯৮
মক্কা শরীফের ফিক্হবিদ মুহাম্মদ	২৯৯
আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ	২৯৯

শায়খ সালিহ মাহমূদ	২৯৯
৬১০ হিজরী সন (১২১৪ খ্রি.)	২৯৯
৬১০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩০০
শায়খ আহমদ হানাফী	৩০০
শায়খ আবুল ফযল ইব্‌ন ইসমাঈল	৩০০
মন্ত্রী মুইয্‌যুদ্দীন আবুল মাআলী	৩০১
সিনজার ইব্‌ন আবদুল্লাহ নাসিরী খলীফাতী	৩০১
কাযী সালামিয়্যাহ	৩০১
তাজুল উমানা	৩০২
আল-কালবী	৩০২
খ্যাতিমান চিকিৎসক আল মুহাযযাব	৩০২
আল কানূন গ্রন্থ প্রণেতা আল-জাযূলী	৩০৩
৬১১ হিজরী সন (১২১৫ খ্রি.)	৩০৩
৬১১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত রিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩০৪
ইবরাহীম ইব্‌ন আলী	৩০৪
আবদুস সালাম ইব্‌ন আবদুল ওহহাব	৩০৪
আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন মুবারক আল বাযযার	৩০৫
হাফিয আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আনজাব	৩০৫
৬১২ হিজরী সন (১২১৬ খ্রি.)	৩০৫
৬১২ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩০৭
হাফিয আবদুল কাদির রাহাভী	৩০৭
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আল-ওয়াজিহ	৩০৭
আবূ মুহাম্মদ আবুল আযীয ইব্‌ন আবুল মাআলী	৩০৯
শায়খুল ফিকহ কামালুদ্দীন মওদূদ	৩০৯
৬১৩ হিজরী সন (১২১৭ খ্রি.)	৩০৯
আবূ শামাহ বলেছেন	৩০৯
৬১৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩০৯
সম্রাট আবূ মনসূর যাহির	৩০৯
যায়দ ইব্‌ন হাসান	৩১০
আল হজ্জ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাফিয আবদুল গণী মুকাদ্দেসী	৩১৫
আবুল ফাতূহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুবারক	৩১৬
শরীফ আবূ জাফর	৩১৬
আবূ আলী মাযীদ ইব্‌ন আলী	৩১৬
আবুল ফযল রিশওয়ান ইব্‌ন মনসূর	৩১৭
৬১৪ হিজরী সন (১২১৮ খ্রি.)	৩১৮

৬১৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩২০
শায়খ আল ইমাদ	৩২০
কাযী জামালুদ্দীন	৩২১
আমীর বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল কাসিম	৩২২
শুজা মাহমূদ ওরফে ইব্ন দিমাগ	৩২২
মহিলা শায়খ দাহনুল লূয	৩২৩
৬১৫ হিজরী সন (১২১৯ খ্রি.)	৩২৩
ফ্রাংকদের দিময়াত দখল	৩২৫
৬১৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩২৭
বিচারপতি শারফুদ্দীন	৩২৭
কাযী আবুল কাসিম ইমাদুদ্দীন	৩২৭
আবুল ইয়ামান নাজাহ ইব্ন আবদুল্লাহ হাবশী	৩২৭
আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ ইব্ন উলওয়ান	৩২৮
আবূ তাইয়েব রিযকুল্লাহ ইব্ন ইয়াহ্য়া	৩২৮
আবুল আব্বাস	৩২৮
৬১৬ হিজরী সন ১২২০ খ্রি.)	৩২৮
চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ও তাতারীগণের জীয়হূন নদী অতিক্রম	৩২৮
৬১৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩৩১
সিত্তুশ শাম	৩৩১
আল ইরাব ও আল লুবাব প্রণেতা আবুল বাকা	৩৩২
হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল কাসিম	৩৩৩
কবি ইব্ন দাভী	৩৩৩
আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্য়া ইব্ন কাসিম	৩৩৩
আল 'জাওয়াহির' গ্রন্থের রচয়িতা	৩৩৪
৬১৭ হিজরী সন (১২২১ খ্রি.)	৩৩৪
৬১৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	৩৪৩
সুলতান ফাইয	৩৪৩
শায়খ সদরুদ্দীন	৩৪৩
হিমা-এর শাসনকর্তা	৩৪৩
আমিদের শাসনকর্তা	৩৪৪
শায়খ আবদুল্লাহ ইউনানী	৩৪৪
আবূ আবদুল্লাহ আল হুসায়ন	৩৪৬
৬১৮ হিজরী সন (১২২২ খ্রি.)	৩৪৬
৬১৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	২৪৮

সাহিত্যিক ইয়াকূত মুসেলী ৩৪৮
জালালুদ্দীন আল হাসান ৩৪৯
শায়খ সালিহ ৩৪৯
খতীব মুওয়াফ্ফিকুদ্দীন ৩৪৯
মুহাদ্দিছ তাকীয়ুদ্দীন আবূ তাহের ৩৪৯
আবুল গায়ছ শুআয়ব ইব্ন আবূ তাহের ইব্ন কালীব ৩৪৯
আবুল ইয্য শরফ ইব্ন আলী ৩৫০
আবূ সুলায়মান দাঊদ ইব্ন ইব্রাহীম ৩৫০
আবুল মুযাফফর আবদুল ওয়াদূদ ৩৫০
৬১৯ হিজরী সন (১২২৩ খ্রি.) ৩৫১
৬১৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৩৫১
আবদুল কাদির ইব্ন দাঊদ ৩৫২
আবু তালিব ইয়াহ্য়া ইবন আলী ৩৫২
কুতুবুদ্দীন আল আদিল ৩৫৩
শায়খ নাসরুদ্দীন আবুল ফারজ ৩৫৩
৬২০ হিজরী সন (১২২৪ খ্রি.) ৩৫৩
৬২০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৩৫৪
মুওয়াফ্ফিকুদ্দীন ৩৫৪
ফখরুদ্দীন ইব্ন আসাকির ৩৫৬
সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন উরওয়া আল মুসেলী ৩৫৭
শায়খ আবুল হাসান রোযবিহারী ৩৫৮
শায়খ আবদুর রহমান আল ইয়ামানী ৩৫৮
রইস ইয্যুদ্দীন মুযাফফর ইব্ন আসআদ ৩৫৮
সেনাপতি মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ৩৫৮
আবূ আলী হাসান ইব্ন আবুল মাহাসিন ৩৫৯
আবূ আলী ইয়াহ্য়া ইব্ন মুবারক ৩৬০
৬২১ হিজরী সন (১২২৫ খ্রি.) ৩৬০
৬২১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৩৬২
আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ৩৬২
আবুল কারাম মুযাফফর ইব্ন মুরাবক ৩৬২
মুহাম্মাদ ইবন্ আবুল ফারাজ ইবন্ বারাকা ৩৬৩
আহ্মাদ ইবন্ জা'ফর ইবন্ সাহমাদ ৩৬৩
৬২২ হিজরী শুরু ৩৬৩
খলীফা নাসেরের ওফাত এবং তার পুত্র যাহিরের খিলাফত লাভ ৩৬৪
"যাহের ইবন্ নাসেরের খিলাফতকাল" ৩৬৬

আবুল হাসান আলী	৩৬৭
আমীর সায়ফুদ্দীন আলী	৩৬৮
শায়খ আলী কুরদী	৩৬৮
ফাখ্‌র ইবন্ তায়মিয়্যা	৩৬৯
ওযীর ইবন্ শাকার	৩৬৯
আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ মুযাফফর	৩৭০
আবুল হাসান 'আলী ইবনুল হাসান	৩৭০
আল্‌বীহা –সানজারী	৩৭০
উছমান ইবন্ ঈসা	৩৭১
আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন্ আহমাদ ইবন্ রুসাবী	৩৭১
আবুল ফযল আবদুর রহীম ইবন্ নামরুল্লাহ	৩৭১
আবূ আলী আল হাসান ইবন্ আলী	৩৭২
তাম্‌রীহ-এর ব্যাখ্যাকার ইবন্ য়ুনুস	৩৭২
৬২৩ হিজরীর সূচনা	৩৭২
খলীফা যাহিরের ওফাত এবং পুত্র মুসতানসিরের খিলাফত	৩৭৩
মুসতানসির বিল্লাহ আল্‌আব্‌বাসীর খিলাফত	৩৭৫
জামাল মিস্‌রী	৩৭৬
দামেশকের শাসক মু'তামিদ	৩৭৭
মাদরাসা শিবলিয়্যার ওয়াকফ কারি	৩৭৮
দিমাশক ও হালবে রওয়াহিয়্যার ওয়াকফকারি	৩৭৮
আবূ মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবন্ মাওদূদ ইবন্ মাহমূদ	৩৭৯
য়াকূত য়াকূব ইবন্ আবদুল্লাহ	৩৭৯
৬২৪ হিজরী সন শুরু	৩৭৯
চেঙ্গিস খান	৩৮১
সুলতান মুআযযম	৩৮৬
আবুল সাআলী আসআদ ইবন্ যাইইয়ার	৩৮৭
আবুল কাসিম 'আব্দুর রহমান ইবন্ মুহাম্মাদ	৩৮৮
আবুন নাজ্‌ম মুহাম্মাদ ইবন্ কাসিম ইবন্ হিকাতুল্লাহ তিকরীতা	৩৮৮
৬২৫ হিজরীর সূচনা	৩৮৮
৬২৬ হিজরীর সূচনা	৩৮৯
সুলতান মাসউদ ইকসীয় কামিল	৩৯১
ছুতোর মুহাম্মাদ সাবতী	৩৯১
আবুল হাসান 'আলী ইবন্ সালিম	৩৯১
আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ইবন্ সাবির আল্‌হাররানী	৩৯১
আবুল ফাত্‌হ নাসর ইবন্ আলী বাগদাদী	৩৯২
আবুল ফযল জিবরাইল ইবন্ মানসূও	৩৯৩

৬২৭ হিজরীর সূচনা	৩৯৪
যায়নুল উমানা শায়খ সালিহ	৩৯৫
শায়খ বায়রম মারদীনী	৩৯৫
৬২৮ হিজরী সূচনা	৩৯৬
য়াহ্ইয়া ইবন্ মুতী ইবন্ আবদুন্ নূও	৩৯৮
চিকিৎসক দাখওয়ার	৩৯৮
কাযী আবূ গানিশ ইবন্ আদীম	৩৯৮
আবুল কাসিম আব্দুল মাজীদ ইবন্ আজামী হালবী	৩৯৯
আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ 'আব্দুল কারীম	৩৯৯
মুজিদ বাহানসী	৩৯৯
জামালুদ্দৌলা	৩৯৯৬
সুলতান আমজাদ	৪০০
বাহরাম শাহ্ ইবন্ ফাররুখ শাহ্ ইবন্ শাহান শাহ	৪০০
জালালুদ্দীন তুকুশ	৪০১
৬২৯ হিজরীর সূচনা	৪০১
হাফিয মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল গণী	৪০২
জামাল আবদুল্লাহ ইবন্ হাফিয আব্দুল গনী	৪০২
আবূ আলী হুসায়ন ইবন্ আবূ বকর আল মোবারক	৪০২
আবুল ফাত্হ মাসউদ ইবন্ ইসমাইল	৪০৩
আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওয়াহাব	৪০৩
হুসাম ইবন্ গাযী	৪০৩
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী	৪০৪
আবু ছানা মাহমূদ ইবন্ রালী	৪০৪
নাহ্বী ইবন্ মুতী য়াইয়া	৪০৪
৬৩০ হিজরীর সূচনা	৪০৪
ওযীর সফীয়ুদ্দীন হবেন শাকার	৪০৬
সুলতান নাসের উদ্দীন মাহমূদ	৪০৬
কাযী শারাফুদ্দীন ইসমাইল ইবন্ ইবরাহীম	৪০৭
সুলতান আবূ সায়ীদ কাওকাবরী	৪০৭
সুলতান 'আযীয ইবন্ উছ্মান ইবন্ আদিল	৪০৮
আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ ইবন্ নাসরুদ্দীন ইবন্ নাসর	৪০৮
শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ারদীর	৪০৯
ইবন্ আছীর	৪১০
ইবন্ মুস্তাওফী আল্আরবালী	৪১০

৬৩১ হিজরীর সূচনা	৪১১
আবুল হাসান 'আলী ইবন্ আবূ আলী	৪১২
আমীর রোকনুদ্দীন ফালাকী	৪১৩
শায়খ ইমাম রাযীউদ্দীন	৪১৩
শায়খ আবদুল্লাহ আরমানী	৪১৩
৬৩২ হিজরীর সূচনা	৪১৫
হালবের প্রধান কাযী	৪১৬
ইবন্ ফারিয	৪১৬
৬৩৩ হিজরীর সূচনা	৪১৬
কবি হাজেরী	৪১৭
ইব্ন দিহয়া	৪১৭
৬৩৪ হিজরীর সূচনা	৪১৮
সুলতান আযীয জাহির	৪১৯
রোম সুলতান	৪১৯
শায়খ নাসেহ হাম্বলী	৪২০
কামাল ইবন্ মুহাজির	৪২০
শায়খ হাফিয আবূ আমর উছ্মান ইবন্ ফিহ্য়া	৪২০
কাযী আব্দুর রহমান তিকরীতী	৪২০
৬৩৫ হিজরীর সূচনা	৪২০
সুলতান কামিলের মৃত্যু	৪২৪
মুহাম্মাদ ইবন্ যায়দ	৪২৬
মুহাম্মাদ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ জামীল	৪২৬
কাযী শামসুদ্দীন য়াইয়া ইবন্ কারাকাত	৪২৭
শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুল হাওবী	৪২৭
শায়খ সালিহ মুআম্মার	৪২৭
বিশিষ্ট আমীর সীমান্তরক্ষী মুজাহিদ সলিমুদ্দীন	৪২৭
৬৩৬ হিজরীর শুরু	৪২৭
জামালুদ্দীন আল্ হুসায়রী আল্ হানাফী	৪২৮
ওযীর জামালুদ্দীন আলী ইবন্ হাদীদ	৪২৯
জা'ফর ইবন্ আলী	৪২৯
হাফিয যাকীযূদ্দীন	৪২৯
৬৩৭ হিজরী সনের সূচনা	৪৩০
হিমসের শাসনকর্তা	৪৩২
কাযী শামসুদ্দীন আহাদ ইবন্ খলীল	৪৩২
৬৩৮ হিজরী সনের সূচনা	৪৩৩
মুহীয়ূদ্দীন ইবন্ আরাবী	৪৩৪

কাযী নাজমুদ্দীন আবুল আববাস	৪৩৪
য়াকূত ইবন্ আবদুল্লাহ আমীনুদ্দীন আররুলী	৪৩৪
৬৩৯ হিজরীর সূচনা	৪৩৫
শামস ইবন্ খাববায	৪৩৫
কামাল ইবন্ য়ূনুস	৪৩৬
আব্দুল ওয়াহিদ সূফী	৪৩৬
আবুল ফযল আহমাদ ইবন্ আস্ফান দিয়ার	৪৩৬
আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ য়াহইয়া	৪৩৬
বাগদাদের প্রধান বিচারপতি	৪৩৭
৬৪০ হিজরী শুরু	৪৩৭
মুস্তাসিম বিল্লাহ্‌র খিলাফত	৪৩৯
খাতুন বিত্ত ইয্যুদ্দীন মাসউদ	৪৪১
৬৪১ হিজরীর সূচনা	৪৪১
শায়খ শামসুদ্দীন আবুল ফুতূহ	৪৪৩
শায়খ হাফিয সালিহ	৪৪৩
মাদরাসা কারুসিয়্যার ওয়াকফকারি	৪৪৩
দানবীর সুলতান য়ূনুস ইবন্ শামদূদ	৪৪৩
মাসউদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ মাসউদ	৪৪৪
আবুল হাসান আলী ইবন্ য়াইয়া ইবন্ হাসান	৪৪৪
৬৪২ হিজরীর সূচনা	৪৪৫
সুলতান মুগীছ উমর ইবন্ সালিহ আয়্যুব	৪৪৬
তাজুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ ইবন্ উমর ইবন্ হামাওয়াহির	৪৪৬
ওযীর নাসরুদ্দীন আবুল আয্হার	৪৪৬
প্রধান নকীব প্রধান খতীব	৪৪৭
৬৪৩ হিজরীর শুরু	৪৪৭
শায়খ তাকীয়ুদ্দীন আবু সালাহ	৪৫০
ঐতিহাসিক হাফিয ইবন্ নাজ্জার	৪৫১
হাফিয যিয়া মাকদিসী	৪৫২
শায়খ আলামুদ্দীন আবুল হাসান সাখাবী	৪৫২
রাবীআ' খাতুন বিনত আয়্যুব	৪৫৩
মুয়ীনুদ্দীন হাসান ইবন্ শায়খুশ্ শুয়ূখ।	৪৫৩
সায়ফুদ্দীন ইবন্ কালাম	৪৫৪
৬৪৪ হিজরীর শুরু	৪৫৪
বাদশা মানসূর	৪৫৫
ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন্ মাহমূদ ইবন্ 'আব্দুল মুন্ইম	৪৫৬
যিয়া 'আব্দুর রহমান আলগিমারী	৪৫৬

৬৪৫ হিজীর সূচনা ৪৫৬
হুসায়ন ইবন্ হুসায়ন ইবন্ আলী ৪৫৭
শালূবীন নাহ্বী ৪৫৭
শায়খ আলী হারীরী ৪৫৭
আমীর ইয্যুদ্দীন আইবেক ৪৫৮
শিহাব গাজী ইবন্ আদিল ৪৫৮
৬৪৬ হিজরীর শুরু ৪৫৮
'আলী ইবন্ য়াহ্ইয়া জামালুদ্দীন আবুল হাসান ৪৫৯
শায়খ আবূ আমর ইবন্ হাজিব মালেকী ৪৬০
৬৪৭ হিজরীর সূচনা ৪৬১
ফখরুদ্দীন য়ূসুফ ইবন্ শায়খ হামাওয়ায়হি ৪৬৩
৬৪৮ হিজরী শুরু ৪৬৩
মুইয ইয়যুদ্দীন অহিবেক তুর্কমানী ৪৬৪
নাসির ইবন্ আযীয ইবন্ যাহির ৪৬৪
সুলতান সালিহ ইসমাঈল ৪৬৫
তূরান শাহ ইবন্ সালিহ আয়ূব ৪৬৬
খাতূন আরগুয়ানিয়া ৪৬৬
আমীনুদ্দৌল্লা আবুল হাসান গযাল ৪৬৬
৬৪৯ হিজরীর সূচনা ৪৬৭
বাহাউদ্দীন আলী ইবন্ হিংতুল্লাহ ইবন্ সালামা ৪৬৮
৬৫০ হিজরীর সূচনা ৪৬৮
জামালুদ্দীন ইবন্ মাতরূহ ৪৬৯
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ আল্‌মাকদিসী ৪৬৯
'আব্দুল'আযীয ইবন্ 'আলী ৪৬৯
আবুল ফাত্হ নাসরুল্লাহ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ৪৭০
৬৫১ হিজরী শুরু ৪৭১
৬৫২ হিজরী শুরু ৪৭২
আব্দুল হামীদ ইবন্ 'ঈসা ৪৭২
শায়খ মাজদুদ্দীন ইবন্ তায়মিয়্যা ৪৭২
শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ তাল্হা ৪৭৩
সায়িদ ইবন্ 'আল্লান ৪৭৩
নাস্রাহ ইবন্ সালাহুদ্দীন য়ূযূফ ইবন্ আয়্যূব ৪৭৩
৬৫৩ হিজরীর সূচনা ৪৭৩
আবুল ইয্ ইসমাইল ইবন্ হামিদ ৪৩৭
৬৫৪ হিজরী শুরু ৪৭৪
আবূ শামা বলেন ৪৭৪
আল্লামা আবূ শামা বলেন ৪৭৫

ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন ৪৭৫
আল্-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন ৪৭৭
বাগদাদ শহরের অপর নাম ৪৮১
শায়খ ইমাদুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন্ হাসান ইবন্ নাহ্হাস ৪৮১
য়ূসুফ ইবন্ আমীর হুসামুদ্দীন ৪৮১
শায়খ শামসুদ্দীন ৪৮১
চিকিৎসাকেন্দ্র সালিহিয়্যার ওয়াক্ফাকারী ৪৮২
মুজীরুদ্দীন য়া'কূব ৪৮২
আমীর মুযাফফরুদ্দীন ইবরাহীম ৪৮৩
শায়খ শামসুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন্ নূহ ৪৮৩
৬৫৫ হিজরীর সূচনা ৪৮৩
শায়খ তাকীয়ূদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন্ আবূল ফাহম ৪৮৫
শায়খ শারাফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফজল আলমাসাসী ৪৮৫
আমীর সায়ফুদ্দীন ৪৮৬
বাশারা ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ৪৮৬
কাযী তাজুদ্দীন ৪৮৬
সুলতান নাসির ৪৮৬
সুলতান মু'ইয ৪৮৭
শাজারাতুদ্দুর বিনত 'আবদুল্লাহ ৪৮৭
শায়খ হিবাতুল্লাহ ইবন্ সা'দ ৪৮৮
ইরাকী কবি ইবন্ আবুল হাদীস ৪৮৮
৬৫৬ হিজরীর সূচনা ৪৮৮
খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ ৪৯৪
পরিচ্ছেদ ৪৯৯
সরসরী (রহঃ) ৫০০
বাহা যুহায়র ৫০১
হাফিয যাবীয়ূদ্দীন মুনযিরী ৫০১
আবূ বকর মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল আযীয ৫০১
ওযীর ইবন্ আল্কামী ৫০২
মুহাম্মাদ ইবন্ 'আব্দুস সামাদ ইবন্' আবদুল্লাহ ইবন্ হায়দারা ৫০২
আলকামাল ইসহাক ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'উছমান ৫০৩
আল ইমাদ দাউদ 'উমর ইবন্ য়াইয়া ইবন্' উমর ইবন্ কামিল ৫০৩
আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ হুমায়ন ৫০৩
শায়খ আলী ৫০৩
মুহাম্মাদ ইবন্ ইসমাইল ইবন্ আহমাদ ইবন্ আবুল ফারাজ আবূ আবদুল্লাহ ৫০৩
মাওসিল প্রশাসক বদর লু'লু ৫০৩
সুলতান নাসের দাউদ মুআয্যম ৫০৪

৬৫৭ হিজরীর সূচনা ৫০৫
মুযাফফর কাত্য-এর শাসনকর্তৃত্ব ৫০৬
সদরুদ্দীন আসআদ ইবন্ মুনজাত ইবন্ বারাকাতদ ইবন্ মুআম্মাল ৫০৭
শায়খ য়ূসুফ আকমীনী ৫০৭
মুহাদ্দিস শামস ইবন্ আলী ইবন্ শাব্বী ৫০৮
শাতেবিয়্যার ব্যাখ্যাকার আবূআবদুল্লাহ ফাসী ৫০৮
সাননাজম আখূ বদর মুফাযযল ৫০৮
সা'দুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ শায়খ মুহীরুদ্দীন ইবন্ আরবি ৫০৮
সায়ফুদ্দিন ইবন্ ৫০৮
নাজীব ইবন্ শুআয়শিআ দামেশ কী ৫০৮
৬৫৮ হিজরীর সূচনা ৫০৯
তাতারীদের দামেশক দখলের বিবরণ ৫১০
আয়ন জালূতের যুদ্ধ ৫১১
সুলতান যাহির কায়বারাস বন্দুকদারী ৫১৫
মারদীন প্রশাসক আলমালিক আসসায়ীদ ৫১৮
আলমালিক আসসায়ীদ হাসান ইবন্ 'আব্দুল' আযীয ৫১৮
আব্দুর রহমান ইবন্ আব্দুর রহীম ৫১৮
আলমালিক আলমুযাফফর কুতুয ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ৫১৮
ফকীহ শায়খ মুহাম্মাদ আল্য়ূনীনী ৫২২
শায়খ ফকীহ বলেন ৫২৪
মুহাম্মাদ ইবন্ খলীল ইবন্ 'আবুদল ওয়াহহাব ইবন্ বদরু ৫২৫
৬৫৯ হিজরীর শুরু ৫২৫
খলীফার বাগদাদ গমন ৫২৯
৬৬০ হিজরীর সূচনা ৫২৯
হাকিম বিআমরিল্লাহর আয়াত ৫৩০
খলীফা মুসতানজির ইবন্ যাহির বিআমরিল্লাহ আব্বাসী ৫৩২
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভাষাও ব্যাকরনবিদ আল্ইয ৫৩২
ইবন্ 'আব্দুস সালার ৫৩৩
কামালুদ্দীন ইবন্ আদীম আল্ হানাফী ৫৩৩
য়ূসূফ ইবন্ য়ূয়ুফ ইবন্ সালামা ৫৩৪
আলবদর আল্মুরাগী আল্খিলাফী ৫৩৪
মুহম্মাদ ইবন্ দাউদ ইবন্ য়াকূত সারিমী ৫৩৪
৬৬১ হিজরী শুরু ৫৩৫
হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস-এর খিলাফত ৫৩৫
সুলতান যাহিরের কারকদখল ৫৩৬

আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবুদুল্লাহ	৫৪০
আবদুর রাযযাক ইবনে আব্দুল্লাহ	৫৪০
আলামুদ্দিন আবুল কাশিম	৫৪১
অতঃপর শুরু হল হিজরী ৬৬২ সন (খ্রিস্টাব্দে ১২৬৪)	৫৪২
হিজরী ৬৬৩ সন (ঈসায়ী ১২৬৫ সন)	৫৪৫
অতঃপর শুরু হল ৬৬৪ হিজরী ঈসায়ী ১২৬৬ সন	৫৪৭
হিজরী ৬৬৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৬৭ সন)	৫৫০
আল আমীর কবীর নাসির উদ্দিন	৫৫২
শায়েখ শিহাবউদ্দিন আবু শামা	৫৫২
হিজরী ৬৬৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৬৯ সন)	৫৫৮
শরফুদ্দিন আবু যাহির	৫৬০
কাযী তাজউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ	৫৬০
দক্ষ চিকিৎসক শরফুদ্দীন আবুল হাসান	৫৬০
শায়খ নাসিরউদ্দিন	৫৬১
শায়খ আবুল হাসান	৫৬১
হিজরী ৬৬৮ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭০ সন)	৫৬১
আল শায়েখ মুয়াফফাস উদ্দীন	৫৬২
শায়খ যাইনুদ্দিন আহমাদ ইবন আবদুল দায়েম	৫৬২
কাযী মহিউদ্দীন যাকী	৫৬৩
সাহেব ফখরুদ্দীন	৫৬৪
শায়েখ আবু নছর ইবন আবুল হাসান	৫৬৪
হিজরী ৬৬৯ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭১ সন)	৫৬৪
কাযী আল কুখাত আবু হাযজ	৫৬৭
হিজরী ৬৭০ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭১ সন)	৫৬৭
ওয়াজীহুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবু তলেব	৫৬৯
শায়খ আলী আল-বাক্বা	৫৬৯
হিজরী ৬৭১ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭২ সন)	৫৭০
রবিউল আউয়াল মাসে ছাহইউরুন অঞ্চলের	৫৭০
খতীব ফখরুদ্দিন আবু মোহাম্মদ	৫৭৩
আল তাযীয গ্রন্থের লেখক	৫৭৩
হিজরী ৬৭২ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৩ সন)	৫৭৪
আমির কবির ফারিদ্দীন আতওয়ী	৫৭৫
শায়তা আব্দুল্লাহ ইবন গাদীন	৫৭৫
ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন শাকের ইবন আব্দুল্লাহ	৫৭৬
আল ফিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা ইবন মালেক	৫৭৬

আল নাসির আল তুসী ৫৭৭
শায়খ সালেম আল বারকী ৫৭৭
হিজরী ৬৭৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৪ সন) ৫৭৭
ইবন আতা আল হানাফী ৫৭৮
বায়মান্দ ইবন বায়হান্দ ইবন বায়মান্দ ৫৭৮
হিজরী ৫৩৪ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৫ সন) ৫৭৯
শায়খ, ইমাম, আল্লামা ৫৮০
ঐতিহাসিক ইবনুস সাঈ ৫৮১
হিজরী ৬৭৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৬ সন) ৫৮১
তাওয়াযি ইয়ামান আল হাবজী ৫৮৩
কবি শিহাবউদ্দীন আবুল মাবনরিম ৫৮৩
শায়খ সালেহ আলেম ও যাহিদ ৫৮৪
মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব ইবন মনসুর ৫৮৫
হিজরী ৬৭৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৭ সন) ৫৮৫
আমীর কবির বদরুদ্দিন বেলবেক ইন আবদুল্লাহ ৫৯০
কাযী আল কুথাত হাম্বলী ৫৯০
শায়েখ মহিউদ্দিন নববী ৫৯১
আলী ইবন আলী ইবন ইস্পানদিয়ার ৫৯২
হিজরী ৬৭৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৮ সন) ৫৯৩
আইদকীন ইবন আব্দুল্লাহ ৫৯৫
ত্বাহা ইবন ইবরাহীম ইবন আবু বকর কামালউদ্দিন হামদানী আল আরিলী আল শাফেঈ ৫৯৬
আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ৫৯৬
উযীর ইবনুল হিনা ৫৯৭
ইবন ইসরাঈল আল হারীরী ৫৯৮
ইবনুল উদ রাফেযী ৬০৫
আবু কাশেম আল হুসাইন ইবন উদ নযীবুদ্দিন ৬০৫
হিজরী ৬৭৮ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৯ সন) ৬০৫
মালিক সাঈদের পদচ্যুতি এবং তদীয় ভ্রাতা মালেক আদেল মালমাশ এর নিযুক্তি ৬০৬
মালেক মনসুর কালাউন ছালেহির বাই'আত ৬০৭
দামেস্কে সানকার আল আশাকারের রাজত্ব ৬০৭
হিজরী ৬৭৯ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮০ সন) ৬০৮
আমীর কবির ৬১২
হিজরী ৬৮০ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮১ সন) ৬১৩
হিমস নগরীর ঘটনা ৬১৪

ইবনে তাওলী ইবনে চেঙ্গিস খান ৬১৬
কাযীউল কুযাত ৬১৭
কাযীউল কুযাত সদরুদ্দীন ওমর ৬১৭
শায়খ ইবরাহীম ইবন সাঈদ আল শাসুরী ৬১৭
কাযী আল কুযাত ৬১৯
শায়খ আলামুদ্দিন আবুল হাসান ৬১৯
আল সদর আল বকীর আবুল গামায়েস আর মুসলিম ৬১৯
শায়খ শফীউদ্দিন ৬১৯
হিজরী ৬৮১ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮২সন) ৬২০
কাযী আমিনুদ্দিন আল তলাশতারী ৬২১
শায়খ বুরহানউদ্দিন আবুস সানা ৬২১
কাযী ইমাম আল্লামা শায়খুল কুররা যয়নুদ্দিন ৬২১
শায়খ সালাহউদ্দিন ৬২১
কাযী আল কুযাত ইবন খাল্লিকান ৬২১
হিজরী ৬৮২ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৩ সন) ৬২২
ইবনু আবি জাফওয়ান ৬২৩
আল খতীব মহিউদ্দিন ৬২৩
শায়খ ইমাম আলেম শিহাবউদ্দীন ৬২৪
হিজরী ৬৮৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৪ সন) ৬২৪
শায়খ তালেব গিফায়ী ৬২৫
কাযী ইমাম ইযযুদ্দিন আবুল মাযাকের ৬২৫
মালেক সাঈদ ফাহউদ্দীন ৬২৫
কাযী নাযমুদ্দিন ওমর ইবন নসর ইবন মনসুর ৬২৬
মালেক মনসুর নাসিরউদ্দীন ৬২৬
কাযী জামালুদ্দিন আবু ইয়াকুব ৬২৬
হিজরী ৬৮৪ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৫ সন) ৬২৬
শায়খ ইযযুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আলী ৬২৭
আল-বানদাকদারী ৬২৭
শায়খ সালেহ আবেদ যাহিদ ৬২৭
ইবন আমির আল মুকরী ৬২৮
কাযী ইমাদুদ্দীন ৬২৮
শায়খ হাসান রুমী ৬২৮
আবুল কাশেম আলী-বলবান ইবন আব্দুল্লাহ ৬২৯
আল- আমির মুজীর উদ্দিন ৬২৯
আল'শায়েখ আল আরিফ শরফুদ্দীন ৬২৯

হিজরী ৬৮৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৬ সন) ৬৩০
আহমদ্ বিন শায়বান ৬৩১
শায়খ ইমাম বিজ্ঞ আলেম ৬৩১
কাযী আল কুযাত ৬৩১
শায়খ খাযদুদ্দীন ৬৩১
কবি ও সাহিত্যিক ৬৩২
আলহাজ্জ শারফুদ্দীন ৬৩২
অনেক গ্রন্থের রচয়িতা আল বায়যাবী ৬৩২
হিজরী ৬৮৬ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৭ সন) ৬৩৩
শায়খ ইমাম আল্লামা ৬৩৪
ইমামুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আল দানিসারী ৬৩৪
কাযী আল কুফত ৬৩৪
শায়খ সালেহ ইযযুদ্দিন ৬৩৪
হাফেয আবুল ইয়ামনী ৬৩৫
হিজরী ৬৮৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৮ সন) ৬৩৫
খতীব ইমাম কুতুবউদ্দীন ৬৩৬
শায়খ সালেহ আবিদ ৬৩৭
শায়খ সালেহ ৬৩৭
হাকিম রঈস আলাউদ্দিন ইবন আবুল হাজ্জ ইবনে নাফস ৬৩৭
শায়খ বদরুদ্দীন ৬৩৭
হিজরী ৬৮৮ সন খ্রিস্টাব্দ ১২৮৯ ৬৩৭
আলেম ইবন ছাহেব ৬৩৮
শামসুদ্দিন ইস্পাহানী ৬৪০
শামস মোহাম্মদ ইবন আল-আফীক ৬৪০
মালেক মনসুর শিহাবউদ্দিন ৬৪১
শায়খ ফখরুদ্দীন আবু মোহাম্মদ ৬৪১
হিজরী ৬৮৯ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯০ সন) ৬৪২
মালেক মনসুর কালাউনের মৃত্যু ৬৪২
সুলতান মালেক মনসুর কালাউন ৬৪৪
আমার হুসাম উদ্দীন তারাক তাই ৬৪৪
খতিব জামাল উদ্দিন আবু মুহাম্মদ ৬৪৫
ফকরুদ্দীন আবু যাহের ইসমাঈল ৬৪৫
আলহাজ্জ তাইবারস ইবন আব্দুল্লাহ ৬৪৬
কাযী আল কুযাত ৬৪৭
হিজরী ৬৯০ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯১ সন) ৬৪৭
এক্কা ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল বিজয় ৬৪৭

তাতার সম্রাট আরগুন ইবন আবগা ৬৫৩
আল মুসনাদ আল মুয়াম্মার আর রাহালা ৬৫৩
শায়খ তাজউদ্দীন ফাযারী ৬৫৪
ইযযুদ্দীন ইবরাহীম ইবন মোহাম্মদ ইবন তরখান ৬৫৫
শায়খ ইমাম আল্লামা ৬৫৬
শায়খ ইমাম আবু হাফস ওমর ইবন ইয়াহহিয়া ইবন ওমর ৬৫৬
মালেক আদেল বদরুদ্দীন সালামাশ ইবন যাহির ৬৫৬
আফীফ তিলমে সানী ৬৫৬
হিজরী ৬৯১ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯২ সন) ৬৫৭
রোম দূর্গ জয় ৬৫৭
খতীব যয়নুদ্দীন আবু হাফস ৬৬৫
সাহেব ফাতহুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ ৬৬৫
ইউনুস ইবন আলী ইবন দিরওয়ান ইবন বারকশ ৬৬৫
জালালুদ্দীন আল খাবাযী ৬৬৬
মালেক মুযাফফর ৬৬৬
হিজরী ৬৯২ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৩ সন) ৬৬৬
শায়খ আল মবীশায়খ সালেহ ৬৬৮
মাকামা গ্রন্থের রচয়িতা অন্ধ তনয় (ইবনুল আ'মা) ৬৬৮
মালেক যাহের মুজউদ্দীন ৬৬৮
শায়খ তকীউদ্দীন ওয়াসেতী ৬৬৮
ইবন সাহেব হেমাতুল মালেক আফজাল ৬৬৯
ইবন আব্দুয যাহের ৬৬৯
আমীর আলামুদ্দিনে সানযার হালবী ৬৬৯
হিজরী ৬৯৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৪ সন) ৬৭০
ওসাপ নাসরানীর ঘটনা ৬৭১
খাতূন মুনীস বিনতে সুলতান আদিল আবু বকর ইবন আইয়ুব ৬৭৩
ছাহেব উজীর ফখরুদ্দীন ৬৭৩
মালেক হাফেয গিয়াস উদ্দীন ইবন মোহাম্মদ ৬৭৩
কাযী আল কুযাত মিহাবউদ্দীন ইবনুল খুবাই ৬৭৩
অন্ধ আমীর আলাউদ্দীন ৬৭৪
উজীর শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন উসমান ৬৭৪
হিজরী ৬৯৪ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৫ সন) ৬৭৫
মালেক আদিল কাতারবার রাজত্ব ৬৭৫
শায়খ আবুর রিযাল আল মানীনী ৬৭৮
শায়খ সালেহ আবিদ যাহিদ ওয়ারা ৬৭৮

শায়খ মুহিব্বুদ্দিন তাবারী মাক্কী ৬৭৮
মালেক মুযাফ্ফর ইয়ামানীর শাসনকর্তা ৬৭৯
শরফুদ্দীন আল মাগদেসী ৬৭৯
ওয়াকিফুল যাওহারিয়া সদর নাযমুদ্দিন ৬৮০
শায়খ আল ফারুনী ইমাম আবিদ যাহির ৬৮০
আল-জামাল আল মুহাক্কিক ৬৮১
আলাস্ত খাতুন বিনতে মালেক আশরাফ ৬৮১
ছদর জামালুদ্দীন ৬৮২
হিজরী ৬৯৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৬ সন) ৬৮২
শায়খ যয়নুদ্দীন ইবন মানজা ৬৮৪
আল- মাযাহ অঞ্চলে হামাম খানার অধিকারী আল মাসউদী ৬৮৫
শায়েখ খালিদী ৬৮৫
শরীফ হুসাইন আল-মাগদেসী ৬৮৫
শায়েখ ইমাম আলিম নাসিখ ৬৮৬
মুহিউদ্দিন ইবন নুহাশ ৬৮৬
কাযী আল কুযাত তকীউদ্দিন আবুল ৬৮৬
হিজরী ৬৯৬ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৭ সন) ৬৮৬
'মালেক মনসুর লাজীন সালাহদারীর রাজত্ব ৬৮৮
হাম্বলী মাযহাবের কাযী আল কুযাত ইযযুদ্দীন ৬৯২
শায়খ ইমাম হাফেয কুদওয়া ৬৯২
শায়খ শীস ইবন শায়খ আলী- আল হাবীরী ৬৯২
শায়খ সালেহ আল মুকরী ৬৯২
ওয়াকিফ আল সামিরিয়া ৬৯২
রছীফস্থ নাফীসার ওয়াকফদাতা ৬৯৩
শায়খ আবুল হাসান সারুর দামেস্কি নামে পরিচিত ৬৯৩
হিজরী ৬৯৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৮ সন) ৬৯৪
শায়খ হাসান ইবন শায়খ আলী আল হারীরী ৬৯৫
আল ছদর আল কবির শিহাবউদ্দীন ৬৯৫
শায়খ শামসুদ্দীন আয়কী ৬৯৬
ছদর ইবন উকবা ৬৯৬
আশ শিহাব আল আ'বির ৬৯৬

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

১৩শ খণ্ড

হিজরী ৫৫৬ সন

এ বছর সুলতান সুলায়মান শাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন মালিক শাহ নিহত হন। ইনি দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন এবং ধর্ম-কর্ম বিষয়ে উপহাস করতেন। রমযান মাসেও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে শাসনকার্যের ব্যবস্থাপক ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করেন। এই ব্যবস্থাপকের নাম ছিলো ইযদিয়ার। তারিখ আল কামিল গ্রন্থে কুতবায়ু উল্লেখ করা হয়েছে, ইনি ছিলেন তার ব্যক্তিগত সেবক। তারপর শপথ গ্রহণ করেন সুলতান আর সালন শাহ ইবন তুগরিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মালিক শাহ। এক-ই বছর মালিক ছালেহ ফারিসউদ্দিন আবুল গারাত তালায়ে ইবন রুযবেগ আল আর মানিককে হত্যা করা হয়। ইনি ছিলেন মিশরের শাসনকর্তা আল আযিদ এর উজীর এবং তার শশুর। আল আযিদ শিশু ছিলেন বলে ইনি তাকে বাঁধা দেন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তার সন্তান রুযবেক উজীর হন এবং আল আদিল উপাধি ধারণ করেন। তার পিতা ছিলেন সৎ, যোগ্য এবং সাহিত্যমনা ব্যক্তি। তিনি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের ভালবাসতেন এবং তাদের কল্যাণ সাধনে কাজ করতেন। ইনি ছিলেন উত্তম শাসক এবং উত্তম উজীর। অনেক কবি তার প্রশংসা করেছেন। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বলেন, পূর্বে তিনি বনী আল আসিব-এর মুনিয়ার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। এরপর এ অবস্থা তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, তিনি আল আযিদ-এর উজীর হন। ইতিপূর্বে তিনি আল-ফায়িয এর উজীর ছিলেন। অতঃপর, তার পুত্র আল আদিল রুযবিক ইবন তালায়ে উজীর হন। অতঃপর সাওয়ার উজীরের পদ জোরপূর্বক অধিকার করে নেয়া পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তিনি আরো বলেন, এই ছালেহ কায়রো শহরের অদূরে যাবিলা দরজা জামে মসজিদের নির্মাতা ছিলেন। তিনি আরো বলেন, মাসের ১৯ তারিখ তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী মাসের ১৯ তারিখ তিনি মন্ত্রীর বাস ভবন থেকে আল-কায়াফা ভবনে স্থানান্তরিত হন। আর পরবর্তী মাসের ১৯ তারিখ তাদের ওযারতির অবসান ঘটে। তার সম্পর্কে যয়বুদ্দিন আলী ইবন নাযা ইবন হাম্বিলী যে কবিতা রচনা করেন তার কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

مشيبك قد محى صنع الشباب * وحل البازفي وكر الغراب

تنام ومقلة الحدثان يقظى * وما ناب النوائب عنك ناب

وكيف نفاد عمرك وهو كنز * وقد انفقت منه بلا حساب

"তোমার বার্ধক্য যৌবনের শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে,
আর বাজপাখি ফিরে এসেছে কাকের বাসায়।
তুমি নিদ্রা যাও, আর জেগে থাকে ঘটনাবলীর চক্ষু,
আর বিপদের ঘনঘটা রেখে যায়নি তোমার কোন প্রতিনিধি।
তোমার জীবনের অবসান কেমন করে ঘটবে,
তাতো এক পুঞ্জিভূত সম্পদ,
আর আমি খরচ করেছি তা থেকে অঢেল।"

তিনি আরো বলেন,

كم ذا يرينا الدهر من احداثه * عبرا وفينا الصد والاعراض

ننسى الممات وليس يجري ذكره * فينا فتذكرنا به الامراض

"যুগ আমাদেরকে দেখিয়েছে কত সব ঘটনাবলী শিক্ষা গ্রহণের জন্য,

আর আমরা ছিলাম উদাস, অমনোযোগী।

আমরা ভুলে যাই মৃত্যুকে, থাকে না আমাদের মধ্যে মৃত্যুর চর্চা রোগ-শোক আমাদেরকে স্মরণ করায় মৃত্যুর কথা।"

তিনি আরো বলেন,

ابى الله الا ان يدوم لنا الدهر * ويخدمنا فى ملكنا العز والنصر

علمنا بان المال تفنى الوفه * ويبقى لنا من بعده الاجر والذكر

خلطنا الندى بالباس حتى كاننا * سحاب لديه البرق والرعد والقطر

"আল্লাহ তা'য়ালা এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কাল সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং সম্মান ও বিজয় আমাদের রাজত্বে; আমাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

আমরা জানি যে, বিপুল অর্থ– সম্পদ বিলীন হয়ে যাবে, এরপর আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে কেবল বিনিময় আর স্মৃতি। আমরা দানকে যুদ্ধের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছি, যেন আমরা মেঘমালা, আর তার কাছে আছে বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের গর্জন এবং বৃষ্টি।

মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

نحن فى غفلة ونوم وللمو * ت عيون يقظانة لا تنام

قد رحلنا الى الحمام سنينا * ليت شعرى متى يكون الحمام

"আমরা পড়ে আছি নিদ্রায় ও অবহেলায়, আর মৃত্যুর চোখ জেড়ে আছে, কখনও ঘুমায় না।

আমরা বছরের পর বছর ধরে মৃত্যুর দিকে গমন করছি, হায় মৃত্যু কবে হবে যদি আমি জানতে পারতাম।"

এরপর আল আযেদ-এর সেবকরা দিনে-দুপুরে তাকে হত্যা করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬১ বছর এবং তার পুত্র আল আদিল-কে মন্ত্রীত্বের খিলাফত দান করেন। কবি ইমারা তামিযী চমৎকার শোক গাঁথায় তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তাঁর লাশ যখন আল কারাফায় দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন আল আযেদ ও লাশের সঙ্গে গমন করেন। তিনি কবর পর্যন্ত লাশের সঙ্গে যান এবং তাকে সিন্দুকে ভরে দাফন করা হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন, ফকীহ আমরা সিন্দুক বিষয়ে একটি কবিতা রচনা করেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেন ঃ

وكانه تابوت موسى اودعت * فى جانبيه سكينة ووقار

"যেন তা ছিল হযরত মূসা (আ)-এর তাবুত এবং তার উভয় পাশে স্বস্তি ও গাম্ভীর্য গচ্ছিত রাখা হয়েছিল।"

এ বছর বনূ খাফাজা এবং কুফাবাসীদের মধ্যে তুমূল যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক কুফাবাসী নিহত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আল আমীর কায়সারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা আমীরুল-হাজ্জ বরগশকে আহত করে। এসময় রাজ্যের উযীর আত্তনুদ্দীন ইবনে হুবায়রাও দ্রুত তার দিকে ছুটে যান আর অনুগমন করে বিপুল সংখ্যক লোক। তারা ক্ষমা ভিক্ষার দাবী নিয়ে লোক প্রেরণ করে। এ বছর মক্কা শরীফের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন আল শরীফ ঈসা ইবন কাসিম ইবন আবু হাশিম, ভিন্নমতে কাসিম ইবন আবী কালিতা ইবন কাসিম ইবন আবু হাশিম। এ বছর খলীফা রাস্তার পাশের দোকানগুলো উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেন; কারণ, এর ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তিনি আরো নির্দেশ দেন যে, কোনো পণ্য বিক্রেতা রাস্তার ওপর বসে কোনো পণ্য বিক্রয় করবে না, যাতে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এ বছর বাগদাদ নগরীতে পণ্যমূল্য হ্রাস পায়। ইবনুস শামাল আল মামুনিয়ায় যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, এ বছর তা উদ্বোধন করা হয় এবং আবু হাকিম ইব্রাহীম ইবন দীনার আল নাহার ওয়ানী আল হাম্বলী এই মাদ্রাসার দারস দান করেন। একই বছর তিনি ইন্তিকাল করেন। এ বছর শেষে তার ইন্তিকালের পর এই মাদ্রাসায় দারস দান করেন আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী। মৃত্যুর পূর্বে এই দারস দান থেকে তিনি অব্যাহতি নেন। এ বছর আরো যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ঃ

হামযা ইবন আলী ইবন তাল্‌হা

আবুল ফাতাহ আল হাজিব। তিনি খলীফা আল মুস্তারশিদ এবং আল মুকতাফীর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আপন বাসগৃহের নিকট তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি হজ্বে গমন করেন এবং হজ্ব থেকে ফিরে এসে তিনি সংসার ত্যাগীর জীবন-যাপন করেন এবং প্রায় বিশ বৎসরকাল স্বগৃহে সংসার ত্যাগীর জীবন-যাপন করেন। অনেক কবি তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। কোনো কোনো কবি তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

يا عضد الاسلام يا من سمت * الى العلا همته الفاخره

كانت لك الدنيا فلم ترضها * ملكا فاخلدت الى الاخره

"হে ইসলামের বাহু, যার গর্ব করার মত সাহস ঊর্ধ্বে আরোহন করেছে, দুনিয়া ছিল তোমার তরে। কিন্তু দুনিয়ার রাজত্বে তুমি তুষ্ট ছিলে না, তুমি বেছে নিয়েছো পরকালকে।"

হিজরী ৫৫৭ সনের ঘটনাবলী

এ বছর আল কারখ অঞ্চল মুসলমানদের শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা অনেক লোককে হত্যা করে এবং অনেক শিশু সন্তানকে বন্দী করে। এ কারণে উক্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং আজারবাইজানের শাসনকর্তা ইলদাযকার এবং খালাত অঞ্চলের শাসনকর্তা ইবন শাকমান এবং মুরারা অঞ্চলের শাসনকর্তা ইবন আকসানকার সকলে সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। এবং পরবর্তী বছর তারা সেখানে লুটতরাজ চালায় এবং শিশুদেরকে বন্দী করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শোচনীয়ভাবে তাদেরকে পরাজিত করে। তারা সেখানে তিনদিন

অবস্থান করে হত্যা, বন্দী ও লুটতরাজ চালায়। এ বছর রজব মাসে ইউসুফ দামেশকীকে পুনরায় নিজামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতায় নিয়োগ করা হয়। নিজামুল মূলকের পুত্র ইউসুফ দামেশকীকে পদচ্যুত করেছিলেন। কারণ ছিল এই যে, এক নারী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি তাকে বিয়ে করেছেন। তিনি প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেন, পরে আবার স্বীকার করেন। এই কারণে তাকে শিক্ষকতার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এ বছর বাবউল বসরায় উজীর ইবন হুবায়রা কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং উক্ত মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক এবং একজন ফকীহ নিযুক্ত করা হয়। একই বছর কুফা নগরীর আমীর বরগশ লোকজনকে নিয়ে হজ্বে গমন করেন। এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ঃ

শাহয়খুল হানাফিয়া সুজা

তাকে আল মাশহাদে দাফন করা হয়। তিনি ইমাম আবু হানিফার মাজারে শায়খুল হানাফিয়া ছিলেন। কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি চমৎকার বক্তব্য রাখতেন। হানাফী মাজহাবের অনুসারীরা তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে।

সদকা ইবন উজীর আল ওয়ায়ীজ

ইনি বাগদাদ নগরীতে প্রবেশ করে ওয়াজ নসীহত করেন এবং দুনিয়া ত্যাগের ধারণা প্রচার করেন। শিয়া মতবাদ এবং কালাম শাস্ত্রের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। এসবের পরও তিনি সাধারণ মানুষ এবং রাজ্যবর্গের নিকট গমন করেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অর্জন করেন। তিনি একটা খানকা নির্মাণ করেন এবং তথায় তাকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাকে মাফ করুন।

যামরাদ খাতুন

ইনি হলেন– বিনতে জাবিলী, বাদশাহ দাকমাক ইবন তুতুশের সৎবোন। ইনি দামিশক শহরের নিকট সানআ গ্রামের বাহিরে খাতুনিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। দামিশক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই স্থানকে তিল-আল সা'আলিবও বলা হয়। দামিশক শহরের পশ্চিম দিকে শাম দেশের সান'আর পূর্বদিকে এ স্থান অবস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে এই জনপদটি প্রসিদ্ধ। যামরাদ খাতুন এই স্থানটি শায়খ বুরহান উদ্দীন আলী ইবন মুহাম্মদ বল্খী হানাফীর জন্য ওয়াকফ করে দেন। শায়খ বুরহান উদ্দীন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই মহিলা ছিলেন মালেক বুরী ইবন তাগতাগীন-এর স্ত্রী। তার গর্বে দুটি সন্তান জন্ম লাভ করে, তাদের একজনের নাম শামসুল মূলক ইসমাঈল। যার সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। ইনি পিতার পর বাদশাহ হন এবং পিতার আদর্শ অনুসরণ করেন। ইনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের সহায়তা করেন এবং দেশ, সহায়-সম্পদ সবকিছু তাদের হাতে তুলে দেয়ার সংকল্প করলে লোকেরা তাকে হত্যা করে। এরপর তার ভাই বাদশাহ হয়। তার সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে শাসনকর্তার পদ অধিকার করে। যামরাদ খাতুন কুরআন মজীদ পাঠ করে এবং হাদীসও শ্রবণ করে। ইনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলেম ও সৎ লোকদের ভালবাসতেন। হালবের শাসনকর্তা আতাবিক জংগী তাকে এই লোভে বিয়ে করে যে, এই সুবাদে সে দামিশক অধিকার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার এই আশা পূরণ হয়নি। বরং

মহিলাটি হলবে তার নিকট গমন করে এবং তার মৃত্যুর পর দামিশকে ফিরে আসে। পরে মহিলা বাগদাদে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে হিজাযে গমন করে এবং মক্কায় এক বছর বসবাস করে। অতঃপর মদীনা শরীফ গমন করে সেখানে মৃত্যুবরণ করে। এ বছর জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। এই মহিলা অনেক দান খয়রাত করতেন এবং নামায-রোজা পালন করতেন। তার সম্পর্কে আসবাত বলেন যে, তার নিকট যা কিছু ছিল, তা শেষ হয়ে গেলে তিনি মারা যান। তিনি গম এবং যব বাছাই করতেন এবং এর বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই ছিল মঙ্গল-কল্যাণ এবং শুভ পরিণতির প্রতীক। আল্লাহ ভাল জানেন। তার প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

হিজরী ৫৫৮ সনের ঘটনাবলী

এ বছর আল মাগরিব-এর শাসনকর্তা আবদুল মুমিন ইবন আলী তুমারতীন মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইউসুফ শাসনকার্যে তার উত্তরাধিকারী হন। ইনি পিতাকে মরক্কো নিয়ে যান এই বলে যে, তিনি অসুস্থ। সেখানে পৌঁছে মৃত্যুর কথা প্রকাশ করলে লোকেরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এবং শাসনকার্যে তার নামে বায়আত করে। তাকে আমীরুল মুমিনীন উপাধি দেওয়া হয়। এই আবদুল মুমিন ছিলেন বিচক্ষণ, বিজ্ঞ, সাহসী, দানশীল এবং শরীয়তের প্রতি অনুরাগী। তার শাসনকালে নিয়মিত যারা নামায আদায় করত না, তাদেরকে হত্যা করা হত। মুয়াজ্জিন যখন আজান দিত এবং আজানের সময় যখন ঘনিয়ে আসত, লোকজন তখন মসজিদে ভীড় জমাত। তিনি ধীরে সুস্থে ভালভাবে নামায আদায় করতেন। নামাযে তিনি বিনয় প্রকাশ করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু। ছোট-খাটো অপরাধের জন্যও তিনি মানুষকে হত্যা করতেন। তার বিষয়টা আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তিনি যেমন ইচ্ছা তার ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। একই বৎসর সায়ফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আলাউদ্দীন আল গোযাই (এক্ষেত্রে আল কামিল ফিত-তারীক গ্রন্থে আল গোরী অর্থাৎ গোর অঞ্চলের বাদশাহ উল্লেখ করা হয়েছে– ১১/২৯৩)-কে হত্যা করা হয়। আল-দাস নামক জনৈক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। এই সাইফুদ্দীন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। এই বৎসর ফিরিঙ্গীরা নুরুদ্দীন এবং তার সৈন্যদের ওপর হামলা চালায়। এতে মুসলমানরা পরাজিত হয়। কেউ কারো দিকে দৃষ্টিপাত করত না। নুরুদ্দীন গিয়ে তার ঘোড়ায় আরোহন করে। ঘোড়া বাধার রশি তার পায়ে ছিল। জনৈক কুর্দী এগিয়ে এসে ঘোড়াকে আঘাত করলে নুরুদ্দীন প্রস্থান করে আত্মরক্ষা করে। তিনি ফিনযা নামক স্থানে গমন করেন। ফিরিঙ্গীরা কুর্দী লোকটিকে পাকড়াও করে হত্যা করে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। নুরুদ্দীন লোকটির সন্তানদের সঙ্গে ভাল আচরণ করেন। তারা তার এই ভাল ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হত না। এ বছর খলীফা বনূ আসাদকে হল্লা অঞ্চল থেকে নির্বাসনের নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে যায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। আর এটা করা হয় তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, সুলতান মুহাম্মদ শাহ-এর সঙ্গে তাদের পত্রালাপ এবং বাগদাদ অবরোধের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার অপরাধে। ফলে বনূ আসাদের চার হাজার লোককে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্টরা হল্লা ছেড়ে চলে যায়। আর খলীফার প্রতিনিধিরা আল হল্লার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর আমীর বরগশ কবীর লোকজনকে নিয়ে হজে গমন করে।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, সুলতান কবীর আবু মুহাম্মদ আবদুল মুমিন ইবন আলী। ইনি ছিলেন আল-কায়সী আল-কুফী ইবন তুমারত-এর শিষ্য। তার পিতা মাটির কাজ করতেন। তার প্রতি ইবন তুমারত-এর দৃষ্টি পড়লে তিনি তাকে পছন্দ করেন এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি জানতে পারেন যে, লোকটি বেশ বীর-বাহাদুর। এ কারণে তিনি তাকে সঙ্গী করে নেন। এর ফলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইবন তুমারত আল-মুসামাদা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে যেসব সৈন্য সংগ্রহ করেন, সকলে তার কাছে সমবেত হয়। এরা সকলে মিলে মরক্কোর শাসনকর্তা আলী ইবন ইউসুফ ইবন কাসিমের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেন। ইনি ছিলেন মুলসেমিন্দের বাদশাহ। ফলে আবদুল মুমিন ওয়াহরান, তিলমিসান, ফাস, সিলা এবং সিবতা অঞ্চল অধিকার করে নেন। অতঃপর মরক্কো অবরোধ করে রাখেন দীর্ঘ এগারো মাস এবং ৫৪২ হিজরী সনে তা অধিকার করে নেন এবং সেখানে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সময়টা ছিল তার জন্য অনুকূল। ইনি ছিলেন বুদ্ধিমান, মর্যাদাবান, সুদর্শন এবং কল্যাণকামী। এ বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ৩৩ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এ ক্ষেত্রে তারীখুল কামিল এবং তারীখে আবুল ফিদা গ্রন্থে কয়েক মাস যোগ করা হয়েছে)। তিনি নিজেকে আমীরুল মুমিনীন বলে দাবি করতেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

তালহা ইবন আলী ইবন তারাদ আবু আহমদ যায়নাবী ইনি ছিলেন নকীবদের নকীব। অকসাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করলে তদীয় পুত্র আবু হাসান আলী নকীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন নাবালক। ফলে তাকে পদচ্যুত করা হয় এবং তার থেকে দায়িত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল করীম ইবন ইব্রাহীম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল আম্বারী নামে পরিচিত। ইনি ছিলেন বাগদাদের কাতীবুল ইনশা বা মহাসচিব। ইনি ছিলেন সুদর্শন শায়খ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। ইনশা বা রচনা শাস্ত্রে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সানজার ইত্যাদি অঞ্চলে তাকে দূত করে প্রেরণ করা হয়। তিনি বাদশাহ এবং খলীফাদের সেবা করেন। তিনি প্রায় ৯০ বছর আয়ু লাভ করেন। দুনিয়া এবং দুনিয়ার জৌলুসকে যারা ভালবাসে তাদের সম্পর্কে তার কয়েকটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

يا من هجرت ولا تبالى * هل ترجع دولة الوصال

هل اطمع يا عذاب قلبى * ان ينعم فى هواك بالى

ما ضرك ان تعللبنى * فى الوصل بموعد المحال

اهواك وانت حظ غيرى * يا قاتلتى فما احتيالى

ايام عنائى قبل سود * ما اشبههن بالليالى

العذل فيك يعذلونى * عن حبك ما لهم وما لى

يا ملزمنى السلو عنها * الصب انا وانت سالى

والقول بتركها صواب * ما احسنه لو استوى لى

طلقت تجلدى ثلاثا * والصبوة بعد فى خيالى

“হে সে ব্যক্তি, যে বিচ্ছেদ বরণ করে নিয়েছে এবং কোনো পরোয়া করেনি। শোন, মিলনের স্বাদ কি ফিরে আসবে?

হে আমার মনের আযাব, আমি কি আশা করব? তোমার প্রেমের ক্ষেত্রে আমার মনের প্রতি দয়া হবে।

তোমার কী ক্ষতি হবে, তুমি মিলন সম্পর্কে আমাকে অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবোধ দিচ্ছ!

তোমার ভালোবাসা এবং তুমি নিজে আমি ছাড়া কি অন্য কারো অংশ। হে আমার হত্যাকারী, আমি কি উদায় অবলম্বন করব?

আমার দুঃখের দিন তো পূর্ব থেকেই কৃষ্ণ, তা ছিল রাতের মত অন্ধকার।

তিরস্কারকারীরা তোমার ভালবাসার কারণে আমাকে তিরষ্কার করে, তারা কি পাবে আর আমি কি পাব?

হে সে ব্যক্তি, যে আমাকে ভুলে যেতে বাধ্য করে, আমি হলাম প্রেমিক আর তুমি হলে বিস্মৃতির স্বীকার।

তাকে ত্যাগ করার কথা সঠিক, তা কতই চমৎকার, যদি আমার উপযুক্ত হত!

আমি তালাক দিয়েছি আমার ধৈর্যকে, তিন তালাক, আর আগ্রহ আমার ধারণা বহুদূর।”

হিজরী ৫৫৯ সনের ঘটনাবলী

এই বৎসর শাহ ওয়ার ইবন মুজীর উদ্দীন ইবন আযী শুজাসাদী যিনি আমীরুল জয়ুশ নামে পরিচিত ছিলেন– তিনি আগমন করেন। এ সময় তিনি ছিলেন রুযবেক বংশের পর মিশরীয় অঞ্চলের উযীর। কারণ, নাসের রুযবেক ইবন তালায়ে'কে হত্যা করেন এবং তারপর তিনি নিজে উযীর হন এবং সেখানে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। যিরগায ইবন সাওয়ার নামক জনৈক আমীর তার ওপর হামলা চালায় এবং বহু সৈন্য সমাবেশ করে তার ওপর বিজয় লাভ করে। সে তার দুইপুত্র তাইয়্যেব এবং সুলায়মানকে হত্যা করে এবং তৃতীয় পুত্র আল কামিল ইবন শাহওয়ারকে বন্দী করে রাখে। কিন্তু হত্যা করেনি। কারণ, তার পিতা তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন। সে যিরগামকে মনসুর উপাধি দিয়ে উজীর নিযুক্ত করে। তখন শাহওয়ার মিশরীয় অঞ্চল এবং আল আজীদ এবং বিরগামের ভয়ে পলায়ন করে নুরুদ্দীন মাহমুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সময় তিনি আল আখযার প্রান্তরের প্রাসাদে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে তিনি তার উপযুক্ত আতিথেয়তা করেন এবং তাকে উপরোক্ত মহলে বসবাস করতে দেন। আর শাহওয়ার তার কাছে সেনা সাহায্য কামনা করেন, যাতে তিনি মিশরীয় অঞ্চল জয় করতে পারেন। এবং নুরুদ্দীন যাতে তার রসদের এক তৃতীয়াংশ[১] লাভ করতে পারে। তিনি আসাদ উদ্দীন শেরকু

১. ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর তার ইতিহাস গ্রন্থে শাহওয়ার এবং নুরুদ্দীন এর মধ্যে চুক্তির শর্তাবলীর কথা উল্লেখ করেন। তাতে বলা হয়, সৈন্য-সামন্তের ব্যয় নির্বাহের পর দেশের উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ নুরুদ্দীন লাভ করবে আর শেরফোব তার সৈন্যদেরকে নিয়ে মিশরে অবস্থান করবেন এবং নুরুদ্দীনের বিষয়টি শাহওয়ারের অধিকারে থাকবে। (১১/২৯৮, ইবনে খালদুন ৫/২৪৬)।

ইবন সাদীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা মিশরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করে। আসাদউদ্দীন তাদেরকে পরাজিত করে অনেককে হত্যা করে। এতে যিরগাম ইবনে সাওয়ার ও নিহত হয় এবং তার কাটা মাথা শহরে শহরে প্রদর্শন করা হয়। আর শাওয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং তার অবস্থা সুসংহত হয়। আর আজিদ ও শাওয়ার আসাদউদ্দীনের সাথে সন্ধি করে এবং নুরুদ্দীনের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল তা থেকে ফিরে আসে। আর আসাদউদ্দীনকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এ নির্দেশ সে মেনে নেয়নি এবং নগরীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং অনেক অর্থ সম্পদ হস্তগত করে। আর পূর্বাঞ্চলের অনেক জনপদ জয় করে নেয়। তখন শাওয়ার তাদের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গী বাদশাহদের নিকট সাহায্য কামনা করেন, যারা আসফালান অঞ্চলে অবস্থান করছিল। এ বাদশাহর নাম ছিল মেরী। বাদশাহ বিপুল লোক নিয়ে এগিয়ে আসে, আর আসাদউদ্দীন বিলবিস অঞ্চলের দিকে গমন করে। তিনি বিলবিসকে সুদৃঢ় করেন এবং অস্ত্র শস্ত্রে শক্তিশালী করে তোলেন। তারা অঞ্চলটি আট মাস অবরোধ করে রাখে। (এক্ষেত্রে তারিখুল কামীল এবং কিতাবুল ইবার এ তিন মাস উল্লেখ আছে– দ্রষ্টব্য তারীখ আবুল ফিদা আর আসাদউদ্দীন এবং তার সঙ্গীরা চরম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ সময় সংবাদ আসে যে, বাদশাহ নুরুদ্দীন ফিরিঙ্গীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করে বিপুল জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে এবং হারেম অঞ্চল অধিকার করে সেখানেও অনেক ফিরিঙ্গীকে হত্যা করে। সেখান থেকে আন ইয়াস অঞ্চলে গমন করে। সেখানে আসকালানের ফিরিঙ্গী শাসক দুর্বলতা প্রদর্শন করে এবং আসাদউদ্দীনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের দাবি করলে তিনি তা মেনে নেন। আর শাহওয়ারের নিকট থেকে ৬০ হাজার দীনার গ্রহণ করেন। এরপর আসাদউদ্দীন এবং তার সৈন্যরা জ্বিলহজ মাসে সিরিয়া অভিমুখে গমন করে।

হারেম যুদ্ধ

এ বছর রমজান মাসে হারেস বিজিত হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, নুরুদ্দীন মুসলিম সৈন্যদের নিকট সাহায্য কামনা করলে তারা চতুর্দিক থেকে ছুটে ছুটে আসে ফিরিঙ্গীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য। তিনি হারেম অঞ্চলের ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং ইনতাকিয়ার শাসনকর্তা আল-বারাস এবং মায়মান্দকে আটক করেন। এছাড়াও ত্রিপোলীর শাসনকর্তা আল-কুমাস, রোম অধিপতি ওয়ালদুক এবং জশলিম, ভিন্ন মতে জুসলিক, ইবনে খালদুনের মতে জুসকিন কে বন্দী করে এবং তাদের ১০ লাখ, ভিন্নমতে ২০ লাখ লোককে হত্যা করে। এ বছর জ্বিলহজ্ব মাসে নুরুদ্দীন বানয়াস শহর দখল করেন। কারো কারো মতে তিনি ৫৬০ হিজরী সনে এ শহর অধিকার করেন। আল্লাহই ভাল জানেন। তার সঙ্গে ছিলেন তার ভাই নসরুদ্দীন[১]আমির আমিরান এ সময় তার এক চোখে তীর বিদ্ধ হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। তখন বাদশাহ নুরুদ্দীন তাকে বলেন, তুমি যদি জানতে আল্লাহ পরকালে তোমার জন্য কি প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাহলে তুমি পছন্দ করতে যে, অপর চক্ষুটিও নষ্ট হয়ে যাক। তিনি ইবন মুইনউদ্দীনকে বলেন, আজকের দিনে তুমি তোমার পিতার চামড়াকে জাহান্নামের আগুণ থেকে ঠাণ্ডা করে দিলে। কারণ, তিনি নিজেকে ফিরিঙ্গীদের

---

১. আল কামিল ১১/৩০৪ ঃ নুসরত, ইবন খালদুন ৫/২৪৭ নাসরিউদ্দীন।

দমনের জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং দামেশক শহর সম্পর্কে তিনি ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এ বছর জ্বিলহাজ্ব মাসে জিরুন প্রাসাদ অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। সেই রাতে অনেক আমীর উপস্থিত হন, তাদের মধ্যে আসাদউদ্দীন শেরকোও ছিল। তিনি মিশর থেকে ফিরে আসার পর সেখানে উপস্থিত হন এবং অগ্নি নির্বাপণে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। আর মসজিদের এলাকা আগুনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন।

এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

জামাল উদ্দিন

ইনি ছিলেন মুসেল অঞ্চলের শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিন মওদূদ ইবনে জঙ্গীর উজীর। ইনি ছিলেন অনেক নেককার ব্যক্তি তার আসল নাম ছিল মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবু মনসুর আবূ জাফর আল ইসবাহানী। তার নবাব ছিল জামালউদ্দিন। তিনি বিপুল দান সদকা করতেন। মক্কা এবং মদীনার তিনি অনেক নিদর্শন রেখে গেছেন। তার এসব নিদর্শনের মধ্যে আছে তিনি আরাফাত পর্যন্ত কূপ স্থাপন করেন এবং সেখানে অনেক বাড়ি-ঘর নির্মাণ করেন। মসজিদুল খায়েফ এবং তার সিঁড়ি নির্মাণ করেন এবং মর্মর পাথর দ্বারা সে মসজিদকে শোভিত করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় বেষ্টনী নির্মাণ করেন এবং দাজলা নদীর উপর জাজীরা ইবনে উমরের নিকট মসৃন পাথর এবং লোহা ও কাঁচ দ্বারা সেতু নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি অনেক আশ্রম নির্মাণ করেন। তিনি প্রতিদিন বাড়ির দরজায় এক হাজার দিনার দান করতেন এবং প্রতি বছর কয়েদীদেরকে দশ হাজার দিনার দান করতেন। তার দান-সদকা ফকির এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছত বাগদাদসহ যেকোনো শহরেই অবস্থান করুক না কেন। আটান্ন বৎসর বয়সে তাকে বন্দী করা হয়। ইবনুস সায়ী তার ইতিহাস গ্রন্থে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি তার সঙ্গে কারাগারে ছিল। তিনি বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে এক সাদা পাখি তার কাছে আগমন করে। পাখিটি তার কাছে ছিল। এ সময় তিনি যিকিরে মশগুল ছিলেন। এমতাবস্থায় এই বছর শাবান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পর পাখিটি তার কাছ থেকে উড়ে চলে যায়। মুসেল শহরে তিনি নিজের জন্য যে আশ্রম নির্মাণ করেন; সেখানে তাকে দাফন করা হয়। তার এবং আসাদউদ্দিন ইবনে শেরকোর মধ্যে একটা সৌহার্দ্য চুক্তি ছিল যে, দুই জনের মধ্যে যে আগে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে অপর জন মদীনা মুনাত্তয়ারা নিয়ে যাবে। চুক্তি অনুযায়ী তাকে মুসেল থেকে কাঁধে করে মদীনা শরীফ নিয়ে যাওয়া হয়। যে শহরেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে সকলে তার জন্য দু'আ করেন। তাঁর জানাজার নামায পড়েন এবং মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন এবং তার নেক আমল শুমার করা হয়। মুসিল, তিকরিত, বাগদাদ, কুফা, ওয়াফিদ এবং মক্কা মুকাররামায় তার জানাজার নামায পড়া হয় এবং তার লাশ নিয়ে কাবার চারিদিক প্রদীক্ষণ করা হয়। অতঃপর তার লাশ মদীনা মুনাত্তয়ারায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে নির্মিত আশ্রমে তাকে দাফন করা হয়। ইবনুল জাওযীল এবং ইবনুল সায়ী বলেন, তার এবং নবীর (স.)-এর রওজার মাঝখানে পনের গজের বেশি ব্যবধান ছিল না। ইবনুস সায়ী বলেন, হোল্লা নগরীতে যখন তার জানাজার নামায পড়া হয়, তখন জৈনক যুবক দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে,

سری نعشه علی الرقاب وطالما * سری جوده فوق الرکاب ونائله
یمر علی الوادی فتثنی رماله * علیه وبالنادی فتثنی أرامله

"তার কফিন মানুষের কাঁধে বহন করা হয়, আর বহুকাল ধরে তার দান বাহন করা হয়েছে কি সাওয়ারীর উপর? ময়দান অতিক্রমকালে তার ধূলিকণা প্রশংসায় রত থাকে তার জন্য। তার সমাবেশে বিধবা নারীরা তার জন্য প্রশংসা করে।"

ইবনুল খাযীম আল কাতীব : আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আল ফজল ইবনে আব্দুল খালেক আবুল ফজল, ইনি আল ইবনুল খাযীম আল কাতীব আল বাগদাদী নামে পরিচিত। ইনি কবিও ছিলেন। ইনি খুব চমৎকার লিখতেন এবং বিভিন্ন খতম লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতেন। তার সন্তান নাসরুল্লাহ 'মাকামাত' লিখে বিপুল পরিমান অর্থ উপার্জন করেন। তিনি সন্তানের জন্য একটা কবিতা সংকলন প্রস্তুত করেন, ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান তার কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন।

হিজরী ৫৬০ সনের ঘটনাবলী

এ বছর সফর মাসে ইসবাহান শহরে মাযহাবকে কেন্দ্র করে ফকীহদের মধ্যে বিরাট ফিতনার উদ্ভব হয়। এই ফিতনা বেশ কিছু দিন চলতে থাকে এবং বিপুল সংখ্যক লোক এতে নিহত হয়। আর এ বছর বাগদাদ নগরীতে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যাতে অনেক বাড়ি-ঘর ও লোকালয় ভস্মীভূত হয়। ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন যে, এ বছর বাগদাদে এক নারী একই সাথে চারজন সন্তান প্রশ্রব করে। এ বছর আমীর বর্গশ কাবীর লোকজনকে নিয়ে হজে গমন করেন।

উমর ইবনে বালহীকা : ইনি চাকতী পেশার কাজ করতেন। এই ব্যক্তি বাগদাদের আল আকীবা জামে মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদে জুমার নামায আদায় করার জন্য খলীফার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা তাকে অনুমতি দেন। আশপাশের কবরগুলো খরিদ করে তিনি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং কবর খনন করে লাশগুলো অন্যত্র স্থাপন করেন। দাফন করার পর তার লাশ কবর থেকে উত্তোলনের জন্য আল্লাহ সুযোগ দেন। এ এক চমৎকার প্রতিদান।

মোহাম্মদ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল হামীদ আবু আব্দুল্লাহ হাররানী, ইনি ছিলেন আবুল হাসান দামিগানী এর নিকট গ্রহণযোগ্য সাক্ষীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। ইনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইনি ছিলেন বেশ হাস্য রসিক ব্যক্তি। ইনি একটা গ্রন্থ সংকলন করে এর নামকরণ করেন, "রওজাতুল উদাবা"। এই গ্রন্থে বেশ মূল্যবান বিষয় স্থান পেয়েছে। ইবনুল জাওযী বলেন, "আমি একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই এবং সেখানে বেশ কিছু সময় অবস্থান করি। অবশেষে বললাম, এবার উঠি, বেশ ভারি হয়ে গেছি। তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন,

لئن سئمت إبراما وثقلا * زيارات رفعت بهن قدری
فما أبرمت إلا حبل ودی * ولا ثقلت إلا ظهر شکری

"অবসাদ আর ভারি হওয়ার কারণে আমি যদি বিতৃষ্ণ হই, তবে

শাখা দ্বারা আমার মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি দৃঢ় করেছি ভালবাসার রজ্জু, আর আমার কৃতজ্ঞতার পিঠে কেবল ভারি হয়েছে।

মারদান আল খাদিম : তিনি ভাল ক্বেরাত পড়তে পারতেন এবং শাফেঈ মাযহাবে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদেরকে বাঁকা চোখে দেখতেন এবং অপছন্দ করতেন। উজীর ইবনে হুবাইরা এবং ইবনে জাওযীর সঙ্গে তিনি ভীষণ শত্রুতা পোষণ করতেন এবং ইবনে জাওযীকে তিনি বলতেন, তোমাদের মাযহাবকে উৎখাত করাই আমার উদ্দেশ্য, আর তোমাদের যিকির খতম করাই আমার কাজ। এ বছর ইবনে হুবায়রা মৃত্যুবরণ করলে তিনি ইবনুল জাওযীর উপর শক্তি অর্জন করেন এবং ইবনুল জাওযী তাকে ভয় পান। কিন্তু এ বছর তিনি মৃত্যুবরণ করলে ইবনুল জাওযী বেশ খুশি হন। একই বছর যিলক্বদ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবনুল তিলমিযী : ইনি ছিলেন দক্ষ তবীব বা বিচক্ষণ চিকিৎসক। তার আসল নাম ছিল হেবাতুল্লাহ ইবনে ছায়েদ। পঁচানব্বই বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। দুনিয়ার জীবনে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দে কাটান। মানুষের নিকট তার ছিল বিরাট সম্মান ও মর্যাদা। তিনি স্বীয় বিশ্বাস আর ঈমান অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন। পুরাতন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি খ্রিস্টান হিসাবে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ তার ভাগ্যে জুটবে না। তবে তিনি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলেও নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেই মৃত্যুবরণ করেন।

উজীর ইবনে হুবায়রা : তার নাম ছিল ইয়াহইয়া ইবনে মোহাম্মদ হুবায়রা আবুল মুজাফ্ফর আওনউদ্দিন, খিলাফাতের উজীর, আল ইফছাহ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কুরআন মজীদের পাঠ শিক্ষা করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন। আরবি ভাষা ব্যাকরণ এবং ছন্দ বিদ্যায় তার প্রচুর জ্ঞান ছিল। ইমাম আহমদ (র)-এর মাযহাবে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি চমৎকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে 'আল ইফছাহ' বেশ কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা করেন এবং আলিমদের মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বিশ্বাসের দিক থেকে ছলফের মাযহাব অনুসরণ করে চলতেন। তিনি ছিলেন নিতান্ত নিঃস্ব। সহায় সম্পদ বলতে কিছু ছিল না। এরপর তিনি খিদমতের জন্য নিজেকে পেশ করেন অবশেষে খলীফা আল মুকতাফী এবং তার পুত্র আল মুসতানজীদ তাকে উজীর নিযুক্ত করেন। জীবন চরিত আর স্বভাব আচরণের বিচারে তিনি ছিলেন উত্তম উজীরদের অন্যতম। তিনি রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন না। তার সম্পর্কে খলীফা আল মুকতাফী বলতেন, আব্বাসী বংশে তার মত কোনো উজীর ছিল না। একই মন্তব্য করেন তদ্বীয় পুত্র খলীফা মুসতানজীদ। তার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। মারযান আল খাদীম বলেন, আমি আমীরুল মুমেনীন আল মুসতানজীদকে ইবনে হুবায়রার উদ্দেশ্যে নিচের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। এ সময় তিনি খলীফার সামনে উপস্থিত ছিলেন,

صفت نعمتان خصتاك وعمتا * فذكرهما حتى القيامة يذكر

وجودك والدنيا إليك فقيرة * وجودك والمعروف فى الناس ينكر

فلو رام يا يحيى مكانك جعفر * ويحيى لكفا عنه يحيى وجعفر
ولم أر من ينوى لك السوء يا أبا * المظفر إلا كنت أنت المظفر

"তোমার জন্য আছে দুটি নিয়ামত খাছ এবং আম। এ দুটি নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। কিয়ামত পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করা হবে।

তোমার অস্তিত্ব, জগৎ তার মুখাপেক্ষী তোমার অস্তিত্ব জনগণের মধ্যে অস্বীকার করা হবে।

হে ইয়াহইয়া! যদি জাফর এবং ইয়াইয়াহ তোমার স্থান লাভ করতে চায়, তবে ইয়াহইয়া এবং জাফর তাকে বাঁধা প্রদান করবে।

আর হে আবুল মুজাফ্ফর! যে ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করতে দেখেছি, তবে তুমি ছিলে সফল।

আব্বাসীয়া সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এবং সালউরী বাদশাহদের দাপট রোধে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। অবশেষে গোটা ইরাকে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের সঙ্গে অন্য শাসকদের কোনো কর্তৃত্ব আদৌ চলতো না। এ জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। তিনি তার বাসগৃহে আলেমদের জন্য বির্তকের আসর আয়োজন করতেন। ফলে আলোচনা করতো, তার সামনে বির্তকে অংশ নিত। তাদের আলোচনা দ্বারা তিনি উপকৃত হতেন এবং তার আলোচনা দ্বারা উপস্থিত সকলে উপকৃত হতো। একদিন এক মজার কাণ্ড ঘটে। জনৈক ফকীহ কথা বলেন, "তাতে কিছু খারাপ বক্তব্য ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে গাধা। অতঃপর নিজে লজ্জিত হলেন এবং বললেন, আমি চাই আমি আপনাকে যেমন কথা বলেছি, তেমন কথা আপনি আমাকে বলেন। কিন্তু লোকটি বিরত থাকল। অতঃপর দুইশ দিনারে আপোষ রফা হল কিন্তু লোকটি হঠাৎ মারা গেল। কথিত আছে যে, চিকিৎসক তাকে বিষ প্রয়োগ করে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়। আর ছয় মাস পর সেই চিকিৎসককেও বিষ প্রয়োগ করা হয়। আর চিকিৎসক বলতেন, আমি তাকে বিষ প্রয়োগ করেছি, ফলে আমিও বিষ প্রয়োগের শিকার হই। এ বছর জুমাদাল উলার বারো তারিখ রোববার[১] তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৬১ বছর।[২] ইবনুল জাওযী তাকে গোসল করান। তার জানাযায় বিপুল মানুষ ভীড় জমায়। হাট-বাজার বন্ধ থাকে। লোকজন তার জন্য মাতম করে। বসরার দ্বার প্রান্তে তার নির্মিত মাদরাসা প্রাঙ্গনে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। অনেক কবি তার মৃত্যুতে শোক গাঁথা রচনা করেন।

হিজরী ৫৬১ সনের ঘটনাবলী

এ বছর নুরুদ্দীন মাহমুদ সিরিয়ার আল মানিতারা দুর্গ জয় করেন। এবং সেখানে বিপুল সংখ্যক ফিরিঙ্গীকে হত্যা করে এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ গণীমত হিসেবে লাভ করেন। এ বছর

---

১. ঐতিহাসিক আল ফকরীহ বলেন, জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার প্রচুর বল্লম দেখা দেয়। একদিন সেজদারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয় (পৃষ্ঠা- ৩১৫)। ঐতিহাসিকজ ইবনুল আসির তার ইতিহাস গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি। তার মতে, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

২. ইবন খাল্লিকান (৬/২৪২) বলেন, ৪৯৭ হিজরীতে তার জন্ম। আর ইবনুল আসীর এর মতে (১১/৩২১) তার জন্ম ৪৯০ হিজরীতে। ইবন খাল্লাকানের বর্ণনা মতে তার বয়স হয় ৬৩ বছরের কিছু বেশি।

উজীর ইবন হুবায়রার পুত্র ইযউদ্দিন কারাগার থেকে পলায়ন করেন, তার সঙ্গে অনেক তুর্কী দাসও ছিল। শহরে ঘোষণা জারি করা হয় যে, তাকে ধরে দিতে পারলে ১০০ দিনার পুরস্কার দেওয়া হবে এবং যার কাছে তাকে পাওয়া যাবে, তার ঘর ধুলিসাৎ করা হবে এবং ঘরের দরজায় তাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে এবং তার সামনে তার সন্তানদেরকে জবাই করা হবে। জনৈক বেদুইন তার সম্পর্কে খবর দেয়। ফলে তাকে বাগান থেকে পাঁকড়াও করে আনা হয় এবং প্রচণ্ড মারপিট করে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং তার জীবন সংকীর্ণ করে তোলা হয়। এ বছর রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে গালমন্দ দেওয়া শুরু করে এবং অনেক খারাপ কথা প্রচার করে। ইতিপূর্বে ইবন হুবায়রার ভয়ে তারা এই ধরনের কাজ করার সাহস পেত না। এ সময় খালকে কুরআন বিষয়ে জনগণের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। এ বছর বরগশ লোকজনকে নিয়ে হজ্বে গমন করেন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করে তাদের অন্যতম হলেন,

আল হাসান ইবনুল আব্বাস : ইবন আবু তাইয়্যেব ইবন রুস্তম আবু আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী। ইনি ছিলেন সে সব নেক ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করত। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন আমি তার ডাকা মজলিসে উপস্থিত হই, তিনি তখন জনগণের সামনে কথা বলছিলেন। সেই রাতে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি একজন বিদয়াতীর সামনে উপস্থিত হলে এবং তার কথা শুনলে? দুনিয়াতে সে ব্যক্তি তোমার নিকট দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য! সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকটি কিছু দেখতে পায় না, অথচ তার দুটি চোখই খোলা, যেন সে তাকিয়ে আছে।

আবদুল আজীজ ইবনুল হাসান : ইবনুল হুবাব আল আগলায়ী আল সাদী আল কাজী আবুল মাআলী আল বসরী। ইনি ইবনুল জালীস নামে পরিচিত ছিলেন। কারণ, তিনি মিশর শাসনকর্তার দরবারে বসতেন। আল ইমাদ 'আল খারীদা' গ্রন্থে তার সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক কথা প্রচলিত আছে এবং তার অনেক স্বীকৃত কবিতা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

ومن عجب أن السيوف لديهم * تحيض دماء والسيوف ذكور

وأعجب من ذا أنها في أكفهم * تأجج نارا والأكف بحور

"বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাদের সেখানে তরবারীর রক্তশ্রাব হয়, অথচ তরবারীতো নারী নয়।

তার চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তাদের হাতের তালুতে আগুন উৎপন্ন হয়, অথচ হাতের তালুতো সমুদ্র!"

শায়খ আব্দুল কাদের আল জিলানী : ইবন আবু সালেহ আবু মোহাম্মদ আল জিলী[১] হিজরী ৪৭০ সালে তার জন্ম। বাগদাদে প্রবেশ করে তিনি হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন এবং আবু সাঈদ

---

১. ভিন্নমতে, জিলানী। 'জিলী' শব্দের প্রতি নিসবত, তবরিজস্থানের একটি অঞ্চলের নাম। এ অঞ্চলকে 'জিলান' বা 'গিলান' ও বলা হয়।

আল মাখরামী-এর নিকট ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তা শায়খ আবদুল কাদের-এর হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি তথায় লোক জনের সঙ্গে কথা বলতেন, ওয়ায করতেন এবং লোকজন এর দ্বারা বিপুল ভাবে উপকৃত হত। তিনি সদগুণের অধিকারী ছিলেন। ভাল কথা বলা এবং খারাপ কাজে নিষেধ করা ছাড়া তিনি চুপ থাকতেন। তার মধ্যে দুনিয়া ত্যাগের মাত্রা ছিল বেশি। সৎ স্বভাবের অধিকারী এই ব্যক্তির অনেক কাশফের কথা প্রচারিত আছে। তার অনুসারী এবং সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কেও অনেক কথা আছে। ভক্তরা তার সম্পর্কে অনেক কথা বলে, যার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৎ এবং সাধু ছিলেন। তিনি কিতাবুল গুনইয়াহ এবং ফতুহুল গায়ব গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয়ে অনেক ভাল কথা আছে। তবে এতে অনেক যঈফ ও মওজু হাদীস আছে। মোটকথা তিনি ছিলেন শায়খদের সর্দার। নব্বই বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার আঙ্গিনায় তাকে দাফন করা হয়।

হিজরী ৫৬২ সনের ঘটনাবলী

এ বছর ফিরিঙ্গীরা বিপুল সংখ্যক সৈন্য 'দিআরে মিশর' অঞ্চলে আগমন করে এবং তথাকার অধিবাসীরা তাদেরকে সহায়তা করে। ফলে তারা কোনো কোনো জনপদ অধিকার করে। আসাদ উদ্দীন শেরকো এ সম্পর্কে জানতে পেরে বাদশাহ নুরুদ্দীনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন এতদঅঞ্চলে ফিরে যাওয়ার জন্য। উজীর শাওয়ারের উপর তিনি দারুন খ্যাপা ছিলেন। বাদশাহ নুরুদ্দীন তাকে অনুমতি দেন, ফলে 'রবিউল আখের মাসে তিনি রওয়ানা হন। সঙ্গে ছিল ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব। জনমনে ধারণা জাগে যে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি দিআরে মিশর অঞ্চল অধিকার করে নেবেন। এ সম্পর্কে কবি আল কালা, যিনি হিসান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন,

اقول والأتراك قد أزمعت * مصر إلى حرب الأعاريب
رب كما ملكها يوسف الصـ * ديق من أولا يعقوب
فملكها فى عصرنا يوسف الصـ * ادق من أولاد أيوب
من لم يزل ضراب هام العدا * حقا وضراب العراقيب

"আমি বলি তুর্কীরা মিশর গিয়ে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প করেছে।

প্রভু, যেমন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ)-কে সে দেশ অধিকার করেছিলেন, আমাদের যুগে সত্যবাদী ইউসুফ, যিনি হযরত আইয়ুব (আ)-এর সন্তান। তিনি তা অধিকার করেছেন।

যিনি সর্বদা আঘাত হানেন দুশমনের মাথার উপর এবং আঘাত হানেন দুশমনের পায়ের ওপর, কঠোর আঘাত।"

উজীর শাওয়ার যখন আসাদউদ্দীন এবং তার সঙ্গে সৈন্যদের আগমন সম্পর্কে জানত পারেন, তখন তিনি ফিরিঙ্গীদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তা পেয়ে তারা চতুর্দিক থেকে তার নিকট ছুটে আসে। আসাদুদ্দীনও এ সম্পর্কে জানতে পারেন। এ সময় তার কাছে ছিল মাত্র

দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। তিনি সঙ্গী ও অমাত্য বর্গের নিকট পরামর্শ চান। সকলেই নুরুদ্দীনের নিকট ফিলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কারণ, ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা ছিল বেশি। শরফুদ্দীন বরগস নামে পরিচিত একজন আমীর ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি নিহত বা বন্দী হওয়াকে ভয় করে সে যেন নিজ গৃহে স্ত্রী-সন্তানদেরকে নিয়ে অবস্থান করে। আর যারা জনগণের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা নিজেদের দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। তার ভ্রাতৃষ্পুত্র সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবন আইয়ুবও অনুরূপ কথা বলেন। আল্লাহ তাদেরকে হিম্মত দান করেন, তারা ফিরিঙ্গীদের প্রতি ছুটে যান এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। আর বিপুল সংখ্যক ফিরিঙ্গীকে হত্যা করে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের অনেককে হত্যা করেন, যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য।

আসাদুদ্দীন শেরকোর হাতে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় : এরপর আসাদুদ্দীন আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে রওয়ানা করার নির্দেশ দেন। তারা আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে সেখানকার সম্পদ এক জায়গায় জমা করে এবং সেখানে ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীন ইউসুফকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে ছাঈদ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে তা অধিকার করে নেন। এখানেও বিপুল মালে গণীমত সংগ্রহ করেন। অতঃপর ফিরিঙ্গী এবং মিশরীয়রা আলেকজান্দ্রিয়া দুর্গে সমবেত হয়ে সালাহউদ্দীনের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য দীর্ঘ তিনমাস চেষ্টা চালায়। এ সময় ছাঈফ অঞ্চলে তার চাচা উপস্থিত ছিলেন না। সালাহউদ্দীন বীর বিক্রমে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তাদের অবস্থা এবং রসদ সম্ভার খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন আসাদউদ্দীন তাদের নিকট গমন করে উজীর শাওয়ারের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যাপারে ৫০ হাজার দিনারের সমঝোতা করে। তারা এই সমঝোতা চুক্তি মেনে নেয়। আলেকজান্দ্রিয়া মিশরীয়দের হাতে অর্পণ করে সালাহউদ্দীন সেখান থেকে ফিরে আসেন। একই বছর শাওয়াল মাসের মধ্যভাগে তিনি শাম দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শাওয়ার ফিরিঙ্গীদের জন্য মিশরের ওপর বছরে এক লক্ষ দিনার অর্থ নির্ধারণ করেন। আরও সাব্যস্ত হয় যে, কায়রো নগরীতে তাদের কোতোওয়াল থাকবে। এরপর তারা স্বদেশ ভূমিতে ফিরে আসে। ইতিপূর্বে বাদশাহ নুরুদ্দিন স্বদেশ ভূমিতে পেছন থেকে তাদেরকে তাড়া করে এবং অনেক দুর্গ অধিকার করে নেন। এছাড়াও অনেক পুরুষকে হত্যা করে, বিপুল সংখ্যক নারী এবং শিশুকে বন্দী করে, অনেক মাল-সামানা গণীমত হিসেবে হস্তগত করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। তার সঙ্গে ছিলেন ভাই কুতুবউদ্দীন মওদুদ। তিনি তাকে রিক্কা অঞ্চল দান করেন এবং তিনি সেখানে গিয়ে সে অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ বছর শাবান মাসে ইমাদ আল কাতীব বাগদাদ থেকে দামিশ্‌ক-এ আগমন করেন। ইনি হলেন আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ আল ইসবাহানী, আল-ফাতহে আল-কুদসী, আল বারখ আল শামী এবং আল খারীজা ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। কাজী আল কুযাদ কামালউদ্দীন শহরযুরী তাকে বাবউল ফারাজের নুরীয়া শাফিয়া মাদ্রাসায় অবস্থান করান। সেখানে তার অবস্থানের কারণে স্থানটি তার নামে সম্পর্কিত করা হয় এবং তাকে আল উমাদিয়াও বলা হয়। শায়খ ফকীহ ইবন আবদ এরপর এই মাদ্রাসায় দারস-এর দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। হিজরী ৫৬৭ সনে। সর্বপ্রথম সেখানে সালাম দেওয়ার জন্য আগমন করেন নাজমুদ্দীন আইয়ুব। তাকরীত সম্পর্কে তার অনেক জ্ঞান ছিল। আল ইমাদ একটি কাসীদায় তার প্রশংসা

করেন, আবু শামা যা উল্লেখ করেছেন। আর আসাদুদ্দীন এবং সালাউদ্দীন মিশরে ছিলেন। তিনি তাকে দিওয়ারে মিশরের শাসনকর্তা হওয়ার সুসংবাদ দান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

ويستقر بمصر يوسف، وبه * تقر بعد التنائى عين يعقوب
ويلتقي يوسف فيها بإخوته * والله يجمعهم من غير تثريب

"মিশরে ইউসুফ স্থায়ী হন এবং ইয়াকুব থেকে দূরত্বের পর মিশরে তার চক্ষু স্থির হয়।

মিশরেই ইউসুফ তার ভাইদের সঙ্গে মিলিত হন এবং আল্লাহ তাদেরকে একত্র করেন কোনো তিরস্কার ছাড়া।"

অতঃপর ইমাদউদ্দীন বাদশাহ নুরুদ্দীন মাহমুদের সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন,

আমীর আলহাজ্ব বরগশ : ইনি ছিলেন সৈন্যদের অগ্রণায়ক। তিনি শিইমলা তুর্কমানীর সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে বের হন। কিন্তু ঘোড়ার পিঠ থেকে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল মা'আলী আল কাতীব : মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হামদুন তাযকিরাহ আল হামদুনিয়াহ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি দীর্ঘদিন যিইমাম দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেন। জ্বিলকাদ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং কুরাইশদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আল রশিদ আল ছাদাফী : ইনি আল ইবাদীর সামনে কুরসীতে বসতেন। এ শুভ্র শুশ্রুমণ্ডিত এ লোকটি ছিলেন বেশ মর্যাদার অধিকারী। তিনি সবসময় সামার আসরে উপস্থিত থাকতেন এবং নর্তন-কুর্দন করতেন। কোনো এক সামার আসরে নর্তনকালে তার মৃত্যু হয়।

হিজরী ৫৬৩ সনের ঘটনাবলী

এ বছর সফর মাসে শরফুদ্দীন আবু জাফর ইবন বলদী ওয়াসিত থেকে বাগদাদে আগমন করেন। তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য সেনা, নকীব এবং কাজী উপস্থিত হন। লোকজন তার আগে আগে দীওয়ান অভিমুখে পদব্রজে গমন করেন এবং তিনি দপ্তরের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করেন। তার দায়িত্বের শপথ পাঠ করা হয় এবং তাকে উজীর শরফুদ্দীন জালালুল ইসলাম, মুইয়যুদ্দৌলা, সাইয়্যেদুল উযারা, ছদরুশ শারকে ওয়াল গারবে ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ বছর খাফাজা দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং গ্রাম-গঞ্জে লুট-তরাজ চালায়। বাগদাদ থেকে একদল সৈন্য তাদের উদ্দেশ্যে বের হলে তারা জঙ্গলে পলায়ন করে এবং সৈন্যরা পিপাসার আশংকায় সেখান থেকে সরে আসে। এ সময় তারা সৈন্যদের ওপর পেছন থেকে হামলা চালায়। অনেক সৈন্যকে নিহত এবং অনেককে আহত ও বন্দী করে। সৈন্যরাও তাদের অনেককে বন্দী করে এবং পাঁচিলের ওপর শুলিবিদ্ধ করে। এ বছর শাওয়াল মাসে বাদশাহ নুরুদ্দীন মাহমুদ ইবন জঙ্গীর স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে বাগদাদ পৌছে। তিনি ছিলেন আলাস্ত ইসমাতুদ্দীন খাতুন বিনতে মঈনুদ্দীন। তার সঙ্গে অনেক খাদেম মওকর ছিল। তাদের মধ্যে

খাদেম সৈন্যদলও ছিল। তাকে বিপুলভাবে সম্মানিত করা হয়। এ বছর বাগদাদের প্রধান বিচারপতি জাফর মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তেইশ দিন দেশ বিচারক শূন্য ছিল। অবশেষে রজব মাসের ৪ তারিখ রাওহ ইবনুল হাদসানীকে 'কাজীউল কুজাত' বা প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হলেন, জাফর ইবনে আবদুল ওয়াহেদ আবুল বারাকাত আল সাকাফী। পিতার পর তিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। হিজরী ৫২৯ সালে তার জন্ম হয়। তার মৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, তার কাছে অর্থ দাবী করা হয় এবং উজীর ইবনুল বালদী তার সঙ্গে কড়া কথা বলেন। ফলে তিনি ভীত হন এবং রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু হয়।

আবু সাদ সামআলী : 'আবদুল করীম ইবন মোহাম্মদ ইবন মানসুর। তিনি বাগদাদ নগরীতে আগমন করেন এবং সেখানে হাদীস শ্রবণ করেন এবং খতীব বাগদাদী রচিত ইতিহাস গ্রন্থ তারীখে বাগদাদ-এর পরিশিষ্ট রচনা করেন। ইবনুল জাওযী আল মুনতাযযে গ্রন্থে তার সমালোচনা করেন। এই বলে যে, তিনি স্বধর্মের অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। তাদের একদলকে তিনি অভিযুক্ত করেন এবং তিনি সাধারণ ভাষায় তরজমা করেন। যেমন কোনো এক বিশিষ্ট নারী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উক্ত নারী আফিফা বা পুতঃচরিত্রের অধিকারী ছিলেন। হিসবিস নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি সম্পর্কে বলেন যে, তার এক বোন ছিল, যাকে বলা হত দাখালা, খারাজা ইত্যাদি।

আবদুল কাছের ইবন মুহাম্মদ : ইনি হলেন ইবন আবদুল্লাহ আবুন মজীব আল সোহরাওয়ার্দী। বলা হয় যে, তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর বংশধর। তিনি হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন এবং ফিকহে শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং ফতোয়া দানের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় দারস দান করতেন। তিনি নিজের জন্য একটি মাদ্রাসা এবং আশ্রম নির্মাণ করেন। এতদসঙ্গে তিনি ছিলেন তাসাউফে অনুরাগী। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি ওয়াজ নসীহত করতেন। তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার আঙ্গিনায় তাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল হামীদ : ইনি হলেন– ইবন আবুল হোসাইন আবুল ফতেহ আল রাজী। ইনি আল-আলা আল আলেম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমরকন্দের বাসিন্দা। মুনাযারা বা তর্ক শাস্ত্রে তিনি দক্ষ ছিলেন। এই শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যাপারে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তার এ পদ্ধতিকে বলা হত আল তালীকা আল আলামীনা। তার সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি বাগদাদে আগমন করে আমার মজলিসে উপস্থিত হন। আর আবু সাদ সামআলী তার সম্পর্কে বলেন, তিনি সর্বদা মদ পান করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বলতেন, পৃথিবীতে মুনাযারা গ্রন্থের চেয়ে উত্তম এবং 'বাতিয়া মদ' থেকে সুপেয় কোন বস্তু নেই। ইবনুল জাওযী বলেন, তার সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি মদ্যপান এবং মুনাযারা ত্যাগ করে ইবাদাত ও কল্যাণের দিকে ফিরে আসেন।

ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ : ইনি হলেন– ইবন বিন্দার দামেশকী, বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। আসআদ আল মাহিনীর নিকট তিনি ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন এবং মুনাযারা বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। আশারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল। এ বছর তাকে দূত করে সিমলা তুর্কমানী অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়।

হিজরী ৫৬৪ সনের ঘটনাবলী

এ বছর আসাদউদ্দীন শেরকোহর-এর হাতে মিশর জয় হয় এবং দিআরে মিশর অঞ্চল ফিরিঙ্গীরা বিদ্রোহ করে। আর এটা ছিল এ জন্য যে, তারা সেখানে শাওয়ারকে তাদের কোতোয়াল নিয়োগ করে এবং তথাকার সম্পদ আর ভূমি সম্পর্কে যথোচ্ছাচারিতা চালায়। ফলে সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। অধিকাংশ বীর বাহাদুররা সেখানে বসবাস করত। ফিরিঙ্গীরা যখন এ সম্পর্কে জানতে পারে, তখন তারা আকালানের শাসনকর্তার সাথে দলে দলে নানা স্থান থেকে এসে মিলিত হয়। তাদের সঙ্গে ছিল বিশাল বাহিনী। সর্বপ্রথম তারা বিলবিস শহর অধিকার করে নেয় এবং তথাকার বাসিন্দাদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করে। অনেককে বন্দী করে। তারা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। সে স্থানকে নিজেদের আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর বাবউল বাক্কিয়ার পথ ধরে তারা কায়রো নগরীতে এস উপস্থিত হয়। তখন উজীর শাওয়ার জনগণকে নির্দেশ দেন মিশরে আগুন ধরাবার জন্য এবং জনগণকে সেখান থেকে কায়রোতে স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দেন। তখন তারা শহরে লুট-পাট চালায় এবং জনগণের সম্পদ হরণ করে। সেখানে অবশিষ্ট ছিল কেবল আগুন, যা ৫৪ দিন ধরে জ্বলতে থাকে। এ সময় তথাকার শাসনকর্তা আল-আযইদ নুরুদ্দীনের নিকট সাহায্য কামনা করেন এবং তার কাছে নারীদের কেশ প্রেরণ করেন। এই বলে যে, ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে আমাকে এবং আমাদের নারীদেরকে রক্ষা করো। তিনি এই শর্ত মেনে নেন যে, মিশরের রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ তাকে দেওয়া হবে। আরো শর্ত আরোপ করা হয় যে, আসাদুদ্দীন তথায় তাদের কাছে অবস্থান করবেন। তিনি এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত রাজস্ব দেওয়ারও অঙ্গীকার করেন। তখন নুরুদ্দীন মিশরে সৈন্য প্রেরণ করা শুরু করেন। উজীর শাওয়ার যখন মুসলমানদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি এই বলে ফিরিঙ্গী বাদশাহর নিকট পয়গাম পাঠান যে, তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে, তা-তো তুমি জান। কিন্তু আল আযইদ এবং মুসলমানরা শহর তোমাদের হাতে অর্পণ করতে আমার সঙ্গে একমত নয়। তিনি ১ কোটি দিনারের বিনিময়ে তাদের ফিরে যাবার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হন এবং তন্মধ্যে ৮ লাখ দিনার তাৎক্ষণিক পরিশোধ করেন। আর তারা নুরুদ্দীনের সৈন্যদের ভয়ে এবং পুনরায় তাদের ফিরে আসার আশায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্মত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বানী,

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ۔

"তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন, আর আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।" (আলে-ইমরান: ৫৪)

এরপর উজীর সাওয়ার লোকজনের নিকট স্বর্ণ দাবী করেন, যার উপর খ্রিস্টানদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল এবং তা পরিশোধ করতে বলে। এজন্য সে লোকজনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। অথচ তাদের এমনিতেই অনেক কষ্ট হচ্ছিল। সেখানে মুসলিম সৈন্যদের আগমনে এবং তাদের সামনে উজীরের ধ্বংস দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ দূর করেন। আর তা এভাবেই হয় যে, নূরুদ্দিন আমীর আসাদূদ্দিনকে হিমস থেকে হলবে ডেকে পাঠান এবং তিনি একদিনে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তার কাছে আগমন করেন। তিনি ফজরের নামায আদায় করে হিমস থেকে রওয়ানা হন। গৃহে এসে কিছু পথের সম্বল নেন এবং সূর্য উদয়ের সময় রওয়ানা হন এবং দিনের শেষে হারবে সুলতান নূরুদ্দিনের কাছে পৌঁছান। কথিত আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া আর কারো জন্য এমন কাজ সম্ভব হয়নি। এতে নূরুদ্দিন সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন এবং দুই লক্ষ দিনার পুরষ্কার দান করেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাদের সকলে এই সফর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কামনা করেন। সকল আমীরদের মধ্যে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দিন ইবনে আইউবও ছিল। তবে বের হওয়ার ব্যাপরে তিনি তুষ্ট ছিলেন না বরং তিনি এটাকে না পছন্দ করতেন। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, "বল, হে আল্লাহ রাজাধিরাজ..... (আলে ইমরান : ২৬)" আর তিনি এর সঙ্গে ছয় হাজার তুর্কী সৈন্য যোগ করেন এবং এই সমস্ত সৈন্যদের উপর আসাদদূদ্দিনকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আর তিনি তাদের সঙ্গে হারব থেকে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হন। নূরুদ্দিনও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাকে দামেস্ক থেকে দিয়ারে মিসরিয়া অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং নূরুদ্দিন দামেস্কে অবস্থান নেন। আর যখন নূরী সৈন্যরা দিয়ারে মিসরে উপস্থিত হয়, তখন তারা দেখতে পায় যে খ্রিষ্টানরা কায়রো থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। তিনি রবিউল আখির মাসের সাত তারিখ সেখানে পৌঁছেন। একই দিন আমীর আসাদদূদ্দিন আল আযীমের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে মূল্যবান উপঢৌকনে ভূষিত করেন। তিনি সে সব মূল্যবান পোষাক পরিধান করে শহরের বাইরে তার তাবুতে আসেন। তার আগমনে মুসলমানরা আনন্দিত হয় এবং তাদেরকে পারিতোষিক দেওয়া হয় মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রি। আসাদউদ্দিনের খিদমাতের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার তাবু অভিমুখে রওয়ানা হয়। সে সব লোক তাবুর দিকে আগমন করেন তাদের মধ্যে খলীফা আল আযিদও ছিলেন। তবে তিনি বেশ-ভূষা বদল করে আসেন। তিনি তাকে গোপনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন, যার মধ্যে উজীর সাওয়ানের হত্যার কথাও ছিল। তিনি তার সঙ্গে বিষয়টা চূড়ান্ত করেন এবং আমীর আসাদ উদ্দিনের বিষয়টাকে বড় করে দেখেন। কিন্তু তিনি নূরুদ্দিনের জন্য যা কিছু সাব্যস্ত করেছিলেন সে বিষয়ে টাল বাহানা করতে থাকেন। এতদসত্ত্বেও তিনি আসাদ উদ্দিনের নিকট যাতায়াত করতেন এবং তার সঙ্গে একই বাহনে আরোহন করতেন। তিনি তার মেহমানদারির সংকল্প করেন, তখন তার সঙ্গীরা তার বিপদ হতে পারে এই আশংকায় তাকে উপস্থিত হতে বারণ করে। তারা সাওয়ানকে হত্যা করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। কিন্তু আমীর আসাদ উদ্দিন তাকে সেই সুযোগ দেননি। একদিন সাওয়ার আসাদউদ্দিনের গৃহে আগমন করেন। তিনি দেখতে পান যে, আসাদউদ্দিন ইমাম আফেঈর কবর যিয়ারতের জন্য চলে গেছেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসুফ সেখানে আছেন। তখন সালাহউদ্দিন ইউসুফ উজীর সাওয়ানকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। তিনি চাচা আসাদ উদ্দিনের পরামর্শের

পর তাকে হত্যা করতে সমর্থ হন এবং তার সঙ্গীরা পরাজিত হন। তারা আল আসীদকে জানান যে, সম্ভবত তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন। তখন আল আসীদ আমলি আসাদ উদ্দিনের নিকট তার মস্তক দাবী করে বার্তা প্রেরণ করেন। সে মতে সাওয়ানকে হত্যা করা হয় এবং তারা ১৭ রবিউল আখির তার মস্তক আল আসীদের নিকট প্রেরণ করেন। এতে মুসলমানরা আনন্দিত হয় এবং আসাদ উদ্দিন সাওয়নের বাড়ি-ঘর লুট করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুয়ায়ী তার বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করা হয়। আর আসাদউদ্দিন আল আযেদের নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে উজীর নিযুক্ত করেন এবং মূল্যবান খিলাতে ভূষিত করেন এবং তাকে আল মালিক আল মানসূর খিতাব দান করেন। তিনি সাওয়ারের গৃহে বসবাস করেন এবং সেখানে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

নূরুদ্দিন যখন মিশর বিজয়ের খবর জানতে পারেন, তখন তিনিও আনন্দিত হন। কবিরা কবিতা রচনা করে তাকে অভিনন্দন জানান। অবশ্য আসাদ উদ্দিন আল আযেদের উজীর হওয়ায় তিনি খুশি হতে পারেননি। অনুরূপভাবে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দিনর মন্ত্রিত্ব লাভ করলেও তিনি খুশি হতে পারেননি। আর নূরুদ্দিন মন্ত্রিত্ব রদ করার চক্রান্ত শুরু করলেও তিনি এতে সফল হতে পারেননি। বিশেষ করে যখন তিনি জানতে পারেন যে, সালাহউদ্দিন আল আযীদের ধন ভাণ্ডার অধিকার করে নিয়েছে, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আসাদ উদ্দিন একজন কাতীব বা সচিব দাবি করে রাজ প্রাসাদে পয়গাম প্রেরণ করলে তারা কবি আল ফাজিলকে এ আশায় প্রেরণ করে যে, তিনি তার কথা মেনে নিবেন এবং তার আশা পূরণ করবেন। আসাদউদ্দিন কর্মচারীদেরকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে অনেক জায়গীর দান করেন এবং ক্ষমতা আর কর্তৃত্বও দান করেন। এভাবে তিনি কিছু দিন আনন্দিত ছিলেন। অবশেষে এ বছর জুমাদাল আখির মাসের ২২ তারিখ মৃত্যু তাকে পাকড়াও করে। দিনটি ছিল শনিবার। তার শাসনকাল ছিল দুই মাস পাঁচদিন। আসাদউদ্দিনের মৃত্যুর পর শামী আমীরা আল আযীদকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন তার চাচার পর সালাহউদ্দিন ইউসুফকে উজীর নিযুক্ত করেন। সে মতে আল আযীদ তাকে উজীর নিযুক্ত করেন এবং তাকে মূল্যবান খিলাত দান করেন এবং তাকে আল মালিক আল নাসের উপাধিতে ভূষিত করেন।

সালাহউদ্দিনের পরিধেয় খিলাত : আল রওজাতাইন গ্রন্থে আবু শামার বর্ণনা অনুযায়ী সালাহউদ্দিনের খিলাত ছিল সাদা পাগড়ি, যার কাছা ছিল স্বর্ণ খচিত এবং দেবীকি বস্ত্র। যাতে ছিল স্বর্ণের রেখা এবং স্বন খচিত জুব্বা এবং তাইলাসান চাঁদর, যাতে ছিল স্বনের কারুকার্য এবং দশ লাখ দিনারের মূল্যবান মণি মাণিক্যের হাঁড় এবং পাঁচ হাজার দিনারের সজ্জিত তরবারি এবং আট হাজার দিনারের পেটি, যার উপর ছিল স্বর্ণের হার এবং তার মাথায় ছিল মণি-মানিক্যের দুইশত দানা এবং তার পায়ে ছিল জাওহারের চারটি হাঁড়। আর হাঁড়ের মাথায় ছিল স্বর্ণের নালী। তার সঙ্গে ছিল কিছু ঘোড়া এবং অন্যান্য জিনিস, আর ওজারতির ফরমান যা মোড়ানো ছিল সাদা রেশমী কাপড়ে। এটা এ বছর জুমাদাল সানি মাসের ২৫ তারিখ সোমবারের ঘটনা। দিনটি ছিল উৎসবের। সমস্ত সৈন্য তার সেবায় নিয়োজিত হয়। আইনুদদৌলা আল ইয়ারুই ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকেনি। ইনি বলেন, নূরুদ্দিনের পর আমি ইউসুফের সেবা করব না।

এরপর তিনি তার সৈন্যদেরকে নিয়ে শাম দেশে গমন করেন। এজন্য নূরুদ্দিন তার নিন্দা করেন। আর বাদশা সালাহউদ্দিন মিশরে নূরুদ্দিনের প্রতিনিধি হিসাবে অবস্থান করেন। মিশর দেশে তার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। এবং আমীর আসফালা সালাহউদ্দিন নামে তার পক্ষ থেকে পত্রাদি প্রেরণ করা হতো। চিঠিপত্রে সালাহউদ্দিন বিনয় প্রকাশ করতেন। কিন্তু অন্তর তার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মন তার প্রতি বিনয় প্রকাশ করে। আল আযীদ তার শাসনামলে ভীষণ কষ্ট স্বীকার করেন। আর সে দেশে লোকজনের নিকট সালাহউদ্দিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা তার সঙ্গে ছিল, তিনি তাদের জায়গীর বৃদ্ধি করেন, ফলে তারা তাকে ভালবাসে, সম্মান করে এবং তার খিদমাত করে। আর তার নির্দেশ ব্যতিরেকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার জন্য দমক দিয়ে তার কাছে পত্র লেখেন এবং তাকে এই নির্দেশও দেন যে, মিশরীয় অঞ্চলের হিসাব তৈয়ার করে রাখতে হবে। কিন্তু সালাহউদ্দিন এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। এ প্রসঙ্গে নূরুদ্দিন বলতে থাকেন, আইয়ুবের পুত্র বাদশা সেজে বসেছে। আর সালাহউদ্দিন নূরুদ্দিনের নিকট পত্র প্রেরণ করে তার পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনকে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। সে মতে তিনি তাদেরকে প্রেরণ করেন, তবে আনুগত্যের শর্ত আরোপ করেন। এভাবে মিশরে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা সুদৃঢ় হয়। তার ক্ষমতা স্থায়ী হয় এবং তার সঙ্গী-সাথীরা শক্তি অর্জন করে। সাওয়ার উজীরকে হত্যা করার ব্যাপারে সালাহউদ্দিন সম্পর্কে জনৈক কবি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন,

هيا لمصر حور يوسف ملكها * بأمر من الرحمن كان موقوتا

وما كان فيها قتل يوسف شاورا * يماثل إلا قتل دود جالوتا

"মিশরের জন্য তাড়াতাড়ি কর সাদা বর্ণের ইউসুফ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তথাকার বাদশা হয়েছে।

মিশরের সাওয়ারকে হত্যা করা ইউসুফের জন্য এমন, যেমন দাউদ হত্যা করেছিলেন জালুতকে।"

আবু শামা বর্ণনা করেন যে, এ বছর আল আযীদ সাওয়ার-এর সন্তানদেরকে হত্যা করে, আর তারা ছিল সুজা, যার উপাধি ছিল কামিল এবং তারীত। যার উপাধি ছিল মুয়াযিম এবং তাদের অপর এক ভাই, যার উপাধি ছিল ফারিসুল মুসলেমীন। মিশর দেশে এ সব নিহত ব্যক্তিদের মস্তক প্রদর্শন করা হয়।

হিজড়াদের হত্যার ঘটনা

মুহতামিনুল খেলাফা এবং তার সঙ্গীরা সালাহউদ্দিনের হাতে নিহত হয়। এর কারণ ছিল এই যে, তিনি দারুল খেলাফা মিশর থেকে খ্রিস্টানদের মিশরে আগমন করার জন্য পত্র লেখেন। তারা যেন সেখান থেকে সিরীয় ইসলামী সৈন্যদের বহিষ্কার করে, আর যে ব্যক্তি এই পত্র বহন করে নিয়ে যায়, সে ছিল হিজড়া মুহতামিনুল খেলাফা। তিনি ছিলেন প্রাসাদরক্ষীদের নেতা এবং হাবসী। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মারফত তার কাছে পত্র পৌছানো হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তার অবস্থা দেখে লোকটির সন্দেহ হয় এবং সে তাকে বাদশা সালাহউদ্দিনের কাছে নিয়ে যায়। লোকটিকে চাপ দিলে সে পত্র বের করে। সালাহউদ্দিন বিষয়টা বুঝতে পারেন

এবং তা গোপন রাখেন। আর হিজড়া মুহতামিনুল দৌলা বুঝতে পারে যে, সালাহউদ্দিন বিষয়টা জেনে ফেলেছেন। নিজের প্রাণের ভয়ে দীর্ঘদিন সে প্রাসাদে অবস্থান করেন। পরে একদিন সুযেগা বুঝে সে শিকার করতে বের হয়, তখন সালাহউদ্দিন লোক প্রেরণ করে। লোকটি তাকে কজা করে হত্যা করে এবং তার মস্তক সালাহউদ্দিনের নিকট প্রেরণ করে। এরপর প্রাসাদের সকল সেবক, রক্ষককে বরখাস্ত করা হয় এবং প্রাসাদ রক্ষার কাজে তাদের পরিবর্তে বাহাউদ্দিন কারাকুশকে প্রসাদ রক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়। তাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, ছোট-বড় সকল ঘটনা যেন তাকে অবহিত করা হয়।

সুদানের ঘটনা

আর তা এভাবে ঘটে যে, হাবলী মুহতামিনুল খেলাফা হাবশী হিজড়াকে হত্যা করার পর অন্যান্য সেবকদেরও পদচ্যুত করা হলে তারা অসন্তুষ্টও ক্ষিপ্ত হয়। ওদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ হাজার। সালাহউদ্দিনের সৈন্যদের সঙ্গে প্রসাদের নিকটে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষের বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হয়, আর আল আযীদ প্রাসাদ থেকে এই সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেন। এই সময় সিরীয় সৈন্যরা প্রাসাদ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করে। তাদের দিকেও প্রস্তর ছুটে আসলে তাদের কেউ বলে, এটা আযীদের নির্দেশে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অন্যরা বলে, তার নির্দেশে করা হয়নি। এরপর নাসের নুসাহ, শাসসুদ দৌলার ভাই, যিনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং যাকে নূরুদ্দিন তার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আল আযীদের দেখা স্থান অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। তখন দরজা খুলে দেয়া হয় এবং ঘোষণা দেয়া হয় যে, আমিরুল মুমেনীন তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন এই সব সুদানীদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য। এতে শামরা শক্তি সঞ্চয় করে এবং সুদানীরা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সুলতান হাবশীদের মহল দার যা 'মনসুবা' নামে পরিচিত ছিল এবং যেখানে তাদের বাড়ি-ঘর ছিল, পবিার-পরিজন ছিল, আর বা'বে জাবিলায় যেখানে তাদের লোকজন ছিল, সেখানে একজন লোক প্রেরণ করে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই সময় তারা পলায়ন করে। তরবারী চালিয়ে তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়। অতঃপর তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে তিনি তাদের দাবি মেনে নেন এবং তাদেরকে আল-জিজা অঞ্চলে নির্বাসন দেওয়া হয়। এরপর সালাহউদ্দিনের ভাই শামসুদদৌলা নুসাহ তাদের মোকাবেলায় বের হন। তিনিও তাদের অধিকাংশকে হত্যা করেন। গুটি কতেক ছাড়া তাদের মধ্যে আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। অত্যাচারের কারণে তাদের রাসগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এ বছর নূরুদ্দিন জে'বার দূর্গ জয় করেন এবং দূর্গের অধিপতি শিহাবউদ্দিন মালিক ইবনে আলী আল আকিরীর নিকট থেকে তা অধিকার করে নেন। মালিক শাহের যুগ থেকে এটা তাদের অধিকারে ছিল। এ বছর, হারবের জামে মসজিদে অগ্নিসংযোগ করা হলে নূরুদ্দিন তা পুনঃনির্মাণ করেন। আর এ বছর মারুফ মৃত্যুবরণ করেন, যার নামে হারবের বাইরে একটা মহল্লা পরিচিত ছিল। এ হিজরী সনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন–

সা'দউল্লাহ ইবনে নসর ইবনে সাঈদ আল দুজাজী : আবুল হাসান আল ওয়ায়েয আল হাম্বলী (৪০০/৪৮০) হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং তিনি বেশ ভাল ওয়ায করতেন। এ বিষয়ে ইবনুল জাওবী তার প্রসংশা করেন। তিনি বলেন যে, একদা তার নিকট আল্লাহর গুণাবলীর বিষয়ে হাদীস জানতে চাওয়া হলে তিনি এই কাজে প্রবৃদ্ধ হতে বারণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আবৃত্তি করেন,

أبى الغائب اغضبان يا نفس أن ترضى * وأنت الذى صيرت طاعته فرضا

فلا هجرى من لا تطيقين هجره * وإن هم بالهجران خديك والأرضا

"হে অতৃপ্ত অনুপস্থিত নাফস, তুমিতো তুষ্ট হতে অস্বীকার করেছ, আর তুমি হলে এমন, যে বশ্যতাকে বাধ্যতামূলক করেছ। সুতরাং যা বিসর্জন দেয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, তুমি তা বিসর্জন দেবে না। যদিও তোমার দু'যাও এবং ভূমি তা বিসর্জন দিতে চায়।"

তাঁর সূত্রে ইবনুল জাওমী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি খলীফাকে ভয় পাই। তখন ঘুমের মধ্যে গায়েবী আওয়াজ আমাকে ডেকে বলে, তুমি লিখে নাও :

ادفع بصبرك حادث الأيام * وترج لطف الواحد العلام

لا تيأسن وإن تضايق كربها * ورماك ريب صروفها بسهام

فله تعالى بين ذلك فرجة * تخفى على الأفهام والأوهام

كم من نجا من بين أطراف القنا * وفريسة سلمت من الضرغام

"কালের চক্রকে ধৈর্য দ্বারা দূর কর এবং একক সত্তার মেহেরবাণী কামনা কর।

তুমি হতাশ হয়ো না। ভূমির কষ্ট তোমাকে যতই ত্যক্ত-বিরক্ত করে এবং কালের চক্র তোমাকে যতই তীর নিক্ষেপ করুক না কেন। আল্লাহ এর মধ্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন। যা ধারণা-কল্পনার অতীত। কত লোক বর্ষার আঘাত থেকে রক্ষ পেয়েছে আর কত শিকার বেঁচে গেছে বাঘের হাত থেকে।"

এ বছর শা'বান মাসে ৮৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আলসুরী খানকায় তাকে দাফন করা হয়, পরে সেখান থেকে তাকে ইমাম আহমদের কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়।

যাওহার ইবন মুজীরুদ্দিনের আবু শুজা আল-সাধী, তার নকব ছিল আমীরুল হুয়মুন।

আল আলিদের শাসনামলে তিনি মিশরীয় অঞ্চলের উজীর ছিলেন। তিনি রুযবেকেরে হাত থেকে মন্ত্রীত্ব ছিনিয়ে নেন। ইনি প্রথম ব্যক্তি যে কাযী আল-ফাসিলকে কাতিব বা সচিব পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ইনি তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাকুস সিদরা থেকে নিয়ে আসেন। সেখানে তার নিকট তিনি মর্যাদা লাভ করেন এবং প্রসাদে পত্র লেখার দায়িত্ব তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ, তিনি তার মধ্যে যোগ্যতা প্রতিভার সন্ধান পান। অনেক কবি তার প্রশংসা করেন। তন্মেধ্যে কবি ইমারাহ আল-ইলয়ানী বলেন,

ضجر الحديد من الحديد وشاور * من نصر دين محمد لم يضجر

حلف الزمان ليأتين بمثله * حنثت يمينك يا زمان فكفر

"কর্মকার লোহার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর দীনের সাহায্যকারীর পরামর্শ গ্রহণ করে, সে কিন্তু ভীতশ্রদ্ধ হয় না। যমানা শপথ করেছে, সে অবশ্যই তার মতো যুক্তি উপস্থিত করবে। হে যমানা তোমার শপথ ভঙ্গ হয়েছে তাই তুমি শপথ ভঙ্গেঁর মাখযারা আদায় করবে।" আমীর সিরদাস ইবন সিওয়ার হামলা চালাবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর শাসন কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন ছিল। আমীর লিরগাম হামলা চালালে তিনি নূরুদ্দিনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তিনি তার সঙ্গে আমীর আসাদুদ্দীন শেরশাহ-কে প্রেরণ করেন। তারা দুশমনের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করে। তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আসাদুদ্দীন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীনের দ্বারা হত্যা করান। ১৭ই রবিউল আখির আমীর জুরদংক-এর হাতে গলা কেটে তাকে হত্যা করা হয়। তারপর আসাদূদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর মেয়াদ ২ মাস ৫ দিনের বেশি ছিল না। ঐতিহাসিক ইবন কাপ্লিসান বলেন, তিনি ছিলেন আবু মুজা শাওয়ার ইবন মুজীরুদ্দীন ইবন নিসার ইবন আশা ইর ইবন শাম ইবন সুগীম ইবন হাবীব ইবনুল হারিস ইরন রবীয়া ইবন মালিক বিন আবুসুয়াইব ইবন আব্দুল্লাহ। ইনি ছিলেন হযরত হানীসা সা'জিয়ার পিতা। এটাই ইবন খাল্লিসনের বর্ণনা। তথায় তাঁর বর্ণনা মৃদ্দতের ধৈর্য্য এবং নসবের স্বল্পতা হেতু সে সম্পর্কেও আপত্তি আছে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

শেরকোহ ইবন সাদী : আসাদুদ্দীন আল্‌কুদী আল খারযারী। কুর্দী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি হলেন সবচেয়ে বিভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি সে জন পদের অধিকারী তাকে 'জারীন' বলা হয়। এলাকাটি ছিল আমারবাইজানের কতৃত্বাধীন। তাঁর ভাই নাজরুদ্দীন আইউব, যিনি বড় ছিলেন। ইরাকের কোতোয়াল আমীর মুজাহিদুদ্দীনে নাওরুম-এর খাদেম ছিলেন। তিনি নাজমুদ্দীন আইউবকে চাকুরীতে দুবার নায়িব নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে ইমাদুদ্দীন জঙ্গী কারাজা আল সাতী থেকে পলায়ন করে সেখানে প্রবেশ করে। এরা উভয়ে তার সঙ্গে সদাচারণ করে এবং তার সেবা-যত্ন করে। এ সময় ঘটনাচক্রে তিনি জনৈক সাধারণ লোককে হত্যা করেন। ফলে নাহরোম তাদের উভয়কে দুর্গ থেকে বের করে দেন। তারা উভয়ে হালবে জঙ্গীর নিকট চলে যান এবং তিনি তাদের সাথে ভাল আচরণ করেন। তারা উভয়ে তার পুত্র নুরুদ্দীন মাহমুদ-এর নিকট মর্যাদা লাভ করেন এবং তিনি আইউবকে বা'লাবাক্কার অঞ্চলের নায়েব নিযুক্ত করেন। তার পুত্র নুরুদ্দীন তাকে উক্ত পদে বহাল রাখে এবং আসাদুদ্দীন নুরুদ্দীনের দরবারে অন্যতম বড় আমীর হয়ে যান। আর তিনি তার কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি তাকে অন্যান্য জায়গীর সাথে রাহবা এবং হিমস্ অঞ্চলের বিরাট অংশ দান করেন। আর এই সুযোগ তাকে দেওয়া হয় তার বীরত্ব, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব এবং খ্রিষ্টানদের সাথে জিহাদের কারণে। এই জিহাদ তিনি পরিচালনা করেন মাত্র হাতে গোনা কয়েক দিনে। বিশেষ করে দামিস্ক বিজয়ের দিন তিনি যে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন সে জন্য। আর দিআরে মিশরে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তা এর চেয়েও বিস্ময়কর। আল্লাহ তার কবরকে রহমত দ্বারা সিক্ত করুন এবং জান্নাতকে তার ঠিকানা করুন। সোমবার দিন হঠাৎ দমবন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ বছর জুমাদাস সানী মাসের ২২ তারিখ এই ঘটনা ঘটে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আবু শামা বর্ণনা করেন যে, পূর্বাঞ্চলের আসাদিয়া খানকাহ তার নামে সম্পর্কিত করা হয়। এরপর তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহউদ্দীন ইউসুফ আমীর হন এবং সেখানে তার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহেদ ইবন সুলাইমান ইবন বাক্তি নামে পরিচিত এবং তিনি হাদীস পড়ে শোনাতেন। অনেকেই তার নিকট আগমন করেন। তিনি প্রায় ৯০ বছর আয়ু পান।

মুহাম্মদ আল ফারুকী : ইনি হলেন আবু আবদুল্লাহ আল ওয়ায়েজ। কথিক আছে যে, নাহজুল বালাগা গ্রন্থ তিনি মুখস্থ করেন এবং তার শব্দগুলো ব্যাখ্যা করতেন। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি এবং তার কথাগুলো লিখে রাখা হতো। তার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি গ্রন্থ রচিত আছে। যা আল হিকাম আল ফারিকীয়া নামে প্রসিদ্ধ।

আল মুয়াম্মার ইবনে আবদুল ওয়াহেদ : ইনি হলেন ইবন রাযা আবূ আহমদ আল ইস্পাহানী। তিনি ছিলেন হাফিজ এবং ওয়ায়েজ। তিনি আবু নুয়াইমের সঙ্গীদের সূত্রে বর্ণনা করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে তার বেশ দক্ষতা ছিল। হজ্বে গমনকালে পথিমধ্যে তার ইন্তেকাল হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী ৫৬৫ সনের ঘটনাবলী

এ হিজরী সনের সফর মাসে খ্রিষ্টানরা মিশরীয় অঞ্চলের দিমইয়াত নগরী ৫০ দিন অবরোধ করে রাখে। ফলে নগরের অধিবাসীরা বেশ সংকটে পতিত হয় এবং তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। দিআর মিশরিয়া অধিকার করার জন্য স্থলভাগ এবং জলভাগ থেকে অনেকেই সেখানে ছুটে আসে এবং মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকার করতে পারে এই আশংকায়ও তারা ছুটে আসে। তখন সালাহউদ্দীন নুরুদ্দীন-এর নিকট সাহায্য কমনা করে পত্র লিখেন এবং সৈন্য প্রেরণ করার জন্য দাবী জানান। কারণ তিনি মিশর থেকে বের হলে মন্দ লোকেরা তার প্রতিনিধি হয়ে বসবে। আর খ্রিষ্টানরা মোকাবেলা করা থেকে তিনি বিরত থাকলে তারা দিমিয়াত নগরী অধিকার করে নেবে এবং তাকে নিজেদের দূর্গে পরিণত করবে এবং মিশর অধিকার করার জন্য তারা শক্তি অর্জন করবে। তাই নুরুদ্দিন একের পর এক তাদের নিকট প্রতিনিধি দল বা সৈন্যদল প্রেরণ করেন। অতঃপর নুরুদ্দিন নগরীতে খ্রিষ্টানদের অনুপস্থিতিকে গণিমত মনে করেন এবং অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং তাদের গৃহের আড়ালে বসে পড়েন এবং তাদের সম্পদ গণিমত হিসাবে অধিকার করেন। আর অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দী করেন। সালাহ উদ্দিনের নিকট যাদেরকে প্রেরণ করেন তাদের মধ্যে তার পিতা আমীর নাজিমুদ্দিন আইয়ুবও ছিলেন। তিনি এক সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার সঙ্গে অন্যান্য সন্তানরাও ছিল। তিনি মিশরীয় বাহিনীর সম্মুখীন হন। মিশরীয় সৈন্যরা তাকে অভিনন্দন জানান এবং আল আযীদও তার পিতার সম্মানার্থে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বের হন। আলেকজান্দ্রিয়া এবং দিমিয়াত নগরী তাকে জায়গীর হিসাবে দান করেন। অনুরূপভাবে তার অন্যান্য সন্তানদেরও জায়গীর দান করা হয়। এই ঘটনায় সালাহউদ্দিন আল আযীদকে এক কোটি দিনার দ্বারা সহায্য করেন। শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা দিমিয়াত ত্যাগ করে চলে যায়। তারা এজন্য দিমিয়াত ছেড়ে চলে যায় যে, তারা জানতে পারে য়ে, নুরুদ্দিন তাদের দেশে যুদ্ধ করেছে এবং বিপুল সংখ্যক লোকদের হত্যা করেছে এবং অনেককে বন্দী করেছে। অনেক নারী এবং শিশুকে আটক করেছে

এবং তাদের অনেক সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। আল্লাহ তাকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অতঃপর জুমাদাল উলা মাসে তিনি কারখ অঞ্চল অবরোধ করার উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। এই অঞ্চলটি ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত। অঞ্চলটি অধিকার করার কাছাকাছি এসে তিনি জানতে পারেন যে, খ্রিষ্টানদের দুই জন সেনাপতি দামিস্কের দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি আশংকা করলেন যে, খ্রিষ্টানরা তাদের আশপাশে সমবেত হবে। তাই তিনি অবরোধ পরিত্যাগ করে দামিস্কের পথে অগ্রসর হন এবং তাকে রক্ষা করেন। খ্রিষ্টানরা দিমিয়াত ত্যাগ করে চলে গেলে নুরুদ্দীন খুব আনন্দিত হন এবং এ আনন্দে কবিরা কবিতা রচনা করেন। বাদশাহ নুরুদ্দীন এজন্য অনেক চেষ্টা যত্ন করেন। হাদীসের এক জন ছাত্র এ প্রসঙ্গে তাকে হাদীস পড়ে শোনান এবং হাদীসটি ছিল যুদ্ধ এবং হাসি-কৌতুক বিষয়ক। হাদীস পাঠক হাদীস শোনায় হাসার জন্য। আর তার কাছে এ ব্যাপারে আবেদন জানালে তিনি তা থেকে বিরত থাকেন এবং বলে, আল্লাহর জন্য আমার লজ্জা হয় যে, তিনি আমাকে হাসতে দেখবেন এমন এক সময়, যখন দিমিয়াত সীমান্তে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের অবরোধ করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে শায়খ আবু শামাহ উল্লেখ করেন যে, মনসুরা দুর্গস্থ আবুদদারদা মসজিদের ইমাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেন; তিনি বলছিলেন, নুরুদ্দীনকে সালাম জানাবে এবং তাকে এই সুসংবাদ দেবে যে, খ্রিষ্টানরা দিমিাত ছেড়ে চলে গেছে। তখন আমি বলালম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কি আলামত আছে? তিনি বললেন, এর আলামত এই যে, তিলহারেয যুদ্ধের দিন যিনি সিজদা করেছেন, তিনি সিজদায় বলেছেন, হে আল্লাহ তোমার দ্বীনের সাহায্য কর, আর সাহায্য কর সে ব্যক্তির, যে সকলের নিকট প্রশংসার যোগ্য। নুরুদ্দীন যখন সেখানে ফজরের নামাজ আদায় করেন, তখন তাকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং আলামত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এই সময় নুরুদ্দীন বলেন, রাসূল (সা) তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছে তুমি তা বল। তিনি তা বললেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। তখন নুরুদ্দীন খুশীতে কেঁদে ফেললেন। অতঃপর খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, তিনি স্বপ্নে যা দেখেছেন, তাই ঘটেছে।

আল ঈমাদ আল কাতিব বলেন, এ হিজরী সনে বাদশাহ নুরুদ্দীন দারয়াহ জামে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে আবু সুলাইমান দারানীর মাজারও নির্মাণ করেন। এ বছর তিনি আল কারখ অঞ্চল চারদিন অবরোধ করে রাখেন এবং সালাহউদ্দীনের পিতা নজমুদ্দীন আইউব তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশরে তার সন্তানের নিকট গমন করেন। আর নুরুদ্দীন তাকে ওসীয়ত করেন তিনি যেন পুত্র সালাহউদ্দীনকে এই নির্দেশ দেন যে, খলীফা (আব্বাসী) আল মুস্তানজিদের নামে মিশরে খুতবা পাঠ করেন। কারণ, খলীফা এই ব্যাপারে তাকে তিরস্কার করে ফরমান পাঠান। আর এই বৎসর খ্রিষ্টানরা আস-সাওয়াহেল অঞ্চল থেকে আগমন করে। আল কারখ অঞ্চল প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। তাদের সঙ্গে ছিল শাবীব ইবন রাকীক এবং ইবনুল কানতারী। এরা দুজন ছিল খ্রিষ্টানদের মধ্যে সবচেয়ে বীর সিপাহী। নুরুদ্দীন এদের উভয়ের মুকাবিলায় বহির্গত হন। তখন তারা রাস্তা থেকে কেটে পড়ে। এই বছর শাম দেশে এবং আল জাযিরা অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্প হয় এবং এতে গোটা এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শামদেশের অনেক প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। অনেক ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে প্রচুর লোক নিহত হয়। বিশেষ করে দামিশ্‌ক, হিমস, হিমাহ, হলব এবং বালাবাক্কা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব নগরীর অধিকাংশ দেয়াল

এবং দুর্গ ধূলিস্যাৎ হয়। নুরুদ্দীন এসব ইমারত নতুন করে নির্মাণ করেন। এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যিনি ইন্তিকাল করেন তিনি হলেন–

বাদশা কুতুবউদ্দীন মওদুদ ইবন জঙ্গী : ইনি হলেন মুসেল অঞ্চলের শাসনকর্তা নুরুদ্দীন মাহমুদের ভাই। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৪০ বছর। তার শাসনকাল ছিল ২১ বছর। তিনি ছিলেন উত্তম বাদশাহদের অন্যতম। প্রজাদের নিকট তিনি ছিলেন প্রিয় পাত্র এবং প্রজাদেরকেও তিনি ভালবাসতেন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি নিজে ছিলেন বেশ সুদর্শন। তারপরে বাদশাহ হন তার পুত্র সাইফুদ্দীন গাজী। ইনি ছিলেন আলামত খাতুন বিনতে ওমরতাশ ইবন ইল গাজী ইবন অরেতাক-এর সন্তান। যিনি ছিলেন মারদিনের শাসনকর্তা। আর তার রাজত্বের ব্যবস্থাপকও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন ফখরুদ্দীন আবদুল মসীহ। এই লোকটি ছিল অত্যাচারী এবং পরের সম্পদ হরণকারী। এ বছর আন্দালুস দ্বীপে পাশ্চাত্যের শাসকদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রাচ্য দেশেও অনেক যুদ্ধ হয়। এ হিজরী সনে এবং তার পূর্বের বছর আমীর বরগশ আল কবীর লোকজনকে নিয়ে হজ্বে গমন করেন। এ বছর অন্য কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে বলে আমার জনা নেই।

হিজরী ৫৬৬ সনের ঘটনাবলী

এ বছর খলীফা আল মুসতানজিদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তারপুত্র আল মুসতাযী খলীফা হন। বছরের শুরুতেই খলীফা আল মুসতানজিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জনগণের দৃষ্টিতে বাহ্যত তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে জনগণও বেশ খুশী হয়। এরপর চিকিৎসক তাকে হাম্মাম খানায় নিয়ে যান। এ সময় তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন। হাম্মাম খানায় তার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, সরকারের কিছু কিছু লোক দ্রুত তার মৃত্যুর জন্য চিকিৎসককে ইঙ্গিত করলে শনিবার যোহরের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেদিন ছিল রবিউল আখির মাস। এ সময় তার বয়স ছিল ৪৮ বছর। তার শাসনকাল ছিল ১১ বছর কয়েক মাস। ইনি ছিলেন উত্তম খলীফা এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাদের মধ্যে সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি প্রজাদের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করে নেন। তার শাসনামলে ইরাকে কোনো কর প্রত্যাহার করেন নি। তার কোনো বন্ধু এক দুষ্ট লোক সম্পর্কে তার কাছে সুপারিশ করে এবং খলীফা তার জন্য ১০ হাজার দিনার দান করেন। তখন খলীফা লোকটিকে বলেন, আমি তোমাকে ১০ হাজার দিনার দেব, তুমি আমার কাছে তার মত লোক নিয়ে আসবে যাতে মুসলমানরা তার অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। খলীফা মুসতানজিদের গাত্রবর্ণ ছিল গন্ধমের মত এবং দাড়ি ছিল দীর্ঘ। তিনি ছিলেন আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে ৩২তম খলীফা তার সম্পর্কে কোনো এক কবি বলেন,

أصبحت لب بنى العباس جملتها * إذا عددت حساب الجمل الخلفا

"তুমি সমস্ত আব্বাসী খলীফাদের সারবস্তু। যখন তুমি এক এক করে তাদের নাম গণনা করবে।"

তিনি ভাল কাজের নির্দেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনেক কঠোর। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

اللهم اهدنى فمن هديت وعافنى فيمن عافيت الخ

"হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছ, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং তুমি যাদেরকে ক্ষমা করেছ, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" এভাবে পুরো দোয়ায় কুনূত রাসূল (সা) তাকে স্বপ্নযোগে শিক্ষা দেন। আর রবিবার যোহরের নামাযের পূর্বে তার যানাজার নামায পড়ানো হয় এবং দারুল খিলাফতে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি রহম করুন।

আল মুসতাযীর খিলাফত : তিনি আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইবন ইউসুফ আল মুসতানজিদ ইবনুল মুকতাফী। তার মা ছিলেন আর্মেনিয়ার অধিবাসী যাকে ইসমত বলা হত। ৫৩৬ হিজরীর শাবান মাসে তার জন্ম হয়। যেদিন তার পিতার মৃত্যু হয়, সেদিন রবিউল আখিরের ৯ম তারিখ। রোববার ভোরবেলা তার খিলাফতের বায়আত সম্পন্ন হয়। হাসান ইবন আলীর পর হাসান নামে আর কেউ খিলাফত লাভ করেন নি। দু'জনের কুনিয়াতও ছিল এক। এ উপলক্ষ্যে এক হাজারের বেশি খিলাফত দান করা হয়। দিনটি ছিল উৎসবের দিন। ২২ রবিউল আখির জুমার দিন রাওহ ইবনুল হাদসানীকে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। এই উপলক্ষে উজীরকেও খিলাফত দান করা হয়। তিনি ছিলেন ওস্তাদ আযদুদদৌলা। ফজর, মাগরিব এবং এশার সময় দরবারে ঢোল পিটানো হয় এবং দরবারের ১৭ জনকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। আর ওয়াজকারীদেরকে ওয়াজ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হলে দীর্ঘ বিরতির পর তারা ওয়াজ করেন। কারণ, এর ফলে অনেক অঘটন ঘটতো। এরপর তিনি দীর্ঘদিন অন্তরালে থাকেন। তার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সুসংবাদ মসুলে পৌঁছলে আল ইমাদ আল কাতীব বলেন,

قد أضاء الزمان بالمستضىء * وارث البرد وابن عم النبى

جاء بالحق والشريعة والعد * ل فيا مرحبا بهذا المجيى

فهنيئا لأهل بغداد فازوا * بعد بؤس بكل عيش هنى

ومضى إن كان فى الزمن المظ * لم بالعود فى الزمان المضى

"যামানা উজ্জ্বল হয়েছে আল মুসতাযীর মাধ্যমে, যিনি চাঁদরের উত্তরাধিকারী এবং নবীজীর চাচাত ভাই। তিনি নিয়ে এসেছেন সত্য শরীয়ত এবং ন্যায় বিচার এই আগমনের জন্য তাকে জানাই খোশ আমদেদ। বাগদাদবাসীদের মোবারক হোক, তারা দুঃখের পর ধন্য হয়েছে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দে।

যদিও তারা পড়ে ছিল অন্ধকারের মধ্যে। এখন তারা ফিরে এসেছে আলোক মালায়।"

আর এ বছর বাদশাহ নুরুদ্দীন রিক্কা অঞ্চল গমন করে তা অধিকার করে নেন। অনুরূপভাবে অধিকার করে নেন নসীবীন, খাবুর এবং সাঞ্জার অঞ্চল। আর এ অঞ্চল তিনি অর্পণ

করেন তার জামাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মওদুদ ইবন ইমাদুদ্দীন এর হাতে। এরপর তিনি মৌসুল অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে ২৪ দিন অবস্থান করেন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র সাইফুদ্দীন গাজী ইবন কুতুবইদ্দীনকে আল জাযিরাসহ এ অঞ্চল দান করেন। এবং তার কাছে অপর কন্যাকে বিয়ে দেন। সেখানে মসজিদ নির্মাণ এবং তা সম্প্রসারনের নির্দেশ দেন। নির্মাণ কাজে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। মসজিদের জন্য তিনি একজন খতীব এবং ফিকহের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ফিকহে শিক্ষার কাজে তিনি নিযুক্ত করেন আবু বকর আল বরকানীকে। ইনি হলেন ইমাম গায্যালীর শিষ্য মোহাম্মদ ইবন ইয়াহহিয়া। এ ব্যাপারে তাকে লিখিত ফরমান হস্তান্তর করেন। আর মসজিদের জন্য মওসুলের একটি গ্রাম ওয়াকফ করে দেন। আর এর সবকিছু তিনি করেন মায়খ সালেহ আবেদ মোল্লা ওমরের পরামর্শে। তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ ছিল, যেখানে তিনি অবস্থান করতেন এবং লোকজন তার কাছে উপস্থিত হত। মৌলুদের মাসে প্রতি বছর তার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা হত। এতে আমীর ওমরাহ এবং আলেম-উজীর সকলে উপস্থিত হতেন। আর বাদশাহ নুরুদ্দীন ছিলেন তার বন্ধু। বিভিন্ন বিষয়ে বাদশাহ তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাদশাহ তার উপর আস্থা রাখতেন। মউসূলে অবস্থানকালে তিনি যেসব ভাল কাজ করেন, তার সবই হয় তার নির্দেশে। ফলে তার আগমনে মসুবাসীরা ভীষণ আনন্দিত হয় এবং তাদের সব মনোকষ্ট দূর হয়ে যায়। আর তিনি তাদের মধ্য থেকে অত্যাচারী ফখরুদ্দীন আবদুল মসীহকে বের কের দেন। তিনি তার নামকরণ করেন আবদুল্লাহ এবং তাকে সঙ্গে করে দামিশকে নিয়ে যান। আর সেখানে তাকে ভাল জায়গীর দান করেন। মূলত এই আবদুল মসীহ ছিল খ্রিষ্টান। কিন্তু সে মুসলিম নাম ধারণ করে। কথিত আচে যে, বাস গ্রহের অভ্যন্তরে সে একটি গির্জা নির্মাণ করেছিল। মুসলমান এবং বিশেষ করে আলেমদের সম্পর্কে তার ছিল দূরভিসন্ধি। নুরুদ্দীন যখন মসুলে আগমন করেন, তখন নুরুদ্দীনের নিকট মোল্লা ওমরের জন্য নিরাপত্তা হাসিল করা হয়। কিন্তু নুরুদ্দীন মসুলে প্রবেশ করলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তিনি তার সঙ্গে ভাল আচরণ করেন এবং তাকে সম্মান করেন। তাকে খিলাতে ভূষিত করেন। এই খিলাত, খলীফার পক্ষ থেকে তার কাছে আসে। আর তিনি তা পরিধান করে শান-শওকতের সঙ্গে নগরে প্রবেশষ করেন। প্রচণ্ড শীতের আগমনের পূর্বে নুরুদ্দীন মসুলে প্রবেশ করেন নি একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেখানে তার অবস্থারে শেষ রাত, তিনি রাসুল (সা)-কে স্বপ্নে দেখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলছিলেন, এই নগর তোমার জন্য শুভ হোক। তুমি আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং জিহাদ পরিত্যাগ করেছ? তিনি তৎক্ষণাৎ সফরে রওয়ানা করেন এবং ভোরবেলা তিনি শাম দেশে পৌছেন। শায়খ ইবন আবু আসরুমকে কাযী নিযুক্ত করেন। ইনি সানজার, নসীবীন এবং খাবুরে তার সঙ্গে ছিলেন। এরপর ইবন আবু আশরুমকে স্থলাভিষিক্ত এবং নবাব নিযুক্ত করেন।

এ বছর সালাহউদ্দীন মিশরের কাযীদের পদচ্যুত করেন। কারণ, তারা সকলেই ছিল শিয়া। সেখানে সদরুদ্দীন ইবন আবদুল মালিক ইবন দরবাস আল মারদানী আল শাফেয়ীকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। আর তিনি সকল ক্ষেত্রে শাফেয়ী কাযী নিযুক্ত করেন এবং শাফেয়ীদের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মালেকী মাযহাবের লোকদের জন্যও অপর একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র তকিউদ্দীন ওমর একটি গ্রহ ক্রয় করেন, যা 'মানাজিল

আল ইয' তথা মর্যাদার গৃহ নামে পরিচিত ছিল। সেখানে তিনি একটি শাফেয়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদরাসার জন্য আল রওজাকে ওয়াকফ্ করে দেন। সালাহউদ্দিন নগরীর প্রাচীর নির্মাণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার জন্যও তিনি প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রজাদের অনেক হিত সাধন করেন। অতঃপর, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে সাওয়ার হয়ে ছুটে যান খ্রিষ্টানদের নগরের পানে, আসকালান গাজা অঞ্চলে। সেখানে আইলায় খ্রিষ্টানদের দুর্গ ধ্বংস করেন এবং অনেককে হত্যা করেন। শামদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পরিজনের সঙ্গে দেখা করেন এবং দীর্ঘ বিরতির পর তাদের সঙ্গে মিলিত হন। এ বছর সালাহউদ্দীন আজানের মধ্যে হাইয়া আলা খাইরিল আমল বাদ দেন। ইতিপূর্বে মিশরে এর প্রচলন ছিল। আর মিশরের মিম্বরে বনূ আব্বাসের জন্য খুতবার প্রচলন করেন। এ বছর যারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন,

কাহের ইবন মুহাম্মদ ইবন তাহের : ইনি আবূ যুরআ, মূলত তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের লোক। জন্মসূত্রে আল রাযী এবং বনবাসের দিক দিয়ে আল হামদানী। ৪৮১ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। তার পিতা ছিলেন হাফেজ মোহাম্মদ ইবন তাহের ইবন আল কাসীর। ইনি ছিলেন মুসনায়ে ইমাম শাফেয়ীর রেওয়াতকারীদের অন্যতম। রবিউল আখের মাসের ৭ তারিখ বুধবার হামাদানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর।

ইউসুফ আল কাযী : আবুল হাজ্জাজ, মিশরের দিওয়ানে ইনশার কর্মকর্তা। তিনি এ বিষয়ে শায়খ কাযী এবং দক্ষ ব্যক্তি। এটাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এতে তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর তার পরিবার পরিজনের প্রতি খলীফা অনেক অনুগ্রহ করেন।

ইউসুফ ইবনুল খলীফা : ইনি হলেন আল মুসতানজিদ বিল্লাহ ইবনুল মুকতাফী ইবনুল মুসতাযহির। তার জীবনী এবং ইন্তিকাল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার মৃত্যুর কয়েক মাস পর তার চাচা আবু নসর ইবনুল মুসতাযহির মৃত্যু বরণ করেন। তারপর মুসতাযহিরের আর কোনো সন্তান অবশিষ্ট থাকলো না। এ বছর জ্বিলকদ মাসের ২৮ তারিখ মঙ্গলবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী ৫৬৭ সনের ঘটনাবলী

এ হিজরী সনে মিশরের শাসনকর্তা আল আযীদ মৃত্যুবরণ করেন। বছরের প্রথম শুক্রবার তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর সালাহউদ্দীন মিশরে বনূ আব্বাসের নামে দ্বিতীয় শুক্রবার খোতবা পাঠের নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল উৎসব ও আনন্দের। বাদশা নুরুদ্দীনের নিকট এই খবর পৌঁছলে তিনি ইবনে আবূ আসরুম শিহাব উদ্দিন আবুল মালিক মারফত খলীফাকে পয়গাম পাঠান, তিনি যেন তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। ফলে বাগদাদকে সজ্জিত করা হয় এবং হাট-বাজার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং স্থানে স্থানে তাবু খাটানো হয় এবং মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হয়। আব্বাসী খলীফা মুতী-এর শাসনামলে ৩৫৯ হিজরীতে বনূ আব্বাসের নামে মিশরে খোতবা দান বন্ধ করা হয়। আর এ কাজ করা হয় এমন সময়, যখন শিশরে ফাতেমী খলীফা আল মুইয়িশ ক্ষমতাসীন হন। ইনি ছিলেন কায়রো নগরীর স্থপতি। তখন থেকে বর্তমান

সময় পর্যন্ত তাদের নামে খোতবা পাঠ রহিত ছিল। এর মুদ্দত ছিল ২৮০ বছর। ইবনুল জাওযী বলেন, এ বিষয়ে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি এবং গ্রন্থটির নামকরণ করেছি 'আন নছর আলা মিশর' বা মিশরের প্রতি সাহায্য।

উবাইদিদের শেষ খলীফা আল আযীদের মৃত্যু : অভিধানে আল আযী-এর অর্থ কর্তনকারী। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, 'লা ফুউজাদুল সাজারহা' অর্থাৎ তার বৃক্ষ কাটা হবে না। অথচ তার মধ্যেই তাদের শাসন কর্তৃত্বের অবসান হয়। তার নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত ছিল আবূ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল হাফিজ ইবনুল মুসতানসীর ইবনুল হাকীম ইবনুল আযীয ইবনুল মুইয ইবনুল মানসুর আল কাহেরী। আবুল গানাইম ইবনুল মাহদী ছিল তাদের প্রথম ব্যক্তি। ৫৪৬ হিজরী সনে আল আযীদের জন্ম। তিনি একুশ বছর বেঁচে ছিলেন। তার চরিত্র ছিল কলংকিত। সে ছিল খাবীস শিয়া। শক্তি থাকলে সে আহলে সুন্নাহর সকলকে হত্যা করত। ঘটনাচক্রে যখন সালাহউদ্দীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে নুরুদ্দীনের নির্দেশ অনুযায়ী বনূ আব্বাসের নামে খোতবা পাঠের নির্দেশ দেয়। আর তা এভাবেই হয় যে, খলীফা নুরুদ্দীনকে এ ব্যাপারে ফরমান পাঠায় এবং মৃত্যুর পূর্বে সে তাকে তিরস্কার করে। আর এ সময় আল মুসতানজিদ মৃত্যুর মুখোমুখি ছিল। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র খলীফা হয়। ফলে মিশরে তার নামে খোতবা পঠিত হয়। এরপর আল আযীদ অসুস্থ হয় এবং আশুরার দিন তার মৃত্যু হয়। বরং সালাহউদ্দীন তার জানাজা এবং শোক সভায় উপস্থিত হন। তার জন্য কান্নাকাটি করেন, শোক প্রকাশ করেন এবং তার পক্ষ থেকে অনেক দুঃখ প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন খলীফার নির্দেশের অনুগত। আর আল আযীদ ছিলেন ভদ্র এবং দানশীল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তার মৃত্যুর পর সালাহউদ্দীন প্রাসাদের সবকিছুর অধিকারী হয় এবং তিনি আল আযীদের পরিবারের লোকজনকে অন্যত্র স্থানান্তর করেন। স্থানটি আগেই তার জন্য নির্মাণ করে রাখা হয় এবং তাদের খোরপোশ এবং ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। এটা করা হয় খেলাফত হারানোর বিনিময়ে। মিশরে বনূ আব্বাসের নামে আল আযীদের মৃত্যুর পূর্বে খোতবা জারী করার জন্য সালাহউদ্দীন লজ্জিত ছিলেন। তিনি এজন্যও লজ্জিত ছিলেন, যে, তার মৃত্যু পরবর্তীকাল পর্যন্ত কেন তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেননি। কিন্তু এটা ছিল বিধির বিধান। এ প্রসঙ্গে আল ইমাত দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন–

توفى العاضد الدعى فما * يفتح ذو بدعة بمصر فما
وعصر فرعونها انقضى وغدا * يوسفها فى الأمور محتكما
قد طفئت جمرة الغواة وقد * داخ من الشرك كل ما اضطرما
وصار شمل الصلاح ملتئما * بها. وعقد السداد منتظما
لما غدا مشعرا شعار بنى الـ * ـعباس حقا والباطل اكتتما
وبات داعى التوحيد منتظرا * ومن دعاة الأشراك منتقما
وظل أهل الضلال فى ظلل * داجية من غباثة وعمى
وارتكس الجاهلون فى ظلم * لما أضاءت منابر العلما

وعاد بالمستضيء معتليا * بناء حق بعد ما كان منهدما
أعيدت الدولة التي اصطهدت * وانتصر الدين بعدما اهتضما
واهتز عطف الإسلام من جلل * وافتر ثغر الإسلام وابتسما
واستبشرت أوجه الهدى فرحا * فليقرع الكفر سنه ندما
عاد حريم الأعداء منتهك الـ * حمى، وفي الطغاة منقسما
قصور أهل القصور أخربها * عامر بيت من الكمال سما
ألاعج بعد السكوت ساكنها * ومات ذلا وأنفه رغما

“বিদআতই আল আযীদের পতনের কারণ, মিশরে তারা আর মুখ খুলতে পারবে না।

মিশরে ফেরাউনের যুগ শেষ হয়েছে, আর ইউসুফ হয়েছে মিশরের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী।

বিভ্রান্তদের স্ফুলিঙ্গের নির্বাপিত হয়েছে, আর মাটিতে দাফন হয়েছে শিরকের বীজ।

আর সেখানে উত্থান হয়েছে সালাহউদ্দীনের দলের এবং গাথা হয়েছে সততার মালা।

যখন উত্থান হয় বনূ আব্বাসের নমুনার তখন অন্তর্ধান হয় বাতিলের।

সে তাওহীদের আহ্বানকারীর অপেক্ষায় ছিল, আর শিরকের ধ্বজাধারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে রাত অতিবাহিত হয়েছে।

আর বিভ্রান্তরা অন্ধকারে রাত অতিবাহিত করেছে এবং তাদের দিনও অতিক্রান্ত হয়েছে বিভ্রান্তিতে।

আলিমদের মিম্বর যখন আলোকিত হয়, তখন জাহিলরা অন্ধকারে পালিয়ে যায়।

আর আল মুসতাযীর মাধমে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে। ইতিপূর্বে স্তব্ধ ছিল যে আওয়াজ।

যে কর্তৃত্ব পরাভূত হয়ে পড়েছিল, পুনরায় তার উত্থান ঘটেছে। আর বিলুপ্ত হওয়ার পর দ্বীনের পুনরুত্থান হয়েছে।

চমকে উঠেছে ইসলামের বাহু শৌর্য-বীর্য নিয়ে।

আর হেসে উঠেছে ইসলামের দাঁত পরম হাসিতে।

আনন্দে চকচক করছে হিদায়াতের চেহারা। আর কুফরী লজ্জায় দাঁত কাটছে।

দুশমনের সমর্থকদের পতন হয়েছে পুনরায়। আর তা বন্টিত হয়েছে বিদ্রোহীদের মাঝে।

আর তা ধ্বংস করেছে অপরাধীদের প্রাসাদ। আর আবাদ করেছে পূণ্যার্থীদের নিবাস।

সে ঘরের বাসিন্দারা নীরব থাকার পর জেগে উঠেছে। আর মৃত্যুবরণ করেছে যিল্লতির সাথে এবং তার নাক হয়েছে কলংকিত।”

আর বাগদাদে যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হয় তাতে খলীফা আল মুসতানযীকে মিশর এবং তার আশপাশে তার খুতবার সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়,

ليهنيك يا مولاى فتح تتابعت * إليك به خوض الركائب توجف
أخذت به مصرا وقد حال دونها * من الشرك يأس فى لها الحق يقذف
فعادت بحمد الله باسم إمامنا * تتيه على كل البلاد وتشرف
ولا غرو إن ذلت ليوسف مصره * وكانت إلى عليهائه تتشوف
فشابهه خلقا وخلقا وعفة * وكل عن الرحمن فى اللأرض يخلف
كشفت بها عن ال هاشم سبة * وعارا أبى إلا بسيفك يكشف

"হে আমার প্রভু! বিজয়ের জন্য তোমাকে অভিনন্দন, যার কারণে আরোহী দ্রুত ছুটে আসে তোমার দিকে।

সে বিজয়ের মাধ্যমে তুমি মিশর অধিকার করতে পেরেছ। অথচ এর বাহিরে শিরকের কারণে হতাশা প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল এবং তথায় সত্য প্রত্যাখ্যাত হত।

প্রশংসা আল্লাহর, সেখানে পুনরায় আমাদের ইমামের নাম ফিরে এসেছে এবং তা সমস্ত নগরীর উপর গর্ব করে।

ইউসুফের জন্য তার শহর অনুগত হলে এত অবাক হবার কিছুই নেই। আর তাতো তাকায় কেবল উর্দ্ধলোকে।"

সুতরাং এটা দেখতে শুনতে, স্বভাব-চরিত্রে এবং পবিত্রতায় তাঁরই মত। আর পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আর তুমি সেখান থেকে দূর করেছ হাশেম বংশের লজ্জা। আর তোমার তরবারী ছাড়া তা দূরে যেতে অস্বীকার করে। আবু শামাহ 'আল রওযাতাই' গ্রন্থে এ কবিতা উল্লেখ করেছেন। আর তা আরো অনেক দীর্ঘ। আর তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, উজীর আবুল ফাজায়েল হোসাইন ইবন মোহাম্মদ বারাকাত খলীফার মৃত্যুর আগে স্বপ্নে দেখার পর, খলীফাকে এ কবিতা শোনান। এ কবিতার দ্বিতীয় ইউসুফ দ্বারা আল মুসতানজিদকে বুঝানো হয়েছে। আর ইবনুল জাওযী ও অনুরূপ বর্ণনা করেন যে, এই কাসীদা আল মুসতানজিদের জীবদ্দশায় তাঁকে শোনানো হয় এবং সেখানে কেবল তার পুত্র আল মুসতানযীর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। আর মালিক নাসের সালাউদ্দীন ইবন ইউসুফ ইবন আইউবের সাথে আলোচনা শুরু হয়। আর খলীফা যখন মিশরে তার নামে খুতবা পাঠের সুসংবাদ লাভ করেন, তখন তিনি বাদশাহ নুরুদ্দীনের নিকট সম্মানসূচক বার্তা পাঠান। অনুরূপভাবে দিআরে মিশরে বাদশাহ সালাউদ্দীনকেও পয়গাম পাঠান। এর সঙ্গে ছিল কৃষ্ণপ্রতি এবং প্রচলিত পতাকা। সিরিয়া এবং মিশরের মসজিদগুলোতেও খুতবা পাঠ করা হয়। ইবনু আবু তায়ী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রাষ্ট্র সুসংহত করা এবং খুতবা জারী করা আর শোক জ্ঞাপন থেকে অবসর হয়ে সালাহউদ্দীন উভয় প্রাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেখানে তিনি অনেক দ্রব্য-সম্ভার, অস্ত্র-শস্ত্র, পরিধেয় বস্তু, উত্তম বিছানাপত্র এবং আরো অনেক মূল্যবান বস্তু লাভ করেন। এছাড়া আরো অনেক অবাক হওয়ার মত বস্তু পান। এসবের মধ্যে ছিল সাতশত বিরল মনিমুক্তা এবং জমরুদ পাথরের ছড়ি, যার দৈর্ঘ্য ছিল এক বিঘত এবং পুরু ছিল আঙ্গুলের সমান এবং ইয়াকুত পাথরের একটি রশি এবং মূল্যবান পাথরের তৈরি একটি

বড় পাত্র। এবং কাওলাঞ্জের তৈরি একটি তবলা। এই তবলার একপাশে আঘাত করা হলে অপর পাশ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস বের হত এবং কেউ তার নিকটে এলে দুর্গন্ধের কারণে দূরে সরে যেত। একদা জনৈক কুর্দি আমীর তা হাতে নেন, তিনি জানতেন না যে এর কাজ কি। তিনি এর উপর আঘাত করলে তা বায়ু নির্গত করে। ফলে তিনি তা মাটির উপর ছুড়ে মারেন এবং তা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। আর জামরুদ পাথরের ছুরিটি সালাহউদ্দীন ভেঙ্গে তিন টুকরো করে তার স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। অনেক জিনিস তিনি আমীরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এসব দ্রব্যের মধ্যে ছিল বালখাশ, ইয়াকুত, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং আরো নানান জাতের দ্রব্যসামগ্রী। এরপরও যেগুলো ছিল সেগুলো বিক্রি করে দেন এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা তার কাছে আগমন করে। যেসব দ্রব্য সম্ভার সেখানে অবশিষ্ট ছিল। তা প্রায় দশ বছল ধরে বিক্রি হয়। বাগদাদ খলীফার আর এক বড় হাতির মূর্তি মাদী গাধার মূর্তি অন্যান্য হাদিয়ার সঙ্গে খলীফার নিকট প্রেরণ করা হয়। ইবনু আবু তাজী বলেন, এমন একটা লাইব্রেরী ও পাওয়া যায়, মুসলিম বিশ্বে যার কোনো তুলনা ছিল না। এ লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি। তিনি আরও বলেন, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সে লাইব্রেরীতে 'তারীখে তাবারী'র ১২২০টি সংখ্যা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল ইমাদ আল কাতীব বলেন, গ্রন্থের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার। আর ইবনুল আমীর বলেন, সে লাইব্রেরীতে হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি ছিল ১ লাখ। কাজী ফাযিল এ লাইব্রেরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি সেখান থেকে অনেক গ্রন্থ বাছাই করে নিয়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি উত্তরা প্রাসাদ আমীরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তিনি তাঁর পিতা নাজমুদ্দীন আইউবকে একটি বড় প্রাসাদে অবস্থান করতে দেন, যা খালিদ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এ প্রাসাদের নাম ছিল লুলুয়া। এখানে ছিল কাফুরীর বাগান এবং অধিকাংশ আমীরদেরকে তিনি এমন সব ঘরে বসবাস করতে দেন, যা ফাতেমীদের নামে উৎসর্গ ছিল। আর তুর্কীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন তাদের হস্তগত হত, যারা সেখানে বড় লোক ছিল, তখন তাদের কাপড় খুলে নেয়া হত এবং বাড়ি-ঘর লুটপাট করা হত। শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকেই শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে তারা অনেকেই বন্দীর জীবন-যাপন করে। আর ফাতেমীদের শাসনকালের মেয়াদ ছিল ২৮০ বছরের কিছু বেশি।[১] অবশেষে তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেন পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বই ছিল না। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বাদশাহ হন, তিনি হলেন আল মাহদী। ইনি ছিলেন সালমিয়া অঞ্চলের কর্মকার। তার নাম ছিল ওবায়েদ। সে ছিল ইয়াহুদী। বেলাদে মাগরিবে প্রবেশ করে সে ওবায়দুল্লাহ নাম ধারণ করে এবং সে দাবী করে যে ফাতেমী আলবী বংশের সে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার নিজের সম্পর্কে সে বলে যে, সে একজন মেহদী। বেশ কিছু আলেম এবং ইমাম ৪০০ হিজরীর পর তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি মোটকথা এই ধড়িবাজ, প্রতারক ব্যক্তিটি এইসব শহরে যে প্রপাগান্ডা চালায়, তা সেখানে খ্যাতি লাভ করে এবং একদল অজ্ঞ-মূর্খ লোক তাকে সহযোগিতা করলে তার অনেক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হস্তগত হয়। অতঃপর সে নিজ নামে

---

১. তারিকুল কামীল (১১/৩৭০)-এর মতে ২৭২ বছর কয়েক মাস।

একটা নগর প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। যার নাম দেওয়া হয় 'আল মাহদিয়া'। আর সে একজন আনুগত্য ও সমর্থন পুষ্ট বাদশাহ বনে বসে। নিজেকে রাফেযী বলে যাহির করলেও আসলে সে ছিল একজন নির্ভেজাল কাফির। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আল কায়েম মোহাম্মদ বাদশাহ হয়। তার পরে তার পুত্র আল মনসুর ইসমাঈল। তারপর তার পুত্র আল মুইয়িজ মুইয়িদ বাদশাহ হয়। এই সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে দিআরে মিসরে প্রবেশ করে এবং তার জন্য আল কাহেরা আল মুইযজিয়া নির্মাণ করা হয় এবং দুটি প্রাসাদও নির্মাণ করা হয়। তারপর তার পুত্র হলে আল-আজিজ নিযার এবং তারপর তার পুত্র আল হাকীম মনসুর। অতঃপর তার পুত্র আয যাহির আলী। অতপর তার পুত্র আল মুসতানসীর মুইদ। অতঃপর তার পুত্র আল মুস্তালী আহমদ, অতঃপর তার পুত্র আল আমর মনসুর, অতঃপর তার পুত্র আল যাহির ইসমাঈল, অতঃপর আল ফায়ইজ ঈসা, অতঃপর তার চাচাত ভাই আল-আজিজ আবদুল্লাহ। এ ছিল ফাতেমী বংশের শেষ শাসন। মোট্ ১৪ জন বাদশাহ এবং তাদের শাসনকাল ২৮০ বছরের কিছু বেশি। অনুরূপভাবে বনূ উমাইয়া খলীফাদের সংখ্যাও ১৪ জন। কিন্তু তাদের শাসনকাল ছিল ৮০ বছরের কিছু বেশি। বাগদাদে বনূ আব্বাসের শাসনকাল অবসান প্রসঙ্গে এসব শাসকদের নাম-ধাম আমি কবিতার মাধ্যমে উল্লেখ করেছি। বাগদাদের আব্বাসীয়দের শাসনকালের অবসান হয় হিজরী ৫৫৬ সনে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। ফাতেমীর শাসনকর্তারা ছিল ধন-সম্পত্তির বিবেচনায় খলীফাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। এছাড়াও খলীফাদের মধ্যে তারা ছিল সবচেয়ে জালিম এবং নিষ্ঠুর এবং চরিত্রের দিক থেকে তারা ছিল বাদশাহদের মধ্যে সবচেয়ে অপবিত্র। আর মন-মানসিকতার দিক থেকে তারা ছিল সবচেয়ে 'খাবীস'। তাদের শাসনামলে বিদআত অপকর্মের বিস্তার ঘটে এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। সৎ-সাধু এবং পুতঃপবিত্র চরিত্রের আলেম-ওলামারা তাদের কাছে কম গমন করেন। সিরিয়া অঞ্চলে দরজিয়া এবং হাশিশিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ফিরিঙ্গীরা প্রভাব বিস্তার করে শাম দেশের সীমান্ত অঞ্চলে। এমন কি তারা বায়তুল মুকাদ্দস, আজলুন, শাবলুস, ঘোর, গাজা এবং আসকালান অঞ্চল অধিকার করে নেয়। এছাড়াও তারা অধিকার করে নেয়, কারাখ আশশাবিক, তাবরিয়া, বানিয়াস, সুর, এক্কা, সায়দা, বৈরুত, সাফাদ, তারাবলিস, ইনতাকিয়া এবং আশ পাশের গোটা অঞ্চল থেকে শুরু করে ইয়াস এবং শিশ নগর পর্যন্ত। তারা আমত, রাহা এবং রাসূর, আঈনসহ বিভিন্ন নগরী অধিকার করে নেয়। তারা মুসলিম উম্মাহর কতলোককে হত্যা করেছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শুমার করতে পারবে না। মুসলিম নারী এবং শিশুদের মধ্যে কত জনকে তারা বন্দী করে তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। এই সব শহর, জনপদ সাহাবায়ে কিরাম জয় করেন এবং তা ছিল দারুল ইসলাম। মুসলমানদের লুণ্ঠিত ধন সম্পদেরও কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তারা দামিশক অধিকার করার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। তাদের সময় ফুরিয়ে এলে আল্লাহ তা'আলা নিজ ক্ষমতা ও দয়ার গুণে এসব অঞ্চল পুনরায় মুসলমানদের নিকট ফেরত দেন। এ সম্পর্কে কবি আল কালা নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

أصبح الملك بعد ال على * مشرقا بالملوك من ال شادى

وغدا الشرق يحسد لغر * ب للقوم فمصر تزهو على بغداد

ما حووها إلا بعزم وحزم * وصليل الفولاذ فى الأكباد

لا كفرعون والعزيز ومن * كان بها كالخطيب والأستاد

"আল আলীর পর আলে শাদির বাদশাহদের শাসনের মাধ্যমে রাজত্ব উজ্জ্বল রূপ লাভ করে।

প্রাচ্য ঈর্ষা করা শুরু করে প্রতিচ্যকে। আর মিশর গর্ব করে বাগদাদের উপর।

তারা এসব অধিকার করে নেয় দৃঢ় সংকল্প আর ধৈর্য্যের দ্বারা এবং চিত্তের অটুট শক্তির ঝংকারে।

ফিরআউন এবং আজিজ-এর মত নয়, আর তাদের মতও নয়, যারা সেখানে ছিল খতীব এবং ওস্তাদ।

আবু শামাহ বলেন, ওস্তাদ অর্থ আখশীদী বা আলো। আর 'আলে-আলী' অর্থ ফাতেমী শাসক, যারা এমন দাবি করত, অথচ তারা ফাতেমী ছিল না। তারা ওবায়েদের বংশধর বলে দাবি করত। আর তার নাম ছিল সাঈদ। আর সে ছিল সালামিয়া অঞ্চলের কর্মকার এক ইয়াহুদী। অতঃপর ফাতেমীদের সম্পর্কে তিনি ইমামদের উক্তি উল্লেখ করেন এবং তাদের নসব সম্পর্কে অভিযুক্ত করেন; যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি আরো বলেন, দামিশকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আবদুল রহমান ইবন ইলিয়াসের আলোচনা থেকে আমি এসব কথা সংগ্রহ করেছি। এরপর 'আর রাওজাতাইন' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরো অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। আর রাওজাতাইন গ্রন্থে তাদের পংকিলতা বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি কথা উল্লেখ করেছেন। যা উল্লেখ করা কখনও কখনও কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে। এ বিষয়ের অনেক কথা তাদের জীবনীর আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ শামাহ আরো বলেন, এ বিষয়ে আমি একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। যার নামকরণ করেছি 'বানূ ওবায়েদদের কুফরী, মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত উন্মোচন'

كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد

এছাড়া আলিম সমাজ তাদের প্রতিবাদে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাযী আবু বকর আল বাকীল্লানীর রচিত গ্রন্থ। যে গ্রন্থের তিনি নামকরণ করেছেন 'কাশফুল আসরার ওয়া হাদফুল আসতার"

كشف الأسرار وهتك الأستار

অর্থাৎ রহস্য উন্মোচন ও পর্দাভেদ। বনূ আইউব মিশরে যা করেছে, তার প্রশংসা করে জনৈক কবি বেশ চমৎকার বলেছেন,

ايدتم من بلى دولة الكفر من * بنى عبيد بمصر إن هذا هو الفضل

زنادقة، شيعية، باطنية * مجوس وما فى الصالحين لهم أصل

يسرون كفرا، يظهرون تشيعا * ليستروا سابور عمهم الجهل

"তোমরা মিশর থেকে বনূ ওবায়দের কাফির শাসন দূর করেছ। এটা একটা নিশ্চিত গুণ বটে তারা ছিল যিনদিত, শিয়া, বাতেনীয়া এবং মজুস।

ভাল লোকদের মধ্যে তাদের কোনো শিকড় নাই।

তারা কুফরীকে লুকায় শিয়া বলে প্রচার করে, যাতে সাবূর লুকাতে পারে, অজ্ঞতা তাদের ঘাড়ে চেপেছে।

হিজরী সনে বাদশাহ সালাহউদ্দীন মিশরবাসীদের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করেন এবং এই বছর সফর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার জুমার দিন নামাজ শেষে জনসমক্ষে সরকারি ঘোষণা পাঠ করে শোনানো হয়। আর একই বছর নুরুদ্দীন এবং সালাহউদ্দীন এর মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে, এই বছর নুরুদ্দীন উপকূলীয় অঞ্চলে খ্রিষ্টান দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তার উপর বেশ দুর্যোগ পতিত হয়। আর তার সম্পর্কে তাদের মনে ক্ষোভ এবং ভীতির সঞ্চার হয়। এরপর তিনি আল কারক অঞ্চল অবরোধ করার সংকল্প করেন এবং তিনি সালাহউদ্দীনকে লিখেন, শির থেকে সৈন্য নিয়ে আল কারক অঞ্চলে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। যাতে তারা উভয়ে তথায় মিলিথ হয়ে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিস্ট বিষয়ে আলোচনা করে ঐক্যমতে উপনীত হতে পারে। কিন্তু সালাহউদ্দীন ভিন্ন চিন্তা করলেন। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন যে, এতে করে মিশরে তার প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হবে। এতদসত্ত্বেও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আদেশ পালনার্থে তিনি বেরিয়ে পড়েন। কয়েকদিন সফর করার পর বাহনের স্বল্পতার অজুহাতে তিনি ফিরে যান। তার আরও আশংকা ছিল যে, তিনি মিশর থেকে দূরে গমন করার পর, সে সম্পর্কে গাফেল হওয়ার সুযোগে তার প্রশাসনিক বিষয়ে ত্রুটি দেখা দেবে। তাই তিনি নুরুদ্দীনের নিকট অক্ষমতা জ্ঞাপন করে বার্তা প্রেরণ করে। এতে তার মনে বিদ্বেষ-ভাব জন্ম নেয় এবং তিনি ক্রুদ্ধ হন। আর তিনি মিশরে প্রবেশ কের সালাহউদ্দীন থেকে দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়ে অপর কাউকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সংকল্প করেন। সালাহউদ্দীন যখন এ সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তার মন সংকুচিত হয়ে পড়ে। তিনি আমীর উমারাদের উপস্থিতিতে বিষয়টা আলোচনা করলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাকীউদ্দীন উমর তৎক্ষণাৎ বলেন, আল্লাহর কসম! নুরুদ্দীন আমাদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে আমরা অবশ্যই তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। এতে সালাহউদ্দীনের পিতা নাজমুদ্দীন আইউব গাল-মন্দ করে তাকে চুপ করান। পরে তিনি পুত্রকে বলেন, আমি তোমাকে যা বলছি, তা তুমি শ্রবণ কর, আল্লাহর কসম! এখানে আমি এবং তোমার মামা শিহাবউদ্দীন আল হাশেমীর চেয়ে তোমার প্রতি বেশি দয়ালু আর কেউ নেই। আর নুরুদ্দীনকে আমরা দেখতে পেলে আমরা দ্রুত তার পানে ছুটে যাব এবং তার সামনে মৃত্তিকা চুম্বন করব। অন্যান্য আমীর এবং সৈন্যরাও তাই করবে। আর যদি তিনি আমার নিকট লিখেন যে, কারো সঙ্গে তোমাকে তার কাছে প্রেরণ করব। তাহলে আমিও তাই করব। এরপর সেখানে যারা ছিল, তাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর পুত্রের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়ে তাকে বলেন, তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। এদের সামনে তুমি এরকম কথা বলছ? উমর এ ধরনের কথা বলছে এবং তার সমালোচনা করছে। সুতরাং তোমার দিকে ছুটে এসে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং আমাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা ছাড়া নুরুদ্দীনের আর কোনো বড় কাজ অবশিষ্ট নেই। নুরুদ্দীন যদি সৈন্যদের সকলকে দেখতে পান, তবে তাদের কেউ আর তোমার সঙ্গে থাকবে না। সকলেই তার দিকে

ছুটে যাবে। কাজেই তুমি তার নিকট পয়গাম পাঠাও এবং তার সঙ্গে কোমল আচরণ কর এবং বল আমাদের প্রভু শাসনকর্তার কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার? মিনযাব বা জামালকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, আমি তার সঙ্গে আপনার সামনে উপস্থি হব। তিনি তাই করলেন। এ ধরনের কথা-বার্তা শ্রবণ করে নুরুদ্দীনের মন গলে যায় এবং তার ইচ্ছা পরিবর্তন হয়। আর তিনি সাহস হারা হয়ে যান এবং তিনি অন্য কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন। আর আল্লাহর ইচ্ছাতো অবধারিত হয়ে আছে।

এ বছর নুরুদ্দীন ডাক পরিবহনের জন্য কবুতর প্রস্তুত করেন। কারণ, তার রাজত্ব অনেক বিস্তার লাভ করেছিল। আর 'নাওবা' অঞ্চল থেকে 'হামদান' পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের তিনি বাদশাহ ছিলেন। মধ্যখানে কেবল খ্রিষ্টানদের অঞ্চল ছিল। সকলেই ছিল তার নিকট পদানত এবং চুক্তিবদ্ধ। এ কারণে তিনি প্রতিটি দুর্গের জন্য কবুতর প্রস্তুত করেন। যারা দ্রুততম সময়ে পত্র পরিবহন করে নিয়ে যেত এবং খুব সহজেই এ কাজ করত। এ প্রসঙ্গে কাযী ফাযিল কি চমৎকার কথা বলেছেন, কবুতর হল দেশের ফিরিশতা। আর ইমাদ আল কাতিব বিষয়টা আরো দীর্ঘ করেছেন এবং তিনি অনেক রোমঞ্চকর কথা বলেছেন।

এ হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন,

আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ : ইনি হলেন ইবন আহমদ ইবন আহমদ আবূ মোহাম্মদ ইবনুল খাসসাব। তিনি কুরআন পাঠ শিখেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন এবং আরবি ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফলে এ বিষয়ে তৎকালে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সকলের ওস্তাদ। তিনি আবদুল কাহের জুরযানী রচিত জুম্মাল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি ছিলেন সৎ এবং ইবাদাত গুজার ব্যক্তি। আরবি ব্যাকরণবিদদের মধ্যে এমন লোক বিরল। এ বছর শাবান মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং ইমাম আহমদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করেছেন এবং আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। তবে তিনি আমাকে এবং এক দল আলিমকে ছেড়ে দিয়েছেন, যারা কাজ বাদ দিয়ে কথা নিয়ে মত্ত থাকে। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বলেন, পানাহার এবং পরিধানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কারোই তিনি পরোয়া করতেন না।

মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ : ইনি হলেন আবুল মুজাফ্ফর আল দাবী ইমাম গাজ্জালীর শিষ্য। তিনি মোহম্মমদ ইবন ইয়াহহিয়ার নিকট ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মুনাজারা করতেন এবং বাগদাদে ওয়াজ করতেন। আশআরী মতবাদ প্রচার করতেন এবং হাম্বলীদের সঙ্গে তর্ক করতেন। তিনি এ বছর রমজান মাসে ইন্তিকাল করেন।

নাসির ইবনুল জাওলী আল সূফী : তিনি হাদীসের সন্ধানে নগ্ন পদে সফর করতেন। বাগদাদে তার ইন্তিকাল হয়। আবু শামা বলেন, এই হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

নাসরুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ তিনি আবূল ফতূহ আল ইসকান্দারী ইবনে কবীর ইবনে কালাকিস নামে পরিচিত। ইনি ছিলেন ইযাব অঞ্চলের কবি। তিনি ৪৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শায়খ আবূ বকর ইয়াহইয়াহ ইবন সাদুন আল কুরতবী, যিনি মুসেল অঞ্চলে

মেহমানদারীতে খ্যাত ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ আরবি বৈকরণিক ছিলেন, তিনি বলেন, এ বছর সালাহউদ্দীনের দুই পুত্র আল আযীয এবং আল জাহীর জন্ম লাভ করে এবং আর মানসুর মোহাম্মদ ইবন তকীউদ্দিন উমর জন্মগ্রহণ করে।

হিজরী ৫৬৮ সনের ঘটনাবলী

এ বছর নূরুদ্দীন সালাহউদ্দীনের নিকট বার্তা প্রেরণ করে। বাহক ছিল আল মুনাফিক খালিদ ইবনুল কায়সাররানী। এই বার্তা ছিল মিশরীয় অঞ্চলের হিসাব নিষ্পন্ন করার জন্য। কারণ, নূরুদ্দীনের নিকট আল আযীদের কোষাগার থেকে যে হাদিয়া প্রেরণ করা হয়, তিনি তাকে স্বল্প মনে করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রতি বছর যেন মিশরীয় অঞ্চলে কর নির্ধারণ করা হয়। এ বছর সালাহউদ্দীন আল কার্লক এবং আল শাবিক অঞ্চল অবরোধ করেন। ফলে জনগণ বেশ সংকটে পড়ে এবং অত্র অঞ্চলের অনেক স্থান ধ্বংস করা হয়। কিন্তু এ বছর অভিযানে তিনি সফল হতে পারেননি। আর এ বছর খ্রিষ্টানরা 'যারা' অঞ্চলের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় সমাগত হয় এবং সেখান থেকে সামাসকীন অঞ্চলে উপনীত হয়। তখন নূরুদ্দীন তাদের উদ্দেশ্যে বের হলে তারা সেখান থেকে 'ঘোড় অঞ্চলে পলায়ন করে। পরে সেখান থেকে 'সাওয়াত' এবং সেখান থেকে 'শালালা' অঞ্চলে পালিয়ে যায়। তখন সে তাববীয়া অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করে। সেখানে তারা লংকা-কাণ্ড ঘটায়। লোকজনকে হত্যা এবং বন্দী করে অনেক গণিমতের মাল নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। আর খ্রিষ্টানরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। একই বছর সুলতান সালাহউদ্দিন তার ভাই শামসুদদৌলা নূর শাহকে 'নাওবা' অঞ্চলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলে তিনি তা জয় করেন এবং তথাকার ইবরীম নামক দূর্গের উপর অধিকার বিস্তার করেন। তিনি যখন দেখতে পান যে, এটা একটা ক্ষুদ্র শহর। এখান থেকে কোনো লাভ হবে না এবং এখানে পরিশ্রম করে খরচও পোষাবে না, তখন তিনি সেখানে অর্থাৎ উপরোক্ত দূর্গে ইবরাহীম নামে জনৈক কুর্দিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং তাকে সে দূর্গের প্রধানের দায়িত্ব দেন। এ সময় দল বেকার কুর্দি তাদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারা সেখান থেকে প্রচুর সম্পদ লাভ করে, ফলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

এ হিজরী সনে সালাহউদ্দীনের পিতা আমীর নাজমুদ্দিন আইউব মৃত্যুবরণ করেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয় নিহত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে এবং তার সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। আর এ বছর বাদশাহ নুরুদ্দীন সালজুকীদের অঞ্চল সফর করেন এবং সেখানে যে দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তা দূর করেন। এই সালজুকী অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ইযউদ্দিন কালাজ আরসালান ইবন মাসউদ ইবন কালাজ আরসালান ইবন সুলাইমান সালজুকী। এরপর সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং 'মারআশ' ও 'বাহা' অঞ্চল জয় করেন এবং সেখানে অনেক ভাল কাজ করেন। আর ইমাত বলে, এ বছর বড় ইমাম ও ফকীহ কুতুবউদ্দিন নিশাপুরী আগমন করেন। ইনি ছিলেন তার সময়ের বড় ফকীহ এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তার আগমনে নূরুউদ্দীন খুশি হন এবং তাকে 'হারবে বাবুল' ইরাকে একটা মাদরাসায় অবস্থান করতে দেন। অতঃপর তাকে দামেস্কে আনা হয় এবং সেখানে শায়খ 'নসব আল বাগদাদী' নামে পরিচিত একটা মসজিদের দারসের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি 'জারুক' মাদরাসায় অবস্থান করেন।

এরপর নূরুউদ্দীন মাফেঈদের জন্য একটা বড় মাদরাসার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। কিন্তু এর নির্মাণ কাজ শেষ করার পূর্বেই সে মারা যায়। আবু শামা বলেন, এই মাদরাসাটি হল 'আল আদেলিয়া আল কাবিরা' পরবর্তীকালে ন্যায় পরায়ণ শাসক আবু বকর ইবন আইউব যা নির্মাণ করেন। এ বছরই শিহাবউদ্দিন ইবন আবী আসরুম বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। মিশরীয় অঞ্চলে আব্বসীয়দের নামে খুতবা প্রচলনের ব্যাপারে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। আর 'দারবে হারুম' এবং 'ছারিফিম' অঞ্চল নুরুদ্দিনকে দান করার ব্যাপারে তার কাছে পরওয়ানা ছিল। পূর্ব থেকে এই দুটি অঞ্চল তার পিতা ইমাযউদ্দিন জঙ্গীর জায়গীর হিসাবে ছিল। নুরুদ্দীন বাগদাদে দাজলা নদীর তীরে একটা মাদরাসা নির্মাণ করার ইচ্ছা করেন এবং এ দুটি স্থান তিনি এ মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করতে সংকল্প করেন। কিন্তু নিয়তি তাকে এ থেকে বিরত রাখে। এ বছর খাওয়ারজীম অঞ্চলে সুলতান শাহ এবং তার দুশমনদের মধ্যে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর এবং ইবনুস সাহী এ সব যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর এ বছর আরমান বাদশা মালিক ইবন লাবুন রোম সৈন্যদেরকে পরাভূত করেন এবং তাদের নিকট থেকে অনেক মালেগনীমত লাভ করেন এবং নূরুদ্দীনের নিকট অনেক অর্থ কড়ি প্রেরণ করেন এবং তাদের মধ্যেকার প্রধান তিরিশ জন ব্যক্তির মস্তকও প্রেরণ করেন। নুরুদ্দীন এসব খলীফা আল মুসতাযীর নিকট প্রেরণ করেন। আর এ হিজরী সনে সালাহউদ্দিন মামলূত তকীউদ্দিন ইবন উমর ইবন শাহেনশাহর নেতৃত্বে আফ্রিকার দেশে একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী সেখানে অনেক অঞ্চল জয় করে। এসব অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমে ত্রিপলি এবং এর সাথে আরও কিছু নগরও ছিল। এ হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন,

ইলদাকুস তুর্কী আতাবুকী : ইনি ছিলেন আজারবাইযান এবং অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তা। ইনি ছিলেন সুলতান মাহমুদের উজীর কামাল সামীরানীর দাস। এরপর তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি আজারবাইজান এবং এর আশপাশের অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করেন। ইনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বীর এবং প্রজা বৎসল। হামাদান শহরে তার মৃত্যু হয়।

আমীর নাজমুদ্দিন আবু শাকার আইউব ইবন সাদী : ইনি ছিলেন মারওয়ানের পুত্র। কেউ কেউ মারওয়ানের পর ইবন ইয়াকুব ও যোগ করেছে। অধিকাংশের মতে সাদীর পর তাদের বংশে আর কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মে লাভ করেনি। আর কোনো ব্যক্তি পরিচিতও হয়নি। কেউ কেউ এমন বিস্ময়কর ধারণা পেশ করে যে, এরা হলো বনূ উমাইয়্যার সর্বশেষ খলীফা মারওয়ান ইবন মোহাম্মদের বংশধর। তবে এই ধারণা ঠিক নয়। যিনি এই ধারণা প্রথম পোষণ করেন তিনি হলেন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন তাগতগীন ইবন আইউব ইবন সাদী। যিনি ইবন সাইফুল ইসলাম নামে পরিচিত ছিলেন। পিতার পর তিনি ইয়ামানের বাদশা হন এবং মনে মনে বড় দাবী পোষণ করে এবং খলীফা বলে দাবী করেন এবং আল ইমাম আল হাদী বেনুরুল্লাহ নাম ধারণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেন,

وأنا الهادي الخليفة والذي * أدوس رقاب الغلب بالضمر الجرد

ولا بد من بغداد أطوي ربوعها * وأنشرها نشر الشماس على البرد

وأنصب أعلامى على شرفاتها * وأحيى بها ما كان أسه جدى

ويخطب لى فيها على كل منبر * وأظهر أمر الله فى الغور والنجد

"আমি হলাম আল হাদী খলীফা, যে পদদলিত করে উদ্ধত মস্তককে শীর্ণ অস্ত্র দ্বারা।

আর প্রয়োজন হলো বাগদাদের ঘরগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়া এবং সবকিছুকে ছাতার মতো চাঁদরের উপরে বিছিয়ে দেওয়া। আর তার শীর্ষদেশে স্থাপন করব আমার পতাকা এবং সেখানে পুনর্জীবিত করব এমন কিছু যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আমার দাদা।

আর সেখানকার সকল মিম্বরে আমার নামে খুতবা পাঠ করা হবে এবং উঁচু-নিচু সর্বত্র আমি আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশ করব।"

আর তিনি যে সমস্ত দাবী করেন, তা ঠিক নয়। তার এমন কোনো ভিত্তি নাই যার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় এবং নির্ভর করা যায়। আসল কথা এই যে, আমীর নাজিমুদ্দীন তার ভাই আসাদউদ্দিন কোকো এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। মুসেল অঞ্চলে তার জন্ম হয়। আর আমীর নাজমুদ্দিন ছিলেন বীর বাহাদুর ব্যক্তি। তিনি বাদশা মোহাম্মদ ইবন মালিক শাহের খেদমত করেন। বাদশা তার মধ্যে বিচক্ষণতা এবং আমানতদারী দেখতে পান। এ কারণে তিনি তাকে তিকরিত দূর্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সেখানে শাসনকার্য পরিচালনাকালে তিনি ইনসাফ, সুবিচার করেন। আর তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অতঃপর বাদশাহ মাসউদ উপরোক্ত দূর্গ মুজাহিদউদ্দিন নাহরুযকে জায়গীর হিসাবে দান করেন। তিনি সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। একদা বাদশা ইমাজউদ্দিন জঙ্গি কারাজা আল সাকীর নিকট পরাজিত হয়ে ইমাজউদ্দিন জঙ্গির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি তাকে আশ্রয় দেন এবং তার চূড়ান্ত সেবা-যত্ন করেন এবং তার আঘাতের চিকিৎসা করেন এবং সেখানে তিনি পনের দিন অবস্থান করেন। অতঃপর আপন শহর মুসেলে গমন করেন। এরপর একদা নাজমুদ্দিন আইউব জনৈক খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে দণ্ড দেন এবং তাকে হত্যা করেন। ভিন্ন মতে তার ভাই আসাদউদ্দিন শেরকো তাকে হত্যা করে। এটা ইবন খাল্লিকানের বর্ণনার বিপরীত। তিনি বর্ণনা করে যে, কোনো এক সেবিকা কোনো একজন সেবকের নিকট দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। সেবিকা অভিযোগ করেন যে, দূর্গের দরজায় সিপাহসালা তাকে উত্যক্ত করে। তখন আসাদউদ্দিন তার দিকে এগিয়ে যায় এবং বর্শা নিক্ষেপে তাকে হত্যা করে। অতঃপর তার ভাই নাজমুদ্দিন তাকে আটক করে এবং মুজাহিদউদ্দিন নাহমুযকে পত্র লিখেন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য। তিনি তার নিকট এই মর্মে লেখেন, আপনাদের উভয়ের পিতার খিদমত করা আমার কর্তব্য। তিনি তাকে আপন পুত্র নাজমুদ্দিন আইউবের পূর্বে এই দূর্গের নায়েব নিযুক্ত করেন। তোমাদের উভয়কে কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়। কিন্তু তোমরা দুজন সেখান থেকে চলে যাও, ফলে নাহরুয তাদের উভয়কে দূর্গ থেকে বের করে দেয়। দূর্গ থেকে বের হওয়ার রাতে মালিক নাসির সালাহউদ্দিন ইউসুফ জন্মগ্রহণ করে। আর স্বদেশ ভূমি হারাবার জন্য আমি তাকে অশুভ জ্ঞান করি। তখন্ কোনো একজন তাকে বলে যে, নবজাত শিশুকে তুমি অশুভ বলে মনে করছো, আমরা তাকে দেখে নিয়েছি যে, এ শিশু একদিন বড় বাদশাহ হবে। তার অনেক নাম-কাম হবে। মূলত তাই হয়। ফলে তারা উভয়ে নূরুদ্দীনের পিতা বাদশাহ ইমাদুদ্দিন জঙ্গির সেবায় নিয়োজিত থাকে। সেখানে

তারা উভয়ে তার নিকট অনেক অগ্রগন্য ছিলেন এবং তাদের স্থান ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং নুরুদ্দিন নাজমুদ্দিন আইউবকে বালাবাক অঞ্চলের নায়েব নিযুক্ত করেন। আর আসাদউদ্দিন ছিল তার সবচেয়ে বড় আমীরদের অন্যতম। তিনি বালাবাকের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তার অধিকাংশ সন্তান তথায় জন্ম লাভ করে। এরপর তার 'দিয়ারে মিশর' গমনের ঘটনা ঘটে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অতঃপর জিলহজ্জ মাসে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে আটদিন পর একই বছর জিলহজ্জ মাসের ২৭ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার পুত্র সালাহউদ্দিন আল-কাফ অঞ্চল অবরোধে নিয়োজিত থাকায় তার থেকে দূরে ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে, উপস্থিত না থাকার কারণে তিনি দুঃখবোধ করেন এবং অন্তর জ্বালা আর ব্যাথা প্রকাশ করে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

وتخطفه يد الردى في غيبتي * هبني حضرت، فكنت ماذا أصنع

"আমার অনুপস্থিতিতে ধ্বংসের হাত তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

আর মনে কর, আমি উপস্থিত থাকলেও কি করতে পারতাম? উল্লেখ্য নাজমুদ্দিন আইউব বেশি বেশি নামায আদায় করতেন, রোযা রাখতেন এবং সদকা দিতেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে সৎ, ভদ্র এবং প্রশংসারযোগ্য দাতা। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, মিশর দেশে তার খানকা আছে এবং কায়রোর 'বাব-আর-নসর' এর বাইরে তার নামে একটা মসজিদ এবং নহর আছে। হিজরী ৫৬৬ সনে তিনি এটা ওয়াকফ করে দেন। আমি বলি, দামেস্কেও তার একটা খানকা আছে। এই খানকা 'নাযমিয়া' নামে পরিচিত। তার পুত্র কারক অঞ্চলে গমনকালে তাকে মিশরীয় অঞ্চলের নায়েব নিযুক্ত করেন এবং ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আল ইমাদ প্রমুখ কবি তার প্রসংশা করেছেন এবং তার মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। শায়খ আবু শামা আল রাওজাতাইন গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। ভাই আসাদউদ্দীনের সঙ্গে দারুন ইমারায় তাকে দাফন করা হয়। অতঃপর ৫৮০ হিজরী সনে উভয়ের লাশ মদীনা শরীফে স্থানান্তরিত করা হয় এবং উজীর জামালউদ্দিন মুসেলির কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। যিনি ছিলেন আসাদউদ্দিন শেরকো-এর বন্ধু। আর এই জামালউদ্দিন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার কবর এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদের মাঝে কেবলমাত্র ১৭ হাত পরিমাণ ব্যবধান উভয়কে সেখানে দাফন করা হয়। আবু শামা বলেন, রাফেজী এবং ব্যাকরণবিদদের বাদশাহ আল হাসান ইবন ছাফী ইবন ইয়দান তুর্কী এ বছর ইন্তিকাল করেন। ইনি ছিলেন বাগদাদের বড় বড় আমীরদের অন্যতম, যিনি শাসনকার্যে মর্জিমত হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খবীস রাফেজী এবং রাফেজীদের সহায়তাকারী। অবশেষে এ বছর যিলহজ্জ মাসে তার থেকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে মুক্ত করেন। আপন গৃহে তাকে দাফন করা হয়। পরে তার লাশ কুরাইশদের কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়। তার মৃত্যুতে আহলে সুন্নাহর অনুসারীরা ভীষণ আনন্দিত হয় এবং তারা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে এবং তাদের সকলে এ ব্যাপারে অংশ নেয়। এতে শিয়ারা ক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে ফিতনার সৃষ্টি হয়। আর ইবনুস সায়ী তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, শৈশবে তিনি ছিলেন সুদর্শন শিশু, বড়দের প্রিয় পাত্র। আর

তিনি আরো বলেন যে, আমাদের শায়খ আবুল ইয়ামান আল-কিনদিও তার ভক্ত ছিলেন। তার সম্পর্কে নিচের কবিতাটি উল্লেখযোগ্য,

بكل صباح لى وكل عشية * وقوف على أبوابكم وسلام

وقد قيل لى يشكو سقاما بعينه * فها نحن منها نشتكى ونضام

"আমি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তোমার দরজায় উপস্থিত হয়ে সালাম করি।

আর আমাকে জানানো হয় যে, চোখের রোগে সে অসুস্থ, আর দেখ তার কারণে আমি নিজে অসুস্থ।"

হিজরী ৫৬৯ সনের ঘটনাবলী

ইবনুল যাওযী আল মুনতাযীম গ্রন্থে বলেন, এ বছর বাগদাদ নগরীতে নারঙ্গী ফলের মত বড় বড় বরফ খণ্ড পড়ে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটির ওজন ছিল সাত রতল। এরপর দেখা দেয় বিরাট বন্যা। দজলা নদীর পানিফুলে ফেঁপে ওঠে। পানি এত বেড়ে যায় যে, ইতিপূর্বে কখনও এরকম দেখা যায়নি। এ ব্যাপক বন্যার ফলে ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি কবর পর্যন্ত উজাড় হয়ে যায়। লোকজন বিরান প্রান্তরে বের হয়ে পড়ে। আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি এবং কান্না-কাটি বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ সংকীর্ণতা দূর করে প্রশস্ততা দান করেন এবং আল্লাহর মেহেরবাণীতে পানি হ্রাস পায়। তিনি আরো বলেন, মুসেল অঞ্চলের অবস্থাও ছিল বাগদাদ নগরীর অনুরূপ। এসব ঘর-বাড়ি ধ্বংস হওয়ার ফলে আশ-পাশের অন্যান্য বাড়ি-ঘরও ধ্বংস হয়। এতে বহু লোক মারা যায়। অনুরূপভাবে ফোরাত নদীতেও পানি বৃদ্ধি পায়। ফলে অনেক জনপদ ধ্বংস হয়। ফল-ফসলের ক্ষতি হওয়ার কারণে এ বছর ইরাকে খাদ্যশস্য এবং ফলমূলের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অনেক গবাদি পশুও মারা যায়। এসব অঞ্চলে ছাগল-ভেড়ার গোশত যারা খায়, তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করে।

ইবনুস সাহী বলেন, এ বছর শাওয়াল মাসে দিআরে বকর এবং 'মুসেল' অঞ্চলে একটানা বৃষ্টি বর্ষিত হয়। রাতদিন ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টি নামে। সামান্য সময়ের জন্য কেবল দুইবার সূর্য দেখা যায়। মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে। এই টানা বর্ষণে অনেক বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয় এবং ঘর-চাপা পড়ে অনেকেই মারা যায়। অনুরূপভাবে দজলা নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়। বাগদাদ এবং মুসেল অঞ্চলের অনেক বাড়ি-ঘর ডুবে যায়। এরপর আল্লাহর হুকুমে পানি হ্রাস পায়। ইবনুল যাওযী বলেন, এ বছর রজব মাসে ইবন শহরযুরী নুরুদ্দীনের নিকট আগমন করেন। তার সঙ্গে ছিল মিশরীয় বস্ত্র। আরও ছিল রঙ্গিন সাদা গাধা। এ গাধাগুলোর চামড়া ছিল ইতাবী বস্ত্রের মত কারুকার্য করা। এ বছর ইবনুস শাহীকে নিজামিয়া মাদরাসার থেকে শিক্ষকতা হতে বরখাস্ত করা হয় এবং তদস্থলে আবুল খায়ের কাযবীনী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আরও বলেন, এ বছর জমাদিউস সানী মাসে ফকিহ আল মুযীদকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি যিন্দিক, হারামকে হালাল করেন এবং নামায-রোজা ত্যাগ করেন। এর ফলে অনেকেই ক্ষিপ্ত হয় তার পক্ষে সাফাই দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনে। একথাও উল্লেখ করা হয় যে, তিনি হাদসিয়া অঞ্চলে এক ওয়াজের মাহফিলে যোগদান করেন। এ মাহফিলে প্রায় ৩০ হাজার লোক সমবেত হয়।

ইবনুস সাঈ বলেন, এ বছর আমীরুল মুমেনীন আল-মুসতাযীর পুত্র আহমদ এক উঁচু গম্বুজ থেকে নিচে পড়ে যান, কিন্তু প্রাণে রক্ষা পান। তার ডান হাত এবং ডান কনুইতে আঘাত পান এবং নাকের চামড়াও ফেটে যায়। তার সঙ্গে ছিল একজন কৃষ্ণ খাদিম, যাকে বলা হতো নাজাহ। খাদিম যখন দেখতে পায় যে, তার মনিব উপর থেকে পড়ে গেছে, তখন সে নিজেও ঝাপ দেয়। এরপর সে বলে, আমার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই। কিন্তু সে নিজেও রক্ষা পায়। পরে যখন আবুল 'আব্বাস আল নাসির খিলাফত পদে অধিষ্ঠিত হন, আর তিনি হলেন গম্বুজ থেকে পতিত সেই শাহজাদা। তিনি যখন খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি এই নাজাহর কথা ভুলতে পারেননি। উত্তরকালে তিনি তাকে বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন এবং তার প্রতি সদয় আচরণ করেন। যে সময় তারা গম্বুজ থেকে নিচে পড়েন, সেসময় উভয়ে ছোট ছিলেন। এ হিজরী সনে বাদশাহ নুরুদ্দীন রোম অঞ্চল সফর করেন। এ সময় তার খিদমতে উপস্থিত ছিল সৈন্য এবং আর্মেনিয়ার বাদশাহ ও মালতিয়ার শাসক, আরো ছিল অনেক আমীর ওমরাহ। তিনি সেখানে অনেকগুলো দূর্গ উদ্বোধন করেন এবং রোম দূর্গ অবরোধ করলে সেখানকার শাসক ৫০ হাজার দিনার জিযিয়ার বিনিময়ে তার সঙ্গে চুক্তি করে। এরপর তিনি হালবে ফিরে আসেন এবং সর্বক্ষেত্রে কামিয়াবী লাভ করেন। এরপর তিনি আনন্দিত হয়ে দামেশ্‌কে ফিরে আসেন।

এ বছর বাদশাহ সালাহউদ্দীনের জন্য ইয়ামান শহর জয় করা হয়। আর তা করা হয় এ জন্য যে, সালাহউদ্দীন জানতে পারেন যে, ইয়ামানে আবদুন নবী ইবন মাহদী নামে একজন লোক আছে। সে তথায় প্রভাব বিস্তার করেছে এবং নিজেকে ইমাম বলে দাবী করে। ধারণা করা হয় যে, একদিন সে গোটা এলাকা অধিকার করে নেবে। ইতিপূর্বে তার ভাই আলী ইবন মাহদীও অনুরূপ করেছিল এবং সে আহলে যুবাইদের হাত থেকে উক্ত এলাকা ছিনিয়ে নেয়। হিজরী ৫৬০ সনে তার মৃত্যু হলে তার ভাই উক্ত অঞ্চলের বাদশাহ হয়। এরা দুই ভাই ছিল বদ স্বভাব এবং অসৎ চরিত্রের লোক। তাই সালাহউদ্দীন তার প্রতি এক বাহিনী প্রেরণ করার সংকল্প করেন। আর তার বড় ভাই শামসুদ্দৌলা ছিল বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং বীর-বাহাদুর। এছাড়াও তিনি ছিলেন এক বিরাট নেতা। কবি ইমারা আল ইয়ামানীর দরবারে তিনি উঠা-বসা করতেন। আর কবি তার কাছে ইয়ামানের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। ফলে এ বছর রজব মাসে তিনি ইয়ামান অভিযানে বের হতে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি প্রথমে মক্কা গমন করেন এবং ওমরাহ আদায় করেন। সেখান থেকে তিনি যুবায়দ অঞ্চল গমন করেন। আবদুন নবী তার মোকাবিলায় দাঁড়ালে তুরান শাহ তাকে পরাজিত করে এবং তাকে ও তার স্ত্রী হোররাকে বন্দী করে। সে ছিল অনেক সম্পদের অধিকারী। তার নিকট ছিল অনেক জিনিস এবং বিশাল ভাণ্ডার। আর সৈন্যরা যুবায়দের সবকিছু লুণ্ঠন করে। অতঃপর মনোনিবেশ করে আদন-এর প্রতি তথাকার বাদশাহ ইয়াসের তার সঙ্গে যুদ্ধ করলে তিনি তাকে পরাজিত ও বন্ধি করেন এবং স্বল্প অবরোধে তিনি নগর অধিকার করেন। তিনি সৈন্যদেরকে লুট-তরাজ চালাতে বারণ করেন। তিনি বলেন, আমরা নগর ধ্বংস করার জন্য আসিনি। আমরা এসেছি নগর আবাদ করা এবং শাসন করা জন্য। আর জনগণের সঙ্গে ভাল আচরণ করলে জনগণ তাকে পছন্দ করে। এরপর তিনি অবশিষ্ট দূর্গ, পর্বত এবং প্রদেশ অধিকার করে নেন এবং গোটা ইয়ামান দেশ তার অধিকারভুক্ত হয়। আর ইয়ামান দেশ তার কলিজার টুকরো উজাড় করে দেয় তার জন্য। আর আব্বাসী আল

মুসতাযীর পক্ষে খুতবা দান করে এবং আবদুন নবী নামে দাবীদার ব্যক্তি নিহত হয়। আর ইয়ামানকে জঞ্জাল মুক্ত করেন এবং ইয়ামান পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তার ভাই বাদশাহ নাসের এর নিকট তিনি এই বিজয়ের সংবাদ দিয়ে পত্র লিখেন। আল্লাহ তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন পত্রে তিনি তাও উল্লেখ করেন। ফলে বাদশাহ সালাহউদ্দীন এ বিষয়ে নুরুদ্দীনকে অবহিত করেন। নুরুদ্দীন এ বিষয়ে খলীফাকে অবহিত করেন এবং ইয়ামান জয়ের সুসংবাদ দেন। সেখানে তার নামে খুতবা জারির কথাও জানান।

একই বছর আল মুত্তয়াক্কের খালিদ ইবনুল কায়সারানী মিশরীয় অঞ্চল থেকে বের হন। সেখানে মালেক নাসের হিসাব-কিতাব নিরীক্ষা করেন এবং যেসব শুল্ক উসুল করা হত মালেক বাদশাহ নুরুদ্দীনের নিয়ম অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর সালাহউদ্দীনের নিকট যখন পত্র আসে, তখন তিনি প্রতিরোধ এবং অস্বীকারের কাছাকাছি পৌছেন। কিন্তু তিনি তার সুন্দর স্বভাবের দিকে ফিরে আসেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং হিসাব আর জবাব লেখার নির্দেশ দেন। হিসাব-কিতাব লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এ নির্দেশ পালনের প্রতি এগিয়ে আসে এবং ইবনুল কায়সারানীর সাথে অনেক মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন। এছাড়া ছিল মণি-মুক্তার ১০০টি হার। এসব মণি-মুক্তা ছিল ইয়াকুত এবং বালখাশ টুকরোর অতিরিক্ত। এছাড়াও ছিল গর্ব করার মত মূল্যবান বস্ত্র এবং বাসন-কোষণ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈজসপত্র এবং বিশেষ চিহ্নিত অশ্বরাজি। আর সুদর্শন যুবক ও যুবতী। আর তালাবদ্ধ এবং সিল করা ১০ সিন্দুক স্বর্ণ। এতে কি পরিমাণ মিশরীয় খাঁটি স্বর্ণ চিল তা বলা মুশকিল। কাফেলা তখন মিশর অঞ্চল থেকে রওয়ানা হয় এবং শাম দেশে পৌছেনি, তখন নুরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। আসমান যমীনের পালনকর্তার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক। তখন সালাহউদ্দিন কাফেলাকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক প্রেরণ করেন এবং তার নিকট তা ফেরত আনা হয়। কথিত আছে যে, এ কাফেলার উপর হামলা করা হয়। কিন্তু এই সিন্দুক তার সামনে রাখা হলে তিনি এ বিষয় জানতে পারেন।

আমারা ইবন আবুল হাসান এর হত্যাকাণ্ড

ইনি হলেন ইবন যায়দান আল হিকামী, ইনি কাহতান বংশের লোক। আবু মুহাম্মদ নাজমুদ্দীন আল ইয়ামানী তার লক্ব। ইনি ছিলেন ফকীহ, কবি এবং শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী। তার হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল এই যে, ফাতেমী সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা ছিলেন শাসনকর্তা, তারা সকলে সমবেত হয় এবং তারা ফাতেমী শাসন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়। তদনুযায়ী তারা খ্রিষ্টানদের পত্র মারফত নিজেদের নিকট ডেকে পাঠায় এবং ফাতেমীদের থেকে একজন খলীফা, একজন উযীর এবং কয়েক জন আমীর নিযুক্ত করে। আর এ কাজ করে 'আল কারুক' অঞ্চল থেকে সুলতানের অনুপস্থিতিকালে। এরপর ঘটনা চক্রে সুলতান উপস্থিত হলে আমারা ইয়ামানী শামসুদ্দৌলা তুরান শাহকে ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যাতে খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে তাদেরকে দুর্বল করে তুলতে পারে, যখন তারা ফাতেমীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তদানুযায়ী তুরান শাহ গমন করেন, কিন্তু তার সঙ্গে আমারা গমন করেননি বরং তিনি কায়রো অবস্থান করেন এবং আলাপ আলোচনায় মত্ত হয়ে

পড়েন। যারা কথাবার্তা বলছিল তাদের সঙ্গে তিনিও যোগ দেন এবং নিজেকে তাদের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করেন। এজন্য যারা আহ্বান জানায় তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং এ জন্য যারা উদ্বুদ্ধ করে তাদেরও অন্যতম ছিলেন। আর আলাপ-আলোচনায় তিনি এমন সব কথা যোগ করেন, যা সালাহউদ্দীনের কথা বলে ধারণা দেওয়া হয়। আর এটা ছিল তাদের নির্বুদ্ধিতা অতিসত্ত্বর বিনাশের আলামত। তারা যার প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী ছিল সেই ব্যক্তি শায়খ যায়নুদ্দীন আলী ইবন নাজাহ আল ওয়ায়েজ। তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেন। তিনি সুলতানকে এই চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেন। এই চুক্তি করা হয়েছিল সুলতানের বিরুদ্ধে। এ জন্য সুলতান তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেন এবং মূল্যবান বস্ত্র দানে ধন্য করেন। অতঃপর এক এক করে সুলতান তাদেরকে ডাকেন, তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি দাবী করলে তারা সকলে স্বীকার করে নেয়, ফলে তাদেরকে বন্দী করা হয়। অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফকীহদের নিকট ফতোয়া বা ধর্মীয় সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়। মুফতিরা তাদেরকে হত্যা করার ফতোয়া দান করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তারা অনুসারী এবং দাসদেরকে বাদ দিয়ে কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমীর ওমরাহদের হত্যা করার পক্ষে মত দেন। আর ওবায়দীদের সৈন্যের মধ্যে যারা রক্ষা পায় তাদেরকে দূর-দূরান্তে নির্বাসনে পাঠায়। আর আল আযইদ এবং তার পরিবার-পরিজনকে এক ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। ফলে তাদের কাছে ভালো-মন্দ কোনো কিছু পৌঁছতে পারেনি। আর তাদের প্রয়োজন অনুপাতে রসদ এবং বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। আর আমারা কাযী ফাযিরে প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। আমারাকে যখন সুলতানের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন কাযী ফাযিল সুলতানের নিকট তার সুপারিশ করার জন্য গমন করেন, তখন আমারা ধারণা করে যে, সে তার সমালোচনা করবে। তখন সে বলে, হে আমার মুনিব সুলতান। তার কথা শুনবেন না। তখন কাযী ফাযিল ক্রোধান্বিত হন এবং প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসেন। তখন সুলতান তাকে বলেন, সেতো তোমার জন্য সুপারিশ করছে। তখন সে ভীষণ লজ্জিত হয়। যখন তাকে শূলিবিদ্ধ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে কাযী ফাযিলের গৃহের নিকট দিয়ে গমন করে এবং তিনি তাকে তালাশ করেন। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করেন। এসময় তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন,

عبد الرحيم قد احتجب * إن الخلاص هو العجب

"আবদুর রহিম আত্মগোপন করেছে। আর তার মুক্তি পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার।"

ইবনু আবী তাই বলেন, আর যেসব লোক কাযী ফযল ইবনুল কামেলকে শূলিবিদ্ধ করে, আর তিনি ছিলেন আবুল কাশেম হেবাতুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কামেল, ফাতেমী শাসনামলে মিশরীয় অঞ্চলের প্রধান কাযী। তার উপাধি ছিল ফখরুল উমানা। আর যে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম শূলিবিদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় আল ইমাদ। আর তাকে সম্পর্কিত করা হত ফজিলত এবং আদবের দিকে। আর তার কিছু চমৎকার কবিতা আছে। গোলাম রিফা সম্পর্কে তার উল্লেখযোগ্য কবিতা এখানে উল্লেখ করা হলো–

يا رافيا خرق كل ثوب * ومار فاحبه اعتقادى

عسى بكف الوصال ترفو * ما مزق الهجر من فؤادى

"হে বস্ত্রের ছিদ্র রিপুকারী তার ভালবাসা আমার বিশ্বাসকে রিপু করতে পারে নি।

হতে পারে সে মিলনের হস্তদ্বারা আমার অন্তরের সে অংশকে রিপু করবে যা বিচ্ছেদ টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।"

আর ইবনু আবদুল কাযী ছিল আহ্বানকারীদের নেতা। প্রাসাদে কি কি বস্তু লুকায়িত আছে, সে সম্পর্কে ইনি জানতেন। সে সম্পর্কে বলার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তিনি মারা যান এবং সেই গুপ্ত ধন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর আল-আবিরাস ছিলেন দিওয়ানের নাযির, এতদসঙ্গে তিনি বিচারকের দায়িত্ব ও পালন করেন। আর সিবইয়া ছিলেন গোপন বিষয়ের লেখক। আর আবদুস সামাদ কাতেব ছিলেন মিশরীদের অন্যতম আমীর। আর নাজাহ ছিল হামামী। আর গনক ছিল ইয়াহুদী। সে তাদেরকে বলে দেয় যে, বিষয়টা জ্যোতিষ বিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হবে।

আমরা আল ইয়ামানী আল শায়ের

ইনি ছিলেন বিশুদ্ধ ভাষী, নামকরা কবি, এক্ষেত্রে কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। তার কবিতার একটি দেওয়ান বা সংকলন প্রসিদ্ধ আছে। তাবাকাতে শাফেঈয়া গ্রন্থে আমি তার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কারণ, তিনি শাফেয়ী মাযহাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ফরায়িয বিষয়ে তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। ফাতেমী মন্ত্রীদের সম্পর্কেও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ গ্রন্থের নামকরণ করেন আল উয়ারা আল ফাতেমী। আল সীরাত বিষয়ে তিনি একটা চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। মিশরের সাধারণ লোক এ গ্রন্থের প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাবান ছিল। ইনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সাহিত্যিক এবং একজন ফকীহ। অবশ্য ফাতেমীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে বলে উল্লেখ করা হয়। ফাতেমীদের উযীর এবং উমারাদের সম্পর্কে তার অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা আছে। তবে তিনি রাফেযী ছিলেন এমন কথা খুব কমই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তিনি যিন্দীক এবং কট্টর কাফির ছিলেন এমন অপবাদ বিস্তর। আর আল ইমাদ তার 'আল খারীদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার এক কবিতার শুরুতে উল্লেখ করেন,

العلم مذ كان محتاج إلى العلم * وشفرة السف تستغنى عن القلم

"আবহমানকাল থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী, আর তরবারির ধারের কোনো প্রয়োজন নেই জ্ঞানের।"

তিনি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, যাতে কুফরী এবং নাস্তিকতা ভরপুর। একটি কবিতায় তিনি বলেন,

قد كان أول هذا الدين من رجل * سعى إلى أن دعوه سيد الأمم

"এই দীনের সূচনায় এক ব্যক্তি ছিল, যে চেষ্টা করে লোকে যেন তাকে বলে সাইয়েদুল উমাম বা সকল জাতির নেতা।"

আল ইমাদ বলেন, মিশরের জ্ঞানীরা এ ব্যক্তিকে হত্যার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আর সুলতানকে উৎসাহিত করে এই ব্যক্তি এবং অনুরূপ ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য। তিনি বলেন,

এই কবিতা তার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন। আর ইবনুস সায়ী তার চমৎকার কবিতা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো বাদশাহর প্রশংসায় তিনি বলেন,

إذا قابلت بشرى جبينه * فارقته والبشر فوق جبيني

وإذا لثمت يمينه وخرجت من * بابه لثم الملوك يميني

"আমি যখন তার কপালের সুসংবাদের মুখোমুখী হই, তখন আমি দূরে সরে যাই। আর তার উজ্জ্বল চেহারা থাকে আমার কপালের উপর।"

আর আমি যখন তার ডান হাতকে চুম্বন করি এবং বের হই তার দরজা থেকে, তখন বাদশাহরা চুম্বন করে আমার ডান হাত।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন,

لى فى هوى الرشا العذرى إعذار * لم يبق لى مذا قسر الدمع إنكار

لى فى القدود وفى لثم الخدو * دوفى ضم النهود لبانات وأوطار

هذا اختيارى فوافق إن رضيت به * وإلا فدعنى لما أهوى وأختار

কুমারী হরিণীর প্রেম সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। আমার জন্য বৃদ্ধি অবশিষ্ট নেই, অশ্রু অস্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

আকার-আকৃতি কপালে চুমু এবং বুকে বুক মিলান আমার জন্য প্রয়োজন আছে;

এটা আমার পছন্দ, যদি তোমারও তাই পছন্দ হয়, তবে একমত হও। অন্যথায় আমাকে বর্জন কর। আমি প্রেম করব এবং বাদশাহী করব।"

আর যখন আল উমারাকে শূলিবিদ্ধ করা হয় তখন আল ফিন্দী তার সম্পর্কে নিচের কবিতা আবৃত্তি করেন,

عمارة فى الإسلام أبدى جناية * وبايع فيها بيعة وصليبا

وأمسى شريك الشرك فى بغض أحمد * وأصبح فى حب الصليب صليبا

سيلقى غدا ما كان يسعى لنفسه * ويسقى صديدا فى لظى وصليبا

"উমারা ইসলামে পাপ প্রকাশ করেছে এবং গীর্জা ও ক্রুশের বায়আত করেছে।

আর সে আহমদের ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু শিরক করেছে। আর ক্রুশের প্রেমের কারণে সে হয়েছে ক্রশবিদ্ধ।

সে নিজের জন্য যা চেষ্টা করেছে, আগামী দিন সে তার সাক্ষাৎ পাবে। আর সে অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মধ্যে পান করবে পুঁজ এবং হাড্ডির চর্বি।"

শায়খ আবু শামা বলেন, প্রথম কবিতায় ক্রুশ অর্থ খ্রিষ্টানদের ক্রুশ, আর দ্বিতীয় কবিতায় ক্রুশ অর্থ-ক্রুশবিদ্ধ, আর তৃতীয় কবিতায় সালীব অর্থ কঠিন-কঠোর, আর চতুর্থ কবিতায় এর অর্থ হাড়ের মগজ। আর বাদশা নাসের যখন এই লোকদেরকে এ বছর দ্বিতীয় রমযান শনিবার কায়রোর দুই প্রাসাদের মধ্যস্থলে শূলিবিদ্ধ করেন, তখন তিনি নুরুদ্দীনকে পত্র মারফত যা কিছু

তারা করেছে এবং তাদের সঙ্গে যে শাস্তি ও অপমানকর আচরণ করা হয় সে সম্পর্কে তিনি তাকে অবহিত করেন। আল ইমাদ বলেন, বাদশাহ নুরুদ্দিন যে দিন ইন্তিকাল করেন, সে দিন তার কাছে এই পত্র পৌঁছে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। অনুরূপভাবে সালাহউদ্দিন আলেকজান্দ্রিয়ায় জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যাকে বলা হতো কাদীদ আল কাফাযী। তার দ্বারা লোকেরা পরীক্ষায় নিপতিত হয় এবং নিজেদের কর্মের অংশ তার জন্য নির্ধারণ করে। এমনকি নারীরাও নিজেদের সম্পদ থেকে তার জন্য নির্ধারণ করে। আর আল-কাফাযী মুক্তি কামনা করে। কিন্তু তখন আর পলায়নের উপায় ছিল না। তাই তাকে পরবর্তীদের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে হত্যা করা হয়। আল আযীদ এবং তার শাসনকাল সম্পর্কে আমারার শোক গাঁথার কিছু কবিতা এখানে উল্লেখ করা হলো :

اسفى على زمان الإمام العاضد * أسف العقيم على فراق الواحد
لهفى على حجرات قصرك إذ خلت * يا بن النبى من ازدحام الوافد
وعلى انفرادك من عساكرك التى * كانوا كأمواج الخضم الراكد
قلدت مؤتمن أمرهم فكبا * وقصر عن صلاح الفاسد
فعسى الليالى ان ترد إليكم * ما عودتكم من جميل عوائد

"যুগের ইমাম আল আযীদের জন্য আমার দুঃখ হয়, যেমন দুঃখ হয় নিঃসন্তান ব্যক্তির একটি সন্তান হারাবার জন্য। হে নবী পুত্র! তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় তোমার কক্ষ আগতদের ভিড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। আরো দুঃখ হয় তোমার সে সব সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যারা ছিল সমুদ্রের তরঙ্গের মত উত্তাল।

তুমি মুতামিনকে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছো, আর সে হোঁচট খেয়েছে এবং ত্রুটি করেছে, অনিষ্ট রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

হতে পারে যামানা তোমার কাছে ফিরে আসবে, কারণ তা তোমাদেরকে ভালকাজে অভ্যস্ত করেছে।"

অপর এক কাসীদায় তিনি বলেন,

يا عاذلى فى هوى أبناء فاطمة * لك الملامة إن قصرت فى عذلى
بالله زر ساحة القصرين وابك معى * لا على صفين ولا الجمل
وقل لأهلهما والله ما التحمت * فيكم قروحى ولا جرحى بمندمل
ماذا ترى كانت الإفرنج فاعلة * فى نسل ابنى أمير المؤمنين على

"ফাতিমার সন্তানের ভালবাসার জন্য আমাকে তিরস্কারকারী, আমাকে তিরস্কার করায় তুমি যদি ত্রুটি করো, তবে তোমাকে তিরস্কার। আল্লাহর শপথ! উভয় মহলের আঙ্গিনা দর্শন কর এবং আমার সঙ্গে রোদন কর, কিন্তু 'সিফফীন' এবং 'জামাল' এর জন্য রোদন করবে না।

আর সে দুটি যুদ্ধে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে বল কসম খোদার! তোমাদের সম্পর্কে আমার আঘাত যা শুকায়নি।

তুমি কী দেখছো, আর খ্রিষ্টানরা কী করছে, আমীরুল মুমেনীন আলী (রা)-এর বংশ ধরের ব্যাপারে?"

আর শায়খ আবু শামা আল-রাওয়যাতাইন গ্রন্থে ফাতেমীদের প্রসংশায় অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবন খাল্লিকানও অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন।

ইবন কারুল : ইনি মাতালেউন আনওয়ার গ্রন্থের রচয়িতা। কাযী ইয়ায প্রণীত 'মাসারেকুল আনওয়ার' গ্রন্থের ধারায় তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ছিলেন তার এলাকার বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ আলীমদের অন্যতম। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বলেন, এ বছর ৬ই শাওয়াল জুমার নামাযের পর হঠাৎ তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ ভাল জানেন।

পরিচ্ছেদ

বাদশাহ নুরুদ্দীন মাহমূদ জঙ্গির ওফাত এবং তাঁর পূতঃপবিত্র জীবন চরিতের কিছু আলোচনা : তিনি হলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নূরুদ্দীন, আবুল কাসিম মহমূদ ইবন বাদশাহ আল-আতাবিক, কাসীমুদ্দৌলা ইমাদুদ্দীন আবূ সাঈদ জঙ্গী, যার উপাধি শহীদ ইবন বাদশাহ আকসিংকর আল-আতাবিক, যার উপাধি কাসীমুদ্দৌলা আল-তুর্কী আল-মালজূকী মাওলাহূম। হিজরী ৫১১ সনের ১৭ই শাওয়াল রবিবার সূর্যোদয়ের সময় হলব (আলেপ্পো) নগরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর লালন-পালন হয়। যিনি ছিলেন হলব ও মুসেলসহ আরো অনেক বড় বড় জনপদের শাসনকর্তা। পিতার তত্ত্বাবধানে কুরআন মজীদ, অশ্বারোহন এবং তীরচালনা বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন বীর বাহাদূর, উঁচু সাহসিকতার অধিকারী, সদিচ্ছা এবং বিরাট সম্মানের অধিকারী। তাঁর দীনদারী তথা ধর্মপরায়ণতা ছিল স্পষ্ট। ৫৪১ হিজরী সনের রজব মাসে জিবির দূর্গ অবরোধকালে তার পিতার ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র এই নূরুদ্দীন হলবে বাদশাহী লাভ করেন। সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর তার ভাই সাইফুদ্দীন গাযী তাকে মুসেল অঞ্চল দান করেন। এরপর তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং ৫৪৯ হিজরী সনে তিনি দামিশক জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচার করেন। আর সেখানকার অধিবাসীদের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা এবং আশ্রম নির্মাণ করেন। পথচারীদের জন্য রাস্তাঘাট প্রশস্ত করেন এবং পথের ধারে সবুজ বনানী গড়ে তোলেন। হাট-বাজার সম্প্রসারিত করেন, আর দারুল গনম, বিত্তীখ এবং আরসাদ ইত্যাদি অঞ্চলের কর প্রত্যাহার করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আলিম-উলামা এবং ফকীর মিসকীনকে তিনি ভালো বাসতেন। তাদের সম্মান করতেন এবং তা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। নির্দেশ জারীর ক্ষেত্রে তিনি সুবিচার করতেন এবং পবিত্র শরীয়তের অনুসরণ করতেন। সুবিচারের মজলিস বসাতেন এবং নিজে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন আর এ প্রসঙ্গে সকল মাযহাবের কাযী, ফকীহ, আর মুফতীরা তাঁর দরবারে সমবেত হতেন। আর মঙ্গলবার আল-কাশ্ক অঞ্চলের মুয়াল্লাম মসজিদে তিনি বলতেন, যাতে মুসলিম এবং মিশরীয় সকলেই যেন তাঁর কাছে পৌছতে পারে এবং তিনি যেন তাদের সকলের মধ্যে সততা বিধান করতে পারেন। আর তিনি যাগুদী জনবসতী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করেন। ইতিপূর্বে যাহুদী

জনবসতী অনেকটা বিরান ছিল। তিনি বাবে কিসান বন্ধ করে দেন। আর বাবুল যরাজ উন্মুক্ত করে দেন। ইতিপূর্বে সেখানে আদৌ কোনো দরজা-ই ছিলনা। তিনি দেশে সুন্নাহকে উজ্জীবিত, আর বিদ'যাতকে স্তিমিত করেন। হাইয়া আলাম সালাহ, হাইয়্যা আলান সালাহ যোগে আমান দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ জারী করেন। তাঁর পিতা আর দাদার রাজত্বকালে এভাবে আমান দেয়া হতো না, বরং তখন 'হাইয়্যা আলা খাইরিল আমাল' অর্থাৎ 'ভালো কাজের পানে এগিয়ে আম জল' আমার দেয়া হতো। কারণ, তখন সেখানে রাফেযীদের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। তিনি দেশে শরীয়তী বিধান চালু করেন এবং অনেক দুর্গ জয় করেন, আর ফিরিঙ্গীদেরকে রবিবার পরাজিত করেন এবং মুসলমানদের সেসব দুর্ঘ ফিরিঙ্গীরা অধিকার করে নিয়েছিল, তাদের হাত থেকে সেগুলো মুক্ত করে নেন।

বিগত বছরগুলোর আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তিনি আরবদেরকে অনেক জায়গীর দান করেন, যাতে তারা হাজীদেরকে উত্তক্ত না করে। তিনি দামিশকে এমন একটা হামপাতাল নির্মাণ করেন, যার অনুরূপ হাসপাতাল তার আগে বা পরে শামদেশে আর নির্মিত হয়নি। এতিমদেরকে পড়ালেখা শিক্ষা দিত, তাদের জন্য তিনি ভূমি ওয়াক্ফ করে দেন এবং তাদের জন্য তিনি খোরপোষের ব্যবস্থা করেন, অনুরূপভাবে হারামাইন তথা কাবা শরীফ এবং মসজিদে নববীর প্রতিবেশি অর্থাৎ সেখানে ইতিকাফকারীদের জন্যও তিনি খোরপোষের ব্যবস্থা করেন। সকল ভাল কাজে এবং বিধবা আর অভাবী ব্যক্তিদের জন্যও তিনি স্থায়ী ওয়াকফের ব্যবস্থা করেন। জামি, মসজিদগুলোর দেখাশুনার কাজ স্থবির হয়ে পড়লে তিনি কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল শহারসুরী আল মৃদেলীকে মসজিদগুলোর ওয়াকফ সম্পত্তি দেখা শোনার দায়িত্তে নিয়োজিত করেন। তিনি দামিশ্ক শহরে আগমন করলে তাকে সেখানে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন এবং চারটি স্থান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। হিজরী ৩৬১ সনে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে এসব স্থানে মসজিদের অনেক মূল্যবান জিনিষ পড়েছিল। এসব জামি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ সম্পদের সঙ্গে তিনি আরো ওয়াক্ফ সম্পত্তি যোগ করেন, যার ওয়াক্ফপারী অজ্ঞাত। এসব ওয়াক্ফ সম্পদের শর্তাভলী সমর্যাদাকেও জানা যায়না। তিনি এসব ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে একই ধারায় পরিণত করেন এবং এর নামকরণ করেন "মাল আল মাসালিহ" তথা "কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত অর্থ।" অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি ফকীর-মিসকীন, এতিম-বিধতা এবং এ জাতীয় লোকদের জন্য তিনি ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী এবং দ্বীনী গ্রন্থাবলী প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। তিনি নবী কারীম (সা)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করতেন এবং নিয়মিত জামায়াতের সাথে নামায আদায় করতেন। কুরআন শরীফ বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন এবং দান-খয়রাত করতে ভালো বাসতেন। তাঁর উদর আর লজ্জাস্থান ছিল পবিত্র ও পরিচ্ছন। অর্থাৎ হারাম খাদ্য এবং অপবিত্র কর্মদ্বারা তিনি এ দুটিকে কলুষিত-কলংকিত করেননি। নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য পানাহার, আর পোশাক-আশাকের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে চলতেন। এমন কি বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর সময়ের একজন নিম্নস্তরের ফকীরও তাঁর চেয়ে বেশি খরচ করতো। তিনি সঞ্চয় করতেন না এবং দুনিয়াকে প্রাধান্যও দিতেন না। তাঁর মুখ থেকে কখনো অশ্লীল কথা শোনা যায়নি। সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টি কোনো অবস্থায়ই তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না। তিনি চুপচাপ থাকতেন এবং নিজের মান-মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আমীর বলেন, উমর ইবন আব্দুল আলীমের পর বাদশাহ নুরুদ্দীনের মতো কোনো শাসকের আবির্ভাব হয়নি এবং তাঁর চেয়ে সুবিচারের সন্ধানীও কেউ ছিল না। হেমছ নগরীতে তাঁর কিছু ওয়ানপাঠ ছিল। গণিমতের মালে তার ন্যায্য অংশ থেকে তিনি দোকান ক্রয় করেন। এসব দোকানের আয় দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য একদা তাঁর দোকানের ভাড়াবৃদ্ধি করলে তিনি এ ব্যাপারে আলিমদের নিকট ফতোয়া তলব করেন, আলিমদের নিকট তিনি জানতে চানযে, বায়তুল মাল থেকে তাঁর জন্য কি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হালাল হবে। আলিমদের ফতোওয়া অনুসারী তিনি বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করতেন, জীবন গেলেও তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করতেন না। তিনি অনেক বেশি পোলো খেলবেন। কোনো একজন সাধু ব্যক্তি এজন্য তাকে দোষারোপ করলে তিনি জবাব দেন যে, কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। এ দ্বারা অশ্বকে প্রশিক্ষণ দান করাই আমার উদ্দেশ্য। আর এ দ্বারা অশ্বের প্রশিক্ষণ হয়। আমরাতো জিহাদ পরিত্যাগ করতে পারি না। তিনি রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন না। তিনি নিজ হাতের উপার্জন আহার করতেন, যা অর্জিত হতো তীর ও তরবারী দ্বারা একদা তিনি জনৈক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে বাহনে আরোহন করে বের হন। এ সময় সূর্য ছিল তাদের পশ্চাতে, আর ছায়া ছিল তাদের সামনে তারা ছায়াকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তাই তারা ফিরে আসছিলেন। এ সময় ছায়া চলে যায় তাদের পশ্চাতে। তখন নূরুদ্দীন দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটালেন আর ছায়া তাকে অনুসরণ করছিল। তখন তিনি সঙ্গীকে বললেন : তুমি কি জান, আমরা যে অবস্থায় আছি, তাকে আমি কিসের সাথে তুলনা করি? আমি তাকে দুনিয়ার সাথে তুলনা করি, যা দুনিয়া সন্ধানী থেকে পলায়ন করে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে পলায়ন করে দুনিয়া তাকে পাকড়াও করে। এ অর্থে কবি কি চমৎকার কথা বলেছেন :

مثل الرزق الذى تطلبه * مثل الظل يمشى معك

أنت لا تدركه مستعجلا * فإذا وليت عنه تبعك

"তুমি যে রিযিক সন্ধান কর, তার উপমা ছায়ার মত, যা তোমাকে অনুসরণ করে।

তুমি দ্রুত তাকে পাকড়াও করতে চাইলেও তার নাগাল পাবেনা আর তুমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, সে তোমার পিছে ছুটবে।"

তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের একজন ফকীহ। তিনি নিজে হাদীস শ্রবন করেন এবং অন্যদেরকে পড়ে শোনান, ভোর রাত থেকে বাহনে আরোহন পর্যন্ত তিনি অনেক নামায আদায় করতেন। কবির ভাষায় তাঁর উপমা,

جمع الشجاعة والخشوع لديه * ما أحسن الشجعان فى المحراب

"তাঁর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল বীরত্ব, আর বিনয়ের, মিহরাবে বাহাদুরকে কতইনা সুন্দর দেখায়।"

অনুরূপভাবে তাঁর স্ত্রী ইসমাতুদ্দীন খাতুন বিনতে আতাবিক মুইনুদ্দীনও রাত্রিকালে বেশি বেশি নামায আদায় করতেন। একবার রাত্রিকালের নিয়মিত ওযীফা কালাম পাঠ না করে ঘুমিয়ে

ভোর বেলা তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হন। কী ঘটেছে নূরুদ্দীন জানতে চাইলে, তিনি নিদ্রার কারণে নিয়মিত ওযীফা, কালাম ছুটে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তখন নুরুদ্দীন ভোর রাত্রে দূর্গের অভ্যন্তরে সাইলেন বাজাবার নির্দেশ দেন, যাতে নিদ্রিত ব্যক্তিরা রাত্রিবেলা নামায আদায় করার জন্য জাগ্রত হতে পারে। আর এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য প্রচুর দান আর পারিতোষিকের হুকুম দেন।

কবি বলেন,

فالبس الله هاتيك العظام وان * بلين تحت تحت الثرى عفوا وغفرانا

سقى ثرى أودعوه رحمة ملأت * مثوى قبورهم روحا وريحانا

"তোমর যেসব হাড্ডি মাটির তলদেশে পঁচেগলে গেছে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা আর দয়ার পোশাকে আচ্ছাদিত করুন। আর যে কবরে তারা তাদেকে দাফন করেছে, আল্লাহ তাকে রহমত দ্বারা সিক্ত করুন এবং তাদের কবরের স্থানকে রাওহা ও রায়হান তথা উৎকৃষ্ট আরাম দায়ক স্থানে পরিণত করুন।

ঐতিহাসিক ইবনুল আমীর আরো উল্লেখ করেন যে, একদা বাদশাহ নূরুদ্দীন পলো খেলছিলেন। এ সময় তিনি দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছে, এ সময় লোকটি নূরুদ্দীনের প্রতি ইঙ্গিত করছে। ব্যাপারটা কি তা জানার জন্য তিনি হাজির বা কোতওয়ালকে প্রেরণ করেন, তিনি দেখতে পান যে, তার সাথে শাসকের পক্ষ থেকে একজন দূতও রয়েছে। আর তিনি মনে করেন যে, নূরুদ্দীনের নিকট তার কোনো অধিকার রয়েছে এবং তিনি লোকটাকে কাযীর নিকট নিয়ে যেতে চান। হাজিব নূরুদ্দীনের নিকট ফিরে এলে তিনি তাকে বিষয়টা জানান। এ সময় সে হাত চৌগান নিক্ষেপ করে দেয় এবং বিরোধীর সঙ্গে হাটতে হাটতে কাযী শহর যূরীর নিকট গমন করেন। আর নূরুদ্দীন কাযীর নিকট এ মর্মে পয়গাম প্রেরণ করেন যে, আপনি আমার সঙ্গে কেবল দুশমনের মতো আচরণ করবে না, তারা উভয়ে যখন সেখানে পৌছেন, তখন নূরুদ্দীন তার বিরোধীর সঙ্গে কাযীর সম্মুখিন হন। শেষ পর্যন্ত বিরোধ নিস্পত্তি হয়ে যায়। নূরুদ্দীনের নিকট লোকটির কোনো অধিকার প্রমাণিত হয়নি। বরং লোকটির উপর সুলতানের অধিকার প্রমাণিত হয়। এটা স্পষ্ট হয়ে গেলে সুলতান বললেন, আমি তার সঙ্গে এজন্য এসেছি, যাতে কোনো ব্যক্তিকে আদালতে ডাকা হলে সে যেন হাজির হতে ইতঃস্তত না করে। কারণ, আমরা শাসক শ্রেণির উচ্চ-নিচু সকলেই রাসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর শরীয়তের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। তিনি সে নির্দেশ দেন, আমরা তা মেনে চলবো। আর তিনি আমাদেরকে যা নিষেধ করেন, আমরা তা থেকে বিরত থাকতো। আর আমি জানি যে, আমার নিকট লোকটার কোন হক নেই। এতদসত্ত্বেও আমি তোমাদের স্বাক্ষী চেয়ে বলছি যে, লোকটি যা দাবী করেছিল, আমি তাকে তার মালিক করেছি এবং তাকে তা দান করে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক ইবনুল আমীর আরো বলেন যে, তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি দারুল 'আদল' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানে সপ্তাহে ২ দিন, ৪ দিন, মতান্তরে ৫ দিন নিজে বসতের, আর সকল মাযহাবের কাযী এবং ফকীহরা তাতে উপস্থিত হতেন; এসম হাজির বা অন্য কেউ বাধা দিতোনা। বরং সবল এবং দুর্বল সকলেই তার কাছে পৌছতে পারতো। তিনি নিজে লোক

জনের সঙ্গে কথা বলতেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাদের মুখোমুখি হতেন। যুলুম-অবিচার দূর করতেন এবং যালিম এর নিকট থেকে মযলূমের হক আদায় করে দিতেন। আর এর কারণ ছিল এই যে, নূরুদ্দীনের নিকট আসাদুদ্দীন শেরবোহ-এর বিরাট স্থান ছিল। এমন কি তাকে রাজত্বের অংশীদার মনে করা হতো। তিনি অর্থ সম্পদ আর ক্ষেত-খামারকে একাকার করে ফেলে ছিলেন। কখনো কখনো তার নায়িবরা প্রতিবেশীদের প্রতি যুলুম-অবিচার করতো। আর কার্য কামালুদ্দীনের নিকট কেউ আমীরদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করেন। তিনি ইনসাফ করতেন। এক্ষেত্রে এই আসাদুদ্দীন ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি হঠাৎ তাঁর নিকট গমন করতেন না। নূরুদ্দীন দারুল আদল প্রতিষ্ঠা করলে আসাদুদ্দীন তার নায়িবদেরকে নির্দেশ দেন যে, কেউ বে-ইনসাফী করলে তাকে যেন রেহাই না দেয়া হয় সে যত বড়ই হোকনা কেন। কারণ, নূরুদ্দীন তাকে যালিমের দৃষ্টিতে দেখার চেয়ে তাঁর সম্পদ ধ্বংশ হয়ে যাওয়া তার নিকট বেশি প্রিয়। অথবা তাকে কোনো সাধারণ দুশমনের পাশে দাঁড় করানো হবে এটাও তার নিকট পছন্দ নয়। তারা তাই করেন। নূরুদ্দীন 'দারুল আছলে' বসার পরও আসাদুদ্দীনের বিরুদ্ধে তার নিকট কেউ ফরিয়াদ করছেনা দেখতে পেয়ে তিনি এ সম্পর্কে কাযীকে জিজ্ঞাসা করলে কাযী তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেন। তিনি বলেন, সে আল্লাহর জন্য শোকর, যিনি আমাদেরকে এমন সঙ্গী দিয়েছে যারা স্বেচ্ছায় হক আদায় করে।

আর তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে কথিত আছে যে, অশ্ব পৃষ্ঠে তার চেয়ে বড় বীর পুরুষ আর স্থির ব্যক্তি কখনো পরিসৃষ্ট হয়নি। তিনি খুব ভাল পোলো খেলতে পারতেন, কখনো বল ছুড়ে মারতেন এবং তার পেছনে ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই হাত দিয়ে তা ধরে ফেলতেন। অতঃপর তা মাটির শেষ প্রান্তে নিক্ষেপ করতেন, তার বোগান কখনো তার মামার উপরে উঠতে দেখা যায়নি। বোগান তার হাতেও দেখা যায়নি। কারণ, তাকে ঢেকে রাখতো, পোলো খেলার ক্ষেত্রে এটাই সহজ উপায়, যুদ্ধে তিনি ছিলেন বীর ও ধৈর্যশীল। এ ক্ষেত্রে তাকে উপমা হিসাবে পেশ করা হতো। তিনি নিজে এ সম্পর্কে বলতেন, একাধিক বার আমি নিজেকে শাহাদাতের জন্য উপস্থাপন করেছিলাম। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয়নি। আমাকে যদি কোনো কল্যাণ মাফতো, আর আল্লাহর নিকট আমার কোনো মূল্য থাকবে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমাকে সাহাদাতের সুযোগ দান করতেন। আর আমল তো নির্ভর করে নিয়তের উপর। একদা কুতুবুদ্দীন নীশাপুরী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, যে আমাদের প্রভু সুলতান! নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন না। কারণ, আপনির নিহত হলে আপনার সঙ্গেঁ যারা আছে সকলেই নিহত হতো, নগর-জনপদ অধিকৃত হতো এবং মুসলমানদের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। তিনি তখন তাকে বললেন, হে কুতুবদ্দীন, চুপ করুন, কারণ, আপনার উক্তি আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবী। কে প্রশংসা পাওয়া যোগ্য? আমার পূর্বে আল্লাহ ছাড়া আর কে দ্বীন ও দেশ রক্ষা করতেন। প্রশংসা পাওয়ারযোগ্য কে? বর্ণনাকারী বলেন, এতে উপস্থিত সকলেই রোদন করে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

কোনও এক যুদ্ধে তিনি নিজেকে শাসকদের হাতে বন্দী হিসাবে পেশ করেন। এখন তাকে কি করা হবে, হত্যা করা হবে না কি অর্থের বিনিময়ে যুক্তি দেয়া হবে এ ব্যাপারে

পরামর্শদাতাদের নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়। অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেকে অর্থ ব্যয় করেন। ফিরিঙ্গী শাসক গোষ্ঠীর মতভেদ দেখা দেয়। অবশেষে টাকার বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়াকেই তারা ভালো মনে করে। মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আনার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে তাঁর দেশে প্রেরণ করেন। লোকটি দ্রুত টাকা নিয়ে ফিরে এলে নূরুদ্দীন তাকে মুক্ত করেছেন। তিনি যখন স্বদেশে পৌঁছেন, তখন বাদশাহ তার দেশে মৃত্যু বরণ করে। এতে নুরুদ্দীন এবং তার সঙ্গী সাথীরা বিস্মিত হয়। মুক্তিপনের অর্থ দ্বারা দামিশ্‌কে একটা হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। কোনো দেশে এই হাসপাতালের যেন তুলনা ছিল না, আর এ হাসপাতালের জন্য শর্ত ছিল যে, এখানে কেবল অসহায় এবং নিঃস্ব রুগীদের (ফকীল-মিসকীন) চিকিৎসা করা হবে। অবশ্য কোনো দূর্লভ ঔষধ যদি কেবল সে হাসপাতালেই পাওয়া যেতো তখন ধনীদের জন্য তা ব্যবহারে বাধা দেয়া হতোনা। আবার কেউ সে হাসপাতালে উপস্থিত হলে তাকে ওষধ পান করাতে বাধা দেয়া হতো না। এ কারণে নুরুদ্দীন এ হাসপাতালে আগমন করলে তাকেও এখান থেকে ওষধ পান করানো হতো। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আমি অর্থাৎ ঐতিহাসিক ইবন কাছীর বলেন, কেউ কেউ এমন কথাও প্রকাশ করেছে যে, উক্ত হাসপাতাল নির্মাণের পর অদ্যাবধি অর্থাৎ লেখকের জীবনদশা পর্যন্ত সেখানে আলো কখনো নিভানো হয়নি। মহান আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তিনি পথিমধ্যে অনেক সরাইখানা এবং দূর্গ নির্মাণ করেন এবং বিপজ্জনক স্থানে পাহারাদার নিযুক্ত করেন এবং তিনি বার্তাবাহক কবুতর নিয়োজিত করেন। যারা সংক্ষিপ্ত সময়ে দ্রুত খবর পৌঁছাতো। এ ছাড়া তিনি আশ্রম এবং খানক নির্মাণ করেন। এ ছাড়া তাঁর দরবারে ফকীহ এবং সূফী মাশায়খরা সমবেত হতেন এবং তিনি এদেরকে সম্মান করতেন। মর্যাদা দান করতেন। নেককার-পরহেজগার লোকদেরকে তিনি ভালবাসতেন। একদা তার দরবারের জনৈক ফকীহকে কেউ মন্দ বলেন। আর উক্ত ফকীহ ব্যক্তি ছিলেন কুতুবউদ্দীন নীশাপুরী তখন বাদশাহ নূরুদ্দীন তাকে বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তারতো অনেক বেশি আছে যা সে সবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তোমার নিকটতো এমন কিছু নেই যা তার সুন্দরগুলো নিশ্চিহ্ন করতে পারে। তুমি যদি সত্য বলে থাক তাহলেও আল্লাহর কসম। আমি তা সত্য বলে মেনে নেবোনা। তুমি যদি পুনরায় তার সম্পর্কে উল্লেখ কর বা আমার সামনে অন্য কাউকে মন্দ বল, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেব। সুতরাং তা থেকে বিরত থাক এবং আমার নিকট তার কথা আর উল্লেখ করবে না। তিনি ভূমিকাকে হাদীস চর্চার জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আমীর বলেন, তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি দারুল হাদীস নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমীরদের অন্তরে তার ভীতি ছিল প্রবল, অনুমতি ব্যতীত তার সামনে বসার সাহস কারো ছিলনা। আমীর নাজমুদ্দীনে আইয়ূব ছাড়া আর কেউ বিনা অনুমতীতে তাঁর সামনে বসতে পারতোনা, আসাদুদ্দীনে শেরবাহ এবং হালবের নায়িব সাজদুদ্দীন ইবনুদ দায়াহত তার সামনে দণ্ডায়মান থাকতেন। এতদসত্ত্বেও কোনো ফকীহ বা কোনো সমীর (সাধু-সজন) তাঁর দরবারে এলে তিনি দণ্ডায়মান হতেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছুদূর হেটে ধীরে সুস্থে সসম্মানে তাকে গদীতে বসাতেন। তাদেরকে কোনো কিছু দান করলে তখন অধিকন্তু বলতেন, এঁরা হলেন আল্লাহর সৈনিক, এদের দোয়ার বরকতে আমরা দুশমনের উপর জয়লাভ করি। আমি তাদেরকে যা দান

করি, বায়তুল মালে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অধিকার রয়েছে। আর আমাদের নিকট থেকে কিছু অধিকার গ্রহণ করে তারা সন্তুষ্ট হলে আমাদের প্রতি এটা তাদের কৃপা। তাকে হাদীসের একটা অংশ শোনানো হয় তাতে উল্লেখ ছিল–

فخرج رسول الله صلاى الله عليه وسلم متقلدا السيف

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহিওয়াসাল্লাম গলায় তরবারী ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসেন।"

তিনি বিস্মেত হন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যেসব অভ্যাস প্রমাণিত আছে। লোকেরা তা থেকে কেমন করে বিগড়ে যায়। সৈন্য আর আমীররা কেমন করে কোমরে তরবারী ঝুলায়। পরদিন তিনি যখন সৈন্যদের কাছে গমন করেন, তখন তার গলায় তরবারী ঝুলাইল। আর সমস্ত সৈন্যদের অবস্থান এমনই ছিল। এ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাসুলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।

তাঁর উযীর মুয়াদযাবুদ্দীন খালিদ ইবন মুহাম্মদ ইবন নছর আল কায়সারানী আল-মাইর তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি স্বপ্নে দেখতে পান, যেন তিনি বাদশাহ নুরুদ্দীনের বস্ত্র ধৌত করে দিচ্ছেন, এ স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি উযীরকে দেশ থেকে কর রহিত করার ফরমান জারী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এটাই হলো তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং তিনি লোকজনকে লিখে দেন যে, তাদের নিকট থেকে ইতিপূর্বে যা কিছু নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা মুক্ত। তিনি তাদেরকে বলতেন, এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে দুশমন ফকিরদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করা, দেশ ও জনগণ এবং নারী ও শিশুদের রক্ষার কাজে। গোটা দেশের সকল দায়িত্বশীলদের নিকটও এ কথা তিনি লিখে পাঠান। তবে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কর আদায় বৈধ– এমন কথা ওয়ায মাহফিলে বলার জন্য তিনি ওয়াযকারীদের প্রতি নির্দেশ দান করেন, আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে তিনি বলতেন,

اللهم ارحم المكاس العشر الظالم محمود الكلب

"হে আল্লাহ! ট্যাকস ও ওশর আদায়কারী মালিক মাহমূদ আল কালব-এর প্রতি তুমি রহম কর।" বলা হয়ে থাকে যে, ফকিরদের সঙ্গে যুদ্ধে ট্যাকসের অর্থ দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করার বিষয়ে বুরহানুদ্দীন বলখী আপত্তি উত্থাপন করেন। একবার তিনি বাদশাহ নূরুদ্দীনকে বলেন, কীভাবে আপনি সাহায্য লাভ করবেন। অথচ আপনার সৈন্যদের মধ্যে রয়েছে মদ্যপায়ী, আরো আছে ঢোল ও তবলার ব্যবহার। কথিত আছে যে, নগর ও জনপদ থেকে বাদশাহ নূরুদ্দীন কর্তৃক 'কর' রহিত করার একটা কারণও আছে। আর সে কারণটি হলো এই যে, সে সময় একজন বিশিষ্ট নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আবূ উসমান আল মুন্তাখাব ইবন আবূ মুহাম্মদ আল ওয়াসিতী। ইনি ছিলেন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, সম্পদ বলতে তাঁর কিছুই ছিলনা এবং তিনি কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণও করতেন না, একটা জুব্বা ছিল তাঁর সম্বল। ওয়াযের মাহফিলে গমনকালে তিনি এ জুব্বাটি পরিধান করতেন। আর তাঁর ওয়াজ মাহফিলে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হতো। একবার তিনি বাদশাহ নূরুদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে একটা দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। এ কবিতায় তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা হলো–

مثل وقوفك أيها المغرور * يوم القيامة والسماء تمور
إن قيل نور الدين رحت مسلما * فاحذر بأن تبقى ومالك نور
أنهيت عن شرب الخمور وأنت في * كأس المظالم طائش مخمور
عطلت كاسات المدام تعففا * وعليك كاسات الحرام تدور
ماذا تقول اذا نقلت إلى البلى * فردا وجاءك منكر ونكير
ماذا تقول إذا وقفت بموقف * فردا ذليلا والحساب عسير
وتعلقت فيك الخصوم وأنت في * يوم الحساب مسلسل مجرور
وتفرقت عنك الجنود وأنت في * ضيق القبور موسد مقبور
ووددت أنك ما وليت ولاية * يوما ولا قال الأنام أمير
وبقيت بعد العز رهن حفيرة * في عالم الموتى وأنت حقير
وحشرت عريانا حزينا باكيا * قلقا ومالك في الأنام مجير
أرضيت أن تحيا وقلبك دارس * عافي الخراب وجسمك المعمور
أرضيت أن يحظى سواك بقربه * أبدا وأنت معذب مهجور
مهد لنفسك حجة تنجو بها * يوم المعاد ويوم تبدو العور

"হে প্রতারিত ব্যক্তি! কিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যেদিন তুমি দণ্ডায়মান হবে আর আসমান আবর্তন করবে।

যদি বলা হয় নূরুদ্দীন গত হয়েছে মুসলিম হিসাবে তবে সতর্ক হও যে তুমি বেঁচে থাকবে। কিন্তু তোমার জন্য কোনো নূর থাকবে না।

তুমি কি মদ্যপান ব্যরণ করেছ, আর তুমি নিজেতো অন্যায়-অনাচারের পানপাত্র নিয়ে বিভোর।

নিজেকে পূতঃপবিত্র যাহির করার জন্য তুমি পানপাত্র ত্যাগ করেছ শুধু আর হারামের পানপাত্র তোমার চারপাশে ঘুর ঘুর করছে।

তুমি একাকী যখন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন কী বলবে? আর তখন তোমার নিকট উপস্থিত হবে মুনকার ও নাকীর নামের ভয়ংকর ফিরিশতা। যখন একা তুমি প্রান্তরে দাঁড়াবে অপদস্থ হয়ে, আর হিসাব হলে কঠিন-কঠোর, তখন তোমার কী বলার থাকবে?

প্রতিপক্ষ তোমাকে পাকড়াও করবে, আর তুমি থাকবে শৃংখলে আবদ্ধ।

আর সেদিন তোমারে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

যেদিন সৈন্য সামন্ত তোমাকে ছেড়ে যাবে, আর তুমি সংকীর্ণ কবরে পড়ে থাকবে।

সেদিন তুমি কামনা করবে যে, যদি একটা দিনের জন্যও তুমি শাসক না থাকতে, আর জগৎবাসী যদি তোমাকে আমীর না-ইবা বলতো।

সম্মানের পর তুমি পড়ে থাকবে বিরান কবরে মৃতদের মধ্যে আর তখন তুমি হবে তুচ্ছ।

তোমার হাশর হবে উলঙ্গ অবস্থায়, দুঃখে তুমি কাঁদতে থাকবে, যেদিন তুমি থাকবে ব্যাকুল, তোমাকে আশ্রয় দেয়ার কেউ থাকবে না, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, তুমি বেঁচে থাকবে আর মন থাকবে নির্জীব, বিরান প্রান্তরে নিঃসাড়, আর তোমার দেহ থাকবে আবাদ?

তুমি কি এতে তুষ্ট যে, অন্যরা তোমার নৈকট্য দ্বারা ধন্য হোক, আর তুমি পড়ে থাকবে নির্জনে পরিত্যক্ত অবস্থায়! যেখানে সর্বদা তোমার আযাব হতে থাকবে। তুমি তোমার নিজের জন্য কিছু পুঁজি সঞ্চয় কর, যদ্দারা কিয়ামতের দিন, যেদিন ভাল-মন্দ প্রকাশ পাবে, সে দিন তুমি নাজাত পেতে পার।"

উপরোক্ত কবিতাগুলো শ্রবণ করে বাদশাহ নূরুদ্দীন ভীষণ রোদন করেন এবং গোটা দেশ থেকে কর রহিত করার জন্য নির্দেশ জারী করেন,

শায়খ উমর মোল্লা নূরুদ্দীনকে সুদেল থেকে পত্র লিখেন, আর তিনি মুশেলের শাসক আর আমীরদের যে নির্দেশ দিয়ে রাখেন যে, মোল্লা উমরকে অবহিত না করে তারা যেন সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। মোল্লা ওমর যে নির্দেশ দিতেন, তারা তা মেনে চলতো। আর এ মোল্লাহ উমর ছিলেন দুনিয়াত্যাগী সাধু ব্যক্তিদের অন্যতম। প্রতি বছর রমযান মাসে মোল্লা উমরের নিকট থেকে টাকা ধার নিতেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি ইফতারির আয়োজন করতেন। আর নূরুদ্দিন মোল্লা উমরের নিকট রমযান মাসে পাতলা রুটি প্রেরণ করতেন, আর এ রুটি দিয়েই তাঁর গোটা রমযানের ইফতার চলতো।

একবার শায়খ উমর মোল্লাহ বাদশাহ নূরুদ্দীনকে পত্র লিখেন–

ان المفسدين قد كثروا ويحتاج الى سياسة ومثل هذا لا يجيء الا بقتل وصلب وضرب واذا أخذ انسان فى البرية من يجيء يشهد له۔

"সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ দিকে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। আর এজন্য দরকার হত্যা করা, শুলিবিদ্ধ করা এবং প্রহার করা। কোনো মানুষকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে গেলে কে স্বাক্ষী দিতে আসবে?"

পত্রের অপর পৃষ্ঠায় বাদশাহ নূরুদ্দীন লিখে পাঠান–

ان الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو اعلم بما يصلحهم ولو علم ان فى الشريعة زيادة فى المصلحة لشرعها لنا فلا حاجة بنا الى الزيادة على ما شرعه الله تعالى فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادتا وهذا من الجراة على الله ةعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدى والله سبحانه يهدينا واياك الى صراط مستقيم۔

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টলোককে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের জন্য আইন-বিধান দান করেছেন, কিসে তাদের মঙ্গল হবে, তা তিনিই ভাল জানেন। তিনি যদি জানতেন যে, শরীয়তে আরো অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন তবে তিনি তাই আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি আমাদের দরকার

নেই। যে ব্যক্তি এর সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে পায়, সে ধারণা করেছ শরীয়ত অসম্পূর্ণ। সংযোজন করে সে শরীয়তকে পরিপূর্ণ করতে চায়। আর এমন করা আল্লাহ এবং তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই পায় না, আর অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান সৎপথ পায় না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করুন।"

মোল্লাহ উমরের নিকট পত্র পৌছলে যিনি মুশেলের লোকজনকে সমবেত করে পত্র পাঠ করে শোনান এবং বলতে থাকেন, এই যেন বাদশাহের প্রতি দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তি, আর দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তির প্রতি বাদশাহের পত্র।

শায়খ আবুল বয়ানের ভাই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অফিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আগমন করে। তার অভিযোগ লোকটি তাকে মন্দ বলেছে, অপবাদ দিয়েছে তাকে একথা সে কথা বলেছে। লোকটি বারবার অভিযোগ করছিল। তার অভিযোগ শ্রবণ করে বাদশাহ বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি,

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوا سَلَامًا۔(الفرقان : ٦٣)

"অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদেরকে সম্বোধন করলে তারা বলে, সালাম। (সূরা ফুরকান, ৬৩)।" আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ۔(الاعراف : ١٩٩)

"আর অজ্ঞ লোকদেরকে এড়িয়ে চলো (আল আরাফ : ১৯৯)।" এতে শায়খ চুপ হয়ে যান, কোনো জবাব দিতে পারেননি। অথচ নূরুদ্দীন এ ব্যক্তি এবং তাঁর ভাই আবুল বয়ানের ভক্ত ছিলেন এবং বহুবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করেছেন। কিছু সময় সেখানে অবস্থানও করেছেন। বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট ফকীহ আবুল ফাতাহ আল আদায়ী। যিনি বাদশাহ নূরুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থও সংকলন করেছেন, তিনি বাদশাহ নূরুদ্দীন সম্পর্কে বলতেন,

وكان نور الدين محافظا على الصلوات فى اوقاتها فى جماعة بتمام شروطها والقيام بها باركانها والطمانينة فى ركوعها وسجودها وكان كثير الصلاة بالليل كثير الإبتهال فى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل فى أموره كلها. قال وبلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام اخذ القدس الفرنج فسمعهم يقولون : ان القسيم ابن القسيم ـ يعنون نور الدين ـ له مع الله سر فإنه لم يظفر وينصر علينا بكثرة جنده وجيشه وانما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل فإنه يصلى بالليل ويرفع يده الى الله ويدعو فانه يستجيب له ويعطيه سوله فيظفر علينا. قال : فهذا كلام الكفار فى حقه.

"আর নূরুদ্দীন যথা সময়ে সমস্ত শর্ত-শরায়েত পালন করে নিয়মিত জামায়াত সহকারে নামায আদায় করতেন। তিনি ধীর স্থির ভাবে রুকু-সেজদা আদায় করতেন এবং নামাযে দণ্ডায়মান হতেন। রাত্রিকালে তিনি অধিক নামায আদায় করতেন। দোয়ায় তিনি অধিক

কাকুতি-মিনতি করতেন, তার সমস্ত বিষয়ে তিনি মহান আল্লাহর নিকট মিনতি সহকারে দোয়া করতেন। তিনি আরো বলেন, একদল সূফী যাদের কথায় আস্থা রাখা যায়, তাদের বরাতে আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, খ্রিস্টানরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করে নেয়, তখন একদল সুফী বায়তুস মুকাদ্দাস যিয়ারত করার জন্য সেখানে প্রবেশ করে। সেখানে তারা খ্রিস্টানদেরকে বলতে শুনেন যে, কাসীন ইবনুল কাসীম অর্থাৎ বাদশাহ নূরুদ্দীন আল্লাহর সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক আছে। কারণ, অধিক সংখ্যক সৈন্য-সামন্তের জোরে তিনি আমাদের উপর জয়লাভ করেননি, বরং তিনি আমাদের উপর জয়লাভ করেছেন দোয়া আর রাত্রিকালীন নামাযের বদৌলতে। কারণ, তিনি গভীর রাতে নামায আদায় করতেন এবং আল্লাহর দরবারে হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করতেন, আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিতেন, তাঁর মনের ইচ্ছা পূরণ করতেন। এর বদৌলতে তিনি আমাদের উপর জয়লাভ করতেন। তিনি বলেন, তাঁর সম্পর্কে এটাই হলো ফকিরদের অভিমত।

শায়খ আবু শামা উল্লেখ করেন যে, নূরুদ্দীন আলময়দান বাগানটা (পার্শ্ববর্তী জঙ্গল বাদে) ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এ বাগানের অর্ধেক অংশ দামিশক নগরীর জামি' মসজিদের শোভা বর্ধনের জন্য। বাকী অর্ধেককে দশ ভাগে বিভক্ত করে তার দু'ভাগ ওয়াক্ফ করেন তার প্রতিষ্ঠিত হানাফিয়া মাদ্‌রাসার শোভা বর্ধনের জন্য, আর অবশিষ্ট আট ভাগ ওয়াক্ফ অন্যান্য মসজিদের জন্য। সে মসজিদগুলো হলো : ১ কায়মূন পর্বতস্থ মসজিদ আছ-ছালেহীন ২. কিল্লা মসজিদ, ৩. আতিয়া মসজিদ, ৪. আসকারে অবস্থিত ইবন লবীদ মসজিদ, ৫. মসজিদ রামাহীন আল-মুয়াল্লাক, ৬. সালেহিয়্যায়স্থ মসজিদুল আব্বাস, ৭. দারুল বিত্তীখ আল-মুয়াল্লাক মসজিদ, ৮. এবং ইয়াহুদীদের গির্জার পার্শ্বে নূরুদ্দীন কর্তৃক নির্মিত নতুন মসজিদ। এসব মসজিদের প্রত্যেকটির জন্য অবশিষ্ট অর্ধেক অংশের এগার ভাগের এক ভাগ। তাঁর কীর্তি গাঁথা আর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তা থেকে কিছু অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করলাম, যাতে অন্যগুলো সম্পর্কে এ দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়।

শায়খ শিহাবুদ্দীন রাওযাতাইন গ্রন্থের শুরু হত তার অনেক গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। তিনি তার প্রশংসায় রচিত ফকিহ্ কাসীদাও উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আসাদুদ্দীন দিয়ারে মিশর জয় করে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর সালাহুদ্দীন শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। তাকে বরখাস্ত করে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করার কথা চিন্তা করেন, কিন্তু খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ তাকে এ চিন্তা থেকে বিরত রাখে। ইতিমধ্যে তার জীবনকাল ফুরিয়ে আসে। এ বছর অর্থাৎ বিজয়ী ৫৬৯ সন ছিল তাঁর জীবনের শেষ বছর। এ বছর তিনি দিয়ারে মিসরে গমন করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। মুসেল ও অন্যান্য অঞ্চলের সৈন্যদের নিকট তিনি বার্তা প্রেরণ করেন, তারা যেন সিরিয়ায় অবস্থান করে, যাতে তার অবর্তমানে খ্রিস্টানদের হাত থেকে ছেলেকে রক্ষা করা যায়। আর তিনি নিজে সাধারণ সৈন্যদের নিয়ে মিশর অভিমুখে গমন করবেন। এতে বাদশাহ সালাহুদ্দীন ভীষণ সংকিত হয়ে পড়েন।

এ বছর ঈদুল ফিতরের দিন উপস্থিত হলে তিনি নিকটস্থ সবুজ প্রান্তরে গমন করে সেখানে ঈদের নামায আদায় করেন। এ দিন ছিল রোববার। এখানে উত্তর দিকের সবুজ প্রান্তরে তিনি তীর ছুঁড়ে ফেলেন, আর নিয়তি তাকে বলছিল এটা হলো তোমার জীবনের শেষ ঈদ। এ দিন

তিনি এক জমকালো ভোজের আয়োজন করেন। এ ভোজে সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। আর এ দিন তাঁর নিষ্ঠাবান সত্যনিষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করা হন। এ উপলক্ষে শহরকে সজ্জিত করা হয়। ঈদ এবং খাতনা উপলক্ষে ঢোল বাজানো হয়। অতঃপর সোমবার যানবাহনে আরোহণ করা হয় এবং রীতি অনুযায়ী অবনত হয়। এ দিন তিনি পোলো খেলেন এবং জনৈক আমীরের ব্যাপারে তিনি ক্রোধান্বিত হন। এভাবে ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁর অভ্যাস বা রীতি ছিল না। চরম ক্রোধের মুহূর্তে তিনি দ্রুত দূর্গ অভিমুখে ছুটে যান। তিনি চরম অস্থির। চরম মানসিক অস্থিরতায় তিনি হাবুডুবু খান। মনোকষ্টে তিনি ছটফট করছেন তার বোধ ও বোধি বিকৃত হয়ে পড়ে। এক সপ্তাহ তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করেন। সাধারণ মানুষের এ ব্যাপারে কোনো খবর নেই, কারণ তারা খেলাধূলায় মত্ত। তার সন্তানের পরিচ্ছন্নতা উপলক্ষে এ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকলেই আনন্দ-উল্লাস আর আমোহ আহ্লাদে আত্মহারা। ইহা আনন্দ-উল্লাস বিক্ষপে পর্যবশিত হয়ে যায়, চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়, কী হলো, কী হলো। জানা গেল, বাদশাহর গলায় ব্যথা, কথা বলা কষ্ট। শিঙ্গা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়, কিন্তু তিনি তা মানতে নারাজ। দ্রুত চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করতে হয়, এ পরামর্শও তিনি গ্রহণ করেন না। আল্লাহর ইচ্ছাইতো চূড়ান্ত। এ বছর ১১ই শাওয়াল বুধবার ৫৮ বছর বয়সে তিনি আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। এর মধ্যে ২৮ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। দামিশকের কেল্লা মসজিদে তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়। এরপর হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য নির্ধারিত গোরস্থানে নিয়ে তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তার কবর যিয়ারত করা হয়। তার কবরের সাথে হলক ব্যবহার করা হয়। যেকোন পথচারী তা দ্বারা বরকত হাসিল করে। তারা বলে : এ হলো শহীদ নূরুদ্দীনের কবর। কারণ, তার গলায় খানুয ব্যাধি ছিল, অনুরূপভাবে তাঁর পুত্রকেও শহীদ বলা হতো। আর তাঁর লকব ছিল আল-কাসীম। আর খ্রিস্টানরা তাকে আল-কাসীম ইবনুল্ কাসীম বললে, তাঁর তিরোধানে কবিরা অনেক শোক গাঁথা রচনা করেন। আবূ শামা তার গ্রন্থে সেসব শোক গাথা উল্লেখ করেছেন। কবি আল-ইমাদ তাঁর সম্পর্কে কি চমৎকার বলেছেন :

عجبت من الموت لما أتى * الى ملك فى سجايا ملك

وكيف ثوى الفلك المستد * ير فى الارض وسط فلك

"যখন মৃত্যু আসে বাদশাহের নিকট রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে, তখন আমি বিস্মিত হই। কেমন করে আশ্রয় নেয় বৃত্তাকার আকাশ মাটির অভ্যন্তরে বৃত্তের মধ্য ভাগে!"

নূরুদ্দীনকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা চত্তরে যখন দাফন করা হয়, তখন কালা লকবধারী কবি হাসসান তাঁর সম্পর্কে বলেন :

ومدرسة ستدرس كل شىء * وتبقى فى حمى علم ونسك

تضوع ذكرها شرقا وغربا * بنور الدين محمود بن زنكى

يقول وقوله حق وصدق * بغير كناية وبغير شك

دمشق فى المدائن بيت ملكى * وهذى فى المدارس بنت ملكى

"মাদ্‌রাসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হবে সবকিছু, আর তুমি বেঁচে থাকবে জ্ঞান আর ত্যাগের চারণ ভূমিতে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে গুঞ্জন ধরবে, নূরুদ্দীন মাহমূদ ইবন জঙ্গির স্মরণে। তিনি কথা বলেন কোনো দ্ব্যর্থতা, আর কোনো সংশয় ছাড়াই আর তাঁর কথা হতো হক ও সত্য।

নগর মাঝে দামিশ্‌ক হলো আমার দারুল খিলাফত আর মাদ্‌রাসা সমূহের মধ্যে আমার এ মাদ্রাসা হলো আমার রাজত্বের কন্যা সম।

নূরুদ্দীন (র)-এর পরিচয়

তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতির , তাঁর গাত্র বর্ণ ছিল দাম-এর মতো, চক্ষু যুগল ছিল চমৎকার, কপাল ছিল প্রশস্ত, মুখমণ্ডল ছিল সুদর্শন গোলগাল আকৃতি, চিবুকে কয়েক গাছি দাড়ি ছিল মাত্র, তাঁকে দেখে সমীহ করা হতো, স্বভাবে তিনি ছিলেন বিনয়ী, তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল এক অপরূপ দীপ্তি ইসলাম এবং দীনের মূলনীতিকে তিনি সম্মান করতেন। তিনি ইসলামী শরীয়তেরও সম্মান করতেন।

অনুচ্ছেদ

এ বছর শাওয়াল মাসে বাদশাহ নূরুদ্দীন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র সালিহ ইসমাঈলের হাতে বাদশাহীর বায়য়াত গ্রহণ করা হয়, সালিহ ইসমাঈল তখন ছোট ছিলেন, তাই আমীর শামসুদ্দীন ইবনে মাকছামকে তার 'আতালীক' নিযুক্ত করা হয়। এ সময় আমীররা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, আর নানা মুনির নানা মত দোয়া দেয়। মন্দ কর্ম প্রকাশ পায় এবং মদ্যপান বিস্তার লাভ করে। অথচ নূরুদ্দীনের শাসনামলে এমনটা ঘটতো না। প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম বিস্তার লাভ করে। এমন কি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুসেল অঞ্চলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন দাসী ইবন মওদূদ যখন তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হন, ইতিপূর্বে যিনি বাদশাহ নূরুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হতে পারতেন না, তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষক নদীতে খেল-তামাশা আর মদ্যপান এবং মাদক দ্রব্য ইত্যাদি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এ সময় ঘোষণাকারীর নিকট ছিল বাদ্যযন্ত্র, পানপাত্র এবং শয়তানের বাঁশী। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহী রাজিউন। অথচ বাদশাহ নূরুদ্দীনের শাসনামলে তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্যান্য আমীর উমরা কারোই সাধ্য ছিল না অন্যায় অশ্লীল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার। তাঁর মৃত্যুর পর সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে এবং এরা চারিদিকে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কবি যথার্থই বলেছেন :

الا فاسقنی خمرا وقل لی هی الخمر * ولا تسقنی سرا وقد امکن الجهر

"হে প্রেয়সী! আমাকে মদপান করাও এবং বলো : এতো মদ, গোপনে পান করাবে না, প্রকাশ করার তো সময় হয়েছে।"

এ সময় চতুর্দিক থেকে শত্রুরা মুসলমানদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আর খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নিকট থেকে দামিশ্‌ক নগরী ছিনিয়ে নিতে সংকল্প বদ্ধ হয়। তাই ইবন মাকদাম আতাবিক তাদের মোকাবিলায় বের হন, বানয়াম নামক স্থানে তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হন এবং তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে দুর্বল হয়ে পড়েন। দীর্ঘ দিনের জন্য তিনি

তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন এবং তাদেরকে বিপুল অর্থ প্রদান করেন। আর এ অর্থ অবিলম্বে পরিশোধ করেন। বাদশাহ নাছিরুদ্দীন ইউসুফ এর আগমনের আশংকা না থাকলে তারা চুক্তিবদ্ধ হতো না। সালাহুদ্দীন এ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি উমরাদের প্রতি, বিশেষ করে ইবন-মকদামের প্রতি নিন্দা সূচক পত্র লিখেন এবং অর্থ দানের জন্য তাদের ভর্ৎসনা করেন। অথচ খ্রিস্টানরা সংখ্যায় ছিল স্বল্প এবং মানমর্যাদায় ছিল অতি তুচ্ছ ও নগন্য। তিনি তাদেরকে এ মর্মে জ্ঞাত করেন যে, খ্রিস্টানদের হাত থেকে শাম দেশকে রক্ষা করার জন্য তিনি সেখানে আগমন করতে সংকল্প বদ্ধ হন। তারা পত্রের জবাব দেয়, যাতে ছিল কঠোরতা আর কটুক্তি। কিন্তু তিনি এ সবের প্রতি বিন্দুমাত্রও পরোয়া করেননি। তাকে বেশি ভয় করার কারণে মুসেলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন গাজীর নিকট পত্র লিখেন, তিনি যেন তাকে তাদের উপর বাদশাহ করে নেন। ফলে তিনি মিসরের অধিপতি মালিক নাছির সালাহুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঠেকাবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কারণ তাঁর মনে ভয় জাগে, যেন এটা তাদের ষড়যন্ত্রে পরিণত না হয়। আর তার কারণ ছিল এই যে, সাদ-উদ-দৌলা মুস্তাকীন, যাকে বাদশাহ নুরুদ্দীন গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেন, যাকে বাদশাহ নুরুদ্দীন গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করেন, তার দায়িত্ব ছিল অন্যায়-অশ্লীল, অসমীচীন কর্মকাণ্ড এবং মদ্যপান ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা। এসবের ভয়ে সে পলায়ন করে। নুরুদ্দীনের মৃত্যু হলে মুসেল অঞ্চলে এসব জঘন্য ঘোষণা প্রচার করে। ধরা পড়ার ভয়ে সে গোপনে গোপনে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গাজী যখন তার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হন, তখন তিনি এই খাদিমের পেছনে লোক প্রেরণ করে। কিন্তু সে তাকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পদ অধিকার করে নেয়। এই সময় তাওয়াঈবাসী হলব অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে দামিশ্‌কে রওয়ানা হয়। উমরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, নুরুদ্দীনের পুত্র বাদশাহ সালেহ ইসমাঈলকে তিনি হালব অঞ্চলে নিয়ে যাবেন। এবং সেখানে তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করবে তার মুরব্বী সহলের পিতা। আর দামিশ্‌ক নগরী আতাবিক শামসুদ্দৌলা ইবন মিকদামিক এর নিকট ন্যস্ত করা হবে। আর দুর্গ ন্যস্ত করা হবে জামাল উদ্দীন রায়হানের নিকট। বাদশাহ সালেহ যখন দামিশ্‌ক থেকে রওয়ানা হন, তখন আমির কবিরাও তার সঙ্গে দামিশ্‌ক থেকে হালব অঞ্চলে গমন করেন। আর এই ঘটনা এ বছরের শেষ জ্বিলহাজ্ব তারিখের। তারা যখন হালব অঞ্চলে পৌঁছেন, তখন শিশু রাজসিংহাসনে আরোহণ করে। আর তারা বানূ আল দায়া শামসুদ্দীন ইবন আল দায়া, যিনি ছিলেন মাজদুদ্দীনের ভ্রাতা এবং নুরুদ্দীনের দুধভাই, এদের তিন ভাইয়ের লালন-পালন করেন। আর শামসুদ্দীন আলী ইবন আল দায়া'র ধারণা ছিল, নুরুদ্দীনের পুত্রকে তার কাছে ন্যস্ত করা হবে এবং তিনি সেই পুত্রের লালন পালন করবেন। কারণ তিনি সকলের মধ্যে এজন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু তিনি এই ধারণা ব্যর্থ করে দেন এবং তাকে এবং তার ভাইদেরকে কূপের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন আর সালাহউদ্দীন শিশুপুত্রকে দামিশ্‌ক থেকে হাল্‌ব অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া এবং ধনী আল-দায়াকেও বন্দী করার বিষয়ে আমীরদেরকে তিরস্কার করে পত্র লেখেন। অথচ এরা ছিল সর্বোত্তম আমীর এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আর কেন পুত্রকে মাজদুদ্দীন ইবন আল দায়ার নিকট সোপর্দ করেনি, যিনি সবচেয়ে বেশী নুরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং অন্যান্য লোকের নিকট ও যার স্থান ছিল সবচেয়ে উচ্চ। তারা তার সঙ্গে বেয়াদবী করে পত্র প্রেরণ করে।

এই সবকিছু তাকে আরও অসন্তুষ্ট করে তোলে এবং তাকে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এ সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। কারণ, এ সময় মিশরে এক বিরাট প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তী বছরের শুরুতে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা করা হবে- ইনশাআল্লাহ।

এ হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আল হাসান ইবন আল হাসান : ইনি হলেন ইবন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আত্তার আবুল আলা আল হামদানী আল হাফিয। অনেকের নিকট থেকে ইনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক দেশ সফর করেন। অনেক বড় বড় শায়খের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বাগদাদ নগরীতে আগমন করে, অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং ইলমে কিরাআত আর অভিধান শাস্ত্রে তিনি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এমনকি তাঁর সময়ে কিতাব এবং সুন্নাহর জ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ছিলেন সত্য-সঠিক মাজহাবের অনুসারী ব্যক্তি। ইনি ছিলেন সুস্থ আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী এবং তার উদ্দেশ্য ছিল সৎ। পার্থিব কোনো লোভ-লালসা তার ছিল না। তাঁর দেশে তাঁর বিরাট মর্যাদা ছিল এবং তিনি সর্ব মহলে জনপ্রিয় ছিলেন এ বছর ২১ 'জুমাদাল উখরা', বৃহস্পতিবার রাত্রে তার ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ৮০ বছরের চেয়ে চার মাস কয়েক দিন বেশী ছিল। ইবনুল জাওযী বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, কোন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখতে পায় যে, তিনি একটি শহরে আছেন এবং সেই শহরের সমস্ত দেয়াল গ্রন্থে পরিপূর্ণ। আর চারিদিকে কেবল বই আর বই। আর তিনি এসব বই অধ্যয়নে নিয়োজিত আছেন। সেখানে এত বেশি বই যার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। স্বপ্নযোগে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় : এটা কী? তিনি বললেন : দুনিয়াতে আমি যে কাজে মত্ত ছিলাম আমাকে যেন সে কাজে ব্যস্ত রাখা হয় তা আমি আল্লাহর নিকট কামনা করি। ফলে আল্লাহ্ আমাকে তা দান করেছেন। এ বছর আরো অনেকেই ইন্তিকাল করেন :

আল-আহওয়াযী

ইনি ছিলেন বাগাদাদে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাজারের গ্রন্থাগারের লাইব্রেরীয়ান। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে অকস্মাৎ তার মৃত্যু হয়।

মাহমুদ ইবন জঙ্গী ইবন আকসাঙ্কার : ইনি হলেন সুলতান, ন্যায়পরায়ণ শাসক নুরুদ্দীন। ইনি ছিলেন শামদেশের অনেক বড় বড় নগরীর শাসনকর্তা। খ্রিস্টানদের সাথে তিনি জিহাদে নিয়োজিত থাকতেন। ভাল কাজের নির্দেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে বারণ করতেন। আলেম-ওলামা, সাধু-সজ্জন এবং অসহায় দুস্থ ব্যক্তিদেরকে ভালবাসতেন। এবং জুলুম অত্যাচারকে ঘৃণা করতেন। সুস্থ-সঠিক আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী এই ব্যক্তি ভাল কাজকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর শাসনা লে কেউ কারো প্রতি অবিচার করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। মন্দ কর্ম এবং মন্দ লোকদেরকে তিনি কঠোরভাবে দম করেন এবং জ্ঞান ও শরীয়তের মর্যাদা উন্নত করেন। ইনি সর্বদা রাত্রি জাগরণ করে নামায আদায় করতেন এবং রোযা পালন করতেন। মনের কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। মুসলমানদের জন্য সহজ কর্মকাণ্ডকে তিনি পছন্দ করতেন। আলিম, ফকির, মিসকীন, এতীম ও বিধবাদের নিকট তিনি দান-দক্ষিণা পাঠাতেন। তার কাছে দুনিয়া ছিল তুচ্ছ ও মূল্যহীন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন এবং রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা তার কবরকে সিক্ত করুন।

ইবনুল জাওযী বলেন, নুরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে জঙ্গি, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তিনি কাফিরদের হাত থেকে ৫০ এর অধিক নগরী পুনরুদ্ধার করেন। তিনি আমার নিকট পত্র লিখতেন, আমিও তার কাছে পত্র লিখতাম। তিনি বর্ণনা করেন যে, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার পুত্র সালেহ ইসমাঈলের পক্ষে আমীরদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং ত্রিপোলীর শাসনকর্তার নিকট থেকে নতুন করে শপথ আদায় করেন যে, যতদিন শাম দেশে তার সৈন্য অবস্থান করবে, ততদিন তিনি সেখানে অভিযান চালাবেন না। আর এর কারণ ছিল এই যে, এক যুদ্ধে তিনি তাকে বন্দী করেন, তৎসঙ্গে আরো কিছু সরকারী কর্মকর্তাকেও বন্দী করা হয়। এ সময় তিনি ৩ লাখ দিনার, পাঁচশত অশ্ব, পাঁচশত গোলাপী পোশাক এবং কানতুরিয়াত এবং পাঁচশত মুসলিম বন্দী ফিদিয়া হিসেবে দান করে নিজেকে মুক্ত করেন। এ সময় তিনি তার সঙ্গে চুক্তি করেন যে, তিনি ৭ বছর ৭ মাস ৭ দিন মুসলমানদের শহরে অভিযান চালাবেন না। এর জামানত হিসেবে তিনি খ্রিস্টান জেনারেলদের ১০০ সন্তানকে মুক্তিপণ হিসেবে আটক করেন। চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে এদেরকে হত্যা করা হবে। ইনি বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এ বছর শাওয়াল মাসে তার এই আকাঙ্খা পূরণ হয়। আর আমলের গুণাগুণ তো নিয়তের উপর নির্ভর করে। ফলে তিনি যা নিয়ত করেন তার ফল ভোগ করেন। তার শাসনকাল ছিল ২৮ বছর কয়েক মাস। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। এ হচ্ছে ইবনুল জাওযীর বর্ণনার সারকথা।

আল খিজির ইবন নসর

ইনি হলেন 'আলী ইবন নসর আল আরবিলী। ইনি ছিলেন শাফেয়ী মাজহাবের বিরাট ফকীহ। আরবিল নগরীতে ৫৩৩ হিজরী সনে ইনি প্রথম দরস দান করেন। ইনি ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী এবং দ্বীনদার ব্যক্তি। তার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হয়। বাগদাদ নগরীতে তার কাজ-কারবার ছিল। ইবন আসাকীর এ বছরের ঘটনাবলীতে তার নাম উল্লেখ করেন। আর ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান তার আল ওয়াফিয়্যাত গ্রন্থে তার জীবনী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তার কবর যিয়ারত করা হয়। আমি একাধিক বার তার কবর যিয়ারত করেছি। তার কবরে গমন করে লোকজনকে বরকত হাসিল করতে আমি দেখেছি। ইবন খাল্লিকানের এই ধরনের উক্তির নিন্দা এবং বিরোধিতা করেন জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদের মতে কবরকে তাজিম করার কিছুই নেই। এ বছর খ্রিস্টানদের সম্রাজ্ঞী মেরী মৃত্যুবরণ করে। আমার ধারণা, তিনি ছিলেন আসকালান এবং অন্যান্য শহরের বাদশাহ। মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত না থাকলে ফিরিঙ্গী বাদশাহ মিশর অঞ্চল অধিকার করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

হিজরী ৫৭০ সনের ঘটনাবলী

এ হিজরী সনের সূচনাতে সুলতান মালিক নাসের সালাহউদ্দীন ইবন আইয়ুব শামদেশকে খ্রিস্টানদের অধিকারমুক্ত করার জন্য বহির্গত হওয়ার সংকল্প করেন। কিন্তু এক বিশেষ কাজে ব্যস্ত হয়ে তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হতে পারেননি। আর সে কাজটি ছিল এই যে, খ্রিস্টানরা এক অশ্রুত পূর্ব উস্তুল নিয়ে মিশরীয় তীরের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের সঙ্গে ছিল অনেক অস্ত্র-শস্ত্র এবং অবরোধ করে রাখার উপকরণ ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে ছিল দুশত শিনী। এর

প্রত্যেকটিতে ছিল একশত পঞ্চাশজন যোদ্ধা। আরো ছিল অতিরিক্ত ৪০০ অস্ত্র। সাকলিয়া অঞ্চল থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে তাদের আগমন এ বছর শুরু হওয়ার ৪ দিন পূর্বে ঘটে। তারা শহরের চতুর্দিকে মিনজানিক বা কামান মোতায়েন করে। নগরবাসীরা তাদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে। আর তাদের তত্ত্বাবধানে কয়েক দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষে বেশ কিছু লোক নিহত হয়। অতঃপর নগরবাসীরা মিনজানিক এবং ট্যাংকে অগ্নিসংযোগ করতে একমত হয়। এবং তারা তাই করে। এতে খ্রিস্টানদের অন্তর কেঁপে ওঠে, তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর মুসলমানরা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদের একদলকে হত্যা করে এবং যা ইচ্ছা তা গণীমত হিসাবে গ্রহণ করে। সকল দিক থেকে খ্রিস্টানরা পরাভূত হয়। হত্যা বা বন্দী হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো পলায়নের উপায় ছিল না মুসলমানরা তাদের ধন-সম্পদ, অশ্বরাজী এবং তাঁবু অধিকার করে নেয়। মোটকথা মুসলমানরা অনেক পুরুষকে হত্যা করে, যারা বেঁচে ছিল, তারা নৌপথে নিজ দেশে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। যেসব বিষয় মালেক নাসিরকে শামদেশে আগমন করতে বাধা দেয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই যে, আল কান্‌য নামে পরিচিত এক ব্যক্তি ছিল। যাকে কেউ কেউ বলতো 'আব্বাস ইবনে সাদী। এই ব্যক্তি ছিল মিশরীয় অঞ্চল এবং ফাতেমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য। এই লোকটি একটি শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যাকে বলা হয়- আসওয়ান। সেখানে লোকজন সমবেত হতো তার চারপাশে। অনেক গন্ড মূর্খ এবং নিম্নশ্রেণীর লোক সেখানে সমবেত হয়। লোকটি এই সমবেত লোকজনকে আশ্বস্ত করে যে, সে ফাতেমী সাম্রাজ্য ফিরায়ে আনবে এবং তুর্কী শাসকদেরকে বিতাড়িত করবে। এই কারণে অনেকেই তার কাছে সমবেত হয়। এরপর তারা সকলে কাস এবং তার আশ-পাশ উদ্দেশ্য করে বের হয় এবং সেখানে অনেক পুরুষ এবং অনেক আমীরকে হত্যা করে, এ সময় সালাহউদ্দীন তাদের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেন তার ভাই আল মালিক আল আদিল আবু বকর আল কুর্দীকে। উভয়দল মুখোমুখি হলে আবু বকর তাদেরকে পরাজিত করে এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বন্দী করে এবং তাকে হত্যা করে।

পরিচ্ছেদ

নগর যখন শান্ত হয় এবং সেখানে ওবায়দী শাসনের কোন কর্তা ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন সুলতান মালেক নাসের সালাহউদ্দীন ইউসুফ তুর্কী সৈন্যদের সঙ্গে শামদেশে গমন করেন। আর এটা সে সময়ের কথা, যখন শামদেশের শাসক সুলতান মাহমুদ ইবন জঙ্গী ইন্তিকাল করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা হয় এবং দেশের ভিত্তি দুর্বল হয়ে উঠে। শাসক শ্রেণির মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয়, তাদের তোড়জোরে বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা দেয় আর এর উদ্দেশ্য ছিল অনৈক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ করা, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সদাচারণ করা, তাদের সমতল আর অসমতল ভূমিতে শান্তি স্থাপন করা, ইসলামের মদদ করা, অধমদের দমন করা, কুরআন মজীদকে প্রচার এবং প্রকাশ করা অন্যান্য সমস্ত ধর্মকে নিষ্প্রভ করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে ক্রুশ নিচিহ্ন করা এবং শয়তানকে অপদস্থ করা। তাই 'বারাকা' নামক স্থানে তিনি সফর মাসের শুরুতে অবস্থান করেন এবং সৈন্য সমাবেশ পর্যন্ত

সেখানে থেকে যান। আর তদীয় ভ্রাতা আবূ বকরকে মিসরে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। অতঃপর ১৩ বদিউল আউয়াল 'বিলকিস' গমন করেন এবং এই মাসের শেষের দিকের সোমবার দামিশ্‌ক নগরীতে প্রবেশ করেন। তথায় ২টা বকরী একে অপরকে শিং দ্বারা গুঁতা মারেনি, দু'টো তরবারীর মধ্যে বিরোধ বাধেনি। আর তা এজন্য যে, সেখানকার নায়িব শামসুদ্দিনে ইবন মিকদাম ইতিপূর্বে তাকে পত্র লিখেন এবং পত্রে তিনি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। তিনি তার অগ্রহ লক্ষ্য করে তার সঙ্গে পত্রলিপি শুরু করেন। তাকে দামিশ্‌ক আগমনের জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে থাকেন। তার নিকট শহর সমর্পণ করার ওয়াদা করেন। প্রস্তুতি লক্ষ্য করে এ ব্যাপারে বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোনো রকম প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ ছাড়াই তিনি তার নিকট শহর সমর্পণ করেন। সর্বপ্রথম সুলতান তার তদীয় পিতার গৃহ দার আল-উকায়লীতে, ভিন্ন মতে, দার আল আবীকীতে তিনি অবতরণ করেন। আল-মালিক আল-যাহির বায়বারস এ গৃহকে মাদ্রাসায় পরিণত করেন। নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাকে সালাম জানাবার জন্য আগমন করে, তাঁরা তাঁর পক্ষ থেকে পরম সদাচার লক্ষ্য করেন, তখন দূর্গের নায়িব ছিলেন তাওয়াশী রায়হান। তিনি তার সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করেন এবং তাঁর দান বৃদ্ধি করেন। অবশেষে দূর্গ তার নিকট সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি তার নিকট আগমন করলে তাকে সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর সুলতান প্রকাশ করেন যে, নূরুদ্দীনের সন্তান লালন-পালনের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি হকদার। কারণ, তাদের প্রতি নূরুদ্দীনের রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, তিনি মিসরীয় অঞ্চলে নূরুদ্দীনের নামে খুত্‌বা জারী করেন। অতঃপর সুলতান লোকজনের সঙ্গে সদাচারণ করেন এবং নূরুদ্দীনের পরে আরোপিত কর প্রত্যাহার করেন এবং ভালো কাজের নির্দেশ দান এবং মন্দ কর্মে নিষেধ আরোপের ফরমান জারী করেন। আর সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।

অনুচ্ছেদ

গোটা দামিশ্‌ক নগরী যখন তার জন্য স্থিতিশীল হয়ে উঠে তখন তিনি দ্রুত হাল্‌ব অঞ্চলে গমন করেন। কারণ সেখানে বিপর্যয় আর বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সময় তিনি তাঁর ভাই সাইফুল ইসলাম উপাধীধারী তাগতাগীন ইবন আইউবকে দামিশ্‌ক নগরীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তিনি হিম্‌ছ নগরী অতিক্রম করেন, তখন তিনি তথাকার নাড়ি কবজা করে নেন, কিন্তু তথাকার দূর্গের প্রতি মনোযোগ দান করেননি। অতঃপর তিনি হিজাদ অঞ্চলে গমন করেন এবং তথাকার শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন ইবন জিব্‌রাইলের নিকট থেকে তা হস্তগত করেন এবং তাকে তার এবং হালবীদের মধ্যে দূতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর কথা মেনে নেন, ফলে তিনি তার নিকট দমন করেন, এবং তাকে তাদের বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করেন, কিন্তু তারা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি। বরং তাকে আটক এবং বন্দী করার নির্দেশ দেয়। ফলে তিনি সুলতানকে বিলম্বে জবাব দেন, তিনি তখন তাদের উদ্দেশ্যে এক আবেগপূর্ণ পত্র লিখেন, এতে তিনি তাদের বিভেদ ও অনৈক্যের জন্য নিন্দা করেন, তারা তাঁর এ পত্রের কড়া জবাব

দেয়। এ সময় তিনি তাদের নিকট একজন লোক প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে তাঁর এবং পিতার সময়ের কথা স্মরণ করান এবং চাচা নূরুদ্দীনের খিদমতের কথা স্মরণ করান, সে খিদমত তিনি আঞ্জাম দেন প্রশংসনীয় স্থানের ক্ষেত্রে। তথাকার দ্বীনদার শ্রেণি যে খিদমতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। অতঃপর তিনি হলব অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি জওশন পর্বতের পাদদেশে অবতরণ করেন। সেখানে হলববাসীদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, যেন তারা বাবুল ইরাক এর ময়দানে সমবেত হয়। তারা সকলেই সমবেত হয়, বাদশাহ নূরুদ্দীনের পুত্র তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং ক্রন্দন করে এবং সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আর এটা করা হয় অগ্রগণ্য আমীরদের ইঙ্গিতে। আর নগরবাসীরা এর জবাব দেয় যে, প্রতিটি ব্যক্তির উপর তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর তাদের মধ্যে রাফিযীরা শর্ত আরোপ করে যে, আযানের মধ্যে "হাইয়্যা 'আলা খায়বিল আমল" তথা ভাল কাজের দিকে ছুটে এসো" বসাটা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। বাজারে একথা প্রচার করতে হবে এবং জামে মসজিদের পূর্বের অংশ তাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তারা আরো শর্ত আরোপ করে যে, জানাযার সামনে ১২ ইমামের নাম নিতে হবে এবং ৫ তাকবীর দিয়ে জানাযার নামায আদায় করতে হবে। তারা আরো শর্ত আরোপ করে যে, বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব শরীক আবূ তাহির ইবন আবুল মাকারিম হামযা ইবন সাহিব আল হুসাইনীর উপর অর্পণ করতে হবে। তিনি তাদের এসব শর্ত মেনে নেন। ফলে জামে' মসজিদসহ সারা দেশের সর্বত্র "হাইয়্যা আলা খায়রিল আমল" শব্দযোগে আযান দেয়া হয়। আল নাছেরকে ঠেকাতে তারা নগরবাসীরা অক্ষম হয়ে পড়ে। এ চক্রান্ত তারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। সর্বপ্রথম তারা হিসাব গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত শায়বানের নিকট পয়গম প্রেরণ করে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন নাছেরকে হত্যা করার জন্য। এ কাজে লোকটি সফল হয়নি বরং সে কোনো আমীরকে হত্যা করে। এরপর তাদের নিকট তা প্রকাশ পায় এবং পরে তারা অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ সময় তারা ত্রিপোলীর শাসক খ্রিস্টান আল-কাওমাসের সাথে পত্রালাপ করে এবং তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দান করে যে, তারা আল নাছেরকে হটাতে পারলে তাদেরকে অঢেল সম্পদ দেওয়া হবে। আর এই আল কাওমাসকে নূরুদ্দীন বন্দী করে ছিলেন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর তিনি আটক ছিলেন। অতঃপর এক লক্ষ দীনার এবং ১ হাজার মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করার বিনিময়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। নূরুদ্দীন এ ঘটনা ভুলতে পারেন না বরং হিমছ অধিকার করার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি বের হন। তখন সুলতান নাছের তার উদ্দেশ্যে বের হন। ইতিমধ্যে সুলতান তার দেশ ত্রিপোলী অভিমুখে একটা গুপ্ত দল প্রেরণ করেন। তারা লোকজনকে হত্যা এবং বন্দী করে গণীমত লাভ করে। নাছের তার নিকটবর্তী হলে সে পেছনে ফিরে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। তার মতে তারা যা চেয়েছিল তার জবাব দেয়া হয়েছে। নাছের যখন হিমছ গমন করে, তখন তথাকার দূর্গ অধিকার করেনি, তাই তা অধিকার করার সংকল্প গ্রহণ করেন, তাই দূর্গের উপর মিনজানিক স্থাপন করেন এবং বলপ্রয়োগে তা অধিকার করেন এবং নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে দূর্গের মালিক হন। অতঃপর তিনি হিমছ নগরীতে ফিরে আসেন। এ হামলায় তিনি যা চেয়েছিলেন, আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন। তিনি যখন সেখানে অবতরণ করেন, তখন

সুলতানের ভাষায় কাযী ফাযিল একটি পত্র লিখে খতীব শামসুদ্দীনের হাতে তা প্রেরণ করেন। ছন্দোবদ্ধ অলংকারপূর্ণ আর উন্নত মানের এ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন :

فاذا قضى التسليم حق اللقا، فاستدعى الاخلاص جهد الدعا، فليعد وليعد حوادث ماكان حديثا يفترى، وجوارى امور ان قال فيها كثيرا فأكثر منه ما قد جرى، ويشرح صدر منها لعله يشرح منها صدرا، وليوضح الاحوال المستبشره فان الله لا يعبد سرا.

ومن العجائب ان تسير غرائب * فى الارض لم يعلم بها المامول

كالعيس اقتل ما يكون لها الصدى * والماء فوق ظهورها محمول

فانا كنا نقتبس النار باكفنا، وغيرنا يستنير، ونستنبط الماء بايدينا وسوانا يسمير. ونلتقى السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير، (ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعى التصدير، ولا بد) تسترد بضاعتنا بموقف العدل الذى يرد به المغصوب ونظهر طاعتنا فتأخذ بحظ (الألسن) كما أخذ بحظ القلوب، وكان أول امرنا انا كنا فى الشام نفتح الفتوح بمباشرتنا أنفسنا، ونجاهد الكفار متقدمين بعساكرنا، نحن ووالدنا وعمنا، فأى مدينة فتحت أو اى معقل للعدو أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب ولم نكن فيه فما يجهل احد صنعنا، ولا يجحد عدونا أن يصطلى الجمرة ونملك الكرة، ونقدم الجماعة ونرتب المقاتلة، وندبر التعبئة، الى ان ظهرت فى الشام الاثار التى لنا اجرها، ولا يضرنا ان يكون لغيرنا ذكرها ثم ذكر ما صنعوا بمصر من كسر الكفر وازالة المنكر وقمع الفرنج وهدم البدع، وما بسط من العدل ونشر من الفضل، وما أقامه من الخطب العباسية ببلاد مصر واليمن والنوبة وافريقية وغير ذلك، بكلام بسيط حسن.

"যখন আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায় উপস্থিত হয়, তখন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে দু'আ করবে, তখন বারবার স্মরণ করবে আর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এমন ঘটনা প্রবাহের জন্য যা মিথ্যা ও অলীক গল্পমালা নয়। তখন এমন সব বিষয় প্রকাশ পাবে, যাকে অধিক বলা হলেও তার বেশির ভাগই অব্যাহত থাকবে, তদ্বারা বক্ষ উন্মোচিত হবে। হয়তো বা তাতেই বক্ষ খুলে যাবে, আর আনন্দদায়ক অবস্থা প্রকাশ পাবে, কারণ আল্লাহ্‌র ইবাদত থাকে না। কবির ভাষায় বলতে হয় :

"এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, পৃথিবীতে অনেক অবাক হওয়ার মতো ঘটনা রয়েছে, অথচ কেউ তা জানার আশা করবে না।

যেমন উষ্ট্র পিপাসায় কাতর, আর সে পানি বহন করছে তার পৃষ্ঠদেশে। আমরা হাতের তালুতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ আচ করি, আর অন্য লোকরা আগুন দ্বারা আলো লাভ করে। আমরা হাত থেকে পানি বের করি, আর অন্য লোকেরা আলাপ আলোচনায় মত্ত থাকে। আমরা বুকে

তীরের আঘাত বরণ করে নেই, আর অন্যরা আস্থা রাখে ছবির প্রতি। আর আমরা অন্তর থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি, আর অন্যরা শুরু করার দাবী করে, আর তা আবশ্যকীয়। আর আমাদের পুঁজি এমন এক বিবাহের স্থানে ফিরিয়ে নেয়া হয়, সেখানে ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর আমরা প্রকাশ করি এবং (যবানের) অংশের মতো অংশগ্রহণ করি, যেমন গ্রহণ করা হয় অন্তরের অংশ। আর আমাদের প্রথম অবস্থা ছিল এই যে, আমরা ছিলাম শামদেশে, বিজয় অর্জন করতাম সরাসরি আমাদের নাফসের সঙ্গে আর আমাদের সৈন্যদেরকে নিয়ে শাসনে অগ্রসর হয়ে জিহাদ করতাম আমরা, আমাদের পিতা এবং চাচা। তবে কোন্ শহর জয় হয়েছে এবং দুশমনের কোন্ দূর্গ বা বাহিনী বা ইসলামের এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে, সেখানে আঘাত হয়েছে (অথচ তথায় আমরা ছিলাম না)। আমাদের কীর্তি জানে না এমন কে আছে? আমাদের দুশমনরা অগ্নিতে প্রবেশ করে, তা অস্বীকার করতে পারে না। আমরা হামলার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারি, দলকে আগে ঠেলে দেই এবং যোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করি এবং প্রস্তুতির তদবীর করি। শেষ পর্যন্ত শামদেশে এর কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে, যার বিনিময় আমাদের প্রাপ্য। অন্যরা সেসব বিষয় আলোচনা করবে, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

এরপর তিনি সেসব বিষয়ের উল্লেখ করেন, যা তিনি সাধন করেন কুফরকে পরাভূত করা, অন্যায়-অনাচার দূর করা, খ্রিস্টানদের বিনাশ সাধন করা এবং বিদয়াত নির্মূল করার কাজে। সুবিচার আর ন্যায়নীতি প্রসারের কাজে, যা তিনি করেছেন এবং মিশর, ইয়ামান, নাওবা এবং আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চলে আব্বাসীয়াদের নামে খুত্‌বা ইত্যাদি জারী করার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তাও উল্লেখ করেছেন। এসব কিছু সবিস্তারে এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।

তাদের কাছে পত্র পৌঁছলে তারা খারাপ জবাব দেয় এবং তারা নূরুদ্দীন মাহমুদ ইবন জঙ্গির ভাই সাইফুদ্দীন গাজী ইবন মওদূদের সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ করেন, তিনি তাঁর ভাই ইয্‌যুদ্দীনকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তিনি তাদের নিকট আগমন করেন, এ সময় হলব অঞ্চলের লোকজনও তাদের সঙ্গে যোগদান করে। তারা আল-নাছেরের অনুপস্থিতিতে এবং হিমছের দূর্গ নির্মাণ কাজে তাঁর ব্যস্ততার কারণে হিসাব গমন করার ইচ্ছা করেন। তিনি এদের সম্পর্কে জানতে গিয়ে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বের হন এবং তাদের নিকট পৌঁছে যান। তাদের সংখ্যা ছিল অনেক, তারা তার মুখোমুখি হয় এবং তাদের সংখ্যা কম দেখে লোভ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করে। তখন তিনি তাদের ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সমঝোতার প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানান। হয়তো সৈন্যরা তার সঙ্গে এসে মিলিত হবে। শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় তিনি তাদেরকে একথাও বলেন যে, আমি কেবল দামিশ্‌ক নিয়েই তুষ্ট থাকবো এবং সেখানে আমি বাদশাহ ছালেহ ইসমাঈলের নামে খুতবা জারী করবো, এছাড়া শামদেশের অন্যান্য অঞ্চল পরিত্যাগ করবো। কিন্তু খাদিম সা'দদ্দৌলা কাসামাতাবীন সমঝোতায় উপনীত হতে অস্বীকার করেন, তবে তিনি কেবল আল-রাহবা অঞ্চল ছেড়ে দিতে রাজী হন, যা ছিল তার চাচাতো ভাই নাছিরুদ্দীন ইবন আসাদুদ্দীনের হস্তগত। কিন্তু তিনি বললেন, এটা নিয়ে আমি তুষ্ট থাকতে পারি না, এটা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই তিনি সমঝোতায় উপনীত হতে অস্বীকার করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এলেন, তিনি সৈন্যদেরকে একটা ইউনিটে পরিণত করেন।

আর এটা হলো ১৯ শে রমযান রোববার 'করুন-ই-হামাত'-এর নিকটের ঘটনা। এ সময় তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। ইতিমধ্যে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র তকিউদ্দীন উমর ইবন শাহান শাহও উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিল একদল সৈন্যসহ তাঁর ভাই ফররুখ শাহ। তার সৈন্যরা তাদের উপর জয় লাভ করে, এর ফলে তাদের উপর তার প্রভাব পতিত হয়। এতে তারা পশ্চাৎমুখী হয়ে পলায়ন করে এবং পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। তিনি তাদের মধ্যে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্দী করেন এবং ঘোষণা করেন যে, পলায়ন পর ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করা হবে না এবং আহত ব্যক্তিকে প্রহার করা হবে না। ফলে তার কাছে যারা বন্দী ছিল তাদেরকে যুক্ত করে দেয় এবং দ্রুত হাল্ব গমন করে। ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তারা খারাপ পরিণতির দিকে ফিরে যায়। গত দিন যারা সমঝোতা দাবী করছিল, আজ তারা অনুরোধ করছে বিরত থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য। তার নিকট হিমাত আর হিমছ এর যে ভূমি রয়েছে তা ছাড়াও থাকবে আল মাআর রাহ কাফার তাব এবং মারদিন অঞ্চলও থাকবে। তিনি এটা মেনে নেন এবং তাদের থেকে বিরত থাকেন। তিনি হলফ করেন যে, এর পর তিনি আর মালিক আল ছালিহ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। দেশের সমস্ত মিম্বর থেকে তিনি তার জন্য দু'আ করবেন। আর তাঁর ভাই মজদুদ্দীন বনুদ্দায়ার জন্য সুপারিশ করেন যে, তারা খারাজ দান করবে। তিনি তাই করেন এবং বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন।

তিনি যখন হিমাত অঞ্চলে অবস্থান করেন, তখন খলীফা আল মুসতাযী বিআমরীল্লাহর দেয়া মূল্যবান খিলাত', আব্বাসী উপঢৌকন, কৃষ্ণ পতাকা এবং সরকারী দফতর থেকে মিশর ও শামদেশে রাজত্বের সিল মোহর নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হন। স্বজন এবং বন্ধু মহলকে খিলাত' দান করা হয়। দিনটি ছিল একটা উৎসবের। তিনি হিমাত অঞ্চলে তার মামাত ভাই এবং জামাতা আমার শিহাবুদ্দিন মাহমুদকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি হিমস অঞ্চল অভিমুখে গমন করেন এবং তার চাচাত ভাই নাসিরউদ্দিনকে উক্ত অঞ্চল দান করেন। ইতিপূর্বে তার পিতা আসাদুদ্দিন শেরকো ছিলেন এই অঞ্চলের অধিপতি। অতঃপর যিলক্বদ মাসে বালা বাগদ অঞ্চল থেকে দামেস্ক পর্যন্ত এলাকা তাকে দান করেন।

এ বছর দামেস্ক নগরীর পশ্চিম অঞ্চলের মাফাগারা জনপদে জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। লোকটি নবুওয়াত দাবী করে। তার দাবীর স্বপক্ষে কিছু অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড এবং ভেলকী বাজিও প্রদর্শন করে। যার ফলে সাধারণ এবং নীচু শ্রেণির লোকেরা এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সুলতান লোকটিকে তলব করলে সে হারব অঞ্চলের দিকে পলায়ন করে। এ সময় তার নিকট কিছু অপরিণামদর্শী লোক জড়ো হয় এবং অনেক কৃষককে সে বিভ্রান্ত করে। জনৈক নারীকে সে বিবাহ করে। পূর্ব থেকে এ নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। সে ছিল একটা নালার পাশের বাসিন্দা। সে নবুওয়াতের দাবী করার কথা মহিলাকে জানায়। এদের কাহিনী মুসায়লামা এবং সাযার কাহিনীর মত। আর এ বছর খলীফার উজীর পলায়ন করে এবং তার বসতবাড়ি লুট করা হয়। এ বছর আবুল ফাজ ইবনুল জাওযী হাম্বলী মাযহারের লোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় দারস দান করেন। এ উপলক্ষ্যে কাযী আল কুযাত আবুল হাসান ইবন দামগানী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ফকীহরা উপস্থিত হন। এ ছিল একটি উৎসবের দিন। এ উপলক্ষে তাকে মূল্যবান খিলাত' প্রদান করা হয়।

এ হিজরী সনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন

রাওহা ইবন আহমদ : ইনি হলেন আবূ তালিব আল হাদাসী, যিনি এক সময় বাগদাদের কাযী আল-কুযাত বা প্রধান বিচারপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তার পুত্র হিযাযে অবস্থান করেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। তিনি রাফেয়ী ছিলেন বলে অভিযোগ আছে।

সিমলা আল তুর্কী মানি : ইনি পারস্য অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করেন এবং সেখানে নতুন দূর্গ নির্মাণ করেন এবং সৈল যুকীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত সেখানে তার প্রভাব ছিল। অতঃপর কিছু তুর্কমানী যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন।

কিমায ইবন 'আব্দুল্লাহ : ইনি হলেন কুতুবউদ্দিন আল মুসতান যীরি। ইনি পরে খলীফা আল মুসতাযীর উজীর হন। ইনি ছিলেন সমস্ত বাহিনীর প্রধান। এরপর তিনি খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং রাজধানী লুণ্ঠন করার ইচ্ছা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি খলীফার গৃহের ছাদে আরোহন করেন এবং কিমাদের গৃহ লুণ্ঠন করার জন্য সকলকে নির্দেশ দেন। ফলে তা লুণ্ঠিত হয়। আর এটা করা হয় ফকীহদের ফতওয়ার ভিত্তিতে। তিনি এবং তার সঙ্গী সাথীরা পলায়ন করে এবং অনেকে নিহত হয়।

হিজরী ৫৭১ সনের ঘটনাবলী

এ হিজরী সনে সুলতান সালাহউদ্দিন 'মারায আল-সফর' এ অবস্থান কালে খ্রিস্টানরা তাঁর নিকট সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি তা মেনে নেন। তখন শামদেশে দূর্ভিক্ষ চলছিল এবং তিনি কাযী আল ফাযিলের সঙ্গে কিছু সৈন্য মিশর অঞ্চলে প্রেরণ করেন সেখান থেকে কিছু খাদ্য শস্য সংগ্রহ করার জন্য। এ সময় তিনি নিজে শামদেশে অবস্থানের ইচ্ছা করেন এবং কাযীর স্থলে কাতীব আল ইমাদের উপর নির্ভর করেন। অথচ তার নিকট আর কোনো ব্যক্তি এত প্রিয় ছিল না। কবি বলেন :

وما عن رضى كانت سليمى بديلة * ولكنها للضرورات احكام

"সুলায়মান আপন সন্তুষ্টিতে বিনিময় নেয়নি, আর প্রয়োজনের জন্য কিছু বিধান থাকে।"

এ সময় সুলতান শামদেশে অবস্থান করেন, আর কাযী আল ফাযীলের সঙ্গে সৈন্য প্রেরণ করা ছিল বুদ্ধিমত্তার কাজ, যাতে নতুন অঞ্চলকে ভয় মুক্ত করা যায়। তিনি যখন সৈন্যদেরকে মিশর অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং নিজে একটি ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার বিজয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নুরুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র মুসেল অঞ্চলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দিন গাজী হলবের এক দল লোকের নিকট পত্র লেখেন। পত্রে তার এবং নাসেরের মধ্যে সমঝোতার জন্য তিরস্কার করা হয়। এ সময় তিনি ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তাকে অবরোধের কাজে লিপ্ত ছিলেন। আর ইমাদউদ্দিন জঙ্গি ছিলেন সাত্তার অঞ্চলে। আর এটা কোন ভাল কাজ ছিল না। আর আপন ভাইয়ের সঙ্গে তার যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, তিনি মালিক আল নাসেরের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন। তিনি আপন ভাইয়ের সঙ্গে তখন সমঝোতা করেন, যখন আল নাসের এবং তার সাহায্য কারীদের শক্তি সম্পর্কে জানতে পারেন। অতঃপর তিনি হারবের

লোকজনকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তা ছুড়ে ফেলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি চুক্তি মেনে চলার আহ্বান জানান। এ সময় তিনি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করেন এবং মিশরীয় বাহিনীকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। তখন মুসেল অধিপতি সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং আপন চাচাত ভাই মালেক সালেহ ইমাদউদ্দিন ইসমাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিশ হাজার লড়াকু সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। এ সৈন্যদল ছিল একটি ক্ষীপ্রগতি সম্পন্ন। ওদিকে আল নাসের ও রওনা হন এবং ক্ষীপ্রগতির সিংহের মত এগিয়ে আসেন। তার সঙ্গে ছিল হিমাদ অঞ্চলের এক হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা। আল্লাহ্‌র বাণী : আর কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে আল্লাহ্‌র হুকুমে পরাজিত করেছে। (আল কুরআন)' কিন্তু মিশরীয় বাহিনী ইচ্ছা করে তার দিকে ছুটে আসে। আর তার সহায়ক বাহিনীও ছিল পর্বতের মত কঠিন। উভয় পক্ষ সমবেত হয় এবং একে অপরকে সংঘাতে প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। এ ঘটনা সাওয়াল মাসের দশ তারিখ বৃহস্পতিবার ঘটে। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়, এমনকি মালেক আল নাসের যুদ্ধে যোগদান করেন। আর আল্লাহ্‌র হুকুমে পরাজয় ঘটে। তারা অনেক হারবী এবং মুসেলীকে হত্যা করে এবং বাদশা সাইফুদ্দিন গাযীর তাবু এবং ভাণ্ডার অধিকার করে নেয় এবং তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বন্দী করে। বাদশা নাসের তাদের মস্তক এবং দেহে খিলাত' দান করে, তাদেরকে মুক্ত করে দেন। যুদ্ধকালে তারা একদল খ্রিস্টানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, আর এটা কোন বীরের কাজ নয়। আর সুলতান গাযীর তাবুতে এমন কিছু খাঁচা দেখতে পান, যাতে এমন পাখি ছিল, যেগুলো গান করত। আর এ খাঁচা ছিল তার এমন বক্ষে, যেখানে বসে তিনি মদ পান করতেন। যে ব্যক্তির অবস্থা আর পরিচয় এমন, সে ব্যক্তি কেমন করে জয় লাভ করতে পারে? সুলতান তা তার নিকট ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে দূতকে বলেন: তার কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম দিয়ে বলবে যে, এই পাখিগুলো নিয়ে তোমার ব্যস্ত থাকা বর্তমান ভয়ংকর অবস্থা থেকেও তোমার নিকট বেশি প্রিয়? তিনি তার নিকট থেকে অনেক কিছু নিয়ে তা সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। উপস্থিত, অনুপস্থিত সকলে এর অংশ পান। আর সাইফুদ্দিন গাযীর তাবু তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইয্‌যুদ্দিন ফররুখ শহ নাযমুদ্দিনকে দান করে দেন এবং তার তাবুতে যে সব নতর্কী, আর গায়িকা ছিল, তাদের ফেরত পাঠান। আর তার সঙ্গে একশর বেশি গায়িকা থাকত। তিনি ক্রীড়া কৌতুকের যন্ত্রপাতি ও হারব অঞ্চলে ফেরত পাঠান এবং বলেন: তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট এসব জিনিস রুকূ এবং সিজদা থেকে অনেক প্রিয়। তিনি যোগাযোগ রক্ষাকারী বাহিনীকে মন আর ক্রীড়া কৌতুকের যন্ত্রপাতির আধিক্যের কারণে মদের দোকানের মত দেখতে পান। এটা হচ্ছে ফাসিক, পাপাচারী এবং ক্রীড়া কৌতুক কারীর পথ।

পরিচ্ছেদ

সৈন্যরা যখন হারব অঞ্চলে ফিরে আসে, তখন তারা মন্দ ঠিকানার দিকে ফিরে আসে এবং অঙ্গীকার ভংগ করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, অনুতপ্ত হয় সুলতানের বিরোধীতা করার জন্য। সিংহের ভয়ে তারা শহরকে সুদৃঢ় করে, আর মুসেলের শাসনকর্তা ও তড়িঘড়ি সেখানে পৌছেন এবং সত্য কথা না বলে তিনি তথায় প্রবেশ করেন। আর নাসের যখন গণীমতের মাল বণ্টন থেকে অবসর হন, তখন অতি সংগোপনে তিনি হারব অঞ্চলে গমন করে। তার শক্তি

অনেক। তিনি দেখতে পান যে, তারা হারবকে সুদৃঢ় করে নিয়েছে, তখন তিনি বললেন, সময়ের দাবী এই যে, আমরা শহরের আশপাশের দূর্গ জয়ের দিকে মনোনিবেশ করবো। পরে আমরা তাদের দিকে ফিরে আসব, তখন কেউ আমাদেরকে বাঁধা দিতে পারবে না। তখন তিনি এক এক করে দূর্গ জয় করা শুরু করেন। এবং রাষ্ট্রের এক একটা স্তম্ভকে ধ্বংস করা শুরু করেন। এই সময় তিনি 'মারাবা' এবং 'মামবাজ' অঞ্চল জয় করেন। অতঃপর তিনি 'এযায' অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন এবং হাল্‌বীরা সিনানের নিকট পয়গাম প্রেরণ করলে তিনি সুলতানকে হত্যা করার জন্য একটা দল প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একদল সৈন্যদের পোশাকে তার দলে প্রবেশ করে এবং তীব্র যুদ্ধ করে। তারা তাদের মধ্যে মিশে যায়। একদিন তারা সুযোগ পেয়ে যায় এবং সুলতান জনগণের সম্পর্কে উপস্থিত হন। এ সময় তাদের একজন তার উপর হামলা করে এবং মস্তকে ছুরিকাঘাত করে। কিন্তু তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তাই আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। কিন্তু ছোরা তার মুখে লাগে এবং তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। কিন্তু ফিদায়ীরা সুলতানের মাথা ধরে জবাই করার জন্য তাকে মাটির উপর শোয়াই ফেলে। তার আশপাশে যারা ছিল, তারা প্রচণ্ড ভয় পাব। অতঃপর তাদের জ্ঞান ফিরে এলে তারা ফিদায়ীদের দিকে ছুটে যায় এবং তাকে হত্যা করে টুকরা টুকরা করে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি কোন এক আমীরের উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে। চতুর্থ ব্যক্তি পলায়ন করলে তাকেও পাকড়াও করে হত্যা করা হয়। এদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকে। অতঃপর সুলতান নগর জয় করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন এবং তা জয় করে নেন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র তকীউদ্দীন উমর ইবন শাহেন শাহ ইবন আইয়ূবকে তা বণ্টন করে দেন। হারববাসীদের প্রতি তার ক্রোধও তীব্র হয়ে উঠে। কারণ তারা তার নিকট ফিদায়ী প্রেরণ করে এবং তারাই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে। নগর অভ্যন্তরে 'জওশন' পর্বতে তারা অবস্থান গ্রহণ করে এবং আল বারুকিয়ার চূঁড়ায় তারা তাঁবু স্থাপন করেন। এ ঘটনা ঘটে যিলহজ্জ মাসের ১৫ তারিখ। এরপর অনেক মাল হাসিল করা হয় এবং গ্রাম থেকে খারাজ উসুল করা হয়। আর এ সময় নগরীতে প্রবেশ করা এবং বের হওয়া নিষিদ্ধ থাকে। বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকে।

হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে সুলতানের ভাই নূর-উদ-দৌলা ইয়ামান দেশ থেকে ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি অনেক সম্পদ লাভ করেন। এতে সুলতান আনন্দিত হন। উভয়ে মিলিত হলে নেককার মুত্তাকী সুলতান বলেন : أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي (يوسف ৯০: "আমি হলাম ইউসুফ এবং এ হলো আমার ভাই, (সূরা ইউসুফ আয়াত-৯০)" তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়কে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন। ভাই তার নিকট অবস্থান করলে তিনি তাকে দামেস্ক এবং তার আশপাশের শাসক নিযুক্ত করেন। কারো কারো মতে মুআসালা যুদ্ধের আগে তার আগমন ঘটে। বীরত্ব আর অশ্বারোহনের জন্য তিনি বিজয়ের কারণ হন। আর এ বছর নাসেরের ভ্রাতুষ্পুত্র তকীউদ্দিন উমর তার ভৃত্য বাহাউদ্দিন কারাকুশকে এক দল সৈন্যসহ আল মাগদীব অঞ্চলে প্রেরণ করলে তিনি অনেক দেশ জয় করেন এবং প্রচুর গণীমতের মাল লাভ করেন। অতঃপর তিনি মিশরে ফিরে আসেন। এ বছর তিনি আবুল ফতূহ আব্দুস সালাম ইবন ইউসুফ ইবন মোহাম্মদ ইবন মাহলাদ আল তানকী, যিনি ছিলেন মূলত দামেস্কের অধিবাসী এবং একজন ওয়ায়েয ক্ষমা করেন, তার জন্ম হয় বাগদাদে। তিনি দামেস্কে আগমন করেন। 'আল-

ইমাদী 'আল বারীদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন : ইনি ছিলেন আমার সঙ্গী, তিনি যেখানে ওয়ায করতে বসেন, সেখানে সুলতান সালাহউদ্দীন উপস্থিত হন। এই মজলিসে তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। যার কয়েকটা কবিতা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

يا مالكا مهجتى يا منتهى املى * يا حاضرا شاهدا فى القلب والفكر

خلقتنى من تراب أنت خالقه * حتى اذا صرت تمثالا من الصور

اجريت فى قالبى روحا منورة * تمر فيه كجرى الماء فى الشجر

جمعتنى من صفا روح منورة * وهيكل صغته من معدن كدر

ان غبت فيك فيا فخرى ويا شرفى * وان حضرت فيا سمعى ويا بصرى

او احتجبت فسرى فيك فى وله * وان خطرت فقلبى منك فى خطر

تبدو فتمحو رسومى ثم تثبتها * وان تغيب عنى عشت بالاثر

"হে আমার জীবনের মালিক! হে আমার আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্ত,
হে চিন্তা-চেতনায় সদা উপস্থিত, সদা সাক্ষ্য,
তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে, তুমি তার স্রষ্টা,
এমনকি আমি হয়েছি আকৃতির প্রতীক।

তুমি আমার অন্তরে জারী করেছো আলোকিত রূহ, তা প্রবাহিত হয় যেমন বৃক্ষে প্রবাহিত হয় পানি। তুমি আমাকে একাত্ম করেছো স্বচ্ছ-আলোকিত রূহ থেকে এবং এমন এক কাঠামো থেকে, তুমি যাকে দৃষ্টি করেছ কদর্য খনি থেকে।

আমি যদি তোমাতে বিলীন হয়ে যাই, তবে আমার কত গর্ব, কত মর্যাদা।

আর যদি আমি উপস্থিত হই, তবে আমার শ্রবণ আমার জন্য কতইনা চমৎকার!

আর যদি আমি পর্দার অন্তরালে চলে যাই, তবে তো আমার আনন্দ তোমাতেই।

আর যদি তুমি বিপদে ফেলো, তবে তো আমার অন্তর তোমার পক্ষ থেকে বিপদেই থাকবে।

তুমি প্রকাশ পাও এবং নিশ্চিহ্ন কর আমার চিহ্ন, এরপর তা পুনঃ স্থাপন কর।

আর যদি তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও, তবে আমি বেঁচে থাকবো চিহ্ন দ্বারা।

এ হিজরী সনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন হাফেজ আবুল কাশিম ইবন আসাকির।

আলী ইবনুল হাসান ইবন হিবাতুল্লাহ

ইনি হলেন ইবন আসাকির আবুল কাশিম আল দামেস্কী, ইনি ছিলেন অন্যতম বড় হাফিজে হাদীস। যারা হাদীস শ্রবণ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন, হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন, হাদীস বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন, হাদীসের সনদ এবং মতন হিফজ করেছেন এবং হাদীসের কাঠামো সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সময় ব্যয় করেছেন, ইনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিত্ব। তিনি সুবিশাল আশি খণ্ডে রচিত, শামদেশের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তারপরও অক্ষয় কীর্তি হিসাবে টিকে আছে। তাঁর পূর্বে এ ধরনের ঐতিহাসিক বিরল ছিল। তাঁর পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদেরকেও তিনি বিচলিত করে তোলেন। এই ইতিহাস গ্রন্থে তিনি সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। কোনো ব্যক্তি তার এই ইতিহাস গ্রন্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে সে দেখতে পাবে, তার কি গুন, আর কি মৌলিকতা। সে ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তিনি ছিলেন ইতিহাস বিষয়ে তাঁর সময়ের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব আর তার এই গ্রন্থ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় এছাড়াও হাদীস শাস্ত্রে তার আরও অনেক উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। এসব গ্রন্থে ইবাদত এবং প্রশংসনীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও তিনি রচনা করেন "আকরা আল কুতুব আল সিত্তাহ" (ছয়টি হাদীস গ্রন্থের ব্যাখ্যা), "আল শুয়ুখ আল-নুবুল" (হাদীসের বিশিষ্ট শায়খদের জীবনী গ্রন্থ), "তাবঈনুল কীযবী আল মুফতারী আল-আবী আল-হাসান আল-আশারী" (আবুল হাসান আল আশরীর বিরুদ্ধে অপবাদ খণ্ডন), ইত্যাদি ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এছাড়া ছোটখাটো বিষয় নিয়েও তিনি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি এসবের নাম দিয়েছেন 'আল আজযা' এবং 'আল-আশফার।' হাদীস অনুসন্ধানে তিনি অনেক পথ পরিক্রম করেন, অনেক দেশ সফর করেন, শহর-বন্দর, নগর, দেশ-দেশান্তরে গমন করেন। তিনি এমন সব গ্রন্থ রচনা করেন, যা অন্য কোন হাফেজে হাদীস রচনা করেননি। এইসব গ্রন্থের মধ্যে কোন কোনটি তিনি নিজ হাতে লিখেন এবং কোন কোনটি ডিকটেশন দ্বারা অপরের দ্বারা লেখান। এই সব গ্রন্থে তিনি শব্দের শুদ্ধা-শুদ্ধি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি ছিলেন দামেস্কের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্যতম। এসব গ্রন্থকারদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর মর্যাদা ছিল সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি প্রচুর দান-দক্ষিণাও করতেন। এ বছর রজব মাসের এগারো তারিখ, বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। তার জানাযায় সুলতান সালাহউদ্দিন উপস্থিত হন। তাকে 'বাব আল-সগীরে 'দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন শায়খ কুতুবউদ্দিন নিশাপুরী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বলেন: তার অনেক কবিতা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করা হলো :

أيا نفس ويحك جاء المشيب * فماذا التصابي وماذا الغزل

تولى شبابي كان لم يكن * وجاء المشيب كان لم يزل

كاني بنفسي على غرة * وخطب المنون بها قد نزل

فياليت شعري ممن اكون * وما قدر الله لي في الازل

"হে আত্মা! তোমার বিনাশ হোক, বার্ধক্য উপস্থিত এই খেলার মাঠ, আর গযলের ধান্দা কোন কাজে আসবে না। আমার যৌবন ফিরে গেছে, যেন তা ছিল না কখনো, আর বার্ধক্য এসেছে, যেন তা সদা থাকবে।

আমি আমার নাফসের ব্যাপারে প্রতারিত, আর মৃত্যুর আপদ তার উপর আপতিত হয়েছে।

হায়! আমি যদি জানতাম, আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব এবং আল্লাহ্ আমার জন্য কি নির্ধারণ করে রেখেছেন অনন্ত কালে?

ইবন খাল্লিকান বলেন: এই কবিতায় তিনি এক অপরূপ অন্তঃমিল করেছেন, যা সাধারণত ঘটে না। আর তা হচ্ছে লাম বর্ণের সাথে যা বর্ণের মিল তার ভাই ছায়েম উদ্দিন হেবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান ছিলেন মুহাদ্দিস এবং ফকীহ। বাগদাদে আসআদ আল মায়হানী-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। এরপর তিনি দামেস্কে গমন করেন এবং আল গাযালিয়ায় শিক্ষা দান করেন এবং সেখানে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

হিজরী ৫৭২ সনের ঘটনাবলী

হিজরী সনের শুরুতে নাসের হারব অঞ্চল অবরোধ করে রাখেন। তথাকার অধিবাসীরা তার কাছে পৌঁছে সমঝোতার উপনীত হওয়ার দাবী জানান। তিনি তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন এই শর্তে যে, কেবল হারব এবং এর সন্নিহিত অঞ্চল মালিক সালেহ লাভ করবেন। তারা এই মর্মে লিখিত চুক্তি করে। কিন্তু সন্ধ্যা হলে সুলতান সালেহ ইসমাঈলকে প্রেরণ করেন তার নিকট অতিরিক্ত ইযায দূর্গ দাবী করার কথা বলে। তিনি তার ছোট বোন খাতুন বিনতে নুরুদ্দিনকেও প্রেরণ করেন যাতে আমীরদের নিকট দাবী পূরণ করার জন্য চাপ দিতে পারে এবং বখশিশ পাওয়ার ব্যাপারে বেশি সফল হতে পারে। সুলতান তাকে দেখে উঠে দাঁড়ান এবং সে ভূমি চুম্বন করে এবং তার দাবী পূরণ করেন এবং তাকে অনেক মণি-মাণিক্য উপহার হিসাবে প্রদান করেন। অতঃপর তিনি হারব অঞ্চল থেকে প্রস্থান করেন এবং সে সব ফিদায়ীদের উদ্দেশ্যে গমন করেন, যারা তার উপর হামলা করেছিল। আর তিনি তাদের দূর্গ অবরোধ করে রাখেন এবং অনেককে হত্যা এবং বন্দী করেন। গবাদী পশু লুন্ঠন করেন এবং অগ্নিসংযোগ করে বাড়ি-ঘর ধ্বংস করেন। অতঃপর তার মামা কিমাত অঞ্চলের অধিপতি শিহাবউদ্দিন মাহমুদ ইবন তুতুস, তিনি তার জন্য সুপারিশ করেন। কারণ, তারা ছিল তার প্রতিবেশী। তার সুপারিশ গৃহীত হয় এবং বালা বাগদ অঞ্চলের নায়েব আমীর শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক মাকদাম, যিনি ছিলেন দামেস্ক নগরীর নায়েব, তিনি একদল খ্রিস্টান বন্দীদের উপস্থিত করেন, যারা তার অনুপস্থিতিতে উক্ত অঞ্চলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে ইসমাঈলী ফিদায়ীরা সিনানের অধিবাসীদের সঙ্গে সমঝোতা করে নেয়। অতঃপর তিনি দামেস্কে ফিরে আসেন। সেখানে তার ভাই শামসুদদৌলা তুরান শাহ তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং এ জন্য তিনি তাকে 'আল-মালিক আল-মুয়াযযম' তথা 'মহান বাদশা' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ সময় নাসের মিশরে গমন করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন। এ বছর মহররম মাসের ছয় তারিখে কাযী কামালউদ্দিন মোহাম্মদ শহরসুরী মৃত্যুবরণ করেন। ইনি ছিলেন অন্যতম উত্তম কাযী এবং নূরুদ্দিন শহীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন। জামে মসজিদ, দার আল যারব এবং নগর প্রাচীন নির্মাণ কাজ এবং গণ-স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র জিয়াউদ্দিন ইবন তাজউদ্দিন শহর যুরীকে কাযী নিযুক্ত করার ওসীয়ত করেন। অথচ তিনি তার প্রতি নাখোশ ছিলেন। কারণ, তাদের উভয়ের মধ্যে পূর্ব থেকে অসন্তুষ্টি দেখা দেয় যখন সালেহ উদ্দিন তাকে দামেস্কে বন্দী করেন, আর তারা একে অপরের বিরোধী ছিলেন। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে ওসীয়ত করে যান এবং তিনি তার চাচার রীতিতে কাযীর আসনে বসেন। আর শরফুদ্দিন

আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবন আবু আসরুলকে কাযী করার জন্য সুলতানের অন্তরে অসন্তুষ্টি থেকে যায়। তিনি সুলতানের উদ্দেশ্যে দামেস্কে হিজরত করেন। এ সময় তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাকে কাযীর পদ দান করনে এবং এ ব্যাপারে তিনি কাযী ফাযিলের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন। এ সময় কাযী ফাযিল জিয়াকে কাযীর পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি পরামর্শ অনুযায়ী ইস্তাফা দিলে তা গৃহীত হয়। তার খাতিরে তিনি বায়তুল মালের দায়িত্ব ও ত্যাগ করেন। আর সুলতান ইবন আশরুলকে এই শর্তে কাযী নিযুক্ত করেন যে, তিনি কাযী মহিউদ্দিন আবুল মাআলী মোহাম্মদ ইবন যাকি উদ্দিনকে নায়েব নিযুক্ত করবেন। তিনি তাই করেন। অতঃপর মহিউদ্দিন আবু হামেদ ইবন আবুল আশরুল তার পিতা ফখরুদ্দীনের পরিবর্তে চক্ষুর দুর্বলতা হেতু পূর্ণ মর্যাদার কাযী হয়ে যান।

আর এ বছর সফর মাসে সুলতান নাসের হাযম জনপদে অবস্থিত গাযারিয়া যাবিয়ার সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। সেখানে যারা শরীয়তের জ্ঞান নিয়ে লিপ্ত থাকবে- তাদের জন্য এবং ফিকহের প্রয়োজনে এই ওয়াকফ করা হয়। আর এ মাদরাসার শিক্ষক কুতুবউদ্দিন নিশাপুরীকে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন। আর এই মাসে সুলতান মালিক নাসির মঈনউদ্দিন উনুর কন্যা খালস খাতুনকে বিবাহ করেন। ইনি ছিলেন নুরুদ্দিনের স্ত্রী এবং তিনি দূর্গে অবস্থান করতেন। তার ভাই আমীর সাদউদ্দিন উনু এই বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে কাযী ইবন আশরুল এবং তাঁর অনুরূপ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সুলতান এই রাতে এবং তার পরবর্তী রাতে নববধূর সাথে রাত্রিযাপন করেন। দুইদিন পর তিনি মিশর অভিমুখে রওনা হন। জুমার দিন নামাযের পূর্বে তিনি তার বাহনে আরোহন করেন এবং 'মারায আল-সফরে' অবতরণ করেন। পরে আবার রওনা হন এবং সিফফিনের নিকটে পৌঁছে রাতের খাবার গ্রহণ করেন। সেখান থেকে আবার রওনা হন এবং এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের ষোল তারিখ শনিবার মিশরে প্রবেশ করেন। সেখানে তার ভাই এবং মিশরের নায়েব মালিক আদিল সাইফুদ্দীন আবু বকর নীল নদের নিকট তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তার সঙ্গে ছিল রকমারি খাবারের অনেক হাদীয়া। আল ইমাদ আল কাতীবও সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। ইতিপূর্বে কখনো তিনি মিশর অঞ্চলে আগমন করেননি। ফলে তিনি মিশরের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং পিরামিডের উল্লেখ করে নানা উপমা দিয়ে তা বুঝান। আল-রাজাতাঈনের বর্ণনা অনুযায়ী, এক্ষেত্রে তিনি অনেক অতিরঞ্জিত করেন।

এ বছর শাবান মাসে নাসের আলেকজান্দ্রিয়া গমন করেন এবং তার দুই পুত্র আল-ফাযিল আলী এবং আযীয উসমান হাফেজ ছালাবির নিকট হাদীস শোনান এবং তারা তাঁর নিকট বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার অবস্থান করেন। আর নাসের সেখানে রোযা সম্পন্ন করার সংকল্প করেন। এ সময় নগর প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তিনি উসতুল নবায়ন এবং নৌযান সংস্কারের নির্দেশ দেন এবং নৌ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার ও নির্দেশ দেন। এজন্য তাদেরকে অনেক জায়গীর দানেরও ঘোষণা দেন। এক্ষেত্রে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দের জন্যও তিনি নির্দেশ দেন। অতঃপর রমযান মাসেই তিনি কায়বো ফিরে আসেন এবং রোযা পূর্ণ করেন।

এ হিজরী সনে নাসের ইমাম শাফেঈর কবরের উপর শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীদের জন্য একটা মাদরাসা নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং শায়খ নায়মুদ্দীন খুয়ুশানীকে এই মাদরাসার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এ বছর তিনি কায়রোতে একটা হসপাতাল নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং এজন্য প্রচুর অর্থ ও সম্পদ ওয়াকফ করেন। এ হিজরী সনে আমীর মুজাহিদ উদ্দিন কীমায, যিনি ছিলেন মুসেল দূর্গের নায়েব। তিনি একটা চমৎকার মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, আশ্রম এবং সন্নিহিত অন্যান্য ভবন মুসেলের বাইরে নির্মাণ করেন। ৫৯৫ হিজরী পর্যন্ত তার মৃত্যু বিলম্বিত হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। উপর উল্লেখিত মাদরাসা, খানকা এবং মসজিদ ছাড়া তার আরও অনেক কীর্তি আছে। তিনি ছিলেন দ্বীনদার, হানাফী মাযহাবের অনুসারী জ্ঞানী-গুণি ব্যক্তি। সাহিত্য, কাব্য এবং ফিকহের বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন। তিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত্রে নামায আদায় করতেন। এ বছর কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বাগদাদ থেকে নির্বাসনের জন্য খলীফা নির্দেশ দেন, যেন তারা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং এর ফলে অন্যরা রোগ মুক্ত থাকতে পারে। ইবনুল জাওযী আল-মুনতাযা গ্রন্থে জনৈক নারী সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, সে নারী বলে : আমি রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। কোন পুরুষের নিকট দিয়ে গমনকালে সে আমাকে বাধা দেয়। আমি তাকে বলি: তুমি যা চাও, তা স্বাক্ষী এবং লিখিত চুক্তি ছাড়া হবে না। তাই লোকটি শাসকদের নিকট গিয়ে আমাকে বিবাহ করে। আমি তার সাথে কিছুদিন কাটাই। পরে তার পেট ফুলে যাওয়া রোগ দেখা দেয়। আমরা এটাকে একটা ব্যাধি মনে করি এবং এজন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। কিছু দিন পর লোকটি নারীর অনুরূপ একটা সন্তান জন্ম দেয়। পরে দেখা যায় যে, লোকটি ছিল এক বিদঘুটে হিজড়া। আর এ ঘটনা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। এ বছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন:

আলী ইবন কাসাকির

ইনি হলেন ইবনুল মারহাব ইবনুল আওয়াম আবুল হাসান আল বাতায়েহী আল-করী। ইনি ছিলেন অভিধান বেত্তা। নিজে হাদীস শ্রবণ করেন এবং অন্যদেরকে হাদীস শুনান আরবি ভাষার ব্যাকরণ এবং আরবি অভিধান সম্পর্কে তার অনেক অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তার সমস্ত কিতাব বাগদাদের ইবন জারারা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। তিনি শাবান মাসে আশি বছরের বেশি বয়সে ইন্তিকাল করেন।

মোহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ

ইনি হলেন, ইবনুল কাশিম আবুল কাজল, দামেস্কের কাযী আল-কুযাত কামালউদ্দিন শহর যুরি আল-মুছিলি। ইনি শাফেঈ' মাযহাবের অনুসারীদের জন্য মুসেলে একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অপর একটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন নাসির বিন অঞ্চলে। ইনি ছিলেন দ্বীনদার, পরহেযগার, আমানতদার এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। নুরুদ্দিন শহীদ মাহমুদ ইবন জঙ্গীর শাসনকালে দামেস্কের কাযীর পদ গ্রহণ করেন। ইবনুস সায়ীর বলেন : তাকে উজীর ও নিযুক্ত করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, যোগাযোগের কাজেও তাকে প্রেরণ করা হতো, একদা তিনি খলীফা আল-মুকতাযীর নিকট একটা ঘটনা লিখে পাঠান। তাতে তিনি লিখেন : "মোহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল-রাসূল"। এর নীচে খলীফা লিখে পাঠান (কেবল দরূদ সালাম) আমি অর্থাৎ

গ্রন্থকার ইবনুল কাছীর বলছি যে, নুরুদ্দিন জামে দারুল-গারব এবং নগর প্রাচীরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেন এবং তাঁর জন্য হাসপাতাল এবং মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর মহররম মাসে দামেস্কে তার মৃত্যু হয়।

আল খতীব শামসুদ্দিন

ইনি হলেন ইবনুল উজীর আবুল যিয়া। ইনি ছিলেন মিশর অঞ্চলের খতীব এবং মিশরের উজীরের পুত্র। ইনি মিশরীয় অঞ্চলে সর্বপ্রথম খলীফা আল মুস্তাযির নামে খুত্বা পাঠ করেন। খলীফার লকব বা উপাধি ছিল আল-মুস্তাযি বিআমরিল্লাহ। বাদশা সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে আব্বাসীয় খলীফার নামে এই খুত্বা পাঠ করা হয়। পরে খলীফার দরবারে তিনি বিশেষ স্থান লাভ করেন। অবশেষে খলীফা তাকে বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ করতেন। ইনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় ব্যক্তি। কবি, সাহিত্যিকরা তাকে তাদের রচনা পাঠ করে শুনাতেন। অতঃপর সুলতানের নির্দেশে নাসের তার স্থলে সহজুরিকে নিযুক্ত করেন এবং তার দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

হিজরী ৫৭৩ সাল

এই সালে বাদশাহ নাসির একটি পাহাড়ি দুর্গ এবং কায়রো ও মিসরের চারপাশে প্রাচীর বেষ্টনী নির্মাণ করতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী বাদশাহর জন্যে একটি সুরম্য দুর্গ নির্মাণ করা হয়। সমগ্র মিসরে নির্মাণ শৈলী ও সৌন্দর্যে এর সদৃশ্য আর কোনো দুর্গ ছিল না। তাকিউদ্দীন আমর ইবনে শাহানশাহ ইবন আইয়ূবের অধীনস্থ কর্মকর্তা আমীর বাহাউদ দীন কারাকুশ এই দূর্গ নির্মানের দায়িত্ব পালন করেন। এ বছর মুসলমানদের উপর রমলার ঘটনা সংঘটিত হয়। সুলতান নাসির সালাহুদ্দীন ফিরিঙ্গীদের দমন করার উদ্দেশ্যে জামাদিউল আউয়াল[১] মাসে মিশর থেকে যাত্রা করেন। রমলা শহরে উপনীত হয়ে যুদ্ধ করে অনেককে বন্দী করেন ও প্রচুর গণীমত লাভ করেন। তাঁর সৈন্যসহ গণীমত সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে ও বিভিন্ন গ্রাম-মহল্লা ও ঘর-বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এ দিকে সুলতান একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ একাকী- হয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে ফিরিঙ্গীরা একদল সৈন্য নিয়ে সুলতানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের আক্রমণ থেকে বহু কষ্টে তিনি কোন মতে রক্ষা পান। কয়েকদিন পর সুলতানের বাহিনী চারিদিক থেকে ফিরে এসে তাঁর কাছে সমবেত হয়। এ ঘটনার ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। মিশরবাসী সুলতানকে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার বিষয়ে সন্দিহান ছিল। তাদের কাছে ঐ অবস্থাটি ছিল এই উক্তির মত "আমি গণীমত চাই না, স্বজনদের প্রত্যাবর্তন চাই"। এতদসত্ত্বেও সুলতানের অক্ষত থাকার সংবাদ শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া দশ বছর পর প্রকাশ পায়। এ দিনটিকে ইয়াত্তমুল হিত্তীন বা হিত্তীন দিবস বলে। এ ঘটনার দিন সুলতান অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দেন। বিজয়ী বাদশাহর জন্যে তাকিউদ্দীন উমর ইবনে আখিস-সুলতান তার পুত্র শাহানশাহকে বন্দী করেন। তাদের নিকট সে সাত বছর পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকে। তার অপর এক পুত্র নিহত হয়। নিহত পুত্র ছিল অত্যন্ত সুশ্রী যুবক।

---

১. আ. জুমাদাল উলা।

তিনি নিহত ও বন্দী পুত্রদ্বয়ের জন্যে দারুণভাবে অনুশোচনা করেন। তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে আইয়ূব (আ)-এর ন্যায় ধৈর্যধারণ করেন এবং অপর দিকে দাউদ ন্যায় বিলাপ করতে থাকেন। এ ঘটনায় জিয়াউদ্দীন ঈসা ও জহীরুদ্দীন নামক দুই বিখ্যাত ফকীহ ভ্রাতৃদ্বয়ও বন্দী হন। দু'বছর পর সুলতান তাদেরকে নব্বই হাজার দীনারের বিনিময়ে মুক্ত করে আনেন।

হালব[১] রাজ্যটি প্রতিরক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে সুলতানুল মালিক সালিহ ইসমাঈল। ইবন নূরুদ্দীন খাদিম কামাশতাগিনের উপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেন এবং হারিম দুর্গ হস্তান্তর করতে তার উপর চাপ প্রয়োগ করেন। তিনি এতে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে তিনি খাদিমকে পা উপরে ও মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে নাকে ধোঁয়া দেন। এতে তিনি মারা যান। এ সময়ে ফিরিংগীদের এক শক্তিধর সম্রাট সুলতানের অনুপস্থিতি ও গভর্নরদের নিজ নিজ রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুবাদে সিরিয়া দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। ফিরিংগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, তাদের কোন শক্তিশালী সম্রাট যখন আসবেন যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না-তখন তারা তার সাথী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে এবং সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করবে। সম্রাট প্রত্যাবর্তন করলে চুক্তিপত্রের কার্যকারিতা থাকবে না-পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাবে। এরপর আগন্তুক এ সিম্রাট ও সমস্ত ফিরিংগীরা মিলে হাসা শহর আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেয়। হাসার শাসনকর্তা সুলতানের মামা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ছিলেন অসুস্থ। দামিশকের গভর্ণর ও অন্য আমিরগণ নিজ নিজি এলাকা নিয়ে ছিলেন ব্যস্ত। আক্রমণকারীরা হামা শহর প্রায় দখল করে ফেলেছিল। কিন্তু চার দিন যুদ্ধের পর আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তারা হারিস শহরে চড়াও হয়। কিন্তু এটাও দখল করতে ব্যর্থ হয়। তারা হালকের অধিপতি মালিক মালিং এর নিকট যত বন্দী ও সম্পদ দাবি করে তা তিনি তাদেরকে অর্পণ করেন। হামার শাসক ও সুলতানের মামা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ এ সময় ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে তাঁর পুত্র তাতাশ মৃত্যুবরণ করে। সম্রাট নাসির যখন শুনতে পান যে, ফিরিংগীরা হারিম শহরে অবতরণ করেছে তখন তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মিশর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ১৪ শাওয়াল তারিখে দামিশকে প্রবেশ করেন। ইমামুল কাতিব তার সঙ্গী হয়। কিন্তু কাযী আল-ফাযিল হজ্জের কারণে মিশরে অবস্থান করেন। এ বছর কাযী আল ফাযিল আল–নাসির এর পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ায় মুবারাকাবাদ জানিয়ে তার নিকট পত্র আসে। এ পুত্রের নাম রাখা হয় আবু সুলায়মান দাউদ। একে নিয়ে তার পুত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় বারোতে। তবে এর পরে তার ঔরসে আরও পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। মোট সতের পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কন্যার নাম মুনাসা। চাচাত ভাই মালিকুল কামিল মুহাম্মাদ ইবন আঙ্গিলের সাথে তার বিবাহ হয়। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।

এ বছর বাগদাদ শহরে ইয়াহূদী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ভীষণ এক গোলযোগ বাঁধে। ঘটনার সূত্রপাত এভাবে হয় যে, এক মুয়াযযিন গির্জার পাশে দাঁড়িয়ে আযান দেয়। এতে কতিপয় ইয়াহূদী ক্ষীপ্ত হয়ে মুয়াযযিনের শক্ত কথা বলে।

---

১. হালব–আলেপ্পো।

মুসলমানেরা ইয়াহূদীদেরকে গালাগালী দেয়। এরপর মুয়াযযিন বিচারকদের কাছে যেয়ে অভিযোগ করে। ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। জনগণ ভীড় জমায় ও শোর-গোল চিল্লা চিল্লি বেড়ে যায়। জুম'আর সময় হলে জনগণ কোনো কোনো মসজিদে যেয়ে খতীবগণকে খুত্বা দিতে বাধা দেয় এবং তৎক্ষনাৎ বেরিয়ে এসে ইয়াহূদীদের আতর বিক্রির বাজার লুট করে এবং গির্জায় হামলা চালায়। হামলা ছিল এত প্রচণ্ড যে, পুলিশরাও বাঁধা দিতে সক্ষম হয়নি। উত্তেজনা লাঘবের জন্যে খলীফা জনগণের মধ্য হতে কয়েকজনকে শূলিতে চড়াবার নির্দেশ দেন। রাত্রিবেলা জেলখানা হতে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারী আসামীকে বের করে আনা হয় যারা বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদেরকে গুলিবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এতে অনেকেই ধারণা করে যে, চলমান ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এ শাস্তি দেয়া হয়েছে। ফলে সমাজে পুণরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

এ সালেই ওযীরুল খলীফা আসুদুদ দৌলা ইবন রায়ীসুর রুআসা ইবনুল মাসলামা হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অনেক লোক তাঁকে বিদায় জানাতে বেরিয়ে আসে। এ সময় তিন গুপ্ত ঘাতক ফকীর বেশে তার সম্মুখে আসে। তাদের সাথে ছিল চুলের গোছা। তাদের মধ্য থেকে একজন অগ্রসর হয়ে ওযীরকে একটি গোছা দেয়ার ভান করে ঝাপটে ধরে এবং লুক্কায়িত চাকু দিয়ে অনেকগুলো আঘাত করে। এরপর দ্বিতীয়জন, তারপর তৃতীয় জনও ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে এবং তার চার পাশের অনেক লোককে জখম করে। তিন ঘাতককে ঘটনা স্থলেই হত্যা করা হয়।

ওযীরকে বহন করে বাড়ি আনার পর ঐ দিনই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ইনি সেই ওযীর যিনি ইতিপূর্বে ওযীর ইবন হুরায়রার পিতামাতাকে হত্যা করে গুম করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঘাতক নিযুক্ত করেন কথায় বলে, যেমন কর্ম তেমন ফল, যথাযথ বিনিময়।

এ বছর যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইনতিকাল করেন নিম্নে তাঁদের বর্ণনা দেয়া হল:

সাদাকা ইবনুল হুসায়ন

আবুল ফারাজ আল হাদ্দাদ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ফাতওয়া দিতেন। কবিতা লিখতেন ও কালাম শাস্ত্রের উপর মন্তব্য করতেন। স্বীয় উস্তাদ ইবনুয্ যাগূনীর উপর তিনি ইতিহাস লিখেছেন। এ গ্রন্থে অনেক বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। ইবনুস-সাঈ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পণ্ডিত, দরিদ্র জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। বই-পুস্তক লিখে ও কপি করে যে পারিশ্রামিক পেতেন তা দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাগদাদের যদরিয়া নামক স্থানে এক মসজিদে অবস্থান করতেন ও তথায় ইমামতি করতেন। তিনি যুগের ঘুর্নিপাক ও তার অনুগামীদেরকে ভৎর্সনা করতেন। গ্রন্থকার বলেন, আমি দেখেছি ইবনুল জাওযী তাঁর মুনতাযাম গ্রন্থে আবুল ফারাজ আল-হাদ্দাদকে তিরস্কার করেছেন ও বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার কিছু কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যা ধর্মহীনতার দিক দিয়ে ইবনুল রাওয়ানদীর কবিতার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

আল্লাহই এ বিষয় ভালরূপে অবগত আছেন। এ বছর রবীউস সানী মাসে পঁচাত্তর বছর বয়সে এ মনীষী ইনতিকাল করেন। বাবে হারবের নিকট তাকে দাফন করা হয়। বিভিন্ন লোকে স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে খারাপ অবস্থায় দেখতে পেয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিকট আমরা তার মঙ্গল কামনা করি।

মুহাম্মাদ ইবন আস'আদ ইবন মুহাম্মাদ

উপনাম আবু মানসূর আল 'আত্তার, হাফাদা নামে খ্যাত। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মুনাযারা ও ফতওয়া দানে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রদের পাঠদান পেশায় লিপ্ত থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাহমুদ ইবন তাতাশা শিহাবুদ্দীন আল–হারিসী

সুলতান সালাহুদ্দীনের মামা। তিনি ছিলেন সাহসী কবি ও দক্ষ প্রশাসক। তার ভাগ্নে তাঁকে হামার জায়গীর দান করেন। ফিরিংগীরা যখন হামা অবরোধ করে তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। ফলে তারা হামা দখল করে নেয় ও বেশ কিছু বাসিন্দাকে হত্যা করে। কিন্তু অধিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুললে ফিরিংগীরা বিতাড়িত হয়ে যায়।

ফাতিমা বিনত নাসর আল–আত্তার

তিনি ছিলেন একজন উচ্চ বংশের সম্ভ্রান্ত মহিলা ও মাখযান গ্রন্থকারের বোনের উত্তরসূরি অধিক পরিমাণ ইবাদত, তাকওয়া পরহেজগারী ও পর্দা-পুশিদা লালনে সমাজে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। কথিত আছে সমগ্র জীবনে তিনবারের বেশি তিনি ঘর থেকে বরে হননি। খলীফা এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এই মহীয়সী নারীর প্রশংসা করেছেন।

হিজরী ৫৭৪ সাল

এ বছর মিশর হতে কাযী আল-ফাযিল সিরিয়ায় অবস্থানকারী নাসিরের নিকট তার বারোজন পুত্র সন্তানের সুস্থ থাকায় মুবারাকবাদ জানিয়ে এক পত্র লিখেন। পত্রে উল্লেখ করেন, আল্লাহর মেহেরবাণীতে তারা জাঁকজমকের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করছে। তাদের দিল মন মানসিকতার উন্নতি ঘটছে। তাদের থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকায় অন্যর উদার হওয়া স্বাভাবিক। তাদের ভাল- থাকার সংবাদ পেয়ে মন জুড়িয়ে যেতে পারে। তাদের থেকে দুরে থেকে চক্ষু নিদ্রাভিভূত হয়। তাদের ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করা বিচক্ষণ বাদশাহর জন্যে শোভনীয়। আল্লাহর যে সব নিয়ামত অনুগ্রহ তাদের সাথে রয়েছে তা জীবনকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে যথেষ্ট। মনিবের গলদেশ স্বর্ণের হার পরিধান করার জন্যে কি উদগ্রীব হয়ে থাকে না? তাদের দর্শন লাভ করে চক্ষু কি তৃপ্তি লাভ করতে চায় না? তার অন্তর কি ওদের সাথে সাক্ষাত করতে কান্নাকাটি করে না? এই পাখিটি তাদের সাথে কথার মালা বুনানোর সুযোগ পাবে না?

মনিবের জন্যে এ কথা বলাই শোভনীয়, আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন:

وما مثل هذا الشوق يحمل بعضه * ولكن قلبي في الهوى يتقلب

অর্থাৎ, এ আগ্রহ আখাঙক্ষার কোনো তুলনা নেই। এর কিছুটা হলেও পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আমার হৃদয়-মন তো শূণ্যে উড়ে বেড়াবে।

এ বছর থেকে মক্কায় গমনকারী হজ্জ যাত্রীদের থেকে শুল্ক ও ট্রাক্স আদায় সুলতান সালাহ উদ্দীন রহিত করে দেন। অথচ ইতিপূর্বে পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে আগত হাজীদের থেকে প্রচুর পরিমাণ ট্যাক্স আদায় করা হত। কেউ ট্যাক্স দিতে ব্যর্থ হলে তাকে আটক করে রাখা হত। অনেক সময় এসব আটককৃত হাজীরা উকুফে আরাফ থেকে বঞ্চিত হত। মক্কার আমীর মিশরের জায়গীরদার থেকে হাজীদের বিনিময়ে মাল উসুল করতেন। প্রতি বছর মক্কায় তার নিকট আট হাজার ইরদাক ফসল পাঠাতে হত। এ সম্পদ দ্বারা আমীর ও তার অনুসারী অনুগামীরা উপকৃত হত। এ ছাড়াও আমীরের অনুগামীদের জন্যে আরও খাদ্য রসদ বরাদ্দ ছিল যা তাদের কাছে পৌছানো হত।

এ বছর বালাবাক্কুর আমীর শামছুদ্দীন ইবন মুকাদ্দাম সুলতানের খেদমতে হাজির হতে অস্বীকার করে এবং তার নির্দেশ অমান্য করে। সুলতান এ সময় হিমসে অবস্থান করছিলেন। নির্দেশ অমান্য করার কারণ ছিল এই যে, শামছুদ্দীনের কাছে এ সংবাদ পৌছে যে, সুলতানের ভ্রাতা তুরান শাহ তার নিকট বালাবাক্কুর শাসন কর্তৃত্বের দাবি করলে সুলতান তাকে তা দিয়ে দেন। তাই তিনি বা'লাবাক্কু থেকে বরে হতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন সুলতান স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন এবং রক্তপাতহীন অবস্থায় ইবনুল মুকাদ্দাসকে অবরোধ করেন। পরে তার নিকট যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ-সম্পদ পেয়ে তুরানশাহর নিকট বা'লাবাক্কু ছেড়ে দিয়ে তিনি বের হয়ে আসেন।

ইবনুল আছীর লিখেছেন, অনাবৃষ্টির কারণে এ বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইরাক, সিরিয়া ও মিশর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং ৫৭৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এরপর বৃষ্টিপাত হলে দুর্ভিক্ষ লাঘব হয় ও জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। কিন্তু এর পরেই দেশজুড়ে আসে ভীষণ মহামারী। সারজাম (কালাজ্বর) নামক আরও একটি কঠিন পীড়া দেশময় বিস্তার লাভ করে। ৫৭৬ সালের পূর্বেও মাহামারী বিদূরিত হয়নি। এর ফলে এত অধিক লোক মারা যায় যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কারও জানা নেই। এ বছর রমযান মাসে মালিক সালাহুদ্দীন যখন দামিসকে অবস্থান করছিলেন তখন খলীফার পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ এক জোড়া পোশাক তার নিকট প্রেরণ করা হয়। তার উপাধি বৃদ্ধি করে মুয়িয আমীরুল মু'মিনীন করা হয। তদীয় ভ্রাতা তুরানশাহকে মুসতাফা আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এ বছর মালিক নাসির তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্র ফররুখ শাহ ইবন শাহানশাহকে ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রস্তুত করেন। কেননা, তারা দামিশকের আশে পাশে হানা দিয়ে লুট তরাজ করে এক অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে। নাসির ফররুখ শাহকে নির্দেশ দেন যে, ফিরিংগীদেরকে বাহির থেকে ঘেরাও করে শহরের মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে এবং সামনে না

---

১. ইরদাব বলা হয় এমন পাত্রকে যার মধ্যে ২৪ সা' বা প্রায় ৮৪ কেজি মাল ধরে। ৮ হাজার ইরদাবে প্রায় ২৬ হাজার ৬৪০ কেজি হয়।

আসা পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কিন্তু ফিরিংগীরা তাকে দেখেই দ্রুত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে ফররুখ শাহ তাদেরকে পরাজিত করেন এবং ফিরিংগীর রাজা নাসিরার অধিপতি হানফারীকে হত্যা করেন। হানযারী ছিল ফিরিংগীদের শক্তিধর মহান বাদশাহ। ভয়ে কেউ তার সামনে আসতে সাহস পেত না। এ যুদ্ধে আল্লাহ তাকে নির্মূল করে দেন। যুদ্ধ নাসির তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাক্ষাতের জন্যে যাত্রা করেন্ কাসওয়া এলাকায় পৌঁছেই সেনা অধিনায়কের ও বন্দীদের নিয়ে ফিরে আসতে দেখেন। ফিরিংগীরা এ বছর দারিয়াদের জন্যে বায়তুল আহযান নামক স্থানে একটি দুর্গ তৈরি করে। এরপর এটাকে তারা লুট-তরাজ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের রাজন্যবর্গ সালালুদ্দীনের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ ভঙ্গ করে এবং চারদিকের শহর উপশহরে হানা দিয়ে লুটপাট চালায়। এদের উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমানদের তাদের থেকে গাফিল করে রাখা। ফিরিংগী সৈন্যরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এক স্থানে সমবেত হতে পারত না। এদেরকে দমন করার জন্যে সুলতান তাঁর সেনাপতিদেরকে যুদ্ধের জন্যে বিচক্ষণতার সাথে বিন্যাস করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র উমরকে হামায প্রেরণ করেন, সেই সাথে ইবন মুকাদ্দাস ও সায়ফুদ্দীন আলী ইবন আহমদ আল মুশতারিবকে উপশহর ও অন্যান্য এলাকায় পাঠান। আর হিমস এর সীমান্ত এলাকায় সীয় চাচাত ভাই নাসিরুদ্দীন ইবন আসাদুদ্দীন শিরকুহকে নিযুক্ত করেন। এরপর সুলতান তার ভ্রাতা মিশরের গভর্নর মালিক আবু বকর আল আদিলের নিকট ফিরিংগীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে পনেরশ অশ্বারোহী পাঠানোর কথা বলে পত্র দেন। অপর দিকে ফিরিংগীরা দারিয়াদের জন্যে যে দুর্গ বানিয়েছে তা ধ্বংস করে দিতে আদেশ দেন। কিন্তু তারা এটা নির্মাণ করতে যা খরচ হয়েছে তা না দিলে ধ্বংস করতে অস্বীকার করে। সুলতান তাদেরকে ষাট হাজার দীনার দেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। এরপর তাদেরকে এক লক্ষ্য দীনার দেন। তখন সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিউদ্দীন উমর তাকে বলল, এ অর্থ আপনি দরিদ্র মুসলমানের জন্যে খরচ করুন আর অভিযোগ চালিয়ে ঐ দুর্গ ধ্বংস করে দিন। সুলতান তার কথা গ্রহণ করে পরের বছর দুর্গটি ধ্বংস করে দেন। এ আলোচনা সামনে যথাস্থানে আসবে।

এ বছর খলীফা মুসতাযী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সমাধির উপর একটি ফল স্থাপনের নির্দেশ দেন। ফলকে আয়াতুল কুরসি লেখার পর এ বাক্যটি লেখা হয় :

هٰذَا قَبْرُ تَاجِ السُّنَّةِ وَحِبْرُ الْاُمَّةِ الْعَالِي الْهِمَّةِ الْعَالِمِ الْعَابِدِ الْفَقِيْهِ الزَّاهِدِ۔

(এটা ঐ মহান ব্যক্তি কবর যিনি সুন্নাতের শিরোমনি উম্মাতের মহাপণ্ডিত। সাহসী বীর আলিম, আবিদ, ফকীহ যাহিদ) সর্বনীচে মরহুমের ওফাতের তারিখ লিখে দেয়া হয়।

এ বছর বাগদাদের এক কবির বাড়ি ঘেরাও করা হয়। সে রাফিযী সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করে সাহাবীদের গালাগাল ও সমালোচনামূলক কবিতা লিখত। যারা সাহাবীদের ভালবাসে ঐ কবি তাদেরও নিন্দা করত। খলীফার নির্দেশক্রমে তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয। কবির সাথে আলোচনা করে জানা গেল যে, সে একজন কট্টর রাফিযী। এ মতের প্রচারক ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক ফকীহগণ তার উভয় হাতও জিহবা কর্তন করার ফতওয়া দেন। সাথে সাথে ফতওয়া বাস্তবায়ন করা হয়। ক্ষীপ্ত জনগণ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং ইট-

পাথর মারতে থাকে। আঘাত সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে সে দাজলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকজন তাকে নদী থেকে তুলে হত্যা করে ফেলে। এরপর তারা তাকে রশি দিয়ে পা বেঁধে শহরের অলি–গলি ও সমস্ত বাজারে টেনে নিয়ে প্রদক্ষিণ শেষে এক গর্তে নিক্ষেপ করে এবং ইট ও চুন দিয়ে গর্ত ভরে দেয়। জনগণ ছিল এত ক্ষিপ্ত যে, পুলিশ তাকে ছড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়নি। এ বছর যেসব বিশিষ্ট লোক মারা যান নিম্নে তাদের বর্ণনা দেয়া হল–

আস'আদ ইবনে আলদারাক আল-জিবরীলী :

এ মনীষী হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন শায়খ ও উস্তাদ। বিচক্ষণ আলোচক ও তীক্ষ্ম মেধা সম্পন্ন। একশ চার বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল- হায়স বায়স (الحيص بيص)

সা'দ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'দ (উপাধি) ঃ শিহাবুদ্দীন আবুল ফাওয়ারিস যিনি হায়স-বায়স নামে পরিচিত। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ আছে। এ বছর শা'বান মাসের পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার তিনি ইনতিকাল করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর। নিযামিয়া মাদরাসায় জানাযা নামায শেষে বাবুত তামান নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। সে সময় রচনা শিল্পে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কোন বিষয়ে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে উন্নত ভাষায় রূপদান করতেন যা কিছু লিখতেন তা হত অত্যন্ত বলিষ্ঠ। নিজেকে তিনি বনূ তামীমের লোক বলে দাবি করতেন। তার পিতার নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, তার কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে আমিও একথা শুনিনি। তার এ দাবীর সমালোচনা করে জনৈক কবি বলেন–

كم تبادى وكم تطيل طرطو * رك وما فيك شعرة من تميم

فكل الضب واقرط الحنظل اليا * يس واشرب ان شئت بول الظليم

فليس ذا وجه من يضيف ولا يقـ * ـرى ولا يدفع الاذى عن حريـم

অর্থাৎ, আর কত দিনতুমি এ দাবি প্রচার করতে থাকবে এবং তোমার পরিহিত টুপী টেনে লম্বা করবে?

তোমার কবিতায় বনূ তামিমের কোন ছাপ নেই। যদি বনূ তামিমের দাবিতে অটল থাক তা হলে গুঁইসাপ ভক্ষণ কর মাকাল ফল কর্তন কর ও ইচ্ছে করলে উটপাখীর পেশাব পান কর।

ঐ ব্যক্তি সম্মানিত হতে পারে না, যে কোথাও মেহমান হতে চায় কিন্তু তার মেহমানদারী করা হয় না। এবং নিরাপাত্তা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা হয় না।

হায়স- বায়সের উত্তম কবিতার মধ্যে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো প্রনিধানযোগ্য :

سلامة المرء ساعة عجب * وكل شيء لحتفه سبب

يفر والحادثات تطلبه * يفر منها ونحوها الهرب

وكيف يبقى على تقلبه * مسلما من حياته العطب

অর্থাৎ, কোন লোকের এক ঘন্টা শানিত ও নিরাপত্তার থাকা এক আশ্চর্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বস্তুর ধ্বংস হওয়ার পিছনে কোনো না কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে।

মানুষ তো দুর্যোগ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; অথচ দুর্যোগ তাকে খুঁজতে থাকে। দুর্ঘটনা এড়াতে সে পলায়ন করতে থাকে; অথচ সে বুঝে না যে, দুঘটনার দিকেই সে এগিয়ে যাচ্ছে।

যে তুলা সর্বদা শূণ্যে ঘুরে বেড়ায় সে তার জীবনকে স্থির রাখবে কিভাবে?.

তার আরও কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা উদ্ধৃত করা হল–

لا تلبس الدهر على غرة * فما لموت الحى من بد

ولا يخادعك طول البقا * فتحسب التطويل من خلد

يقرب ماكان اخرا * ما اقرب المهد من اللحد

অর্থাৎ, কালের আবর্তে পড়ে ধোঁকা খেওনা; কেননা জীবের মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারে না। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশায় প্রতারিত হয়ো না। কারণ, তখন দীর্ঘ জীবনকে তুমি চিরস্থায়ী ভেবে বসবে। যা কিছু ভবিষ্যত ঘটবে তা ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে। যেমন শিশুর দোলনা কবরের বাক্সের কাছাকাছি।

এইর কাছাকাছি অর্থবোধক কথা লিখেছেন ইকদ কাব্যের রচয়িতা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদি রাবিবাহি আল আনদাহুলনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে যথা:

الا انما الدنيا غضارة ايكة * اذا اخضر منها جانب جف جانب

وما الدهر والامال الا فجائع * عليها وما اللذات الا مصائب

فلا تكتحل عيناك منها بعبرة * على ذاهب منها فانك ذاهب

অর্থাৎ, জেনে রেখ, এ দুনিয়া ঘন বৃক্ষরাজির এক উদ্যান বিশেষ। এর এক পাশ সবুজ থাকে তো আর এক পাশ শুকিয়ে যায়। এখানকার কাল-চক্রের উপর থাকে আশা-আকঙ্ক্ষার বুভুক্ষ থাবা। এর আস্বাদ গ্রহণ করার অর্থ হল বিপদ-আপদ টেনে আনা। সুতরাং দুনিয়ার কোনো সম্পদ যদি তোমার হাতছাড়া হয়, তা হলে বিলাপ করে অশ্রু ঝরিয়ে চক্ষু বারি করোনা। কেননা, তোমাকেও দুনিয়া ছেড়ে দিতে হবে।

আবু সা'দ সামআলী তাঁর কিতাবের পরিশিষ্ট এই হায়স-বায়সের কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন। তার কাব্য ও অন্যান্য রচনাপত্র তার সামনে পাঠ করে শুনানো হয়। কাযী ইবন খাল্লিকান তাঁর রচনা শৈলীর প্রশংসা করে বলেছেন, এর মধ্যে ভ্রষ্টতা ও অহংকারের ছাপ রয়েছে। তিনি উন্নত অলংকার ও ফসীহ ভাষায় কথা বলতেন। তিনি ছিলেন ফকীহ ও শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। এক পর্যায়ে তিনি দর্শন ও তর্কশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করেন। পরবর্তীতে সবকিছু বাদ দিয়ে কাব্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আরবী কবিতা ও আরবী ভাষায় ভিন্নতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন বড় পণ্ডিত। ইবন খাল্লিকান লিখেছেন, তাকে হায়স- বায়স বলে ডাকার কারণ আছে। ব্যথিত আছে একবার তিনি লোকজনকে গোলমাল ও হৈ চৈ করতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এরা হায়স-বায়স করছে কেন? অর্থাৎ, শোরগোল ও দুষ্টামি করছে কেন? তখন থেকে এই শব্দ তার নামের সাথে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনি নিজেকে আরবের চিকিৎসক আকছাম ইবন সায়ফির বংশধর বলে দাবি করতেন। তিনি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। হুল্লা শহরে তার কিছু ঋণ দেয়া ছিল, সেগুলো আদায় করতে গেলে বাগদাদে তাঁর ইনতিকাল হয়।

মুহাম্মাদ ইবন নাসীম

আবু আবদুল্লাহ আল-খায়্যাত আতীকুর রাইস আবুল ফযল ইবনে আবসুল। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। প্রায় আশি বছর বয়সকালে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ইনতিকাল করেন। তিনি বলেন, আমাকে কবিতা শিখিয়েছেন মওলাদদীন অর্থাৎ, ইবন্ আল্লামুল হাকিম ইবন আবগুল:

للقارىء المحزون اجدر بالتقى * من راهب فى ديره متقوس
ومراقب الافلاك كانت نفسه * بعبادة الرحمن احرى الانفس
والماسح الارضين وهى فسيحة * اولى بمسح فى اكف اللمس
اولى بخشية ربه من جاهل * بمثلث ومربع ومخمس

অর্থাৎ, একজন চিন্তাশীল পাঠক তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির ক্ষেত্রে ঐ তাপস্যের চেয়ে অধিক যোগ্য, যে তার উপাসনাগৃহে তপসা করতে করতে ধনুকের ন্যায় বেকে গেছে। আকাশ জগত, নিয়ে যে গবেষণা করে সে দয়াময় আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশি উপযুক্ত। প্রশস্ত যমিনে বিচরণ করা কারও হাত স্পর্শ করতে গমন করার চেয়ে উত্তম। আর ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে জাহিল ব্যক্তির চেয়ে তিন, চার ও পাঁচ গুণ অধিক শ্রেয়।

হিজরী ৫৭৫ সাল

এ বছরের শুরুতে ঐতিহাসিক মারজে উয়ুনের ঘটনা সংঘটিত হয়। সুলতান সালাউদ্দীন এ সময় সেনাবাহিনীসহ বানিয়াসের কাযির টিলায় অবস্থান করছিলেন। ফিরিংগীদের সম্মিলিত বাহিনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অসগ্রসর হয়। সুলতানও তাদের মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয় ও দুই বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। আল্লাহ সুলতানকে সাহায্য করেন ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করেন। ক্রুশধারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে পলায়ন করতে উদ্যত হয়। আল্লাহর পক্ষে অশ্ববাহিনী তাদের ধাওয়া করে। ফলে তাদের মধ্যে থেকে অগণিত লোক নিহত হয় এবং তাদের রাজন্যবর্গের একটি বৃহৎ দল বন্দী হয়। এ সময় তারা সুলতানের নির্দেশ শুনতে ও আনুগত্য করতে প্রস্তাব দেয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছে মুকাদ্দামুদ দাবিয়া, মুকাদ্দামুল আবসাবাতারিয়া। রমলা, তবরিয়া ও কুসতালাতের শাসক ইয়াফা। এ ছাড়া তাদের আরও রাজন্যবর্গ ও বীর-বাহাদুর বহু সেনা-ধ্যক্ষ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের অশ্ববাহিনীর প্রায় তিনশ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাসহ বহু অশ্বারোহীকে বন্দী করা হয়। এরা সনাই বন্দীত্বের লাঞ্চনা ভোগ করতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক আম্মাদ বলেন, রাত্রিবেলা সুলতান এসব বন্দীদের নিকট থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ কাজ করতে করতে ভোর হয়ে যায়। সে দিন তিনি ইশার উযু দ্বারা ফজরের সালাত আদায় করেন। রাতের এক পর্যায়ে তিনি মাত্র বিশজন মুসলমান সৈন্যকে সাথে নিয়ে তথ্য নিচ্ছিলেন তখন বিপুল সংখ্যক ফিরিংগী চারপাশে সমবেত ছিল। এ সময় তারা কোনো অঘটন ঘটাতে পারত কিন্তু আল্লাহ তাকে তাদের হাত থেকে নিরাপদ রাখেন। এরপর সমস্ত বন্দীকে দামিশকের দূর্গে আটক রাখার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে রামালার শাসক ইবনুল বারখানী নিজেকেও তার

শহরের এক লক্ষ বন্দীকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার সুরিয়া দীনার দেয়ার প্রস্তাব দিলে সুলতান তা গ্রহণ করেন। বন্দীদের মধ্য থেকে আরও একটি বড় দল বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয়। কতিপয় বন্দী জেলখানায় আটক অবস্থায় মারা যায়। ঘটনাক্রমে যে দিন সুলতান মারজে উয়ুলে ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। সেদিন মুসলমানদের নৌ-বাহিনীও সমুদ্র ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান চালায়। আরও একটি নৌ-বহর এসে তাদের সাথে মিলিত হয়। ফলে এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী ফিরিংগীদের এক লাখ লোককে বন্দী করে বিজয়ী বেশে উপকূলে চলে আসে। দেশের কবিগণ এ যুদ্ধে সুলতানের প্রভূত প্রশংসা ও স্তুতিমূল কবিতা লিখে প্রকাশ করেন। যুদ্ধ জয়ের সংবাদ লিখিতভাবে বাগদাদে পৌছলে লোকের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ খেলে যায়। মালিক মুজাফফার তাবিয়দ্দী-এর চেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বিষয়টি হল রোম সম্রাট ফারার সালান সুলতানের নিকট রানান দুর্গ ফেরৎ চেয়ে পত্র পাঠান এবং বলেন যে, নূরুদ্দীন এ দূর্গ তার থেকে কেড়ে নিয়েছিল এবং তার পুত্র বিদ্রোহ করেছে। সুলতান তার এ পত্রের কোনো জবাব দেননি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রোম সম্রাট রানান দূর্গ অবরোধ করার জন্যে বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এ দিকে সুলতান আটশ অশ্বারোহীসহ তকিউদ্দীন উমরকে তাদের মোকাবিলায় প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে সাইফুউদ্দীন আলী ইবন আহমাদ আল মাশরূবও ছিলেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে আল্লাহর হুকুমে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়। এর ফলে রানাল দূর্গে সালাহুদ্দীনের শক্তি আরও মজবুত হয়। ইতিপূর্বে এ দুর্গটি ইবনুল বা'লাবাক্কুর পরিবর্তে দেয়া হয়েছিল তকিউদ্দীন উমর এ ঘটনাকে নিয়ে গর্ব করে বলতেন, মাত্র আটশ সৈন্য দ্বারা বিশ হাজার ভিন্ন মতে ত্রিশ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেছি। এ বিজয়ের মূল কারণ ছিল এই যে, তিনি গভীর রাতে শত্রু-বাহিনীকে পরিবেষ্টন করে ফেলেন ও একযোগে হামলা করেন ফলে দিক-বেদিক হয়ে তারা দ্রুত পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যায়। অধিক সংখ্যক লোক নিহত হয়। তারা তাবূর মধ্যে যা কিছু ফেলে যায় তা মুসলমানদের হস্তগত হয়। এক বর্ণনা মতে তকিউদ্দীন সেই দিন শত্রুকে পরাজিত করেন যেই দিন সুলতান সালাহুদ্দীন মারজে উয়ূলে ফিরিংগীদের পরাজিত করেছিলেন। আল্লাই ভাল জানেন।

আহমান দুর্গ বিধ্বংস

এ দুর্গটি সাফাদ এলাকার সন্নিকটে অবস্থিত। বিজয়ের পর সুলতান ঐ দুর্গের দিকে যাত্রা করেন যা ফিরিংগীরা গত বছর তৈরি করে এবং তার অভ্যন্তরে কুয়া খনন করে ঝর্ণা হিসেবে ব্যবহার করে। এরপর তা দাবিয়াদের হাতে অর্পণ করে। সুলতান এ দুর্গটি জয় করার উদ্দেশ্যে অবরোধ করেন এবং চতুর্দিকে ছিদ্র করেন। পরে এতে অগ্নি ঢেলে ভিত পর্যন্ত নষ্ট করে দেন। দুর্গের ভিতর যত মালামাল ছিল সবই গণীমত হিসেবে সংগ্রহ করেন। এসব মালের মধ্যে ছিল এক লক্ষ অস্ত্র ও প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী। দুর্গের সাতশ লোককে বন্দী করে কতককে হত্যা করেন আর অবশিষ্টদের দামিস্কের কারাগারে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি স্বয়ং বিজয়বেশে দামিস্কে প্রবেশ করেন। অবশ্য সুলতানের বাহিনীর দশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চৌদ্দ দিনের অবরোধকালে গরম ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিজয়ের আনন্দ নিয়ে জনগণ তাদের প্রথা অনুযায়ী

ইয়াকুবের মাযার যিয়ারত করেন। কবিগণ সুলতানের ভূয়সী প্রশংসা করে কবিতা রচনা করে? তাদের একজনের কবিতার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল—

بحمدك اعطاف القنا قد تعطفت * وطرف الاعادى دون مجدك يطرف
شهاب هدى فى ظلمة الليل ثاقب * وسيف اذا ما هزه الله مرهف
وقفت على حصن المخاض وانه * لموقف حق لا يوازيه موقف
فلم يبد وجه الارض بل حادونه * رجال كاساد الثرى وهى ترجف
وجرد سلهوب ودرع مضاعف * وابيض هندى ولدن مهفهف
وما رجعت اعلامك البيض ساعة * الا غدت اكبادها السود ترجف
كنائس اغياد صليب وبيعة * وشاد به دين حنيف ومصحف
صليب وعباد الصليب ومنزل * لنوال قد غادرته وهو صفصف
اتسكن اوطان النبيين عصبة * تمين لدى ايمانها وهى تحلف
نصحتكم والنصح فى الدين واجب * ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف

অর্থাৎ, আমি আপনার প্রশংসা করছি। যুদ্ধে নেযার মাথা ঝুঁকে পড়েছে। আপনার সম্মানের সম্মুখে শত্রুদের চক্ষু ঘুরে গিয়েছে। রাত্রের অন্ধকারে আপনি পথ প্রদর্শনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। আপনি তলোয়ার সদৃশ আল্লাহ যখন তাতে ঝাঁকা দেন তখন তা আরও সূক্ষ্ম ও ধারাল হয়ে যায়। সাহযাতুল আহযান দুর্গে আপনি অবস্থান নিয়েছেন। এ অবস্থান যথাযথভাবে সঠিক হয়েছে; অন্য কোন অবস্থান স্থল এর সমতুল্য হতে পারে না। ফলে ভূমির উপরিভাগ আর প্রকাশিত হয়নি। এবং তার মাঝে বনের ঝুপড়ির ন্যায় কিছু লোক ভয়ে কাঁপছিল। আরও দৃষ্টি- গোচর হল বৃক্ষ-লতা শূণ্য প্রলম্বিত স্থান, দ্বিগুণ কড়া বিশিষ্ট বর্ম ভারতীয় তলোয়ার ও হালকা পাতলা সচ্চরিত্র সাথী।

আপনার শুভ্র ঝাণ্ডা ক্ষণিকের জন্যেও প্রত্যাবর্তন করলে লোকের কলিজা প্রকম্পিত হতে থাকে। ক্রুশধারী সন্ন্যাসীদের গির্জার্য সত্য একনিষ্ঠ দীন ও পবিত্র কিতাব বিনষ্ট হয়। ক্রুশ ক্রুমের পুজারী ও আবাস-স্কুলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী আপনি হামলা করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। নবীদের বাসস্থানে কি এমন লোকদের বসবাস শোভা পায় যারা তাদের ঈমানের নিকট কসম করে মিথ্যা কথা বলবে? আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। দ্বীনের জন্যে উপদেশ দেয়াও জরুরি। তাই ও মুহুর্তে তোমরা ইয়া'কুব (আ)-এর বাড়ি ত্যাগ কর কেননা, ইউসুফ এসে গিয়েছে।

আর এক কবি বলেন—

هلاك الفرنج اتى عاجلا * وقد ان تكسير صلبانها
ولو لم يكن قد دنا حتفها * لما عمرت بيت احزانها

অর্থাৎ, ফিরিংগীদের পতন অতি দ্রুত এসে গেল। আর এখন তাদের ক্রুশ ভাংগার সময় এসেছে। যদি এর ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে না আসত তা হলে আহযান দুর্গ নির্মিত হত না।

কাযী ফাযিল বাগদাদের উদ্দেশ্যে যে কিতাব লিখেন তাতে এ দুর্গ ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরেন। সেখান থেকে কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হল যথা: দুর্গ প্রাচীর মেপে দেখা যায় যে প্রাচীর গাত্র দশ হাতের বেশি চওড়া। প্রাচীরের দেয়াল গাথার জন্যে বড় বড় পাথর কাটা হয় যার এক একটি খণ্ড ছিল সাত হাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশি। এরূপ পাথর খণ্ডের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের বেশি। ভিত্তির উপরে এক একখানা পাথর গাথার বিনিময় দেয়া হত চার দীনারেরও অধিক। দুই প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল অতিরিক্ত শক্ত ও কঠিন শিলা। উচু পাহাড়ের চূঁড়া থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হত। একটি পাথরের উপর অনুরূপ আর একটি পাথর সাজিয়ে চুন দ্বারা লেপে আটকিয়ে দেয়া হত। কোনো শক্তিশালী লোহা দ্বারা এগুলো ভাংগা সম্ভব হত না।

এ বছর সালাহুদ্দীন স্বীয় ভাতিজা ইযযুদদীন ফররুখ শাহকে বালাবাকুকুর জায়গীর দান করেন। এ বছর সুলতান সাফাত শহর ও তার শাসকের উপর অভিমান পরিচালনা করেন যুদ্ধে সেখানকার বিরাট একদল যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। ফররুখ শাহ ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত সাহসী বীর।

কাযী ফাযিল এ বছর দামিশক থেকে হতে গমন করেন ও মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। আগমন পথে তিনি অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হন। দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এর আগের বছর তিনি মিশর থেকে হাজ, যান ও সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছরের তুলনায় গত বছরের হজ ছিল তার পক্ষে অনেকটা সহজ। এ বছর এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, যার ফলে বহু দুর্গ ও জনপদ বিধ্বস্ত হয় ও অসংখ্য লোক মারা যায়। বিবর্ণ মরুভূমি এমন কি চারদিকে দুরবর্তী পাহাড়েও এর ধাক্কা লেগে ক্ষতি সাধিত হয়। এ বছর দুর্ভিক্ষে জন জীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উল্লিখিত উভয় কারণে বিপুল সংখ্যক লোকের প্রাণহানী ঘটে

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

মুসতাযী বি- আমরিল্লাহর মৃত্যু ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাওয়াল মাসের শেষ দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী ঐ সময় তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। এ সময় বাগদাদে বিরাট অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জনগত বহু বাড়ি-ঘর লুট করে বিপুল পরিমাণ মালামাল নিয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে শাওয়াল মাসের বাইশ তারিখ জুমআর দিন তিনি যুবরাজ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনুল মুসতাযীর পক্ষে খুতবা দেন ও নাসির লি দীনিল্লাহ্ উপাধি দিযে তাকে খলীফা ঘোষণা করেন। তার নাম যখন মিম্বার থেকে ঘোষণা করা হয় তখন সকল খতীব মুআযযিন ও উপস্থিত জনতার মধ্যে স্বর্ণ বিতরণ করা হয়। ঈদুল ফিতরের দিন তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। টানা একমাস যাবত জ্বরে ভুগতে থাকেন এবং জ্বর-বাড়তে থাকে। অবশেষে শাওয়াল মাস অতিক্রম করলে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র উনচল্লিশ বছর। তার খিলাফতকাল ছিল নয় বছর তিন মাস সতের দিন।[১] পরের দিন তার গোসল ও জানাযা হয় এবং তার ওসিয়ত

১. কামিল গ্রন্থে খ. ১১, পৃ. ৪৫৯ আছে যিল-কাদের ২ তারিখ (দ্র. মিরআতুয-যামান, খ. ৮, পৃ. ৩৫৬; জাওহারুছ-ছামিন খ. ১, পৃ. ২১৩; তারিখে আবুল ফিদা খ. ৩, পৃ. ৬২; নিহায়াতুল আরাবে আছে খ. ২, পৃ. ৮৯; শাওয়ালের দশ তারিখ শুক্রবার)।

অনুযায়ী স্বীয় নির্মিত দারুন-নাসরে তাকে দাফন করা হয়। তার উত্তরাধিকারী দুই পুত্রের মধ্যে একজন হল যুবরাজ ইদ্দাতুদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল আব্বাস আহমদ আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ অপরজনের নাম আবূ মানসূর হাশিম। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তার মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। খলীফা মুসতাযী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক ও উত্তম খলীফা। গোটা রাজ্যে তিনি ভাল কাজ চালু ও মন্দ কাজ রহিত করেন। জনগণের উপর থেকে কর-খাজনা মওকুফ করে দেন ও বিদআত এবং শরীআত বিরোধী কাজ বন্ধ করেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল গম্ভীর ও দয়ালু। তার পরে স্বীয় পুত্র নাসিরের পক্ষে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম

ইবরাহীম ইবন 'আলী

উপনাম আবূ ইসহাক-ফকীহ ও শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। ইবনুল ফাররা উমাবী বাগদাদী নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন বড় পন্ডিত। তার্কিক উচু মাপের ভাষাবিদও কবি। চুহাত্তর বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষক আবুল হাসান কাযবীনী তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

ইসমাঈল ইবন মাওহূব-এর পূর্ণ পরিচয়

ইসমাঈল ইবন মাওহূব ইবন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আল-খিযির আবূ মুহাম্মাদ আল-জাওয়ালীকী, হুজ্জাতুল ইসলাম। তিনি ছিলেন সে যুগে আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। ইসলামের প্রতি বিশ্বাস-আনুগত্য ও নিষ্ঠা, ভাষা ও ব্যকরণের জ্ঞান, আচরণ ও নিয়তের বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বাল্যকালে যৌবনকালে ও বৃদ্ধকালে জীবনের সকল পর্যায়ে তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি হাদীস ও আছার শ্রবণ করেন ও তার মর্ম অনুযায়ী সুন্নাতের পথ অনুসরণ করে চলেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আল মুবারাক ইবন আলী ইবন হাসান

আবু মুহাম্মাদ ইবনে তাব্বাখ আল-বাগদাদী। মক্কায় আগমন করেন ও তথায় বসবাস করেন। মক্কায় থেকে তিনি হাদীছ মুখস্থ করেন। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যে দিন তাঁর জানাযা হয় সে দিন চারদিক থেকে মানুষের ঢল নামে।

নাসির লি দীনিল্লাহ আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবন মুসতাযীর খিলাফত

পাঁচশ পচাঁত্তর সালের শাওয়াল মাস অতিক্রম হয়ে গেলে ঈদের রাতে তার পিতার ইনতিকালের পর রাজ্যের আমীর ওযীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ তার বায়আত গ্রহণ করে। পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে নাসিবের পক্ষে মিম্বারে খুতবা দেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, পিতার মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব ভার কিন্তু অন্যদের মতে এক সপ্তাহ পূর্বে। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় পিতার মৃত্যুর পর দুইজন লোকও এ ব্যাপারে

---

২. ইবনুল আছীর খ. ১১, পৃ. ৪৫৯; নয় বছর সাত মাস : ইবন খালদূন খ. ৩, পৃ. ৫৫৮; সাড়ে নয় বছর।

আপত্তি উঠায়নি। তিনি নিজের জন্যে নাসির উপাধি গ্রহণ করেন। বনু আব্বাসের মধ্যে আর কেউ নাসিরের ন্যায় দীর্ঘকাল খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। কেননা ছয়শ তেইশ সালে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ধীরসম্পন্ন, বীর ও প্রভাব বিস্তারকারী। সামনে তার মৃত্যুর বর্ণনার সময় এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ খিলাফাতে আসীন হয়ে এ বছরই জিল-ক্বাদের সাত তারিখে বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ যহীরুদ্দীন আবু বকর ইবন আত্তারকে পদচ্যুত করেন। তাকেও তার সংগীদেরকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করা হয় এবং ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত অনেককে হত্যা করা হয়। তাদের এ শাস্তির কথা সারা দেশে প্রচারিত হয়ে যায়। ফলে নাসিরের খিলাফত পূর্বের চেয়ে আরও মজবুত হয়, রাজ্যের মধ্যে তার বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং সকল স্তরে খিলাফতের শক্তি দৃঢ়তর হয়। কিছুদিন পর ঈদুল আযহা সমাগত হলে সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা হয়।

হিজরী ৫৭৬ সাল

সুলতান সালাহুদ্দীন এ বছর ফিরিংগীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসায় উপনীত হন। তিনি রোমে যেয়ে সেখানকার বনূ আরতাকের রাজন্যবর্গের সাথে সমঝোতা করে পুণরায় আরমানে ফিরে আসেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি তথার একটি দুর্গ দখল করেন। দুর্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যত পাত্র ছিল সেগুলোসহ বহু মালামাল গণীমত হিসেবে উদ্ধার করেন। দুর্গটি দখলের কারণ হল, এর অধিপতি তুর্কমানের এক কওমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করে। তিনি তাকে বহিস্কার করে তার দেশে পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি তার পথে সম্পদ প্রদান ও বন্দী মুক্ত করার শর্তে সন্ধি করেন। এ ছাড়া ফিরিংগীদের হাতে আটককৃত বন্দীদেরকেও তিনি মুক্ত করে আনেন। সকল কাজ সম্পন্ন হলে জামাদিউস সানীর শেষ দিকে তিনি বিজয়ীবেশে হামায় প্রবেশ করেন। দেশের কবিগণ তার এ অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করে কবিতা লিখেন।

এ বছর মাওসিলের শাসক- সাযফুদ্দীন গাযী ইবন মাওদূদ ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন যুবক দীর্ঘকায় ও সুঠাম দেহের অধিকারী এবং মুখে ছিল চাপ দাড়ি। দশ বছর শাসক পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ত্রিশ বছর বয়সকালে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন পবিত্র মনের অধিকারী, গম্ভীর ও প্রভাব বিস্তাকরারী। আরোহণকালে বা বৈঠককালে এদিক সেদিক তাকাতেন না। তার ব্যক্তিত্ব ছিল এত মর্যাদাবান যে, কোনো বয়স্ক খাদিমকে মহিলা অংগনে আসার অনুমতি দিতেন না। রক্তপাত ঘটতে পারে এরূপ কাজে অগ্রসর হতেন না। অবশ্য কৃপণতার কিছু দোষ তার প্রতি আরোপ করা হয়ে থাকে আল্লাহ তাকে মার্জনা করুন। এ বছর সফর মাসের তিন তারিখে তার ইনতিকাল হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বীয় পুত্র ইয্যুদদীন সানজার শাহকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বয়স তখন কম থাকায় রাজ্যের আমীরগণ সালাহুদ দীনের ভয়ে এতে সম্মত হতে পারেননি। বরং তারা সবাই তা ভ্রাতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। সুতরাং তাকেই পরবর্তী শাসক হিসেবে ক্ষমতায় বসান হয়। ভ্রাতার নাম ইয্যুদদীন মাসউদ। আর মুজাহিদুদ দীনকে করেন তার সহকারী ও সচিব। এ দিকে খলীফার প্রেরিত দূত এসে সালাহুদদীনকে সুরুজ রাহা ও রাককা নিজের দায়িত্বে রেখে

সাররান, খাবূর ও নাসিবীন ইয্যুদদীন মাসউদের অধীনে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। কেননা, এগুলো তার ভ্রাতা সাইফুদ্দীন গাজীর অধীনে ছিল। কিন্তু সুলতান এতে রাজি হননি। তিনি জবাবে বললেন, এই শহরগুলো মুসলমানদের সীমান্ত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। আমি তাকে দিয়েছিলাম যাতে ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। খলীফাকে তিনি লিখে জানালেন যে, মুসলমানদের স্বার্থে এটা ছেড়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত।

সুলতান তুরাগ শাহর মৃত্যু

এ বছর সুলতানুল মালিকুল মুআযযাম শামসুদ, দৌলা তুরাগ শাহ ইবন আইয়ূব মৃত্যুবরণ করেন তিনি ছিলেন মালিখ সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা। ভাইয়ের নির্দেশক্রমে তিনি অভিযোগ চালিয়ে ইয়ামেন জয় করেন। জয়ের পর তথায় কিছুদিন অবস্থান করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেন এরপর সেখানে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে তিনি ভ্রাতার ভালবাসার টানে সিরিয়া চলে আসেন। ইবনুল মুনজিম নামক জনৈক কবি পথিমধ্যে তাকে একটি কবিতা লিখে পাঠান। এ সময় তারা সামা নামক স্থানে পৌছে যায়। কবিতাটি এই—

هل لأخي بل مالكي علم بالذي * اليه وان طال التردد راجع
واني بيوم واحد من لقائه * علي وان عظم الموت بايع
ولم يبق الا دون عشرين ليلة * ويحيي اللقا ابصارنا والمسامع
الى ملك تعنو الملوك اذا بدا * وتخشع اعظاما له وهو خاشع
كتبت واشواقي اليك ببعضها * تعلمت النوح الحمام السواجع
وما الملك الا راحة انت زندها * تضم على الدنيا ونحن الاصابع

অর্থাৎ, আমার ভাইয়ের বরং আমার মালিকের সেই ব্যক্তির সম্পর্কে কি ভাল জানা আছে, যে তার কাছেই রয়েছেন যদিও তার সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রলম্বিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। আমি এক দিনের জন্যে হলেও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে বদ্ধপরিকর। মৃত্যু যদিও বড় হয়ে থাকে তাতে কোনো পরোয়া নেই। বিশ দিনেরও কম সময় হাতে আছে। এরই মধ্যে আমাদের চক্ষু কর্ণ আপনার সাক্ষাতে জীবন লাভ করবে।

সেই শাসকের প্রতি আমরা আকৃষ্ট যিনি প্রকাশ হলে অন্যসব শাসক তার মহত্ত্বের সামনে অনুগত ও ভীত হয়ে পড়ে, অথচ তিনি থাকেন বিনম্র। আপনার প্রতি আমার আকৃষ্ট হওয়ার কিছু ভাব লিখে প্রকাশ করলাম। আপনি অবশ্যই কবুতরের বাক-বাকুম আওয়াজ সম্পর্কে সম্যক অবগত। রাজ্য শাসন হচ্ছে এক অনাবিল আনন্দ যা দুনিয়ার জীবনে ভোগ করা যায়। আপনি এর হাতের কবজী আর আমরা হলাম অংগুলি।

তুরাগ শাহ্ তার ভাই আমরা হলাম অংগুলি। তুরাগ শাহ তার ভাই সালাহুদ্দীনের নিকট আসেন ৫৭১ হিজরী সালে। তিনি তার নিকট উন্নত ও প্রশংসাযোগ্য অবস্থান লক্ষ্য করেন সালাহুদ্দীন কিছু দিনের জন্যে তাকে অর্পণ করেন পরে তিনি মিশরে গমন করেন তখন তাকে আলেকজান্দেরিয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তার সহ্য হয়নি। তিনি তথায় কাওয়ালিনজ রোগে আক্রান্ত হন এবং এ বছরই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেখানকার রাজ প্রাসাদের

আংগিনায় তাকে দাফন করা হয়। কিন্তু পরে তার কোন সিত্তুশ-শাম বিন্ত আইয়ূব তার দেহাবশেষ সেখান থেকে তুলে নিয়ে সিরিয়ার বারানিয়ায় নিজের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন এখানে প্রথমে তুরাগ শাহর কবর। মাঝখানে তার স্বামীর কবর ও চাচাত ভাই হামা ও রহবার অধিপতি নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আসাদুদ্দীন শিরকুহর কবর এবং সর্বশেষে তার নিজের কবর। ভগ্নি সিত্তুশ শাম-এর পুত্র হুসামুদ্দীন উমর ইবন লাশীন-এর নামানুসারে এ কবরস্থানকে হুসামিয়া কবরস্থান বলা হয়। এ কবরস্থানটি (মুসতানসিরিয়া) মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। বাদশাহ তুরাগশাহ ছিলেন দয়ালু। বীর মহৎ ও উদার। দান-দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন বিশ্বাস অন্তরের অধিকারী। ইবনসা'দান আল হাবলী তাঁর সম্পর্কে বলেন–

هو الملك ان تسمع بكسرى وقيصر * فإنهما في الجود والباس عبداه
وما حاتم ممن يقاس بمثله * فخذ ما رايناه ودع ما رويناه
ولذ بعلاه مستجيرا فانه * يجيرك من جور الزمان وعدواه
ولا تحمل للسحائب منه اذا * هطلت جودا سحائب كفاه
فترسل كفاه بما اشتق منهما * فلليمن يمناه ولليسر يسراه

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন এমন একজন বাদশাহ যে, দানশীল তায় ও বীরত্ব প্রদর্শনে কিসরা ও কায়সারকে তার দাসাসুদাস বলে মনে হবে। বদান্যতার বিবেচনায় তার সাথে তুলনা করলে হাতিম তাইকেও কিছুই মনে হবে না। আমরা যা দেখেছি তা মেনে নাও। আর যা না দেখে বর্ণনা করি তা বর্জন কর। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও প্রতাপশালী যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা যায়। কেননা, তিনি তোমাকে কালের যুলুম চক্র ও শত্রুতা থেকে রক্ষা করবেন। তিনি যখন দু'হাত দিয়ে দান বর্ষণ করেন তখন মেঘমালা থেকে মুষলধারার বৃষ্টিও তুচ্ছ মনে হয়। তিনি তার দু'হাতে দান ছড়াতে থাকেন ডান দিকে ডান হাত দ্বারা এবং বাম দিকে বাম হাত দ্বারা।

রাজা সালাহুদ্দীনের নিকট যখন তার মৃত্যু সংবাদ পৌছে তখন তিনি হিমসের উপরিভাগে স্থাপিত শিবিরে অবস্থান করছিলেন। মৃত্যু সংবাদে তিনি ভীষণ দুঃখিত হন ও দারুণভাবে ভেংগে পড়েন। তিনি তার বীরত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহ করে শোকগাঁথা রচনা করেন- যা সংরক্ষিত রয়েছে।

এ বছর রজব মাসে খলীফা নাসিরের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত নাসির সালাহুদ্দীনের জন্যে রাজকীয় পোশাক ও উপহার সামগ্রী পাঠানো হয়। তিনি খলীফার রাজকীয় পোশাক দামিষ্কে পরিধান করেন। এ উপলক্ষ্যে রাজধানী শহরকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করা হয়। এ দিনটি নগরবাসীর জন্যে আনন্দ-উৎসবের দিনে পরিণত হয়। এ বছর রজব মাসেই সুলতান মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা দেখার জন্যেও রমযানের রোযা পালন করার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন। এ বছর হজ্জব্রত পালন করাও তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ইয্যুদ্দীন ফররুখ শাহকে সিরিয়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি ছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিশালী বাদশাহ ও দয়া অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক। এ সময় মালিকুল আদিল আবু বকরের পক্ষ থেকে কাযী আল-ফাযিল ইবন বাকী ও মক্কার অধিবাসীদের নিকট সুলতান নাসিরের হজ্জ গমণের সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন। সুলতানের সাথে ছিলেন বাগদাদের শায়খুশ শুয়ূখ আবুল কাসিম আবদুর রাহীম। তিনি

খলীফার পক্ষ দূত হিসেবে উপহার নিয়ে এসেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মিশরে সুলতানের খিদমতে থাকা এবং হিজায সফরে তাঁর সংগী হওয়া। সুলতান মিশরে প্রবেশ করলে সৈন্যবাহিনী এসে তার সাথে মিলিত হয়। এ দিকে শায়খুশ শুয়ূখ তথায় অল্পদিনে থেকে হিজাযের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন এবং মসজিদে হারামে পৌঁছে সিয়াম পালন করতে সক্ষম হন।

কারাকুশ আত-তাকওয়া এ বছর পশ্চিমা অঞ্চলে অভিযানে বের হন। ফাস নগরীসহ পার্শ্ববর্তী অনেকগুলো দুর্গ অবরোধ করেন। অল্প দিনের মধ্যে অধিকাংশ দুর্গই স্বীয় দখলে নিয়ে আসেন অবরোধের সময় একটি দুর্গ তিনি এক কৃষ্ণকায় গোলামকে বন্দী করে তাকে হত্যা করার সংকল্প করেন। দুর্গবাসীরা অনুরোধ করে জানমাল আপনি একে হত্যা করবেন না, আমরা এর মুক্তিপথ হিসেবে দশ হাজার দীনার আপনাকে দিচ্ছি। কারাকুশ তাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলে মুক্তিপণের পরিমাণ এক লাখ দীনারে উন্নীত করে। কিন্তু তিনি হত্যা ছাড়া মুক্তিপথে রাজি হলেন না। অবশেষে তাকে হত্যা করা হল। কারাকুশ যখন তাকে হত্যা করলেন তখন দুর্গ অধিপতি নীচে নেমে এলেন। তিনি একজন অতি প্রবীন লোক। তার হাতে রয়েছে দুর্গের চাবির ছড়া। কারাকুশকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, নিন এই চাবির ছড়া। আমি প্রবীন-বৃদ্ধ। যে বালকটিকে আপনি হত্যা করলেন তার জন্যেই আমি এ দুর্গ সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। আমার ভাইয়ের অনেক সন্তান জীবিত আছে। কিন্তু আমি চাইনা তারা আমার পরে এর মালিক হোক। কারাকুশ বৃদ্ধকে সেখানে থাকতে দেন এবং তার থেকে প্রচুর সম্পদ গ্রহণ করেন।

যে সব গুরুত্বপূর্ণ লোক এ বছর মৃত্যুবরণ করেন তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল–

হাফিয আবু তাহির সালাফী

পূর্ণ নাম আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম সালাফী, উচু তরে হাফিযে হাদীস প্রবীণ ও দীর্ঘ বয়সী আবু তাহির আস-সালাফী আল ইস্পাহানী। তার পিতামহ ইবরাহীম সালফীর নামানুসারে তাকে সালাফী বলা হয়। ইবরাহীমের একটি ঠোঁট ছিল কাটা। ফলে তার ঠোট হয়ে যায় তিনটা। ঐ কারণে আজমীরা তাকে সালাফী উপাধি দান করে। ইবনে খাল্লিকাস বলেন, আবূ তাহিরকে সদরুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। বাগদাদে এসে তিনি গম পিশে মিশ্রিত খাদ্য তৈরি করার পেশা অবলম্বন করেন। খতীব আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন আলী আত-তিরীয়যত্রর নিকট ভাষা শিক্ষা করেন। বিভিন্ন দেশ সফর করে প্রচুর হাদীস শ্রবণ করে ৫১০ হিজরীতে আলেকজান্ত্রিয়ার সীমান্তে এসে বসবাস শুরু করেন। মহান খলীফার ওযীর আল-আদিল আবুল হাসান আলী ইবন সালার একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে আবূ তাহিবের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। এখন পর্যন্ত ঐ মাদরাসাটি তাঁর নাম অনুসারে মাদরাসাতুস সালাফী নামে পরিচিত। ইবন খাল্লিকান বলেন, তার লিখিত রচনা সামগ্রী। গ্রন্থ ও টীকা টিপ্পনী সম্বলিত কিতাবের সংখ্যা প্রচুর। তার বয়স নিয়ে মতভেদ আছে। মিশরীয় লেখকগণ বলেন তিনি ৪৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাফিয আব্দুল গণি তার বক্তব্যের বরাত দিয়ে বলেন, আমার স্মরণ আছে নিযামুল মূলক ৪৮৫ হিজরীতে বাগদাদে নিহত হন। তখন আমার বয়স প্রায় দশ বছর। আবুল কাসিম সাফ রাবী আবু তাহিবের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে না পারলেও আনুমানিকভাবে বলতে পারি যে, আমার জন্ম হয়েছে ৪৭৮

হিজরীতে। এ হিসাব মতে মৃত্যুকালে তার বয়স হয় ৯৮ বছর। কেননা, তিনি যখন আলেকজান্দ্রিয়ার সীমানে ইন্তিকাল করেন তখন ছিল ৫৭৬ সালের রবিউস সানী মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবার। প্রকৃত হিসাব আল্লাহই ভাল জানেন। ওয়ালা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। সালিহীন বা সৎকর্মশীলদের একটি জামাআতও সেখানে ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান সাফাবির মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমরা তিনশ লোকের মতামত নিয়েছি তার মধ্যে আবু তায়্যিব তাবারী ব্যতীত একজনও তার বয়স একশ বছর অতিক্রম করেছে বলে জানাননি। ইবন আসাকির তার ইতিহাসে আবূ তাহিরের জীবনলেখা বর্ণনা করেছেন। যদিও তার পঞ্চাশ বছর পূর্বে তার ইনতিকাল হয়। হাদীস সংগ্রহে তার সফর ও বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি সূফী মতার্দশে আকৃষ্ট হন। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া সীমান্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানে তিনি এক স্বচ্চল ভদ্র মহিলাকে বিবাহ করেন ও সুখের সংসার গড়ে তোলেন। ঐ মহিলা তথায় স্বামী সালাফীর জন্যে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইবন 'আসাকির তার গ্রন্থে সালাফীর কিছু কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো-

اتأمن الـمام المنية بغتة * وامن الفتى جهل وقد خبر الدهرا

وليس يحابي الدهر في دورانه * اراذل اهليه ولا السادة الزهرا

وكيف وقد مات النبي وصحبه * وازواجه طرا وفاطمة الزهرا

অর্থাৎ, তুমি কি মৃত্যু-যন্ত্রণা হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করছ যদি তা আকস্মিকভাবে এসে পড়ে? কোনো লোকের এরূপ মনে করাটা হল মূর্খতা সে তো কাল চক্রের গুঢ় রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাল কখনও তার আবর্তনচক্রে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট- কোনো লোককে ছাড় দেয় না। কি করে দিবে, যখন স্বয়ং নবী (সা) তার সাহাবীগণ, সহ-ধর্মিণীগণ ও ফাতিমা জোহরার ইনতিকাল হয়েছে।

তার আরও কয়েকটি কবিতা :

يا قاصدا علم الحديث لدينه * اذ ضل عن طرق الهداية وهمه

ان العلوم كما علمت كثيرة * واجلها فقه الحديث وعلمه

من كان طالبه وفيه تيقظ * فاتم سهم في المعالي سهمه

لولا الحديث واهله لم يستقم * دين النبي وشذ عنا حكمه

واذا استراب بقولنا متحذلق * ماكل فهم في البسيطة فهمه

অর্থাৎ, হে ইলমে হাদীস সংগ্রহের সংকল্পকারী, তোমাকে আশীর্বাদ জানাই। কেননা হিদায়াতের পথ থেকে এর শিক্ষা ও সংগ্রহের চেষ্টা ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। তুমি জান যে, জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা আজ অনেক হয়েছে। কিন্তু হাদীসের জ্ঞান ও শিক্ষা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন। তাই যে ব্যক্তি এর জ্ঞান অন্বেষণে বের হবে ও সচেতন থাকবে সে ব্যক্তিই উচ্চ মর্যাদা লাভে তার ভাগ্যকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। মানব সমাজ থেকে যদি ইলমে হাদীস ও তার

শিক্ষার্থীর সংখ্যা লোপ পায় তা হলে নবীর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং তার বিধান ও আদর্শ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কোন সতর্ক ও বিচক্ষণ লোক যদি আমাদের কথায় সন্দেহ পোষণ করে তা হলে ধরে নিও তার বুঝটাই দুনিয়ার সকল বুঝ নয়।

হিজরী ৫৭৭ সাল

সালাহুদ্দীন কায়রোতে অবস্থান করে হাদীস শ্রবণে রত ছিলেন। এমতাবস্থায় পাঁচশ সাতাত্তর সালের নব বর্ষের সূচনা হয়। সরিয়ায় তার নিযুক্ত প্রতিনিধি ইয্যুদ্দীন ফররুখ শাহ তার নিকট দেশবাসীর উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে পত্র লিখেন। পত্রে বলেন, গত বছর মহামারীতে এখানে যে লোক ক্ষয় হয়েছিল তা পুষিয়ে দেয়ার জন্যে বহু মহিলাদের যমজ সন্তান জন্ম হয়েছে। এ ছাড়া ফসলহানির কারণে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এ বছর আল্লাহর হুকুমে গোটা সরিয়া সবুজ শস্যে ভরে উঠেছে। শাওয়াল মাসে মালিক সালাহুদদীন আলেক জান্দ্রিয়া গমন করেন। এখানে গমন করার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এখানকার প্রাচীর মিনার ও প্রাসাদ মজবুতভাবে নির্মাণ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা দেখা। সেখানে তিনি শায়খ আবু তাহরি ইবন আওফ থেকে মুআত্তা মালিক শ্রবণ করেন যা তারতুগী হতে বর্ণিত। তার সাথে ইমাদুল কাতিবও মুআত্তা শ্রবণ করেন এই শ্রবণের জন্যে কাযী আল ফাযিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সুলতানের নিকট পত্র লিখেন।

হালবের অধিপতি মালিক সালিহ ইবন নুরুদ্দীন শহীদের ইনতিকাল ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ

এ বছর রজব মাসের পঁচিশ তারিখে মালিক সালিহ হালবের আলেপ্লেরি দুর্গে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। তার মুত্যুর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে আমীর আলামুদ্দীন সুলায়মান ইবন হায়দার শিকার করা প্রাণির গোশতের মধ্যে কাঁচা আংগুণের বিষ মিশ্রিত করে খাওয়ায়। আবার কেউ কেউ বলেন, ইয়াকুতুল আসাদী মদের ভিতর বিষয় মিশিয়ে পান করায়। ফলে তিনি কলান্জ রোগে আক্রান্ত হন এবং ধীরে ধীরে দুর্বল হতে হতে এর ফলেই তার মৃত্যু ঘটে। তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন যুবক। মৃত্যুকালে তার বয়স বিশ বছরও পূর্ণ হয়নি। শাসক হিসেবে তাঁর জীবন ছিল পবিত্র। পিতার চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রজাদের উপর কখনও কোনো যুলুম করেননি। অসুস্থকালে চিকিৎসকগণ তাকে মদ পান করতে বলেন। তখন তিনি ফকীহদের নিকট ওষুধ হিসেবে মদ পান করা যাবে কি-না ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন। ফকীহগণ পান করার পক্ষে ফতওয়া দেন। তখন তিনি জানতে চাইলেন। মদ পান করলে আমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। না কি মদ পান না করলে হায়াত কমে যাবে? তারা বললেন, বাড়বেও না কমবেও না। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মদ পান করবো না। আমি ঐ জিনিস পান করে তাঁর সান্নিধ্যে যেতে চাইনা যা তিনি আমার উপর হারাম করেছেন।

মালিক সালাহুদদীন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থেকে যখন নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তার চাচাত ভাই মাওসিলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন মাসউদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্যে আত্মীয়- উমারকে ডেকে আনুগত্যের অংগীকার গ্রহণ করেন। কারণ ইয্যুদ্দীন ছিলেন শক্তিধর ও ক্ষমতাবান

নৃপতি। সালাহুদ্দীনের হস্তক্ষেপ থেকে হালবকে রক্ষা করতে তিনিই ছিলেন যোগ্য। তার অপর চাচাত ভাই সানজার এর শাসক ইমামুদ্দীন যঙ্গীকে এ দায়িত্ব দিতে তিনি আশংকা বোধ করেন। যদিও ইমাদুদ্দীন ছিলেন তার ভগ্নিপতি পিতার পোষ্য। কিন্তু সালাহুদ্দীনের হস্তক্ষেপ থেকে তিনি হালবকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন না। যখন তার মৃত্যু হন তখন হালবের অধিবাসীরা মাওসিল-এর অধিপতি ইয্যুদ্দীন মাসউদ ইবন কুতুবুদ্দীনকে হালবে আমার আহবাস জানায়। শাবান মাসের বিশ তারিখে বিশাল বাহিনী ও জৌলুস সহকারে তিনি হালব শহরে প্রবেশ করেন। এ দিনটি ছিল তাদের নিকট আনন্দ উৎসবের দিন পরে তার নিকট তথার সময়ও অর্থ-সম্পদ ও অস্ত্র শাস্ত্র সোপর্দ করা হয়। এ সময় তাকিয়্যাতুল উমর মাম্বাজ শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে হামা চলে যায়। সেখানে যেয়ে দেখেন হামার অধিবাসীরা মাওসিলের নৃপতির ঝাণ্ডা কামনা করছে। এ দিকে হালবের জনগণ ইয্যুদ্দীন মাসউদকে অধিকার করতে প্রলুব্ধ করে। কারণ সালাহুদ্দীন তখন দাম্ভিকে উপস্থিত ছিলেন না। তারা তাকে আরও জানায় যে, সিরিয়া বাসীরা নূরুদ্দীন আতাবিকীর এই পরিবারকে অত্যন্ত ভালবাসে। ইয্যুদ্দীন তাদের বললেন, আমাদেরও সালাহুদ্দীনের মাঝে অঙ্গিকার ও চুক্তিপত্র বিদ্যমান আছে। আমি চুক্তি ভংগ করে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারি না। এরপর তিনি হালবে কয়েকমাস অবস্থান করেন। এ সময় শাওয়াল মাসে মালিক সালিহ এর মাতাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি সেখান থেকে রাককায় চলে যান। এখানে অবস্থান কালে তদীয় ভ্রাতা ইমামুদ্দীন জঙ্গী তার নিকট দূত পাঠিয়ে হালব থেকে সানজার পর্যন্ত এলাকা তার দখলে দেয়ার আবেদন জানায় ও বারবার চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু ইযযুদ্দীন মাসউদ তাতে রাজি ছিলেন না। অবশেষে অসন্তুষ্ট চিত্তে ভাইয়ের আবদার রক্ষা করেন ও হালব-এর শাসন কর্তৃত্ব তার কাছে ন্যস্ত করেন। বিনিময়ে ইয্যুদ্দীন সানজার, খাবূর, রাক্কা নাসিবীন সুরুজ ইত্যাদি শহর নিজের দখলে নিয়ে নেন।

মালিক সালাহুদ্দীন যখন এসব বিষয় অবগত হলেন তখন তিনি তার সৈন্য সামন্তসহ মিশর থেকে যাত্রা করেন এবং ফুরাত নদী অতিক্রম করে শিবির স্থাপন করেন। এ সময় মাওসিনের অধিপতির জনৈক কর্মকর্তা গোপনে এসে তার সাথে মিলিত হয়। কিন্তু স্বয়ং মাওসিল অধিপতি তার সাক্ষাৎ থেকে দূরে থাকেন। সালাহুদ্দীন অভিযান চালিয়ে জাযীরার সমস্ত শহর দখল করে নেন। এরপর তিনি মাওসিল অবরোধ করার পরিকল্পনা নেন। কিন্তু সে সুযোগ তার হয়নি। তারপরে তিনি হালবে অভিযান চালিয়ে ইমামুদ্দীন জঙ্গী থেকে তা ছিনিয়ে নেন। কারণ, ইমাদুদ্দীনের প্রতিরোধ ছিল দুর্বল এবং ইয্যুদ্দীনের রেখে যাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র ছিল খুবই সামান্য অবশ্য এ ঘটনা সংঘটিত হয় পরের বছর।

এ বছর কারকের সামন্তরাজ বুরনুস হিজাযের তায়মা দখল করার সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে মদিনাতুন্নবী পর্যন্ত দখল বিস্তার করা। এ সংবাদ পেয়ে সালাহুদ্দীন হিজায আক্রমণ থেকে বুরনুসকে বাধা দেয়ার জন্য দামিস্ক থেকে একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী বুরনুসের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। এ বছর সুলতান সালাহুদ্দীন স্বীয় ভ্রাতা সায়ফুল ইসলাম যহীরুদ্দীন তুগতাগীন ইবনে আইয়ূবকে তার প্রতিনিধি হিসেবে ইয়ামনে প্রেরণ করেন সুলতানের অপর ভ্রাতা মুসাআসের মৃত্যুর পর ইয়ামনের দখল নিয়ে অন্যান্য প্রতিনিধির

মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় এবং অধিবাসীদের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করায় তাকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে তুগতাগীর যথা সময়ে যাত্রা করেন এবং ৫৭৮ সালে তথায় পৌছেন। ইয়ামনে তার এ গমন খুবই শুভ হয়েছিল। তিনি যুবায়দ শহরের শাসনকর্তা হাত্তান ইবন মুনকিযের যাবতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করেন। তার সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ লক্ষ দীনার বা তারও বেশি। আর আদান-এর প্রতিনিধি ফখরুদ্দীন উসমান (আস সানজাবীলী-) ইয়ামনে তুগতাবীনের প্রবেশের পূর্বেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন ও সিরিয়ায় বসবাস করেন। ইয়ামন ও মক্কায় তার বহু ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। তারই নাম অনুসারে আল-মাদরাসাতুল যানজাবীলিয়্যা নামকরণ হয়। এ মাদরাসাটি করে তাওসার বাইরে মুতইসের ঘর বরাবর অবস্থিত। ইয়ামন থেকে আসার সময় তিনি প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ নিয়ে আসেন।

ফিরিংগীরা এ বছর চুক্তি ভংগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তারা স্থলপথে নৌপথে মুসলিম কাফেলার উপর চড়াও হয়ে ডাকাতি রাহাজানি চালাতে থাকে। আল্লাহ এক বিরাট তুফান দিয়ে তাদেরকে কাবু করেন। প্রায় আড়াই হাজার বাছাই করা যোদ্ধা এতে আক্রান্ত হয়। জলোচ্ছাস তাদেরকে দিসিয়াত সীমান্তে নিক্ষেপ করে। সুলতান সালাহুদ্দীন তখনও মিশর থেকে বের হননি। ফিরিংগীরা সেখানে মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্য হতে একটি অংশ পানিতে ডুবে মারা যায়। আর প্রায় এক হাজার সাতশজন বন্দী হয়।

এ বছর কারাকুশ আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে অভিযান চালিয়ে বহু শহর জয় করেন। মরক্কোর শাসক ইবন আবদুল মুমিনের বাহিনীর সাথে তার যুদ্ধ হয় এবং তার কর্ম-তৎপরতা সেখানে অনেক বৃদ্ধি পায়। কারাকুশ ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাতিজা উমরের গোলাম। আফ্রিকার অভিযান শেষে কারাকুশ মিশরে প্রত্যাবর্তন করলে সালাহুদ্দীন তাকে কায়রো ও মিশরের বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এ বছর মিশর ত্যাগ করার পূর্বেই তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে এটাই ছিল মিশরে তার সর্বশেষ অবস্থান। এরপর আল্লাহ তার হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিজয় দান করেন। এটাই ছিল তার জীবনের বড় সাধ। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সালাহুদ্দীন মিশর ছেড়ে আসার উদ্দেশ্যে বাইরে অবস্থান করেন তখন তার সন্তানাদি তার চারপাশে জড়ো হয়। তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ করেন ঘ্রাণ নেন ও চুম্বন করেন। এ সময় একজন কবিতার ছন্দে বলেন-

تمتع من شميم عرار نجيد * فما بعد العشية من عرار

অর্থাৎ, নাজদের বিখ্যাত নার্গিস পুষ্পের ঘ্রাণ উপভোগ করুন। কেননা এ রাতের পর এসব নার্গিস আর পাওয়া যাবে না।

বাস্তব অবস্থাও ছিল তাই। এ বছর পর আর তিনি মিশরে প্রত্যাবর্তন করেননি। বরং সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এ বছর সুলতানের দুটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। এ কজনের নাম মুআযযম তুরাশাহ এবং অপরজনের নাম মালিকুল মুহসিন আহমাদ। এ দুইজনের জনমের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র সাত দিন। এদের জন্মের খুশীতে শহরকে সুসজ্জিত করা হয় এবং চৌদ্দ দিন যাবত আনন্দ উৎসব পালিত হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হলেন–

শায়খ কামালুদ্দীন আবুল বারাকাত

আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবুস সাআদাত। উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ আল-আম্বারী আন-নাহবী। আল-ফকীহ আল–আবিদ। আয-যাহিদ। তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কারও নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। এমন কি খলীফা থেকেও কিছু নিতেন না। খলীফার দরবারে যাওয়ার সময় তিনি সূফীদের দলভুক্ত হয়ে যেতেন। খলীফার দেয়া কোন উপহার বা অর্থ গ্রহণ করতেন না। সর্বদা তিনি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ বছর শা'বান মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। ইবনে খালিকান বলেন, তাঁর রচিত আসরারুল আরাবিয়্যা তাবাকাতুন নুহাত ও ব্যকারণ শাস্ত্রে কিতাবুল মীযান অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ।

হিজরী ৫৭৮ সালের আগমন

শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন এ বছর মুহাররম মাসের পাঁচ তারিখে দামিস্কের উদ্দেশ্যে মিশর ত্যাগ করেন। এটাই ছিল তাঁর মিশরে সর্বশেষে অবস্থানকাল। যাত্রাপথে ফিরিংগীদের দেশের আশপাশে বিভিন্ন এলাকায় তিনি হানা দেন। তদীয় ভ্রাতা তাজুল মূলক বুরাই ইবন আইয়ূবকে তিনি দক্ষিণ দিকে পাঠান। সাত দিন পর আযরাক নামক স্থানে পুনরায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। এ দিকে ইযযুদ্দীন ফররুখ শাহ তবরীয়া আক্রমণ করে বহু প্রসিদ্ধ দুর্গ জয় করেন। অনেককে বন্দী করেন ও বিশ হাজার গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু গনীমত হিসেবে লাভ করেন। সুলতানুন নাসির সালালুদ্দীন সফর মাসের সাত তারিখে দামিস্কে প্রবেশ করেন। এরপর রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে তিনি দামিস্ক থেকে বেরিয়ে কাওকার দুর্গের অধীন তবরিয়া ও বায়সান সংলগ্ন এলাকায় ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক লোক নিহত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে ও মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। সালাহুদ্দীন বিজয় বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি হালব ও পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহ দখল করার জন্যে অভিযানে বের হন। মাওসিল ও হালবের অধিবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ফিরিংগীদের নিকট পত্র লেখার সংবাদ পেয়ে তিনি এ অভিযান চালান। তার চাচ্ছিল সালাহুদ্দীন নাসিরকে তাদের দিক থেকে অন্যমনস্ক করে রাখতে। পরে তিনি হালব আক্রমণ করে তিন দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। তারপর নিজেই উপলব্দি করলেন যে, এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়অ অধিক যুক্তি সংগত। তাই তিনি সেখান থেকে অবরোধ তুলে অন্য দিকে যাত্রা করেন এবং ফুরাতে এসে পৌছেন। এ অভিযানে তিনি জাযীরা, রাহা, রাক্কা ও নাসিবীন শহর জয় লাভ করেন। এসব এলাকার শাসকবর্গ তার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এরপর তিনি হালব প্রত্যাবর্তন করেন ও ইমামুদ্দীন জঙ্গীর থেকে হালবের কর্তৃত্ব বুঝে নেন। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশসমূহের উপর তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয় এবং সহসা ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হন।

পরিচ্ছেদ

কারকের রাজা আবরানাস স্থলপথে মুসলমানদের কষ্ট দিতে অপারগ হয়ে হজ্জযাত্রী ও ব্যবসা-কাফেলাকে বাধা দেয়ার জন্যে লোহিত সাগরে এক নৌ-বাহিনী গড়ে তোলে। আয়াব পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথব্যাপী তারা মুসলমানদের নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। মদীনাতুন্নবীর অধিবাসীরা এদের অত্যাচারের আশংকায় ভয় পেয়ে যায়। তখন মালিকুল আদিল অর্থাৎ, সালাহুদ্দীন। উসতুলের শাসক আমীর হুমামুদ্দীন লুলুকে আবরানা- সের বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্যে লোহিত সাগরে তার নৌ-বাহিণী প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। বাদশাহর নির্দেশক্রমে তিনি যথাযথভাবে নৌ-বাহিনী তৈরি করেন। এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি সকল যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করেন। বহু যুদ্ধে তিনি শত্রু বাহিনীর অনেককে হত্যা করেন। অনেককে জ্বালিয়ে দেন। অনেককে ডুবিয়ে মারেন এবং অনেককে বন্দী করে আনেন, অধিকাংশ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও ঝুকিপূর্ণ। আল্লাহর অনুগ্রহে স্থল ও নৌপথ নিরাপদ ও কন্টকমুক্ত হয়। নাসির স্বীয় ভ্রাতা আদিলের সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পত্র লিখেন এবং খলীফাকে অবহিত করার জন্যে তাঁর দরবারে চিঠি পাঠান।

পরিচ্ছেদ

মানসুর ইয়যুদ্দীন এর মৃত্যু

ফররুখ শাহ ইবন শাহানশাহ ইবন আইয়ূব ছিলেন বালাবা কুকুর শাসক ও চাচা নাসিরের পক্ষ থেকে দামিস্কের প্রতিনিধি তিনি আমজাদ বাহরাম শাহর পিতা এবং পিতার মৃত্যুর পর তিনি বেলাবাক্কুর শাসক নিযুক্ত হন। দামিষে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মাদরাসা ফররুখ শাহী তারই নাম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং এর পার্শ্বে রয়েছে তার পুত্রের নাম অনুযায়ী আমজাদিয়অ কবরস্থান। পিতা-পুত্র উভয়ে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ফররুখ শাহ ছিলেন সাহসী বীর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জ্ঞানী। ধীশক্তির অধিকারী দয়ালু ও প্রশংসার অধিকারী। তার উচ্চ মর্যাদা ও বদান্যতার প্রশংসামূলক কবিতা লিখেছেন। শায়খ তাজুদ্দীন আবুল ইয়ামম কিনদীর অতি ঘনিষ্ঠ সংগী ছিলেন তিনি। তাকে তিনি কাযী আল ফাযিলের মজলিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এ জন্যেই তাকে তার দিকে সম্পক করতে দেখা যায়। তিনি তার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। এ ব্যাপারে তারও আসমাদুল কাতিবের যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। তদীয় পুত্র আমজাদশাহ ছিলেন একজন উচ্চস্তরের কবি। পিতার মৃত্যুর পর তদীয় পিতার চাচা সালাহুদ্দীন তাকে বালাবাককুর শাসক নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে থাকেন। তাজুদ্দীন কিনদীর সাহচর্যে থাকা ফররুখশাহর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উত্তম কবিতা লেখায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন যথা:

انا فى اسر السقام * وهو فى هذا المقام
رشا يرشق عينا * فؤادى بسهام
كلما ارشفنى فا * ه على حر الاوام
ذقت منه الشـ * ـهد المصفى فى المدام

অর্থাৎ, আমি রেনাগের কাছে বন্দী। আর তিনি এই স্থানে আসীন। তিনি আমার অন্তর চোখে তীর নিক্ষেপ করেন। তৃঞ্চার উষ্ণতায় যখন তিনি পানি ছিটিয়ে দেন তখন মনে হয় আমি তার থেকে শরাবের মধ্যে খাঁটি মধু পান করছি।

ফররুখ শাহ একদিন হাম্মাম খানায় প্রবেশ করেন। তখন এক লোককে দেখতে পান। তাকে তিনি চিনেন। লোকটি ছিল সম্পদশালী। কিন্তু এখন সে দুরবস্থার সম্মুখীন। এমন কি সত্য প্রকাশ হওয়ার আশংকায় সে এক খণ্ড কাপড় দ্বারা তা আবৃত করার চেষ্টা করছিল। তাকে এ অবস্থায় দেখে ফররুখ শাহর অন্তর বিগলিথ হয়ে যায়। তিনি গোলামকে তাকে এ দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের নির্দেশ দেন এবং লোকটির থাকার স্থানে ভাল বিছানা দিতে বলেন। এ ছাড়া তাকে নগদ এক হাজার দীনার একটি খচ্চর ও মাসিক বিশ হাজার করে দীনার ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। দেখা গেল লোকটি ফকীর হয়ে হামযা খানায় প্রবেশ করে এবং ধনী হয়ে বেরিয়ে যায়। এ বদান্যতার জন্যে আল্লাহ তাকে রহম করুন।

যেসব উল্লেখযোগ্য লোক এ বছর মারা যান তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল:

শায়খ আবুল আব্বাস

আহমাদ ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে রিফাঈ নামে পরিচিত। আহমদিয়া রিফাইয়া তা-ইহিয়অ দলের শায়খ। কাতাইহ এলকায় উম্মে উবায়দা পল্লীতে বসবাস করতেন। বসরা ও ওয়াসিতের মধ্যবর্তী স্থানে এ পল্লীর অবস্থান। তিনি মূলত আরবের লোক এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন বহু লোক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শাফিঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ আনবীহ তিনি মুখস্থ করেন।ল ইবন কাল্লিকাল বলেন, তার ভক্তদের মধ্যে বিস্ময়কর অবস্থা পরিলক্ষিত হত। যেমন, জীবজন্তু সাপ খেয়ে ফেলা। প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করা ও জ্বলন্ত আগুন নিয়ে খেলা করা। বাথিত আছে যে, তারা তাদের এলাকায় কৃঞ্চ অজগর সাপের উপর সওয়াব হত। ইবন খাল্লিকান আরও বলেন, শায়খ আহমদের কোনো সন্তানাদি ছিল না। অবশ্য তার ভাইয়ের পুত্র সন্তান ছিল। তারাই এলাকায় শায়খের আদর্শের উত্তরাধিকারীত্ব গ্রহণ করে। তিনি বলেন নিম্নোক্ত কবিতাগুলো শায়খের রচিত বলে কথিত আছে, যথা–

اذا جن ليلى هام قلبى بذكركم * انوح كما ناح الحمام المطوق

وفوقى سحاب يمطر الهم والاسى * وتحتى بحار بالاسى تتدفق

سلوا ام عمرو كيف بات اسيرها * تفك الاسارى دونه وهو معوثق

فلا هو مقتول ففى القتل راحة * ولا هو ممنون عليه فيطلق

অর্থাৎ, রাতের যখন আগমন ঘটে, তখন তোমাদের স্মরণে আমার চিত্ত অস্থির হয়ে উঠে। আমি সেভাবে ক্রন্দন করতে থাকি যেভাবে খাঁচার মধ্যে বন্দী কবুতর ক্রন্দন করে। আমার মাথার উপরে রয়েছে মেঘ– গুচ্ছ- যা সর্বদা দুঃখ যাতনার বারি বর্ষণ করছে। আর আমার পায়ের নীচে রয়েছে সমুদ্র যা দুঃখ- বেদনাকে আরও উথলিয়ে দিচ্ছে। উম্মে আমরকে জিজ্ঞেস কর,

কিভাবে রাত কাটিয়েছে তার কয়েদী? সে তো একে বাদ দিয়ে অন্যসব কয়েদীকে মুক্ত করে দিচ্ছে আর একে রেখেছে বন্দী করে। একে হত্যা করা হবে না, যদিও হত্যার মধ্যে ছিল শান্তি। আর এর উপর সহানুভূতি দেখিয়ে মুক্ত করাও হবে না।

তার আরও কিছু কবিতা :

اغار عليها من ابيها وامها * ومن كل من يدنو اليها وينظر

واحسد للمراة ايضا بكفها * اذا نظرت مثل الذى انا انظر

অর্থাৎ, আমি তার পিতা ও মাতার পক্ষ থেকে তার উপর হামলা করব এবং ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও যে তার কাছে যাবে ও তাকে দেখবে। আমি ঐ নারীর প্রতিও হিংসা রাখি যে তার প্রতি ঐরূপ নজর দেয়, যেইরূপ নজর আমি দিয়ে থাকি।

ইবন মাল্লিকান বলেন, তিনি এভাবেই তার গোটা জীবন অতিবাহিত করেন। অবশেষে এ বছর জমাদিউল মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন। খালফ ইবন আবদুল মালিক ইবন মাসউদ ইবন বাশকুআল আবুল কাসিম কুরতুবী হাফিয, মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। আবুল ওয়ালীদ ইবন ফরাযির ইতিহাস গ্রন্থের একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন তিনি, তার নাম দিয়েছেন কিতাবুস সিলাহ। কিতাবুল মুসতালছীনা বিল্লাহ নামে তার একটি গ্রন্থ আছে। খতীবের পদ্ধতি অবলম্বনে তা'ঈনু আসমাইল সুবহানা নামে তার আরও একটি গ্রন্থ আছে। মুয়াত্তা গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে তিনি একটি নামের তালিকা বিশিষ্ট কিতাব লিখেন। এই কিতাবে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিহাত্তর জন। এ বছর রমযান মাসে চুরাশি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

"আল্লামা কুতুবুদ্দীন আবুল মা'আলী

মাসউদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবন মাসউদ নিশাপুরী। মুহাম্মাদ ইবন ইয়অইয়অ গাযালীর নিকট তিনি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর দামিস্ক এসে গাযালিয়া ও মুজাহিদিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। হালবের নূরুদ্দীন ও আসাদুদ্দীন মাদরাসায় এবং পরে হামাদানের মাদরাসায় পাঠদান করেন। এরপর তিনি দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করে গাযালিয়া মাদরাসায় পুণরায় অধ্যাপনা করেন। তিনি ছিলেন সে যুগে মাযহাব বিষয়ে শীর্ষ বিশেষজ্ঞ। হিজরী পঁচিশ আটাত্তর সালের রমযান মাস অতিক্রান্ত হলে ঈদের দিন তিহাত্তর বছর বয়সে তিনি দামিস্কে ইনতিকাল করেন। যখন বিন আসাকির তার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সেই সম্মানিত ব্যক্তি যিনি হাফিয ইবন আসা- কিরের জানাযা নামায পড়ান। আল্লাহ সুবাহানাল্লাহু-ই সর্বজ্ঞ।

হিজরী ৫৭৯ সালের আগমন

এ বছর মুহাররম মাসের চৌদ্দ তারিখ সুলতান নাসির সালাহুদ্দীন দীর্ঘ অবরোধের পর আমাদ শহর তার শাসনকর্তা ইবন কায়সাল থেকে সন্ধির মাধ্যমে বুঝে নেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শহরের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পূর্বে তিন দিন পর্যন্ত ইবন কায়সাল প্রাসাদে রক্ষিত সম্পদ ও রুপার বসা সাধ্যমত বের করে নেয। নগরীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর সুলতান তথায় অবশিষ্ট

বহু রৌপ্য ও যুদ্ধাস্ত্র দেখতে পান। এক প্রসাদ তীরের ফলকে পরিপূর্ণ; আর এক প্রাসাদে এক লক্ষ মোমবাতি দিয়ে ভরা। এছাড়া আরও অনেক দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে যার তালিকা অনেক দীর্ঘ। তিনি সেখানে দশ লক্ষ্য চল্লিশ হাজার কিতাবের একটি ভাণ্ডারও পেয়ে যায়। এসব সামগ্রী তিনি কাযী আল-ফাযিলকে দান করেন। তিনি সেখান থেকে সত্তরটি গাধার পিঠে বহন করে মাল-সম্পদ নিয়ে যান। এরপর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সুলতান সেগুলিসহ নগরীর কর্তৃত্ব নুরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন কারা আরসালানকে প্রদান করেন। তিনি ইতিপূর্বে এ নগরীর কর্তৃত্ব তাকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাকে জানানো হল, দানের মধ্যে রৌপ্যকে শামিল করা হয়নি। তিনি বললেন, আমি তার উপরে এ বিষয়ে কোনরূপ কৃপণতা করবনা। এ নগরীর ধন ভাণ্ডারে ত্রিশ লক্ষ্য স্বর্ণমুদ্রা দীনার মওজুদ ছিল। সুলতানের এ আচরণের প্রশংসা করে কবিরা কবিতা লিখেন। তন্মধ্যে একজনের কবিতার কিছু অংশ নিম্নরূপ :

قل للملوك تنحوا عن ممالككم * فقد اتى اخذ الدنيا ومعطيها

অর্থাৎ, তুমি সকল রাজা-বাদশাহকে বল, তারা যেন তাদের রাজ্য ত্যাগ করে চলে যায়, কেননা, সমগ্র দুনিয়া পরিচালনা ও তা বিলিয়ে দেয়ার মত সম্রাটের আগমন ঘটেছে।

এরপর সুলতান নাসির মুহারবাম মাসের অবশিষ্ট দিনে হালবে অভিযান চালাল। তথাকার অধিবাসীরা সুলতানের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে সুলতাননের ভাই-তাজুল মুলুক বুরী ইবনে আইয়ূব মারাত্মকভাবে আহত হন এবং কয়েক দিন পর মারা যান। ইনি ছিলেন আইয়ূবের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র। তখন তার বয়স বিশ বছরও হয়নি। অবশ্য কারও মতে তার বয়স বাইশ বছর হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক। তার একটি উচ্চ মানের কাব্যগ্রন্থ আছে। সুলতান সালাহুদ্দীন তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাকিভূত হন। প্রথমে তাকে হালবে দাখনে কারা হয়। পরে সেখান থেকে উঠিয়ে দামিষেক সমাহিত করা হয। এরপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুলতান নাসিরউদ্দিন ও হালব অধিপতি ইমাদুদ্দীন জংগী ইবনে আকসালকারের মধ্যে একটি বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে নাসির তাকে মুক্ত করে দেন। বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী নাসির ইমামুদ্দীনকে সানজার ছেড়ে দিবসেন আর ইমামুদ্দীন নাসিরকে হালর অর্পণ করবেন। কথা অনুযায়ী ইমামুদ্দীন দুর্গ থেকে বেরিয়ে নাসিরের খিদমতে তার শিবিরের উপস্থিত হন এবং তার নিহত ভ্রাতার জন্যে শোক প্রকাশ করেন। তার সকল মালামাল সানজারে সরিয়ে নেন। সুলতান তাকে সানজার ছাড়াও আরও কয়েকটি এলাকা অতিরিক্ত দান করেন। সেগুলো হল খাবুর। রাক্কা, নাসিবীন ও সুরুজ। তবে এ জন্য তিনি শর্ত দেন যে, ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তার খিদমতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে হবে। ইমামুদ্দীন সানজার চলে গেলেন। সুলতান তাকে বিদায় জানাল। এরপর তিনি শিবিরে অবস্থান করে হালবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। কয়েক দিনের মধ্যে হালবে কোনো বিদ্রোহ কিংবা অরাজকতা দেখতে পাননি। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি সফর মাসের সাতাশ তারিখ সোমবার হালবের দুর্গে প্রবেশ করেন। তার সম্মানে আমীর তাহমান এক বিশাল ভোজ সভার আয়োজন করেন। দুর্গের দ্বারে প্রবেশকালে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন : قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ বল হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর। আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ

তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান (আলে ইমরান : ২৬১)। আর যখন তিনি রাজ প্রসাদে প্রবেশ করেন তখন নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যথা- وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী। করলেন ওদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনও পদার্পণ করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (আহযাব : ২৭)। যখন তিনি ইবরাহীমের অবস্থান স্থলে প্রবেশ করেন তখন সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন ও দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকেন। তারপরে দু'আ করেন ও আল্লাহর নিকট বিনয়ের সাথে আবেদন করেন। এসব কাজ শেষে তিনি ভোজে অংশগ্রহণ করেন। আনন্দ উৎসবের ঢেউ খেলে যায়। আমীর উমারাকে রাজকীয় পোষাক দেন, গণ্যমান্য ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে উপহার ও সাহায্য বিতরণ করেন। যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলল। কবিগণ তার উচ্ছসিত প্রশংসামূলক কবিতা লিখলেন। এই দুর্গ বিজয়ের মাধ্যমে পরবর্তী বিশাল বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতও হয়। সুলতান স্বয়ং বলেন, হালব শহর বিজয়ের দ্বারা আমি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছি। এতবড় আনন্দ আর কোন দুর্গ বিজয়ের দ্বারা হয়নি। হালবের এবং জাযিরার সকল শহরের কর ও শুল্ক তিনি মওকুফ করে দেন। একইভাবে সিরিয়া ও মিশরের শহরগুলোর কর শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন।

সালাহুদ্দীনের অনুপস্থিতির সুযোগে ফিরিংগীরা সমাজে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি সৈন্য বাহিনীকে খবর দিলে তারা তার নিকট এসে সমবেত হয়। সালাহুদ্দীন যখন হালব জয় করেন তখন তিনি সৈন্যদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের সুসংবাদ আগাম জানিয়েছিলেন। এর একটা সূত্র ছিল। তা হল এই যে, ফকীহ মাজদুদ্দীন বিন জাহবল আশা শাফিঈ; আবুল হাকাম আল আরাবীর তাফসীর গ্রন্থে : الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي اَدْنَى الْاَرْضِ

আলিফ লাম মীম, রোমকগণ পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে (রূম- ১-২) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতরে মধ্যে পাঁচশত তিরাশি সাহল বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের সু সংবাদ নিহিত আছে। এর স্বপক্ষে তিনি বিভিন্ন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ফকীহ মাজদুদ্দীন উক্ত তাফসীরের এ উক্তিটি এক পত্রে লিখে সুলতানের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য ফকীহ ঈসা আল-হাকরীর নিকট পাঠিয়ে দেন। এ ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবের সাথে মিল হয় কি না সে আশংকা করে তা প্রকাশ করতে তিনি সাহস পাননি। তবে কাযী ইবন যাকীকে তিনি বিষয়টি জানিয়ে রাখেন। তিনি এর মমার্থ এক কবিতায় লিখে সুলতানের সামনে পেশ করেন। কবিতাটি এই–

وفتحكم حلب الشهباء في صفر * قضى لكم بافتتاح القدس في رجب

সফর মাসে অর্থাৎ, তোমাদের হালব আশশাহবার বিজয় রজব মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়ের ঘোষণা দিচ্ছে।

এ লেখাটি পেয়ে সুলতানের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। পরে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় লাভ করলে তিনি ইবন যাকীকে খুতবা দেয়ার নির্দেশ দেন। সে দিন ছিল শুক্রবার। ইবন সাকী জুম'আর খুতবা দেন। সুলতান পরে জানতে পারেন যে, বিন জাহবালই প্রথমে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের ঐতিহাসিক সাখরা- বা সিলার উপর পাঠদানের

নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়ে তিনি সেখানে বড় আকারের পাঠদান করেন। সুলতান তাকে প্রচুর উপহার উপঢৌকন দান করেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন হালবে তার পুত্র যাহির গাযীকে প্রতিনিধি রেখে রবিউস সানী মাসের শেষ দিকে সেখান থেকে যাত্রা করেন। ইবন যাকীকে হালবের কাযী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি একজনকে তার স্বলাভিষিক্ত করে সুলতানের সাথে চলে আসেন। জমাদিউল আউয়াল মাসের তিন তারিখে তারা পৌঁছান। যে দিন তিনি পৌঁছেন সে দিন মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। কিছু দিন পর ফিরিংগীদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জামাদিউস সানী মাসের গোড়ার দিকে বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে রওনা হয়ে যায়। বায়সান নামক স্থানে পৌছে সেখানে হামলা করেন ও জালুতের কুয়ার নিকট অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনীকে তিনি সম্মুখে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীতে ছিল বীর বারদাবিল ও একদল নূরিয়া সৈন্য। সুলতানের চাচার গোলাম আসাদুদ্দীনও এসে এদের সাথে মিলিত হয়। তারা দেখতে পায় যে, ফিরিংগীরা তাদের নজদের সাথীদের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে। সুতরাং উভয় দলের মধ্যে সেখানে যুদ্ধে বেঁধে যায়। মুসলমানরা ফিরিংগীদের অনেককে হত্যা করে ও একশজনকে বন্দী করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে মাত্র একজন শহীদ হয়। ঐ দিন শেষ বেলায় তারা প্রত্যাবর্তন করে। এ দিকে সুলতানের কাছে সংবাদ আসে যে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে ফিরিংগীরা সমবেত হয়েছে। তিনি দ্রুত তাদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন- যাতে তারা সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ না পায়। উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর লড়াই হয়। ফিরিংগী বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয় এবং সমসংখ্যক আহত হয়। এমতাবস্থায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পিছনের দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সুলতানের বাহিনী তাদের পশ্চাধার করে হত্যা করতে থাকে ও বন্দী হিসেবে আটক করতে থাকে। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে মুসলমানরা ফিরিংগীদের শহরে ঢুকে পড়ে। শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে দুর্বল হয়ে পড়লে তারা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে আসে। এদিকে কাযী আল ফাযিল খলীফার নিকট তাঁর উপরে ও মুসলমানদের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে এক পত্র লিখেন। তার নীতি ছিল, খলীফাকে অবহিত না করে কোন কাজ করতেন না। এমনকি কোনো কাজের সংকল্প করতে না। তিনি এরূপ করতেন খলীফার প্রতি আদব, সম্মান, আনুগত্য ও সমভ্রমকে বিবেচনায় রেখে।

পরিচ্ছেদ

এ বছর রজব মাসে সুলতান কার্‌কে অভিযান চালান। কার্‌ক দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এ অভিযানে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিয়্যুদ্দীন মুরকে সংগে রাখেন। সুলতান স্বীয় ভ্রাতা আদিলকে তার কাছে আসার জন্যে পত্র লিখেন। আদিল হালবের কর্তৃত্ব পাওয়ার আবেদন করার প্রেক্ষিতে তিনি তাকে হালবের শাসক নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংবাদ দেন। পুরো রজব মাস ধরে কার্‌কের অবরোধ চলে। কিন্তু এতে কোনো ফল হল না। ইতিমধ্যে সুলতানের নিকট সংবাদ আসে যে, কারক তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সমস্ত ফিরিংগী একত্রিত হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর সুলতান প্রত্যাবর্তন করেন.। এটা ছিল তার বড় একটা বিচক্ষণতার পরিচয়। ভ্রাতুষ্পুত্র তাবিদ্দীনকে তিনি মিশরের নায়েব করে পাঠান এবং কাযী আল-ফাযিলকে নিজের সাহচর্যে রাখেন।

আপন ভ্রাতাকে হালবের সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন এবং পুত্র যাহিরকে সেখান থেকে নিজের কাছে ডেকে আনেন। যাহিরের নায়েব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও সেখান থেকে ফেরৎ আনেন। ভাইকে হালবে পাঠাবার উদ্দেশ্য হল সে যাতে তার কাছাকাছি থাকে। কেননা, তার সাথে পরামর্শ ব্যতীত সুলতান কোনো ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতেন না। ভাই আদিলের নিকট থেকে তিনি এক লক্ষ দীনার ধার নেন। হালব ছেড়ে আসার বেদনায় যাহির ইবন নাসির খুবই মর্মাহত হন। সেখানে তার অবস্থান ছিল মাত্র ছয় মাস। কিন্তু পিতার কারণে মনের দুঃখ প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশ্য তার চেহারায় ও কথা-বার্তায় অন্তরের অবস্থা ফুঁটে উঠত :

হিজরী পাঁচশত আশি সালের আগমন

ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা করে সুলতান নাসির এ বছর হালব, জাযিরা, মিশর ও সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে তার নিকট আসার জন্যে সংবাদ পাঠান। সুলতানের নির্দেশমত মিশর হতে তাকিউদ্দীন উমার ফাজিলকে সাথে নিয়ে আসেন। হালব থেকে আসেন আদিল। জামিয়া, সানজার ও অন্যান্য দেশের রাজন্যবর্গও যথাসময়ে চলে আসেন। সকল সৈন্যকে সাথে নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। জমাদিউল আউয়াল মাসের চৌদ্দ তারিখে তথায় পৌছে কারক শহর ঘেরাও করেন। প্রাচীরের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করার জন্যে ক্ষেপনাস্ত্র স্থাপন করেন। এর সংখ্যা ছিল নয়টি। অবরোধ কার্য তিনি অব্যাহত রাখেন। সুলতান অন্যান্য স্থানের তুলনায় এ অভিযানকে অধিক গুরুত্ব দেন। কেননা, এটা বিজয় লাভের মধ্যে মুসলমানদের উপকার বেশি ছিল। কারণ, এর অধিবাসীরা এখান থেকে হজ্জযাত্রীদের পথরোধ করেছিল এবং তারা তা-ই করত। এমন সময় তার কাছে সংবাদ এল যে, ফিরিংগীরা কারক অভিযান ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে জড়ো করছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি দ্রুত তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শত্রুরা যে দিকে ছিল সে দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে হিসান এবং পরে মাইরে শিবির স্থাপন করেন। দ্রুত এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কারকের উদ্দেশ্যে গমনকারী ফিরিংগীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। পলায়নকালে তাদেরকে ধাওয়া করার জন্যে সুলতান তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনীর হাতে ফিরিংগীদের অগণিত লোক হতাহত হয়। এ সময় উপকূলীয় শহরগুলো নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকায় সুলতান সেখানে হামলা করার হুকুম দেন। ফলে সৈন্যগণ নাবলুসসহ বিভিন্ন পল্লী ও জনপদে হামলা চালায়। এরপর অভিযান শেষ করে সুলতান প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেনাবাহিনীকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ভ্রাতুস্পুত্র উমর মালিকুল মুখফফারকে মিশরে যাওয়ার আদেশ দেন। আর তিনি নিজে রমযানের রোযা পালন, অশ্ব পরিচর্যা ও তলোয়ার শানিত করার জন্যে দামিস্কে অবস্থান করেন। ঐ সময় সুলতানের নিকট খলীফা কর্তৃক প্রদত্ত রাজকীয় পোশাক হাজির করা হয়। তিনি তা পরিধান করেন। ভ্রাতা আদিল ও চাচাত ভাই নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন শিররূহ-কেও মর্যাদার পোষাক পরিধান করানো হয়। এরপর সুলতানের পক্ষ থেকে সম্মান স্বরূপ বিশেষ পোষাক নাসিরুদ্দীন ইবন কারা আরসালানকে পরিধান করানো হয়। ইনি ছিলেন কায়ফা আমাদ দুর্গের অধিপতি যেটি সুলতার তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এ বছর মরক্কোর অধিপতি ইউসুফ ইবন আবদুল মুমিন ইবন আলী ইনতিকাল করেন এবং তদীয় পুত্র ইয়াকুব রাজ্যের ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এ বছরের শেষ দিকে সালাহুদ্দীনের

নিকট খবর আসে যে, শাসক আরবালে এসে সেখানকার শাসককে তার পক্ষে সাহায্য চেয়ে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করতে বলেছেন। তিনি দ্রুত তার সাথে সাক্ষাৎ করলে প্রথমে বা'লাক্কু ও পরে হামা গমন করেন। ইমামুদ্দীনের আসার প্রতীক্ষায় তিনি কয়েক দিন তথায় অবস্থান করেন। এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যান এবং বা'লাবাক্কুতে অবস্থান করেন। সংবাদ পেয়ে আলী আল-ফাযিল মাতরান নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক প্রেরণ করেন। তিনি তাকে উত্তমরূপে চিকিৎসা করেন।

হিজরী পাঁচশ একাশি সালের আগমন

এ বছর শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সুলতান সালাহুদ্দীন হামায় শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে হালবে গমন করেন। তারপর সফর মাসে মাওসিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং হারবান পৌছেন। সেখানে মুযাফফারুদ্দীনের কাছ থেকে হারবান কব্জা করেন। ইনি হলেন ইরবালের শাসক যায়নুদ্দীনের ভাই। পরে এক সমঝোতার ভিত্তিতে তাকে তার রাজ্য ফেরৎ দেন যাতে তার নিকৃষ্ট গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে। সেখান থেকে তিনি মাওসিলের নদ্‌কে অগ্রসর হন। তখন বিভিন্ন দেশের শাসকবর্গ এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইমাদুদ্দীন আবু বকর কারা আরসালান তার খিদমতে উপস্থিত হন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে সুলতান মাওসলের সন্নিকটে ইসমাঈলিয়াতে শিবির স্থাপন করেন। এখানে ইরবালের শাসক নুরুদ্দীন এসে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করেন। ঐ অঞ্চলের শাসকগণ ছিলেন তার অনুগত। সালাহুদ্দীন মাওসিল অবরোধ করার সংস্কল্পের বিষয় জানাবার জন্যে যিয়াউদ্দীন শাহরযুরীকে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলেন যে, অবরোধ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে খলীফার আনুগত্য নিয়ে আসা ও দীন ইসলামের সাহায্য করা। এরপর বেশ কিছু দিন যাবৎ মাওসিল অবরোধ করে রাখলেম। কিন্তু জয় করতে না পেরে সরে আসেন। পরে তিনি খাল্লাত পৌছে অনেকগুলো শহর দখল করেন। এ ছাড়া জাযীরাও দিয়ারে বকরের অনেকগুলো প্রদেশ নিজ দখলে আনেন। সুলতানের এ সফরে আরও অনেক ঘটনা ঘটে যার বিস্তারিত বর্ণনা ইবনুল আছীর তার তারীখে কামিলে এবং সাহবুর রওযাতায়ন তাঁর গ্রন্থে প্রদান করেছেন। যেসব শাসক ও রাজার সাথে সুলতানের সম্পর্ক হল তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তি হয় যে, ফিরিংগীদের সাথে যুদ্ধের সময় আহবান করলে তারা তার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিবেন। আরও চুক্তি হয় যে, তারা নিজ নিজ দেশে সুলতানের নামে খুতবা দিবেন ও মুদ্রা তৈরি করবেন। চুক্তি অনুযায়ী তারা সবাই ঐ সকল দেশে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন ফলে সব দেশ থেকে সালজুক ও আযিকিয়ার নামে খুতবা দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এসব কাজ সম্পাদনের পর সুলতান হঠাৎ করে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে তিনি কষ্ট যাতনা কোনোভাবে প্রকাশ না করে ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে থাকেন। অবশেষে অসুস্থতা অনেক বেড়ে যায় এবং তার অবস্থার অবনতি ঘটে। তখন তিনি সেখান থেকে হারবান চলে যান- ও তথায় শিবির স্থাপন করেন। সুলতানের অবস্থার খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ে জনগণ তার জীবনের ব্যাসারে আশংকাবোধ করতে থাকে। এ দিকে কাফির ও বিধর্মীরা তার মৃত্যুর গুজব রটিয়ে দেয়। সুলতানের ভ্রাতা আদিল হালব থেকে ডাক্তার ও ওষুধপত্র নিয়ে হাজির হন। তিনি তাকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় দেখে ওসিয়ত করে যাওয়ার জন্যে ইংগিত দেন। তিনি বললেন, আমি যখন আমার পরে আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলীকে রেখে যাচ্ছি তখন

আমার কোনো পরোয়া নেই। এ দ্বারা তিনি তার দুই ভাই আদিল ও তাকিয়্যুদ্দীন উমরকে এবং দুই পুত্র- আযীব উসমান ও আফযাল আলীকে বুঝাতে চেয়েছেন। তাকিয়্যুদ্দীন ছিলেন হামার শাসক ও ঐ সময় মিশরের নায়েব এবং তথায় অবস্থানকারী। ঐ সময় তিনি মানত করেন যে, আল্লাহ তাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

لَئِنْ شَفَاهُ اللّٰهُ مِنْ مَّرَضِهِ هٰذَا بَيَصْرِفَنَّ هِمَّتَهُ كُلَّهَا إِلَى قِتَالِ الْفَرَنْجِ

এরপর আর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার জন্যে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। তার যত অর্থ-সম্পদ আছে সবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন। এ ছাড়া কারক অধিপতি বুরনুসকে নিজ হাতে হত্যা করবেন। কেননা, যে অংগীকার ভংগ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুৎস্যা রটনা করেছে। মিশর থেকে সিরিয়াগামী একটি কাফিলা আটক করে সে তাদের সকল মালামাল ছিনিয়ে নেয় ও হত্যা করে এবং উপহাস করে বলে। কোথায় তোমাদের মুহাম্মাদ? তাকে ডাক, সে তোমাদের সাহায্য করুক। তার এই মানতের পিছনে সম্পূর্ণ প্রেরণা যুগিয়েছিল কাযী আল-ফাযিল। তিনি তাকে এ ব্যাপারে বুঝান ও উৎসাহিত করেন। অবশেষে তিনি আল্লাহর সাথে অংগীকারে আবদ্ধ হন। সত্যিই আল্লাহ তাকে সেই মুহূর্তে ঐ রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন যে রোগে তিনি ভুগছিলেন। এ ছিল যেন তার গুনাহের কাফফারা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুলতানের আরোগ্য লাভের সুখবর ছড়িয়ে পড়ে সুসংবাদ ঘোষণা করা হয় ও শহর সুসজ্জিত রাখা হয়। কাযী আল ফাযিল, যিনি অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে মুযাফফার উমরের নিকট সুলতান নাসিরের আরোগ্য লাভ ও এর সুসংবাদ প্রচারের খবর জানিয়ে পত্র লিখেন। পত্রে তিনি আরও লিখেন যে, অন্ধকার বিদায় নেয়ার পর আলোর প্রকাশ ঘটেছে, আবরণ উম্মুক্ত হওয়ার পর লুক্কায়িত চিহ্নগুলো আবার উদ্ভাসিত হয়েছে, রোগ বিদায় গ্রহণ করেছে। প্রশংসা ও অনুগ্রহের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আগুন নির্বাপিত হয়েছে, ধুলা-ময়লা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে, আগুনের তেজ ঠাণ্ডা হয়েছে। একটিমাত্র মোচড় ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এর ক্ষতিও ত্রুটি আল্লাহর পথেই নিবেদিত। ইসলামকে কলুষমুক্ত করে তার মর্যাদা রক্ষার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। এটি একটি তওবা। আল্লাহ এ দ্বারা আমাদের অন্তরকে পরীক্ষা করেছেন। আমাদের নিকট তিনি সামান্য পরিমাণ ধৈর্যই অবলোকন করেছেন। খাঁটি অন্তর দিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ বিফল করেন না। সে দু'আয় সাড়া দিতে আল্লাহ আদৌ দেরি করেন না। যদিও গুনাহসমূহ সে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মুক্ত প্রতিশ্রুতি তিনি ভংগ করেন না; ফলে মাওসিলের অধিকারী ও অধিকৃতদেরকে নিরাশ করে দেন।

نعى زاد فيه الدهر ميما * فاصبح بعد بؤساه نعيما
وما صدق النذير به لأنى * رايت الشمس تطلع والنجوما

অর্থাৎ, কালের চক্র نعى (মৃত্যু সংবাদ) শব্দের শেষে ميم যোগ করে দিয়েছে। ফলে তার খারাপ অবস্থার পর نعيم বা নিয়ামতে পরিণত হয়ে যায়। তার সম্পর্কে সতর্ককারী সত্য সংবাদ দেয়নি। কেননা, আমি সূর্য ও নক্ষত্রকে উদয় হতে প্রত্যক্ষ করেছি।

ইতিমধ্যে আমাদের অভিভাবক সুলতান মালিক নাসির নতুনভাবে সজীব হয়ে উঠেন। বিগত পরিকল্পনা আরও শানিত হয। জিহাদের উম্মাদনা বৃদ্ধি পায়। বান্দার প্রতিপালকের জন্যে তওবা নির্ধারিত। জান্নাতের বিছানা সম্প্রসারিত। হিসাব-নিকাশ শেষ হয়েছে। পুলসিরাত আমরা অতিক্রম করে এসেছি। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমরা এমন বিভীষিকাময় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম যে, তার ভয়ে যেন সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার পর সুলতান বাহনে আরোহণ করে হালবে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে দামিস্কে পৌছান। এ সময় তিনি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। দামেস্কে প্রবেশের দিনটি জনসাধারণের জন্যে উৎসবের দিনে পরিণত হয়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম

আবদুল্লাহ ইবন আস'আদ আল মাওসিলী

আল-ফকীহ মুহাযযাবুদ্দীন। তিনি ছিলেন হিমসের শিক্ষক। বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ। বিশেষভাবে কাব্য সাহিত্যে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। আমযাদ ও শায়খ শিহাবুদ্দীন আবু শামা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আমীর নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে শিরকূহ

হিম্স ও রাহবার শাসনকর্তা। তিনি সালাহুদ্দীনের চাচাত ভাই ও তার বোন সিত্তুশ শাম বিনত আইয়ূবের স্বামী। হিমসে তিনি ইনতিকাল করেন পরে তার স্ত্রী তাকে সিরিয়ায় বারানিয়া পারিবারিক কবরস্থানে স্থানান্তর করেন। স্ত্রীর কবর ও স্ত্রীর ভাই ইয়ামনের শাসক মুআযযাস তুরান শাহ-এর কবরের মধ্যবর্তী কবরটি তার। মৃত্যু কালে তিনি বহু অর্থ-সম্পদ রেখে যান, যার পরিমাণ প্রায় দশ কোটি দীনারের অধিক। যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ আরাফার দিনে তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান। তার ইনতিকালের পর তদীয় পুত্র আসাদুদ্দীন শিরকূহ সালাহুদ্দীনের নির্দেশক্রমে হিমসের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

আল-মাহমূদী ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন ইসমাঈল

ইবন আবদুর রাহীম আশ শায়খ জামালুদ্দীন আবুছ ছানা মাহমূদী ইবন সাবুনী। বিখ্যাত ইমামদের মধ্যে তিনি অন্যতম। পিতামহ সুলতান মাহমূদ জঙ্গীর সংস্পর্শে থাকার কারণে তাকে মাহমূদী নামে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি তাকে মর্যাদা দান করেন। এরপর তিনি মিশরে এসে বসবাস শুরু করেন। সালাহুদ্দীন তাকে খুবই সম্মান দেখাতেন। তিনি তাকেও তার সন্তানদের জন্যে একটি জমি ওয়াকফ করে দেন যা এখন পর্যন্ত তাদের দখলে রয়েছে।

আমীর সা'দুদ্দীন মাসউদ

ইবন মুইনুদ্দীন। নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীনের আমলে তিনি ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত শাসক। তিনি ছিলেন সিত্তু খাতুনের ভাই। সালাহুদ্দীন যখন সিত্তু খাতুনকে বিবাহ করেন তখন তিনি নিজের বোন সিত্তু রাবিয়া খাতুন বিনত আইয়ূবাকে সা'দুদ্দীন মাসউদের সাথে বিবাহ দেন। কায়সুন অঞ্চলে হাম্বলী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা সাহিবিয়া এই সিত্তু খাতুনেরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং ছয়শ তেতাল্লিশ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন।

আইয়ূবের ঔরসগাত সন্তানদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ বেঁচে ছিলেন। যা'দুদ্দীন মাসউদ মিয়া ফারিকায়ন শহর অবরোধকালে যে জখম হয়েছিলেন তারই প্রতিক্রিয়ায় এ বছর জমাদিউস সানী মাসে দামিস্কে ইনতিকাল করেন।

আস-সিত্তু খাতুন ইসমতুদ্দীন

বিনতে মুঈনুদ্দীন যিনি দামিস্কের নায়েব এবং নূরুদ্দীনের পূর্বে তার অধীনে সেখানকার সেনা বাহিনীতে ছিল আতাবুকী সৈন্য। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিত্তু খাতুন ইসমাতুদ্দীন ছিলেন নূরুদ্দীনের স্ত্রী। তার মৃত্যুর পর সালাহুদ্দীন পাঁচশত বাহাত্তর সালে তাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা ছিলেন অনেক উত্তম গুণের অধিকারী পুত-পবিত্র ও উদার দানশীল ব্যক্তিত্ব। হাজারুস-সাহাব গ্রামে খাতুনিয়াতুল জাওয়ানিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তিনি ওয়াকফ করে দেন। খাতুনের খানকা ও আশ্রম সমূহের অবস্থান ছিল কাবে নাসর এর সম্মুখে যা বানিয়অসের দিকে যাওয়অর পথে প্রথমেই দৃষ্টি গোচর হয়। মৃত্যুর পরে তাকে কুবাবুস সারকাসিয়ার নিকটে কাসিউন অঞ্চলে তার পরিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। কবরস্থানের পাশেই রয়েছে আশরাফিয়া ও আতাবুকিয়া দারুল হাদীস। এগুলো ব্যতীত তার আরও অনেক ওয়াকফকৃত প্রতিষ্ঠান আছে। তার আর একটি প্রতিষ্ঠান খাতুনিয়া বারানিয়া। এটি সিরিয়ার। সালআ নামক স্থানে লেকের পাড়ে অবস্থিত। এ স্থানটি তাললুছ ছাআলিব নামে পরিচিত। সিত্তু যামরাদ খাতুন বিনত জাবিলীর এ এক নতুন সৃষ্টি। ইনি হলেন মালিক দাকমাকের বৈ-পিত্রিয় বোন। নূরুদ্দীন মাহমুদের পিতা হালবের অধিপতি জঙ্গীর স্ত্রী- এ সময়ের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। ইতিপূর্বে তার মৃত্যুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

হাফিযুল কাবীর আবূ মূসা আল-মাদীনী

মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন মুহাম্মাদ ইসপাহানী আল হাফিয্র। আল মুসাবী আল মাদীনী। তিনি ছিলেণ হাফিযুদ দুনিয়া। হাদীস শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থ করণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন ও একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

সুহায়লী আবুল কাসিম

আবু যায়দ আবদুর রহমান বিনুল খতীব আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনুল খাতীব আবূ উমর আহমাদ ইবন আবুল হাসান আসবাগ ইবন হুসায়ন ইবন সা'র ইবন রিযওয়ান ইবন পাত্তুহ- তিনি স্পেনে প্রবেশকারী আল-খাছআমী আস-সুহায়লী। কাযী ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি নিজের নসবনামা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মালিক শহরের নিকটবর্তী সুহায়ল নামক গ্রামের দিকে সম্পর্ক করে তাকে সুহায়লী বলা হয়। এই নামের কারণ হল ঐ গ্রামের পাশে অবস্থিত সুউচ্চ পর্বত শৃংগ ব্যতীত সে দেশের অন্য কোথাও থেকে সুহায়ল সেতারা দেখতে পাওয়অ যায় না। মরক্কোর একটি জনপদের নাম সুহায়ল। সুহায়লী ৫০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলমে কিরআতসহ বহু বিষয়ে লেখা-পড়া করে বিরাট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জন্মগত প্রতিভা, প্রখর ধী-শক্তি ও উন্নত রচনা শৈলীর দ্বারা তিনি সহসাই সে যুগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করেন। এ ছিল তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত। কেননা, তিনি ছিলেন অন্ধ। এ

সত্ত্বেও তিনি অনেক মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আর রাওযুল উনুফ তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ শরীয়াতের উপরে খুবই উত্তম তথ্য ও পরিবেশন করেছেন। এর মধ্যে কোনরূপ কাটছাট বা অতিরঞ্জিত বর্ণনার আশ্রয় নেননি। তার আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম : আল-ই'লাম ফীমা উবহিমা ফিল- কুরআনি মিনাল আসমায়ি ওয়াল আলাম,নাতাইজুল ফিকরি, মাসআলাতুন ফিল-ফারাইদি, মাসআলাতুল ফী সারকনিদ দাজ্জালি আ'ওয়ারাত। এগুলো ছাড়াও আরও বহু উৎকৃষ্ট ও উপকারী প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। ভাল ভাল আকর্ষণীয় অনেক কবিতাও তিনি লিখেছেন। সুহায়লী ছিলেন একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও অর্থ-সম্পদহীন দরিদ্র মানুষ। শেষ বয়সে মরক্কোর শাসনকর্তয়ার থেকে বেশ কিছু সম্পদ লাভ করেন। এ বছর শা'বান মাসের ছাব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি একটি কাসীদা তৈরি করেন। এ কাসীদা পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন ও এর মাধ্যমে দু'আ কবূলের আশা করতেন। কাসীদাটি এই-

يا من يرى ما فى الضمير ويسمع * انت المعد لكل ما يتوقع
يا من يرجى للشدائد كلها * يا من اليه المشتكى والمفزع
يا من خزائن رزقه فى قول كن * امنن فان الخير عندك اجمع
ما لى سوى فقرى اليك وسيلة * فبالا فتقار اليك فقرى ادفع
ما لى سوى قرعى لبابك حيلة * فلئن رددت فاى باب اقرع
ومن الذى ارجو واهتف باسمه * ان كان فضلك عن فقيرك يمنع
حاشا لمجدك ان تقنط عاصيا * الفضل اجزل والمواهب اوسع

অর্থাৎ, হে ঐ সত্তা! যিনি অন্তরের মধ্যে লুকায়িত সব কিছু দেখেন ও সব কথা শ্রবণ করেন। যা কিছু পাওয়ার আশা করা হয় তার জন্যে আবেদন নিবেদনের স্থান আপনিই। হে ঐ সত্তা! যার নিকট সব ধরণের কঠিন অবস্থায় রূহ মতের আশা করা হয়। হে ঐ সত্তা! যার নিকট ভীত সংকীত ও নিবেদনকারীগণ জড়ো হয়। হে ঐ সত্তা! যার রিযিকের ভাণ্ডারসমূহ 'কুন' (হও) শব্দের মধ্যে নিহিত। আপনি আমার প্রতি ইহসান করুন। কেননা, সকল সম্পদ ও অনুগ্রহ আপনার কাছেই আছে। আমার নিঃস্বতা ব্যতীত আপনার নিকট পেশ করার মত আর কোনো ওসীলা বা বাহানা নেই। তাই আপনার নিকট অভাব পেশ করছি। এতেই আমার অভাব দূর হওয়ার দৃঢ় আশা রাখি।

আপনার দরবারে ধরনা দেয়া ছাড়া আমার তো কোন উপায় নেই। যদি আমি এখান থেকে বিতাড়িত হয় তা হলে আর কি কোনো দরবার আছে যেখানে ধরনা দেব? আপনার অনুগ্রহ যদি আপনার এ ফকীর থেকে রুদ্ধ করা হয়, তা হলে আর কে আছে যার নিকট আমি অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করতে পারি ও তার নাম ধরে আহবান করতে পারি? কোনো অপরাধীকে নিরাশ করা থেকে আপনার মর্যাদার রহস্য অদ্ভুত। কেননা, আপনার অনুগ্রহ বিরাট এবং দানও বিশাল।

হিজরী পাঁচশ বিরাশি সালের আগমন

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসের দুই তারিখে সুলতান সালাহুদ্দীন নাসির রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর দামিস্কে প্রবেশ করেন। কাযী আল-ফাযিল তার সাথে সাক্ষাত করেন।

তিনি তার থেকে পরামর্শ চান। তার সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। সুলতান তাঁর পুত্র আফযাল আলীকে দামিস্কের নায়িব পদে নিয়োগ করেন। আবূ বকর আদিল তার কন্যার স্বামী (জামাই) মালিকুয যাহির গাযী ইবন নাসিরের আত্মীয়তা সম্পর্কের জন্যে হালব থেকে চলে আসেন। সুলতান তার ভাই আদিলকে আপন পুত্র ইমামুদ্দীন উছমান আল-মালিকুল আযীযের সহযোগী করে মিশর দেশে প্রেরণ করেন। মালিকুল আদিল তার আতাবুক হয়ে থাকবেন। তাকে অনেকগুলো জায়গীর প্রদান করা হয় মিশরের নায়েবের পদ থেকে তাকিয়ুদ্দীন উমরকে সুলতান অপসারণ করেন।[১] তিনি তখন আফ্রিকা চলে যাওয়ার সংকল্প করেন। সুলতান নাসির তখন তার সাথে মোলায়েম ব্যবহার দেখিয়ে ও বদান্যতা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাছে আসতে বলেন। অব্যাহতভাবে এ প্রক্রিয়া চলাবার পর অবশেষে তিনি তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সুলতান নাসিরের কাছে হাজির হন। তিনি তাকে ইজ্জত ও সম্মান দান করেন এবং হামাসহ অনেকগুলো শহরের জায়গীর প্রদান করেন। এগুলো পূর্বেও তার অধীনে ছিল। অতিরিক্ত হিসাবে তাকে মিয়া ফারিকায়ন শহরও প্রদান করেন। সুলতানের এ আচরণের প্রশংসা করে আহমাদ এক কাসীদা লিখেন। যা রওয়াতায়ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বছর ত্রিপোলীর শাসক কাওমাস সুলতান নাসিরের সাথে সন্ধি করেন ও সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। এমন কি ফিরিংগী বাদশাহদের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড লড়াই করেন এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করে আনেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু সুলতান তাকে বাধা প্রদান করেন।[২] পরে তিনি কুফার অবস্থায় মারা যান। তার সাথে সম্পাদিত এ সন্ধি চুক্তি ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে লড়াই যে বিরাট সাহায্যের ভূমিকা পালন করে এবং তাদের ধর্ম অনুসরণের বড় ধরণের সহায়ক হয়। আমযাদুল কাতির বলেন, জ্যোতিষীগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা দেয় যে, এ বছর শা'বান মাসে গোটা বিশ্বের অবস্থা বিপর্যস্ত হবে। কেননা, সে মাসে ছয় সেতারা মিযান মধ্যে একত্রিত হয়ে যাবে। ফলে সমস্ত দেশে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হবে। তিনি বলেন যে, মূর্খ লোকেরা ভয়ে পাহাড় পর্বতে গুহা তৈরি করে এ ভূমিতে সুড়ঙ্গ করে বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে আশ্রয় তৈরি করে। আমজাদ বলেন, যখন সেই রাতের আগমণ হল। যে রাতের প্রতি তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইংগিত করেছিল তখন বাস্তবে দেখা গেল এমন সুন্দর শান্ত ও নিরিবিলি রাত

---

১. ইবনুল আছীর তার তারিখে লিখেন: তাকিয়্যুদ্দীন উমর সালা-হুদ্দীনের নিকট তার পুত্র আফযাল আলীকে মিশর থেকে বের করার চেষ্টা করেন। সে খারাজ আদায় করতে অযোগ্য বলে অভিযোগ করেন। এতে সালাহুদ্দীন ধারণা করেন যে, তার মৃত্যুর পর তাকিয়্যুদ্দীন মিশরের একচ্ছত্র মালিক হতে চাচ্ছেন। তারিখুল কামিল খ. ১১ পৃ. ৫২৩ তারিখু আবিল ফিদা : ক. ৩. পৃ. ৭৩।

২. সম্রাট চতুর্থ বালদা বিন মৃত্যুর পুর্বে তার বোনের ছেলেকে পরবর্তী সম্রাট বলে ঘোষণা দিয়ে যান। সে ছিল বয়সে ছোট। তাই ত্রিপোলীক শাসক- রায়মন্দ (কাওমাস বা কাম্মাস) তার লালন- পালনের দায়িত্ব নেন। তবে এই বালক পঞ্চম বালদা বিনের সুযোগে এই রাজ্যেল প্রতি তার লোভ জাগে। কিন্তু ঘটনা ক্রমে বালকটি মারা যায়।। নয় বছর বয়সকালে রাজ্যেল দায়িত্ব তার মাতা সাবিলালার হাতে চাল যায়। তিনি কাই নামক এক ফিরিংগীকে বিবাহ করেন। তখন কাওমাস নিরাশ হয়ে পড়েন। সালালুদ্দীন তার সাথে যোগাযোগ করে সখ্যতা সৃষ্টি করেন, তাকে স্বপক্ষে আলেম এবং ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে তার সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি নিজেকে রাজ সিংহাসনের যোগ্য বলে মনে করেন। ইবন জুবায়র বলেন: (পৃ. ৩০৪) নতুন যুগ ফিরে পাওয়ার প্রতি তার লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকে। আবু শামা ইমামুদ্দীন ইসপাহানা থেকে বর্ণনা করেন যে, রায়মন্দ (কাওমাস) ইসলাম গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন ও একান্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন তার ও আগ্রহ সালালুদ্দীনের সহযোগিতা ছাড়া পূর্ণ হবে না। (আর রওযা তায়ন খ. ২. পৃ ২৫৭) আল কামিল ট.১১.পৃ. ৫২৬. ৫২৭: তারীখুল হুরুবুস সালিবিয়া। খ. ২. ৭২৫)

কখনও দেখা যায়নি। বিশ্বের সকল এলাকার লোক এরূপ এক ও অভিন্ন মন্তব্য করেছে। জ্যোতিষীদের এ মিথ্যা প্রচারণার উল্লেখ করে অনেক কবি বহু কবিতা লিখেছেন। তার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল যথা :

مزق التقويم والزيج فقد بان الخطا * انما التقويم والزيج هباء وهوا
قلت للسبعة ابرام ومنع وعطا * ومتى ينزلن فى الميزان يستولى الهوا
ويثور الرمل حتى يمتلى منه الصفا * ويعم الارض رجف وخراب وبلى
ويصير القاع كالقف وكالطود العدا * وحكمتم فابى الحاكم الا ما يشا
ما تى الشرع ولا جاءت بهذا الانبيا * فبقيتم ضحكة يضحك منها العلما
حسبكم خزيا وعارا ما يقول الشعرا * ما اطمعكم فى الحكم الا الامرا
ليت اذ لم يحسنوا فى الدين طغاما اسا * فعلى اصطرلاب بطليموس والزيج العفا

وعليه الخزى ما جادت على الارض السما

অর্থাৎ, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে পঞ্জিকা ও মানমন্দির। কেননা, এর ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং পঞ্জিকা ও মানমন্দির বাতাস ও ধুলাবালিতে পরিণত হয়েছে। আমি সাতজনকে বললাম ফয়সালা করতে বন্ধ রাখতে ও প্রদান করতে। আর তারা যখন মীযানের মধ্যে অবতরণ করবে তখন বাতাসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। বালু-উড়ে সমতলভূমি পূর্ণ হয়ে যাবে, আর পৃথিবীর সর্বত্র কম্পন বিপর্যয় ও ধ্বংস নেমে আসবে। সমতল ভূমি পরিণত হবে কংকরময় ভূমিতে এবং এতে থাকবে উচু উঁচু টিলার ন্যায় বালু রাশি। তোমরা তো এক কথা ঘোষণা করে দিলে। কিন্তু আহ কামুল হাকিমীর আল্লাহ তা হতে দেননি। তিনি যা চান তাই হয়। তোমরা যা বলেছ তা কোন শরীয়াতে নেই এবং কোনো নবীও এমন বার্তা নিয়ে আসেননি। অবশেষে তোমরা হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছ। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা এ শুনে হাসবে বৈ কি? লাঞ্ছনা বঞ্চনা আর কবিদের কটুক্তিই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। এরূপ ফয়সালা দিতে আমীরগণ ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদেরকে প্রলুব্ধ করেনি। হায়! তারা তো দ্বীনের মধ্যে ভাল কাজ করেনি বরং বোকামি করে মন্দ কাজই করেছ অবশেষে বাতলেমুসের আসতারলাব বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন করা যায়। আসমানের নীচে জমিনের উপর সে যা কিছু ভাল অবদান রেখেছে তার উপরে এ ঘটনা কিছু লাঞ্ছনার ছাপ রেখে গেল।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা যান তাদের পরিচয়

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন আবুল ওহাশ

বারী ইবন আবদুল জব্বার ইবন বারী আল মুকাদ্দিসী আল-মিশরী। তিনি ছিলেন সে যুগে ভাষা ও ব্যাকরণবিদ ইমামদের মধ্যে অন্যতম। ইবন বাবশাদের পরে তার নিকটই চিঠিপত্র পত্র পেশ করা হত। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। তিনি তার বক্তব্যের গভীরে যেতে শ্রোতাকে কষ্টের মধ্যে ফেলতেন। যখন লোকজনকে সম্বোধন করে কথা বলতেন তখন ইরাকের দিকে লক্ষ্য রাখতেন না। তার অনেকগুলো মূল্যবান রচনা আছে। তিরাশি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহই সম্যক অবগত।

হিজরী পাঁচশত তিরাশি সালের আগমন

এ বছর হিত্তীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের পটভূমি সূচনা ও লক্ষণ। কাফিরদের হাত থেকে হিত্তীনের দখল মুসলমানদের কব্জায় আসার মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের পথ সুগম হয। বছরের প্রথম দিন ছিল শনিবার। এটি ছিল সৌর বছরের প্রথম দিন। পারস্যবাসীরা এ দিনকে নায়রোজ নামে অভিহিত করত। ঘটনাক্রমে এটা রোমীয় বর্ষেরও প্রথম দিন ছিল। রোমীয় বছরের শুরু বলতে ঐ দিনকে বুঝায় যে দিন সূর্য বুরুজে হামালে অবতরণ করে এবং চন্দ্রও অনুরূপ বুরজে হামালে নেমে আসে। এতগুলো সালের নববর্ষ একই দিনে হওয়া সত্যিই এক অদ্ভুত ব্যাপার। সুলতান নাসির মুহাররামের প্রথম তারিখ শনিবার নিজ সৈন্যবাহিনীসহ দামিষ্ক থেকে যাত্রা করেন এবঙ পানির উৎস পর্যন্ত পৌছেন। তিনি পুত্র আফযালকে একদল সৈন্যসহ সেখানে রেখে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে বসরার দিকে অগ্রসর হন এবং কসরে আবূ সালামে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে তিনি হজ্জ যাত্রীদের আগমণের অপেক্ষা করেন। এই কাফেলায় সুলতানের ভগ্নী সিত্তগা শাম ও তার পুত্র হুসামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন লাশীনও ছিল। হাজ্জীরা যাতে কারক প্রধান বুরনুসের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পায় সে জন্যে তিনি এখানে অবস্থান করেন। হাজীরা নিরাপদে বের হয়ে যাওয়ার পর সুলতান কারকে যেয়ে অবস্থান নেন। কারকের আশা পাশ এলাকার বৃদ্ধাদি কর্তন করেন ক্ষেতের ফসলের মধ্যে পশু চরান এবং ফল-ফলাদি ভক্ষণ করেন। এ সময়ে মিশরীয় সৈন্য বাহিনী এখানে চলে আসে এবং পূর্ব অঞ্চলের সমস্ত সৈন্য এসে হাজির হয। তারা সুলতানের পুত্রের নিকট পানির উৎসের কাছে অবতরণ করে। আফযাল একটি ক্ষুদ্রবাহিনী ফিরিংগীদের শহরের দিকে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে যেয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে। গণীমত লাভ করে ও নিরাপদে অক্ষতভাবে প্রত্যাবর্তন করে। এটা ছিল বড় বিজয় ও সাহায্যের প্রাথমিক সুসংবাদ। তখন সুলতান তার বিশাল বাহিনীসহ উপস্থিত হন। সাথে সাথে অন্য সকল বাহিনী তার কাছে এসে জড়ো হয়। সৈন্যদেরকে সু-বিন্যাস করে তিনি সুমদ্র তীরবর্তী দেশসমূহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। স্বেচ্ছাসেবক দল ব্যতীত তার সাথে মোট যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় বারো হাজার। সুলতানের আগমনের সংবাদ ফিরিংগীরা লোক পরম্পরায় শুনতে পায়। তখন সকল ফিরিংগী একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করে এবং মুকাবিলার জন্যে ঐক্যমত পোষণ করে। তারাবলিস অধিপতি কাওমাস ও কারকের অধিপতি সন্ত্রাসী বুরনুস পরস্পর সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তা তাদের সমস্ত জনবল ও আম্রশস্ত্র নিয়ে মুকাবিলার জন্যে এগিয়ে আসে। তারা সমস্ত ক্রুশধারী। তাগুতের অনুসারী ও দুরাচারী পথভ্রষ্টদেরকেও সংগে নিয়ে আসে তাদের সেট সংখ্যা কত হবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। কেউ বলেন, পঞ্চাশ হাজার। কেউ বলেন, তেষট্টি হাজার। এক পর্যায়ে তারাবালিস অধিপতি মুসলমানদের ব্যাপারে সৈন্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তখন কারকের অধিপতি বুরনুস তাকে বাধা দিয়ে বললেন: আমি সন্দেহ করিনা যে, আপনি মুসলমানদের ভালবাসেন অথচ কেন তাদের সংখ্যাধিক্যের কথা বলে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। আমি যা বলছি পরে এর পরিণতি দেখতে পারেন। এরপর তারা মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হয়। আর সুলতানও সম্মুখে এগিয়ে যান। পথে তবমিয়া দখল করে নেন এবং সেখানকার খাদ্য-সামগ্রী ও সম্পদরাজি ইত্যাদি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করেন। তবে তার

হস্তপেক্ষ থেকে দুর্গ রক্ষা পেয়ে গেছে। কিন্তু এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। সুলতান সেখানকার সমস্ত পানির প্রবাহগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদেরকে এখান থেকে এক ফোঁটা পানি নেয়ার পথও আল্লাহ বন্ধ করে দেন। ফলে তারা ভীষণ তৃষ্ণায় পতিত হয। সুলতান তখন তবরিয়ার অন্তর্গত হিত্তীন নামক গ্রামের নিকটে অবস্থিত পশ্চিম দিকের পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। কথিত আছে এই হিত্তীন গ্রামে নবী শুআয়ব (আ)-এর কবর বিদ্যমান আছে। অভিশপ্ত শত্রু বাহিনীও ইতিমধ্যে তথায় পৌছে গেছে। এ বাহিনীতে ছিল আক্কা ও কাফারনাকার অধিপতি। নাসিরার অধিপতি সূর-এর অধিপতিসহ সমস্ত ফিরিংগী দেশের রাজন্যবর্গ। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয এবং উভয় সৈন্য বাহিনী সম্মুখ সমরে চলে আসে। ঈমানদারদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পক্ষান্তরে কাফির ও অবাধ্যদের চেহারা ধূসর ও কালবর্ণ হয়ে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ক্রশ পুজারীদের দিকে দুর্ভাগের চাকা ঘুরে দাঁড়ান। এটা ছিল জুম'আর দিন সন্ধ্যা বেলার কথা। সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে রাত সম্পন্ন করল। পরদিন শনিবার সকাল হল। এটি ছিল একত্ববাদীদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার দিন। রবিউস সানী মাস শেষ হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। সূর্য উদিত হল ফিরিংগীদের মুখের উপরে রৌদ্রতাপ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে আর ওদের পানির পিপাসাও বাড়তে থাকে। তকিদের অশ্ববাহিনীর পায়ের নীচে ছিল শুস্ক ঘাস- যা পায়ের ঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হযে দাঁড়ায়। সুলতান তার সৈন্য বাহিনীকে শত্রুদের প্রতি অগ্নি উৎপন্নকারী নুফাত তেল নিক্ষেপ করার আদেশ দেন। এ তেল নিক্ষেপের ফলে তাদের অশ্বের খুরের নীচে আগুন জ্বলে উঠে। উভয় পক্ষ সম্মুখ মুকাবিলার জন্যে ময়দানে নেমে পড়ে। সুলতান তার বাহিনীকে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দুর্বার আক্রমণ করার জন্যে নির্দেশ দেন। তারা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেভাবে আক্রমণ শুরু করে। আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের অনুকুলে আসে। তিনি শত্রুদের কাঁধগুলো মুসলমানদের দান করেন। ফলে ঐ দিনই ত্রিশ হাজার শত্রু সৈন্য নিহত হয় এবং ত্রিশ হাজার বীর যোদ্ধা ও অশ্ববাহিনীর সদস্য বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে ফিরিংগীদের সকল রাজা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেবলমাত্র তারাবলিসের সম্রাট কাওমাস বন্দী হওয়া থেকে রেহায় পান। কারণ, আক্রমণের শুরুতেই তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালায়ন করেন। সুলতান শত্রুদের কাছ- থেকে তাদের সর্ব বৃহৎ ক্রুশ-কাঠ ছিনিয়ে নেন। তাদের ধারণা মতে এই ক্রশ কাঠে মিশুকে মুলাবিদ্ধ করা হয়েছিল। তারা একে স্বর্ণ- রৌপ্য মণি-মুক্তা ও মূল্যবান ধাতব দ্বারা আচ্ছাদিত ও সঙ্গিত করে রেখেছিল। এদিন ইসলাম ও মুসলমানদের যেরূপ সম্মান মর্যাদা অর্জিত হয় এবং মিথ্যা ও বাতিলপন্থীদের ধ্বংস নেমে আসে এ রকম আর কোন দিনের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায় না। এমন কি বলা হয়ে থাকে সে। একজন কৃষক জনৈক কৃষককে দেখে যে সে ত্রিশজনেরও অধিক ফিরিংগীকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাবুর রশির সাথে বেঁধে রাখে। পরে সে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে একজন বন্দীকে বিক্রী করে দেয় এবং সে ঐ জুতা পায়ে পরিধান করে। এ যুদ্ধে এমন কতগুলো ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায় যেরূপ ঘটনা সাহাবা ও তাবেঈদের যুগের পরে ঘটেছে বলে শোনা যায় না। আল্লাহই সর্বদা সকল প্রশংসা ও বরকতের অধিকারী।

এ ঘটনা যখন সমাপ্ত হল এবং যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দিল তখন সুলতান একটি বিশাল শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। তিনি সে শিবিরে যেয়ে রাজ সিংহাসনে বসলেন। তার ডানে ও বামে

সভাসদরা বসলেন। তখন বন্দীদেরকে কয়েক অবস্থায় সেখানে আনা হয়। তিনি দাবিয়াদের নেতৃস্থানীয় এক দলের গর্দান উড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। সকল বন্দী তার সম্মুখে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যার সম্পর্কে লোকজন অপরাধ করার অভিযোগ আনে তাকে রেহাই দেয়া হয়নি। এরপর বন্দীদের মধ্যে সেসব রাজা বাদশাহ ছিল তাদেরকে আনা হয় এবং মর্যাদা অনুযায়ী সুলতানের ডান দিকে ও বাম দিকে বসানো হয়। সবচেয়ে বড় বাদশাহকে ডান পাশে বসান। কারকের বাদশাহ আরইয়াত বুরনুস ও অন্যায় রাজা বাদশাহকে বাম পাশে বসান। এ সময় সুলতানের জন্যে মধু মিশ্রিত পোলারের ঠাণ্ডা শরবত আনা হয়। তিনি পান করার পর আর এক বাদশাহকে দেন। তিনিও পান করলেন। এরপর কারকের বাদশাহ আরইয়াতকে দেন এবং তিনি তা পান করেন)– তখন সুলতান ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বললেন, আমি তোমাকে দিয়েছি কিন্তু তা পান করার অনুমতি তো দিইনি আমার দরবারে এরূপ আচরণ করার কোনো সুযোগ নেই। এরপর সুলতান ঐ শিবিরের মধ্যে স্থাপিত একটি তাঁবুতে মনি এবং কারক অধিপতি আরইয়াতকে সেখানে নিতে বলেন। তাকে যখন সুলতানের সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করানো হয় তখন তিনি তরবারি হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হন। তাকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন সুলতান তাকে বললেন, দেখ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর উম্মাতকে সাহায্য করার দায়িত্ব পালন করছি। এ কথা বলে তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার কর্তিত মস্তক শিবিরে অবস্থানরত বাদশাহগণের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি সবাইকে জানালেন যে, এই ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে গালমন্দ করত এরপর সুলতান বন্দীদের মধ্যে দাবিয়া ও ইসবাতারিয়া সম্প্রদায়ের সবাইকে হত্যা করেন এবং এই দুই দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে মুক্তি দেন। সুলতান সেসব বন্দীর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান তাদের মধ্যে থেকে অল্প কয়জন ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে কারণে বলা হয় যে, নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার। বন্দীরাও সংখ্যায় ছিল অনুরূপ ত্রিশ হাজার। আর তাদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল তেষাট্টি হাজার। এসব হত্যার পরেও যারা রক্ষা পেয়ে যায় ও পলায়ন করে তাদের অধিকাংশই ছিল আহত। তারাও দেশে ফিরে যাওয়ার পর মারা যায়। বিপোলহ তারাবানীর অধিপতি কাওমাসের মৃত্যু এভাবেই হয়েছিল। কারণ সে আহত হওয়ার পর পলায়ন করে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মারা যায়। পরে সুলতান ফিরিংগীদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং যে সব নেতাকে হত্যা করা হয়নি তাদেরকে ক্রুশত ধারীদের ক্রুশকাঠ দামিস্কের দুর্গে রাখার জন্যে কাযী ইবন আবূ আসরূনের সাথে পাঠিয়ে দেন। তিনি লাঞ্ছিত অপমানিত ক্রুশ নিয়ে দামিস্কে প্রবেশ করেন্ এ দিনটি ছিল জুমআর দিন।

সুলতান এরপর তবরিয়া অভিযান চালিয়ে তা দখল করে নেন। এই তারিখে হাওরানের শহরসমূহ এবং বালকান ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদ ও তৎসংলগ্ন সমস্ত ভূমি দু'ভাগে বিভক্ত করে। এ বিভক্তি দ্বারা আল্লাহ মুসলমানদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। সুলতান এখান থেকে হিত্তীনে যেয়ে শুআয়েব (আ)-এর কবর যিয়ারত করেন। এরপর তিনি সেখান থেকে জর্ডানের বিভিন্ন প্রদেশে হামলা চালিয়ে তথাকার সমস্ত শহর জয় করেন। এখানে ছিল অসংখ্য ছোট বড় জনপদ। এরপর তিনি আক্কারার দিকে অগ্রসর হন এবং রবিউস সানী মাসের শেষ তারিখ

বুধবারে সেখানে পৌছান শুক্রবারে এক সন্ধির মাধ্যমে তিনি এ শহর জয় করেন। এখানকার খনিজ সম্পদ, বিভিন্ন মালামাল, সঞ্চিত অর্থ-ভাণ্ডার ব্যবসার পূজি ইত্যাদি নিয়ে যান। এতভিন্ন এখানে যত মুসলিম বন্দী ছিল তাদের মুক্ত করে নেন। চার হাজার মুসলমান সেখানে বন্দী ছিল। আল্লাহ তাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেন। সৈন্যদের তিনি এখানে জুমআর সালাত আদায় করার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। ফিরিংগীরা এ এলাকা দখল করার সত্তর বছর পর এই প্রথম জুমআ সমুদ্রতীরে অনুষ্ঠিত হল। এখান থেকে যাত্রা করে তিনি সায়দা বৈরুত ও তীরবর্তী বিভিন্ন শহরে অভিযান চালান। এসব এলাকা যোদ্ধা ও শাসক শূণ্য থাকায় একের পর এক সবগুলো শহর জয় করে নেন। এরপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন অভিযানে বের হন। এ অভিযানে গাজা আসকালান, নাবলুস, বায়সান ও গাওরে হামলা চালিয়ে সবগুলো দেশ অধিকার করে নেন। নাবলুসে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র হুসামুদ্দীন উমর ইবন মুহাম্মাদ ইবন লাশীনকে নায়েব নিযুক্ত করেন। বস্তুত এই হুসামুদ্দীনই নাবলুস জয় করেছিলেন। এ অভিযানে অল্প সময়ের মধ্যে সুলতান যে সব শহর জয় করেন। তার মধ্যে বড় বড় শহরের সংখ্যা পঞ্চাশ। এর প্রত্যেকটি শহরে স্বতন্ত্র সৈন্যবাহিনী দুর্গ ও বেষ্টনী প্রাচীর। সেনাবাহিনী ও মুসলমানগণ এসব অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ গণীমত লাভ করে ও অসংখ্য শত্রুকে বন্দী করে।

এরপর সুলতান সৈন্য বাহিনীকে এক মাস পর্যন্ত এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। যাতে এ সময়ের মধ্যে তারা বিশ্রাম নিতে পারে এবং নিজেদেরকে ও অশ্বসমূহকে বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের জন্যে প্রস্তুত করতে পারে। ইতিমধ্যে লোক সমাজে প্রচার হয়ে গেল যে, সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাস অভিযানের সিদ্ধান্ত করেছেন। আলিম-উলামা ও সত্যপন্থী লোকজন এতে ঐকমত্য পোষণ করে তার নিকট এসে সমবেত হন। তিত্তীনের ঘটনা ও আককা বিজয়ের পরে সুলতান স্বীয় ভ্রাতা আদিলের সংগে মিলিত হন। তিনি নিজে বহু সংখ্যক দুর্গ জয় করেন। ইতিমধ্যে আল্লাহর পথে নিবেদিত বান্দা ও সেনাযোদ্ধাদের এক বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটে। তখন সুলতান তাঁর সমস্ত সাথী-সংগী কুদ্স অভিযানের সংকল্প করেন। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে। হিত্তীনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি সাহিত্যিকগণ সুলতানের ভূয়সী প্রশংসা করে অনেক কবিতা লিখেন। কাযী আল ফাযিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দামিষ্কে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখান থেকে সুলতানকে লিখে জানান যে, জনগণ গভীরভাবে এ কামনা করছে যে, আল্লাহর তার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করবেন। মামলূক এ সময় লিখেন। মানুষের মস্তক সিজদা থেকে উঠেনি। অশ্রু গণ্ডদেশ থেকে মুছে যায়নি। মামলূক যতবারই উল্লেখ করেন যে, গির্জা ও মন্দিরগুলো মসজিদে পরিণত হবে এবং যে স্থানে ত্রিত্ববাদের পূজা করা হত সেখানে একত্ববাদের ঘোষণা করা হবে ততবারই তিনি আল্লাহর শোকর আদায়ে সিক্ত হন। কখনও বা তার মুখ থেকে কখনও বা তার চোখ থেকে আল্লাহর তাওহীদের আনন্দ প্রকাশ হতে থাকে। সত্য ও প্রকাশ্য মালিকের মর্যাদা সমুন্নত হোক। আর বলা হোক যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। আল্লাহ ইউসুফের জেলখানা থেকে মুক্ত করার চেয়ে অধিক উত্তম পুরুস্কার দান করেছিলেন। সকল রাজা-বাদশাহ এ অভিযানের অপেক্ষা করছিলেন। যে ব্যক্তি দামিষ্কের হাম্মাম, ম. খানায় প্রবেশের কামনা করছিল সে ব্যক্তিই তরবয়ির হাম্মামখানায় প্রবেশের জন্যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করছিল।

تلك المكارم لا قعبان من لبن * وذلك السيف لا سيف ابن ذى يزن

অর্থাৎ, ঐ হল উন্নত চরিত্রের নমুনা। এতটুকু দুধের পেয়ালায় তা পরিমাপ করা যায়না। ঐ হচ্ছে আসল তলোয়ার, এটা ইবন যি ইয়াযানের তলোয়ার নয়। এরপর তিনি বলেন, এ বিজয়ের পরে রয়েছে দীর্ঘ আলোচনা ও বহু মূল্যবান কথা।

বায়তুল মুকাদ্দাস জয়

খ্রিস্টানদের দখলে বিরানব্বই বছর থাকার পর পুনরুদ্ধার পূর্বোল্লিখিত দেশ ও শহরসমূহ জয় করার পর সুলতানের নির্দেশে সমস্ত সৈন্যবাহিনী একত্রিত হলে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে যাত্রা করেন। এ বছর অর্থাৎ, পচিশ তিরাশি সালের রজব মাসের পনের তারিখ বায়তুল মোকাদ্দাসের পশ্চিম পার্শ্বে শিবির স্থাপন করেন। সেখানে যেয়ে দেখেন শহরের নিরাপত্তা বেষ্টনী অত্যন্ত মজবুত। বায়তুল মুকাদ্দাসের আশপাশে ষাট হাজার সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন। ঐ সময় কুদসের প্রশাসক ছিলেন বালবান ইত্তন বাযরান।[১] তার সাথে ছিল হিত্তীন যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়া দাবিয়া ও ইসবাতারিয়া সম্প্রদায়ের লোকগণ। স্বভাব চরিত্রের এরা ছিল শয়তানের চেনা। আরও ছিল ক্রুশ-পূজারীরা। উপরোল্লিখিত স্থানে সুলতান পাঁচ দিন অবস্থায় করেন। সৈন্যদের প্রতিটি গ্রুপকে প্রাচীর ও দুর্গের বিভিন্ন কোনে নিযুক্ত করেন আর তিনি নিজে সিরিয়ামুখী কোনে অবস্থান নেন। এ দিকটি ছিল ঘুরতে ফিরতে অবতরণ করতে অধিকতর মজবুত ও প্রশান্ত। ফিরিংগীরা শহর রক্ষার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে। তারা তাদের দীন ও সম্প্রদায়ের সাহায্যার্থে জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দেয়। অবরোধ এলাকালে মুসলমানদের কতিপয় আমীর শাহাদাত বরণ করেন।[২] ফলে মুসলমানদের নেতৃবর্গ ও আদর্শিক লোকদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। তারা তীব্র গতিতে লড়াই করতে থাকেন। নগরীর বিভিন্ন উচুঁ স্থানে মিনজানিক ও নিক্ষেপন যন্ত্র বসানো হয়। তলোয়ার ও বিখ্যাত খাত্তী বর্ষা-বল্লম গর্জে উঠে। মুসলমানদের চক্ষুগুলো দেখতে পাচ্ছিল যে, প্রাচীরের উপর ক্রুশ চিত্র ও কুবরাতুস সাখরার উপরে সবচেয়ে বড় ক্রুশ স্থাপিত আছে। এগুলো দেখে ঈমানদারদের অন্তরে ক্রোধের আগুন আরও বৃদ্ধি পায়। এ ছিল এক কঠিন ভয়াবহ দিন যা কাফিরদের ক্ষেত্রে সহজ ছিল না। সুলতান তার সংগীদের নিয়ে দ্রুত প্রাচীরের উত্তর পূর্ব কোণে চলে যান এবং সে দিকের প্রাচীর গাত্রে আঘাত করতে করতে প্রথমে ছিদ্র করে পরে ভেংগে আগুন ধরিয়ে দেন। ফলে এ দিকের প্রাচীন মাটিতে পড়ে যায় এবং তার খাম্বা জোড়াসহ লুটিয়ে পড়ে। যা অসম্ভব ছিল তা এতক্ষণে বাস্তবে পরিণত হল। ফিরিংগীরা যখন এ ভয়াবহ ও পীড়াদায়ক বিপদ প্রত্যক্ষ করে তখন তাদের নেতৃবৃন্দ সুলতানের নিকট উপস্থিত হয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদের নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি তাদের

---

১. কামিল গ্রন্থে তার নাম বলা হয়েছে বালয়ান ইবন বায়রাগ্রান। তারীখে ইবন খালাদুন ও ইবনুল আবারীতে আছে বাল্যয়ান ইবন খায়রাযান। তারীখুল সলিবিয়ায় আছে- বালিয়ান আবলাইয়ান। বালইয়ান ছিলেন রমযাদন অধিপতি। পরে ফিরিংগীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এর পূর্বে সালাহুদ্দীনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই শর্তে তিনি কুদসে প্রবেশ করেন যে, বাযতুল মুকাদ্দাসে এক রাতের বেশি অবস্থান করবেন না। কিন্তু সেখানে প্রবেশের পর ফিরিংগীরা তাকে বের হতে দেয়নি। বরং তাদের দলের নেতৃত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। পরে তিনি সালাহুদ্দীনের নিকট প্রেরিত এক পত্রের মাধ্যমে তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের কারণ ব্যাখ্যা করে জানান (দ্র. তারীখুল হারুবসু সালীরিয়া। খ. ২. পৃ. ৭৪৮)

২. তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইযযুদ্দীন ঈসা ইবন মালিক। তিনি একজন প্রভাবশালী আমীর। তার পিতা ছিলেন জা'বার দুর্গের অধিপতি।

বললেন, আমরা এটাকে জোরপূর্বক জয় করব। যেমন তোমরা জোরপূর্বক জয় করেছিলে। আমরা এখানে কোন খ্রিষ্টানকে হত্যা না করে ছেড়ে দেব না। যেমন তোমরা এটা দখল করার সময় কোনো মুসলমানকে হত্যা না করে ছাড় দেওনি। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রধান নেতা বালবান ইবন কাযরাস নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেন এবং সুলতানের নিকট উপস্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তিনি তাকে নিরাপত্তা দিলেন। তিনি যখন সুলতানের নিকট হাজির হন তখন অতিশয় বিনয়ের সাথে প্রস্তুতি মিনতি জানান। তিনি তার নিকট সম্ভাব্য সকল বিষয়ের জন্যে সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি ফিরিংগীদের নিরাপত্তা দেয়ার আবেদনে কোন সাড়া দেননি। তখন খ্রিষ্টান নেতারা বলল, আপনি যদি আমাদের নিরাপত্তা না দেন তা হলে আমরা ফিরে যেয়ে আমাদের কাছে যত মুসলমান বন্দী আছে তাদের আমরা হত্যা করে। মুসলিম বন্দীদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার[১]। আমরা আমাদের শিশু-সন্তান বালক-বালিকা ও স্ত্রীদের হত্যা করব, আমাদের সুন্দর বাড়ি ঘর ও বাসস্থান নষ্ট করে দেব, সকল সম্পদ ও আসবাবপত্র জাবইলয়ে দেব, আমাদের কাছে যত মালামাল আছে তা সব ধ্বংস করে ফেলব। কুব্বাতুস সাখরা ভেংগে ফেলব এবং যতদূর সম্ভব হয় তা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব। যা কিছু ধ্বংস করা সম্ভব তার কিছুই অবশিষ্ট রাখব না। এরপর আমরা বের হব ও আমৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করব কেননা এর পর আমাদের বেঁচে থাকার কোন সাধ নেই। আমাদের একজন লোকও ততক্ষণ পর্যন্ত নিহত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত আপনাদের কয়েকজনকে হত্যা না করে। এরপরও আপনি আর কোন কল্যাণ আশা করতে পারেন।

এসব কথাবার্তা শুনে সুলতান সন্ধির প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেন। তবে সন্ধির জন্যে শর্ত আরোপ করলেন যে, প্রতিটি পুরুষের জন্যে দশ দীনার। প্রত্যেক মহিলার জন্য পাঁচ দীনার এবং প্রতিটি ছোট ছেলে মেয়ের জন্যে দুই দীনার করে বিনিময় দিতে হবে। এ বিনিময় দিতে যে অক্ষম হবে সে মুসলমানদের নিকট বন্দী হিসেবে থাকবে আরও শর্ত করা হয় যে, সমস্ত উৎপন্ন ফসল অস্ত্রশস্ত্র ও ঘর-বাড়ি মুসলমানদের অধিকারে আসবে সর্বশেষ শর্ত অনুযায়ী তারা এ স্থান ত্যাগ করে তাদের নিরাপদ স্থান সূর শহরে চলে যাবে। এসব শর্তের উপরে সন্ধিপত্র লেখা হয়। কেউ যদি চল্লিশ দিনের মধ্যে এ শর্ত আদায়ে ব্যর্থ হয় তা হলে তাকে বন্দী করা হবে। এই শর্ত ভংগ হওয়ার দায়ে যাদের বন্দী করা হয়, তাদের সংখ্যা পুরুষ, নারী ও শিশু মিলিয়ে মোট ষোল হাজারে পৌছে। সুলতানও মুসলমানগণ জুমুআর দিন সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার সামান্য পুর্বে নগরীতে প্রবেশ করেন। এ দিনটি ছিল রজব মাসের সাতাশ তারিখ। ইমাদ বলেন, এটি ছিল লায়লাতুন ইসরার তারিখ। এ তারিখে রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। এ দিন মুসলমানদের জুমুআর সালাত আদায় করার সুযোগ হয়নি। তবে কেউ কেউ বলেন এ দিন সেখানে জুমআর সালাত আদায় করা হয়েছে। সুলতান নিজে সাওয়াদে খুতবা প্রদান করেন তবে সঠিক কথা হল ঐ দিন জুমআ আদায় করা সম্ভব হয়ে উঠেনি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে। অবশ্য পরবর্তী জুমআ সেখানে আদায় করা হয়। এই জুমুআয় খতীব ছিলেণ মুহিউদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আল কুরায়শী ইবন যাকী। একটু পরেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১. কামিল ইবন খালদূন ও ইবন আবারির বর্ণনা মতে পাঁচ হাজার।

এ দিন মুসলমানরা মসজিদে আকসা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যস্ত থাকে। কেননা এর ভিতর এতদিন ক্রুশধারী পাদ্রি ও শুকর অবস্থান করত। মসজিদের বড় মিহরাবের পশ্চিম পাশে দাবিয়ারা যেসব কক্ষ ও ঘর তৈরি করেছিল সেসব ভেংগে ফেলা হয়। আল্লাহর অভিশপ্তরা মিহরাবকে শীতকালের আনন্দ স্থান বানিয়েছিল। এসব কদর্যতা থেকে মসজিদকে পরিষ্কার করা হয়। ইসলামী যুগে এর যে অবয়ব ও ভাব মর্যাদা ছিল সে অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। কুব্বাতুস সাখরাকে পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করা হয়। এরপর গোলাপ ও মিশক মিশ্রিত পানি দিয়ে পুনরায় ধৌত করা হয়। দর্শনার্থীদের জন্যে সাখরাকে উন্মুক্ত রাখা হয়। ফিরিংগীরা একে দর্শনার্থীদের থেকে ঢেকে আড়াল করে রেখেছিল। সাখরার কুববা অর্থাৎ, পাথরের উপরের গম্বুজে গম্বুজ স্থাপিত ক্রুশ অপসারণ করা হয়। ফলে গম্বুজ তার সাবেক মর্যাদা লাভ করে। ফিরিংগীরা সাখরার গাত্র থেকে একটি খণ্ড ভেঙ্গে সমুদ্রের নাবিকদের নিকট স্বর্ণের ওজনে বিক্রি করে দেয়। সে খণ্ডটি উদ্ধার করে তথায় লাগিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। ফিরিংগীরা তাদের জীবন রক্ষার বিনিময়ে সেসব সম্পদ দিয়েছিল সুলতান তা গ্রহণ করেন। তিনি তাদের বহু সংখ্যক লোককে বিনিময় ছাড়াই চুক্তি দেন। এদের মধ্যে ছিল সম্রাটদের কন্যাবর্গ। তাদের সাথে যেসব নারী, পুরুষ ও পশু ছিল তাদের মুক্ত করে দেন। তাদের বহু লোকের ক্ষেত্রে উদারতা ও সহানুভবতা প্রদর্শন করা হয়। বহু সংখ্যক লোকের জন্যে তাঁর কাছে সুপারিশ করা হয। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। ফিরিংগীদের নিকট থেকে যত স্বর্ণ পাওয়া গিয়েছিল তার সম্পূর্ণটাই সুলতান সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেন। জমা ও সঞ্চয় করে রাখার জন্যে তিনি সেখান থেকে এক কর্পদকও রাখেননি, বস্তত পক্ষে সুলতান ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল কোমল সাহসী। বীর ও দয়ালু।

বিজয়ের পর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রথম জুম'আ

বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ক্রুশ শঙ্খ ঘন্টা পাদ্রি ও সন্ন্যাসীদের সকল আবর্জনা অপবিত্রতা অপসারণ করার পর ঈমানদার মুসলমানগণ তাতে প্রবেশ করে। সেখানে আযান দেয়া হয় কুরআন তিলাওয়াত করা হয় ও আল্লাহ রাহমানুর রহীমের একত্ববাদের মহিমা বর্ণনা করা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের আট দিন পর শা'বান মাসের চার তারিখে সেখানে প্রথম জুম'আ আদায় করা হয়। মিহরাবের পাশে মিম্বর[১] স্থাপন করা হয়। বিছানা বিছানো হয়। ঝাড়বাতি ঝুলান হয় এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয়। সত্যের আগমত ঘটেছে ও যাবতীয় বাতিল অপসারিত হয়েছে। সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর সামনে সিজদা করা হয়। অসংখ্যবার সিজদায় মস্তক অবনত হয়। বিভিন্ন ধরনের ইবাদত পালিত হয়। আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ সমুন্নত হয়। ধারাবাহিকভাবে বরকত নাযিল হয়। সকল প্রকার বিপদ-আপান ও সমস্যা দূরীভূত হয়। সালাতের আযান ঘোষিত হয়। পাদ্রিদের বাকশক্তি রহিত হয়। সকল প্রকার সংকট বিদূরিত হয়। মানুষের অন্তর আনন্দে দোল খায়। সৌভাগ্য এগিয়ে আসে এবং দুর্ভাগ্য বিতাড়িত হয়। এক ও অভাবমুক্ত আল্লাহর ইবাদত করা হয় যিনি– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

১. এই মিম্বর হালব থেকে আনা হয। নূরুদ্দীন মিস্ত্রী দিয়ে তৈরি করেন। ইবন খান তৈরীর বিশ বছর পরে এটিকে বায়তুল মুজাদ্দাসে বহন করে আনা হয। ড. কায়িস ১১/৫৫নং দু: ৫%

তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই (ইখলাস : ৩-৪)। রুকুকারী ও সিজদাকারী। দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট সবাই আল্লাহর মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে মুখর। মানুষের হৃদয় মন বিগলিত হয়ে প্রবাহিত অশ্রুধারায় বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের চত্ত্বর পরিপূর্ণ হয়ে গড়িয়ে পড়ে। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পুর্বে মুয়াযযিনগণ যখন জুম'আর সালাতের আযান দেয় তখন মানুষের অন্তরে আনন্দের এমন তরংগ উঠে যে, মনে হচ্ছিল এখনই অসম্ভব উড়ে যাবে। তখনও পর্যন্ত কোন খতীব নির্ধারণ করা হয়নি। তাই কুরবাতুস সাখরায় অবস্থানকারী সুলতান সালাহুদ্দীন বেরিয়ে এসে ঘোষণা দেন যে, আজকের জুম'আর খতীব হবেন কাযী মুহিউদ্দীন ইবন কাকী। তখন খুতবা দেয়ার জন্যে তিনি কালো বর্ণের পোষাক পরিধান করেন। উপস্থিত মুসল্লিদের সামনে তিনি উচ্চাংগ ভাষা সাহিত্যে সাবলীল এক মর্মস্পর্শী খুতবা প্রদান করেন। এ খুতবায় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সমান মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন হাদীস বর্ণিত ফযীলত ও পুরুস্কারের বিবরণ তুলে ধরেন। এ মসজিদে ইসলামের যেসব নিদর্শন ও প্রমাণানাদি রয়েছে সে সবের বিবরণও তিনি পেশ করেন। শায়খ আবূ শামা তাঁর রওযাতায়ন গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এ খুতবা উল্লেখ করেছেন। খুতবার প্রথমেই তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যথা–

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

অর্থাৎ, অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মুলাচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক (আন'আম : ৪৫)

এরপর তিনি কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর প্রশংসামূলক সবগুলো আয়াত একে একে পেশ করেন। তারপরে বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُعِزِّ الْاِسْلَامِ بِنَصْرِهٖ۔ وَمُذِلِّ الشِّرْكِ بِقَهْرِهٖ۔ وَمُصَرِّفِ الْاُمُوْرِ بِاَمْرِهٖ۔ وَمُزِيْدِ النِّعَمِ بِشُكْرِهٖ۔ وَمُسْتَدْرِجِ الْكَافِرِيْنَ بِمَكْرِهٖ۔ اَلَّذِىْ قَدَّرَ الْاَيَّامَ دُوَلًا بِعَدْلِهٖ۔ وَجَعَلَ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ بِفَضْلِهٖ۔ وَاَفَاضَ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ طَلِّهٖ وَمُطِّلِهٖ۔ وَاَظْهَرَ دِيْنَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ۔ اَلْقَاهِرِ فَوْقَ عِبَادِهٖ فَلَا يُمَانَعُ۔ وَالظَّاهِرِ عَلٰى خَلِيْقَتِهٖ فَلَا يُنَازَعُ۔ وَالْاٰمِرِ بِمَا يَشَاءُ فَلَا يُرَاجَعُ۔ وَالْحَاكِمِ بِمَا يُرِيْدُ فَلَا يُدَافَعُ۔ اَحْمَدُهٗ عَلٰى اِظْفَارِهٖ وَاِظْهَارِهٖ۔ وَاِعْزَازِهٖ لِاَوْلِيَاءِهٖ وَنَصْرِهٖ اَنْصَارَهٗ۔ وُمُطَهِّرِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ مِنْ اَدْنَاسِ الشِّرْكِ وَاَوْضَارِهٖ۔ حَمْدَ مَنِ اسْتَشْعَرِ الْحَمْدِ بَاطِنَ سِرِّهٖ وَظَاهِرِ اِجْهَارِهٖ۔ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ الْاَحَدُ الصَّمَدُ۔ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔ شَهَادَةَ من طَهُرَ بِالتَّوْحِيْدِ قَلْبُهٗ۔ وَاَرْضٰى بِهٖ رَبَّهٗ۔ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَافِعُ الشُّكْرِ وَدَاحِضُ الشِّرْكِ وَرَافِضُ الْاِفْك۔ اَلَّذِىْ اُسْرِىَ بِهٖ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى۔ وَعَدَّحَ بِهٖ مِنْهُ اِلَى السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى۔ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى خَلِيْفَتِهٖ الصِّدِّيْقِ السَّابِقِ اِلَى الْاِيْمَانِ۔ وعلى امير المؤمنين عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ اَوَّلَ مَنْ رَفَعَ عَنْ هَذَا الْبَيْتِ شِعَارِ الصُّلْبَان۔ وَعَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ذى النُّوْرَيْنَ جَامِعُ

الْقُرْاٰنِ - وَعَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ مُزَعْزِلِ الشِّرْكَ - وَمُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ - وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ۔

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ যিনি নিজ সাহায্য দ্বারা ইসলামকে মহিমান্বিত করেন, শক্তি প্রয়োগ করে শিরককে পদদলিত করেন। যিনি আপন নির্দেশে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। যিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে নিয়ামত বৃদ্ধি করেন এবং অকৃজ্ঞদের কৌশলে পর্যায়ক্রমে পরিণতির দিকে এগিয়ে আলেম। যিনি কালচক্রকে ইনসাফের সাথে পরিবর্তন ও নির্ধারণ করেন আর যিনি সানুগ্রহে মুত্তাকীদেরকে শুভ পরিণতি দান করেন। যিনি তার বান্দাদের প্রতি কখনও হালকা কখনও মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যিনি তাঁর দ্বীনকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেছেন। যিনি তাঁর বান্দাহর উপর শক্তি প্রয়োগ করলে বাধা দেয়ার কেউ নেই। যিনি তাঁর মাখলুকের বা সৃষ্টির উপর বিজয়ী হলে বাক বিতণ্ডা করার কেউ নেই। যিনি নিজের ইচ্ছামত নির্দেশ দেন কিন্তু তা প্রত্যাহার করার মত কেউ নেই। তিনি নিজের ইচ্ছামত যা কিছু ফয়সালা করেন। কিন্তু তা প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। আমি তাঁর প্রশংসা করছি তাঁর বিজয়ের জন্যে তাঁর প্রভাব বিস্তারের জন্যে, তাঁর বন্ধুদের ভালবাসার জন্যে ও তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারীদের সহযোগিতা করার জন্যে। যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে পাক-পবিত্র করেছেন শিরকের ময়লা আবর্জনা থেকে। যথাযথ প্রশংসা সেই করতে পেয়েছে সে প্রশংসা উপলব্দি করতে পেরেছে। তাঁর রহস্য লুক্বায়িত ও প্রকাশ্য উম্মোচিত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তার কোন শরীক নেই। তিনি এক ও অভাবমুক্ত। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি তাঁর সমকক্ষ কেউ-ই নেই। এ সাক্ষ্য কেবল সে-ই দিতে পারে, যে তাওহীদের শিক্ষা দ্বারা নিজের অন্তরকে পবিত্র করতে পেরেছে এবং তা দ্বারা আপন প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। তিনি তাওহীদকে সমুন্নতকারী ও শিরকের উচ্ছেদকারী এবং মিথ্যাকে দূরে নিক্ষেপকারী। যাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে এই মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে সপ্ত আকাশের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। যার সন্নিকটে জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং দৃষ্টি লক্ষ্যচুত হয়নি। আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক তার উপর। আরও বর্ষিত হোক প্রথম ঈমানগ্রহণকারী খলীফা সিদ্দীকের উপর। আমীরুল মু'মীনুল উমর ইবন খাত্তাবের উপর- যিনি সর্বপ্রথম ও ঘর (অর্থাৎ, মসজিদে আকসা) থেকে ক্রুশের নিদর্শন নির্মূল করেছিলেন। সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক আমীরুল মু'মীনীন যুন-নূরায়ণ ও কুরআন সংকলনকারী উসমান ইবন আফফানের উপর এবং আমীরুল মু'মীনীন আলী ইবন আবূ তালিবের উপর যিনি ছিলেন শিরকের আতংক ও মূর্তি উচ্ছেদকারী। সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ সাহাবীগণ এবং সাহাবীদের সঠিক অনুসরণ বর্ণনাকারী তাবিঈদের উপর।

এরপর তিনি ওয়ায উপদেশমূলক বক্তব্য উপহাসপণ করেন। এ দ্বারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলা হয়। কেননা, আল্লাহ তাদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করিয়ে

দিয়েছেন -যে বায়তুল মুকাদ্দাসের এত এত মর্যাদা রয়েছে। এ বলে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের ফযীলত ও মর্যাদা উল্লেখ করেন– তিনি বলেন– إِنَّهُ أَوَّلُ الْقِبْلَتَيْنِ وَثَانِي الْمَسْجِدَيْنِ وَثَالِثُ الْحَرَمَيْنِ এটা দুই কিবলার প্রথম কিবলা, দুই মসজিদের দ্বিতীয় মসজিদ এবং তিন হারমের তৃতীয় হারাম। দুই মসজিদের পরে এ মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হওয়া যায় না। দুই স্থানের পরে এই স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানকে মূল্যবান স্থান হিসেবে গণ্য করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদে হারাম থেকে এ মসজিদের দিকেই রাতে ভ্রমণ করানো হয়। যাকে সিরা বলা হয়ে থাকে। পরে এখান থেকে আকাশসমূহে মি'রাজ নেয়া হয়। তারপর এখানেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখান থেকে মসজিদে হারামে যান। এসব সফর সম্পাদিত হয় বোরাকে চড়ে। এটাই হবে হাশরের ময়দান ও মহামিলনের নির্ধারিত স্থান। এটা নবী রাসূলদের আবাসমহল ও আওলিয়া কিরামের বিচণক্ষেত্র। সূচনা লাগ্নেই এর ভিত্তি স্থাপিত হয় তাকওয়ার উপর।

গ্রন্থকার বলেন, ইবরাহীম খলীল (আ) কর্তৃক মসজিদে হারাম নির্মিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ইয়া'কুব (আ) সর্বপ্রথম ও বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি করেন। বুখারী ও মুসলিমে ও রকম বর্ণনা এসেছে। পরে সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) একে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। ইবনে খুযায়ফা ইবন হিব্বান, হাকিম ও আরও অনেক হাদীসবেত্তার সহীহ। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মসজিদ নির্মাণ শেষে সুলায়মান (আ) আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেন যথা: ১। এমন ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতা যা আল্লাহর ফয়সালার সাথে মিলে যায়। ২। এমন রাজত্ব যে, তারপরে আর কেউ তেমন রাজত্বের অধিকারী হবে না। ৩। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সালাত আদায়ের জন্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন তার গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যায় যেরূপ নবজাত শিশু পাপমুক্ত থাকে।

এরপর তিনি দুই খুতবা সম্পূর্ণ উল্লেখ করেন। তারপর খতীব খলীফা নাসির আব্বাসীর জন্যে দু'আ করেন্ তারপর সুলতান নাসির সালালুদ্দীনের জন্যে দু'আ করেন। সালাত সম্পাদন হওয়ার পর শায়খ যায়নুদ্দীন আবুল হাসান ইবন আলী নাজাল মিশরী সুলতানের অনুমতিক্রমে বক্তৃতা মঞ্চের উপর বসেন ও উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন।

কাযী ইবন যাকী পরপর চার জুমআয় খুতবা প্রদান করেন। এরপর সুলতান মসজিদে কুদসের জন্যে স্থায়ীভাবে খতীব নিয়োগ করেন। তিনি হালবে লোক পাঠিয়ে মসজিদের মিম্বর আনার ব্যবস্থা করেন মালিকুল আদিল নূরুদ্দীন শহীদ বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্যে এ মিম্বর তৈরি করেন। তিনি আশা করতেন যে, তার হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় হবে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারই অনুগত সালাহুদ্দীনের হাতে সে জয় বাস্তবায়িত হয়।

একটি অভিনব সূক্ষ্ম তত্ত্ব

আবূ শামা রাওযাতায়ন গ্রন্থে লেখেন, আমাদের শায়খ আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মাদ আস-সাখাবী তার তাফসীরে আওয়ালে বলেন, আবুল হাকাম আনদানসী অর্থাৎ, ইবন বেরিজানের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সূরা রোমের শুরুতে বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি লিখেন যে, হিজরী পাঁচশত তিরাশি সালে খ্রিষ্টানদের দখল থেকে একে মুক্ত

করা হবে। সাখাবী বলেন, আমি মনে করিনা যে, তিনি হরফের মানের জ্ঞান দ্বারা এটা নির্ণয় করেছেন। বরং তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের ভাষ্য থেকেই গ্রহণ করেছেন আল্লাহর বাণী–

الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ -

অর্থ: আলিফ লাম- মীম। রোমকগণ পরাজিত হযেছে- নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। (রূম : ১- ৩) তিনি বিষয়টিকে সাল তারিখের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন জ্যোতিষীরা করে থাকে হিসাব নির্ণয় করে তিনি বলেন যে, খ্রিষ্টানরা অমুক সালে বিজয়ী হবে এবং অমুক সালে পরাজিত হবে। অনুমান তত্ত্বের হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা বের করা হয়েছে। এ একটি চমৎকার তথ্য যা সঠিক বিধায় বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি এ কথা বলেছেন তখন যখন ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং তাঁর গ্রন্থে তখন থেকে বিদ্যমান যখন এর আত্মপ্রকাশ হযনি। সাখাবী বলেন, এটা হরফ বিদ্যার পর্যায়ে পড়ে না এবং কাশফ কারামতের বিষয়ও নয়। গণীমতের হিসাবেও এটা পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, আবুল হাকাম সূরা ক্বদরের তাফসীরে লিখেছেন যে, কুরআন ঠিক কোন মুহূর্তে নাযিল হয়েছে। তা যদি জানা যেত তা হলে কোনো সময় উঠে যাবে সে কথা অবশ্যই বলা যেত।

গ্রন্থকার বলেন, ইবন বারজান তাঁর তাফসীরে এ তথ্যটি পাঁচশত বাইশ সফর মাসের মধ্যে লিখেছেন। আর বলা হয়ে থাকে যে, মালিক নুরুদ্দীন এ বিষয়ে অধিক অবহিত ছিলেন। এ কারণেই তিনি পাঁচশ তিরাশি সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কেননা তার জন্ম হয় পাঁচশ এগার সালে। তাই- ঐ বিজয়ের জন্যে তিনি বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমনকি বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর সেখানে স্থাপনের জন্যে তিনি বিশাল এক মিম্বরও তৈরি করেন। আল্লাহই এ বিষয়ে সম্যক অবগত।

পবিত্র সাখরার আশপাশ থেকে সকল প্রকার খারাপ বসন্ত শঙ্খ ঘন্টা। ক্রুশ ইত্যাদি আবর্জনা সুলতানের নির্দেশে অপসারণ করা হয়। পচা-দুর্গন্ধময় মৃতদেহ পরিণত হওয়ার পর তাকে পাক পবিত্র করা হয়। দীর্ঘদিন ঢাকা, লুক্কায়িত ও দৃষ্টির আড়ালে থাকার তা পুনরায় উন্মোচন করা হয়। সুলতান নাসির ফকীহ ঈসা হাকারীতে সাখরার চারপাশে লোহার জানালা দ্বারা ঘিরে দেয়ার নির্দেশ দেন। সাখরার জন্যে একজন নিয়মিত বেতনভুক্ত ইমাম নিয়োগ করেন ও তার উন্নত খাবারের ব্যবস্থা করেন। মসজিদে আকসার ইমামের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা করেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের শিক্ষা লাভের জন্যে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদরাসাকে মাদরাসায়ে সালাহিয়া বলা হয় এবং মাদরাসায় নাসিরিয়াও বলা হয়। মাদরাসার স্থানে ছিল একটি মন্দির যাকে বিবি মারইয়ামের মাতা হান্নার কবরের উপর তৈরি করা হয়েছিল। কুমামার পাশে বিতরিকের জন্যে যে গৃহ ছিল তা তিনি সূফীদের জন্যে ওয়াকক করে দেন। ফকীহ ও ফকীরদের জন্যে মাসিক ভাতা চালু করেন। মসজিদে আকসা ও সাখরার অদূরে বিশ্রামাগার ও পান্থশালা নির্মাণ করেন। যাতে অবস্থানকারী মুসাফির ও দর্শনার্থীরা এখানে থেকে পড়তে পারে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য স্থানের প্রতিটি লোককে দান দাক্ষিণ্য করার ক্ষেত্রে। বনু আইয়ূবের লোকেরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সুলতান খ্রিষ্টানদের প্রাচীন ধর্মীয় নিদর্শন কুমাসা ধ্বংস করে

সমতল করে ফেলার দৃঢ় সংকল্প করেন্ যাতে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে খিষ্টানদের জিনিস চিরতরে উৎপাটিত হয়ে যায়। তখন তাকে বুঝান হয় যে, এই তীর্থ ভূমিতে তাদের গমনাগমন কখনও তারা বন্ধ করবেনা যদিও পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। আপনার পূর্বে আমীরুল মু'মীনীন উমর ইবন খাত্তাব ও অঞ্চল জয় করেরছিলেন। কিন্তু তিনি এ মন্দির তাদেরই দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঐ ঘটনা আপনার সিদ্ধান্তের জন্যে আদর্শ হতে পারে। তখন তিনি বিরত হলেন এবং উমরের (রা)-এর অনুকরণে তা ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেন। এর মধ্যে মাত্র চার জন খ্রিষ্টানকে থাকার অনুমতি দেয়া হয় যারা এর সেবাযত্ন করবে। এভাবে তিনি খ্রিষ্টানদের ও মন্দিরের মাঝে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। বাবে রহমতের কাছে তাদের যেমন কবর ছিল সেগুলো তিনি ধ্বংস করে দেন এবং তার নিশানা চিহ্ন পর্যন্ত বিলীন করে দেন। এ ছাড়া কুদ্স এলাকার মধ্যে যত গম্বুজ ছিল তার সবগুলোই তিনি বিধ্বস্ত করে ফেলেন।

কুদ্স এলাকায় মুসলমানদের যত বন্দী ছিল সুলতান তাদের সবাইকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেন। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন্ অনেক মূল্যবান ও লোভনীয় জিনিসপত্র তাদের প্রদান করেন তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন ও পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। তখন তারা সবাই নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তারা তাদের বাসস্থান ও পরিবার পরিজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুকম্পার জন্যে সকল প্রশংসা তাঁরই।

পরিচ্ছেদ

বায়তুল মুকাদ্দাসের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করার পর সুলতান সালাহুদ্দীন শা'বান মাসের পঁচিশ তারিখ উপকূলবর্তী সূর শহর অবরোধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অবশ্য এ শহর জয় করতে বিলম্ব হয়। হিত্তীন যুদ্ধের পরে মারকিস নামক এক ফিরিংগী ব্যবসায়ী শহরটি দখল করে নেয়। সুলতান শহরের নিয়ম-শৃংখলা সুবিন্যাস্ত করেন। নিরাপত্তা প্রাচীর মজবুত করেন ও শহরের বহিপার্শ্ব দিয়ে গভীর খন্দক খুঁড়ে দুই প্রান্তকে সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করে দেন। সুলতান এসে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখেন। শেষে মিশর থেকে নৌপথে যুদ্ধ জাহাজ তলব করেন এবং জল ও স্থল উভয় দিক থেকে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু এক রাত্রে ফিরিংগীরা আকস্মিক হামলা চালিয়ে মুসলমানদের পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ কব্জা করে নেয়। এ ঘটনার মুসলমানরা ক্ষোভে দুঃখে একেবারে নির্বাক হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নেমে আসে। সৈন্যদের খাবার রসদ ফুরিয়ে যায়। হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘ অবরোধের কারণে সেনাপতিরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা সুলতানের নিকট এই মুহূর্তে দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করে বিশ্রাম নিয়ে শীতের পর পুনরায় এখানে আসার প্রস্তাব দেয়। সুলতানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং সবাইকে সাথে নিয়ে দামিস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দামিস্কে যাওয়ার পথে আককা অঞ্চল অতিক্রম করতে হয়। এ পর্যন্ত পৌছলে সৈন্যরা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আক্কায় পৌছে সেখানকার দুর্গে অবতরণ করেন এবং পুত্র আফযালকে বুরজে দাবিয়ায় থাকতে বলেন। ইয্যুদ্দীন হারদাবিলকে শহরের নায়িব নিযুক্ত করেন। দলের কোনো কোনো লোক আক্কা শহর বিধ্বস্ত করার পরামর্শ দেয়। তারা এ আশংকা করছিল যে, ফিরিংগীরা হয়তো এখানে চড়াও হতে পারে। কিন্তু তিনিও তার নিযুক্ত শাসকও কাজ করেননি।

বরং এর সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করণের জন্যে বাহাউদ্দীন কারাকুশ আত-তাক্ওয়াকে দায়িত্ব প্রদান করেন্ দারুল ইসতিবারিয়াকে দু লাইনে শাজিয়ে ফুকাহা ও ফুকারাদের জন্যে ওয়াক্ফ করে দেন গির্জা ও মন্দিরকে সরাইখানা বানান। এসবগুলোকে ওয়াকফ হিসেবে গণ্য করে অবতরণ ও অবস্থান স্থলরূপে ছেড়ে দেন। এসব ওয়াকফ সম্পত্তি দেখা-শুনা করার জন্যে আক্কার বাহিনী জামালুদ্দীন বিন শায়খ আবূ নাজীবের উপর দায়িত্ব দেন।

এসব কাজ থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি বিজয়ী বেশে দামিস্কে চলে আসেন। সকল অঞ্চলের শাসক ও রাজা বাদশাহগণ সুলতানের নিকট মুবারকবাদ জানিয়ে উপহার উপঢৌকন প্রেরণ করেন। এ সময় খলীফা কয়েকটি বিষয়ে সুলতানকে তিরস্কার করে এক পত্র প্রেরণ করেন তিরস্কারের মধ্যে ছিল। ১। হিত্তীন বিজয়ের সুসংবাদ বাগদাদের নিম্ন শ্রেণির এক যুবকের মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ, যার কোনো মর্যাদা ও মুল্যায়ন সে সমাজে ছিল না; ২। আল কুদস বিজয়ের সংবাদ নিজাবের সাথে প্রেরণ : ৩। নিজেকে নাসির খিতাবে ভূষিত করা- যা খলীফার খিতাবের সাথে সদৃশ হয়ে যায়। সুলতান এসব তিরস্কারকে হাসিমুখে স্নেহ মনে করে ও আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করেন যা ঘটে গেছে সে ব্যাপারে নিজের দুর্বলতা ও ওজর পেশ করে খলীফার নিকট পত্র দেন। পত্রে তিনি লিখেন এ যুদ্ধের পেরেশানী আমাকে এরূপ অনেক বিজয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত রাখে। আর নাসিব উপাধি গ্রহণ করা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, খলীফা মুসাতম্বির আমল থেকে আমার এ উপাধি চলে আসছে। এ সত্ত্বেও আমীরুল মু'মীনীন আমাকে যখন যে উপাধি দিবেন, আমি তা ত্যাগ করব না। এভাবে তিনি খলীফার মুখাপেক্ষীহীন থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাথে অত্যন্ত আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করে চলেন।

এ বছর ভারতবর্ষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গজনীর সম্রাট শিহাবুদ্দীন ঘুরী ও হিন্দুস্তানের এক শক্তিশালী রাজার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের জন্যে হিন্দুদের এক বিরাট সৈন্য বাহিনী তৈরি হয়। তাদের সাথে ছিল চৌদ্দটি হস্তী। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ কাধে এবং তুমুল যুদ্ধ হয়। হিন্দুদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসলিম বাহিনীর ডান ও বাম ব্যুহ ভেংগে পড়ে। তখন ঘনিষ্ঠ লোকদের পক্ষ থেকে সম্রাটকে বলা হয়। আপনি এখন নিজেকে রক্ষা করুন। কিন্তু এ কথা শুনে তিনি আরও সম্মুখে ধাবিত হন দ্রুত হস্তী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে একটা হস্তীকে জখম করে দেন। আর হস্তী জখম হলে তা সহজে ভাল হয় না। এ সময় হস্তীর উপর থেকে একজন তাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ে মারে। বর্শা তার বাহুতে লেগে বাহু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আহত সম্রাটকে ধরে নেয়ার জন্যে হিন্দুরা দৌড়ে আসে। কিন্তু তার সংগীরা তার উপরে হামলা প্রতিহত করার জন্যে প্রাণপনে চেষ্টা করে। তখন তার পাশেই দু-পক্ষের মধ্যে পুনরায় তুমুল লড়াই হয। এতবড় তীব্র লড়াইয়ের কথা সাধারণত শোনা যায় না। অবশেষে মুসলমানরা হিন্দুদের পরাস্ত করে সম্রাটকে ছাড়িয়ে আনে। এরপর তারা তাকে এক পাল্কীতে করে কাঁধে বহন করে বিশ ফারসাখ পথ অতিক্রম করে আসের তখনও তার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। সৈন্যরা তার নিকট সমবেত হলে তিনি আমীরদের দারুণ ভর্ৎসনা করেন ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার জন্যে প্রত্যেক আমীরের নিকট থেকে তিনি শপথ নেন ও গজনী পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে তিনি বাধ্য করেন।

এ বছর বাগদাদের উপকণ্ঠে এক মহিলার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় যার মুখভরা দাঁত ছিল। এ বছর খলীফা নাসির (বিল্লাহ)– দারুল খলীফার উস্তাদ আবুল যগল ইবন সাহিবকে হত্যা করেন। তিনি কতগুলো বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সে সব বিষয়ে তিনি খলীফার কোন কথা মানতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন পবিত্র, নি লোভ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। খলীফা তার থেকে প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ জোর করে নিয়ে নেন। এ বছর আবুল মুযাফফার জালালুদ্দীনকে খলীফা তার উযীর। নিয়োগ করেন তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পায়ে হেঁটে। যান। এদের মধ্যে প্রধান বিচারপতি ইবন দামগানীও ছিলেন। ইবন ইউনুস কাযীর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই দলের সাথে হেটে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, দীর্ঘ জীবনের উপর আল্লাহর অভিশাপ। অতঃপর এ বছরের শেষ দিকে কাযী ইনতিকাল করেন।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এ বছর ইনতিকাল করেন তাঁরা হলেন

শায়খ আবদুল মুগীছ ইবন যুহাযর আল–হারবী

তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন। লোকজন সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট যাতায়াত করত। ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়ার ফযীলত মাহাত্য বর্ণনা করে তিনি একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এ গ্রন্থে তিনি তার সম্পর্কে বহু আশ্চর্য অভিনব অজানা ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে আবুল ফারাজ ইবন জাওযী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও তথ্য নির্ভর বক্তব্য দ্বারা এর প্রতিবাদ করেছেন। একবার এই শায়খ আবদুল মুগীদের সাথে খলীফার শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার দরবারে যান। গ্রন্থকারের ধারণা মতে তিনি ছিলেন খলীফা নাসির বিল্লাহ। শায়খ আবদুল মুগীছ খলীফাকে দেখে চিনে ফেলেন। কিন্তু তিনি যে, চিনেছেন খলীফাকে জানাননি। খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াযীদকে অভিশাপ দেয়া যাবে কি যাবে না? শায়খ জবাবে বললেন, আমি একে বৈধ ও ভাল কাজ মনে করিনা। কেননা যদি আমি এর দ্বার উন্মোচন করে দিই, তা হলে লোকজন ঐ পর্যন্ত ক্ষান্তি থাকবে না। আমাদের খলীফাকেও অভিশাপ পা দিবে। তিনি বললেন, খলীফাকে তারা অভিশাপ দেবে কেন? শায়খ বললেন, অভিমাপ এই জন্যে দিবে যে, তিনি বহু অন্যায় ও গর্হিত কাজ করেন, যেমন এই এই কাজ তিনি করেছেন। এ কথা বলে তিনি খলীফার সামনে তার অন্যায় কাজগুলো একে একে গণনা করতে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে খলীফার থেকে যেসব গর্হিত আচরণ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোও তিনি উল্লেখ করেন শায়খের এগুলো বলার উদ্দেশ্য হল, যাতে এসব দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি দূরে থাকেন এরপর খলীফা আলোচনা বন্ধ করে সেখান থেকে চলে আসেন। শায়খের কথাগুলো খলীফার অন্তরে বিরাট প্রভাব ফেলে এবং তিনি এ দ্বারা উপকৃত হন। এ বছর মুহাররম মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

"আলী ইবন খিতাব ইবন খালফ

এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের আবিদ। তাপস ও সাধক এবং কারামতের অধিকারী। জাযীরায়ে ইবন উমরে তিনি বসবাস করতেন। ইবন আছীর তাঁর কামিল গ্রন্থে বলেন, তার ন্যায় উত্তম চরিত্র। সু-অভ্যাস, কারামত ও ইবাদতের অধিকারী অন্য কাউকে আমি দেখিনি।

আমীর শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মুকাদ্দাস

তিনি ছিলেন সালাহুদ্দীনের একজন নায়িব বা ডিপুটি। সুলতান নাসির যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন তখন হজ্জের মওসুম একদল লোক সেখান থেকে মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে হজ্জের ইহরাম বাঁধে। ঐ বছর হজ্জ কাফেলার আমীর ছিলেন ইবন মুকাদ্দাস। কাফেলাসহ আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নিশ্বাস উড়িয়ে হাজীদের সমবেত করেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীনের মর্যাদাও শক্তিমত্তা সবার সামনে প্রকাশ করেন। এতে খলীফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীরুল হজ্জ তাশতাকীল ক্ষুদ্ধ হয়ে ইবন মুকাদ্দাসকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কিন্তু ইবন মুকাদ্দাস তার নিষেধের প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর লড়াই শুরু হয়। লড়াইয়ে ইবন মুকাদ্দাস আহত হয়ে পরের দিন মিনায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছুই ঘটে যায়। তাশতাকীনের কৃতকর্মের জন্যে তাকে বিভিন্নভাবে ভৎসনা করা হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন ও খলীফার শাস্তির ভয়ে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। অবশেষে খলীফা তাকে তার পদ থেকে অপসারন করেন।

মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ

ইবন আবদুল্লাহ সাবত ইবন তাআবিযী, আশ-শায়ির। জীবনের শেষ দিকে তিনি অন্ধ হয়ে যায়। ষাট বছর বেঁচে থেকে শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

নাসর ইবনে ফিতইয়া ইবন মাতার

তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ। ইবনুল মুনি নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন দুনিয়া ত্যাগী ও বড় আবিদ। পাঁচশ এক হিজরীতে তাঁর জন্ম। যাদের নিকট থেকে তিনি ইলমে ফিক্হ অর্জন করেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন। শায়খ মুআফফাকুদ্দীন ইবন মুকামা। হাফিয আবদুল গণী। মুহাম্মাদ ইবন খালফ ইবন রাজিহ্, নাসির আবদুর রহমান্ বিন মুনজিম ইবন আবদুল ওয়াহহাব ও আবদুর রাযযাক ইবন শায়খ আবদুল্ কাদির আল জায়লী। এ ছাড়া তাঁর উস্তাদদের মধ্যে আরও অনেকে আছেন। এ বছর রমযান মাসের পাঁচ তারিখে তিনি ইনতিকাল করেন। একই বছর তৎকালীন শফীউল কুখাত বা প্রধান বিচারপতিও ইনতিকাল করেন।

আবুল হাসান আদ-দামিগানী

তিনি প্রথমে খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ এবং পরে খলীফা মুসতানজিদে বিল্লাহর কিলাফতকালে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এরপর তিনি ঐ পদ থেকে অপসারিত হন। পরে খলীফা মুসতাসী বি আমররিল্লাহর আমলে তাকে আবার স্বীয় পদে ফিরিয়ে আনা হয়। খলীফা নাসির লি-দীনিআল্লাহর পক্ষে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করেন। অবশেষে এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ চুরাশি সালের আগমন

এ বছর মুহারাম মাসে সুলতান সালাহুদ্দীন কাওকার দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা জয় করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। অগত্যা

তিনি এদের যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ করে রাখার জন্যে আমীর কায়েসবাজ বাজমীকে[১] পঁচিশ অশ্বারোহীসহ সেখানে মোতায়েন করেন। অনুরূপভাবে দাবিয়া সম্প্রদায়ের ঘাঁটি সাফাত[২] দুর্গের জন্যে পঁচিশ অশ্বারোহীসহ তুগর বেগ জামদারকে নিযুক্ত করেন। এদের কাছে যাতে খাদ্য-রসদ ও শক্তি সরঞ্জাম পৌছতে না পারে সে দিকে তারা লক্ষ্য রাখবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এভাবে কারক দুর্গ অবরোধ ও দুর্গের অধিবাসীদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্যে শাওবাক-কে প্রেরণ করেন। এ ব্যবস্থাগুলো তিনি করলেন যাতে এসব স্থানে আক্রমণ চালবার প্রস্তুতি নিতে পারেন। উল্লিখিত যুদ্ধসমূহ শেষে সুলতান দামিষ্কে প্রবেশ করেন। সেখানে যেয়ে তিনি দেখতে পান যে, অর্থ ভাণ্ডারের দায়িত্বশীল সাফী ইবন ফাগ্রি তার জন্যে দুর্গের পাশে শারায কিবালিতে এক বিশাল মনোরম প্রাসাদ তৈরি করে রেখেছে। অতএব দর্শনে তিনি তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করেন এবং বলেন, আমাদেরকে দামিষ্কে কিংবা অন্য কোন শহর স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি বরং আমাদের কে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার ইবাদত করার জন্যে ও তাঁর পথে জিহাদ করার জন্যে। আর তুমি যে কাজটা করেছ তা আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হতে অন্তর কে বিরত রাখতে ও নিস্ক্রীয় করে ফেলবে। এরপর সুলতান দারুল আদল বা বিচারালয়ে ঔপবেশন করেন বিচারপতি ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হন। ইবন ফারাশের প্রাসাদের নিকট শারাফে অবস্থিত বাগিচায় এসে তিনি কাযী আল ফাযিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এ পযন্ত যে সব যুদ্ধ সংঘর্ষ হয়েছে। তা বর্ণনা করে শুনাল। এরপর সামনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও যুদ্ধ বিগ্রহ আছে সে সকল বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করেন। তারপর তিনি দামিষ্ক থেকে বের হন এবং বুয়ুস অতিক্রম করে বুকায় উপনীত হন। সেখান থেকে যাত্রা করে হিম্‌স ও হামায় পৌছেন। সেখান থেকে যেয়ে যখন তিনি আমি শহরে অবস্থান করছিলেন তখন মাযীরা থেকে সেনাবাহিনী এসে তার সাথে মিলিত হয়। এখান থেকে তিনি যাত্রা করে উত্তর উপকূলীয় এলাকায় গমন করেন এবং উনতুরতুসসহ বিভিন্ন দুর্গ দখল করেন এ অঞ্চলে অবস্থিত জাবালা ও লাজিকিয়া নামক দুটি শহরও তিনি জয় করেন শহর দুটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। এর প্রাসাদগুলো অত্যন্ত নিপুনভাবে তৈরি ও মরমর পাথরে বাঁধানো। তিনি হামলা চালিয়ে সাহয়ূন। বুকাস ও শাগার দুর্গ জয় করেন শেষোক্ত দুর্গ দুটি আমি শহরে অবস্থিত। অত্যন্ত মজবুত ও সুরক্ষিত দুর্গ দুটি তিনি শক্তি প্রয়োগ করে জয় করেন এরপর তিনি বদারিয়া দুর্গ অধিকার করেন। এটি একটি বিশাল দুর্গ। সুউচ্চু পাহাড়ের উপর এর মজবুত অবস্থান। এর পাদদেশে গভীর নীচে রয়েছে বিস্তৃত উপত্যকা। ফিরিংগী ও মুসলমানদের সকল অঞ্চলে এ দুর্গকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তাই সুলতান একে অতি কঠিনভাবে অবরোধ করেন এর উপরে বড় বড় মিনজামিক বা নিক্ষেপন যন্ত্র স্থাপন করেন এবং সৈন্যদেরকে তিন দলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক দলই পর্যায়ক্রমে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। একদল যখন লড়াই করতে করতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন দ্বিতীয় দল সামনে আসে এভাবে রাত দিন সর্বক্ষণ বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে সুলতানের ভাগ্যে এর বিজয় নিশ্চিন্ত হয়ে

---

১. কামিল ও তারীখে আবুল ফিদায় তার নাম এসেছে নাজমী দেখুন : তারিখে ইবন খালদুন : খ. ৫. পৃ. ৩১২)

২. মুল গ্রন্থে ও সাফাত বলা হয়েছে। কিন্তু এটা ভুল। সঠিক নাম সাফাদ; কামিল ইবনে সালুদুন ও তারীখে আবুল যিদায় এ রকমই বলা হয়েছে।

যায় এবং কয়েক দিনের মধ্যে বল-পূর্বক তিনি এ দুর্গ দখল করেন। দুর্গের মধ্যে যা কিছু ছিল সবই কজায় নিয়ে আসেন। ফল-ফসল সঞ্চিত ধন ও মাল- আসবাব পত্র সবকিছু দখল করে নেন। দুর্গের রক্ষী ও পুরুষদের হত্যা করেন এবং নারী ও শিশু-দেরকে খাদিম হিসেবে ব্যবহার করেন। এরপর সুলতান সেখান থেকে অন্যদিকে গতি পরিবর্তন করেন এবং দরবিযাক ও বাগরাস দুর্গ জয় করেন। এর প্রতিটিই যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়। ফলে সেখান থেকে গণীমত লাভ করে কারও দায়িত্বে তা ন্যাস্ত করেন। এরপর এন তাকিয়া বিজয়ের জন্যে তিনি সাহাসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন্ কেননা এর আশে-পাশের সমস্ত শহর ও জনপদ তিনি ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছেন। আন্তাকিয়ার সর্বত্র অধিপতি এই শর্তে সুলতানের নিকট চুক্তির প্রস্তাব দিয়ে পাঠান যে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হলে বিনিময়ে তারা তাদের নিকট যত মুসলমান বন্দী আছে তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। সুলতান এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার সংগের সৈন্যরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যুদ্ধের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে ও বিরক্ত বোধ করছে। শেষে সাত মাসের জন্যে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয। এ চুক্তির পেছনে সুলতানের উদ্দেশ্যে ছিল যুদ্ধের ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করা। পরে সুলতান দূর্গ অধিপতির নিকট থেকে বন্দী বুঝে আনার জন্যে লোক প্রেরণ করেন। এরপর খ্রিষ্টানদের সাম্রাজ্য কিয়ার কাজ-শেষে সুলতান সেখান থেকে প্রত্যবর্তন করেন। পথে পুত্র যাহির তাকে হালব হয়ে যাওয়ার আহবান জানায়। তিনি তার আহবানে সাড়া দেন এবং হালবের দুর্গে তিন দিন অবস্থান করেন। এরপর সুলতানের ভাতিজা তারিযুদ্দীন তার কাছে হামায় যাওয়ার অনুরোধ জানায়। ফলে সেখানে যেয়ে তিনি একরাত অবস্থান করেন। তিনি জাবালা ও লাযিকিয়া দুর্গ তার অধীনে ন্যস্ত করেন। এরপর তিনি সেখান থেকে যাত্রা করে বালাবাক্স দুর্গে অবতরণ করেন এবং সেখানকার হামসাম খানায় প্রবেশ করেন। রমযান মাসের প্রথম দিকে তিনি দামিষ্ক প্রত্যাবর্তন করেন। এটা তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। এ সময তার নিকট কারক বিজয় ও ফিরিংগীদের দখল থেকে তাকে মুক্ত করার সুসংবাদ আসে। আল্লাহ তাদের অত্যাচার থেকে ঐ এলাকার লোকজনকে মুক্তিদান করেন। এ পথ দিয়ে গমনকারী ব্যবসায়ী যুদ্ধ অভিযানে গমনকারী ও হজ্জ যাত্রীদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অর্থাৎ, অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। (আনআম : ৪৫)

পরিচ্ছেদ : সাফাদ ও কাওকার দুর্গ বিজয়

সুলতান এবার দামিষ্কে বেশি দিন অবস্থান করেননি। অল্পকিছু দিন থেকেই তিনি সাফাদ দুর্গে অভিযান চালাতে বেরিয়ে পড়েন। রমযান মাসের মধ্যে দশকে তিনি সেখানে পৌছেন। দুর্গের চার-পাশে নিক্ষেপ মাত্র মোতায়েন করে পুরো দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। তখন ছিল শীতকাল। শীতের তীব্রতা ছিল এত বেশি যে, ঠাণ্ডায় পানি পর্যন্ত জমে যেত। বেশ কিছু দিন অবরোধ চলার পর শাওয়াল মাসের আট তারিখে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তিনি দুর্গ জয় করেন। এখান থেকে যাত্রা করে তিনি সূর দুর্গে চলে যান। এ দুর্গ তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যমূলক

আচরণ করে। সুলতানের হাতে এর পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেয় এর সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হতে হাত গুটিয়ে নেয়। সাফাদ দুর্গ যখন বিজিত হয়েছে তখন সে অনুসন্ধান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছে। কেননা সাফাদ দুর্গের সাথেই এর মিলিত অবস্থান। এখান একে যাত্রা করে তিনি কাওকাব দুর্গে চলে যান। এ দুর্গে ছিল ইসবিতারিয়া সম্প্রদায়ের অবস্থান। ফিরিংগী জাতির মধ্যে এ দু'টি সম্প্রদায় ছিল সুলতানের নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত। এদের কেউ যদি বন্দী হয়ে আসত তখন তাকে তিনি হত্যা না করে ছাড়তেন না। অব্যাহত অবরোধ চলায় অবশেষে কাওকার দুর্গের পতন ঘটে এবং একে নিজ কব্জায় নিয়ে নেন। দুর্গের মধ্যে যারা ছিল তাদের সবাইকে তিনি হত্যা করেন। এর ফলে এ পথ দিয়ে চলাচলকারী লোকজন দুর্গবাসীদের যুলুম অত্যাচারের হাত থেকে বেঁচে যায়। এই অত্যাচারী জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করায় গোটা উপকূলীয় অঞ্চলে শান্তি নেমে আসে। এসব এলাকায় বসবাসকারী লোকের ঘর-বাড়ি ও বাসস্থান স্থায়ী নিরাপত্তা লাভ করে। এই ছিল এখানকার বিরাজমান অবস্থা। আর আকাশ উপরে স্থাপিত। বায়ুশন বান করে প্রবাহিত হচ্ছিল। সমুদ্রের তরংগমালা উত্থাল পাথাল খাচ্ছিল। পথ যাত্রীদের পদচারনা নির্বিঘ্নে যে দিকে খুশি এগিয়ে চলছিল। আর সুলতান সালাহুদ্দীন সর্ব অবস্থায় নিজে অবিচল ধৈর্য্যধারণ করেন ও অন্যকে ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দান করেন। এসব যুদ্ধে সুলতানের সাথে কাযী আল-ফাযিল ছিলেন। তিনি সুলতানের ভ্রাতা-ইয়ামানের শাসককে ইসলামের সাহায্যার্থে সিরিয়া আসার জন্যে পত্র লিখেন। তিনি আনতাকিয়া দুর্গ অবরোধ করা ও সংকল্প করেছিলেন। এ বছর শেষ হলে জাকিয়ূদ্দীন উমর জিপোলী দুর্গ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর কাযী আল ফাযিল মিশরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। সুলতান তাকে বিদায় জানাল। সব শেষে সুলতান সালাহুদ্দীন বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করেন। সেখানে তিনি জুম'আ আদায় করেন এবং ঈদুল আযহার সময় হলে সেখানে ঈদুল আযহার সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি স্বীয় ভ্রাতা সুলতানুল আদিলকে সাথে নিয়ে আসকালানে চলে আসেন। সেখান থেকে ভ্রাতাকে আসকালানের বিনিময়ে কারকের জায়গীর দান করেন। তিনি তাকে কারকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এর ফলে মিশরে অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তদীয় পুত্র আবীকে তিনি সহযোগিতা করতে পারবেন। এরপর সুলতান আক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বছরের শেষ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

এ বছর মিশরে রাযী সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র দল আত্মপ্রকাশ করে। তারা এখানে ফাতিমী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালায়। এ সময়ে মিশরে সুলতানুল আদিলের অনুপস্থিতিকে তারা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। আমীর ইছমান ইবন সালাহুদ্দীনের শাসনকে তারা অত্যন্ত নগণ্য মনে করে। তারা বারোজন সদস্যকে রাত্রিবেলা শহরে ইয়া আলআলী ইয়া আলআলী ঘোষণা করার জন্যে প্রেরণ করে। তাদের ধারণা ছিল যে, এরূপ ঘোষণা শোনলে জনগণ আলী পরিবারের মহব্বতে সাড়া দেবে। কিন্তু শহরের কোন লোকই তাদের এ ঘোষণায় সাড়া দেয়নি এবং এদিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাতও করেনি। জনসাধারণের এ মানসিক অবস্থা দেখে তারা ঘোষণা দেয়া বন্ধ রেখে দ্রুত পলায়ন করে। কিন্তু পশ্চাধারণ করে তাদের আটক করা হয় ও জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। এ ঘটনার সংবাদ সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট পৌছলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন কাযী আল ফাযিল তখন তার কাছেই উপস্থিত ছিলেন। তার

থেকে আলাদা হয়ে যাননি। তিনি সুলতানকে সম্বোধন করে বললেন, আপনার তো খুশী প্রকাশ করা উচিত। আপনি কোনো চিন্তাই করবেন না। কেননা, আপনার প্রজাদের মধ্য থেকে একজন লোকও ঐ সবক জাহিলদের আহবানে সাড়া দেয়নি। আপনি যদি আপনার পক্ষ থেকে গুপ্তচর বাহিনী সেখানে পাঠিয়ে লোকদের থেকে প্রাপ্ত প্রকৃত তথ্য জানেন, তা হলে সে তথা আপনাকে অবশ্যই খুশি করবে। কাযী আল ফাযিল থেকে এ কথা শুনার পর তার মনে যে দুশ্চিন্তা এসেছিল তা চলে যায়। তিনি ফাযিলের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাকে মিশরে প্রেরণ করেন ফল তার দ্বারা সুলতানের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তা হল গোপন তথ্য সংগ্রহ করা ও তার সহযোগিতা লাভ করা।

এ বছর যে সব বিশিষ্ট লোক ইনতিকাল করেন তাদের বর্ণনা

আল-আমীরুল কবীর সুললাতুন মূলক ওয়াসসালাতীন

আশ-শায়যূরী মুআই-ইদুদ দৌলা আবুল হারিছ ও আবুল মুহফাফার উসামা ইবন মুরশিদ ইবন আলী ইবন মুকাললিদ ইবন নাসর ইবন মুনকিয। তিনি বিখ্যাত ও প্রশংসাপ্রাপ্ত কারীদের মধ্যে অন্যতম। তিরানব্বই বছরের দীর্ঘ জীবন তিনি লাভ করেন। তার জীবনটাই একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস হওয়ার দাবি রাখে। তার বাসস্থান ছিল দামিষ্ক আযীযিয়া প্রাসাদের নিকটে। এটা ছিল বিদগ্ধ পণ্ডিত ও আলিমদের মিলনকেন্দ্র। তিনি বহু মূল্যবান ও মর্মস্পর্শ কবিতা লিখেন। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। দানশীলতায় ও বদান্যতায়ও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তিনি শায়যুর-এর রাজ পরিবারের সন্তান। ফাতিমী শাসনামলের পুরো সময় তিনি মিশরে অবস্থান করেন। এরপর তিনি দামিস্কে চলে আসেনা এবং পচিশ স্তর সালে মালিক সালাহুদ্দীনের দরবারে উপস্থিত হায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

حمدت على طول عمرى المشيبا * وان كنت اكثرت فيه الذنوبا
لانى حييت الى ان لقيت * بعد العدو صديقا حبيبا

অর্থাৎ, আমি আমার দীর্ঘ জীবন ও বৃদ্ধ বয়সের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যদিও এ লম্বা জীবনে আমি পাপ করেছি প্রচুর। কেননা, আমি বেঁচে আছি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে।

তিনি তাঁর একটি অকেজো দাঁত তুলে ফেলে সে সম্পর্কে বলেন–

وصاحب لا امل الدهر صحبته * يشقى لنفعى ويسعى سعى مجتهد
لم القه مذ تصاحبنا فحين بدا * لناظرى افترقنا فرقة الابد

অর্থাৎ, সে আমার এমন এক সংগী যে দীর্ঘ দিন যাবৎ তার সংস্পর্শ আমাকে বিরক্ত করেনি। পার সে আমাকে উপকৃত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মুজতাহিদ বা গবেষকের চেষ্টার ন্যায় যে চেষ্টা করেছে। যতদিন সে ভালভাবে আমার সাথে ছিল ততদিন আমি তাকে ফেলে দেইনি। কিন্তু যখন দর্শকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল তখন চিরদিনের জন্যে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম।

তার একটি বিরাট দিওয়ান বা কাব্যগ্রন্থ আছে। সালাহুদ্দীন তার এ দীওয়ানকে অন্যান্য সকল দিওয়ানের উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করতেন। হিজরী চারশ অষ্টাশি সালে এই মহান কবির

জন্ম হয়। যৌবনকালে তিনি ছিলেন একজন বীর সাহসী পুরুষ। একদা এক সিংহের সাথে মুকাবিলা করে তিনি সেটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকার পর এ বছর রমযান মাসের তেইশ তারিখের রাতে তিনি ইনতিকাল করেন কাযউন পর্বতের পূর্ব প্রান্তে তাঁকে দাফন করা হয়। জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি তার কবর যিয়ারত করেছি ও তার উদ্দেশ্যে বলেছি:

لا تستعر جلدا على هجرانهم * فقواك تضعف عن صدود دائم

واعلم بانك ان رجعت اليهم * طوعا والا عدت عودة نادم

অর্থাৎ, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তুমি দেহকে উত্তেজিত করো না। নচেৎ এ স্থায়ী বিচ্ছিন্নতায় তোমার পেরেশানী আরও বেড়ে যাবে। জেনে রেখ, যদি তুমি তাদের কাছে খুশী মনে ফিরে যাও তাহলে তো ভাল। অন্যথায় তোমার ফিরে যাওয়া হবে খুবই লজ্জাকর।

তার আরও কিছু কবিতা

واعجب لضعف يدى عن حملها قلما * من بعد حطم القنا فى لبة الاسد

وقل لمن يتمنى طول مدته * هذى عواقب طول العمر والمدد

অর্থাৎ, আশ্চর্য হই, আমার হাতের দুর্বলতার জন্যে যে, একটা কলমত উঠাতে সক্ষম নয়; অথচ এক সময় এই হাত দিয়েই সিংহের বুকে বর্শা ভেঙ্গেছি। তাই যে বক্তি দীর্ঘজীবন লাভের আকাংক্ষা করে, তাকে বলে দাও যে, দীর্ঘজীবনের পরিণতি কিন্তু এই।

আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী

ইবন আবদুল্লাহ ইবন সুওয়াইদ আত-তিরবীতী। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন বড় আলিম। তার রচিত অনেকগুলো মুল্যবান গ্রন্থ আছে।

আল-হাযিমী আল-হাফিয

আবু শামা বলেন, হাফিয আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মূসা ইবন উছমান ইবন হাসিম আল–হাযিমী আল–হামাদানী এ বছর বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি অল্প বয়স থেকেই গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আল-উছউছালাতু ফিন নানাব, আন-নাসিখু ওয়াল মানসূখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তার আরও অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। পাঁচশ আটচল্লিশ বা উনপঞ্চাশ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এ বছর জমাদিউল আউয়াল মাসের আঠাশ তারিখ ইনতিকাল করেন।

হিজরী পাঁচশ পঁচাশি সালের আগমন

এ বছর মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা নাসির [লি. দীনিল্লাহ] এর পক্ষ থেকে সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট রাজকীয় দূত আগমন করে। তারা সুলতানকে এই সংবাদ দেয় যে, খলীফার পুত্র আবূ নাসবকে যাহির [বিল্লাহ] উপাধি দিযে যুবরাজ ঘোষণা করা হয়েছে। তখন সুলতান সালাহুদ্দীন দামিস্কের খতীব আবুল কাসিম আবদুল মালিক ইবন যায়দ আদ - দাওলায়িকে মিম্বরে উঠে জনগণকে জানিয়ে দিতে নির্দেশ দেন এরপর তিনি খলীফার উদ্দেশ্যে দুতদের নিকট বহু মুল্যবান উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। সেই সাথে কিছু সংখ্যক ফিরিংগী

বন্দীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে অবস্থায় আটক করা হয়েছিল সে অবস্থা বহাল রেখে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। এ ছাড়া সলীবুস সালবুত বা সুবৃহৎ ক্রুশকাঠও তাদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। এই সলীবকে দারুল খলীফার বাবুন নাওয়ার চৌকাঠের নীচে দাফন করা হয। ফলে একদা যে সলীবকে সম্মান দেখান হত ও চুম্বন করা হত তাকে দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় পা দ্বারা দলিত করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এ সলীব বায়তুল মুকাদ্দাসের যাখরার উপর স্থাপিত ছিল। এ ছিল তামা দ্বারা তৈরি এবং স্বর্ণ দিয়ে মোড়ানো। আল্লাহ একে লাঞ্ছনার সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেন।

আক্কার ঘটনা ও পরিণতি

এ বছর রজব মাসে সূর এলাকায় অবস্থানকারী সমস্ত ফিরিংগী ঐক্যবদ্ধ হয়ে আককা শহরে আগমন করে এবং চতুর্দিক থেকে শহরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। এ ফলে শহরে যত মুসলমান ছিল তারা সবাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধের জন্য যা কিছুর প্রয়োজনে তা সবই ফিরিংগীরা জোগাড় করে। এ সংবাদ সুলতানের নিকট পৌছলে তিনি দ্রুত দামিষ্ক থেকে আককার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি এসে দেখেন যে ফিরিংগীরা শহরকে এমনভাবে বেষ্টন করে আছে যেমনভাবে অঙ্গুরি অঙ্গুলিকে বেষ্টন করে রাখে। তিনি ফিরিংগীদের বেষ্টনী ভাংগার জন্যে অব্যাহতভাবে প্রতিরোধ ও পতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকেন। অবশেষে বহু কষ্টের পর দুর্গের দ্বারে পৌছার একটি পথ তিনি উপযুক্ত করতে সক্ষম হন। এখন যে কেউ ইচ্ছা করলে তার কাছে আসতে পারে- সৈন্য হোক বা বাজার করা লোক হোক। নারী হোক বা শিশু। ঐ পথ দিয়ে তিনি দুর্গ অভ্যন্তরে অস্ত্র ও খাদ্য রসদ পাঠান। এরপর এক পর্যায়ে তিনি নিজে দুর্গে প্রবেশ করেন। দুর্গ প্রাচীরে উঠে তিনি ফিরিংগীদের পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, তাদের সৈন্য সংখ্যা অঢেল অগণিত। সমুদ্রে রক্ষিত রসদভাণ্ডার তাদের নিকট পৌছে দেয়া হচ্ছে। তাদের নিকট যা কিছু আছে প্রতি মুহূর্তে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিরামভাবে সাহায্য সহযোগিতা আমদানি হচ্ছে। এসব দেখেশুনে সুলতান তার তাঁবুতে আমদানি হচ্ছে। এসব দেখে শুনে সুলতান তার তাঁবুতে ফিরে আসেন। সৈন্যরা তার কাছে এসে সমবেত হয়। চতুর্দিকের সকল অঞ্চল থেকে পদাতিক ও অশ্বাহিনী এখানে এসে জড়ো হয়। শা'বান মাসের শেষ দশকে ফিরিংগীরা তাদের শিবির ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে ছিল প্রায় দু'হাজার অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার পদতিক সৈন্য। এ দিকে সুলতানও তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলায় বের হন এরপর আককার চারণভূমিতে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দিনের প্রথম ভাগে মুসলিম বাহিনীর একটি দল শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে। কিন্তু এরপর যুদ্ধের চাকা ঘুরে ফিরিংগীদের পক্ষে যায়। এ সংঘর্ষে উভয় পক্ষে সাত হাজারেরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধ শেষ হলে সুলতান পূর্বে যে স্থানে শিবির স্থাপন করে ছিলেন সে স্থান পরিবর্তন করে অনেক দূরে যেয়ে শিবির স্থাপন করেন। কারণ সেখানে ছিল লাশের দুর্গন্ধ। ফলে পেটের পীড়া ও অন্যান্য দিক থেকে নানাবিধ রোগের আশংকা ছিল। কিছুদিন দূরে থেকে অশ্ব ও যোদ্ধাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে, তার এ দূরে অবস্থান করাকে লাঞ্ছিত শত্রুরা নতুন কোন ফন্দি আটার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে কেননা তারা সত্যিই এ সময়টুকু সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদের সৈন্য শিবিরকে ঘিরে পরিখা খনন করে। সমুদ্র কূল থেকে এ পরিখা শুরু হয় এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে বেষ্টন করে রাখে।

খননকৃত মাটি দ্বারা তারা সুউঁচু প্রাচীর তৈরি করে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে দরজা রাখে। এসব দরজা দিয়ে তারা যখন ইচ্ছা বাইরে আসতে পারত। আবার প্রয়োজন সেরে তারা তাদের নির্ধারিত ও পছন্দনীয় স্থানে নির্বিঘ্নে অবস্থান করতে পারত। কিন্তু মুসলমানরা পড়ে যায় বেকায়দায়। তাদের অবস্থা কঠিন হয়ে যায়। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। বিপদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা। সুলতানের ইচ্ছা ছিল বিশ্রাম গ্রহণের পর দ্রুত হামলা করা এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত রেহাই দিবেন না যতক্ষণ না সমুদ্র পথে চতুর্দিকে থেকে সাহায্য আসে। কিন্তু সৈন্যদের দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার কারণে তার পক্ষে এ পরিকল্পনা বসন্তবায়য করা সম্ভব হয়নি। ফিরিংগীদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে মুসলিম সৈন্যরা নিজেদেরকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে করছিল। তারা জানতনা যে ভাগ্যে তাদের কি লেখা ছিল। অগত্যা সুলতান সমস্ত মুসলিম রাজন্যবর্গের নিকট সাহায্য চেয়ে ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে পত্র লিখেন। তিনি খলীফাকে অবস্থার বিবরণ দিয়ে পত্র দেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল। অতঃপর দলগত ও এককভাবে তাঁর নিকট সাহায্য আসতে থাকে সুলতান মিশরে তার ভ্রাতা আদিলকে দ্রুত যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবার জন্যে পত্র দেন এবং তাকেও আসতে বলেন। পত্রের আলোকে তিনি আদীর হুমামুদ্দীন লুলুর নেতৃত্বে পঞ্চাশটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন। যথা– সময়ে তা সুলতানের নিকট এসে পৌছে। এরপর আদিল নিজে মিশরীয় সৈন্যদের সাথে চলে আসেন। যখন যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌছে তখন ফিরিংগীরা ভীত-সন্ত্রান্ত হয়ে ডানে-বামে ছুটে চলে যায়। শহরে খাদ্য রসদ ও সৈন্যদের ভিড় জমে যায়। অবস্থার এ পরিবর্তনে সৈন্যদের বক্ষ উন্মুক্ত হয় ও সাহস বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে বছর শেষ হয়ে যায়। অবস্থার যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে তাই বিদ্যমান থাকে। বরং বলা যায় এ সময় যে অবস্থা বিরাজ করে সে অবস্থা-ই চলতে থাকে। আর আশ্রয়ের স্থান তো আল্লাহ ব্যতীত আর কোথাও নেই।

যে সব গুরুত্বপূণ্ লোক এ বছর ইনতিকাল করেন তাঁদের বিবরণ

কাযী শরফুদ্দীন আবু সা'দ

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আবূ আসরূন। শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম ইমাম। কিতাবুল ইনতিসাফ এর রচয়িতা। তাঁকে দামিস্কের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তখন তার সমস্ত সিট রক্ষার্থে তার পুত্র নাজিমুদ্দীনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তিনি মোট তিরানব্বই বছর ছয় মাস জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁকে মাদরাসা আসরূনিয়ায় দাফন করা হয়। এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। এটি তার বাড়ির সম্মুখে বাবুল বারীদ নামক ছোট বাজারের নিকট অবস্থিত। তার বাড়ী ও মাদরসাার মাঝ দিয়ে একটি রাস্তা আড়া-আড়ি ভাবে চলে গেছে। তিনি ছিলেন সত্যপন্থী ও বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণকারী আলিম। ইবন খাল্লিকান তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর মূল আবাসস্থল মাওসিলের আধুনিক আবাসিক এলাকায়। ইলমের অন্বেষণে তিনি বহু শহর সফর করেন। এসব সফরে যেয়ে তিনি আসআদ মাহানি ও আবূ আলী পারিকিসহ বহু আলিমের সান্নিধ্যে থেকে কুরআন হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। সানজার ও হারবান শহরের কাযী পদে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। নূরুদ্দীনের শাসনামলে তিনি গাযালিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি এখান থেকে হালবে চলে যান। তখন

নূরুদ্দীন তার জন্যে হালবে একটি এবং হিসেমস আরো একটি মাদরাসা তৈরি করে দেন। এরপর তিনি সালাহুদ্দীনের আমলে এখান থেকে দামিষ্কে চলে আসেন। সালাহুদ্দীন পাঁচশ তিহাত্তর সালে তাকে দামিস্কের কাযী পদ দান করেন। তিনি এ বছর মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। অন্ধদের বিচার কাজ পরিচালনা বিষয়ে বিভিন্ন মনীষীদের মন্তব্য মতামত সংগ্রহ করে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশা করেন। তার মতে অন্ধদের বিচার কাজ পরিচালনা করা জায়েয। অবশ্য এটা প্রচলিত মাযহাবের পরিপন্থী। বয়ান গ্রন্থ প্রণেতা এটা কারও কারও মত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এটা তাকে ব্যতীত অন্য কারও মধ্যে দেখিনি। কিন্তু কোনো কিছুর ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। কাজী শরফুদ্দীন অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির নাম যথা: সাফওয়াতুল মাযহাব ফী নিহায়াতিল মাতলব: এ গ্রন্থটি সাত খন্ডে সমাপ্ত; আল-ইনতিসাফ, চার খণ্ডঃ আল-খিলাফ; চার খণ্ড; আজ যারীয়াত ফী মারিফাতিশ শরীয়আত ও আল– মুরশিদ ইত্যাদি। তার আর একটি গ্রন্থের নাম মা'খযুন নযর এবং অন্য একটির নাম মুখতাসার ফিল-ফারাইয। ইবন আসাকির তার তারিখের মধ্যে ও আম্মাদ তাঁর গ্রন্থের মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে কাযী আল-ফাগ্রিলও তার প্রশংসা করেছেন। ইমাদ ও ইবন খাল্লিকান স্বস্ব গ্রন্থে তার বহু কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হল–

اومل ان احيا وفى كل ساعة * تمر بى الموتى يهز نعوشها

وهل انا الا مثلهم غير ان لى * بقايا ليال فى الزمان اعيشها

অর্থাৎ, আমি তো বেঁচে থাকার আশা করি। অথচ প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু আমাকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে– যা তার লাশকে কাঁপিয়ে তুলছে। আমি তো তাদের অনুরূপ ছাড়া আর কিছু নই। অবশ্য মাত্র কয়েক দিনের জীবন আমার বাকী আছে। সেই সময়টুকু অতিবাহিত করার জন্যে আমি জীবিত আছি।

আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন উহবান

উপনাম আবুল আব্বাস। ইবন আফযালুযামান নামে তিনি পরিচিত। ইবন আছীর বলেন, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বহু কয়টি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তন্মধ্যে ফিকহ, উসূল, গণিত, ফারইয, জ্যোতিষ, সৌর বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। অবশেষে এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। সাহচর্য দানে ও চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন এক অনন্য পুরুষ।

আল-ফকীহুল আমীর যিয়াউদ্দীন ঈসা আল–হাকারী

তিনি ছিলেন আসাদুদ্দীন শিরকুহ-এর ঘনিষ্ঠ সংগী। তার সাথে তিনি মিশরে চলে আসেন এবং তার নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। এরপর তিনি জীবনভর সুলতান সালহুদ্দীনের সাথে লেগে থাকেন। অবশেষে তিনি আক্কার সন্নিকটে খারুবা নামক স্থানে সুলতানের সেনা শিবিরে ইনতিকাল করেন। সেখান থেকে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওখানেই দাফন করা হয়। তিনি শায়খ আবুল কাসিম ইবন বারখি আল-জাযরীর নিকট থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম ও আমীর।

আল-মুবারক ইবন মুবারাক আল-কারখী

তিনি ছিলেন নিযামিয়া মাদরাসার অধ্যাপক। ইবন খাল হাযানী নিকট থেকে তিনি ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান-অর্জন করেন। খলীফার নিকটে ও জনগণের নিকটে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল যথেষ্ট। তার উত্তম হাতের লেখা দ্বারা দৃষ্টান্ত পেশ করা হত। তাবাকাত গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

হিজরী পাঁচশ ছিয়াশি সালের আগমন

এ বছর শুরু হয় এমন অবস্থায় যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আক্কার দুর্গ অবরোধ করে আছেন। অন্য দিকে ফিরিংগীদের নিকট সমুদ্র পথে প্রতিনিয়ত সাহায্য আসার ধারা অব্যাহত আছে। এমন কি ফিরিংগীদের ঘরের মহিলারা পর্যন্ত যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে এমন চিন্তা নিয়ে অনেকে আসে যে, প্রবাসী পুরুষদের তারা শান্তি আনন্দ দিবে এবং প্রবাসকালীন বিবাহে আবদ্ধ হবে। এ দ্বারা সৈন্যরা আনন্দ সেবা ও প্রয়োজন পূরণের সুযোগ লাভ করে। জানা যায় এ উদ্দেশ্য নিযে একটি নৌযানেই তিনশ সুন্দরী রূপসী মহিলা তাদের নিকট পৌছে। মনোরঞ্জনের এ সুযোগ পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ও প্রবাস জীবনে তারা অটল অবিচল হয়ে থাকে। এসব রমনী আকর্ষনে অনেক দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানও ফিরিংগীদের কাছে চলে আসে। শীঘ্রই এ খবর চারদিকে রটে যায়। ইতিমধ্যে মুসলিম ও ফিরিংগীদের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, জার্মান সম্রাট তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে ইস্টালিনের দিক থেকে আগমন করছেন। তার উদ্দেশ্য সিরিয়া দখল করা। এর অধিবাসীদের হত্যা করা ও বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করা। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান ও তাঁর সাথী মুসলিম যোদ্ধারা এক মহাদুশ্চিন্তায় পড়ে যান এবং ভীষণভাবে ভয় পেয়ে যান। তদুপরি তারা এমনিতেই এক ভয়াবহ সংকটময় অবরোধ স্থলে সময় কাটাচ্ছেন। পক্ষান্তরে, ফিরিংগীদের এ সংবাদে আরও শক্তির সঞ্চয় হয়। যুদ্ধ ও অবরোধ কাজে তারা আরও কঠোর হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দয়া- মেহেরবাণী এগিয়ে আসে। জার্মানে সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশকেই তিনি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, ক্ষুধা ও দুর্গম পথে পথ-ভ্রান্ত করে ধ্বংস করে দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরেই আসছে। ফিরিংগীরা চতুর্দিকে সংবাদ দিয়ে লোক জড়ো করে তাদের এলাকা ছেড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করতে কেন আসল তার কারণ ইবনুল আছীর তার বিখ্যাত্ ইতিহাস গ্রন্থ্ আল-কাসিলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, একদল পাদ্রি ও সন্ন্যাশী যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করত। তারা চারটি জাহাজে চড়ে সূর থেকে বের হয়। তারা সমুদ্রকুলবর্তী ও সমুদ্রের ওপার তীরের খ্রিষ্টান অধ্যুষিত শহরসমূহে ঘুরে ঘুরে ফিরিংগীদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করতে থাকে। তারা কুদসের অধিবাসী ও উপকুলের অধিবাসীদের উপর হত্যা। বন্দী ও ঘর-বাড়ির উপর যে সব বিপর্যয় নেমে এসেছিল সে সব বিষয় তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তারা ঈসা মাসীহর একটি প্রতিকৃতি এবং একজন আরবীয় লোকের একটি প্রতিকৃতি[১] নির্মাণ করে এবং উভয়কে এমন অবস্থায় প্রদর্শন করে যে, দেখলে মনে হবে আরবীয় লোকটি মাসীহকে

---

১. وقد صوروا صورة المسيح وصواق عربي احز يضربه ويؤذنيه ـ فأذا سالوه من هذا الذى يفر بو المسيح اقالوا هذا بنى العرب يضر به وقد جرحه ومات

প্রহার রয়েছে ও কষ্ট দিচ্ছে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, যে লোকটি মাসীহকে প্রহার করছে সে কে? তখন জবাবে তারা বলত, এ হল আরবের নবী, সে মাসীহকে প্রহার করছে। ফলে মাসীহ আহত হয়ে মারা গেছে। এ কথা শুনে তারা অস্থির হয়ে যেত। ক্রোধে ফেটে পড়ত। রোদন করে অশ্রু ঝরাত ও দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হত। এরূপ পরিস্থিতিতে তারা তাদের দ্বীন ও নবীর সাহায্যার্থে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের গন্তব্য স্থান ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বন্ধুর! এ যুদ্ধে কেবল পুরুষ লোকই আসেনি বরং ঘরের রমণী এবং পুরুষ-মহিলা বেশ্যারাও অংশগ্রহণ করে। এই বেশ্যারা ছিল তাদের সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

রবিউল আউয়াল মাসের মাঝা-মাঝি সময়ে সুলতান শাঈফ আরবূন দুর্গ নির্বিঘ্নে দখল করে নেন। এ দুর্গের অধিপতি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে অপমান ও লাঞ্ছনা জীবন অতিবাহিত করছিল। সে ছিল ফিরিংগী জাতির মধ্যে এক বিচক্ষণ ধুরন্ধর ও মানব জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানসমৃদ্ধ এক পরিচিত ব্যক্তি। সে হাদীসের অনেক গ্রন্থও কুরআনের তাফসীর অধ্যয়ন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার হৃদয় ছিল কঠিন, অন্তর কলুষিত ও আত্মা ছিল অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। যখন শীতকাল অতিবাহিত হল এবং বসন্তকাল এসে গেল তখন মুসলিম দেশসমূহের রাজা-বাদশাগণ নিজ নিজ দেশের অশ্ববাহিনী পদাতিক বাহিনী ও বীর যোদ্ধাদেরকে এখানে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে মুসলিম জাহানের তদানীন্তন খলীফা মালিক সালালুদ্দীনের নিকট প্রচুর পরিমাণ নুফাত (তেজস্ত্রির তেল বিশেষ) ও খাদ্যরসদ বোঝাই করে প্রেরণ করেন এবং সেই সাথে পাঠান নুফাত নিক্ষেপকারী ও প্রাচীর ছেদ করার কারিগর। এরা সবাই ছিল নিজ নিজ পেশায় অত্যন্ত দক্ষ ও বিশ্বস্ত। এদের জন্যে তিনি বিশ হাজার দীনার বেতন ধার্য করে দেন। এ দিকে সমুদ্রের পথ উন্মুক্ত থাকে। প্রত্যেক দ্বীপ থেকে জাহাজ ভর্তি করে ফিরিংগীদের সাহায্যার্থে লোক খাদ্য রসদ ও অস্ত্রপাতি অব্যাহতভাবে আসতে থাকে।

ফিরিংগীরা কাঠ ও লোহা দ্বারা তিনটি কিল্লা নির্মাণ করে। এগুলোর ছাদের উপরে চামড়া বিছিয়ে দেয়া হয় এবং সিরকা বা টক দ্বারা সিক্ত করা হয়। এটা করা হয় যাতে নুফাত তেল তার মধ্যে কোনো কাজ করতে না পারে। এর মধ্যে একটি কিল্লা ছিল সবচেয়ে বড়। তাতে পঁচিশ সৈন্য থাকতে পারত্ শহরের অন্যান্য কিল্লার থেকে এটা ছিল অনেক উঁচু। এ কিল্লাটি ছিল গাড়ির উপর স্থাপিত। ফলে যেভাবে তারা একে ঘুরাতে ইচ্ছা করত সেভাবেই ঘুরাতে পারত। প্রতিটি কিল্লার উপরে ছিল বিশাল বিশাল মিনজানিক বা নিক্ষেপন যন্ত্র। তাদের এ কলা কৌশল দেখে মুসলমানরা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। তারা শহরের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভীত হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশংকা করে। সবদিক বিবেচনায় তারা অত্যন্ত কঠিন ও সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। সুলতান এসব কিল্লা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে লোক নিয়োগ করেন। কিন্তু তারা অপারগতা প্রকাশ করে। পরে তিনি নুফাত নিক্ষেপে পারদর্শী লোকদের হাজির করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে এগুলো জ্বালিয়ে দিতে পারলে বিরাট অংকের পুরুস্কার দেয়া হবে। সুলতানের প্রতিশ্রুতিতে সাড়া দিয়ে। দামিস্কের এক যুবক এগিয়ে আসে যে আগুনে তামা জালিয়ে বিভিন্ন জিনিষপত্র তৈরি করত। এই যুবকের নাম ইয়ালা ইবন আরীফ আন নাহহাসীন। সে কিল্লা জ্বালিয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাদা বর্ণের নুযাতের সাথে সে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করে যার কার্য কারিতা সম্পর্কে কেবল

সে-ই জানত। এরপর সেই মিশ্রিত নুফাত তিনটি তামার ডেগে রেখে আগুন দিযে জ্বালায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাতে আগুন জ্বলে উঠে। তখন আক্কা শহরের মধ্যভাগ থেকে নিক্ষেপযন্ত্র দিয়ে এক এক কিল্লার উপরে একটি করে ডেগ নিক্ষেপ করে। ফলে আল্লাহর হুকুমে তিনটি কিল্লা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা উর্ধ্ব আকাশে উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। কিল্লা অভ্যন্তবে যারা ছিল তারা সবাই পুড়ে ভস্ম হযে যায়। মুসলমানরা এ সময় একসাথে চিৎকার দিয়ে বলে উঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। প্রতিটি কিল্লায় সত্তর জন করে কাফির মারা যায়। এ দিনটি কাফিরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন দিন হয়ে দেখা দেয়। এ বছর রবীউল আউয়াল মাসের বাইশ তারিখ সোমবার এ ঘটনা সংঘটিত হয। ফিরিংগীরা একটানা সাতমাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে কিল্লা তৈরি করেছিল, তা একদিনেই পুড়ে শেষ হয়ে যায়। আল্লাহর বাণী–

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔

আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব- (সূরা ফুরকান : ২৩) সুলতান তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ঐ যুবককে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও উত্তম পুরুস্কার প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু যুবক এর প্রতিদান হিসেবে কিছুই নিতে সম্মত হয়নি। সে বলল আমি এ কাজ করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে এবং তার নিকট যে পুরুস্কার আছে তা পাওয়ার আশায়। সুতরাং আপনাদের নিকট থেকে আমি কোনো বিনিময় বা ধন্যবাদ পেতে চাই না।

এ সময় মিশর থেকে প্রেরিত যুদ্ধ জাহাজ আককা উপকূলের কাছাকাছি চলে আসে এসব জাহাজে ছিল শহরের মুসলিম অধিবাসীদের জন্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী। ফিরিংগীরা তখন এসব জাহাজের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে নিজেদের যুদ্ধ জাহাজগুলো বিন্যাস করে। তাদের এ তৎপরতা দেখে সুলতান তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে বাধা দেয়ার জন্যে অগ্রসর হন- যাতে তারা মুসলিম যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ করা থেকে ফিরে আসে। শহরের অধিবাসীরাও এ যুদ্ধে অংশ নেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সমুদ্রের মধ্যে উভয় পক্ষের জাহাজের সাথে নৌ-যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ দিনটি ছিল অত্যন্ত কঠিন দিন্ জলে ও স্থলে উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলে। মুষলমানদের জাহাজগুলোর মধ্য থেকে একটি জাহাজ ফিরিংগীদের জাহাজের কাছা-কাছি চলে আসায় সেটিকে তারা দখল করে নেয়। অবশিষ্ট জাহাজগুলো মালামালাসহ নিরাপদে শহরের নিকট পৌছে যায়। এ সব জাহাজে ছিল শহরের মুসলমানদের জন্যে খাদ্য- খাবার। তারা এ সময় এসব খাদ্যের প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। অন্তত কিছু খাদ্যের প্রয়োজনে তখনই দেখা দেয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জার্মান সম্রাট আক্কা শহর ধ্বংস এর অধিবাসী মুসলমানদের হত্যা ও বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করার সংকল্প নিয়ে বিপুল সংখ্যক সৈন্য যার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ সাথে নিয়ে আসে। তার আরও উচ্চাশা ছিল দেশের পর দেশ জয় করা এমন কি মক্কা মদীনা পর্যন্ত দখল করা। কিন্তু আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যে তার ভাগ্যে এর কিছুই জুটেনি। বরং আসার সময় আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে সমূলে ধ্বংস করে দেন। তাদের মৃতদেহ শিয়াল কুকুরে এমনভাবে টেনে ছিড়ে খেয়ে ফেলে যেমন মৃত প্রাণিতে টেনে ছিড়ে খায়। শুধু তারাই ধ্বংস হয়নি বরং তাদের সম্রাটও ধ্বংস হয়। কেননা তাদের

আসার পথে এক নদী সামনে পড়ে।[১] নদীটি ছিল অত্যন্ত খরস্রোতা। সম্রাট আনন্দে এই নদীতে সাঁতার কাটার ইচ্ছে করে। কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দেয়ার সাথে সাথে স্রোতের টানে এক গাছের সাথে যেয়ে আঘাত লাগে আঘাতে তার মাথা ফেটে যায় এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।[২] এ ভাবে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ দেশ ও জনগণকে হিফাযত করেন সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসান হয়। তাদের শক্তি ভংগে তছনছ হয়ে যায়। সৈন্য সংখ্যা প্রচুর হ্রাস পায়। এরপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হয় এবং কোনো শহর অতিক্রম করে ততই তারা নিধন হতে থাকে। অবশেষে যখন তারা আককায় তাদের সাথীদের কাছে পৌছে তখন অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। আককার ফিরিংগীরা এদেরকে পেয়ে মাথা তুলতে সাহস পায়নি এবং তাদের নিকট এদের কোনো মূল্যায়ন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকেনি। শুধু তাই নয়, এদের জাতি গোষ্ঠীর কাছেও এদের কোনো মূল্য ছিল না। তেমনি ভিন জাতির কাছেও ছিল না। যারা আল্লাহর নূর বা আলোকে নির্বাপিত করতে চায় এবং দীন ইসলামকে অপদস্থ করতে চায় তাদের পরিণতি এ রকমই হয়। ইমাদ তার কিতাবে লিখেছেন যে, জার্মানদের মোট পাঁচ হাজার সৈন্য আককা পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু ফিরিংগী বাদশাহরা সকলেই তাদের আগমনকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। কেননা, তারা এদের কারণে নিজেদের শক্তি ও রাজত্ব চলে যাওয়ার আশংকা করছিল। একমাত্র সূর অধিপতি মারাকীস ব্যতীত আর কেউ জার্মনদের উপরে খুশী হতে পারেনি। এই অধিপতিই সমস্ত ফিৎনার জন্মদাতা এবং সকল বিপর্যয়ের মূল হোতা। কেননা, সে এ দ্বারা ও এর কলা কৌশল দ্বারা মুক্তি সঞ্চয় করে। কারণ, সে ছিল যুদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী। সে যুদ্ধের এমন সব আধুনিক অস্ত্র নিয়ে আসে এবং তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না। সে পাহাড়ের ন্যায় উঁচু দাবাবা[৩] স্থাপনা করে। যা দ্রুত স্থানান্তর করা যেত। অনেকগুলো লোহার চাকা তাতে লাগানো থাকত। এটা প্রাচীরের গায়ে আঘাত করে ভেংগে দেয় এবং বিভিন্ন দিক ধ্বংস দেয়া আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে এটা জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে নিরাপদে রেখেছেন। এক পর্যায়ে জার্মান অধিপতি ফিরিংগীদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। মুসলিম বাহিনীও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুকাবিলায় এগিয়ে আসে। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বিপুল সংখ্যক কাফির নিতে হয়। আর একবার তারা সুলতানের শিবিরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে কিছু আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন মালিকুল আদিল আবূ বকর দ্রুত উঠে হালার প্রস্তুতি নেন। তিনি ছিলেন যায়মানা বা দক্ষিণ পার্শ্বসহ সৈন্যদলের প্রধান। নিজের বাহিনী নিয়ে তিনি অগ্রসর হন। কিছু সময় ফিরিংগীদের অবকাশ দেন যাতে তারা তাবুর মধ্যে

---

১. সালুফিয়া অঞ্চলে প্রবাহিত এ নদীর ইয়াকাদালুস। তারীখুল হুরকিস সালীবিয়া। খ. ৩. পৃ. ৩৯)

২. রান সায়মান তার হুরবু সালীবিয়ায় লিখেন, আমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হয তা একেবারে নিশ্চিত নয়। কেননা হতে পারে সম্রাট সুস্থতা লাভের উদ্দেশ্যে পানিতে নামে। কিন্তু তার ধারণা অপেক্ষা নদীর স্রোত ছিল তীব্র : অথবা তার বৃদ্ধ দেহ হঠাৎ প্রাপ্ত ব্যথা সহ্য করতে পারেনিঃ অথবা তার অশ্ব পা পিছলে তাকে নিয়ে পানিতে পড়ে যায় এবং অস্ত্রের ভারে সে তালিয়ে যায়। সৈন্যরা নদীর কাছে পীছে তার মৃত দেহ উদ্ধার করে এবং নদীর পাড়ে তাকে রেখে দেয়। খ. ৩. পৃ. ৪০)

৩. দাবাবা : একটা যুদ্ধাস্ত্রের নাম। দুর্গ অবরোধকালে ব্যবহৃত হয়। এর ভিতরের ফাঁক দিয়ে দুর্গের প্রাচীরের মুল পর্যন্ত পৌছা পৌছা যেত এবং ভিতরে থেকেই প্রাচীর ছিদ্র করা যেত। আধুনিক ট্যাংক।

প্রবেশ করতে পারে। এরপর বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে তাদেরকে আক্রম করেন। উপায়ন্তর না পেয়ে ফিরিংগী তাঁর সম্মুখ দিয়ে পালাতে থাকে। তখন তিনি তাদেরকে এক দলের পর আর এক দলকে আবার কখনও একজনের পর আরেকজনকে যখন যেভাবে পান একাধারে হত্যা করতে থাকেন। ফলে ভূ-পৃষ্ঠকে তাদের অত্যাচার ও অপতৎপরতা থেকে মুক্ত করে ছাড়েন যা সবুজ ঘেরা উদ্যান থেকে অধিক পরিচ্ছন্ন হয় এবং স্থায়ী নিয়ামতের তুলনায় মানব অন্তরে অধিক প্রিয় অনুভূত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি পাঁচ হাজার ফিরিংগী হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এ সংখ্যা বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম। আহম্মাদ বলেছেন, তিনি ঐ দিন যোহর থেকে আসর পর্যন্ত দশ হাজার শত্রু নিধন করেন। আল্লাহই ভাল জানেন। এ দিকে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন মুসলিম বাহিনীর মায়সারা বা বাম কুহের সৈন্যরা এর কিছুই জানেনি এবং তারা এর কোনো আলামতই লক্ষ্য করেনি। তারা বরং নিজেদের শিবিরে দুপুর বেলা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাদের অপর পাশ দিয়ে যারা চলে যেতে সক্ষম হয় তাদের সংখ্যা এক হাজারেরও কম। এদিক মুসলমানদের মধ্য থেকে মাত্র দশজন কিংবা তারও কম সৈন্য শহীদ হয়। এ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহা নিয়ামত। এ ঘটনায় ফিরিংগীদের শক্তি চরমভাবে ভেংগে পড়ে এবং তারা দুর্বল হয়ে যায়। তারা সুলতানের সাথে সন্ধি করতে ও শহর থেকে প্রত্যাবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এ সময়ে তাদের নিকট সুমদ্র পথে বিরাট সাহায্যও প্রচুর পরিমান মাল-সম্পদ তাদের সাথে ছিল। রাজা এ সব মালামাল ফিরিংগীদের জন্যে খরচ করে ও তাদেরকে ঋণ দেয়। এরপর তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবআন জানায়। শহরে দুটি মিনজানিক স্থাপন করে। প্রতিটি মিনজানিকের জন্যে এক হাজার পাঁচশ দীনার খচর নির্ধারণ করে। কিন্তু মুসলমানরা শহরের ভিতর থেকে উভয় মিনজানিক জ্বালিয়ে দেয়।

এ সময় ইস্তাম্বুল থেকে রোম সম্রাটের লিখিত পত্র সালাহুদ্দীনের নিকট পৌঁছে। এ পত্রে তিনি জার্মান বাদশাহর পক্ষ থেকে নিজের ওজর পেশ করেন। তিনি বলেন যে, সে নিজের ইচ্ছায় দেশ অতিক্রম করেনি। তার অধীনে প্রচুর সৈন্য থাকার কারণেই অতিক্রম করেছে। তারা সুলতানকে এই সুসংবাদ দেয়া যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিটি স্থানে ধ্বংস করবেন। বাস্তবে হয়েছেও তাই। সুলতানকে তিনি জানান যে, মুসলমানদের জন্যে রোমে জুম'আর সালাত আদায় করা ও খুতবা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। সুলতান সম্রাটের দূতদের সাথে খতীব ও মিম্বর পাঠিয়ে দেন যে দিন তারা সম্রাটের নিকট পৌঁছে সে দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সম্রাটের এ পদক্ষেপ ছিল সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এভাবে জুম'আ ও খুতবার প্রচলন হয়ে যায়। তিনি আরববাসী খলীফার জন্য দুআ করেন। এ সময় থেকে সেখানে মুসলমান ব্যবসায়ী। মুসলিম বন্দী ও মুসাফিরগণ সমবেত হতে থাকে। সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্যে নির্দিষ্ট।

পরিচ্ছেদ

সুলতান সালাহুদ্দীনের নিয়োগকৃত আক্কার ব্যবস্থাপক আমীর বাহুউদ্দীন কারাকুশ শা'বান মাসের প্রথম দশকে সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট প্রেরিত এক পত্রে জানান যে, শহরে খরচ চালাবার জন্যে মওজুদকৃত রসদ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। যা কিছু আছে তা দ্বারা শা'বান মাসের অর্ধেক পর্যন্ত চালান যাবে। সুলতানের নিকট এ পত্র যখন পৌঁছে তখন তিনি একে এমনভাবে

গোপন করলেন যেমন নবী ইউসুফ ভাইদের নিকট পরিচয় দিতে নিজেকে গোপন রেখেছিলেন। তাদের কাছে প্রকাশ করেননি। তিনি আশংকা করছিলেন যে, এ কথা প্রকাশ হয়ে গেলে দুশমনদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন তারা মুসলমানদের উপর হামলা করতে উদ্যোগ নিবে এবং এতে মুসলমানদের মন দুর্বল হয়ে পড়বে। সুলতান মিশরের নৌ-বাহিনীর আমীরের নিকট খাদ্য রসদসহ আককায় আসার জন্যে পত্র দেন। প্রস্তুতি নিয়ে তার বের হতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অবশেষে সেখানে থেকে তিনটি জাহাজ শাবন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আক্কায় এসে পৌঁছে। এতে যে পরিমান খাদ্য রসদ ছিল তা শহরবাসীদের গোটা শীতকালের জন্যে যথেষ্ট ছিল। হাজিব লুলুর দায়িত্বে এটা ন্যস্ত ছিল। জাহাজ তিনটি যখন শহরের কাছাকাছি আসে তখন ফিরিংগীদের যুদ্ধজাহাজ সে দিকে ধাবিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেগুলোকে শহরে আসতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং তাতে যা কিছু আছে তা ধ্বংস করে দেয়া হয়। ফলে সমুদ্রের মধ্যে উভয় পক্ষের জাহাজের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মুসলমানরা স্থলে থেকে জাহাজের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মুসলমানরা স্থলে থেকে জাহাজের নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহর নিকট কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে দু'আ করতে থাকে। ফিরিংগীরাও সমুদ্রে ও স্থলে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে মানুষের শোরগোল বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের জাহাজও লোকে নিরাপদে রাখেন। বাতাস মুসলমানদের জাহাজের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। ফলে সেগুলো কুলের দিকে ধাবিত হয় এবং গোটা বন্দর ঘিরে ফিরিংগীদের যেসব যুদ্ধ জাহাজ ছিল সেগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর মুসলমানদের জাহাজ নিরাপদে ও অক্ষতভাবে শহরের কাছে চলে আসে। শহরবাসীরা ও সৈনিকগণ দারুণভাবে খুশী প্রকাশ করে।

এই তিন জাহাজের পূর্বেই সুলতান সালাহুদ্দীন বৈরুত থেকে বিশাল একটি জাহাজ খাদ্যভর্তি করে প্রেরণ করেন। এতে ছিল বড় বড় চারশটি বস্তা। বস্তার মধ্যে রাখা হয়েছিল পানীর, চর্বি, গোশতের টুকরা ও প্রচুর পরিমাণ নুফাত তেল। এ জাহাজটি ইতিপূর্বে গণীমত হিসেবে ফিরিংগীদের থেকে মুসলমানদেরকে হাতে আসে। এ জাহাজে যেসব ব্যবসায়ী লোক ছিল তাদেরকে ফিরিংগীদের পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দেয়া হয়। তারা অনুরূপ পোশাক পরিধান করা ছাড়াও দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলে, গলায় যুন্নার বাঁধে এবং জাহাজের মধ্যে কয়েকটি শুকরও সাথে নিয়ে আসে। এগুলো নিয়ে তারা তাদের জাহাজটিকে ফিরিংগীদের জাহাজের পাশা দিয়ে অতিক্রম করে। ফিরিংগীর বিশ্বাস করল এরা তাদেরই লোক। তীর ফেলে ধনুক থেকে দুত গতিতে সামনে ছুটে। তেমনি দ্রুত গতিতে এ জাহাজটি সম্মুখে অগ্রসর হয়। ফিরিংগীরা তাদেরকে শহরের পাশে বন্দরের দিক থেকে কোনো ধ্বংসাত্মক তৎপরতার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। তারা আপত্তি জানিয়ে কাল যে, তাদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে তাদের পক্ষে জাহাজের গতিরোধ করাও সম্ভব ছিল না। এভাবে অব্যাহত চেষ্টার ফলে অবশেষে তারা বন্দরে প্রবেশ করে। এরপর সেখানে ফিরিংগীদের সেসব রসদপত্র ছিল তা সব পানিতে ডুবিয়ে দেয। যুদ্ধ হচ্ছে কলা। কৌশল (اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ) জাহাজটি বন্দরের তীরে ভিড়ে মাল খালাস করে দেয়। বন্দরের প্রশস্ত সমতল প্রাঙ্গন মালামাল ভরে যায়। এ খাদ্য তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল। এরপর মিশরীয় জাহাজ তিনটিও তাদের আয়ত্ত্বে নিরাপদে পৌঁছে যায়।

দুটি দূর্গ আককা শহরকে ঘিরে রেখেছিল। এর একটি নাম দাইয়ান। ফিরিংগীরা এক বিশাল জাহাজ নির্মাণ করে। এ জাহাজে স্থাপন করা হয় লম্বা শুড়। এতে ছিল চাকা লাগানো ও ঘুরাবার ব্যবস্থা। তারা যখন একে কোণ প্রাচীর বা দুর্গের উপর রাখার ইচ্ছা করত তখন একে ঘুরিয়ে নন্দত। ফলে সেখানে ইচ্ছা করত সেখানেই পৌঁছে যেত। এ জাহাজের ব্যাপারে মুসলমানরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ঐ জাহাজে আগুনের হলকা পাঠিয়ে দেন। ফলে জাহাজটি আগুন লেগে জ্বলে যায় এবং পানিতে ডুবে যায়। এই আগুনে জ্বালার পশ্চাতে কারণ ছিল। তা হচ্ছে ফিরিংগীরা জাহাজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ নুফাত তেল এবং বহু কাঠ বোঝাই করে রাখে। এই জাহাজের পেছনে ছিল আর একটি জাহাজ যার সম্পূর্ণটাই ছিল কাঠবোঝাই। মুসলমানরা বন্দর রক্ষার্থে কাঠের জাহাজের উপর নুফাত নিক্ষেপ করে। ফলে তাতে আগুন ধরে যায়। এ জাহাজটি তখন মুসলমানদের জাহাজ এলাকায় চলাচল করছিল। নুফাত ছড়িয়ে পড়ে অপর জাহাজও আগুন লেগে যায। এই জাহাজে ছিল তাদের অধিনায়ক কাবু। এরপর ফিরিংগীরা দাইয়ান প্রাচীরের উপর তাদের নুয়াত নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে তা উল্টো তাদের উপর ফিরে আসে। কারণ, ঐ রাতে প্রচণ্ড ঝড় হয়। তাদের জাহাজের উপর জ্বলন্ত আগুন ফিরে আসলে তা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এ আগুন তাদের অপর জাহাজটিতে সম্প্রসারিত হলে তা পুড়ে যায় এবং ডুবে যায়। এ আগুন তাদের সৈন্যবাহিনীর জাহাজে লেগে তাও ধ্বংস হয় এবং ভিতরে যত লোক ছিল সবই মারা যায়। তাদের দৃষ্টান্ত হয়ে যায় পূর্ববর্তী আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তাদের ন্যায় যেমন আল্লাহর বাণী يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ। তারা ধ্বংস করে ফেলল নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও (হাশরঃ ২)।

পরিচ্ছেদ

এ বছর রমযান মাসের তিন তারিখে শহরে ফিরিংগীদের বিরুদ্ধে অবরোধ কঠোর করে দেয়া হয়। অবশেষে তারা পরিখার মধ্যে নেমে আসে। শহরের অধিবাসীরা তখন তাদের উপর হামলা চালিয়ে বহু লোক হত্যা করে। তারা ভিতরের গো্া ও প্রাচীর জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আগুন ছাদ-পর্যন্ত উঠে যায়। আগুনের বিশাল উঁচু শিখা উর্ধ্ব আকাশে পৌঁছে যায়। পরে মুসলমানরা লোহার শিকলের কাটা দিয়ে সেগুলোকে টেনে আনে এবং তার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালে কয়েকদিন পর্যন্ত পানি ঢালার পর তা ঠাণ্ডা হয় সেখান থেকে একশ হন্দর (ফিনতার) লোহা মুসলমানদের হাতে আসে। রমযানের আটাশ তারিখে ইরবালের শাসক মালিক যায়নুদ্দীন ইনতিকাল করেন। তখন তিনি সুলতানের সাথে আককার অবরোধে ছিলেন। যৌবন বয়সে এই দুর বিদেশে এমন একজন দানশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে জনগণ দারুণভাবে বিলাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করে। তার ভাই মুযাফফারুদ্দীন ভীষণ কষ্টবোধ করেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনিই সে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এর সাথে শাহারযোর, হারবান, রাহা ও সামিসাতসহ আরও কয়েকটি শহর সংযুক্ত করে দেয়ার জন্যে তিনি সালাহুদ্দীনের নিকট প্রার্থনা করেন। সালাহুদ্দীন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তিনি তার জন্যে শাহী– ফরমান জারি করেন ও পৃথক পতাকা

নির্ধারণ করেন। আর তিনি যা ত্যাগ করে গেছেন তা সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিকুল সুগাফার তাকিয়ুদ্দীনকে দিয়ে দেন।

পরিচ্ছেদ

কাযী আল ফাগ্রিল মিশরে অবস্থান করে শাহী কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। সুলতানের মাল সম্পদের প্রয়োজন হলে তিনি তার ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি যুদ্ধজাহাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন ও রাজকীয় চিঠিপত্র লিখতেন। একটি পত্রে তিনি লিখেন এই অবরোধ এত দীর্ঘ হওয়ার কারণ হল পাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ও ব্যাপক হারে মানুষের হারাম কাজে জড়িয়ে পড়া, কেননা আল্লাহর নিকট যা আছে তা তার আনুগত্য ব্যতীত লাভ করা যায় না। তার নিকট প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাঁর নির্দেশ পালন ব্রতীত সংকট থেকে বর্ণ সম্ভব নয়। সুতরাং অবরোধ কেন দীর্ঘ হবে না যখন সর্বত্র পাপাচার বিরাজ করছে। আল্লাহর নিকট যা কিছু পৌঁছাচ্ছে তার পরে তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর কিছুরই আশা করা যায় না। ঐ পত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আমি জানতে পেরেছি যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে অপরাধ ও অশ্লীলতা অনেক বেড়ে গেছে। ঐ শহরে যুলুম অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে- যার ক্ষতিপূরণ বহু চেষ্টা সাধনা ছাড়া সম্ভব হবে না।

আর একিট পত্রে লিখেন : আমরা নিজদের উদ্যোগেই এখানে এসেছি। যদি আমরা সত্যপথ অনুসরণ করি তা হলে আল্লাহ শীঘ্রই আমাদের সত্যানুসরনের শুভ পরিণতি দান করবেন। আমরা যদি তার আনুগত্য করি, তা হলে শত্রুদের চাপিয়ে দিয়ে আমাদের শাস্তি দিবেন না। আল্লাহর হুকুম গুলো যদি আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী পালন করি, তা হলে তিনি আমাদেরকে এমন কাজ করিয়ে দিবেন যা তার সাহায্য ব্যতীত করার সামর্থ্য আমাদের নেই। সুতরাং কেউ যদি বিতর্ক বা বিরোধিতা করতে চায়, তা হলে তার নফস ও কাজের সাথে বিরোধিতা করে। আপন প্রতিপালক ছাড়া কারও কাছে কিছু পাওয়ার আশা করবে না। সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য উপায় উপকরণের প্রাচুর্যতা নিয়ে গর্ব অহংকার করা যাবে না। যুদ্ধে জয় লাভের জন্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। এমন কথা বলা যাবে না যে অমূক বীরযোদ্ধা থাকলে আমাদের জয় হত। এসব কর্মনীতি ও চিন্তাধারা মানুষকে আল্লাহর সাহায্যে থেকে বিমুখ করে দেয়। তাঁর থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না। অথচ সাহায্য একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারও থেকে পাওয়া যায় না। ঐ দিকে আল্লাহ আমাদেরকে সোপর্দ করেন কিনা সে ব্যাপারে আমরা একেবারে নিরাপদ নই। সাহায্য তাঁর কাছেই কাম্য এবং দয়া মেহেরবাণী তার থেকে পাওয়ার আশা। আমরা সবাই আল্লাহর নিকট আমাদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের দু'আর পথ যদি বন্ধ হয়ে না যায়, তা হলে দু'আর জবাব অবশ্যই আসবে। আল্লাহর ভয়ে ভীত বান্দারা অশ্রু দ্বারা সিক্ত হবে। আমাদের সকলের অভিভাবকের জীবনকে আল্লাহ তার পূর্বের ও বর্তমানের ফয়সালায় মঙ্গলময় করুন।

তৃতীয় আর এক পত্রে তিনি সুলতানের জন্যে দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। কেননা, তিনি হৃদয়ে কঠিন বেদনা অনুভব করেন যার প্রতিক্রিয়ায় তার শরীরে দুর্বলতা নেমে আসে। আল্লাহ তার পবিত্র বাণীর সাহায্যে তাকে সুস্থতা করে দিন। তিনি বলেন, আমাদের অভিভাবক

সুলতানের দেহে যে দুর্বলতা আছে তা এই গোলামের নিজের দেহে দিয়ে তাকে ভাল করে দিন। তার এই কথার বিনিময় আল্লাহ তাকে দান করুন। কেননা, সুলতান হচ্ছে আমাদের হৃদয়। আমরা আমাদের চক্ষু, বর্ণ তার জন্যে উৎসর্গ করছি। এরপর তিনি কবিতায় বলেন–

بنا معشر الخدام ما بك من اذى * وان اشفقوا مما اقول فبى وحدى

অর্থাৎ আপনার শরীরের উপর দিয়ে যে কষ্ট যাচ্ছে সে কষ্ট আমাদের সকল খাদিমের উপর আসুক। আমি যা বলছি এতে যদি অন্যান্য খাদিমরা ভয় পায় তা হলে সব কষ্ট কেবল আমার একার উপরই হোক।

রাওয়াতায় গ্রন্থকার শায়খ শিহাবুদ্দীন এ আলোচনা করতে গিয়ে কাযী আল কামিল কর্তৃক সুলতানের নিকট লিখিত অনেকগুলো পত্রের উল্লেখ করেছেন পত্রগুলোর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল্য সৌন্দর্যমণ্ডিত। উপদেশ ও নীতিকথায় পরিপূর্ণ ও জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ। উপদেশ ও নীতিকথায় পরিপূর্ণ ও জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ সম্বলিত। একজন মানুষ হয়ে এত উন্নত ভাষা বলায়। একজন ওযীর হয়ে এত ভাল উপদেশ দেয়ায় ও এমন জ্ঞানগর্ভ কথা বলায় আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

পরিচ্ছেদ

কাযী আল ফাযিল সুলতান সালাহুদ্দীনের পক্ষে মরক্কোর বাদশাহ আমীরুল মুসলিমীন ও সুলতানু জায়শিল মুওয়াহহিদীন ইয়া'কুব ইবন ইউসুফ ইবন্ আবদুল মু'মিনের নিকট এক পত্র লিখেন। এ পত্রের মাধ্যমে তিনি ফিরিংগীদের যুদ্ধজাহাজের মুকাবিলায় মুসলমানদের সাহায্যার্থে কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ সমুদ্র পথে পাঠাবার অনুরোধ জানান। পত্র ছিল অনেক দীর্ঘ। ভাষা অত্যন্ত কোমল প্রাঞ্জল ও অলংকার সজ্জিত্ আবু শামাতার গ্রন্থে পত্রটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পত্রের সাথে সুলতান সালাহুদ্দীন মুল্যবান উপহারও প্রেরণ করেন। আমীরুল কবির শামসুদ্দীন আবুল হাযম ইবন আবদুর রহমান ইবন মুনকিযের মাধ্যমে এ পত্র প্রেরণ করেন। যিলকাদ মাসের আট তারিখে পত্র নিয়ে তিনি সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। যিল-হাজ্জ মাসের বিশ তারিখে তিনি বাদশাহর নিকট পৌছেন। পাঁচশ অস্টাশি সালের মুহাররাম মাসের দশ তারিখ আশুরা পর্যন্ত তিনি তার নিকট অবস্থান করেন। কিন্তু এই পত্র প্রেরণ কোনই কাজে আসেনি। কারণ তাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন না করায় তিনি ক্রোধান্বিত হন। অবশ্য কাযী আল ফাযিল প্রথমেই তার কাছে পত্র প্রেরণ না করতে ইংগিত দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় যা হবার তাই হয়েছে।

পরিচ্ছেদ

এ বছর অনেকগুলো অনাকাঙ্খিত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ায় নাসির সালাহুদ্দীনের স্বভাব প্রকৃতিতে খানিকটা অস্বস্তিকর ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে পরাজিত শত্রুরা ইসলামের চৌহদ্দির

---

১. আককা অবরোধ যুদ্ধের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরিংগীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে প্রায় দশ হাজার ফিরিংগী নিহত হয়। সুলতানের নির্দেশে লাশগুলো সেই নদীতে নিক্ষেপ করা হয় যে নদীর পানি ফিরিংগীরা পান করত। লাশের দুর্গন্ধে বায়ু ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে অস্বস্তিভাব দেখা দেয়। সালাহুদ্দীন ও একই অবস্থায় শিকার হয়ে কালঙ্গে রোগে আক্রান্ত হন। আমীর উমরা তাকে ঐ স্থান ত্যাগ করার পরামর্শ

মধ্যে প্রবেশের সাহস পায়। তাদের একদল সম্মুখ সমরে সসরে থাকে এবং অন্যরা অবরোধে এবং সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। সুলতান তখন মুসলিম বাহিনীকে মায়মাথা (ডা), মায়সারা (বাম) কলব (মধ্যভাব) ও জানাহায়া (দুই বাহু) এই পাঁচ ভাগে বিভক্তি করেন। শত্রুরা যখন মুসলিমবাহিনীকে এই বিশাল আকৃতিতে দেখল তখন তারা পলায়ন করে। এ সময় মুসলমানদের হাতে তাদের বিরাট সংখ্যক লোক নিহত হয়।

পরিচ্ছেদ

যখন শীতকালের আগমন হন এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শ্রোতে ধ্বংসের ভয়ে ভীত হয়ে ফিরিংগীদের যুদ্ধজাহাজগুলো দ্রুত চলে যায় তখন শহরের মুসলমানরা সুলতানের নিকট তাদের বিশ্রাম যাওয়ার অনুমতি দানের আবেদন জানায়। কেননা দীর্ঘ দিনের অবরোধও দিনরাত যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে ছিল। তাই তাদের স্থলে অন্য লোক দেয়ার জন্যে তারা প্রার্থনা জানায়। তাদরে কথা শ্রবণ করে সুলতানের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে পরিবর্তন করে দিতে দৃঢ়ভাবে সংকল্প করেন। সাধারণ সৈনিক ও তাদের পরিচালক মিলে এদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। তাদের স্থলে সুলতান অন্য লোক নিযুক্ত করেন। তবে এরূপ করাটা তার জন্যে উত্তম হয়নি। অবশ্য সুলতান কল্যাণের চিন্তা করেই এরূপ করেন। যারা নতুন ভাবে শহরে আসল তারা অধিক উদ্যোগ সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রবেশ করে। পূর্বের লোকদের তুলনায় এরা ছিল অধিক শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশে। তবে এদের পূর্বে যারা শহরে ছিল এবং বর্তমানে বেরিয়ে গেছে তারা শহরের মধ্যে যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিল। তারা ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও প্রত্যয় দীপ্ত। তারা শহরে থাকার জন্যে এক বছরের খাদ্য ও খরচ দেয়ার আবেদন করেছিল। কিন্তু শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে সে বরাদ্ধ বাতিল হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে মিশর থেকে একটি জাহাজ আসে। তাতে শহরবাসীদের পূর্ন এক বছরের খাদ্য রসদ ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর ফয়সালা তখন এগিয়ে আসে। পূর্বের ও পরের সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তের মালিক একমাত্র তিনিই। কেননা জাহাজটি যখন সমুদ্রের মধ্যভাগ থেকে বন্দরের কাছাকাছি আসে তখন তার উপর দিয়ে এক বিরাট ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয। হাওয়ার কবলে পড়ে জাহাজটি উল্টো দিকে ঘুরে যায়। বিশাল আকৃতি হওয়া সত্ত্বেও বাতাস তাকে দুর্বল করে ফেলে। ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে ঘুরপাক খেতে থাকে। অবশেষে বারবার ধাক্কা খেয়ে জাহাজটি ফেটে যায় এবং সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যায়। জাহাজে যত খাদ্য রসদ ও মাঝি মাল্লা ছিল সবই পানিতে ডুবে যায়। এ ঘটনার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধরণের দুর্বলতা দেখা দেয়। অবস্থা আরও কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। সুলতান আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর রোগ আরও বেড়ে যায়। অবস্থা যতই জটিল হোক; মুমিনদের বিশ্বাস তো এটাই যে, আমরা আল্লাহর হুকুম মানার জন্যে সৃষ্টি হয়েছি। আর তার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। এ

দেন। ডাক্তারগণও এ মত সমর্থন করেন। সুলতান তাতে সম্মত হয়ে সৈন্যদলসহ খারুবায চলে যান। তিনি যখন ঐ স্থান ছেড়ে যান এবং তার সৈন্যদেরকেও নিয়ে যান। তখন ফিরিংগীরা সুযোগ পেয়ে বসে। তারা আক্কায় ছড়িয়ে পড়ে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে আককা অবরোধ করে (দ্র. ইবনুল আছীর ও ইবনে খালদুন।)। আবুল ফিদা বলেন, সুলতানের পেটে পীড়া ও নাড়িতে ঘা দেখা দেয়। তখন তিনি দূরে যেয়ে একটি ছোট শিবিরে অবস্থান করেন।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুরা শহর আক্রমণ করার সুর্বণ সুযোগ লাভ করে। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি কিছুই করতে পারে না। এ ঘটনা এ বছরের যিলহাজ্জ মাসে সংঘটিত হয়। আক্কায় নতুন প্রবেশকারী বাহিনীর প্রধান ছিলেন আমীর সায়ফুদ্দীন আলী ইবন আহমদ ইবন মাশাতূব।

এ বছর যিলহাজ্জ মাসের সপ্তম দিনে আক্কা শহরের প্রাচীর গাত্রের একটির বড় অংশ ধসে পড়ে। ফিরিংগীরা সুযোগ দেখে ঐ ফাঁক দিয়ে ভিতরে প্রবেশের জন্যে অগ্রসর হয়। মুসলমানরা তাদের আক্রমণ ঠেকাতে প্রাচীরের ফাঁকা স্থানে দাঁড়িয়ে বক্ষ পেতে দেয় এবং বুক পেতে সেখান থেকে তারা যুদ্ধ করতে থাকে। শত্রুদের তারা অবিরামভাবে প্রতিহত করতে থাকে এবং অন্যদিকে প্রাচীর পুনঃনির্মানের কাজ চালাতে থাকে। এভাবে প্রাচীর পূর্বের তুলনায় অধিক মজবুত শক্ত ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে এ বছর এক ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়। এ প্রসংঙ্গে সুলতান বলেছিলেন–

اقتلونی ومالکا * واقتلوا مالکا معی[১]

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে হত্যা কর এবং মালিককেও। আর তোমরা মালিককে হত্যা কর আমার সাথে।

এ বছর যিলহজ্জ মাসের দুই তারিখে আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত জার্মান সম্রাটের পুত্র[২] বান্দাহারিয়ার উচ্চ পদস্থ একদল এবং অভিশপ্ত ফিরিংগীদের কতিপয় নেতা মৃত্যুবরণ করে। মালিকুল আলমানের পুত্রের মৃত্যুতে ফিরিংগীরা অত্যন্ত ব্যথিত হয় ও শোক প্রকাশ করে। প্রতিটি তাঁবুর সামনে তারা এ উপলক্ষে বিরাট আগুনের কুণ্ডলি তৈরি করে। ফিরিংগীদের মধ্য থেকে প্রতিদিন একশ দুইশ লোক মারা যেতে থাকে। অবরোধের কষ্ট ও ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে ফিরিংগীদের একটি দল সুলতানের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। অবশিষ্টদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ বছরের মধ্যেই কাযী আল-ফাযিল মিশর থেকে এসে সুলতানের সাথে সাক্ষ্য করেন দীর্ঘদিন যাবৎ উভয়েই পারস্পারিক সাক্ষাতের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। এ সাক্ষাতে প্রত্যেকেই পারস্পারিক মত বিনিময় করেন এবং মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের বিষয়ে পরামর্শ করেন। এ বছর যে সব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের বিবরণ

জার্মান সম্রাট

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে আগমন করেন কিন্তু পথে পথে তাদের প্রায় সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। ফিরিংগীদের নিকট যখন এসে পৌঁছেন তখন তার সাথে ছিল মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য কারও মতে দুই হাজার সৈন্য। তিনি ইসলামকে ধ্বংস করতে এবং মুসলমানদের হাত থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন। তার ধারনামতে এটাই ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রকৃত বিজয়। আল্লাহ তাকে

---

১. এ কবিতাটি আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের বলেছিলেন। জামাল যুদ্ধে তারও মালিখ ইবন হারিছ অর্থাৎ, আশতারের মধ্যে যুদ্ধ হয়। মালিক ছিল আলীর দলভুক্ত। যুদ্ধে একবার আবদুল্লাহ মালিককে আর একবার মালিক আবদুল্লাহকে নীচে ফেলে বুকের উপর চড়ে। বার বার এ রকম হতে থাকলে ইবন যুবাযর এ কবিতা বলেন : اقتلانی ومالکا * واقتلا مالکا معی

২. পুত্রে নাম ফারদারিক দাওক সাওয়াবিয়া (ইবনে মালিকুল আলমান)।

পানিতে ডবিয়ে ধ্বংস করেন। যেভাবে তিনি ধ্বংস করেছিলেন ফিরআওনকে। তার মৃত্যুর পরে তার কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যেল সম্রাট বানানো হয়। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে ফিরিংগীদের নিকট আসেন। ফিরিংগীরা তখন আক্কার অবরোধের মধ্যে ছিল। এরপর তিনিও এ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং প্রশংসা ও দয়া মেহেরবাণীর মালিক আল্লাহই।

মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ

আবু হামিদ কামালুদ্দীন শূহারমূরী আশ শাফিঈ। মাওসিলের কাযিউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। আমজাদ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

قامت باثبات الصفات ادلة * قصمت ظهور ائمة التعطيل
وطلائع التنزيه لما اقبلت * هزمت ذوى التشبيه والتمثيل
فالحق ما صرنا اليه جميعنا * بادلة الاخبار والتنزيل
من لم يكن بالشرع مقتديا فقد * القاه فرط الجهل فى التضليل

অর্থাৎ, আল্লাহর সিফতাও গুণাবলী অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী দলের ইমামদের আত্ম প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ মাখলুকের সমস্ত দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার রৌশনী যখন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে তখন আল্লাহর সাথে বান্দা তাশবীহ ও তাসছিল। (সাদৃশ্য) পেশ কারীরা ও পলায়ন করেছে। আমরা জমহুরে উম্মাত) সবাই যে দিকে দিয়েছি সেটাই সত্য ও সঠিক। কেননা, এটা হাদীস ও কুরআনের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। শরীয়আতের বিধি-বিধান মানার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির কোন মুকতাদা বা অনুসরণ যোগ্য ইমাম না থাকে চরম মূর্খতা তাকে ভ্রষ্ট পথে নিক্ষেপ করে।

পাঁচশ সাতাশি সালের আগমন

এ বছর ফ্রান্স ও ইংলেন্ডসহ সমুদ্র তীরের অন্যান্য ফিরিংগীদেশের রাজা বাদশাহগণ আক্কায় তাদের স্বজাতি ফিরিংগীদের নিকট আগমন করে। তারা এ বছরেই আক্কা দখল করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালায়। এ বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে। এ বছর যখন শুরু হয় তখন আক্কায় উভয় পক্ষের কঠোর অবরোধ চলে। দুশমনদের শহরে প্রবেশ করা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে যায়। মালিকুল আদিল সমুদ্র তীরের কাছে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন যাতে তারা সম্পূর্ণভাবে শহরে প্রবেশ করে এবং তাদের খাদ্য রসদও প্রবেশ করে। এ বছরে রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখে মুসলমানরা আককা থেকে বের হয়ে ফিরিংগীদের শিবিরে হামলা চালায়। তারা তাদের অনেক লোক হত্যা করে। অনেককে বন্দী করে এবং বহু মালপত্র গণীমত হিসেবে নিয়ে আসে। তারা বারজন মহিলাকেও বন্দী করে আনে। এ সময় ফিরিংগীদের একটি বড় জাহাজ ভেংগে যায়। ফলে তার মধ্যে যা কিছু ছিল সবই পানিতে ডুবে যায়। যারা অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে মুসলশানরা বন্দী করে নিয়ে যায়। হিমসের শাসক আসাদুদ্দীন ইবন শিরকুহ ত্রিপোলী এলাকায় ফিরিংগীদের গবাদি পশুর উপর হামলা চালিয়ে সেখান থেকে বহু সংখ্যক ঘোড়া, গরু ও মেষ দরে নিয়ে আসেন। বহু ফিরিংগাদের ওপর হামলা

করে জয় লাভ করে এবং তাদেরকে হত্যা করে। মুসলমানদের মধ্যে একজন ছোট বালক ব্যতীত আর কেউ মারা যায়নি। তাও যুদ্ধক্ষেত্রে নয় বরং তার ঘোড়া পা পিছলে পড়ে গেলে তার মৃত্যু ঘটে।

রবিউল আউয়ালের বারো তারিখে অভিশপ্ত বিতাড়িত ক্রুশ্ পূজারী ফ্রান্সের সম্রাট প্রায় পাঁচখানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আক্কায় পৌছেন। তিনি যখন এখানে এসে পৌছেন ও তাদের সম্মুখে আসেন তখন ফিরিংগীদের কোন রাজা-বাদশাহ তার সাথে কথা বা মত প্রকাশে সাহস পায়নি। কেননা তিনি ছিলেন তাদের সবার কাছে অতি সম্মানিত ও মহান ব্যক্তি। তার সাথে বিরাট আকারের এক শক্তিশালী ও ভয়ানক বাযপাখি আসে। এক পর্যায়ে পাখিটি তার হাত থেকে উড়ে যেয়ে আক্কা শহরের প্রাচীরের উপর বসে। শহরবাসীরা পাখিটি ধরে সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ফিরিংগীরা তাকে ছাড়ায়ে আনতে এক হাজার দীনার বিনিময় দিতে চাইলে সুলতান অস্বীকার করেন। ফ্রান্সের সম্রাট আসার পর ফিরিংগীদের আর এক বড় বাদশাহ কায়দা পরিরও এখানে আগমন করেন। ইংলেন্ডের সম্রাটের প্রেরিত জাহাজ এসে পৌছে। তবে তাদের সম্রাট আসতে পারেননি। কারণ, তিনি সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে সেখানকার অধিবাসীদের উপর জিযিয়া ধার্য করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুসলিম দেশের প্রধানগণ ও বসন্তকালের প্রথম দিকে নিজ নিজ শহর থেকে যাত্রা করে পর্যাক্রমে মালিকুন নাসিরের খিদমতে আসতে থাকেন।

ইমাদ বলেন, মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোকের চুরি করার অভ্যাস ছিল। তারা প্রায়ই ফিরিংগীদের তাবুতে যেয়ে বিভিন্ন জিনিষ চুরি করে নিয়ে আসত। এমন কি সুযোগমত তারা বয়স্ক পুরুষ লোককেও চুরি করে নিয়ে আসত। একবার এক চোর তিন মাসের এক দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে দোলনা থেকে চুরি করে আনে। শিশুকে হারিয়ে তার মা পাগলিনীর মত হয়ে যায়। মহিলা তাদের রাজার কাছে অভিযোগ করে। তারা মহিলাকে বলল, মুসলমানদের সুলতান খুবই দয়ালু লোক। আমরা পরামর্শ দিচ্ছি। তুমি তার কাছে যাও এবং তোমার অভিযোগটি তাকে জানাও। ইমাদ বলেন, মহিলাটি সুলতানের নিকট যেয়ে তার অবস্থা বর্ণনা করল। মহিলার বক্তব্য শুনে সুলতানের কোমল হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। এমন কি তার চক্ষু থেকে অশ্রু নির্গত হতে থাকে। তারপর সুলতান শিশুটিকে হাজির করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, তাকে বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বিক্রির মুল্যটা ক্রেতাকে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুকে হাজির করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে শিশুটিকে হাজির করা হয়। মা তার শিশুকে গ্রহণ করে তখনই দুধ পান করতে দেয় এবং আনন্দ ও মহব্বতের অতিশয্যে কাঁদতে থাকে। এরপর সুলতান শিশুসহ মহিলাকে একটি অনুগত অশ্বের উপর উঠিয়ে তাঁর তাঁবুতে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দেন। আল্লাহ সুলতানের উপর রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করুন।

পরিচ্ছেদ

সুলতানের দখল থেকে শত্রুদের আক্কা অধিকার

জামাদিউল আউয়াল মাসে আল্লাহর অভিশপ্ত ফিরিংগীদের আককা শহরের অবরোধ কার্যক্রম অত্যন্ত জোরদার করে। দূর দুরান্ত দেশ থেকে এসে সম্মিলিতভাবে একযোগে এর উপর

চড়াও হয়। ইংল্যান্ডের সম্রাট বিরাট বাহিনী ও বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ হাজির হয়। পঁচিশটি জাহাজে সৈন্য ও মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে আসেন। এ সব বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা সীমান্তবর্তী লোকজন যে বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হয় তা বর্ণনাতীত। পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে তখন শহরব্যাপী ঢোল বাজিয়ে দেয়া হয়। এ ছিল শরহবাসীদের প্রতি সুলতানের বিশেষ সংকেত। তাই সুলতান ঢোল পিটিয়ে দিয়ে শহরের কাছাকাছি চলে আসেন। যাতে শহর থেকে তাদের তৎপরতাকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে আনা যায়। ফিরিংগীরা চতুর্দিক থেকে শহর ঘিরে রেখেছিল। শহর প্রাচীরের উপর সাতটি নিক্ষেপণ যন্ত্র মিনজানিক স্থাপন করেছিল। এগুলো দিয়ে রাত দিন তারা শহর অভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপ করত। বিশেষ করে আয়নুল বাকার দুর্গে অতি মাত্রায় পাথর বর্ষণ করে। ফলে দুর্গটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারা খননকৃত পরিখা ভরাট করতে শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে পরিখার মধ্যে মৃত জীব-জন্তু নিহতদের লাশ এবং যারা স্বাভাবিকভাবে মারা যেত তাদের মৃতদেহ এতে নিক্ষেপ করত অথচ ফিরিঙগীরা যেসব জিনিষ পরিখার মধ্যে ফেলছে, এগুলোকে শহরবাসীরা সমুদ্রে নিক্ষেপ করত।

ইংল্যান্ডের সম্রাট সমুদ্রের মধ্যে মুসলমানদের একটি বড় জাহাজ আটক করে। জাহাজটি খাদ্য রসদ, যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম বোঝাই করে বৈরুত থেকে আসছিল। এই সম্রাট চল্লিশটি নৌযান নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। সমুদ্র পথে আক্কা শহর অভিমুখী আগমণকারী কোনো কিছুকে তিনি বিনা বাধায় ছেড়ে দিতেন না। মুসলমানদের এই জাহাজে বাছাইকৃত ছয়শ বীরযোদ্ধা ছিল। তারা সবাই এখানে শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তাদের মৃত্যুর ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক্ কেননা ফিরিংগারা যখন সমুদ্রের মধ্যে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। তখন তারা দেখল। আমাদের পরিণতি দুই অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটি নিশ্চিতভাবে হবে। হয় ডুবে মরতে হবে না হয় ওদের হাতে নিহত হতে হবে। এসব দিক চিন্তা করে তারা নিজেদের জাহাজের চারপাশে ছিদ্র করে দেয়। ফলে পানি উঠে জাহাজটি সমুদ্রে ডুবে যায়। ফিরিংগীরা এখান থেকে খাদ্যরসদ বা যুদ্ধাস্ত্রের কিছুই নিতে পারেনি। এ ঘটনার পর মুসলমানরা অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতের মধ্যে পড়ে যায। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তবে আল্লাহ অন্যভাবে প্রতিশোধ নিয়ে এই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে দেন। তা-ই এইভাবে যে মুসলমানরা এই দিন ফিরিংগীদের একটি বড় দাবাবা ট্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত সে যুগের এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র আগুন দ্বারা পুড়িয়ে ফেলে। ঐ দাবাবাটি ছিল চারতলা বিশেষ। প্রথম তলা কাঠের। দ্বিতীয় তলা শিশার তৃতীয় তলা লোহার এবং চতুর্থ তলা তামা দ্বারা নির্মিত। দাবাবাটি প্রাচীরের দিকে তাক করে স্থাপিত ছিল এবং এর ভিতরে যোদ্ধারা অবস্থান করছিল। এ দাবাবার ভয়ে শহরের লোকজন বিচলিত হয়ে উঠে এবং দারুণ উৎকণ্ঠ বোধ করে। তাদের পেরেশানী এমন পর্যায়ে পৌছে যে এর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে তারা ফিরিংগীদের কাছে আত্মসর্ম্পণ করে শহর ছেড়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়। অবশেষে আল্লাহ মুসলমানদেরকে দুশ্চিন্তামুক্ত করেন এবং তাদের দ্বারা দাবাবা জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে তারা দাবাবা ঐ দিন জ্বালিয়ে ফেলতে সঙ্গম হয় যে দিন মুসলমানদের উপরোল্লিখিত জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। এরপর শহরবাসীরা তাদের উপর দীর্ঘ অবরোধ এবং এর কারণে কৃষ্ট দুঃখ কষ্টের কথা অভিযোগ আকারে সুলতানের নিকট জানায়। ইংল্যান্ডের অভিশপ্ত সম্রাট যখন থেকে এসেছে তখন থেকেই

এই কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করে। এসব কিছু সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের সম্রাট রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ফ্রান্সের সম্রাট আহত হন। কিন্তু এতে তারা নরম না হয়ে আরও কঠোর বেপরোয়া ঔদ্ধত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সম্রাট মারাকিস তাদেরকে ত্যাগ করে নিজ শহর সূরে চলে যান। এই ভয়ে যে না জানি তারা তার দখল থেকে সে দেশও অধিকার করে নিয়ে যায় কিনা।

এ সময় ইংল্যান্ডের সম্রাট সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট বার্তা পাঠান যে, তার কাছে কয়েকজন আহত মুসলমান আছে। এদেরকে তিনি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। সুলতানের নিকট তিনি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে চান। কিন্তু বর্তমানে তারা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় আছে। তাই ওদের জন্যে কিছু মুরগী ও পাখি পাঠিয়ে দিলে সেগুলো খেয়ে কিছুটা সবল হওয়ার পর প্রেরণ করা যাবে। সুলতান অবশ্য বুঝে নিলেন যে এগুলো তিনি নিজের জন্যে চাচ্ছেন, আহতদের কথা বলছেন সৌজন্য রক্ষার্থে। তবুও সম্রাটের প্রার্থিত খাদ্য সামগ্রী সুলতান পর্যাপ্ত পরিমান পাঠিয়ে দেন। এরপর সম্রাট কিছু মাল ও বরফ পাঠিয়ে দিতে বললে সুলতান তাও পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তার সাথে এ সৌজন্যমূলক আচরণের কোনই সুফল হয়নি। বরং সম্রাট এগুলো খেয়ে সুস্থ হওয়ার পর আবার পূর্বের শত্রুতায় ফিরে যায় এবং দিনে ও রাত্রে বিরতিহীনভাবে অবরোধ কার্যক্রম চালিয়ে যায়। এরপর শহরবাসীরা সুলতানকে জানায় হয় আমাদের সংগে মিলে আগামী কালই কোনো ব্যবস্থা করা হোক, না হলে আমরা ফিরিংগীদের নিকট নিরাপত্তা চেয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হব। শহরবাসীদের এ চিন্তা-প্রস্তাব সুলতানকে আরও কঠিন অবস্থায় ফেলে দেয়। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, সিরিয়া মিশর ও সমস্ত উপকূলীয় শহর থেকে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র আককায় প্রেরিত হয। এই সাথে হিত্তীন ও কুদস বিজয়কালে প্রাপ্ত গণীমতের যুদ্ধাস্ত্রও পাঠানো হয়। এসব অস্ত্র হাতে পেয়ে সুলতান দুশমনদের উপর হামলা করার সংকল্প করেন। সকাল বেলা সৈন্যদের প্রস্তুত করে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, ফিরিংগীরা তাদের পরিখার পশ্চাতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। তাদের মধ্যে পদাতিক বাহিনী অশ্ববাহিনীর চারপাশে সারিবদ্ধ হয়ে প্রাচীর-নির্মাণ করেছে এরা এমনভাবে মানব বন্ধন সৃষ্টি করেছে যে দেখে মনে হবে এ একটি নিথর পাথর। এদের মধ্যে কিছুই প্রবেশ করবে না। এ অবস্থা দেখে তিনি ভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। কেননা তিনি জানতেন যে, তার সংকল্প বাস্তবায়নে তার সৈন্যরা পশ্চাৎপদ হবে এবং বীর যোদ্ধারা তার উপর ক্রোধান্বিত হবে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

এ দিকের অবস্থা যখন এই তখন অন্যদিকে শহরে অবরোধ কার্য গ্রহণ জোরদার করা হয়। ফিরিংগীদের পদাতিক বাহিনী পরিখায় প্রবেশ করে। তারা শহরের প্রাচীরে বড় ও ছোট যুদ্ধ পোশাক ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে যায় এবং তারা শহরে প্রবেশ করে। তখন মুসলমানরা বাঁধার সৃষ্টি করে এবং তাদের সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হয় লড়াইয়ে ফিরিংগীর ছয়জন নেতা নিহত হয়। এর ফলে মুসলমানদের প্রতি ফিরিংগীদের ঘৃণা ও ক্রোধ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। এ সময় রাতের আগমন ঘটলে উভয় দল যুদ্ধ বন্ধ করে আপন আপন স্থানে চলে যায়। রাত অতিবাহিত হওয়া ভোরবেলা মুসলমানদের নগর আমীর আহমদ ইবন মাশতুন নিজের স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রান্সের সম্রাটের সাথে মিলিত হন। তিনি শহর ছেড়ে দেয়ার

বিনিময়ে তার কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানান। সম্রাট তাৎক্ষণিকভাবে এর কোনো জবাব দেননি। তবে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার পর মাশতুবকে বলেন; তুমি নিরাপত্তার আবেদন করতে এসেছ। এমন উত্তর শ্রবণ করার পর মাশতুব সম্রাটকে কিছু কঠোর কথা বলে চলে আসেন। শহরে তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন তার মানসিক অবস্থা যে কি পরিমাণ বিপর্যস্ত ছিল তা কেবল আল্লাহই ভাল জানেন। নগর আমীর যখন শহরবাসীর নিকট সম্রাটের সাথে আলোচনার ফলাফল ব্যক্ত করেন তখন তারা ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়ে। যা কিছু ঘটে গেছে সে সম্পর্কে সুলতানকে অবগত করার জন্যে তারা তার নিকট লোক প্রেরণ করে। সবকিছু শুনে সুলতান শহরবাসীদের নিকট সংবাদ পাঠান যে, তারা যেন দ্রুত শহর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রতীরে চলে আসে এবং এই রাত অতিক্রম না করে। কোন মুসলমান যেন শহরে থেকে না যায়। কিন্তু শহরের অনেক লোকই মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং সে রাতে তারা আর বের হতে পারেনি। সকাল না হতেই ফিরিংগীরা দুজনে ছোট গোলামের কাছে থেকে এ সংবাদ জেনে যায়। সুলতান রাতের মধ্যে শহর ত্যাগ করার যে হুকুম দিয়েছিলেন তা এই গোলাম দুটি শুনে ফেলে এবং রাতেই পালিয়ে গিয়ে আপন জাতির নিকট ফাঁস করে দেয়। এ গোপন সংবাদ জানার পর ফিরিংগীরা সমুদ্রে নিশ্চিন্ত পাহারার ব্যবস্থা করে। ফলে শরহবাসীদের কারও পক্ষে সামান্যতম নড়াচড়া করাও সম্ভব হয়নি এবং বিন্দুমাত্র জিনিষও শহর থেকে বের করতে পারেনি। এই দুই গোলাম ছিল ফিরিংগীদের সন্তান। সুলতান তাদেরকে বন্দী করেছিলেন এবং তার নিকটই তারা বন্দী অবস্থায় ছিল।

সুলতান এই রাতে দুশমনদের উপর হামলা করার সংকল্প করেন। কিন্তু সৈন্যরা এ ব্যাপারে তার সাথে একমত হত পারেনি। তারা আরও বলল যে, আমরা মুসলিম সৈন্যদের সাথে নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারি না। যখন সকাল হল তখন তিনি ফিরিংগী বাদশাহদের নিকট এই শর্তে শহরবাসীদের নিরাপত্তা দেয়ার প্রস্তাব পাঠান যে, তার নিকট ফিরিংগীদের যত বন্দী আছে তার একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং অতিরিক্ত হিসেবে সালীবুস সালবূত ও তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু উল্লিখিত শর্তে তারা নিরাপত্তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলল নিরাপত্তা দেয়া যাবে যদি সুলতানের নিকট বন্দী থাকা সকল ফিরিংগীকে মুক্তি দেয়া হয়, উপকূলীয় যতগুলো শহর সুলতান দখল করেছেন সবগুলো শহর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর থেকে সুলতানের দখল প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কিন্তু সুলতান এতে রাজী হননি। এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বারবার যোগাযোগ হতে থাকে। অপর দিকে শহরের সমস্ত দুর্গে অবরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেক দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফাঁকা হয়ে যায়। মুসলমানরা এসব ফাঁকার অনেকটাই পুনঃনির্মাণ করে। ঐ সব স্থানের সীমানাগুলোরে তারা বুক পেতে বন্ধ করে রাখে। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। এসব স্থানে তারা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং শত্রুদের উপর হামলা চালায়। অবশেষে তারা শাহাদাতের শীতল শরবত পান করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা সুলতানের নিকট এ কথাগুলো লিখে দিয়ে যায় যে, হে আমাদের অভিভাবক! আপনি ঐসব অভিশপ্তদের নিকট নতি স্বীকার করবেন না যাদের নিকট আপনি আমাদের জন্যে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে তার সাড়া দিতে অস্বীকার করেছে। কেননা, আমরা মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে আল্লাহর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কাছেই আমাদের সাহায্য প্রার্থনা।

এ বছর জমাদিউস ছানী মাসের সাত তারিখ সমাগত। সময় তখন দুপুর বেলা। কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল শহরে কাফিরদের পতকা উড়েছে। তাদের ক্রুশ ও আগুন শহরের প্রাচীরের উপর স্থাপিত। ফিরিংগীরা এক ভয়ানক মুসীবতের দিন। মুওয়াহহিদ্দীন বা একত্ববাদীরা দুশ্চিন্তার সাগরে ভাসছে। মানুষের কথা কেবল ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলায়হি রাজিউন বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিরাট এক পেরেশানী ও কঠিন দুশ্চিন্তায় মানুষ একেবারে মুষড়ে পড়েছে। সুলতানের সেনাবাহিনীতে বিলাপ ও কান্নার রোল পড়ে গেছে। আল্লাহর অভিশপ্ত সম্রাট মারাকিস আবার আক্কায় প্রবেশ করেছে। সে তার দেশ সূর হতে অনেক উপহার উপঢৌকন নিয়ে এখানে প্রত্যাবর্তন করে এবং ফিরিংগী বাদশাহদেরকে প্রদান করে। সে ফিরিংগী বাদশাহদের চারটি পতাকা নিয়ে এই দিনে আক্কায় প্রবেশ করে। এরপর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেগুলো স্থাপন করে। তন্মধ্যে একটি স্থাপন করে জুম'আর দিন আযান দেয়ার স্থানে বা মিনারায়। আর একটি উড়ায় দুর্গের উপরে। তৃতীয়টি স্থাপন করে বুরজে দাবিয়ায় এবং চতুর্থটি স্থাপন করে বুরজে বিতালে। এসব স্থান থেকে সুলতানের পতাকা নামিয়ে তাদের পতাকা স্থাপন করে। শহরে যত মুসলমান ছিল তারা নগরীর এক প্রান্তে আটক অবস্থায় সমবেত হয়। তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং তাদেরকে সব দিক দিয়ে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মুসলমান নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয় এবং তাদের সমস্ত সম্পদ লূণ্ঠন করে নেয়া হয়। বীর যোদ্ধাদের কয়েদী করা হয় এবং সম্মানী লোকদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়। বস্তুত যুদ্ধ হচ্ছে পানি উত্তোলনের জেল স্বরূপ যা একবার এর হাতে আর একবার ওর হাতে চলে যায় (اَلْحَرْبُ سِجَالٌ) সর্ব অবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই।[১]

সুলতান এ সময় লোকদেরকে এ স্থানে আরও অবস্থান করার নির্দেশ দেন। তিনিও তার স্থানে অবস্থান করে লক্ষ্য করতে থাকেন যে, ফিরিংগীরা এরপর কি করে এবং ঘটনা কোন পর্যন্ত গড়ায়। এ দিকে ফিরিংগীরা তো শহরময় আনন্দ উল্লাসে মেতে আছে। কিছু দিন পর সুলতান সৈন্যদের কাছে যান। তখন তার মন কত যে বিষন্ন ছিল তা আল্লাহ ব্যতীত কেঈই জানে না। এর মধ্যে ইসলামী দেশসমূহ থেকে বাদশাহ আমীর ও প্রধানগণ এখানে এসে ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সুলতানকে সান্ত্বনা দেন। এরপর সুলতান সালাহুদ্দীন ফিরিংগীদের হাতে যে সব বন্দী ছিল তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে ফিরিংগী বাদশাহদের সাথে যোগাযোগ করেন। তখন ফিরিংগীরা সুলতানের নিকট তাদের যত বন্দী আছে তাদেরকে মুক্তি দিতে এক লক্ষ দীনার প্রদান করতে এবং সালীবুস সালবূত যদি বিদ্যমান থাকে তাও প্রদান করতে বলে। সুলতান নির্দেশ দিলে মাল ও সালীব২ হাজির করা হয় এবং অনধিক ছয়শ বন্দীকে মুক্ত করার জন্যে প্রস্তুত করা হয়। ফিরিংগীরা সুলতানকে অনুরোধ হালাল দূর থেকে তাদেরকে সলীবটা দেখাতে।

---

১ ইবনুল আছীর তার তারিখে বলেন: মাশতূব যখন দেখলেন যে, সালালুদ্দীন যখন কোন উপকার করতে পারছেন না এবং তাদের উপর হামলা প্রতিহত করতে পারছেন না, তখন তিনি ফিরিংগীদের কাছে যেযে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করেন যে, শহর ফিরিংগীদের দখলে দেয়া হবে। শহরবাসীরা তাদের জান মাল নিয়ে চলে যাবে। বিনিময়ে ফিরিংগীদের দুই লাখ দীনার ও পাঁচশ ভাল মানের বন্দী দিবেন। সলীবুস সালকৃত ফিরিয়ে দেয়া হবে। সূর অধিপতি মারাকিসকে ৯ইবন খালদুনে : মারাকিশ) চৌদ্দ হাজার দীনার দেয়া হবে। এসব শর্তের উপরে তারা সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয় এবং এর উপর। হলফ করে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, উল্লিখিত সম্পদ ও বন্দী হস্তান্তরের সময়সীমা থাকবে দু'মাস। আল-কামিল ফিত তারিখ: খ. ১২ পৃ. ৬৭: ইবন খালদূন: খ. ৫ ৩২৫. ইবনুল আবারী ফী. মুকতাসারিদ দুওয়াল : পৃ. ২২২)

যখন তিনি সলীব উঁচু করে ধরলেন তখন তা দেখেই তারা সিজদা দিল এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সুলতান যে সলি ও বন্দী হাজির করেছেন তা প্রদান করার জন্যে তারা তার নিকট লোক পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু ফিরিংগীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে আটককৃত মুসলমান বন্দীদের মুক্তি না দিবে কিংবা এর জন্যে লিখিত মুচলেকা না দিবে ততক্ষন পর্যন্ত তিনি মাল ও বন্দী দিতে অস্বীকার করেন। তখন ফিরিংগীরা আগে দিতে অস্বীকার করে বলল বরং আপনি আগে ঐগুলো আমাদের কাছে পাঠান এবং আমাদের প্রতি আস্থা রাখুন। এতে সুলতানের বুঝতে বাকী থাকল না যে, ফিরিংগীরা বিশ্বাসঘাতকতা করার পরিকল্পনা নিয়েছে ও ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করছে। তাই তিনি তাদের কাছে কিছুই পাঠালেন না। তিনি বন্দীদেরকে তাদের দেশে দামিস্কে এবং সলীব বা ক্রুশও লাছওলার সাথে ফেরৎ পাঠাতে নির্দেশ দেন। এদিকে ফিরিংগীরা তাদের শিবির শহরের সম্মুখভাগে এনে স্থাপন করে। এরপর তিন হাজার মুসলিম বন্দীকে তথা এনে দাঁড় করায়। তখন আসরের সালাতের সময়। বন্দীরা যখন নিরুপায় দাঁড়িয়ে আছে তখন ফিরিংগীরা এক সংগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে তিন হাজার লোককে হত্যা করে ফেলে। মনে হল যে একজন লোক এক আঘাতে একজনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন ও সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। ফিরিংগীরা তাদের হাতে একজন ব্যতীত আর কোন মুসলমান বন্দীকে জীবিত রাখেনি। যাকে রেখে দেয় সে হয়তো আমীর অথবা শিশু। অথবা তাদের কাজে লাগে এমন কোন শক্তিশালী লোক অথবা একজন নারী। এরপর তথায় যা কিছু ঘটার ছিল তাই ঘটে গেল। যেমন নবী ইউসুফ (আ) তার কারাসঙ্গীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন : وَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ অর্থাৎ- যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। আক্কা দখলের পর সুলতান সালাহুদ্দীনের তথায় মোট অবস্থানকাল ছিল সাইত্রিশ মাস। তার হাতে নিহত ফিরিংগীদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার।

পরিচ্ছেদ

ফিরিংগীদের আক্কা দখলের পরবর্তী ঘটনা

ফিরিংগীরা আক্কা দখল করে নেয়ার পর মুসলমানরা তাদের সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আসকালানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সুলতান তার বাহিনীর সাথে থাকেন, মুসলিম যাত্রীদের সংগে একসাথে চলেন এবং প্রতিটি মনযিলে তাদের সম্মুখে এসে খোঁজ খবর নেন। যাত্রাপথে মুসলমানরা সেখানই ফিরিংগীদের পেয়েছে সেখান থেকেই তাদেরকে আটক ও অপহরণ করে। সুলতানের সামনে যখন কোন বন্দী হাজির করা হত তখনই তিনি সেখানেই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। এভাবে ফিরিংগী ও মুসলমান উভয় বাহিনীর মধ্যে অব্যাহতভাবে বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা চলতে থাকে। অবশেষে ইংল্যান্ডের সম্রাট সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাই মালিকুল আদিলের সাথে এক আলোচনায় বসেন। তিনি আদিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, আমাদের মধ্যে এই শর্তে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তি হতে পারে যে, উপকূলীয় শহরগুলোর উপর থেকে মুসলমানদের দখলদারিত্ব প্রত্যাহার করে শহরবাসীদের হাতে ফেরত দিবে। তখন আদিল তাকে বললেন, এর আগের শর্ত থাকবে, তোমাদের সকল অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে হত্যা করে ফেলা হবে। এ জবাব শুনে অভিশপ্ত সম্রাট ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং আদিলের কাছ

থেকে রাগান্বিত অবস্থায় উঠে চলে যায়। এরপর ফিরিংগীরা সুলতান সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গাবাতু উরসূফ নামক স্থানে সমবেত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য লাভ করে। গাবাতু উরসূফের নিকটে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে হাজার হাজার ফিরিংগী নিহত হয়। মুসলমানদের মধ্য হতেও অনেক লোক শহীদ হয়ে যায়। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমান সৈন্যরা সুলতানকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মাত্র সতেরোজন যোদ্ধা ব্যতীত তার সাথে আর কেউ ছিল না। এ অবস্থায় সুলতান অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অটল অবিচল হয়ে থাকেন। ঢোল ঢাক পিটানো বন্ধ করা হয়নি। পাতকাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে উড়ছে। এরপর সৈন্যরা পর্যায়ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে জমায়েত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হয়।

এখানকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সুলতান তার সেনাবাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং আসকালান উপকণ্ঠে যেয়ে শিবির স্থাপন করেন। বাহিনীর মধ্যে যারা দুরদর্শী ও ধী শক্তি সম্পন্ন ছিলেন তারা আসকালান শহরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে সুলতানকে পরামর্শ দেয়। তারা আশংকা প্রকাশ করে যে, কাফিররা এ শহর অধিকার অধিকার করে নিতে পারে এবং সে সুযোগে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করার জন্যে একে মাধ্যম বানাতে পারে। অথবা এ শহরকে কেন্দ্র করে আককার ন্যায় বা তার চেয়েও কঠিন যুদ্ধ সংগ্রাম চলতে পারে। সুলতান কোনো জবাব না দিয়ে ঐ রাত্রে এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেন। আল্লাহ তার অন্তরে এ ভাব উদয় করে দেন যে, এ শহর ধ্বংস করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। সকাল বেলা তিনি উপস্থিত লোক জনের নিকট তার এ মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন–

وَاللهِ لَمَوْتُ جَمِيْعِ اَوْلَادِيْ اَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ تَخْرِيْبِ حَجَرٍ وَّاحِدٍ مِّنْهَا - وَلَكِنْ اِذَا كَانَ خَرَابُهَا فِيْهِ مَصْلِحَةٌ لِّلْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَأْس بِهٖ -

আল্লাহর কসম! এ শহরের একখানা পাথর নষ্ট করার চেয়ে আমার সমস্ত সন্তান মারা যাওয়া আমার নিকট সহজ। কিন্তু একে নষ্ট করার মধ্যে যখন মুসলমানদের কল্যাণ রয়েছে তখন আর কোনো কষ্ট নেই। এরপর তিনি অধিনায়কদের ডেকে অতি দ্রুত এবং শত্রু এখানে পৌছার পূর্বেই এ শহরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে লোকজন ধ্বংসের কাজে লেগে যায়। কিন্তু এ শহরের বাসিন্দারা এবং যারা সেখানে উপাধিতে ছিল তারা শহরটির সৌন্দর্য, নির্মল আবহাওয়া শস্য ফসলের প্রাচুর্য সুশোভিত ফুল ও নহরের দৃশ্য এবং প্রাসাদগুলোতে লাগান মর্মর পাথর ও নির্মাণশৈলী ধ্বংস দেখে অঝোরে কাঁদতে থাকে। ঘরের ছাদের উপর আগুন নিক্ষেপ করে শস্য ফসলের স্টক জ্বালিয়ে ভস্ম করা হয়। কেননা এত পরিমাণ মাল স্থানান্তর করা বা নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এভাবে জ্বালাও পোড়ান ও ভেংগে ফেলার মাধ্যমে শরহটির ধ্বংস যজ্ঞ কার্যক্রম এ বছর জামাদিউর সানী মাস থেকে নিয়ে শা'বান মাসের শেষ পর্যন্ত চলে।

আসকালান শহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস নিশ্চিহ্ন ও পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত করে দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন রমযান মাসের দুই তারিখে এখান থেকে প্রস্থান করেন। যাত্রাপথে রমলা অতিক্রমকালে এর দুর্গ ধ্বংস করেন এবং লুদ মন্দির বিধ্বস্ত করেন। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করে দ্রুত শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় ইংল্যান্ডের সম্রাট সুলতানের নিকট

সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে বলেন যে, আমাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলছে। অনেক ফিরিংগী ও মুসলমান নিহত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য মাত্র তিনটি বিষয়ের প্রতি। এগুলো ব্যতীত আমাদের আর কোনো দাবি নেই। বিষয় তিনটি হচ্ছে সগীব উপকূলীয় শহর ও বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরিয়ে দেয়া। এই তিনটি দাবি থেকে আমরা সরে দাঁড়াব না। আর আমাদের মধ্য থেকে কিছু পর্যবেক্ষণকারী থাকবে তারা এগুলো দেখবে। সুলতান সম্রাটের প্রস্তাবের পরে অতি কঠোর ভাষায় জবাব লিখে প্রেরণ করেন। জবাব পাওয়ার পর ফিরিংগীরা বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়। সুলতানও তার বাহিনী নিয়ে কুদসের দিকে অগ্রসর হন। জুমা'আর সন্নিকটে দারুল কাসাকাসে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন চলছিল যিলকাদ মাস। তিনি এখানে থেকে শহরের নিরাপত্তা জোরদার ও গভীর পরিখা খননের কাজ শুরু করে দেন। তিনি নিজে তার সন্তানাদিসহ এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। সকল আমীর, কাযী আলিম ও সত্যপন্থী লোকজনও সুলতানের সাথে এ কাজে অংশগ্রহণ করে। এ সময়টি ছিল মুসলমানদের এক স্মরণীয় কাল। ফিরিংগীরা প্রায়ই শহরের আশে পাশে হানা দিত। প্রত্যেকবারই মুসলমানরা ফিরিংগীদের উপর বিজয়ী হয়। তারা তাদেরকে হত্যা করে। বন্দী করে ও প্রচুর গণীমত লাভ করে। দয়া, অনুগ্রহ ও প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত। এরূপ অবস্থা চলার মধ্য দিয়েও সান অতিক্রান্ত হয়ে যায়।[১]

এ বছরের কিছু ঘটনা সম্পর্কে ইমাদ বলেন, মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুয যাকীকে দামিস্কের কাযী পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তাছাড়া মক্কার আদমীর দাউদ ইবন ঈসা ইবন ফালিতা ইবন হাশিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ হালিম আল-হাসানী এ বছর একটা সীমালংঘন মূলক কাজ করে ফেলেন। তিনি কাবা ঘরের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেন। এমন কি হাজারে আসওয়াদের চারপাশে রৌপ্য দিয়ে মালার মত ঘিরে রাখা হয়েছিল সেই রৌপ্যের মালাও তিনি উঠিয়ে নেন। রৌপ্যের মালাটি এতই শক্তভাবে গাঁথা ছিল যে, ঐ কুরসুতি (মীলা সম্প্রদায়ের চরমপন্থী দলকে কুরমুক্তি বরং কারামিতা বলা হয়) লোহার গদা দ্বারা আঘাত করলেও সামান্য বেকে যায়নি বা ভেংগে পড়েনি। সুলতান হাজীদের মাধ্যমে এ সংবাদ শুনতে পেয়ে তাকে আমীরের পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তদস্থলে তার ভাই বুকায়রকে নিয়োগ করেন। তার ভাই আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর যে দুর্গ নির্মাণ করে ছিলেন সুলতান তা ভেংগে দেন। দাউদ অপসারিত হওয়ার পর নাখলায় যেয়ে বসবাস করেন এবং এখানেই পাঁচশ সাতাশি সালে মৃত্যুবরণ করেন। এ বছর যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাদের বিবরণ :

---

১. ইবনুল আছীর তার তারীখে বলেন, সালালুদ্দীনের ভাই আদিলের নিকট রায়তাশরাদ প্রস্তাব দেয় যে, সম্রাট তার কোনো জওয়ানকে আদিলের সাথে বিরাহ দিতে চান। ফলে কুদস ও মুসলমানদের দখলকৃত উকূলীয় শহরগুলো আদিনের অধীনে থাকিবে। আর আককা ও ফিরিংগীদের কব্জায় থাকা শহরগুলো ইংল্যান্ডের সম্রাটের বোনের অধীনে থাকবে। আর দারিয়ারা যে দিকে খুশী সে দিকে যাবে। রাসিমান বলেন, রায়তাশরিদু ইতিপূর্বে সালাহুদ্দীনের নিকট প্রস্তাব দেয়। সেখান থেকে বিমুখ হয়ে কয়েক দিন পর এই নতুন প্রস্তাব আদিলের কাছে পেশ করে। বৈনুল আছীরের বক্তব্যের চেয়ে রানাসিমা কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এ বিবাহের ফলে মাসীহীদের পক্ষে বায়তুল মুকাদ্দাস সলীবুস সালবূত ও বন্দী বিনিময়ের বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। সালাহুদ্দীন এতে সম্মত হন ও খুশী প্রকাশ করেন (আল কামি) খ. ১২পৃ. ৮২ : তারিখু. আবিল ফিদা : খ. ৩. পৃ. ৮০. তারীখুল হুরাশি. সলীবিস্তঃ খ. পৃ. ১১৫-১১৬ দ্র. আর রাওগ্রাতাযঃ পৃ. ২. পৃ.-৪৫-৫৯।

আল-মালিকুল মুযাফফার

তাবিয়্যুদ্দীন উমর ইবন শাহানশাহ ইবন আইয়ূব। পিতৃব্য সালাহুদ্দীন নিকট তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন। তাকে তিনি মিশর ও অন্য কয়েকটি শহরের নায়িব হিসেবে নিযুক্ত করেন। এরপর হামা ও তার আশপাশে অবস্থিত জাযীরা অঞ্চলের অনেকগুলো শহরের জায়গীর প্রদান করেন। আককার ঘটনার সময় তিনি পিতৃব্য সুতলানের সংগে সেখানে ছিলেন। এরপর তিনি জাযীরা ও ফুরাতের পার্শ্ববতী কতিপয় শহরের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার কল্পে চলে যাওয়ার জন্যে সালাহুদ্দীনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি যখন সেখানে যান তখন এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পার্শ্ববর্তী দেশের শাসকদের থেকে সেসব দেশ দখল করে নেয়ার জন্যে তিনি সে দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকান। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি ইনতিকাল করেন। পিতৃব্য সুলতানকে এড়িয়ে এভাবে যুদ্ধ করার কারণে তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট হন। মৃত্যুর পরে তার লাশ হামায় আনা হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। হামায় তার প্রতিষ্ঠিত একটি বিশাল মাদরাসা আছে। দামিস্কেও তার প্রতিষ্ঠিত আর একটি মাদরাসা খুবই প্রসিদ্ধ। এই মাদরাসার মালিকানাধীন বহু ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মানসূর নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। বহু চেষ্টা তদবির এবং অঙ্গিকার ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করার পর সালাহুদ্দীন তাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। সালাহুদ্দীনের ভাই সুলতানুল আদিল যদি তার পক্ষে সুপারিশ না করতেন তা হলে তিনি কখনই তাকে তার পিতার স্থানে বহাল করতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাকে নিরাপদে রেখেছেন। এ বছর রমযান মাসের জুমআর দিন তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর পুরুষ।

আমীর হুসামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন উমর ইবন লাশীন[১]

তার মাথার নাম সিত্তুশ শাম বিনত আইয়ূব। যিনি দামিস্কের শামিয়াতায়ন নামক মহল্লায় বসবাস করতেন। আসীর হুসাসুদ্দীনও এ বছর রমযান মাসের উনিশ তারিখে জুম'আর রাত্রে ইনতিকাল করেন্ একই রাতে ভাতিজা ও ভাগ্নের মৃত্যুতে সুলতান অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। এরা দুজনই ছিল সুলতানের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। হুসামিয়া কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এই হুসামিয়ার আওনিয়া মহল্লায় তার মাতা লালিত পালিত হন। এ মহল্লাটি শামিয়াতুল বারানিয়া নামে খ্যাত।

আমীর আলামুদ্দীন সুলায়মান ইবন হায়দার আলী-হালবী

দৌলতে সালাহিয়া অর্থাৎ, সুলতান সালাহুদ্দীনের রাজ্যের একজন প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সুলতান যেখানেই থাকতেন তিনিও তার সাথেই থাকতেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি সুলতানকে আসকালান ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি দামিস্কে যেয়ে রোগের চিকিৎসা করাবার জন্যে সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুলতান তাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। এরপর তিনি সেখান থেকে

---

১. কামিল ও তা'রীখে আবুল ফিদায়া আছে : লাজীন। আদীর আমামুদ্দীন সুলায়মান ইবন হাযদার আল-হালবী।

দামিস্কের পথে যাত্রা করেন। জিন-হাজ্জ মাসের শেষ দিকে গাবাগার নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি ইনতিকাল করেন। এ বছর রজব মাসে দামিস্কের নায়িব আমীরুল কাবীরের ইনতিকাল হয়।

আস্ সাফী ইবনুল ফায়িয

মালিকের পূর্বে তিনি ছিলেন সুলতানের ঘনিষ্ঠ সহচরদের মধ্যে প্রধান। এরপর তিনি তাকে দামিস্কের নায়িব নিযুক্ত করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন এবং এ বছর এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন।

প্রখ্যাত চিকিৎসক আস'আদ ইবন মাতবান

ইসলাম গ্রহণ করে তিনি জীবনকে ধন্য করেন। সাধারণ জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলেই তার চিকিৎসা দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল-জুয়ূশানী শায়খ নাজমুদ্দীন

সুলতান সালাহুদ্দীনের নির্দেশক্রমে আল জুরশালী মিশরে তুরবাতুশ শ্যাফিঈ নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান এ প্রতিষ্ঠানে বহু মূল্যবান জিনিস ওয়াকফ করেন। তিনি জুয়ূশানী এর তদারকি ও পাঠদানের জন্যে নিয়োগ করেন্ সুলতান তাকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতেন। তাবাকাতে শাফিয়া গ্রন্থে আমি তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আপন মাযহাবের পক্ষে তিনি যে সব কিতাব লিখেছো তার মধ্যে শারহুল ওয়াসিত উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তার আরও গ্রন্থ আছে। জুয়ূশানীর ইনতিকালের পর একদল লোক পাঠদানের ব্যবস্থা করার আবেদন জানায়। তখন মালিকুল আদিল তার ভাই শায়খুশ শূয়ূখ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন হাবিয়াকে এ খিদমতের জন্যে অনুরোধ করেন। পরে তাকে তিনি এ পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু সুলতানের মৃত্যুরপর এ পদ থেকে তাকে অপসারণ করেন। সুলতানের পুত্রগণ একের পর এক এর উপর হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখেন। সুলতান বংশের হস্তক্ষেপের অবসান ঘটলে পুনরায় এখানে ফকীহ ও আলিমদের ভিড় জন্মে।

হিজরী ৫৮৮ সালের আগমন

এ বছর যখন শুরু হয় তখন সুলতান সালাহুদ্দীন কুদস শিবিরে অবস্থান করছিলেন। তিনি আপন সন্তান ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাচীর বন্টন করে দিয়েছিলেন। প্রাচীর নির্মাণ কাজে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন। সামনের ও পশ্চাতের উঁচু স্থান থেকে পাথর বহন করে আনেন। অন্যান্য লোক তাদের অনুসরণ করে্ ফকীহ ও আলিমগণও এ কাজে জড়িত হন। অভিশপ্ত ফিরিংগীরা কুদস শহরের পার্শ্ববর্তী আসকালাম ও তার সংলগ্ন এলাকায় বিচরণ করে। কুদসের চারপাশে কড়া প্রহরা ও চৌকি থাকার কারণে তারা শহরের নিকটে আসতে সাহস পায়নি। তবে তারা কুদ্স অবরোধ করার সংকল্পে অত্যন্ত দৃঢ় ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালায়। কুদসের সীমান্ত প্রহরী ও ফিরিংগীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে প্রত্যেক দলই কখনও জয়ী হয় আবার কখনও পরাজিত হয়। কখনও অপহরণ করে আবার কখনও অপহৃত হয়। রবিউস সানী মাসে আমীর সায়ফুদ্দীন মাশতূব বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করেন। আককা দখলের পর তিনি সেখানে নায়িব নিযুক্ত হন। পঞ্চাশ হাজার দীনার মুক্তিপণ

দিয়ে তিনি ফিরিংগীদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনেস। সুলতান তাকে মুক্তিপণের একটা বড় অংশ দান করেন। এরপর তিনি তাকে লাবলুসের নায়িব নিযুক্ত করেন। এখানেই তিনি এ বছর শাওয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। এ বছর রবিউস সানী মাসে সূর অধিপতি অভিশপ্ত মারাকিস আততায়ির হাতে নিহত হয়। ইংল্যান্ডের সম্রাট তাকে হত্যা করার জন্যে দুজন ফিদাঈকে প্রেরণ করেন। তারা সুযোগমত তাকে হত্যা করে। আগুন্তুক এই দুই ব্যক্তি নিজেদেরকে নাসারা পরিচয় দিয়ে গির্জায় অবস্থান নেয়। এক সুযোগে তারা মারা কিসের উপরে চড়াও হয় এবং তাকে হত্যা করে। অবশ্য এ দুজনও ধৃত ও নিহত হয়। এরপর ইংল্যান্ডের সম্রাট তার ভ্রাতুষ্পত বালামুল কালদাহারকে সূরের নায়িব নিযুক্ত করেন। এই কালাম ছিল ফ্রান্সের সম্রাটের বৈপিকের যে বোনের ছেলে। অতএব, উক্ত সম্রাটদ্বয় বালাসের মামা। কালাম কান্দাহার সূরে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হযে সারাকিসের স্ত্রীকে বিবাহ করেন। মারাকিসের মৃত্যুর একদিন পর এ বিবাহের ঘটনা সংঘটিত হয়। যে ছিল তখন অন্তসত্ত্বা। ইংল্যান্ড ও সূরের রাজার মধ্যে চরম শক্রতা থাকার কারণেই এ ঘটনা ঘটে। আর সালাহুদ্দীনের আক্রোশ ছিল এদের উভয়ের উপর। তার মারাকিস সালাহুদ্দীকে কোনো এক ব্যাপারে সৌজন্যে দেখিয়ে ছিল বলে তার হত্যা কাণ্ডকে তিনি পছন্দ করেননি।

জমাদিউল আউয়াল মাসের নয় তারিখে আল্লাহর অভিশপ্ত ফিরিংগীরা দারূম দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দেয়। দুর্গে বসবাসকারী বহু লোক হত্যা করে এবং শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসে। ইন্না লিল্লাহি, ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর তাদের সম্মিলিত বাহিনী কুদসের দিকে অগ্রসর হয়। সংবাদ পেয়ে সুলতান মুমিনদের বাহিনী নিয়ে মুকাবিলার জন্যে বের হন। যখন উভয় দল মুখোমুখি হয় তখন শয়তানের দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে তারা শিবির স্থাপন ও যুদ্ধে জড়িত হতে ভয় পেয়ে যায়। সুলতান সেখানে অবস্থান না করে কুদসে প্রত্যাবর্তন করেন।

وَقَدْ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا۔

আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন তারা কোনো কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী (আহযাব : ২৫)

এরপর তদনীন্তন যুগের ফিরিংগী রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর সম্রাট ছিলেন ইংল্যান্ডের সম্রাট। আল্লাহর অভিশপ্ত এই সম্রাট কয়েকটি মুসলিম বাণিজ্যিক কাফিলার উপর হামলা চালিয়ে জয়ী হন। রাত্রিবেলার এই হামলায় কাফিলার অনেক লোক হত্যা করেন এবং পঁচিশজনকে বন্দী করেন। তাদের থেকে বহু মালামাল, উট, ঘোড়া ও খচ্চর লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে উটের সংখ্যাই ছিল তিন হাজার। ফিরিংগীরা এগুলো পেয়ে যথেষ্ট মক্তি সঞ্চয় করে। সুলতানের কাছে এ সংবাদ আসলে তিনি দারুণভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাদের তরফ থেকে কোন মুসীবত আসার ব্যাপারে আশংকা বোধ করেন। ইংরেজ সম্রাট লুণ্ঠিত পশুগুলোর দেখাশুনা ও পরিচর্যা করতে উটের জন্যে জামালা, খচ্চরের জন্যে খরবনদিয়া এবং ঘোড়ার জন্যে সুয়াস নিযুক্ত করেন। অতি আবেগ উদ্দমের সাথে তিনি অগ্রসর হন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ

করার দৃঢ়– সংকল্প করেন। উপকূলীয় অঞ্চলে যত ফিরিংগী রাজা ছিল তাদেরকে ও তাদের সাথে যেসব যোদ্ধা ছিল তাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে সংবাদ দেন। সুলতান তাদের মুকাবিলার জন্যে সৈন্যদের বিন্যাস করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রাচীর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন এবং পরিখা সংস্কার করেন। বিভিন্ন স্থানে মিনজানির স্থাপন করেন। কুদসের চারপাশে যত পানির জায়গা ছিল সেখান থেকে পানি নিষ্কাষণের নির্দেশ দেন। জামাদিউস সানী মাসের উনিশ তারিখে জুম'আর রাতে সুলতান আমীরদেরকে ডেকে হাজির করেন। এদের মধ্যে আবুল হায়জা আল-মুসামেমীন। মাশতূব ও আসাদিয়া উল্লেখযোগ্য এরপর তিনি তাদের থেকে এই আকস্মিকভাবে আপতিত ভয়াবহ দুঃখজনক ও বেদনায়ক পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চান। তারা অবস্থাকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন এবং প্রত্যেকেই আপন আপন মত প্রকাশ করেন। ইমাদুল জাতির তার পরামর্শে বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই পবিত্র সাখরার কাছে যেয়ে মৃত্যুর উপর হলফ করতে হবে যেমন করতেন সাহাবায়ে কিরাম। উপস্থিত সকলেই তার এ মতকে সমর্থন করে। অন্যরা যখন এসব কথা বলছিল সুলতান তখন নীরব নির্বাক ও চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন। কথা শেষ হয়ে গেল মজলিসের লোকজন সবাই চুপ হয়ে যায় এবং নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। যেন তাদের মাথার উপরে পাখি বসে আছে। এরপর সুলতান বললেন,[১] সকল প্রশংসা আল্লাহর। দরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি। জেনে রেখ, তোমরা তাই যুগে ইসলামের সৈনিক। ইসলামের উপরে কোনো আঘাত আসলে তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, মুসলমানদের রক্ত তাদের সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের যিম্মায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের এ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। মুসলিম দেশ ও জাতির পক্ষে তোমরা ব্যতীত আর কেউ এই দুশমনের মুকাবিলা করবে না। যদি তোমরা মুকাবিলা করা থেকে (নাউযু বিল্লাহ) মুখ ফিরিয়ে নেও তা হলে এই দুশমন সমস্ত শহর গ্রাস করে নেবে এবং সকল মানুষকে হত্যা করে ফেলবে। মুসলমানদের সমুদয় সম্পদ, মিশু সন্তান ও নারীদের লুণ্ঠন করবে। মসজিদগুলোতে ক্রুশের পূজা শুরু হযে যাবে এবং সেখান থেকে কুরআন ও সালাতকে বিদায় দেয়া হবে। অথচ এ সবকিছু রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তোমরা হচ্ছ সেসব লোক যারা এ সমস্ত কাজের দায়িত্ব পালনের জন্যে এগিয়ে এসেছ। তোমরা মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে আহার গ্রহণ করছ এই জন্যে যে, তোমরা তাদের থেকে তাদের দুশমনদের প্রতিহত করবে এবং তাদের দুর্বল শ্রেণির লোকদের সাহায্য করবে। সুতরাং সবল দেশের সমস্ত মুসলমানদের সম্পর্ক তোমাদের সাথে, ওয়াস-সালাম.।

---

১. الحمد لله والصلواة والسلام على رسول الله ـ اعلموا انكم جند الاسلام اليوم و منعته ـ وانتم تعلمون ان دماء المسلمين واموالهم وذراريهم فى ذممكم معلقة ـ والله عزو جل سائلكم يوم القيامة عنهم ـ وان هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن العباد والبلاد غيركم ـ فان وليتم والعياذ بالله طوى البلاد واهلك العباد ـ واخذ الاموال والاطفال والنساء ـ وعبد الصليب فى المساجد ـ وعزل القران منها والصلاة ـ وكان ذالك حكه فى ذممكم ـ فانكم انتم الذين قصديتم مهذا كله ـ واكلتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم ـ وتنصروا ضعيفهم ـ فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بكم والسلام ـ

সুলতানের বক্তব্যের জবাব দেয়ার জন্যে সাইফুদ্দীন আল-মাদাতূব অগ্রসর হলেন এবং বললেন, হে আমাদের অভিভাবক! আমরা আপনার অধীনস্থ গোলাম, আপনি আমাদেরকে দান করেছেন, বড় করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন। আমাদের গর্দান ছাড়া আর আমাদের কিছুই নেই। আর আমরা তো আপনার সামনেই হাজির আছি। আল্লাহর কসম! মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমরা কেউ আপনাকে সাহায্য করা থেকে পিছু হটব না। এরপর উপস্থিত সকলেই একে একে মাশতূবের ন্যায় বলতে লাগল। সৈনিকদের এরূপ দ্ব্যর্থহীন কথা শুনে সুলতান অত্যন্ত খুশী হন এবং তার অন্তর প্রকাশিত বোধ করে। তিনি তাদের জন্যে বিশাল এক বাহিনী সুবিন্যস্ত করেন। এ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর আমীরগণ তার থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু কিছু সময় পর তার কাছে এই মর্মে সংবাদ আসে যে, কতিপয় আমীর বলাবলি করছে যে, আমাদের আশংকা হচ্ছে; এই শহরে আমাদের উপর সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। যেই পস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আককাবাসীদের উপর। তারপরে ফিরিংগীরা ইসলামী দেশগুলোকে একের পর এক দখল করে আনবে। সুতরাং মহল এর মধ্যেই নিহিত যে, আমরা শহরের উপকণ্ঠে যেয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করব। তাতে যদি আমরা এদেরকে পরাজিত করতে পারি তা হলে তাদের অন্য শহরগুলো আমরা দখল করে নিতে পারব। আর যদি ঘটনা অন্য রকম হয় তা হলে সৈন্যরা বেঁচে যাবে এবং আপন অবস্থার উপর থাকবে। শত্রুরা কুদস দখল করে নিবে। কিন্তু আমরা কুদস ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দেশগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের দখলে রাখতে পারব। এরপরে তারা সুলতানের নিকট প্রস্তাব পাঠান যে, আপনি যদি চান যে, আমরা ফিরিংগীদের অবরোধের মধ্যে কুদসে অবস্থানকারী- তা হলে আপনিও আমাদের সংগে থাকুন কিংবা আপনার পরিবারের কয়েকজন আমাদের সংগে থাকুক। তা হলে সৈন্যবাহিনী আপনার নির্দেশের অধীনে চলবে। কারণ কুর্দীরা তুর্কীদের আনুগত্য করবে না; আবার তুর্কীরাও কুর্দ্দীদের আনুগত্য মেনে নিবেন না। এ কথা শোনার পর সুলতান অত্যন্ত কষ্ট পান ও পেরেশানী বোধ করেন। রাত্রিবেলা তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হন এবং তারা যা বলেছে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। অবশেষে এ সমস্যা সমাধানের একটি উপায় তাঁর কাছে পরিস্কার হয় এবং অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে উপায়টি এই যে, বালাবাককুর অধিপতি মালিক আমজাদ সুলতানের নায়িব হিসেবে কুদসে থাকবেন এবং তাদের নিকটে অবস্থায় করবেন। এ ব্যবস্থা জুম'আ বার দিনের বেলা নেয়া। যখন তিনি জুম'আর সালাত আদায় করতে আসেন এবং মুআযযিন যোহরের সময় আযান দেয় তখন দুই আযানের মধ্যেবর্তী সময়ে তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। অকল্পনীয় আবেগের সাথে আল্লাহকে ডাকেন। আপন প্রতিপালকের নিকট কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দু'আ প্রার্থনা না করেন। আল্লাহর কাছে ধর্না দিয়ে তার ও তাঁর মাঝের সম্পর্কের উল্লেখ করে এই মহাসংকট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে দু'আ করেন।

পরদিন শনিবার। কুদস শহরের চারপাশে পাহারায় নিয়োজিত রক্ষীদের পক্ষ থেকে খবর এল যে, ফিরিংগীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। ফ্রান্সের সম্রাট বলছেন, আমরা দূরদেশ থেকে বহু অর্থ সম্পদ ব্যয় করে এখানে এসেছি বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করতে ও আমাদের অধিকারে আনতে। আর বায়তুল মুকাদ্দাস ও আমাদের মাঝে এখন মাত্র এক মারাহালা দূরত্ব বাকী আছে। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের সম্রাট বলছেন এই শহর অবরোধ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত

কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, এর চারপাশে পানির কোন চিহ্ন নেই। দূর থেকে অনেক কষ্ট করে পানি আনতে হবে। এতে অবরোধ ব্যহত হবে এবং সৈন্যরা পানির অভাবে বিপর্যস্ত হবে। এরপর দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে উভয় পক্ষ এই ব্যবস্থায় একমত হয় যে, দুই পক্ষ থেকে বাছাইকৃত তিনশ লোক যে সিদ্ধান্ত দিবে তাই সকলে মেনে নিবে। পরে এই তিনশ লোকে সিদ্ধান্ত দেয়ার দায়িত্ব তাদের মধ্যে থেকে বারোজনের উপর ন্যস্ত করে। এ বারোজন আবার তাদের মধ্য থেকে তিনজনের উপর সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। এ তিনজন রাত্রিবেলা চিন্তা গবেষণা করে সকালে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় যে, অবরোধে যাওয়া যাবে না। বরং এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। এভাবে তাদের মতদ্বন্দ্বের নিরসন হল এবং বিমুখ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হল। আল্লাহর অভিশাপ তাদের উপর।

শত্রু বাহিনী এখান থেকে যাত্রা করে রমলায় যেয়ে অবতরণ করে। দীর্ঘদিন বিদেশ যাপন ও এক অবস্থায় থাকায় তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। তখন ছিল জমাদিউস সানী মাসের একুশ তারিখ। এদিকে সুলতান তার বাহিনী নিয়ে কুদসের বাইরে চলে আসেন। শত্রুরা মিশর আক্রমণ করতে পারে এ আশংকায় তিনি তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে অগ্রসর হন। কেননা মিশরে ছিল সম্পদ ও গবাদির প্রাচুর্য। আর ইংল্যান্ডের সম্রাটের ছিল সম্পদের প্রতি দারুণ লোভ ও আসক্তি। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত ও অপমানিত করেন। এ সময় ইংরেজ সম্রাটের পক্ষ থেকে সুলতানের নিকট দূতের মাধ্যমে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব পাঠানো হয় যে, এখন থেকে তিন বছর পর্যন্ত মুসলমান ও ফিরিংগীদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, আসকালান শহর ফিরিংগীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। বায়তুল মুকাদ্দাসের গির্জা কুসামা তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে এবং খ্রিষ্টানরা বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে এখানে যিয়ারত করতে ও আসা-যাওয়া করতে পারবে। এ প্রস্তাবের জবাবে সুলতান তাদেরকে আসকালান ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। তবে কুমামা তাদের জন্যে ছেড়ে দেন। আর বায়তুন মুকাদ্দাস যিয়ারতকারী খ্রিষ্টানদের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল ধার্য করেন যা প্রত্যেক যিয়ারতকারীকে আদায় করতে হবে। কিন্তু ইংরেজ সম্রাট আসকালের ফেরৎ দান ও সেখানে পূর্বের ন্যায় প্রাচীর নির্মাণ করে দেয়া ব্যতীত সন্ধি করতে রাজি হননি। সুলতান এরপর কোনো জবাব না দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন। এরপর সুলতান যুদ্ধ অভিযানে বের হন এবং ইয়াফা শহর পর্যন্ত পৌছে। কঠিনভাবে শহর অবরোধ করেন্ শেস পর্যন্ত তিনি শহরটি জয় করে নেন। শহরবাসীরা তখন ছোট.বড় সবার জন্যে সুলতানের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন। এ দিকে যখন এই অবস্থা চলে ঠিক তখনই সমুদ্র পথে ইংরেজদের নৌযান সেখানে এসে হাজির হয়। নৌযান দেখতে পেয়ে এখানকার সর্দারদের মনোবল বেড়ে যায় এবং অন্তর কলুষিত হয়ে পড়ে আকস্মিকভাবে এ অভিশপ্তরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের দখল থেকে শহর পুনরুদ্ধার করে। যে সব মুসলমান শহরে রয়ে যায় এবং বের হতে বিলম্ব করে তাদেরকে তারা সুলতানের সামনেই নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করে। সৈন্যবাহিনীর উপর ফিরিংগীদের হামলার আশংকায় সুলতান অবরোধ স্থান থেকে পিছু হটে পশ্চাৎ দিকে চলে যান। সুলতানের ও বিজয়ের জন্যে ইংরেজ সম্রাট অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করেন। তিনি এর জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না যে, যে শহর কারো পক্ষে দু'বছরেও জয় করা সম্ভব নয় সে শহর মাত্র দুই দিনে তিনি কিভাবে জয় করলেন? আমি ভেবে পাইনা যে তিনি এত বিচক্ষণ ও সাহসী হওয়া সত্ত্বেও

কেবল আমার আগমনের সংবাদ শুনে তার স্থান থেকে কিছু হটে গেলেন। অথচ আমি ও আমার সাথীরা তো সমুদ্র থেকে অস্ত্র ছাড়া শুধু খালি হাতে বের হয়েছি। এরপর সম্রাট সুলতানকে সন্ধি করতে বারবার আহবান জানান এবং আসকালানকে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুলতান তা মানতে রাজি হননি। এ সময়ে কোনো এক রাতে সুলতান সতেরোজন যোদ্ধা নিয়ে ইংরেজ সম্রাটের উপর অতর্কিত হামলা করেন। তখন সম্রাটের পাশে অল্প কিছু পদাতিক সৈন্য ছিল। তিনি তার পাশের সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি এমনভাবে অবরোধের মধ্যে পড়েন যে, সুলতানের সৈন্যরা যদি তার সাথে দৃঢ় হয়ে হামলা চালত তা হলে সম্রাটের রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তারা সকলেই হামলা করা থেকে বিরত থাকে (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) সুলতান অবশ্য তাদেরকে হামলা করতে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু তারা এমনভাবে হামলা করা থেকে বিরত থাকে যেমনভাবে রোগী ওষধ সেবন করতে বিরত থাকার চেষ্টা করে।

এই ছিল তখনকার মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা। এর মধ্যে একদিন ইংরেজ সম্রাট কিছু সংগীদের নিয়ে বের হন। কিছু সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ সাথে নেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা যেখানে ছিল তার ডান পাশ থেকে বাম পাশ পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে টহল দেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন অশ্বারোহীও তার দিকে এগিয়ে আসেনি এবং কোনো বীরযোদ্ধা হুংকারও ছাড়েনি। এ সময় সুলতান আবার সেখানে প্রত্যাবর্তন করেন। সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব পরিলক্ষিত না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তাদের উপর যদি সুলতান তখন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন তা হলে যারা বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করত তাদের কাউকেই তিনি সেখানে থেকে একটি পয়সাও দিবেন না। এরপর ইংরেজ রাজা এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি সুলতানের নিকট লোক প্রেরণ করে তাকে নিকট কিছু ফল ও বরফ পাঠাবার অনুরোধ জানাল। সুলতান সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক তার জন্যে প্রার্থিত জিনিষ পাঠিয়ে দেন। অভিশপ্ত সম্রাট ফল ও বরফ খেয়ে সুস্থ হয়ে যান পরে সম্রাট স্বীয় সন্তানাদি ও দেশের প্রতি মমতার আকর্ষণে সুলতানের সাথে সন্ধি করার জন্যে বারবার দূতের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আসকালানের দাবী ছেড়ে দিয়ে সুলতান যেভাবে সন্ধি করতে সম্মত হন তাই মেনে নিয়ে সম্রাট সন্ধি করতে আগ্রহী হন। এ কথার উপর শা'বান মাসের সতোর তারিখ উভয়ের মধ্যে সন্ধিপত্র লেখা হয়। সন্ধির শর্তাবলী মেনে চলার জন্যে শত্রুপক্ষের সকল রাজার থেকে ওয়াদা অংগীকার কঠোরভাবে গ্রহণ করা হয়। মুসলমানদের আমীরগণ হলফ করেন ও নিজ নিজ পত্রে লিখে নেন্ আর সুলতানের শুধু মুখের কথাকেই যথেষ্ট গণ্য করা হয়। কারণ, সন্ধি চুক্তির ক্ষেত্রে সুলতানদের প্রচলিত নীতি এ রকমই ছিল। সন্ধির ফলে উভয় পক্ষের লোকজন অত্যন্ত খুশী হয় ও প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিন বছর ছয় মাস[১] যুদ্ধ বিরতির ফলে মানুষের মনে শান্তির হাওয়া বইতে থাকে। সন্ধি চুক্তির মধ্যে আরও শর্ত ছিল যে, উপকূলের যে সব দেশ ফিরিংগীদের দখলে ছিল তা

---

১. কামিলে খ. ১২. পৃ. ৮৪, আছে তিনবছর আট মাস; ইবন খাওদনে খ. ৫.পৃ.৩২৮ আহছ চুয়াল্লিশ মাসঃ তারীখুল হারবিস সালিবিয়া খ.৩.৪.৩৯ আছে পাঁচ বছর; আবুল ফিদায় আছে তিন বছর তিন মাস। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয় পহেলা সেপ্টেম্বর বিশ শা'বান। আবুল ফিদা তার তারীখে বলেন, ঐ দিনটি ছিল বুধবার বাইশে শা'বান।

তাদের দখলেই থাকবে; আর মুসলমানদের দখলে থাকবে ঐ সবের পরিবর্তে পার্বত্য দেশসমূহ। অন্যান্য সকল কার্যকাণ্ড উভয় দলের মধ্যে আধাআধি হারে বন্টিত হবে। সুলতান আসকালান দুর্গ ধ্বংস করতে এবং তথায় অবস্থানকারী ফিরিংগীদের বহিষ্কার করে দিতে একজন আমীরের নেতৃত্বে একুশজন রাজমিস্ত্রী পাঠিয়ে দেন।

সুলতান এরপর কুদসে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানকার অবস্থাকে সুবিন্যস্ত করেন ও স্থায়িত্বের জন্যে মজবুত ও দৃঢ়তর করেন। এখানকার সকল কাজকর্ম ও বিষয়াদির উপর নজর দেন। দুরস্ত করেন ও বিধিভুক্ত করে শক্তিশালী করেন মাদরাসার জন্যে ওয়াকফকৃত জায়গায় অতিরিক্ত একটি বাজার ও দোকানঘর বসান। আর এক খণ্ড জমিতে উদ্যান তৈরি করেন। সূফী দরবেশদের গমনাগমণ ও অবস্থানের জন্যে আর একটি ওয়াকফ সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এসব কাজ সমাপ্ত করে তিনি এ বছর হজ পালন করার দৃঢ় সংকল্প করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হিজাজ, ইয়ামন, মিশর, ও সিরিয়ার চিঠি প্রেরণ করেন- যাতে তারা এ বিষয়ে অবগত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সংবাদ শুনে কাজী আল ফাযিল হজ্বের সংকল্প থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে সুলতানের নিকট পত্র লিখেন। পত্রে তিনি আশংকা ব্যক্ত করেন যে, আপনার অবর্তমানে ফিরিংগীরা কুদসের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, যুল্‌ম অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে পারে, জনগনও সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে ও তাদের শাসন ও কল্যাণ ব্যবস্থায় ঘাটতি আসতে পারে। তাই এ বছর হজ করার চেয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থার প্রতি নজর রাখা আপনার জন্যে অধিক মঙ্গলজনক। ওদিকে শত্রুরা সিরিয়ায় শিবির স্থাপন করে আছে। আপনি ভাল করেই জানেন যে, তারা শান্তিচুক্তি করেছে তলে তলে শক্তিবৃদ্ধি ও লোকবল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এরপর তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনবে ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। পত্র পাঠ করে সুলতান কাযী আল ফাযিলের পরামর্শ মেনে নিলেন, ভাল উপদেশ দেয়ার জন্যে কাযীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যার জন্যে সংকল্প করেছিলেন তা প্রত্যাহার করে নেন। এ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি সকল বাদশাহর কাছে পুনরায় পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পূর্ণ রমযান মাস কুদসে অবস্থান করে সিয়াম সালাত ও কুরআন নিযে মশগুল থাকেন। ফিরিংগীদের নেতৃস্থানীয় কোনো প্রতিনিধি দল যখনই যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কুদসে আগমত করত তখন তিনি তাদের অন্তর জয় করার জন্যে তাদের সাথে সর্বোত্তম সদাচরণ প্রদর্শন করতেন ও যত্ন নিতেন। ফিরিংগীদের কোনো রাজাই কুমামা যিয়ারতে না এসে থাকেননি। তবে রাজারা যখন আসতেন তখন নিজেদের গোপন করে রাখতেন। যখন সুলতানের নিকট যেতে তখন তাদের সাথে আসা অন্যান্য লোকের ভিড়ের মধ্যে থাকতেন যাতে তাকে দেখা না যায়। সুলতান এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কিছুই জানতে পারতেন না। এজন্যে তিনি তাদের সবার সাথে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতেন তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতেন ও সদাচারণ করতেন।

শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখে সুলতান সৈন্য বাহিনীসহ দামিষ্কের উদ্দেশ্যে কুদস থেকে যাত্রা করেন। কুদ্স ত্যাগের প্রাককালে তিনি ইয্‌যুদ্দীন জাওরাদিককে তথায় নায়িব এবং বাহাউদ্দীন ইবন ইউসুফ ইবন রাফি' ইবন তামীম আশ-শাফিঈকে কাযী পদে নিয়োগ দান করেন। ওয়াদিয়ে জীব অতিক্রম করে তিনি বারকাতুদ দাবিয়ায় রাত্রি যাপন করেন। সকাল বেলা নাবলুসে উপনীত হয়ে সেখানকার অবস্থা পরিদর্শন করেন। তারপর এখান থেকে যাত্রা করে

বিভিন্ন কিল্লা দুর্গ ও শহর অতিক্রম করতে থাকেন এবং সেসব স্থানের সার্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন ও অন্যায় অত্যাচার দেখলে তা দূর করেন। পথিমধ্যে আন্তরিয়ার অধিপতি তার খিদমতে হাজির হন। সুলতান তাকে সমমান করেন। তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং উপহার স্বরূপ প্রচুর মাল ও খিলাফত প্রদান করেন। এই সফরে ইমাদ আল আল-কাতিব সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। তিনি এক এক মনযিল করে সফরের সমস্ত মনযিলের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এ বিষয়ে ইমাদ বলেন– সুলতান সোমবারে আয়নুল হুর থেকে মারজে বুয়ুস পর্যন্ত পথ অতিক্রম করেন। পূর্বেই বুসের পতন হয়। এখানে অবস্থানকালে দামিষ্ক ও অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি দল এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। মঙ্গলবারে তিনি আরাদায় অবতরণ করেন। প্রথা অনুযায়ী সেখানে সাক্ষাৎকারীগণ তোহফা উপহার নিয়ে আগমন করেন শাওয়াল মাসের ষোল তারিখ[১] বুধবার সকাল বেলা আমরা নির্বিঘ্নে নিরাপদে দামিষ্কের সবুজ উদ্যানে প্রবেশ করি। একটানা চার বছর যাবৎ সুলতান দামিষ্কের বাইরে ছিলেন। তাই দামিষ্ক তার সবকিছু সুলতানের চরণ তলে লুটিয়ে দেয়। দামিষ্কের নারী পুরুষ ও শিশুরা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এটা ছিল এক অনাবিল আনন্দ উৎসবের দিন। নসরের অধিকাংশ বাসিন্দা বেরিয়ে এসে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। সুলতানের ছোট বড় সকল সন্তান পিতা সান্নিধ্যে জড়ো হয়। মুসলিম দেশগুলো থেকে দূতগণ এসে সুলতানের সাথে মিলিত হয়। বছরের অবশিষ্ট দিনগুলো তিনি পাখি ও হরিণ শিকার করেন। দারুল আদলে অবস্থান; সৎকর্ম ও পরবর্তীদের মাঝে দান দাক্ষিণ্য বিতরণ কাজে অতিবাহিত করেন ঈদুল আযহার প্রক্কালে জনৈক কবি সুলতানের প্রশংসায় এক কাসীদা রচনা করেন যার কিছু অংশ নিম্নে দেয়া হল:

وابيها لولا تغزل عينها * لما قلت فى التغزل شعرا
ولكانت مدائح الملك النا * صر والى ما فيه اعمل فكرا
ملك طبق الممالك بالعد * ل مثلما اوسع البرية برا
فيحل الاعياد صوما وفطرا * ويلقى الهنا برا وبحرا
يامر بالطاعات لله ان * اضحى مليك على المناهى مصرا
نلت ما تسعى من الدين والدنيا * فتيها على الملوك وفخرا
قد جمعت المجدين اصلا وفرعا * وملكت الدارين دنيا واخرى

অর্থ: তার পিতার কসম; যদি তার চোখের চাহনিতে প্রেমের ইংগিত না থাকত তা হলে আমি কখনও প্রেম-ভালবাসা নিয়ে কবিতা লিখতাম না। আর মালিক নাসিবের প্রশংসা এবং তার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য আছে তা নিযে কোনো-চিন্তা করতাম না। তিনি তো এমন একজন বাদশাহ যিনি ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতার মাধ্যমে সকল দেশের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে জোড়-সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং কল্যাণ দ্বারা বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছেন। সওম ও ইফতার এর মাধ্যমে

১. আসল ও ইবন শাদ্দাদ তার সিরাত গ্রন্থে পৃ. ২৩৯ এভাবে লিখেছেন। কিন্তু কামিলে ১ ব. ১২. পৃ. ৮৭ ও তারীখে ইবন খালদূনে খ. প. পৃ. ৩৩০ আছে পচিশ দিন বাকী থাকতে।

তিনি ঈদ উদযাপন করেন। জলে ও স্থলে যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। যদি কোন শহরের উপরে তিনি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করেন তা হলে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যে তিনি সকলকে নির্দেশ দেন। দ্বীন ও দুনিয়ার যা কিছু পাওয়ার চেষ্টা আপনি করেছেন, তা পেয়ে গেছেন। তাই এগুলো অর্জনের দ্বারা অন্য বাদশাহদের উপর আপনার গৌরব স্বীকৃত। মূল ও শাখা উভয় প্রকার মর্যাদা আপনি নিজের মধ্যে একত্র করেছেন। ফলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জগতের মালিক আপনি হতে পেরেছেন।

এ বছর যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় তার মধ্যে অন্যতম ঘটনা হল গযনীর সম্রাট শিহাবুদ্দীন সবুক্তগীন ও হিন্দুস্থানের রাজার মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ যুদ্ধ। এই রাজা ও তার সৈন্যরা পাঁচশ তিরাশি হিজরী সাথে সবুক্তগীনকে পরাজিত করেছিল। এ বছরের যুদ্ধে আল্লাহর তাদের মুকাবিলায় সবুক্তগীনকে বিজয় দান করেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদেরকে পরাজিত করেন। অনেককে হত্যা করেন এবং অনেককে বন্দী করেন। বন্দীদের মধ্যে হিন্দুদের মহান রাজাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আঠারটি হাতিও আটক করা হয়। এই আটককৃত হাতিগুলোর মধ্যে সেই হাতিটি ছিল যাকে ইতিপূর্বে তিনি আহত করেছিলেন। পরে মহান রাজারে সম্রাটের সম্মুখে হাজির করা হয়। কিন্তু তিনি তাকে কোনোই সম্মান প্রদর্শন করেননি বরং লাঞ্ছিত করেন। তিনি তাকে তার দুর্গের মধ্যে আনেন এবং সেখানে ছোট-বড় মূল্যবান ও নিম্নমানের যা কিছু ছিল সবকিছু জ্বালিয়ে দেন। এরপর তাকে হত্যা করেন। সবশেষে সম্রাট আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ীবেশে আনন্দ ও প্রফুল্লচিত্তে গযনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বছর বাগদাদের আমীর হজ্জ তাশতাগীণের বিরুদ্ধে এক অপবাদ ছড়ানো হয়। তিনি বিশ বছর যাবৎ আমীর হজ্জের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বাস্তব জীবনে তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তার উপরে অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ূবকে বাগদাদ দখল করার আহবান জানিয়ে পত্র যোগাযোগ করেছেন। এ অপবাদ ভিত্তিহীন এই জন্যে যে, সালাহুদ্দীন ও বাদগাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না যে, তিনি যদি তা দখল করার ইচ্ছা করতেন তা হলে সে তাতে বাধা দান করতে পারত। তার সম্পর্কে এটা ছিল এক প্রকাশ্য মিথ্যা অভিযোগ। এতদসত্ত্বেও তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। আটক রাখা হয় ও কথা আদায় করার জন্যে নিপীড়ন চালানো হয়।

পরিচ্ছেদ

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের বিবরণ

কাযী শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মূসা তিনি ইবনুল ফিরাশ নামে পরিচিত। দামিষ্কের সামরিক আদালতের কাযী পদে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সুলতান তাকে বিভিন্ন দেশের বিচারকার্যে প্রেরণ করতেন। অবশেষে মালটা দ্বীপে তিনি ইনতিকাল করেন।

সায়দুদ্দীন আলী ইবন আহমদ আল-মাশতূব

তিনি আসাদুদ্দীন শিরকুহের সেনা বাহিনীতে ছিলেন। মিশরের তিনটি যুদ্ধে তিনি তার সাথে ছিলেন। পরে তিনি সালাহুদ্দীনের শীর্ষস্থানীয় শাসনকর্তার মর্যাদা লাভ করেন। ফিরিংগীরা যখন

আক্কা দখল করে তখন তিনি সেখানকার নায়িব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফিরিংগীরা অন্য বন্দীদের সাথে তাকেও বন্দী করে। পরে তিনি পঞ্চাশ হাজার দীনার মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করেন। বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি কুদসে এসে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান তাকে মুক্তিপণের চেয়েও অধিক অর্থ দান করেন এবং নাবলুসে শাসক পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পর এ বছর শাওয়াল মাসের তেইশ তারিখ রোববার তিনি কুদসে ইনতিকাল করেন। তার গৃহাঙ্গনে তাকে দাফন করা হয়।

ইয়্যুদ্দীন কালাজ আরসালান ইবন মাসঊদ

ইবন কালাজ আরসালান। তিনি রোম সম্রাজ্যের কতগুলো দেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুত্র সন্তানদের আনুগত্য পাওয়ার আশায় তিনি গোটা দেশকে তাদের মধ্যে বন্টন করে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তার বিরোধিতা করে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ও অবাধ্য হয়ে যায়। তার ক্ষমতা ও মর্যাদাকে খর্ব করে এবং নিজেরা উপরে উঠার চেষ্টা করে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। অবশেষে এ বছর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ বছর রবিউস সানী মাসে কবি আবুল মারাহিফ ইনতিকাল করেন।

নাসর ইবন মানসূর আন-নুমায়রী

তিনি প্রথম জীবনে হাদীস শ্রবণ করেন। পরবর্তীতে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এতে তার দৃষ্টিকারী অনেকখানি লোপ পেয়ে যায়। দূরের কিছুই তিনি দেখতে পারতেন না। অবশ্য নিকটের জিনিস কিছুটা দেখতে পারতেন। তবে দৃষ্টিশক্তি হারালেও তাকে চালিয়ে নেয়ার লোকের প্রয়োজন ছিল না। চোখের চিকিৎসার জন্যে তিনি ইরাক গমন করেন। কিন্তু চোখ আর ভাল হবে না বলে চিকিৎসকগণ তাকে নিরাশ করে দেয়। তখন তিনি কুরআন মুখস্থ করতে থাকেন এবং সত্যপন্থী লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করে ধন্য হন। তার রচিত একটি উন্নতমানের দীওয়ান বা কাব্য সংকলন আছে। একাদা তাকে তার মাযহাব ও আকীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে কবিতায় বলেন–

احب عليا والبتول وولدها * ولا اجحد الشيخين فضل التقدم

وابرا ممن نال عثمان بالاذى * كما اتبرا من ولاء ابن ملجم

ويعجبنى اهل الحديث لصدقهم * فلست الى قوم سواهم بمنتمى

অর্থ: আমি আলীকে ভালবাসি, কুমারী মারিয়াম ও তার পুত্রকে সম্মান করি। আমি শায়খান অর্থাৎ, আবূ বকর ও উমর এর বিরোধিতা করি না। তাদের ফযীলত ও মর্যাদা আগেই স্বীকৃত। যারা উসমানকে কষ্ট দিয়েছে আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট যেমন অসম্ভব ইবন মুসলিজমের সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে। হাদীস চর্চাকারীদের বিশুদ্ধচিত্ত আমাকে মুগ্ধ করে তারা ব্যতীত অন্য কারও সাথে আমি সম্পর্কযুক্ত হতে চাইনা।

তিনি এ বছর বাগদাদে ইনতিকাল করেন এবং বাবে হারবে শহীদদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহর তার প্রতি রহম করুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

৫৮৯ হিজরী সন (১১৯৩)

সুলতান মালিক নাসির সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইব্‌ন আইয়ূব (র) এই হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ বছরের শুরুতে তিনি খুবই সুস্থ সমর্থ ছিলেন। তিনি ও তাঁর ভাই আদিল তখন পশু শিকারের উদ্দেশ্যে পূর্ব দামেস্কে গমন করেছিলেন। ঘটনাক্রমে ফ্রান্স বিষয়ক জটিলতা নিরসনের পর তিনি গেলেন রোমান অঞ্চলে আর তার ভাই গেলেন বাগদাদে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন শেষে তাঁরা দু'জনে অনারব দেশ আযার বাইজানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ পথে তাঁদেরকে বাধা দেয়ার মত কেউ ছিল না। সফর মাসের ১১ তারিখ সোমবার হাজীগণ দেশে ফিরে আসেন। তিনি তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময়ে তাঁদের সাথে তাঁর ভাই ইয়ামানের গভর্নর সাইফুল ইসলাম ছিলেন। তিনি ভাইকে সম্মান দেখালেন, কোলাকুলি করলেন এবং নতুন ফটক দিয়ে আপন দূর্গে ফিরে এলেন। তাঁর এই যাত্রা ছিল দুনিয়াতে শেষ যাত্রা। এরপর ১৬ সফর শনিবার রাতে তিনি জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হলেন। ভোরে কাযী ফাযিল, ইব্‌ন শাদ্দাদ এবং তদীয়পুত্র আফযাল তাঁর সাক্ষাতে এলেন। পূর্ববর্তী রাতের ভীষণ কষ্ট ও অস্থিরতার কথা তিনি তাঁদেরকে জানালেন, পরস্পর কথাবার্তা ও ভাব বিনিময় তাঁর ভালই লেগেছিল। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। এরপর রোগ বেড়ে গেল। এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল। বুধবার চিকিৎসকগণ তাঁর রোগের গতি নিয়ন্ত্রণে আনলেন। এরপর পানি শূন্যতা রোগ তাঁকে আক্রমণ করল। ভীষণ ভাবে ঘামাতে থাকলেন তিনি। টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ছিল মাটিতে। এ রোগ আরো বেড়ে যায়। শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের কে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তদীয় পুত্র আফযাল নূরুদ্দীন আলী পরবর্তী শাসক হবার পক্ষে ওদের বায়'আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। নুরুদ্দীন তখন দামেস্কের প্রশাসক ছিলেন। এ সময়ে বাদশাহ খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রষ্ট ও আত্মভোলা হয়ে যাচ্ছিলেন, ফাযিল, ইব্‌ন শাদ্দাদ এবং মহানগর হাকিম ইব্‌ন যাকী শুধু চার সাক্ষাতে যাওয়া আসা করছিলেন। ২৭ সফর রোজ বুধবার তাঁর অবস্থার দারুন অবনতি ঘটে। কাল্লামার ইমাম আবূ জা'ফরকে ডেকে আনা হল রাতের বেলা তাঁর নিকট থাকা, কুরআন পাঠ করা এবং অন্তিম মুহূর্তে তাকে কালিমা পাঠে সহযোগিতা করার জন্যে। সুলতান মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। ইমাম সাহেব পাঠ করছিলেন–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

(তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা সূরা হাশর : ২২)। এটা শুনে সুলতান বললেন, এটা তো সঠিক ও অকাট্য সত্য। ফজরের আযান হবার পর কাযী ফাযিল এলেন। তাঁর অবস্থা তখন খুবই সংকটাপন্ন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি।

কারী সাহেব পাঠ করলেন لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই), তাঁরই উপর নির্ভর করি আমি (সূরা তাওবা : ১২৯)। তখন সুলতান হেসে উঠলেন, তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং অবিলম্বে তাঁর রূহ মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছে গেল। তিনি ইন্তিকাল করলেন, মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাঁর বাসস্থানরূপে মঞ্জুর করুন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বৎসর। তিনি ৫৩২ হিজরিতে তিকরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের রক্ষক ও শত্রুদের প্রতিরোধক। তাঁর মৃত্যুতে দামেস্ক বাসী যেভাবে শোকাভিভুতা হয়েছে তা ছিল নজির বিহীন। তারা নিজের ভাই বেরাদর ও পুত্রকন্যার প্রাণের বিনিময়ে হলেও সুলতানের জীবন রক্ষায় প্রস্তুত ছিল। তাঁর শোকে হাট বাজার ও দোকান পাঠ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তাঁর দাফন কাফনের প্রস্তুতি নেয়া হয়। তাঁর পুত্র কন্যাগণ এসে উপস্থিত হয়। তাঁকে গোসল দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় নগর-খতীব ও ফিক্‌হবিদ দাওলাঈ এর উপর। বিচারপতি ফাযিল তাঁর ব্যক্তিগত হালাল সম্পদ থেকে সুলতানের কাফন ক্রয় ও দাফনের ব্যয় নির্বাহ করেন। তাঁর পুত্র কন্যাগণ শোকে মুহ্যমান হয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। জনগণ মাতম, বিলাপ আহাজারী ও দু'আ মুনাজাতে রত ছিল। যোহরের নামাযের পর তাঁর বাক্সবন্দী কফিন বাহিরে নিয়ে আসা হয়। বিচারপতি ইব্‌ন যাকী জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর আল মানসূরাহ দূর্গে নিজ বাসস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এরপর তাঁর পূর্ব ওসিয়ত অনুযায়ী আল কাদাম মসজিদের পাশে তাঁর স্মৃতিসৌধ এবং শাফিঈ মাযহাবের একটি মাদরাসা নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু এটি সমাপ্ত করা যায়নি। কারণ ইতিমধ্যে তার পুত্র আযীয ফিরে আসে এবং তার ভাই আফযালকে গৃহবন্দী করে ফেলে। এ ঘটনা ঘটে ৫৯০ হিজরী সনে। এরপর তদীয় পুত্র আফযাল কিলামা দুর্গের দক্ষিণ পাশে ওয়াযান নামক স্থানে তাঁর জন্যে একটি বাড়ি ক্রয় করেন এবং সেখানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। সেটির উপর মহান আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। ৫৯২ হিজরী সনে সুলতানের মরদেহ সেখানে স্থানান্তর করা হয়। শাহজাদা আফযালের অনুমতিক্রমে এবার তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী কারাইবী ইব্‌ন যাকী। আফযাল নিজে সমাধিতে অবতরণ করে মরদেহ সমাহিত করেন। তখন তিনি ছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা। বিচারপতি ফাযিলের নির্দেশে তাঁর সাথে তাঁর যুদ্ধে ব্যবহৃত তরবারি ও দাফন করে দেয়া হয় এই আশায় যে, কিয়ামত দিবসে তিনি এই তরবারিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবেন এবং জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তরবারি তাঁর সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। তাঁর ইন্তিকালে উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনের শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণ ও বিশেষ এবং শাসক প্রজা নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এই শোকসভায় যোগ দেয়। কবিগণ তাঁর তিরোধানে বহু শোকগাঁথা রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উন্নত শোকগাঁথা ছিল সাহিত্যিক ইমাদুদ্দীনের রচিত শোকগাঁথা। তাঁর "আল বারক্ আমসামী পুস্তকের শেষে তিনি এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে ২০২টি চরণ রয়েছে। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামাহ তাঁর "আল রাওয়াতাইন গ্রন্থে এগুলো সংযুক্ত করেছেন। তার কতক নিম্নে দেয়া হল :

شُغْلُ الْهُدٰى وَالْمُلْكِ عَمَّ شَتَاتُهُ * وَالدَّهْرُ سَاءَ وَاَقْلَعَتْ حَسَنَاتِهِ.

তিনি হিদায়াতের আলোক বর্তিকা, দেশের প্রদীপ, তাঁর কর্ম তৎপরতা ছিল বহুমুখী। যুগ ও সময় বৈরী আচরণ করেছে এবং তাঁর সৎ কর্মগুলোকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে।

أَيْنَ الَّذِىْ مُذْ كَمْ يَزَلْ مَخْشِيَةً * مَرْجُوَّةً مُهْيَاتُهُ وَهِبَاتُهُ۔

তিনি হারিয়ে গেলেন কোথায় যাঁর ভয়ে সবাই থাকত ভীত আর যাঁর দক্ষিণা পেতে সবাই থাকত আশান্বিত।

أَيْنَ الَّذِىْ كَانَتْ لَهُ طَاعَاتُنَا * مَبْزُوْلَةً وَلِرَبِّهِ طَاعَاتُهُ۔

যাঁর জন্যে নিবেদিত ছিল আমাদের আনুগত্য আর যাঁর আনুগত্য ছিল আপন প্রতিপালকের প্রতি নিবেদিত তিনি এখন কোথায়?

بِاللهِ أَيْنَ النَّاصِرُ الْمَلِكُ الَّذِىْ * لِلّٰهِ خَالِصَةً صَفَتْ نِيَّاتُهُ۔

হায় আল্লাহ্! সুলতান নাসির এখন কোথায়, তাঁর নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ছিল একান্তভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে পরিচালিত।

أَيْنَ الَّذِىْ مَا زَالَ سُلْطَانًا لَنَا * يُرْجٰى نَدَاهُ وَتُتَّقٰى سَطْوَاتُهُ۔

তিনি কোথায় যিনি আমাদের দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সর্বদা যাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশা থাকত যাঁর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।

أَيْنَ الَّذِىْ شَرَّفَ الزَّمَانَ بِفَضْلِهِ * وَسَمَتْ عَلَى الْفُضَلَاءِ تَشْرِيْفَاتُهُ۔

সেই মহান ব্যক্তিত্ব কোথায় রইলেন যিনি আপন দয়া-দাক্ষিণ্যে যুগকে করেছিলেন মর্যাদাময়, যাঁর দান দক্ষিণা সমানে বর্ষিত হত গুণীজনের উপর?

أَيْنَ الَّذِىْ عَنَتِ الْفَرَنْجُ لِبَأْسِهِ * ذُلًّا وَمِنْهَا أَدْرَكَتْ ثَارَاتُهُ۔

যাঁর আক্রমণে ফ্রান্স লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল, যিনি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি এখন কোথায়?

أَغْلَالُ أَعْنَاقِ الْأَعْدَاءِ أَسْيَافُهُ * أَطْوَاقُ أَجْيَادِ الشُّوْرِيِّ مَنَاتُهُ۔

তাঁর তরবারি শত্রুর গলায় গলবেড়া আর তাঁর দান ও অনুগ্রহ সিরীয়দের গলার মালা।

مَنْ لِلْعُلٰى مَنْ لِلذُّرٰى مَنْ لِلْهُدٰى * يَحْمِيْهِ۔ مَنْ لِلْبَأْسِ مَنْ لِلنَّائِلِ۔

উচ্চাসনে আরোহনের কে থাকল, শৃঙ্গে উঠার কে থাকল, হিদায়াত করার কে থাকল যুদ্ধ করার কে থাকল আর বিজয় অর্জনের কে থাকল?

طَلَبَ الْبَقَاءَ لِمُلْكِهِ فِىْ آجِلٍ * إِذْ كَمْ يَثِقْ مِيْقَا مُلْكٍ عَاجِلٍ۔

এই জগতের দায়িত্বে আস্থাবান না হওয়ায় পরকালীন রাজত্বে স্থায়িত্ব কামনা করেছেন তিনি।

بَحْرٌ أَعَادَ الْبَرَّ بَحْرًا بِرُّهُ * وَبِسَيْفِهِ فَتَحَتْ بِلَادَ السَّاحِلِ۔

তিনি ছিলেন সমুদ্র। তাঁর দানশীলতা স্থল ভাগকে সমুদ্রে পরিণত করে দিয়েছে। তাঁর তরবারি দ্বারা তিনি উপকূলবর্তী অঞ্চলকে জয় করেছেন।

مَنْ كَانَ أَهْلَ الْحَقِّ فِىْ أَمَامِهِ * وَبِعِزِّهِ يَرُدُّوْنَ أَهْلَ الْبَاطِلِ۔

তাঁর যুগে সত্য পন্থী যারা ছিল তারা তাঁর দাপটে বাতিল পন্থীদেরকে দুরে তাড়িয়ে দিত।

وَفُتُوحُهُ وَالْقُدْسُ مِنْ اَبْكَادِهَا * اَلْقَتْ لَهُ فَضْلًا بِغَيْرِ مَسَاجِلِ۔

তাঁর বিজয় সমূহ যার প্রথম পর্বে ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় তাঁর মর্যাদাকে স্মরণীয় করে রেখেছে লিখন ছাড়াই।

مَا كُنْتُ اَسْتَسْقِىْ لِقَبْرِكَ وَابِلًا * وَرَأَيْتُ جُوْدَكَ مُخْجِلًا لِلْوَالِ۔

আপনার কবরের জন্যে আমি প্রবল বৃষ্টিপাত কামনা করব না। আমি আপনার ব্যাপক দানশীলতা দেখেছি যে, তা প্রবল বারি বর্ষণকে ম্লান করে দিয়েছে।

فَسَقَاكَ رِضْوَانُ الْاِلٰهِ لِاَنَّنِىْ * لَا اَرْتَضِىْ سَقْيَا الْغَمَامِ الْهَاطِلِ۔

মহান আল্লাহ্ রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করুক। কারণ প্রবল বারি বর্ষণের পানীয় পানে আমি সন্তুষ্ট নই।

সুলতানের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ইমাদুদ্দীন এবং অন্যান্যরা বলেছেন "সুলতান মালিক নাসির মৃত্যুকালে তাঁর ব্যক্তিগত কাণ্ডে মাত্র একটি সিরীয় স্বর্ণ মুদ্রা ও ৩৬টি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা রেখে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর ত্যাজ্য সম্পদ ছিল মাত্র ৪৭ দিরহাম। কোন ঘরবাড়ি জায়গা জমি কিংবা ক্ষেত বাগান তিনি রেখে যাননি। অন্য কোন ধনসম্পদ ও তাঁর ছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর ১৭ জন পুত্র ও একজন কন্যা সন্তান জীবিত ছিল। অন্যান্যরা তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিল। সর্বমোট ১৬ জন পুত্র সন্তান তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। এদের মধ্যে বড় জন হলেন সুলতান আফযাল নুরুদ্দীন। ৫৬৫ হিজরী মুতাবিক ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঈদুল ফিতরের রাতে মিশরে তাঁর জন্ম হয়। এরপর আযীয ইমাদুদ্দীন আবুল ফাত্হ উছমান। ৫৬৭ হিজরী মুতাবিক ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুজাদাল ঊলা মাসে মিশরে তাঁর জন্ম হয়। এরপর যাহির মুযাফ্ফরুদ্দীন আবুল আব্বাস খিযির। তিনি ৫৬৮ হিজরী মুতাবিক ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ শা'বান মাসে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আফযালের সহোদর। এরপর যাহির গিয়াছুদ্দীন আবূ মনসূর গাযী। তিনি ৫৬৮ হিজরী মুতাবিক ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দে রামাদান মাসের ১৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর আযীয ফাতহুদ্দীন আবূ ইয়াকূব ইসহাক, তিনি ৫৭০ হিজরী মুতাবিক ১১৪৮ খ্রিস্টাব্দ রবিউল আউয়াল মাসে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর নাজমুদ্দীন আবুল ফাত্হ মাসঊদ। তিনি ৫৭১ বিজয়ী মুতাবিক ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দ দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আযীযের সহোদর। এরপর আগারর শারফুদ্দীন আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব। ৫৭২ হিজরী মুতাবিক ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি ও আযীযের সহোদর ছিলেন। এরপর যাহির মুজীরুদ্দীন আবূ সুলায়মান দাঊদ। ৫৭৩ হিজরী মুতাবিক ১১৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন যাহিরের সহোদর। এরপর আবুল ফযল কুতুবুদ্দীন মূসা। তিনি আফযালের সহোদর। ৫৭৩ হিজরী মুতাবিক ১১৫১ খ্রিস্টাব্দে মিশরে তাঁর জন্ম হয়। এক পর্যায়ে তিনি 'মুযাফফার' উপাধি প্রাপ্ত হন। এরপর আশরাফ মুইয্যুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ তিনি ৫৭৫ হিজরী মুতাবিক ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মুহসিন যহীরুদ্দীন আবূ মনসূর তূরান শাহ্। ৫৭৭ হিজরী মুতাবিক ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে মিশরে তাঁর জন্ম হয়। ৬৫৮ হিজরী মুতাবিক ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর জাওয়াল রুকনুদ্দীন আবূ সাঈদ আইয়ূব। তাঁর জন্ম

হয় ৫৭৮ হিজরী মুতাবিক ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মুইয্যুদ্দীনের সহোদর। এরপর গালিব নাসিরুদ্দীন আবুল ফাত্হ মালিক শাহ্। ৫৭৮ হিজরী মুতাবিক ১১৫৬ খ্রিস্টাব্দের রজব মাসে তাঁর জন্ম হয়। তিনি মুআয্যামের সহোদর। এরপর মনসূর আবূ বকর। তিনি মুআয্যামের ভাই। সুলতানের মৃত্যুর পর বাহরাইনে তাঁর জন্ম হয়। এরপর ইমাদুদ্দীন শাদী, ইনি তাঁর দাসীর ঘরে জন্ম নেয়া পুত্র। এরপর নাসিরুদ্দীন মারওয়ান। ইনি ও দাসীর ঘরে জন্ম নেয়া পুত্র। সুলতানের একমাত্র কন্যা ছিলেন মুনিসাহ খাতুন। আপন চাচাত ভাই মালিক আল কামিল মুহাম্মদ ইব্ন আদিল আবূ বকর ইব্ন আইয়ূবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মহান আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি দয়া করুন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদার দানশীলতার প্রেক্ষিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী মৃত্যুকালে কোন সম্পদ রেখে যেতে পারেননি। তিনি পানাহার পোশাক আশাক ও যান-বাহন ব্যবহারে খুবই মিতব্যয়ী ছিলেন। সুতা, পশম ও তুলার কাপড় পরিধান করতেন। কোন অপ্রীতিকর কাজে জড়িত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বিশেষত রাজাসনে বসার পর সকল মন্দকাজ সযতনে পরিহার করেছেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল ইসলামের বিজয় অর্জন এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করা। তিনি নিজে এবং তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শকগণ দিনে-রাতে সব সময় এই বিষয়েই চিন্তা-গবেষণা ও পরিকল্পনা করতেন। আরবি ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামী ইতিহাসে তাঁর প্রচুর দখল ছিল। বলা হয়ে থাকে যে আল-হাম্মামা বা বীরত্ব গাঁথা কাব্য তাঁর ঠোঁটস্থ ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'তের সাথে যথা সময়ে আদায় করতেন। মৃত্যুর বহুদিন পূর্ব হতে মৃত্যু পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাযেও তাঁর জামা'আত বাদ যায়নি। তাঁর মৃত্যু রোগেও জামা'আত বাদ যায়নি। এ সময়ে ইমাম তাঁর নিকট যেতেন এবং তাঁকে নিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করতেন। শারিরীক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের চেষ্টা করতেন। তাঁর দরবারে অনুষ্ঠিত আলাপচারিতা, সেমিনার ও বিতর্ক সভায় তিনি নিজে উপস্থিত থাকতেন। মনোযোগ সহকারে আলাপচারিতা ও মতামতসমূহ শ্রবণ করতেন। কুতুব নিশাপুরী তাঁর জন্যে আকীদা ও বিশ্বাস বিষয়ক তথ্য সম্বলিত একটি সংকলন তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে এগুলো মুখস্থ করতেন এবং তাঁর বাচ্চাদের মধ্যে যারা বোধসম্পন্ন তাদেরকে মুখস্থ করাতেন। কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ আলোচনা তিনি পছন্দ করতেন। কোনো কোনো সময় তিনি হাদীসের আলোচনায় বসে অবিরাম হাদীস শুনতে থাকতেন এবং বাহ্ বাহ্ বলে আনন্দ প্রকাশ করতেন। সাহিত্যিক ইমাদের ইঙ্গিতে এরূপ হত। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল। হাদীস শোনার সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। দীন ও শরী'আতের প্রতি প্রচন্ড শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর। তাঁর পুত্র যাহির এক সময় হালব অঞ্চলে অবস্থান করছিল। সেখানে এক যুবকের সাথে তার পরিচয় হয়। যুবকটি রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। সুলতান পুত্র ওই যুবকের ফাঁদে আটকা পড়ে। যুবকটি তাঁর সাথে ভাব গড়ে তোলে। গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ হয় তারা। এ পথে সে শরী'আতের বিধি বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। বিষয়টি সুলতানের গোচরীভূত হয়। তিনি পুত্রকে লিখিত নির্দেশ দেন ওই যুবককে হত্যা করার জন্যে। পিতার নির্দেশে সে যুবককে হত্যা করে এবং বিষয়টি সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করে দেয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁকে দু'টো প্রাচীরের মাঝে আবদ্ধ করে রাখা হয়। অবশেষে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনা ঘটে ৫৮৬ হিজরী মুতাবিক ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে।

সুলতান মালিক আন নাসির সালাউদ্দীন ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রচণ্ড সাহসী ব্যক্তি। সামান্য রোগ ব্যাধিও তাঁর মধ্যে ছিল বটে। আক্কা রাজ্য অবরোধের সময় তাঁর অসীম সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাঁর বীরত্ব ও সাহস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শত্রু-পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। কেউ বলেছেন ছয় লক্ষ। যুদ্ধে ওদের এক লক্ষ্য সৈন্য নিহত হয়।

এই যুদ্ধ যখন শেষ হয় ওরা যখন আক্কা হস্তান্তর করে এবং সেখানকার মুসলমানদেরকে হত্যা করে তখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সুলতান সালাহউদ্দীন ও তখন ওদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সাথে থাকা সৈন্যের চেয়ে ওদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বহু গুণে বেশী। তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন এবং শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করেন। তিনি ওদের আগে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় পৌঁছে যান এবং ওদের আক্রমন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করেন। তাঁর সেনাবহর নিয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করত শত্রুদেরকে ভয় দেখাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর নিকট নতি স্বীকার করে সন্ধি স্থাপন ও যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয়। তিনি প্রস্তাবে সম্মতি হন তাঁর চাহিদা মুতাবিক ওদের শর্তানুসারে নয়। এটি ছিল মু'মিনদের প্রতি মহান আল্লাহ্র অন্যতম প্রধান অনুগ্রহ। কারণ, এই সুত্র ধরে এই বৎসরগুলো শেষ না হতে তাঁর ভাই আদিল এতদসংশ্লিষ্ট শহরগুলো দখল করে নেন। এতে মুসলমানগণ জয়ী হয় আর কাফিরগণ হয় পরাজিত ও লাঞ্ছিত।

সুলতান সালাহউদ্দীন ছিলেন মুক্ত হস্তে দানকারী সদা হাস্যমুখ সুদর্শন পুরুষ। কল্যাণকর্মে তিনি কখনো পিছপা হতেন না। পূণ্য ও ইবাদতী কর্মে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতেন তিনি। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া ও রহমত নাযিল করুন। শায়খ শিহাবউদ্দীন আবূ শামা সুলতান সালাহুদ্দীনের আচার-আচরণ, বীরত্ব-সাহসিকতা, জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি মুখ পাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

পরিচ্ছেদ

সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলগুলো তাঁর পুত্রদের মাঝে বণ্টন করে দেন। মিশরীয় অঞ্চল প্রদান করেন তদীয়পুত্র আযীয ইমাদুদ্দীন আবুল ফাত্হকে। দামেস্ক এবং তদসংলগ্ন এলাকা বড় ছেলে আফযাল নুরুদ্দীন আলীকে প্রদান করেন। হালাবিয়া রাজ্য দিলেন আল যাহির গাযী গিয়াছুদ্দীনকে। ভাই আদিলকে দিলেন কুর্ক, শাবীক, জওয়ার ও ইউফেটিস অঞ্চলের প্রচুর শহর নগর। হামা এবং তার সাথে আরো কিছু জনপদ দিলেন সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র আল মনসূর মুহাম্মদ ইব্ন তাকীয়্যুদ্দীন উমারকে। হিমস, রাহবাহ্ ও আরো কিছু অঞ্চল দিলেন আসাদুদ্দীন ইব্ন শীরকূহ ইব্ন নাসিরুদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সিনিয়ার আসাদুদ্দীন ইব্ন শীরকূহকে। কিছু অংশ দিলেন তাঁর বৈমাত্রীয় ভাই নাজমুদ্দীন ইব্ন আইয়ূবকে। সন্নিহিত অঞ্চলসহ সমগ্র ইয়ামান ছিল সুলতান সালাহুদ্দীনের ভাই সুলতান যাহীরুদ্দীন সাইফুল ইসলাম তাগুততুগীন ইব্ন আইয়ূবের তত্ত্বাবধানে। বা'আলা বাক্কা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল আমজাদ বাহরাম শাহ্ ইব্ন ফাররুখ শাহের দখলে এবং বসরা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল যুফার ইব্ন নাসিরের দখলে। উল্লেখ্য যে, সুলতান সালাহুদ্দীনের ইনতিকালের পর এ সকল প্রদেশ ও রাজ্যে রাজনৈতিক মনোযোগ ও দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা দেয়। অবশেষে সুলতানের ভাই আদিল আবূ বকর কঠোর হয়ে এগুলো দমন করে সর্বত্র নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তাঁর বংশধরগণ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

এই হিজরী সনে খলীফা নাসির-লি-দীনিল্লাহ্ বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসা গ্রন্থাগারের সংস্কার ও উন্নতি সর্বত্র করেন। হাজার হাজার দুষ্প্রাপ্যও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেন। এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে বাগদাদে এক অভিনব কাণ্ড ঘটে। এক আটা ব্যবসায়ীর কন্যা তার পিতার এক ক্রীতদাসের প্রেমে পড়ে যায়। বিষয়টি ব্যবসায়ীর গোচরীভূত হওয়ার পর তিনি দাসিটিকে তাঁর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। মেয়েটি একরাতে ওই যুবককে গোপনে তার বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। যুবকটি রাতের বেলা চুপিসারে বাড়িতে প্রবেশ করে। সে তাকে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রাখে, রাতে তার বাবা বাড়িতে আসে। মেয়েটি যুবককে নির্দেশ দেয় তার বাবাকে হত্যা করার। গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসো সে ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। অতঃপর মেয়ের নির্দেশে তার মাকেও হত্যা করে। তার মাতা তখন অন্তসত্ত্বা ছিল। মেয়েটি তখন ওই যুবককে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি গহনা প্রদান করে। ঘটনাটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে পড়ে। তারা যুবকটিকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করে। নিহত ব্যবসায়ী খুবই ভাল লোক ছিলেন। দান-খয়রাতে তিনি ছিলেন উদার। বয়সে তরুন ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি। শায়খ আবূ আলী তূবাবী মারূফ কারখী এর কবরের পাশে নির্মিত মাদরাসায় পড়াশোনা শুরু হয় এই হিজরী সনে, এ উপলক্ষে সেখানে একটি দু'আ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সুলতান সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আইয়ূব : তাঁর ওফাতের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে।

আমীর বাকতামুর : তিনি খাল্লাত অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। এই হিজরী সনে তিনি নিহত হন। তিনি সাহসী চরিত্রবান ও সুশাসক ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

আতাবেগ ইজ্জুদ্দীন মাসউদ : তিনি মাওদূদ ইব্ন জঙ্গীর পুত্র। প্রায় ১৩ বৎসর তিনি মুসেলের শাসনকর্তা ছিলেন। সকল শাসকদের একজন ছিলেন তিনি। নূরুদ্দীন শহীদ তাঁর চাচা ছিলেন। মুসেলে নির্মিত তাঁর মাদরাসার পাশে নিজ সমাধিতে তাঁকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ইতিবাচক প্রতিফল দান করুন।

জাফর ইব্ন মুহাম্মদ পাটিরা : তাঁর উপনাম আবুল হাসান। ইরাকের পরিচিত লিখকদের একজন ছিলেন তিনি। শিয়া' মতবাদের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। ওই শহরের অধিকাংশ লোক সম্পর্কে এই অভিযোগ রয়েছে। মহান আল্লাহ ওদেরকে প্রচুর বরকত থেকে বঞ্চিত করুন। একদিন এক লোক এসে বলল আমি গতরাতে হযরত আলী (রা)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি ইব্ন ফাতীরার নিকট যাও এবং বল সে যেন তোমাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। ইব্ন ফাতীরা তাকে বললেন, তুমি স্বপ্নটি রাতের কোন্ সময়ে দেখেছ? সে বলল প্রথম অংশে দেখেছি। ইব্ন ফাতীরা বললেন আমি তো হযরত আলী (রা)-কে শেষ রাতে দেখেছি এবং তিনি আমাকে বলেছেন যে, এই চেহারা সুরত ও আকৃতি প্রকৃতির কোন লোক যদি তোমার নিকট এসে কিছু চায় তুমি তাকে কিছু দিবে না। একথা শুনে লোকটি ফিরে যাচ্ছিল। তিনি লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং যৎসামান্য কিছু দান করলেন। ইব্ন সাঈ তাঁর রচিত কবিতার যেটুকু সংকলন করেছেন তার অংশ বিশেষ এই–

وَلَمَّا سَبَرْتُ النَّاسَ اَطْلُبُ مِنْهُمُ * اَخَا ثِقَةٍ عِنْدَ اعْتِرَاضِ الشَّدَائِدِ۔

আমি যখন জনগণের নিকট গমন করি তখন ওদের মধ্যে খুঁজতে থাকি একজন বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিকে যে আমার বিপদের দিনে বন্ধু হিসেবে উপস্থিত হবে।

وَفَكَّرْتُ يَوْمَيْ سُرُوْرِيْ وَشَرَائِرِيْ * وَنَادَيْتُ فِي الْاَحِبَّاءِ هَلْ مِنْ مُسَاعِدٍ۔

আমার সুখের দিন ও দুঃখের দিন নিয়ে একদিন আমি চিন্তা ভাবনা করলাম এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে ঘোষণা দিলাম যে, আমার সাহায্য সহায়তাকারী কেউ আছ কি?

فَلَمْ اَرَ فِيْمَا سَاءَنِيْ غَيْرَ شَامِتٍ * وَلَمْ اَرَ فِيْمَا سَرَّنِيْ غير حاسد

তাতে আমার বিপদে খুশী হওয়া শত্রু ব্যতীত অন্য কাউকে আমি অপ্রীতিকর খুঁজে পাইনি। এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ শত্রু ব্যতীত অন্য কাউকে আমার নিকট সুখকর ও আনন্দদায়ক মনে হয়নি। ইয়াহ্য়িয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন গাযী ঃ তিনি মাকামাত সাহিত্য রচয়িতা আবুল আব্বাস বসরী নাজরানী। তিনি একজন খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ভাষা শাস্ত্র ও কাব্য শাস্ত্রে তার ব্যাপক দখল ছিল। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ এই :

غَنَاءُ خَوْدٍ يُنْسَابُ لُطْفًا * بِلَا عِنَاءٍ فِيْ كُلِّ اِذْنٍ۔

সুন্দরী কুমারী কিশোরীর গান বিনা বাধায়-বিনা কষ্টে সকল কানের মধ্যে প্রবেশ করে।

مَا رَدَّهُ قَطُّ بَابُ سَمْعٍ * وَلَا اَتَيْ زَائِرًا بِاِذْنٍ۔

কোন কানের প্রবেশ পথ সেটিকে ফিরিয়ে দেয় না এবং সেটির কোন সাক্ষাত প্রার্থীর নিকট অনুমতি নিয়ে আসে না।

সাইয়েদা যুবায়দা : তিনি ইমাম মুত্তাকী-লি-আমরিল্লাহ্ এর কন্যা, মুসতানজিদের বোন এবং মুনতানদী-এর ফুফু। তিনি সুদীর্ঘ আয়ুকাল পেয়েছিলেন। তাঁর বিয়ের দেন-মোহর হিসেবে বিশাল অংকের অর্থ পেয়েছিলেন। সুলতানের জীবনকালে মাসঊদ তাঁকে বিয়ে করেছিলেন এক লক্ষ দীনার দেন-মোহর ধার্য করে। কিন্তু তাঁর সাথে বাসর যাপনের পূর্বেই তাঁর ওই স্বামীর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য তিনিই ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করতেন না। ফলে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হল এবং তিনি ধার্যকৃত দেন মোহর দাবী করলেন।

পূণ্যবতী শায়খা সালেহা ফাতেমা খাতুন : তিনি মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আল উমারদের কন্যা, ইবাদত বন্দেগীতে দিন কাটাতেন তিনি। পার্থিব স্বার্থ চিন্তা ও লোভ লালসা তার মধ্যে ছিল না। ১৬৬ বৎসর জীবিত ছিলেন তিনি। সেনাপতি মুতা তাঁকে বিয়ে করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন কুমারী শিশু। স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। এ সময়ে অধিক হারে তিনি মহান আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী ও যিকর আযকারে নিয়োজিত হন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন।

এই হিজরী সনে খলীফা নাসির আব্বাসী শায়খ আবুল ফারজ ইবনুল জূযীকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি আ'দী ইব্ন যায়দের প্রসিদ্ধ কবিতামালার সাথে এ রকম আরো কিছু কবিতা সংযোজন করেন। এটি যদি ১০ খণ্ড ও হয় তাতে আপত্তি নেই। আদী ইব্ন যায়দের কবিতামালার অংশবিশেষ এই ঃ

أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْرِ * أَأَنْتَ الْمُعْبَرُأُ الْمَوْفُوْرَ۔

ওহে শত্রুর দুঃখে আনন্দ প্রকাশ কারী, সময়ের দুর্দশায় লজ্জা দানকারী তুমি কি মুক্ত? তুমি কি খুব সম্মানিত?

أَمْ لَدَيْكَ الْعَهْدُ الْوَثِيْقُ مِنَ الْاَيَّامِ * بَلْ اَنْتَ جَاهِل مَغْرُوْرٌ۔

তোমার নিকট কি দুর্যোগ থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে? তুমি বরং প্রতারিত মুর্খ।

مَنْ رَأَيْتُ الْمَنُوْنُ خَلَدَتْ * اَمْ مَنْ ذَا عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّضَامَ خَضِيْرُ۔

তুমি কাকে দেখেছ যে, মৃত্যু তাকে তুলে না নিয়ে চিরদিন রেখে দিয়েছে? কিংবা এমন কে আছে যে, নির্যাতিত ও দুর্দশা গ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষার জন্যে তার নিকট সদা প্রহরী রয়েছে?

اَيْنَ كِسْرٰى كَسَّرَ الْمُلُوْكَ اَبُوْ سَاسَانَ اَمْ اَيْنَ قَبْلَهُ سَابُوْرُ۔

সব রাজা বাদশার ঘাড় মটকিয়ে দেয়ার দাপট সমৃদ্ধ পারস্য সম্রাট আবূ সাসান কিংবা তার পূর্ববর্তী শাসক সাবূর আজ কোথায়?

وَبَنُوا الْاَصْفَرِ الْمُلُوْكُ مُلُوْكُ الرُّوْمِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَذْكُوْرُ۔

রোমান রাজ পরিবার বানূ আসফার এখন কোথায়? উপরোল্লেখিত রাজা বাদশার কেউই তো এখন অবশিষ্ট নেই।

وَاُخُوا الْخَضِرِ وَاِذْ بَنَاهُ وَاِذْ * دِجْلَةُ تَجِيْئُ اِلَيْهِ وَالْخَابُوْرُ۔

খাযির প্রাসাদ কোথায় যেখানে দজলা নদী প্রবাহিত হত, সেই মনোরম ফুল বাগিচা কোথায়।

شَادَهٗ مَرْمَرًا وَحَلَّله كَلْسًا * فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وُكُوْر۔

সংশ্লিষ্ট সম্রাট ওই প্রাসাদকে মর্মর পাথর দ্বারা সুসজ্জিত করেছিল আর চোখ বাঁধানো রং দ্বারা রাঙিয়ে তুলেছিল। এখন সেটির চূড়ায় রয়েছে পাখির বাসা।

وَلَمْ تُهِبْهُ رَيْبُ الْمَنُوْنُ فَزَالَ * الْمُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهٗ مَهْجُوْر۔

যুগ যুগান্তরে দুর্যোগ দুর্দশা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। অতঃপর এক পর্যায়ে তার রাজত্বের অবসান ঘটল, তার দরজা ও ফটক এখন পরিত্যক্ত।

وَتَذَكَّرْ رَبَّ الْخَوْرَنَقِ إِذْ أَشْرَفَ يَوْمًا وَلاهدى تكفير۔

তুমি কি খাওরানাক প্রাসাদের মালিকের কথা স্মরণ কর। একদিন সে সুসজ্জিত হয়ে প্রাসাদ ছাদে উঠেছিল। হিদায়াতের প্রতি ছিল তার অস্বীকৃতি।

سَرَّهٗ حَالُه وَكَثْرَة مَا مَيْلِكُ * وَالْحَجْرُ مَعْرِضًا وَالسَّدِيْرُ۔

তার অবস্থা তাকে আনন্দিত করেছিল। তার মালিকানাধীন সম্পদ-সম্পত্তি তাকে প্রীতি করেছিল। বিস্তৃত সমুদ্র ও ঝর্ণাসমূহ তাকে উৎফুল্ল করেছিল–

فَارعوى قَلْبِه وَقَالَ وَمَا غِبْطَةُ حَيٍّ إِلَى الْمَمَاتِ يَصِيْرُ۔

অতঃপর তাঁর হৃদয় ভীত ও কম্পিত হয়ে পড়ল, সে বলল হায় জীবিত মানুষের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণের কী যুক্তি আছে? সে তো মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

ثُمَّ بَعْدَ الْفَعِيْمِ وَالْمُلْكِ وَالنَّهْيِ وَالْاَمْرِ وَأُرْثُهُمْ هُنَاكَ قُبُوْرُ۔

তারপর নেয়ামতরাজি ভোগ উপভোগ, রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের দাপট এবং আদেশ নিষেধের ছড়ি ঘুরানোর পর কবরসমূহ তাদেরকে ঢেকে ফেলেছে।

ثُمَّ اَضْحَوْا كَاَنَّهُمْ اَوْرَقٌ * جَفَّتْ فَاَلْوَتْ بِهَا الصَّبَا وَالدَّبُوْرُ۔

এরপর তারা হয়ে গেল শুকনো পাতার মত, পুবাল ও পশ্চিমা বায়ু যেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

غَيْرَ اَنَّ الْاَيَّامَ تَخْتَصُّ بِالْمَرْءِ * وَفِيْهَا لَعَمْرِيْ الْعِظَاتُ وَالتَّفْكِيْرُ۔

তবে যুগ পরিক্রমা প্রকৃত মানুষকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। এর মধ্যে রয়েছে নসীহত, তা উপদেশ ও চিন্তা ভাবনার বিষয়।

৫৯০ হিজরী সন (১১৯৪ খ্রি.)

সালাহুদ্দীনের পুত্র মালিক আফযাল যখন দামেস্কে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন খলীফা আল নাসিরের নিকট বহু উচ্চমূল্যের হাদিয়া ও উপহার প্রেরণ করলেন। তার মধ্যে ছিল তাঁর পিতার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং যে অশ্বে আরোহণ করে তাঁর পিতা জিহাদে অংশ নিতেন সেই অশ্ব। হিত্তীন যুদ্ধে ফ্রাংক যোদ্ধাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া ক্রুশ চিহ্ন। উপহারের মধ্যে আরো ছিল উচ্চমানের মণি মুক্তো খচিত ২০ রিতলের অতিরিক্ত স্বর্ণ, ফ্রান্সের রাজ পরিবার ভুক্ত বন্দী হওয়া চার যুবতী মেয়ে। সাথে ছিল সাহিত্যিক ইমাদের একটি কাব্যগ্রন্থ যার বিষয় ছিল মৃত

সুলতানের জন্যে শোকগাঁথা এবং যুবরাজ আফযালের পক্ষে শাসন ক্ষমতা মঞ্জুরীর আবেদন। বস্তুত খলীফা এই আবেদন গ্রহণ করেছিলেন।

এই হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে মরহুম সুলতান সালাহুদ্দীনের পুত্র মিশরের শাসক আযীয দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তদীয় ভ্রাতা আফযাল থেকে দামেস্কের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার জন্যে। ৬ জুমাদাল উলা তিনি কাসওয়া নামকস্থানে তাঁবু স্থাপন করেন এবং শহর দামেস্ক শহর অবরোধ করে রাখেন। তাঁর ভাই আফযাল তাঁকে প্রতিরোধ করেন এবং শহরে প্রবেশে বাধা দেন। অতঃপর আযীয নদ-নদীগুলো নষ্ট করে দেন, ফল ফসলে লুটতরাজ চালান। পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠে। ক্রমান্বয়ে তা অধিকতর অবনতির দিকে ধাবিত হয়। এক পর্যায়ে তাঁদের চাচা আদিল সেখানে আগমন করেন এবং উভয়ের বিরোধ মীমাংসা করত পরিস্থিতি শান্ত করেন। বিরোধের স্থায়ী সমাধান কল্পে তিনি এই প্রস্তাব প্রদান করেন যে, আল কুদস এবং সংলগ্ন এলাকাসহ ফিলিস্তিন থাকবে আযীযের অধীনে। জাবাল্লা ও লাযিকিয়্যাহ থাকবে হালবের শাসক যাহিরের অধীনে। সিরিয়া ও দ্বীপাঞ্চলের সাথে মিশরের প্রথম অংশসমূহ যেমন হাররান, রাহা, জরওয়ার ও সংলগ্ন অঞ্চল থাকবে চাচা আদিলের অধীনে। সংশ্লিষ্ট সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বিরোধের অবসান ঘটে। যুবরাজ আযীয তারা চাচা আদিলের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এক পর্যায়ে আযীয অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে সুস্থতা লাভ করেন। এ সময়ে তিনি 'মারজ আল সাফার' অঞ্চলে তাঁবু ফেলেছিলেন। তাঁর নতুন বিবাহ, রামন্দু ও সন্ধি স্থাপন উপলক্ষে তাঁকে অভিবাদন জানানোর জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ আসতে থাকেন। এরপর পরিবার পরিজনের আকর্ষণ তিনি পুনরায় মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ আফযাল বখাটে বয়ে যায়। সে উচ্ছন্নে যেতে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্যে বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায়। তার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তার বাবার সময়ের প্রবীন কর্মচারীগণ তার নিকট হতে দুরে সরে যায়। সে আমোদ প্রমোদ ও নেশাখোরীতে জড়িয়ে পড়ে। তার মন্ত্রী জিয়াউদ্দীন ইব্‌ন আছীর জায্‌রী তাঁকে এ পথে টেনে আনে। ফলে সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে যুবরাজ আফযালকেও ধ্বংস করেছে। দু'জনে পথভ্রষ্ট হয়েছে। দু'জনেরই ধন সম্পদ মান-সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয়েছে।

এই হিজরী সনে গযনীর ও সম্রাট শিহাবুদ্দীন এবং ভারতের কাফিরদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শত্রুপক্ষ লক্ষ লক্ষ সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ওদের সাথে সাতশত সাদা হাতি ছিল, এ জাতীয় হাতি ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়, প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। এমন কঠিন যুদ্ধ ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। মাল্লাহূন নামে এক নদীর নিকট এসে সম্রাট শিহাবুদ্দীন ওদেরকে পরাজিত করেন। ওদের রাজা নিহত হয়, ওদের সহায় সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্র সব মুসলমানগণ দখল করে নেয়। ওদের হাতিগুলোও মুসলমানদের হস্তগত হয়। অতঃপর মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের বড় রাজার এলাকায় প্রবেশ করে। ওখান থেকে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধন রত্ন নিয়ে আসে। ওই সব ধন রত্ন বহনের জন্যে এক হাজার চারশত উটের প্রয়োজন হয়, এরপর সম্রাট শিহাবুদ্দীন সুস্থ ও নিরাপদে বিজয়ীবেশে নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন।

সুলতান খারিযাম শাহ ওরফে ইব্‌নুল আসবাঈ এই হিজরী সনে রায় অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকার শহরগুলো দখল করে নেন। তিনি সুলতান তুঘ্রিলবেগ সেলজুকীর সাথে চুক্তি সম্পাদন

করেন। তুগ্রিলবেগ রায় অঞ্চল এবং তদীয় ভ্রাতা সুলতান শাহের রাজ্য ও ধনসম্পদ খারিযাম শাহের নিকট হস্তান্তর করে। এই বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান খারিযাম এবং সুলতান তুগ্রিলবেগ মুখোমুখি হয়। খারিযাম তার প্রতিপক্ষ তুগ্রিলবেগকে হত্যা করেন তার মাথা পাঠিয়ে দেন খলীফার নিকট। দরবারের সদর দরজায় বহুদিন ওই মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ কাজের জন্যে খলীফা উচ্চমূল্যের উপহার প্রদান করেন সুলতান খারিযামকে। এবং হামাদান ও তৎসংলগ্ন এলাকা তাঁর অধীনস্থ করে দেন।

এই হিজরী খলীফা অসন্তুষ্ট হন শায়খ আবুল ফারজ ইব্নুল জূযী এর প্রতি তিনি তাঁকে ওয়াসিত প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি পাঁচ দিন ছিলেন কোন পানাহার ছাড়া, শায়খ ইব্নুল জূযী সেখানে মোট পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। এ সময়ে নিজেই নিজের সব কাজ করেছেন নিজ হাতে পানি সংগ্রহ করে পান করেছেন। তখন তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। তাঁর বয়স ছিল ৮০ বৎসর। সেখানে তিনি দিনে রাতে মিলে প্রতিদিন এক বার করে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে শেষ করতেন। তিনি বলেন, সূরা ইউসুফ পাঠ করতে গেলে আমার পুত্র ইউসুফের শোকে আমি অস্থির ও বেখোদ হয়ে পড়ি তাই আমি সূরা ইউসুফ পাঠ করিনি, পাঁচ বৎসর পর মহান আল্লাহ তাঁর দুঃখের অবসান ঘটান।

৫৯০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আহমদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইউসুফ : তিনি হলেন আবুল খায়ের কাযভীনী শাফিঈ। তিনি একজন খ্যাতিমান তাফসীর কার ছিলেন। এক সময়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেন। নিযামিয়া মাদরাসায় ওয়ায নসীহত করতেন। ইসলামের মূলনীতি বা উসূল শাস্ত্রে তিনি ইমাম আশআরীর অনুসরণ করতেন। একদিন আশুরা দিবসে তিনি মজলিসে বসা ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে বলল ইয়াযীদের প্রতি লা'নত কামনা করতে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "সে তো একজন মুজতাহিদ ইমাম।" একথা শুনে লোকজন তাঁর প্রতি ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। তিনি আত্মগোপন করলেন এবং গোপনে বাগদাদ ছেড়ে জন্মস্থান কাযভীনে চলে গেলেন।

ইবনুশ শাতিবী : তিনি হলেন আবুল কাসিম ইব্ন কাসীরাহ ইব্ন আবুল কাসিম খালফ ইব্ন আহমদ রাঈনী শাতিবী। তিনি চোখে দেখতেন না। সপ্ত কিরআত তথা সাত প্রকারে কুরআন পাঠের নিয়মাবলী সম্বলিত আশ-শাতিবিয়্যাহ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। এ বিষয়ে অন্য কেউ তার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারেনি তার সমকক্ষও হতে পারেনি। ওই গ্রন্থে এতসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা একান্ত মনোযোগী ও বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী ব্যতীত সাধারণ মানুষের জন্যে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। ৫৩৮ হিজরী মুতাবিক ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্মস্থান হল পূর্ব স্পেনের শাতিবা জনপদ। তিনি দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর শহরের খতীব পদে তাঁকে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু খুতবা দিতে মিম্বরে উঠে খতীবগণ সংশ্লিষ্ট রাজা বাদশাদের গুণ কীর্তনে যে সীমালংঘন করে তা দেখে তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এক পর্যায়ে তিনি হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৫৭২ হিজরী মুতাবিক ১১৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইশকান্দরিয়া শহরে এসে পৌছেন। এ সময়ে ইমাম সালাফীর নিকট তিনি হাদীস শুনেন। সেখানকার বিচারক তাঁকে তাঁর মাদরাসার কিরআত বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ দেন।

শাতিবী অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন এবং সেখানে রামাদান মাসের রোযা আদায় করেন। এরপর তিনি কায়রো ফিরে আসেন। এই ৫৯০ হিজরী মুতাবিক ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে তাঁর ওফাত হয়। ফাযিলিয়্যাহ সমাধির পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি একজন দ্বীনদার, বিনয়ী, খোদাভীরু, ইবাদতী ও আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তি ছিলেন। অর্থহীন বাজে কথাবার্তা তিনি মোটেই বলতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি এই পংক্তিগুলো ব্যবহার করে উপমা দিতেন :

أَتَعْرِفُ شَيْئًا فِي السَّمَاءِ يَطِيْرُ * إِذَا سَارَهَاجَ النَّاسُ حَيْثُ يَسِيْرُ۔

তুমি কি এমন একটি বস্তু সম্পর্কে জান যেটি আকাশে উড়ে বেড়ায়? এটি যখন ভ্রমণ করে তখন এটি যেখানে যায় মানুষ সেখানে ভিড় জমায়।

فَتَلْقَاهُ مَرْكُوْبًا وَتَلْقَاهُ رَاكِبًا * وَكُلُّ أَمِيْرٍ يَعْتَلِيْهِ أَسِيْرُ۔

অতঃপর সেটিকে সাক্ষাত লাভ করে আরোহী হয়ে এবং বাহন হয়ে। শুনে নাও প্রত্যেক সেনাপতিকে বন্দী ব্যক্তি সম্মান করে থাকে।

يَحُثُّ عَلَى التَّقْوٰى وَيَكْرَهُ قُرْبَهُ * وَتَنْفِرُ مِنْهُ النَّفْسُ وَهُوَ نَذِيْرُ۔

মানুষ অন্যকে তাকওয়া অর্জনে উৎসাহিত করে কিন্তু নিজে তাকওয়ার কাছাকাছি পৌছতে পসন্দ করেন। মানব প্রবৃত্তি তাকওয়া থেকে দূরে সরে থাকে অথচ মানুষ অন্যকে সতর্ক করে।

وَلَمْ يَسْتَنْزِرْ عَنْ رَغْبَةٍ فِيْ زِيَارَةٍ * وَلٰكِنْ عَلٰى رَغْمِ الْمَزُوْرِ يَزُوْرُ۔

মৃত্যুর মুখোমুখি হবার আগ্রহে কমতি দেখা যায় না, কিন্তু সময়মত মৃত্যু এলে অনিচ্ছাসত্ত্বে তার সাথে সাক্ষাৎ করে।

৫৯১ হিজরী সন (১১৯৫ খ্রি.)

এই হিজরী সনে কর্ডোভার উত্তরে স্পেনীয় শহর মারজ আল হাদীদে এক ভীষণ দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এটি হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ক্রুসেড। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে মহান আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং ক্রুশপন্থীদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। ফ্রান্সের রাজা পিটার মুসলিম আমার ইয়াকূব ইব্ন ইউসুফ ইব্ন আবদুল মুমিনের নিকট একটি দীর্ঘ পত্র লিখে পাঠায়। পত্রটিতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং হুমকি ধমকিতে ভর্তি ছিল। সে মুসলিম আমীর ইয়াকূবকে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। সুলতান ইয়াকূব তারই লিখিত পত্রের উপরিভাগে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত লিখেছেন :

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِ جَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ۔

(তুমি ওদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই ওদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এমন এক সৈন্যবাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি ওদের নেই। আমি অবশ্যই ওদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করব লাঞ্ছিত ভাবে এবং ওরা হবে অবনমিত। (সূরা নাম্ল : ৩৭)। অতঃপর তিনি পত্রটি ওদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন। এদিকে কালবিলম্ব না করে তিনি তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে যাত্রা শুরু করেন ওদেরকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্যে পথ ঘাট পেরিয়ে তিনি স্পেনে

পৌঁছে যান। নির্ধারিত স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। যুদ্ধ শুরু হয় যুদ্ধের গতি হয়ে উঠে দোদুল্যমান। প্রথমে যুদ্ধের গতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যায়। তখন প্রায় বিশ হাজার মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি মোড় পরিবর্তন করে। যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের পক্ষে এসে যায়। মহান আল্লাহ্ শত্রুপক্ষকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে দেন। জঘন্যভাবে ওদেরকে অপমানিত করেন। ওদের প্রায় এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়, ১৩ হাজার সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, মুসলমানগণ এই যুদ্ধে বিশাল পরিমানে গণীমত তথা শত্রু সম্পদ অধিকার করে। তার মধ্যে ছিল এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তাঁবু, ছেচল্লিশ হাজার ঘোড়া, এক লক্ষ খচ্চর, এক লক্ষ গাধা, সত্তর হাজার পূর্ণাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য ধন-সম্পদ, দূর্গ ও প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা যহরত। ওদের টেলিটালাহ্ শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন বহুদিন। শেষ পর্যন্ত সেটি জয় করেননি। নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

ফ্রান্স সম্রাট পীটার শোচনীয় এই পরিনতিতে আত্ম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সে তার মাথা ন্যাড়া করে ফেলে দাঁড়ি গোঁফ-ছেঁচে ফেলে, তাঁর ক্রুশ চিহ্নকে উপুড় করে রাখে, গাধার পিঠে চড়তে থাকে, ঘোড়ায় আরোহন করে না, ভাল খাবার ছেড়ে দিয়েছে, স্ত্রীর সাথে ঘুমানো বর্জন করেছে এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, খ্রিস্টবাদকে বিজয়ী না করা পর্যন্ত সে এভাবেই চলবে; সুখকর কোন কিছু স্পর্শ করবে না। এরপর সে ফ্রান্স অঞ্চলীয় সকল শাসকের সাথে সাক্ষাত করে এবং ক্রুসেড পরিচালনার জন্যে এত প্রচুর সংখ্যায় সৈন্য সংগ্রহ করে যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এদিকে সুলতান ইয়া'কূব তার প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এক সময়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। অতীতের যে কোন যুদ্ধের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় উভয় দলের মধ্যে। ফরাসীগণ এবার পরাজিত হয় আগের চেয়ে অধিক গ্লানি সহকারে। মুসলমানগণ পূর্ববর্তী যুদ্ধের মত এই যুদ্ধেও সেই পরিমান কিংবা তার চেয়ে অধিক গণীমত ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধিকার করে। সুলতান ইয়া'কূব ওদের অধিকাংশ দুর্গ ও অস্ত্রাগার দখল করে নেন। সকল প্রশংসা ও আনুগত্য মহান আল্লাহর প্রতি। মুসলমানগণ এত বেশী ধন-সম্পদ এই যুদ্ধে অর্জন করে যে, অল্প মূল্যে সেগুলো বিক্রি করতে হয়েছে। কথিত আছে যে, তখন একজন ক্রীতদাস বিক্রি হয়েছে এক দিরহামে ঘোড়া বিক্রি হয়েছে পাঁচ দিরহামে। তাঁবু বিক্রি হয়েছে এক দিরহামে। একটি তরবারি বিক্রি হয়েছে তার চেয়েও কম দামে। সুলতান যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ শরীআতী বিধান অনুসারে। ফলে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণ চিরদিনের জন্যে স্বচ্ছল ও সম্পদশালী হয়ে গেলেন। এরপর ফরাসিগণ সুলতানের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেয়। তিনি ওদেরকে পাঁচ বৎসরের পূর্ণ যুদ্ধ বিরতি মেনে নিয়ে চুক্তি করতে বাধ্য করেন। তারা সেই শর্তে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এদিকে আলী ইব্ন ইসহাক নূরী ওরফে মাকলাছিম নামের এক ব্যক্তি আফ্রিকান অঞ্চলে গজিয়ে উঠে। সুলতানের অনুপস্থিতিতে সে এখানে বহু অঘটন ঘটায়। ফরাসীদের সাথে যুদ্ধ উপলক্ষে তিন বছর এই অঞ্চলে সুলতানের অনুপস্থিতিতে সে এইসব অস্থিতিশীল ঘটনা সংঘটিত করার সুযোগ পায়। এখানে সে বিভিন্ন ফিতনা সৃষ্টি করে। বহু মানুষকে হত্যা করে এবং কতগুলো শহর তার নিজের দখলে নিয়ে নেয়।

এই হিজরী সনে এবং এর পূর্ববর্তী বৎসর সমূহে খলীফার অনুগত সৈন্যগণ রায়, ইস্পাহান, হামাদান, খুযিস্তান ও অন্যান্য শহরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় সর্বত্র খলীফা ও

সুলতানদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই হিজরী সনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর পুত্র আল আযীয মিশর থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তার ভাই আফযাল থেকে দামেস্কের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। যুবরাজ আফযাল তখন তাওবা ইসতিগফার করত তার মন্দ চরিত্র পরিত্যাগ করে সুপথে এসে গিয়েছিল, আমোদ প্রমোদ ও নেশা করা ছেড়ে দিয়ে রোযা-নামায ও ইবাদত বন্দেগীর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তিনি নিজ হাতে কুরআন মজীদের একটি পাণ্ডুলিপি লিখতে শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর মন্ত্রী যিয়াজায্রী তখন ও তাঁকে বিভ্রান্ত করা ও তাঁর রাজ্য ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মিশর থেকে তাঁর ভাই আযীয আসছেন দামেস্ক দখল করার জন্যে এ সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত জাওয়ারে তাঁর চাচা আদিলের নিকট গমন করেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করেন। তিনি আফযালের সাথেই যাত্রা করেন এবং তাঁর আগে দামেস্ক এসে পৌঁছেন। আফযাল সেখান থেকে হাল্ব অঞ্চলে তাঁর ভাই যাহিরের নিকট গমন করেন। তাঁরা দুজনে দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে আযীয দামেস্কের কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং এই সংবাদ অবহিত হয়ে দ্রুত মিশরে ফিরে যায়। চাচা আদিল ও ভাই আফযাল তার পশ্চাদ্ধাবন করে তার নিকট থেকে মিশরের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার জন্যে। তাঁরা দুজনে এ বিষয়ে একমত হন যে, মিশর অধিকার করে তার $\frac{২}{৩}$ অংশ নিবেন আদিল এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ নিবেন আফযাল। এরপর আদিল এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি আযীযকে ওখান থেকে যেতে বলেন আর আফযালকেও যেখানে রয়েছে সেখানে অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি নিজে ব্যালিবাস নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। অবশেষে আযীযের দূতরূপে কাযী আল ফাযিল আগমন করেন। তখন ত্রিপক্ষায় একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাঁরা একমত হন যে, আল কুদস ও তৎসংলগ্ন এলাকা আফযালের অধীনে থাকবে এবং আদিল তাঁর মিশরীয় অঞ্চলের পূর্বেকার দখলাধীন এলাকা শাসন করবেন। অতঃপর আদিল সেখানে থেকে যান আর আফযাল দামেস্কে ফিরে আসেন। এটি এমন একটি চুক্তি হল যা বাহ্যিকভাবে সন্ধি চুক্তি হলেও মূলত এর মধ্যে অধিকতর বিশৃংখলা নিহিত ছিল।

৫৯১ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আলী ইব্ন হাসসান ইব্ন সাফির : তাঁর উপনাম আবুল হাসান। তিনি একজন সু-সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। বাগদাদ কেন্দ্রিক অবস্থানের কারণে তাঁকে বাগদাদী বলা হত। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

نَفٰى رُقَادِىْ وَمَضٰى ـ يَرَقٌ بِسِلْعٍ وَمَضَا لَاحَ * كَمَا سَلَّتْ يَدُ الْاَسْوَدِ غَضْبًا اَبْيَضَا ـ

আমার নিদ্রা তিরোহিত হয়েছে, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত আমার সহায় সম্পদ নিয়ে গিয়েছে।

ওই বিদ্যুৎ দৃশ্যমান হয়েছে চোখ ধাঁধিয়ে যেমন রুদ্র মূর্তি সিংহ শিকার ধরার জন্যে তার শ্বেত শুভ্র পাঞ্জা প্রসারিত করে।

كَاَنَّهٗ الْاَشْهَبُ فِى النَّقْعِ اِذَا مَا رَكَضَا يَبْدُوْ * كَمَا تَخْتَلِفُ الرِّيْحُ عَلٰى جَمْرِ الفضا ـ

ওই বিদ্যুৎ-বিজলী স্বচ্ছতায় যেন উল্কা পিণ্ড।

সেটি থেকে থেমে বার বার প্রকাশিত হচ্ছে যেমন গাযা বৃক্ষের জ্বলন্ত কয়লায় দমকা বাতাস বারে বারে আসে।

فَتَحْسَبُ الرِّيْحَ اَبَدًا نَظَرًا وَّغَمْضًا * أَو شُعْلَةَ مِنَ النَّارِ عَلَا لَهِيْبُهَا وَانْخَفَضَا۔

তাতে তুমি মনে করবে যে, এই বাতাস কখনো চক্ষু খুলে তাকাচ্ছে আবার কখনো চক্ষু মুছে ঘুমোচ্ছে।

অথবা এটিকে মনে হবে অগ্নিমশাল, যার শিখা কখনো উর্ধ্বমুখী হচ্ছে আবার কখনো নিম্নমুখী।

اهلَهُ مِنْ بَارِقٍ ضَاءَ عَلَى ذَاتِ الْاَضَا * اذكرَنِىْ عَهْدًا مَضَى عَلَى الْغَوِيْرِ وَانْقَضٰى۔

হায়রে দুঃখ তার জন্যে, সেই বিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে যেটি আযা বৃক্ষবিশিষ্ট পর্বতে দৃশ্যমান হয়েছে।

এটি তো আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল আমার সেই সময়ের কথা যেটি পার্বত্য অঞ্চলে অতিবাহিত হয়েছে।

فَقَالَ لِيْ قَلْبِيْ اَتَوَصَّى حَاجَةً وَاَعْرَضَا * يَطْلُبُ مَنْ اَمْرَضَهُ فَدَيْتَ ذَاكَ الْمرضا۔

তখন আমার হৃদয় বলল, আমি একটি প্রয়োজনের বিষয় অসিয়ত কর এবং পেশ করব।

সে তো খুঁজছে এমন কাউকে যে তাকে অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছে। তুমি তো ওই অসুস্থ কারীকে ছেড়ে দিয়েছ।

يَا غَرَضَ الْقَلْبِ لَقَدْ غَادَرْتَ قَلْبِيْ عَرَضًا * لِاَسْهُمٍ كَاَنَّمَا يُرْسِلُهَا صَرْفُ الْقَضَا۔

ওহে আমার হৃদয়ের কাংখিত ধন-লক্ষ্য বস্তু। তুমি তো আমার হৃদয়কে এমন সব বর্শার লক্ষ্য বস্তু করেছ যেগুলোকে মনে হয় খোদায়ী নির্দেশই প্রেরণ করেছে।

فَبِتُّ لَا اَرْتَابُ فِيْ اَنَّ رُقَادِيْ قَدْ مضى * حَتّٰى قَفَا اللَّيْلُ وَكَادَ اللَّيْلُ اَنْ يَنْقَرِضَا۔

অতঃপর রাত কাটালাম এটা সন্দেহাতীত ভাবে জেনে নিয়ে যে, আমার নিদ্রা বিদুরিত হয়েছে।

এভাবে রাত্রি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং রাত্রি শেষ হবার উপক্রম হল।

وَاَقْبَلَ الصُّبْحُ لِاَطْرَافِ الدُّجَا مَبَيِّضًا * فِيْ وُسَلَّ الشرق عَلَى الْغَرْبِ ضِيَاءٌ وَانْقَضٰى۔

এবং রাতের প্রান্ত গুলোকে শুভ্র ও শ্বেত বন করে ভোর এল।

এভাবে উদ্ভাসিত পূর্ব। দিগন্তে প্রভাত আলো এবং কেটে গেল রাত।

৫৯২ হিজরী সন (১১৯৬ খ্রি.)

এই হিজরী সনের রজব মাসে সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর পুত্র আল আযীয মিশর থেকে যাত্রা শুরু করেন দামেস্কের উদ্দেশ্যে। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আদিল। তাঁদের সাথে বহু সেনা বিশিষ্ট সেনাবহর ছিল। তাঁরা জোর জবরদস্তি করে দামেস্কে প্রবেশ করেন এবং যুবরাজ আফযালকে এবং তাঁর কুপরামর্শদাতা মন্ত্রীকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন। সুলতান আযীয তাঁর পিতা সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সমাধির নিকট নামায আদায় করেন। দামেস্কে তাঁর নিজের নামে খুতবা প্রদান করেন। একদিন মানসূরাহ দূর্গে প্রবেশ করেন। বিচার কার্য-সম্পাদনের জন্যে দার-আল আদল" এ- উপবেশন করেন। তিনি এসব করছিলেন আদর তাঁর ভাই আফযাল তাঁর খেদমতে

নিয়োজিত ছিলেন। পিতা সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সমাধির পাশে আযিযিয়া মাদরাসা নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে কাযী মুহিউদ্দীন ইব্ন যাকীকে নির্দেশ দেন। ওই বাড়িটি ছিল সেনাপতি ইজুদ্দীন ইব্ন শাম-এর। এরপর তিনি তাঁর চাচা আদিলকে দামেস্কের শাসনভার প্রদান করে মিশর ফিরে আসেন। তাঁর মিশরে প্রত্যাবর্তন হয় শাওয়াল মাসের নয় তারিখে, দামেস্কে খুতবা প্রদান এবং মুদ্রা তৈরী তাঁর নামেই চলতে থাকে। ক্ষমতাচ্যুত আফযালের সাথে চুক্তি হয় যে, তিনি সারখাদ এলাকায় চলে যাবেন এবং সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। আফযালের কুপরামর্শদাতা মন্ত্রী ইব্নুল আছীর যাজরী তার নিজ এলাকা দ্বীপাঞ্চলে পালিয়ে যায়। সে তার নাম-সুনাম রাজত্ব সবই হারিয়েছে। যুবরাজ আফযাল তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে সারখাদ অঞ্চলে চলে যান। তাঁর ভাই কুতুবুদ্দীন ও তাঁর সাথে সেখানে গমন করেন।

এই হিজরী সনে ইরাকে প্রচণ্ড এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। কালো কুচকুচে ঝড়ো হাওয়া ও প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড় আঘাত হানে সেখানে। ঘুর্ণিঝড়ের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, মনে হচ্ছিল মাটি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এর সাথে লাল বর্ণের বালিরাশি, তখন দিনের বেলাতে মানুষের বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই হিজরী সনে কাওয়ামুদ্দীন আবূ তালিব ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদকে বাগদাদে "কিতাব আল-ইনশা" রচনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি উঁচু মানের ভাষাবিদ ছিলেন, তবে তিনি সাহিত্যিক আল ফাযিলের সমকক্ষ নন? এই হিজরী সনে মুজীরুদ্দীন আবুল কাসিম মাহমূদ ইব্নুল মুবারক নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তিনি উচ্চস্তরের জ্ঞানী ও তার্কিক ব্যক্তি ছিলেন। এই হিজরী সনে ইস্পাহানের শাফিঈ মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মাহমূদ ইব্ন আবুল লতীফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত খাজনাদী নিহত হন। মালিক আল দীন সিনকার তাঁকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড দেওয়ান বংশ থেকে ইস্পাহানের কর্তৃত্ব বিলুপ্তর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুআয়্যিদুদ্দীন আবুল ফযল

এই হিজরী সনে খলীফার পক্ষ থেকে মন্ত্রীরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত মুআয়্যিদুদ্দীন আবুল ফযল মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন কাসসাব। তাঁর পিতা আলী বাগদাদের একটি বাজারে গোশত বিক্রি করতেন। তাঁর পুত্র বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগতি অর্জন করে এবং সমসাময়িকক লোকদের নেতৃত্ব লাভ করে, তাঁর মৃত্যু হয় হামাদানে, ইরাক ও খোরাসান থেকে অনেক কৃষি জমি পুনরুদ্ধার করে তিনি খলীফার তত্ত্বাবধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও উদ্যোগী মানুষ। নিজের প্রতি আস্থাবান, কর্মে অবিচল এবং উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন তিনি।

ফখর মাহমূদ ইব্ন আলী

এই হিজরী সনে ফখর মাহমূদ ইব্ন আলী তাওকানী শাফিঈ ইনতিকাল করেন। তিনি হজ্জ শেষে বাড়ি ফেরার পথে মারা যান।

আবুল গানাইম মুহাম্মদ ইব্ন আলী

কবি আবুল গানাইম মুহাম্মদ ইব্ন আলী এই হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন ওয়াসিত রাজ্যের খ্যাতিমান শিক্ষক আল হারাছী-এর পুত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১

বৎসর। তিনি বিশুদ্ধভাষী কবি ছিলেন। ইব্‌নুল জূযী তাঁর সভাগুলোতে কবি আবুল গানাইমের কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। ইব্‌ন সাঈ' কবি আবু গানাইমের উচ্চস্তরের কবিতাগুলোর একটা অংশ তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

ফকীহ আবুল হাসান আলী ইব্‌ন সাঈদ

৫৯২ হিজরী সনে যাদের ওফাত হয় তাঁদের অন্যতম হলেন ফকীহ আবুল হাসান আলী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হাসান বাগদাদী ওরফে ইব্‌নুল আরীফ। তিনি 'বায়'-ই-ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ-বিক্রি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের অনুসরণকারী ছিলেন। এরপর আবুল কাসিম ইব্‌ন ফাদলানের সংস্পর্শে এসে শাফিঈ মাযহাব অবলম্বন করেন। বায়'ই ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয় বিষয়ে হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ফকীহ আবুল হাসান সেটি বারবার ও বহুবার আলোচনা করেছেন বিধায় তিনি ওই উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন বলা হয়ে থাকে যে, এতসব কিছুর পর তিনি ইমামিয়া মাযহাবের অনুসারীতে পরিণত হন।

শায়খ আবু শুজা'

তিনি হলেন শায়খ আবূ শুজা' মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুগীছ ইব্‌ন দাহ্‌হান আল ফারযী বাগদাদী, তিনি গণিত বিশারদ ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। এক সময়ে দামেস্কে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং আবুল ইয়ামান যায়দ ইব্‌ন হাসানের প্রশংসায় নিম্নের কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন–

يَا زَيْدُ زَادَكَ رَبِّيْ مِنْ مواهبه نِعَمًا * يَقْصُرُ عَنْ إِدْرَا كِهَا الْأَمَلُ.

হে যায়দ! আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোষাগার থেকে আপনাকে এমন নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করুন যা আশাতীত।

لَا بَدَّلَ اللهُ حَالًا قَدْ حَبَاكَ بِهَامَا * دَارَ بَيْنَ النُّحَاةِ الْحَالُ وَالْبَدَلُ.

মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতিদান শীলতার মাধ্যমে আপনার অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করে দিন যেমন আরবি ব্যাকরণবিদদের পরিভাষায় হাল (حال) এবং বদল (بدل) তথা অবস্থা জ্ঞাপক বিশেষণ এবং ব্যাখ্যা মূলক বিশেষ্যের আবর্তন ঘটে থাকে।

اَلنحو اَنْتَ اَحَقُّ الْعَالَمِيْنَ بِهِ * اَلَيْسَ بِإِسْمِكَ فِيْهِ يُضْرَبُ الْمِثْلُ.

ব্যাকরণ শাস্ত্র হে যায়দ! আপনি জগতের সর্বাধিক অধিকার প্রাপ্ত, ওই শাস্ত্রে কি আপনার নামেই উদাহরণ বর্ণনা করা হয় না?

৫৯৩ হিজরী সন (১১৯৭ খ্রি.)

এই হিজরী সনে কথা ফাযিল একটি চিঠি পাঠান কাযী ইব্‌নুয যাকী এর নিকট। চিঠিতে লিখা ছিল "জুমাদাল আখিরাহ মাসের নয় তারিখ জুমুআর রাতে এক দুর্যোগ নেমে এসেছিল এই অঞ্চলে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রচণ্ড বেগে ঝড় প্রবাহিত হচ্ছিল। শূন্যে শোঁ শোঁ আওয়াজ। বজ্রপাতের কানকাটা শব্দ।

ঘর-দোয়ার, দালান-কোঠা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। একটি অপরটির উপর ভেঙ্গে পড়ছিল। আসমান-জমিন ধুলায় ধুলিময়। মনে হচ্ছিল যে, স্তরে স্তরে ধুলি জমে যাবে। ধারণা করা হচ্ছিল যে, জাহান্নামের একটি উপত্যকা থেকে ধুলি বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। ঝড় তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল। তারকা প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। আকাশের আবরণ ফেঁটে গিয়েছিল। তদুপরিস্থ নিদর্শন ও চিহ্নগুলো মুছে গিয়েছিল। আমাদের ছিল যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ۔

(বজ্রধ্বনিতে তারা তাদের কর্নে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়, সূরা বাকারাহ : ১৯) বিদ্যুতের ঝলকানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা হাতে চোখ ঢেকে রাখে, দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়া এবং দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ইসতিগফার ও মহা প্রভুর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত কোন পথ ছিল না। শিশু-যুবা, বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সবাই পালাচ্ছিল, কিছু নিয়ে কিছু না নিয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যাবার কোন উপায়ও ছিল না। অতঃপর সবাই জামে মসজিদে এসে আশ্রয় নিল। এটা ধরে নিল যে, মৃত্যু পরোয়ানা সমুপস্থিত। পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ বিচ্ছিন্ন হয়ে অবিলম্বে পরপারে যাত্রা করতে হবে। অর্ধ নিমীলিত ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল কোন মহাদুর্যোগ অবতীর্ণ হচ্ছে। তাদের জীবনের আশা তিরোহিত হয়ে আসছিল, তাদের মুক্তি ও নাজাতের পথে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। তারা কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তা নিয়ে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। তারা সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আর কামনা করছিল যে, যদি তারা সর্বদা নামাযে দণ্ডায়মান থাকতে পারত। আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে ভোর হতে হতে তাদের দুর্যোগ কেটে গেল। সকালে এক বন্ধু অপর বন্ধুর খোঁজ খবর নিল, দেখা সাক্ষাত করল, ভাল থাকার জন্যে একে অন্যকে ধন্যবাদ দিল তারা যেন ইসরাফীল (আ)-এর শিঙ্গায় ফুৎকারের পর জ্ঞান ফিরে পেল, বিশ্বজোড়া বিকট শব্দের পর সজ্ঞান হল। মহান আল্লাহ্ যেন তাদেরকে পুনঃজীবন দান করলেন, আচমকা মৃত্যুর পর পুনরায় প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। পরে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, সে রাতে বহু নৌকা, জাহাজ ও জলযান সমুদ্রে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। স্থলভাগে বহু বৃক্ষরাজি উপড়ে পড়েছে। পথে ঘাটে থাকা বহু মুসাফির মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। অনেকে দৌড়াদৌড়ি করে পালাতে চেয়েছে কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। তিনি একথাও লিখলেন যে, আমি যা লিখলাম বাস্তব ঘটনা তদাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। তবে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। আমরা আশা করছি যে, এতদ্বারা মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সাবধান করে দিবেন আমাদেরকে গাফিলতি ও উদাসীনতা থেকে সচেতন করবেন। আমাদের শহরবাসীগণ যেভাবে কিয়ামতের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখল, এরপর কিয়ামত সম্পর্কে অন্য প্রমাণ চাইবে না। ইতিপূর্বে যারা এসব ঘটনার কথা বলেছেন আমাদের চাক্ষুষ এই ঘটনার ও ধ্বংসলীলার তুলনায় সেগুলো নিতান্তই গৌণ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে এ কারণে যে, তিনি আমাদেরকে ওই দুর্যোগের বর্ণনা দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সংবাদের বিষয়বস্তু বানাননি। মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা তিনি যেন লোভ লালসাকে আমাদের থেকে দুরে রাখেন এবং আমাদেরকে ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত না করেন।

কাযী ফাযিল এই হিজরী সনে মিশর থেকে একটি পত্র লিখেন দামেস্কে সুলতান আদিলের নিকট। এতো তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্যে সুলতানকে উৎসাহিত করেন এবং

ওদেরকে মুকাবিলা করত: মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সীমানা রক্ষার জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ওই চিঠির একাংশের ভাষ্য ছিল এই আপনার শাসনকালীন এই সময় হল উত্তম সময়। আপনি এখন যা ব্যয় করছেন তাহলে জান্নাতী হুরদের দেন মোহর। যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন সম্পদ আল্লাহ্‌র মালিকানায় আমানত রাখে সে কতইনা সৌভাগ্যবান! এসব হল তার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এটি সেই মহান স্বত্বার দয়া যিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি এও লিখেন যে, মিম্বর ও ঢালসমূহে মহান আল্লাহ যেন এই নাম চির স্মরণীয় করে রাখেন, দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর কল্যাণে মহান আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন। তাঁকে কল্যাণময় পথের দিশা দান করুন। শান্তি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন দান করুন। তাঁর অবস্থা যেন এমন না হয় :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَرْءَ تَدْوَى يَمِينُهُ فَيَقْطَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلِمَ سَائِرُهُ۔

তুমি কি দেখ না কোন কোন ব্যক্তি তার ডান হাতের চিকিৎসা করে। আর প্রয়োজনে ওই হাতটাই কেটে ফেলে যাতে তার অবশিষ্ট দেহ সুনিরাপদ ও সুস্থ থাকে।

যে কর্মে দুরদর্শিতা ও জনকল্যাণ নিহিত আমাদের কথা ও সুলতান যেন সেদিকে অগ্রসর হন। কেউ তার হাতের নখ কেটে ফেললে বস্তুত সে তার দেহের কল্যাণই সাধ্য করে এবং ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। স্থূল দৃষ্টিতে অপছন্দীয় কাজ মূলত ক্ষতিকর নয় যদি সেটির পরিনাম পছন্দনীয় ও প্রশংসাযোগ্য হয়। সব যুদ্ধের শুরুটার উপর তার শেষ বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুতরাং আমাদের মান্যবর সুলতান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং এ পথে আগত কোন দুঃখ কষ্টে ক্লান্তিবোধ করবেন না। তিনি বরং সর্বক্ষেত্রে তাঁর মুখমণ্ডল একক সত্বা মহান আল্লাহ্‌র প্রতিই ফিরাবেন। যাঁর প্রতি সকল মুখমণ্ডল মুখোমুখি হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔

(যারা আমার পথে মেহনত ও সাধনা করে আমি তাদেরকে আমার পথের সন্ধান প্রদান করি (সূরা আনকাবূত : ৬৯)।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ফরাসীদের সাথে যে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করছিলেন এই হিজরী সনে তার মেয়াদ শেষ হয়। এরপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে। তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে সুলতান আদিল সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাভুত করে না প্রচুর ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইয়াফ রাজ্য ও মুসলমানগণ জয় করেন, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে নিবেদিত। ওরা কিন্তু আল মানের রাজাকে প্ররোচিত করেছিল মুসলমানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ দ্রুত ওদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করে দেন। এই হিজরী সনে ফরাসীগণ ইয্‌যুদ্দীন শামাহ্ এর হাত থেকে বিনা যুদ্ধে এবং বিনা সংঘাতে বৈরুত দখল করে নেয়। এজন্যে আমীর ইয্‌যুদ্দীন শামার সমালোচনায় জনৈক কবি বলেছেন–

سَلِّمِ الْحِصْنَ مَا عَلَيْكَ مُلَامَةٌ * مَا يُلَامُ الَّذِي يَرُوْمُ السَّلَامَةَ۔

তুমি দূর্গ ছেড়ে দাও, তাতে তোমার কোন সমালোচনা হবে না, যে ব্যক্তি শান্তি কামনা করে তাকে দোষারোপ করা যায় না।

فَتُعْطِيَ الْحُصُوْنَ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ * سُنَّةٌ سَنَّهَا بِبَيْرُوْتَ شَامَةُ.

তাহলে তুমি তথাকথিত শান্তির আশায় বিনা যুদ্ধে দূর্গসমূহ শত্রুর হাতে তুলে দিবে, এটি হচ্ছে আমীর শামা-এর পথ সে বৈরুতে এই পথ অবলম্বন করেছে।

এই হিজরী সনে ফরাসী রাজা কিন্ধরীর মৃত্যু হয়। একটি পর্বত শৃঙ্গ থেকে নীচে পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই সময়ে ফ্রান্স রাখাল বিহীন বকরী পালের ন্যায় হয়ে যায়। অবশেষে কিবরিমের শাসনকর্তা পুরো ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন। জনগণ প্রয়াত সম্রাট কিন্ধরীর স্ত্রীকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। অতঃপর নব নিযুক্ত সম্রাট এবং মুসলিম সুলতান আদিলের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি যুদ্ধে সুলতান আদিল বিজয় লাভ করেন এবং শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করেন। এসব যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য নিহত হয়। এক পর্যায়ে তারা সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তী বৎসরে সুলতান আদিল ওদের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন।

৫৯৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সাইফুল ইসলাম তুগতুগীন—তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর ভাই। বিশাল ধন ভাণ্ডার গড়ে তোলেন তিনি। তিনি স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরা যহরতকে গম ভাঙ্গানোর মত ভাঙ্গিয়ে স্বচ্ছ করে গহনা অলংকার বানাতেন এবং সঞ্চয় করে রাখতেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র ইসমাঈল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ইসমাঈল ছিল নির্বোধ ও অপরিনামদর্শী। তার বোকামীর ফলে এক সময় সে নিজেকে উমাইয়া ও কুবায়শী বলে দাবী করে। সে 'আল হাদী' উপাধি ধারণ করে। এ প্রেক্ষিতে তার চাচা আদিল তাকে এসব বিষয়ের জন্যে তিরস্কার করেন এবং এগুলো ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। সে এদিকে কর্ণপাত করেনি। তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেনি। সে বরং তার ভ্রান্তিতে সুদৃঢ় থাকে এবং তার কর্মচারী ও জনগণের জন্যে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এক পর্যায়ে সে নিহত হয় এবং তার পিতার মামলূক তথা ক্রীতদাসগণ ক্ষমতা গ্রহণ করে।

আমীরুল কবীর আবূ হায়জা আল সামীন কুর্দী : ৫৯৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের অন্যতম হলেন আমীর আবূ হায়জা কুর্দী। সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি। আক্কা প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ফ্রান্স কর্তৃক আক্কা দখলের পূর্বে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যান, মাশতূব কর্তৃক আক্কা দখলের পর তিনি পুনরায় সেখানে প্রবেশ করেন এবং তার হাত থেকে আক্কা পুনঃদখল করেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁকে আল কুদস অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতান পুত্র আল আযীয যখন আল কুদস নিজ দখলে নিয়ে যায় তখন তাঁকে ওই পদ থেকে অপসারণ করে। এরপর তাঁকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবং তাঁকে প্রচুর সম্মানও সম্মাননা দেয়া হয়। খলীফা তাঁকে হামাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেনা দলের প্রধান রূপে মনোনীত করেন। অবশেষে হামাদানে তাঁর ওফাত হয়।

কাযী আবূ তালিব আলী : তিনি হলেন কাযী আবূ তালিব আলী ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ বুখারী। আবুল ওয়াক্‌ত এবং অন্যান্যদের নিকট হাদীস শিক্ষা নেন। ফিক্‌হ পাঠ করেছেন আবুল কাসিম ইব্‌ন ফাদলানের নিকট। বাগদাদে বিচারকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিছু সময় শুধু বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের দায়িত্বে যুক্ত

হন, এরপর বিচারকের পদ থেকে অপসারিত হন। আবার ওই পদে নিযুক্তি পান। বিচারকের পদে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি একজন সম্মানিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল ও ছিল ফিক্হ ও ন্যায়বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিদের পদচারণায় সজীব। তাঁর একটি কবিতা এরূপ :

تَنَحَّ عَنِ الْقَبِيْحِ وَلَا تَرِدْهُ * وَمَنْ اَوْلَيْتَهُ حُسْنًا فَزِدْهُ.

তুমি কদর্যতা ও মন্দ কর্ম থেকে দূরে সরে থাকবে। ওই ঘাটে তুমি অবতরণ করবে না। যাকে তুমি সদাচার ও পুণ্য কর্ম প্রদান কর তাকে ব্যাপক হারে তা প্রদান করবে।

كَفَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ كُلَّ كَيْدٍ * اِذَا كَادَ الْعَدُوُّ وَلَمْ تَكِدْهُ.

তোমার বিরুদ্ধে শত্রুর সকল কুট কৌশল ব্যর্থ হবে যদি তুমি তার বিরুদ্ধে কুট কৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না কর।

তালিবীন নেতা সৈয়দ শরীফ : এই হিজরী যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন তালিবীন নেতা সৈয়দ শরীফ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন হামযা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আল আলাভী আল হুসায়নী ওরফে ইব্নুল আকসাসী আল কূফী। কূফা নগরীতে তাঁর জন্ম ও বড় হওয়া। তিনি ছিলেন রিক্ত কবি। খলীফা ও মন্ত্রীদের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন তিনি। তাঁদের পরিবার ছিল ভদ্রতা নেতৃত্ব ও সাহিত্যিক পরিবেশ সমৃদ্ধ। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং খলীফা আল মুকতাফী, আল মুসতানজিদ, আল মুসাতাদী এবং তদীয় পুত্র আল নাসিরের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। ফলে তাঁকে প্রশংসাগীতি বিষয়ক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ছিলেন গুরু গম্ভীর ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বয়স্ক লোক। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসরের উপরে। তাঁর পরিচয় প্রদানে কবি ইব্নুল সাঈ কতক পংক্তিমালা রচনা করেছিলেন তার কতক এই :

اِصْبِرْ عَلَى كَيْدِ الزَّمَانِ * فَمَا يَدُوْمُ عَلَى طَرِيْقَةٍ.

কাল পরিক্রমার প্রতারণায় তুমি ধৈর্যধারণ কর, এটি তো কোন এক পথে স্থির থাকে না।

سَبَقَ الْقَضَاءُ فَكُنْ بِهِ * رَاضٍ وَلَا تَطْلُبْ حَقِيْقَةً.

তাকদীর ও ভাগ্যের নির্ধারণ তো পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে সুতরাং তুমি তাতে রাজী ও সন্তুষ্ট থেকো, তার গুরুত্ব খুঁজতে যেয়ো না।

كَمْ قَدْ تَغَلَّبَ مَرَّةً * وَاَرَاكَ مِنْ سَعَةٍ وَضِيْقِهِ.

এমন বহু লোক রয়েছে যে, যুগ পরিক্রমা তার উপর বিজয়ী হয়েছে, অতঃপর তাকে কখনো স্বচ্ছল তা স্বাচ্ছন্দ আমার কখনো সংকট-সংকোচনের জালে আটকিয়েছে।

مَازَالَ فِيْ اَوْلَادِهٖ * يَجْرِيْ عَلَى هٰذِى الطَّرِيْقَةِ.

ওই ব্যক্তির তিরোধানের পর তার বংশধরদের মধ্যে যুগ পরিক্রমার উত্থান পতনের এই তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ইলসতি আযরা বিনত শাহেনশাহ : এই হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্তদের একজন হলেন ইলসাত আযরা বিনত শাহেনশাহ ইব্ন আইয়ূব। আন নাসর ফটকের অভ্যন্তরে তাঁর মাদরাসা প্রাঙ্গনে তাঁকে দাফন করা হয়। এই হিজরী সনে সুলতান আদিলের মাতা ইলসাত খাতুনও মৃত্যুবরণ করেন। আসাদুদ্দীন শীরকূহ-এর বাড়ির পাশে দামেস্কস্থ নিজ বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৫৯৪ হিজরী সন (১১৯৮ খ্রি.)

এই হিজরী সনে ফরাসিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটায়, ওরা তীনীন অবরোধ করে। সুলতান আদিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে আহ্বান জানান ফরাসীদের প্রতিরোধ করার জন্যে। ফলে মিশর থেকে আসেন আযীয, সারখন্দ থেকে আসেন আফযাল, এক পর্যায়ে ফরাসিগণ অবরোধ তুলে নেয়। ইতিমধ্যে তাদের সম্রাট আল মানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তাদের নিকট। ফলে তারা সুলতান আদিলের নিকট সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দেয়। তিনি চুক্তি সম্পাদন করেন, সুলতানগণ নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যায়, এই অভিযানে সুলতান আদিলের পুত্র আল মু'আয্যাম ঈসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পিতা তাঁকে দামেস্কের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এবং তিনি নিজে আপন রাজ্য জাযীরাতে ফিরে যান। যুবরাজ ঈসা সুচারুরূপে দামেস্কে জন প্রশাসন পরিচালনা করেন সিনজার ও অন্যান্য বড় বড় কয়েকটি অঞ্চলের শাসক সুলতান ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্ন মাওদূদ ইব্ন জঙ্গী আতাবেগ এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। চেহারা-সুরত, আকার আকৃতি ও জীবনাচারে তিনি ছিলেন অন্যতম ভাল প্রশাসক। তবে কিছুটা কার্পণ্য ভাব তাঁর মধ্যে ছিল। আলিম-উলামাদেরকে ভীষণভাবে ভালবাসতেন তিনি। বিশেষত হানাফী আলিমদের প্রতি তাঁর হৃদ্যতা ছিল গভীর। সিনজারে তিনি একটি হানাফী আবাসিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শর্ত নির্ধারণ করেন যে, এখানকার সকল আলিমের জন্যে প্রতিবেলা এখানে খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। বস্তুত এটি একটি খুবই ভাল উদ্যোগ। এই সুযোগ প্রাপ্তির জন্যে ফকীরের চেয়ে ফকীহ ব্যক্তি অগ্রাধিকারী। কারণ এই পথে ফকীহ ব্যক্তি নিশ্চিন্তে কিতাব পাঠ ও গবেষণার সুযোগ লাভ করে। এক পর্যায়ে তাঁর চাচাত ভাই মুসেলের শাসনকর্তা তাঁর সন্তানদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তাঁর পুত্রগণ সুলতান আদিলের শরণাপন্ন হয়। তিনি ওদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দেন এবং তাদের সংকট নিরসন করে দেন। শেষ পর্যন্ত তদীয় পুত্র কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ শক্ত হাতে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন এবং তাঁর শাসনকাল স্থায়ী হয়। এরপর সুলতান মার্ডিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রামাদান মাসে ওই শহর অবরোধ করেন। অতঃপর সুক্ষিত দূর্গের বহিরাংশ ও বেসামরিক অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। দূর্গ জয়ে অসমর্থ হন। দীর্ঘদিন অবরোধ স্থায়ী রাখেন।

এই হিজরী সনে খাযর গোত্র বল্খ নগরী দখল করে নেয়। স্থানীয় জনসাধারণের উপর জুলুম নির্যাতন চালায়। খলীফা তাদেরকে নির্দেশ দেন যেন খাওয়ারিযাম শাহকে তারা ইরাক প্রবেশে বাধা দেয়। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল সে বাগদাদ দখল করবেন এবং তাঁর নামে খুতবা দেয়া হবে। এই হিজরী সনে খাওয়ারিযাম শাহ বুখারা শহর অবরোধ করেন এবং দীর্ঘদিন অবরোধের পর তা

জয় করে নেন। শক্তি প্রয়োগে শহর দখলের পর অবশ্য তিনি নাগরিকরেদকে ক্ষমা করে দেন। ইতিপূর্বে তারা তাঁকে নিয়ে চরম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিল। তারা একটি এক চোখা কুকুরকে দামী জামা পরিয়ে দেয়। এবং তাকে খাওয়ারিযাম শাহ্ নাম দেয়। অতঃপর দূর্গের ভেতর থেকে কামানের মাধ্যমে সেটিকে দূর্গের বাইরে অবস্থানরত খাওয়ারিযামিয়াহ্ লোকদের নিকট নিক্ষেপ করে এবং বলে যে, এটি তোমাদের জন্যে উপহার। খাওয়ারিযাম শাহ এর এক চোখ ছিল। তিনি যখন শহর দখল করেন তখন এই ধৃষ্টতার প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

৫৯৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আওয়াম ইব্ন যিয়াদাহ : তিনি হলেন আবূ তালিব ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন যিয়াদাহ। তিনি খলীফার দরবারের সাহিত্য ও লেখালেখি বিভাগের প্রধান। সমসাময়িক যুগে ইরাকে প্রবন্ধ রচনা, চিঠিপত্র লিখন, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রসহ সাহিত্য শাখার সকল দিকের নেতৃত্বের সমাহার ঘটে তাঁর মধ্যে। এছাড়াও শাফিঈ মাযহাবের ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক জানা শোনা ছিল। তিনি ফিক্হ পাঠ করেছেন ইব্ন ফাদলানের নিকট। দু'টো মৌলিক বিষয় গণিত ও সাহিত্যে তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। উচ্চমানের বহু কবিতা রচনা করেছিলেন তিনি। কর্মজীবনে একাধিক পদে তিনি দায়িত্বে পালন করেছেন এবং সকল ক্ষেত্রে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর উত্তম কবিতা মালার একাংশ এই :

لَا تَحْقِرَنْ عَدُوًّا تَزْدَرِيهِ فَكَمْ * قَدْ أَتْعَسَ الدَّهْرُ جَدَّ الْجِدِّ بِاللَّعِبِ.

তোমার চোখে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে এমন শত্রুকে ও তুচ্ছ জ্ঞান করো না কারণ যুগ পরিক্রমা অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের কারণে বহু শক্তিধর মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

فَهٰذِهِ الشَّمْسُ يَعْرُوهَا الْكُسُوفُ لَهَا * عَلَى جَلَالَتِهَا بِالرَّأْسِ وَالذَّنَبِ.

এই যে, সূর্য, তার বিশালত্ব সত্ত্বেও সূর্য গ্রহণ শক্তি তাকে লেজে মাথায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। কবিতার আরো কিছু অংশ :

بِاضْطِرَابِ الزَّمَانِ تَرْتَفِعُ الْأَنْذَالُ * فِيهِ حَتَّى يَعُمَّ الْبَلَاءُ.

যুগ অস্থিরতায় তাতে লাঞ্ছনা ও দৈন্য উঠে থাকে ফলে গণ বিপদ সৃষ্টি হয়।

وَكَذَا الْمَاءُ رَاكِدًا فَإِذَا * حُرِّكَ ثَارَتْ مِنْ قَعْرِهِ الْأَقْذَاءُ.

বদ্ধ পানি ও সেরূপ। এটিকে নাড়া দিলে তার তলদেশ থেকে বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা উঠে আসে। তাঁর কবিতার আরো কিছু অংশ–

قَدْ سَلَوْتُ الدُّنْيَا وَلَمْ يَسْلُهَا * مَنْ عَلَّقْتُ فِي آمَالِهِ وَالْأَرَاجِيْ.

আমি তৃপ্তির সাথে দুনিয়াকে ত্যাগ করেছি। কিন্তু আমি যাদের আশা আকাংখা পূরণে ব্যবহৃত হয়েছি তারা দুনিয়াকে ত্যাগ করতে পারেনি।

فَإِذَا مَا صَرَفْتُ وَجْهِيَ عَنْهَا * قَذَفَتْنِيْ فِيْ بَحْرِهَا الْعَجَاجِ.

আমি যখন দুনিয়া থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি তখন সে আমাকে সজোরে নিক্ষেপ করেছে তার গর্জন মুখর গভীর সমুদ্রে।

يَتَضِيئُونَ بِي وَاَهْلِكَ وَحْدِيْ * فَكَأَنِّيْ ذُبَالَةٌ فِيْ سِرَاجٍ۔

ওরা আমাকে ব্যবহার করে নিজেরা আলো গ্রহণ করে আর আমি একাই ধ্বংস হতে থাকি। আমি যেন প্রদীপের সলিতা ও বাতির ফিতা।

এই হিজরী মনের যিলহাজ্জ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। বহু লোক তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়েছিল। মূসা ইব্ন জাফরের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

কাযী আবুল হাসান আলী ইব্ন রাজা ইব্ন যুহায়র

তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং সেখানে ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এখানে তিনি হাদীস শাস্ত্রেও প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মালিক ইব্ন তাওকের চত্বরে বসে আলী আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাবীহ্ ফারাযী নিকট পড়াশোনা করেন। দীর্ঘদিন তিনি ইরাকে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক ব্যক্তি। তিনি তাঁর উস্তাদ আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাবীহের মুখে দু'টো পংক্তি শুনেছিলেন যে দু'টো পংক্তি আল্লামা হারিরীর পংক্তিদ্বয়ের সাথে তুলনীয়। কথিত আছে যে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এক্ষেত্রে এই দুজনের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আল্লামা হারিরীর পংক্তি দুটো এই :

سَمِّ سِمَةً يُحْمَدُ اٰثَارُهَا * وَاشْكُرْ لِمَنْ اَعْطَا وَلَوْ سِمْسِمَةً۔

রেখা অংকন করবে, চিহ্ন রেখে যাবে যা শেষ পর্যন্ত প্রশংসা কুড়িয়ে আনে। যে ব্যক্তি দান করবে তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যদি ও বা সেই দান একটি তিল পরিমাণ হয়।

وَالْمَكْرُ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ لَا تَأْتِهِ * لِتَقْتَنِيَ السُّؤْدَدَ وَالْمَكْرُمَةَ۔

আর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি, তা করতে সমর্থ হলেও তুমি তা করবে না। নেতৃত্ব অর্জন ও সম্মান লাভের জন্যেও তুমি ওই পথে যাবে না।

এ প্রসংগে ইব্ন নাবীহ বলেন :

مَا الْاُمَّةُ الْوَكْسَاءُ بَيْنَ الْوَرٰى * اَحْسَنُ مِنْ حُرٍّ اَتٰى مُلَامَةً۔

জগতে মাথা নীচু করা, কাপুরুষ উম্মত মোটেই উত্তম নয় সেই স্বাধীন চেতা সাহসী ব্যক্তি থেকে যে প্রয়োজনে তিরস্কার ও সমালোচনার মুখোমুখি হয়।

فَمَهْ اِذَا اسْتَجْدَيْتَ عَنْ قَوْلِ لَا * فَالْحُرُّ لَا يَمْلَأُ مِنْهَا فَمَهْ۔

"না" বলার মাধ্যমে যদি তোমার আর্থিক ও বৈষয়িক লাভও হয় তবু তুমি থেমে যাবে, না শব্দ উচ্চারণ করবে না। কারণ স্বাধীন ব্যক্তি 'না' শব্দ উচ্চারণ করে তার মুখ ভর্তি করে না।

আমীর ইযযুদ্দীন জারদীল : এই হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্তদের একজন হলেন আমীর ইযযুদ্দীন জারদীল। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর আমলে তিনি উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের একজন ছিলেন। তিনি শাভীর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁকে সপ্রশংসা মুল্যায়ন করেছেন। আল কুদস বিজয়ের পর তিনি তাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁকে বড় অভিযানে প্রেরণ করতেন। আপন যোগ্যতা ও সাহসিকতা দ্বারা তিনি সেসব অভিযানে বিজয় ছিনিয়ে আনতেন। যুবরাজ আফযাল শাসনভার গ্রহণ করার পর তাঁকে

আল কুদস এর শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া ছেড়ে মুসেলে চলে যান এবং ৫৯৪ হিজরী সনে সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫৯৫ হিজরী সন (১১৯৯ খ্রি.)

সুলতান আযীযের মৃত্যু : সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর পুত্র এবং মিশরের শাসনকর্তা সুলতান আযীয এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পশু শিকারে বের হয়েছিলেন। মুহাররম মাসে ২১ তারিখ রাতের বেলা তিনি একটি চিতা বাঘের পেছনে অশ্ব চালিয়ে সেটিকে শিকার করতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর অশ্ব তাঁকে নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। মারাত্মকভাবে আহত হন। কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর নিজ বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়। এরপর তাঁকে শাফিঈ গোরস্থানের নিকট স্থানান্তর করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৭ কিংবা ২৮ বৎসর। বলা হয় যে, এই বৎসর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হাম্বলী মাযহাব অনুসারীদেরকে তিনি তাঁর রাজ্য থেকে বের করে দিবেন এবং তাঁর অন্য ভাইদেরকে ও বলবেন নিজ নিজ শহর থেকে ওদেরকে বহিষ্কার করার জন্যে। তাঁর এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যায়। অবিলম্বে এটি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে বস্তুত জাহমিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকদের পক্ষ হতে তিনি প্ররোচনা প্রাপ্ত হন। হাদীস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের স্বল্পতাও এর একটি কারণ বটে। পরিস্থিতি যখন এ পর্যন্ত গড়াল এবং তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তখন মহান আল্লাহ অবিলম্বে তাঁকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করে দিলেন। পক্ষান্তরে মিশর ও সিরিয়ার আম-খাস নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট হাম্বলী মাযহাবের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। কেউ কেউ বলেছেন যে, হাম্বলী মাযহাবের কোন একজন পূণ্যবান ও বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর জন্যে বদ দু'আ করেছিলেন যার ফলে তিনি শিকারে বের হন এবং দ্রুত ধ্বংসে পতিত হন। এ সময়ে সুলতান আদিল স্ব-সৈন্যে মারদীন অবরোধে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পুত্র কামিল তখন হীরা অঞ্চলীয় শহরগুলোর মধ্য থেকে পশ্চিমা দ্বীপগুলোর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আযীযের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তদীয় ভ্রাতা আফযাল তাঁর চাচা আদিলের নিকট লিখেছিলেন– "মহান আল্লাহ্ সুলতান ও বাদশাহ আদিলের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুন। তাঁর জীবনে বরকত দান করুন। তাঁর কর্ম ও অবস্থান উচ্চ করুন। তাঁকে সাহায্য করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন। তাঁর মর্যাদায় ব্যক্তিত্ব রক্ষায় অন্যান্য ব্যক্তি কুরবানী হউক। মহান আল্লাহ তাঁর বড় বড় নে'য়ামত প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য বড় বিষয়গুলোকে তাঁর নিকট তুচ্ছ ও ক্ষুদ্ররূপে উপস্থাপন করুন। বিরাট বিরাট বিজয় অর্জনের এই সময়ে মহান সুলতান আদিলকে এবং ইসলামকে পবিত্র জীবন দান করুন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেন তিনি সুস্থ ও নিরাপদ ফিরে আসতে পারেন। তাঁর জনবলে যেন মহান আল্লাহ্ কমতি না করেন। তাঁর নিজের ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কারো যেন ক্ষতি না হয়, তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে যেন হ্রাস না ঘটে। চোখে ও মনে যেন তিনি ক্লেশ বোধ না করেন। তাঁর চলার পথ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়। সুলতান আযীযের মৃত্যু যখন অনিবার্য হয়ে উঠল তখন তার জীবন তার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুর্বিসহ হয়ে উঠল। মৃত্যু যখন তাঁর সন্নিকটে তখন তাঁর বিপদ স্পষ্টত বড় হয়ে দেখা ছিল। তাঁর চেহারার দ্যুতি ও ঔজ্জল্য বিলীন হয়ে গেল। আহত হয়ে ফিরে আসা এবং মৃত্যু

মুখে পতিত হবার মাঝে ব্যবধান ছিল দু'সপ্তাহের। তিনি আহত হয়েছিলেন ২১ মুহাররাম রাত ৭:০০ ঘটিকায়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি একই সাথে দেহ ও মনের রোগে ভুগছিলেন। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও হৃদযন্ত্রের ব্যাথায় জর্জরিত হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়, আত্মীয় পরিজন সবাই বিচলিত হয়ে পড়ল। পুত্র পৌত্রগণ তাঁর কাছাকাছি থাকতে লাগল। প্রতিদিন নতুন নতুন দর্শনার্থী তাঁকে দেখার জন্যে আসতে লাগল। সুলতান আযীয তাঁর মৃত্যুকালে দশজন পুত্র সন্তান রেখে যান। অতঃপর তাঁর সেনাপতি ও রাজ কর্মচারিগণ তদীয় পুত্র মুহাম্মদকে আল মানসূর উপাধি দিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত রূপে ঘোষণা দেন। তবে অধিকাংশ সেনাপতি সুলতান আদিলকে নিজেদের রাষ্ট্র প্রধান মনোনীত করার পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু তাঁর বড় দূরত্বে অবস্থান করার কারণে তারা এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। তাই তারা যুবরাজ আফযালের নিকট সংবাদ পাঠাল এই মর্মে যে, তিনি যেন দ্রুত দামেস্কে এসে পৌছেন। তিনি তখন সারখাদে ছিলেন কিন্তু তিনি যখন দামেস্কে এসে পৌছেন, তবে তখন তাঁরা তার প্রতি সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। তাঁর সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেখতে পান। বিশেষত নেতৃস্থানীয় নাসিরিয়াপন্থী সেনাপতিগণ তাঁর শাসন ক্ষমতা গ্রহণে বিরোধিতা করেছিল। ওরা এক পর্যায়ে মিশর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে আসে এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে। তারা তখন আদিলপন্থী সৈন্যদেরকে সেখানে চলে আসার আহবান জানায় বিশেষ আফযাল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁর নামে মুদ্রাংকন ও মিশরীয় শহরসমূহে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। এই সফরে যুবরাজ আফযালের এতটুকু লাভ হল যে, বহু মিশরীয় সৈন্য তিনি তাঁর সাথে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। তিনি ওদেরকে নিয়ে তাঁর চাচার অনুপস্থিতিতে দামেস্ক পুনরুদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হন। এমনটি হয়েছিল তাঁর ভাই হালবের শাসক এবং হিমসের সুলতান আসাদুদ্দীনের পরামর্শে। তাঁরা দামেস্কে পৌছেন। নৌযান গুলো বন্ধ করে দেন। বৃক্ষরাজি কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। ফল-মূল খেয়ে ফেলেন। আল কাদাস মসজিদে তাঁবু স্থাপন করেন। তাঁর ভাই যাহির এবং চাচাত ভাই আসাদ আল কাসির স্বসৈন্যে এসে তাঁর সাথে যোগ দেয়। এতে তাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শক্তি বেড়ে যায়। তাঁর সৈন্যগণ শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, জনগণকে তারা আহবান জানায় আফযালকে বরণ করে নিতে, জনসাধারণের কেউই তাদের আহবানে সাড়া দেয়নি। অন্যদিকে সুলতান আদিল মার্ডিন থেকে তাঁর সৈন্যসহ দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর ভাইয়ের শাসনামলের সেনাপতিগণ এবং তাঁর অপরাপর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁর দলভুক্ত হয়। প্রত্যেক মিশরবাসী তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পাঠিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করে। তিনি আফযালের দুদিন আগে দামেস্কে এসে পৌছেন এবং সেটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। মার্ডিনে তিনি তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আল কামিলকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে এসেছিলেন। তিনি যখন দামেস্কে প্রবেশ করলেন তখন মিশরীয় সেনাপতিগণ ও অন্যান্যরা গোপনে তাঁর দলে যোগ দিল। আফযালের অবস্থান দুর্বল হয়ে গেল। যারা তাঁর প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিল তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। অনন্তর তিনি তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে শহর অবরোধই করে রাখলেন। এভাবে এই বৎসর কেটে গেল। পরবর্তী বছরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। তার বর্ণনা পরে আসবে। এই হিজরী সনে ইট ও সিমেন্ট দ্বারা বাগদাদের চারিদিকে নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়, এটি দেখা শোনার ও তদারকির দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া

হয় সেনাপতিদেরকে। এই বছরের পরে সেটির নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ফলে অবরোধ ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাগদাদ নগরী নিরাপদ হয়ে উঠে। ইতিপূর্বে সেখানে নিরাপত্তা প্রাচীর ছিল না।

৫৯৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সুলতান আবূ মুহাম্মদ ইয়াকূব ইব্ন ইউসুফ ইব্ন আবদুল মুমিন : তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা ও স্পেনের অধিপতি ছিলেন। নিজ শহরে তাঁর ইনতিকাল হয়। তিনি আল মাহ্দিয়াহ নামে একটি চমৎকার শহর তৈরী করেছিলেন। দীনদার, চরিত্রবান ও স্বচ্ছ হৃদয়ের ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইমাম মালিকের মতবাদের অনুসারী ছিলেন তিনি। পরে যাহিরী ও হানাফী মাযহাবভুক্ত হয়ে পড়েন। এরপর শাফিঈ মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর শাসিত কতক শহরে শাফিঈ মাযহাবভুক্তদের ব্যক্তিদেরকে বিচারক পদে নিয়োগ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ১৫ বছর। জিহাদের প্রতি ছিল তাঁর বলিষ্ঠ আকর্ষণ। বহু জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তিনি নিজে ইমামতি করতেন। মহিলা ও অসহায় লোকদের প্রতি তাঁর মনোযোগ আন্তরিক সহযোগিতা ছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন না করায় তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং আহবানে সাড়া দেননি। তাঁর ওফাতের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং তাঁর রীতি অক্ষুণ্ন রেখে শাসনকার্য চালিয়ে যান। পিতা ইয়াকূবের শাসনামলে তাঁর অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল এমন কতক শহর-নগর পুত্র মুহাম্মদের শাসনামলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর অবশ্য তারা পুনরায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইয়াকূবের পর এই পরিবারের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার পতন ঘটে। এই হিজরী সনে খোরাসান প্রদেশে এক মহাবিপর্যয় সংঘটিত হয়। এর কারণ এই যে, খ্যাতিমান আলিম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন উমার রাযী একসময় গযনীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘোরীর নিকট উপস্থিত হন। সুলতান তাঁকে স্বসম্মানে বরণ করেন এবং হিরাত অঞ্চলে তাঁর জন্যে একটি মাদরাসা তৈরি করে দেন। মূলতঃ ঘোরি বংশের অধিকাংশ লোক তখন কারামিয়্যাহ মতাদর্শ অনুসরণ করত। ইমাম রাযীর রাষ্ট্রীয় ঘনিষ্ঠতায় তারা ক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁকে সুলতানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করে, এক পর্যায়ে তারা হানাফী, শাফিঈ এবং কারামিয়াহ সম্প্রদায়ভুক্ত কতক ফকীহ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে সেখানে শায়খ ইব্নুল কুদওয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। মানুষের নিকট তিনি একজন সম্মানিত শায়খরূপে স্বীকৃত ছিলেন। তিনি ইব্ন কিরাম এবং ইব্ন হায়সামের অনুসারী ছিলেন। তিনি এবং আল্লামা রাযী বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। স্বাভাবিক ও নিয়ম মাফিক যুক্তি তর্কের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁরা পরস্পর গাল-মন্দ ও ভর্ৎসনা করার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পরদিন জনসাধারণ জামে মসজিদে উপস্থিত হয়, জনৈক ওয়াযকারী ওয়ায করেন এবং কিছু যুক্তি পেশ করেন, তিনি তাঁর বক্তৃতায় বললেন, লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য কিছু আমরা গ্রহণ করি না। এ্যারিস্টোটলের জ্ঞান, ইব্ন সীনার কুফরী, ফারাবীর দর্শন এবং রাযীর গোল মেলে কথা এগুলোর কিছুই আমরা জানিও না বলিও না। আমরা মহান আল্লাহর বাণী কুরআন মজীদ এবং তাঁর রাসূলের বাণী হাদীস শরীফই গ্রহণ করি। গতদিনে একজন

শায়খকে কেন গালমন্দ করা হল। যিনি মহান আল্লাহ্‌র দীন ও তাঁর রাসূলের সুন্নতের হিফাযতে নিয়োজিত রয়েছেন? তাছাড়া যিনি গালমন্দ করলেন তিনি একজন তাকিক ব্যক্তি, তার বক্তব্যের পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ নেই। তাঁর এই বক্তব্য শুনে শ্রোতাগণ কাঁদতে শুরু করে। কান্নার রোল পড়ে যায়। বিশেষত কারামিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকজন কেঁদে গড়াগড়ি খায়। তারা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানায়। কতক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করে। তারা ঘটনাটি সুলতানের নিকট পৌঁছায়। সুলতান নির্দেশ দেন ইমাম রাযীকে তাঁর রাজ্য থেকে বের করে দেয়ার জন্য। অতঃপর ইমাম রাযী হেরাত অঞ্চলে ফিরে আসেন। এজন্যে ইমাম রাযীর অন্তরে করামিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সর্বত্র তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ওদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন।

এই হিজরী সনে খলীফা সে কালের শায়খুল ওয়া'আয আবুল ফারাজ ইব্‌নুল জূযীর প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বাগদাদ থেকে ওয়াসিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পাঁচ বছর অবস্থান করেন। তাঁকে পেয়ে সেখানকার জনগণ অনেক উপকৃত হয়। তারা তাঁর চারিপাশে ভিড় জমাত এবং লাভবান হত। তিনি যখন বাগদাদে ফিরে আসেন তখন খলীফা তাঁকে বিশেষ উপহারে ভূষিত করেন এবং তাঁর পূর্ব নিয়ম মুতাবিক শায়খ মা'রূফ কারখীর মাযারের পাশে ওয়াজ নসীহত করার অনুমতি দেন। বহু লোক ওয়ায মাহফিলে শরীক হতে লাগল। স্বয়ং খলীফা ও হাজির হতেন। সে সময়ে খলীফাকে সম্বোধন করে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন–

لَا تُعْطِشِ الرَّوْضَ الَّذِیْ بَنَیْتَهٗ * بِصَوْبِ اِنْعَامِكَ قَدْ رَوَّضَا۔

নিজে যে বাগান তৈরী করেছেন সেটিকে পিপাসার্ত করে শুকিয়ে মারবেন না। আপনার অনুগ্রহের বর্ষণে ওই বাগান সজীব হয়েছে।

لَا تُبْرِ عُوْدًا قَدْ رَشَتَّهٗ * حَاشَى لِبَانِیْ الْمَجْدِ اَنْ یَنْقُضَا۔

যে কবিকে আপনি সযতনে নক্সা খচিত করেছেন সেটিকে কেটে টুকরো টুকরো করবেন না। মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারীর জন্যে তা বিনষ্ট করে দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

اِنْ كَانَ لِیْ ذَنْبٌ قَدْ جَنَیْتُهٗ * فَاسْتَأْنِفِ الْعَفْوَ وَهَبْ لِیَ الرِّضَا۔

আমার যদি কোন দোষ থাকে যা আমি করেছি তবে আমাকে নতুন ভাবে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি আপনার সন্তুষ্টি মঞ্জুর করুন।

قَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ لِنَیْلِ الْمُنٰى * فَالْیَوْمَ لَا اَطْلُبُ اِلَّا الرِّضَا۔

আমি অনেক মনোবাঞ্ছা পূরণের আশা পোষণ করতাম আজ শুধু আপনার সন্তুষ্টি পাওয়ার কামনাতেই সীমিত করেছি।

তিনি সেদিন আরো বলেছেন :

شَقِیْنَا بِالنَّوٰی زَمَنًا * فَلَمَّا تَلَاقَیْنَا كَاَنَّا مَا شَقِیْنَا۔

পরস্পর দূরত্ব ও বিরহে আমরা কষ্ট পেয়েছি। যখন আমরা পরস্পর মিলিত হলাম, সাক্ষাত হল তখন মনে হচ্ছে যেন আমরা কখনো দুঃখ ভোগ করিনি।

سَخَطْنَا عِنْدَ مَا جَنَّتِ اللَّيَالِي * وَمَا زَالَتْ بِنَا حَتَّى رَضِينَا۔

আমরা পরস্পর বিরাগ ভাজন ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম রাত যখন গভীর হয়েছিল তখন। তবে এই বিরাগ ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকার এক পর্যায়ে আমরা পরস্পর সন্তুষ্ট ও আন্তরিক হয়েছি।

وَمَنْ لَمْ يَحْيَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَوْمًا * فَإِنَّا بَعْدَ مَا مِتْنَا حَيِينَا۔

মানুষ মৃত্যুর পর কোন দিন জীবিত হয় না। আমরা কিন্তু মরে যাবার পর পুনরায় জীবিত হলাম।

এই হিজরী সনে খলীফা আল নাসির মুসেলের বিচারক কাযী যিয়াউদ্দীন ইব্ন শাহরযূরীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দান করেন। হাকিম আবদুল গনী মুকাদ্দেসীকে কেন্দ্র করে এই হিজরী সনে দামেস্কে এক দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি আল মাকসূরাহ প্রাসাদের উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। একদিন তিনি আকীদা বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলেন। অতঃপর কাযী ইব্ন যাকী, যিয়াউদ্দীন খতীব দাওলা'ঈ, আমীর সারিমুদ্দীন বারগাশ প্রমুখ একত্রিত হয়ে একটি উলামা সমাবেশের আয়োজন করেন। মহান আল্লাহ্র আরশে অবস্থান করা, অবতরণ করা এবং শব্দ করা এগুলো ছিল সমাবেশের আলোচ্য বিষয়। নাজমুল হাম্বলী এসব বিষয়ে অন্যান্য ফকীহদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। কিন্তু হাকিম আবদুল গণী তাঁর বক্তব্যে অবিচল থাকেন, তা হতে ফিরে আসেননি। অন্যান্য ফকীহগণ তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তাঁকে জঘন্য অপবাদে অভিযুক্ত করে। মূলত: তিনি তেমন অপবাদ যোগ্য কিছু করেননি। এক পর্যায়ে আমীর বারগাশ বললেন, তাহলে কি এরা সকলেই ভ্রান্তিতে আছেন আর আপনি একা সত্যের উপর আছেন? তিনি বললেন, হাঁ তাই। এতে আমীর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং হাকিমকে শহর থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। হাকিম তিন দিনের সময় চান। তাঁকে তিন দিনের সময় দেয়া হয়। আমীর বারগাশ পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে দেন। তারা হাম্বলী মিম্বর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ওই দিন হাম্বলী মিহরাবে যোহরের নামায হয়নি। সেখানে থাকা সিন্দুক, আলমিরা ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বাহিরে নিয়ে যাওয়া যায়। এটি এক বিরাট অশান্তি। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল ফিতনা ও বিশৃংখলা থেকে আমরা মহান আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করছি। ওই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫৯৫ হিজরী সনের ২৪ জিলহজ্জ সোমবারে। অতঃপর হাকিম আবদুল গণী দামেস্ক ছেড়ে বা'আলা বাক্কা শহরে চলে যান। এরপর এক সময় তিনি মিশর গমন করেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁকে সেখানে সসম্মানে বরণ করে নেয়।

আমীর মুজাহিদুদ্দীন কীমায রূমী : তিনি ছিলেন মুসেলের শাসনকর্তা। তাঁর উস্তাদপুত্র নূরুদ্দীন আরসালান এর শাসনকালে তিনি এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, মেধাবী হানাফী ফিক্হবিদ। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। ইতিহাস ও ঘটনাবলীর এক বিরাট অংশ তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি বহু বিদ্যালয়, মসজিদ, মেহমানখানা ও বিশ্রাম কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি অনেকগুলো সাদকায়ে জারিয়া বা চলমান সাদকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইব্নুল আছীর তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন দুনিয়ার অলংকার।

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর : তিনি হলেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ, ইব্ন আবদুল আযীয আব্বাসী হাশেমী। ইব্ন নাজ্জারীর পর তিনি বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করতেন। আবুল হাসান ইব্নুল খিল্ল ও অন্যান্য শায়খের নিকট ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। এক পর্যায়ে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে বিচারক ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মূল জন্মস্থান মক্কা নগরী। তিনি বাগদাদে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে পার্থিব উন্নতি অগ্রগতি যা পাবার পেয়েছেন। একটি মুদ্রায় তাঁর নাম অংকিত করার অভিযোগে তাঁকে বিচারকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর বিরুদ্ধে এটি ছিল ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যা অভিযোগ। এ বিষয়ে মহান আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর থেকে তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করতেন এবং এক সময়ে তাঁর ওফাত হয়।

শায়খ জামালুদ্দীন আবুল কাসিম : তিনি হলেন আবুল কাসিম ইয়াহ্য়া ইব্ন আলী ইব্ন ফযল ইব্ন বারাকাহ ইব্ন ফযলান। বাগদাদে তিনি শাফিঈ মাযহাবের শায়খ ও অভিভাবক ছিলেন। প্রথমে তিনি নিযামিয়া মাদরাসার অধ্যাপক সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ আলযার-এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর খোরাসান গমন করেন এবং ইমাম গায্যালীর ছাত্র শায়খ মুহাম্মদ যুবায়দী থেকে ফিক্হের জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর বাগদাদ ফিরে আসেন। তিনি ইলমুল মুনাযারাহ বা তর্কবিদ্যা এবং মূল বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি বাগদাদবাসীকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। শিক্ষার্থী ও ফকীহবৃন্দ তাঁর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। তাঁর শিক্ষাদানের জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি সেখানে পাঠ দান করতেন। প্রচুর সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর মজলিসে উপস্থিত হত। তিনি খুব মনোযোগের সাথে দীর্ঘক্ষণ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন এবং অধিক পরিমাণে হাদীস শরীফ শ্রবণ করতেন। তিনি একজন সুদর্শন সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান উস্তাদ ছিলেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

وَإِذَا أَرَدْتَ مَنَازِلَ الْأَشْرَافِ * فَعَلَيْكَ بِالْإِسْعَافِ وَالْإِنْصَافِ۔

তুমি যদি অভিজাত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের মর্যাদা পেতে চাও তাহলে তোমাকে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে এবং ন্যায় বিচার করতে হবে।

وَإِذَا بَغَى بَاغٍ عَلَيْكَ فَخَلِّهِ * وَالدَّهْرَ فَهُوَ لَهُ مُكَافٌ كَافٍ۔

কোন সন্ত্রাসী ও সত্যাদ্রোহী যদি তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আক্রমণ করে তবে তাকে যুগ-পরিক্রমার হাতে ছেড়ে দিবে। তোমার পক্ষে সেটিই তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫৯৬ হিজরী সন (১২০০ খ্রি.)

এই হিজরী সন যখন শুরু হয় তখন সুলতান আফযাল তাঁর সৈন্য সামন্তসহ তাঁর চাচা আদিলকে দামেস্কে অবরোধ করে রেখেছিল। নগরে খাদ্য প্রবেশ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছিল। ফলে জনগণও পানির অভাবে ভুগছিল। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত ছিল। দামেস্কের সৈন্যদল যেন তাদের নিকট পৌঁছতে না পারে সেজন্যে তারা নগরীর চারিদিকে পরিখা খনন করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে শীতকাল এসে যায়। প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু হয়। সফর মাস আসার পর সুলতান আদিলের পুত্র আল কামিল মুহাম্মদ এক বিশাল সেনাবহর নিয়ে তুর্কম্যান

হতে এগিয়ে আসে তাঁর পিতাকে সহযোগিতা করার জন্যে। তাঁর সাথে জাযীরা, রাহা এবং হাররানের সেনাবাহিনীও ছিল। তাঁদের আগমন সংবাদ পেয়ে মিশরীয় সৈন্যগণ রনে ভঙ্গ দিয়ে চলে যায়। যুবরাজ যাহির হালবে চলে যায়, আসাদ চলে যায় হিমসে আর আফযাল চলে যায় মিশরে। সুলতান 'আদিল শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ করেন। ইতিমধ্যে কিন্তু তিনি নগরে কর্তৃত্ব সমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে সেনাপতিগণ আফযালের পেছনে পেছনে যাত্রা করল তাকে কায়রো প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্যে। তারা আদিলকে লিখিত ভাবে জানাল যে, তিনি যেন দ্রুত ওদের সাথে মিলিত হন। আদিল দ্রুত ওদের সাথে মিলিত হলেন। ইতিমধ্যে আফযাল মিশরে পৌঁছে যান এবং আল জাবাল দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দুর্বল ও সাহসহারা হয়ে যান। আদিল এসে বিরকাহ অঞ্চলে অবতরণ করে এবং মিশর দখল করে নেন। লাঞ্ছিত ও আত্ম সমর্পিত হয়ে আফযাল তাঁর সম্মুখে আগমন করেন। তিনি আফযালকে সিরিয়া অঞ্চল থেকে বহিষ্কার করে জাযীরাতে কয়েকটি শহর তাঁর নামে বরাদ্দ দেন। সুলতান আদিল দূর্গে প্রবেশ করেন এবং সদরুদ্দীন আবদুল মালিক ইব্ন দিরবাস কর্দীকে বিচারকের দায়িত্বে পুর্নবহাল করেন। খুতবা প্রদান ও মুদ্রাংকন তাঁর ভাই মনসুরের নামেই রেখে দেন। সুলতান আদিল নিজেই রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তিনি সফিউদ্দীন ইব্ন শোকরকে তাঁর মন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করেন। কারণ সফিউদ্দীন তাঁর সততা, সাহসিকতা ও দৃঢ়তায় সুলতানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আদিল তদীয় পুত্র আল কামিলকে জাযীরা থেকে মিশরে ডেকে পাঠালেন তাঁর হাতে মিশরের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করার জন্যে। যুবরাজ আল কামিল এলেন। সুলতান তাঁকে স্বশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করলেন। নগরের ফকীহবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুলতান তাঁদের নিকট তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মানসুর ইব্ন আযীযের সুলতান পথে অধিষ্ঠিত থাকার বৈধতা সম্পর্কে ফাতাওয়া চাইলেন। তখন মানসুরের বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। তাঁরা তাঁর সুলতান পদে অধিষ্ঠিত থাকা বৈধ নয় বলে ফাতাওয়া দিলেন। কারণ, তাঁর স্বাধীন বিচারিক শক্তি ছিল না। অন্যের পরামর্শে তাঁকে চলতে হয়। এরপর সুলতান আদিল সেনাপতিদেরকে তলব করলেন এবং তাঁর সাথে বায়'আত করার আহবান জানালেন। তাঁরা তাতে রাজী হল না। তিনি তাদেরকে এই প্রস্তাব মানার জন্যে উৎসাহিত করলেন এবং লাভ ও কল্যাণের দিক তুলে ধরলেন, অন্যদিকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেন উলামা-ই-কিরাম যে ফতোয়া দিলেন তাতো আপনারা শুনেছেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, ছোট বাচ্চারা শত্রুদের আক্রমণ থেকে মুসলমানদের সমুদ্র উপকুল রক্ষা করতে পারে না; বরং বয়স্ক ও অভিজ্ঞ রাজা বাদশাগণ তা রক্ষা করতে পারেন। এরপর সেনাপতিগণ তাঁর বক্তব্যের সত্যতার স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁর হাতে বায়আ'ত গ্রহণ করে। এরপর তদীয়পুত্র আল কামিলের প্রতি তারা বায়আ'ত গ্রহণ করে সমর্থন জানায়। তখন থেকে মসজিদে খতীবগণ খলীফার নামের পর খুতবায় তাঁদের দু'জনের নাম উল্লেখ করতেন। তাঁদের দু'জনের নামে মুদ্রাংকন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘ দামেস্কে আদিল পুত্র আল মুআ'যযাম ঈসা এবং মিশরে আদিল পুত্র আল কামিলের শাসন ক্ষমতা পাকা পোক্ত হয়।

এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে আমীর মালিকুদ্দীন আবূ মনসূর সুলায়মান ইব্ন মাসরুর ইব্ন জিলদাক দামেস্কে ফিরে আসেন। তিনি হলেন সুলতান আদিলের বৈপিত্রের ভাই। তিনি

আল ফারাদীস ফটকের অভ্যন্তরে আল ফালাকিয়্যাহতে অবস্থানরত ছিলেন। সেখানে তাঁর সমাধি রয়েছে। দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের পর সম্মান ও মর্যাদার সাথে তিনি সেখানে বসবাস করেন। অবশেষে এ বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই হিজরী সন ও তৎপরবর্তী সনে মিশরীয় অঞ্চলে দ্রব্য-মূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতি বিদ্যমান থাকে। চরম অভাব অনটনে অতীষ্ঠ হয়ে উঠে জনসাধারণ। এই অভাব অনটন ও দুর্ভিক্ষে ধনী গরীব নির্বিশেষে বহু মানুষ মারা যায়। লোকজন মিশর ছেড়ে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক মানুষ সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কারণ, পথে-প্রান্তরে ওঁৎপেতে থাকা ফরাসী সৈন্যগণ তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে এবং স্বল্প পরিমাণ খাদ্য সামগ্রীর লোভ দেখিয়ে প্রতারণা করে তাদেরকে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে গিয়ে খুন করে। অবশ্য ইরাকী শহর নগরে তখন খাদ্য সামগ্রী পর্যাপ্ত মওজুদ এবং সস্তা মূল্য অব্যাহত ছিল। ইব্নুস সাঈ বলেন, এই হিজরী সনে বাগদাদে এক অভিনব ঘটনা ঘটে। একটি মোরগ ডিম দেয়। তিনি বলেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে আমি এর রহস্য জিজ্ঞেস করি। তাঁরা এ বিষয়ে এই ব্যাখ্যা দেন যে, বাগদাদে খাদ্য সমাগ্রীর অভাব দেখা দিবে না।

৫৯৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিযম শাহ : তিনি হলেন তাহির ইব্ন হুসায়নের বংশধর সুলতান আলাউদ্দীন ইব্ন আলফ আরসালান। তিনি খোরাসানের কতক প্রদেশ, রায় এবং অন্যান্য কতক বিস্তৃত জনপদের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনিই সেলজুক বংশের শাসন ক্ষমতার পতন ঘটান। তিনি একজন চরিত্রবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসন ছিলেন। সংগীত শাস্ত্রে তাঁর প্রচুর দখল ছিল। তিনি সরল ও সুন্দর জীবন যাপন করতেন। হানাফী মযাহাবের একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ ছিলেন তিনি। ফিকহের নীতিমালা শাস্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। হানাফী মাযহাবের অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্যে তিনি একটি বিরাট মাদরাসা স্থাপন করে গিয়েছেন। তাঁরই নির্মিত খাওয়ারিযমের সমাধিতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর ইনতিকালের পর তদীয় পুত্র আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইতিপূর্বে তিনি 'কুতুবুদ্দীন' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই হিজরী সনে সুলতান খাওয়ারিযমের উপরোল্লিখিত মন্ত্রী নিহত হয়।

নিযামুদ্দীন মাসঊদ ইব্ন আলী : ৫৯৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন নিযামুদ্দীন মাসউদ ইব্ন আলী। তিনি সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করতেন। খাওয়ারিযমে তাঁর একটি বড় মাদরাসা রয়েছে। তাঁর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে। হালব অঞ্চলে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারিগণ শাফিঈ পন্থীদের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে। শায়খুল ইসলাম নামে পরিচিত ওদের স্থানীয় শায়খ ও শাফিঈদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। কথিত আছে যে, ওরা শাফিঈ মাযহাবের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পুঁড়িয়ে দেয়। বস্তুত: ওদের বোকামী ও দ্বীনের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও সংকীর্ণ গোষ্ঠি-অন্ধত্ব তাদেরকে এই অপকর্মে প্ররোচিত করেছিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যত টাকা ব্যয় করেছিলেন সুলতান খাওয়ারিযম শাহ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সেই পরিমাণ অর্থ তাঁকে পরিশোধ করে দেন।

আবুল ফারাজ ইব্ন আবদুল মুন'ইম ইব্ন আবদুল ওহহাব : তিনি হলেন শায়খুল মুসনাদ আবুল ফারাজ ইব্ন আবদুল মুন'ইম ইব্ন আবদুল ওওহাব ইব্ন সাদকাহ ইব্ন খাযির ইব্ন কালীব আল হারবানী। জন্ম, বসবাস এবং মৃত্যু তাঁর সবই বাগদাদে অনুষ্ঠিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। বহু মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন এবং বহু শিক্ষার্থীকে তিনি হাদীস শুনিয়েছেন। বহু মাশায়েখ থেকে তিনি এক হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন।

ফকীহ্ মাজদুদ্দীন : তিনি হলেন ফকীহ মাজদুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ ইব্ন তাহির ইব্ন নাসর ইব্ন জামীল। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের শিক্ষক ছিলেন। সিলাহিয়্যাহ মাদরাসার প্রথম শিক্ষক ছিলেন তিনি। বানূ জামীলুদ্দীন গোত্রের ফকীহ্বৃন্দের পিতা ছিলেন তিনি। তাঁরা সকলে জারুখিয়্যাহ মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। এরপর সমসাময়িক যুগে চলে গেলেন ইমাদিয়্যাহ মাদরাসায় ও দিমাইয়্যাহ মাদরাসায়। একপর্যায়ে তাঁরা সকলে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের ভাষ্যগ্রন্থ ব্যতীত তাঁদের ব্যক্তিগত কোন নিদর্শন এখন অবশিষ্ট নেই।

আমীর সারিমুদ্দীন কাইমায : ইব্ন আবদুল্লাহ আননুজ, সালাহিয়্যাহ সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীনের নিকট তিনি ছিলেন শিক্ষক সমতুল্য। আল আযিদের মৃত্যুর পর তিনি 'আল কাসর' প্রসাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাতে তিনি প্রচুর ধন রত্নের মালিক হন। ব্যাপকহারে দান সাদকা ও ধর্মীয় কাজে জায়গা জমি ওয়াক্ফ করতেন তিনি। একদিন তিনি নগদ সাত হাজার দীনার সাদকা করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। মাদরাসা আল কীমাযিয়াহ্ তাঁর ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে গড়ে উঠেছে। মাদরাসাটি দূর্গের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। আল আশরাফিয়াহ 'দারুল হাদীস' ছিল এই আমীরের রাজপ্রাসাদ। সেখানে তাঁর একটি গোসলখানা ছিল। পরবর্তীতে সুলতান আশরাফ এটি ক্রয় করেন এবং এটিকে দারুল হাদীস বা হাদীস শিক্ষালয়ে রূপান্তরিত করেন। গোসলখানাটিকে শিক্ষকদের বাসস্থানে রূপান্তরিত করেন, আমীর কীমাযের মৃত্যুর পর তাঁকে যখন দাফন করা হয় তাঁর বাসস্থান গোলা ঘরের মাটি খনন করে স্বর্ণ-রৌপ্য অনুসন্ধান করা হয়। কারণ, সকলের জানা শোনা ছিল যে, আমীর কীমায বিশাল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। এসব খোঁজা খোঁজির পর যা পাওয়া যায় তার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ দীনার। সন্দেহ করা হত যে, তাঁর নিকট এর চাইতে আরো অধিক ধনেশ্বর ছিল। তিনি অনাবাদী ও পরিত্যক্ত ভিটে মাটি ও পল্লী অঞ্চলে তাঁর ধন-সম্পদ মাটির নীচে পুঁতে রাখতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

আমীর লু'লু : তিনি মিশরীয় অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নিরাপত্তা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর শাসনামলে তিনি শীর্ষ সেনাপতিদের একজন ছিলেন। তিনি সমুদ্রে নৌবহরে নেতৃত্ব দিতেন। সামুদ্রিক যুদ্ধাভিযানে কত বীর শত্রুকে তিনি বন্দী করেছেন কত নৌযান ধ্বংস করেছেন তার হিসেব নেই। ব্যাপকহারে জিহাদে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর দান সাদকা করতেন। একবার মিশরে অভাব ও দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ফান্ড হতে ১২ হাজার লোককে বার হাজার বড় বড় রুটি দান করেছিলেন।

শায়খ শিহাবুদ্দীন তূসী : তিনি মিশরীয় অঞ্চলের ফিক্হ শাস্ত্রের অন্যতম শায়খ। ত্বকী উদ্দীন শাহানশাহ-এর সাথে সম্পর্কিত "মানাযিল আল-ইজু' নামে পরিচিত মাদরাসার শায়খ

ছিলেন তিনি। ইমাম গায্‌যালী (র)-এর শিষ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া-এর সহপাঠী ছিলেন তিনি। মিশরীয় রাজা বাদশাদের নিকট তাঁর খুব মর্যাদা ছিল। তিনি ওদেরকে সৎকর্মে আদেশ দিতেন এবং মন্দকর্মে বারণ করতেন। এই হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জানাযায় বহু লোক উপস্থিত হয়। তারা তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ ও আহজারি করে।

শায়খ যহীরুদ্দীন আবদুস সালাম ফারসী : তিনি ছিলেন হালব অঞ্চলে শাফিঈ মাযহাবের শায়খ ও উস্তাদ। ইমাম গায্‌যালীর (র) শিষ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া থেকে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম রাযী-এর শিষ্যত্ব ও গ্রহণ করেন তিনি। তিনি মিশর গমন করেন। তাঁকে ইমাম শাফিঈ (র)-এর সমাধি পার্শ্বস্থ মাদরাসায় শিক্ষাদানের প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। অতঃপর তিনি হালব ফিরে যান এবং আমৃত্যু সেখানে বসবাস করেন।

শায়খ আল্লামা বদরুদ্দীন ইব্‌ন আসকার : তিনি ছিলেন দামেস্কে হানাফী মতাবলম্বীদের নেতা, আবু শামা বলেছেন যে, তিনি ইব্‌নুল আক্কাদাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কবি আবুল হাসান : তিনি হলেন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আকীল ইব্‌ন আহমদ বাগদাদী, ৫৯৬ হিজরী সনে তিনি দামেস্কে আগমন করেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। উচ্চমানের বহু কবিতা রয়েছে তার মধ্যে বা 'আলা বাক্কা প্রদেশের গভর্নর সুলতান আল আমজাদের প্রশংসাগীতি রচনায় তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন এ প্রসংগে তিনি রচনা করেছেন :

وَمَا النَّاسُ اِلَّا كَامِلُ الْحَظِّ نَاقِصٌ - وَاٰخَرُ مِنْهُمْ نَاقِصُ الْحَظِّ كَامِلُ.

মানুষের মধ্যে কতক আছে পার্থিব উন্নতিতে পরিপূর্ণ কিন্তু পরকালীন অংশ প্রাপ্তিতে পিছিয়ে পড়া। আর কতক আছে পার্থিব উন্নতিতে পিছিয়ে পড়া কিন্তু পরকালীন প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ।

وَاِنِّىْ لمثر مِنْ خِيَارٍ اَعِفَّةٍ - وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَالِ كَامِلُ.

আমি কল্যাণকামী সৎ ও পরিচ্ছন্ন মানুষদের দলে আছি। যদিও আমার নিকট প্রচুর পরিমাণ বিত্ত বৈভব নেই।

আবূ আলী আবদুর রহীম ইব্‌ন কাযী আশরাফ : ৫৯৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন হলেন সম্মানিত বিচারক, বিজ্ঞ ইমাম শীর্ষস্থানীয় ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক আবূ আলী আবদুর রহীম ইব্‌ন কাযী আশরাফ ইব্‌ন আবুল মাজ্‌দ আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন বিসানী ওরফে কাযী ফাযিল। তাঁর পিতা আসকালান শহরের বিচারপতি ছিলেন। ফাতেমা শাসনের যুগে তিনি তাঁর পুত্রকে মিশর প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে আবুল ফাত্‌হ কাদুস ও অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য চর্চা করতে থাকেন। অতঃপর তিনি শহরবাসীদের মধ্যে এমনকি বাগদাদ নগরীতে ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এখনো পর্যন্ত তাঁর সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন কারো আবির্ভাব ঘটেনি। সুলতান সালাহুদ্দীন মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তাঁকে বিশেষ সহকারী, বন্ধু, মন্ত্রী এবং উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করেন। নিজের ছেলে মেয়ে এবং পরিবার পরিজন অপেক্ষা সুলতান তাঁকে অধিক গুরুত্ব ও সম্মান দিতেন। তাঁরা দু'জন পরস্পর সহযোগী হয়ে বহু দেশ ও রাজ্য জয় করেছেন। একজন চালিয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণ বীর তরবারি আর অপরজন চালিয়েছেন

তাঁর ক্ষুরধার কলমও তেজস্বী জিহ্বা, কাযী ফাযিল ছিলেন প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। তা সত্ত্বেও তিনি দান সাদকা করতেন নিয়মিত। রোযা, নামায ও আত্মীয় বাৎসল্যে তিনি ছিলেন অগ্রগামী, রাতে দিনে মিলিয়ে প্রতিদিন তিনি একবার পূর্ণ কুরআন মজীদ পাঠ শেষ করতেন। বহু রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল। চরিত্র সুন্দর। বাহির ও ভেতর পবিত্র। মিশরে, তাঁর একটি মাদরাসা রয়েছে সেখানে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের চর্চা হয়। খ্রিস্টানদের হাত থেকে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্তি করার জন্যে মুক্তিপণ প্রদানের লক্ষ্যে তিনি বহু অর্থ সম্পদ ওয়াক্ফ করে যান। তাঁর ছিল একটি পুস্তক সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, তাতে প্রায় এক লক্ষ কিতাব মজুদ ছিল।

৫০২ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। সুলতান আদিল যেদিন আকস্মিক মিশরের প্রাসাদস্থ তাঁর মাদরাসায় প্রবেশ করেন সেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন ছিল ৫৯৬ হিজরী সনের রবিউল আখির মাসের ৬ তারিখ মঙ্গলবার। তাঁর জানাযায় বহু লোকের সমাগম ঘটে। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিনে সুলতান আদিল তাঁর কবর যিয়ারত করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। সুলতান আদিল মিশরে প্রবেশ করে সফিউদ্দীন ইব্ন শোকরকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কাযী ফাযিল যখন এই সংবাদ শুনলেন তখন মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন যেন তিনি তাঁকে এই সাম্রাজ্যে আর জীবিত না রাখেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, কেউ তাঁকে দুঃখ কষ্ট দিতে পারেনি এবং রাজ্যে তদপেক্ষা বয়স্কা ও সম্মানিত অন্য কাউকে তিনি দেখে যাননি। কবিগণ তাঁর বিয়োগ বেদনায় বহু উন্নত পর্যায়ের শোকগাঁথা রচনা করেছেন, সেগুলোর একটা হল কাযী হিবাতুল্লাহ্-এর নিম্নের কবিতা :

عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَلَى الْبَرِيَّةِ رَحْمَةٌ * اَمِنَتْ بِصُحْبَتِهَا حُلُوْلُ عِقَابِهَا-

তিনি হলেন দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা। জগতের জন্যে তিনি ছিলেন দয়া। তাঁর সংস্পর্শে থেকে জগত নিরাপদ ছিল শাস্তি ও গযব অবতীর্ণ হওয়া থেকে।

يَاسَائِلِيْ عَنْهُ وَعَنْ اَسْبَابِهِ * نَالَ السَّمَاءَ فَسَلْهُ عَنْ اَسْبَابِهَا-

ওহে প্রশ্ন কর্তা; যে আমাকে প্রশ্ন করছেন তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর সরঞ্জামাদি সম্পর্কে। শোন, তিনি আকাশ ছুঁয়েছেন, সুতরাং তার মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

وَاَتَتْهُ خَاطِبَةٌ اِلَيْهِ وَزَارَةٌ * وَلَطَالَ مَا اَعْيَتْ عَلَى خِطَابِهَا-

মন্ত্রীত্ব স্বত্ব তাঁর প্রতি প্রস্তাব হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন তাঁকে তাতে সম্মত করাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

وَاَتَتْ سَعَادَتُهُ اِلَى اَبْوَابِهِ * لَا كَالَّذِيْ يَسْعٰى اِلَى اَبْوَابِهَا-

সৌভাগ্য তাঁর দরজায় এসেছে স্বেচ্ছায়, সেই ব্যক্তির মত নয় যে সৌভাগ্যের দরজায় দৌড়ে যায়।

تَعْنُوْ الْمُلُوْكُ بِوَجْهِهِ بِوُجُوْهِهَا * لَا بَلْ تساق لِبَابِهِ بِرِقَابِهَا-

রাজা বাদশাগণ মুখমণ্ডল অবনত করে তাঁর সম্মুখে, তিনি মাথা নত করেন না, বরং তাদের বাহন তাঁর দরজার দিকে পরিচালিত হয়।

شَغَلَ الْمُلُوْكَ بِمَا يَزُوْلُ وَنَفْسَهُ * مَشْغُوْلَةٌ بِالذِّكْرِ فِيْ مِحْرَابِهَا-

রাজা বাদশাগণ ব্যস্ত থাকে সে সব বিষয়ে নিয়ে যেগুলো ধ্বংস ও নিঃশেষ হবে। আর তাঁর আত্মা মগ্ন থাকে আল্লাহ্‌র যিকরে স্মরণে।

فِيْ الصَّوْمِ وَالصَّلَوَاتِ اَتْعَبَ نَفْسَهُ * وَضِمَانُ رَاحَتِهِ عَلَى إِتْعَابِهَا۔

তিনি রোযা ও নামাযে তাঁর আত্মাকে ব্যাপৃত রাখেন। বস্তুতঃ আত্মাকে মেহনত ও শ্রমে নিয়োজিত রাখার মধ্যেই রয়েছে তাঁর শান্তির গ্যারান্টি।

وَتَعَجَّلَ الْاَقْلَاعُ عَنْ لَذَّاتِهِ * ثِقَةٌ بِحُسْنِ مَالِهِ وَمَا بِهَا۔

এই জগতের আরাম আয়েশ তাঁর দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল। পরকালীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুনিশ্চিত ও আস্থাশীল।

فَلْيَتَفْخَرِ الدُّنْيَا بِسَائِسِ مُلْكِهَا * مِنْهُ وَدَارِسِ عِلْمِهَا وَكِتَابِهَا۔

দুনিয়া তার রাজত্বের এই ব্যক্তি নিয়ে গৌরব করতে পারে জ্ঞান ও কিতাবের পঠন পাঠনকারী এই ব্যক্তির জন্যে অহংকার করতে পারে।

صَوَّامُهَا وَقَوَّامُهَا عَلَّامُهَا * عَمَّالُهَا بَذَّالُهَا وَهَّابُهَا۔

দুনিয়া গর্ব করতে পারে তার এই নাগরিককে নিয়ে যিনি প্রচুর রোযা পালনকারী, ইবাদতকারী, বিশাল জ্ঞানাধিকারী, দানশীল ও ব্যয়কারী।

অবশ্য এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কাযী ফাযিল তাঁর এত গুণ ও যোগ্যতা থাক সত্বেও তাঁর কোন দীর্ঘ কবিতা নেই। তাঁর পুস্তকগুলোর মাঝে মাঝে এক দুই পংক্তির কবিতা প্রচুর পাওয়া যায় বটে তার কতক এই :

سَبَقْتُمْ بِإِسْدَاءِ الْجَمِيْلِ تَكَرُّمًا * وَمَا مِثْلُكُمْ فِيْمَنْ يُحَدِّثُ اَوْ يَحْلَى۔

সুদর্শন ও সুপুরুষকে সাজিয়ে দিতে তোমরা এগিয়ে গিয়েছ। যারা হাদীস বর্ণনা করে কিংবা ঘটনা বিবৃত করে তাদের মধ্যে তোমাদের মত কেউ নেই।

وَكَانَ ظَنِّيْ اَنْ أُسَابِقَكُمْ بِهِ * وَلَكِنْ بَلَتْ قَبْلِيْ فَهِيْجَ لِيَ الْبُكَا۔

আমার ধারণা ছিল যে, এই বিষয়ে আমি তোমাদের চেয়ে এগিয়ে যাব। কিন্তু সে আমার আগে কেঁদে উঠল, ফলে আমার কান্না জোরদার হল।

وَلِيْ صَاحِبٌ مَا خِفْتُ مِنْ جَوْرِ حَادِثٍ * مِنَ الدَّهْرِ اِلَّا كَانَ لِيْ مِنْ وَرَائِهِ۔

আমার একজন বন্ধু আছেন। ফলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আমি ভয় পাই না। সকল দুর্যোগ দুদর্শায় তিনি আমার সাথে থাকেন।

اِذَا عَضَّنِيْ صَرْفُ الزَّمَانِ فَإِنَّنِيْ * بِرَايَاتِهِ أَسْطُوْ عَلَيْهِ وَارَائِهِ۔

যুগ বিবর্তন যদি আমাকে ছোবল মারে তখন আমি তাঁরই ঢাল ব্যবহার করে তার পেছন দিক থেকে আক্রমণ করি।

তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতা :

أَرَى الْكُتَّابَ كُلَّهُمْ جَمِيْعًا * بِأَرْزَاقٍ تَعُمُّهُمْ سِنِيْنَا.

আমি লেখকদেরকে এবং সাহিত্যিকদেরকে দেখেছি যে, তাদের সকলে ভাতাও জীবিকাপ্রাপ্ত। বছরের পর বছর তাঁরা ভাতা ও অনুদান পেয়ে আসছেন।

وَمَالِيْ بَيْنَهُمْ رِزْقٌ كَأَنِّيْ * خُلِقْتُ مِنَ الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَا.

কিন্তু তাদের মাঝে থাকা সত্ত্বেও আমার জন্যে কোনো ভাতা ও অনুদান নেই। আমি যেন কিরামান কাতিবীন ফিরিশতাদের মধ্য হতে সৃজিত হয়ে এসেছি।

মৌমাছি ও ভ্রমর বিষয়ে তাঁর কবিতা :

وَمُغْرِدَيْنِ تَجَاوَبَا فِيْ مَجْلِسٍ * مَنَعَاهُمَا لِأَذَاهُمَا الْأَقْوَامُ.

গানে গানে গুঞ্জন করে ওই দুটোই একটি আমরে এসেছিল। ওগুলোর ক্লেশ দান চরিত্রের কারণে লোকজন সেগুলোকে মজলিসে প্রবেশে বাধা দেয়।

هَذَا يَجُوْدُ بِعَكْسِ مَا يَأْتِيْ بِهِ * هَذَا فَيُحْمَدُ هٰذَا وَذَاكَ يُلَامُ.

এটি অর্থাৎ মৌমাছি এমন উপহার নিয়ে আসে যা ওটি অর্থাৎ ভ্রমরের আনীত বস্তুর বিপরীত, ফলে এটি প্রশংসা পায় আর ওটি গালমন্দ শোনে।

তাঁর অন্য একটি কবিতা :

بِتْنَا عَلٰى حَالٍ تَسُرُّ الْهَوٰى * لٰكِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الشَّرْحُ.

আমরা রাত কাটিয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমাদের কামনা ও আমোদ প্রমোদভাব পূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু সেটি বিস্তারিত বলা যাবে না।

بَوَّابُنَا اللَّيْلُ وَقُلْنَا لَهُ * إِنْ غِبْتَ عَنَّا هَجَمَ الصُّبْحُ.

আমাদের দারোয়ান ছিল রাত নিজেই। আমরা তাকে বললাম তুমি আমাদেরকে রেখে অদৃশ্য হলে প্রভাত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একবার সুলতান আযীযের এক ক্রীতদাসী সুলতান আযীযকে স্বর্ণের একটি পুঁথি দান করে কালো কস্তুরীতে আচ্ছাদিত করে। তখন সুলতান এর রহস্য জানতে চাইলেন কাযী ফাযিলের নিকট তখন কাযী ফাযিল নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

أَهْدَتْ لَكَ الْعَنْبَرَ فِيْ وَسْطِهِ * زومن التبر رقيق اللحام.

সে তো আপনার জন্যে উপহার পাঠিয়েছে। উপহার সামগ্রী হল কস্তুরী। এটির মাঝে আছে স্বর্ণের পুঁথি। আচ্ছাদন হল পাতলা।

فَالزِّرُّ فِي الْعَنْبَرِ مَعْنَاهُمَا * زُرْ هٰكَذَا مُخْتَفِيًا فِي الظَّلَامِ.

কস্তুরীতে স্বর্ণ পুঁথি এর অর্থ হল তুমি আমার সাথে দেখা করবে রাত বেলায় চুপি সারে।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন কাযী ফাযিলের উপাধি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, মুজির। অন্য কয়জন আবার বলেছেন মুহিউদ্দীন। আম্মারাহ আলয়ুমনা বলেছেন যে, এক রূপবান পুরুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মালিক আদিল মতান্তরে মালিক সালিহ তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে অভিনন্দন সহকারে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। রূপ-সৌন্দর্যে কাযী ফাযিল

ছিলেন হাতে গোনা কয়েকজন সৌন্দর্য প্রিয়দের একজন। ইব্‌ন খাল্লিকারা তাঁর গ্রন্থে কাযী ফযলের জীবন বৃত্তান্ত এনেছেন। সেখানে আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৫৯৭ হিজরী সন (১২০১ খ্রি.)

এই হিজরী সনে মিশরীয় অঞ্চলে চরম দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ধনী-গরীব নির্বিশেষে বহু লোক মারা যায় এই দূর্ভিক্ষে। এরপর আসে গণহারে ধ্বংসলীলা। শায়খ আবূ শামার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : সুলতান আদিল তখন এক মাসে নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দুই লক্ষ বিশ হাজার মৃত মানুষের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়ে ক্ষুধার তাড়নায় মিশরের মানুষ কুকুর খেয়েছে এবং মৃত প্রাণি খেয়েছে। এমন কি বহু শিশু কিশোরকে অন্যরা খেয়ে ফেলেছে। পিতামাতা তাদের বাচ্চাকে ভাজা করে খেয়েছে। এরকম ঘটনা একটা দু'টা নয় বহু ঘটেছে। এ দুঃখজনক ঘটনায় কেউ কাউকে দোষারূপ করেনি। শিশু কিশোরদেরকে খেয়ে শেষ করার পর সবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে খেতে শুরু করেছিল। শক্তিমান লোক দুর্বল লোককে ধরে নিয়ে জবাই করে খেয়েছে। কেউ কেউ ভিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে ভিক্ষুককে ডেকে নিয়ে জবাই করে খেয়েছে। কেউ কেউ নিজের স্ত্রীকে জবাই করে খেয়েছে এ জঘন্য কর্ম ঘটতে ঘটতে সহনীয় পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। কেউ কাউকে এজন্যে মন্দ বলেনি। বরং এটাকে ওযর ও অপারগতা রূপে দেখেছে। জনৈক ব্যক্তির নিকট চারশত মাথা পাওয়া গিয়েছিল। এ সময়ে প্রতারণার শিকার হয়ে বহু ডাক্তার ও চিকিৎসক যারা নিহত হয়েছে। তাদেরকে রোগী দেখার জন্যে ডেকে এনে জবাই করে খাওয়া হয়েছে। একদিন এক ধনী লোক এক বুদ্ধিমান ডাক্তারকে রোগী দেখার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে ডাক্তার তাঁর সাথে যাত্রা করে। পথে দেখা গেল যে, ধনী লোকটি পথে পথে যার সাথে দেখা হয়েছে তাকেই সাদকা দিয়েছে এবং পথে আল্লাহ্‌র নামে তাসবীহ তাহলীল পাঠ করেছে। এতে ডাক্তারের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও অর্থ লাভের আশায় সে লোকটির সাথে গমন করে এং তার বাড়িতে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে ডাক্তার দেখতে পায় যে, ঘরটি একেবারেই অনাবাদী, পতিত ও জন মানুষের চিহ্নহীন। তাতে ডাক্তারের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। ইতিমধ্যে ধনী লোকটি তার সাথীকে বলে যে, এই হাঁসের সাথে আমাদের জন্যে একটি শিকারও ধরে এনেছি। একথা শোনেই ডাক্তার দৌড়ে পালাতে থাকে। ওরা দু'জন তাকে ধরার জন্যে দৌড়াচ্ছিল। অনেক চেষ্টা তদবীর ও পরিশ্রম করার পর ডাক্তার প্রাণে বেঁচে আসে।

এই হিজরি সনে হিজাজ ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী অঞ্চল আনাযাই-তে এই বৎসর মারাত্মকভাবে মহামারী-রোগের প্রাদুর্ভার ঘটে। এখানে সেটি ২০টি জনপদের অবস্থান ছিল। তার মধ্যে ১৮টি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানে তখন কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট ছিল না এমনকি আগুনে ফুঁ দেবার মত লোকও ছিল না। তাদের ধনরত্ন এবং পশু প্রাণী যেমন ছিল তেমন রয়েছে। রাখাল বিহীন পশুপাল দিব্যি দিন কাটাচ্ছিল। এই গ্রামে প্রবেশ করা, এবং সেখানে বসবাস করার সাধ্য ছিল না। কারো ওই অঞ্চলের কোন বস্তুর নিকটে যদি কেউ আসত তখনই সে মারা যেত। মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিও তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। ওই জনপদের অবশিষ্ট দু'টো গ্রামে এর কোনো ছোঁয়া

লাগেনি। ওদের মধ্যে কারোরই মৃত্যু হয়নি। এই আট গ্রামে যে এত বড় বড় ঘটনা ঘটেছে পাশের দু গ্রামের লোক কিছুই টেরই পায়নি। তারা দিব্যি নিয়ম মাফিক জীবন যাপন করেছে। সুবহানাল্লাহ্!

এই হিজরী সনে ইয়ামানে এক অবাক কাণ্ড ঘটে যায়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামযা আলাভী নামের এক লোক ইয়ামানের কয়েকটি শহরের উপর তার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। দোর্দান্ত প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রায় ১২ হাজার অশ্ববাহিনী এবং প্রচুর সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের এক বিরাট বহর গড়ে তোলে। ইয়ামানের গভর্নর ইসমাঈল ইব্ন তুগতুগীন ইব্ন আইয়ুব তার ভয়ে ভীত হয়ে ওঠেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, এই লোকের হাতে তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে। তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, ওই লোক তাঁকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কারণ একদিকে ওর মুকাবিলা করার মত শক্তি তাঁর নেই অন্যদিকে বুদ্ধি পরামর্শে তাঁর স্ত্রীর সাথে তাঁর মতের মিল হয় না। ঘটনাক্রমে মহান আল্লাহ্ বজ্রপাত নাযিল করেন। এটি এসে পতিত হয় ওই বিদ্রোহী ব্যক্তি ও তার অনুসারীদের উপর। তাতে সামান্য সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছাড়া সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও নিজেদের মধ্যে মতভেদে লিপ্ত হয়। এই সুযোগে সুলতান মুইয্য তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের ছয় হাজার লোককে হত্যা করে। তারা অবদমিত হয়। তাঁর রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই হিজরী সনে দুই ভাই আফযাল ও যাহির একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আফযাল তখন সারখাদের শাসনকর্তা আর যাহির হালবের শাসনকর্তা, তারা চুক্তিবদ্ধ হয় যে, উভয়ে একযোগে দামেস্ক অবরোধ করে সুলতান আদিলের পুত্র মুআয্যাম থেকে তা ছিনিয়ে নিবে। অতঃপর এটি আফযালের শাসনাধীন থাকবে। এরপর তারা একযোগে মিশর অবরোধ করে তাঁদের চাচা আদিল ও তাঁর পুত্র কামিল থেকে সেটি ছিনিয়ে নিবে। কারণ তারা পিতা পুত্র দু'জনে চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং আল মনসূরের নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দিয়েছে। মিশর অধিকার পর মিশর থাকবে আফযালের অধীনে এবং দামেস্ক থাকবে হালবের সাথে যুক্ত হয়ে যাহিরের অধীনে। সুলতান আদিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত হবার পুত্র স্বীয় পুত্র মুআয্যাম ঈসার সাহায্যার্থে দামেস্কের একটি সেনাবহর পাঠন। যাহির ও তার ভাই আফযাল দামেস্কে পৌছার পূর্বে আদিলের প্রেরিত সৈন্যগণ সেখানে পৌছে যায়। তাঁরা দু'জনে সেখানে পৌছেছিলেন জিলক্বাদ মাসে, তারা গিয়েছিলেন বা'আলা বাক্কা এর দিক থেকে। তাঁরা আল কাদাম মসজিদে তাঁবু স্থাপন করলেন, শহরের চারদিকে কঠোর অবরোধ গড়ে তুললেন, খান আল কাদামের দিক থেকে বহু সৈন্য হয়ে চীৎকার করে সম্মুখে অগ্রসর হয়। নগর জয় করা তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। রাত এসে না পড়লে তখনই বিজয় হাতে এসে যেত। ইতিমধ্যে যাহিরের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হল যে, দামেস্ক প্রথমে আফযালের অধীনে থাকবে কেন? তার নিজের অধীনে থাকবে। অতঃপর মিশর বিজিত হলে সেটি আফযালকে দেয়া যাবে। এই প্রস্তাব নিয়ে সে আফযালের নিকট লোক পাঠায়। আফযাল সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের দু'জনের মধ্যে পরস্পর মতভেদ শুরু হয়। দামেস্কের ক্ষমতা প্রশ্নে উভয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সেনাপতিগণ তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। সুলতান আদিলকে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেয়া হয়। তাদের দাবী মত তিনি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাদের দু'জনকে আরো অধিক অঞ্চল প্রদানে

সম্মত হন। দামেস্ক অবরোধে ভঙ্গ দিয়ে সৈন্য বাহিনী চলে যায়। এটি ঘটে ৫৯৮ হিজরী সনে। আফযাল ও যাহির নতুন ভাবে পাওয়া এলাকাগুলোর দখল বুঝে নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যায়। এই সময়ে আরো বহু দুর্যোগ ঘটে যার বর্ণনা সুদীর্ঘ। ইতিমধ্যে যাহির ও তাঁর ভাই দু'জনে মুসেলের শাসনকর্তা নুরুদ্দীন আরসালান আতাবেগীকে আহবান জানান তাঁদের চাচা আদিলের দখলাধীন জাযীরার শহরগুলো অবরোধ করার জন্যে। শাসনকর্তা নুরুদ্দীন নিজে সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং তাঁর চাচাত ভাই সিনজারের শাসনকর্তা কুতুবুদ্দীনকে ও এই অভিযানে অংশগ্রহণের আহবান জানান। তাঁদের সাথে যোগ দেন মার্ডিনের শাসনকর্তা, সুলতান আদিল দীর্ঘদিন যাবত এই মার্ডিন অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং জনজীবনে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি করছিলেন। সম্মিলিত বাহিনী হাররানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, সেখানকার শাসনকর্তা ছিল ফাইয ইব্‌ন আদিল, তারা কয়েকদিন ওই রাজ্য অবরোধ করে রাখে, ইতিমধ্যে আদিলের সাথে তাঁর দুভ্রাতুষ্পুত্রের চুক্তির কথা সেখানে পৌঁছে যায় এবং শাসক ফাইয ও স্বর্ণচুক্তির প্রস্তাব পেশি করে। অতঃপর তার একটি চুক্তি সম্পাদন করত অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। চারিদিকে পরিস্থিতি শান্তি হয়ে উঠে এবং দেশে দেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই হিজরী সনে সুলতান গিয়াছুদ্দীন ঘোরী এবং সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরী শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহের শাসনাধীন অঞ্চল ও রাজ্যসমূহে। তাঁর পরিত্যক্ত ধনসম্পদের তাঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও বহু ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে।

এই হিজরী সনে এক ব্যাপক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এটি সিরিয়ার শহরসমূহ থেকে শুরু করে জাযীরা, রোমান অঞ্চল এবং ইরাক পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এটি সবচেয়ে বড় আঘাত হানে সিরিয়াতে। সেখানে ঘর দরজা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। গ্রামের পর গ্রাম বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়। বসরার একটি জনপদ ভূগর্ভে দেবে যায়। সিরিয়া ও তার উপকুলবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। তারাবলুস, সূর, আক্কা এবং নাবলুসে ও ধনসম্পদ নষ্ট ও প্রাণহানি ঘটে। হাররাহ আল সামুরা ব্যতীত নাবলুসের কোন এলাকা অক্ষত ছিল না। দেয়াল চাপা পড়ে ওই অঞ্চলে মারা যায় প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ। দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্বদিকের অনেকগুলো মিনার ভেঙ্গে পড়ে। চৌদ্দটি ছোট ছোট মিনারও নষ্ট হয়। কাল্লাসা এবং মারিস্তান নূরীতে ভূমিকম্প শক্তিশালী আঘাত হানে। জনসাধারণ প্রাণ বয়ে লোকালয় ছেড়ে মাঠে ময়দানে পালিয়ে যায়, তারা আহাজারি করতে থাকে। প্রচণ্ড মজবুত থাকা সত্ত্বেও বা'আলা বাক্কা দূর্গের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে যায়। সামুদ্রিক জলোচ্ছাস উঠে। নৌযানগুলো ডাঙ্গায় এসে উঠে। এই ভূমিকম্পে অগণিত মানুষ মারা গেছে এই প্রসংগে "মিরআ তুযযামান' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন এই হিজরী সনে ভূমিকম্পে প্রায় এক কোটি এক লক্ষ লোক মারা যায়। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এই হিজরী সনে কী পরিমাণ লোক মারা গেছে তা কেউ গুণে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী : তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাম্মাদী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর জূযী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন নাদর ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর

রহমান ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। শায়খ হাফিয ওয়ায়েয জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ। ইব্‌নুল জূযী নামে তিনি সুপরিচিত। তিনি কুরায়শী, তায়মী, বাগদাদী ও হাম্বলী। তিনি একজন উঁচু মানের আলিম। বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি। এবং ওই সব শাস্ত্রে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলেন। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশত গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। নিজ হাতে প্রায় দুইশত সাময়িকী ও ম্যাগাজিন লিখেন। ওয়ায ও উপদেশ শাস্ত্রে তিনি অনন্য নযির স্থাপন করেন। ওয়ায ও নসীহত প্রদানে তাঁর উপস্থাপনা, বাক ভঙ্গি ও ভাষা বিন্যাস ছিল অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা, শ্রুতি মধুর ভাষা বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অল্প কথায় অধিক মর্ম প্রকাশ, সহজ বোধ্যতা ইত্যাদি ছিল তার ওয়ায-নসীহতের বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর পর্যাপ্ত দখল ছিল। তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, ফিক্‌হ, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক অংশ গ্রহণ ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রচুর। সেগুলোর অন্যতম হল তাফসীর-ই-“যাদ-আল-সাসীর। এটি ছাড়া তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর আরো একটি বড় গ্রন্থ রয়েছে তবে সেটি তেমন প্রসিদ্ধ নয়। জামিউল মাসানীদ নামে তাঁর একটি হাদীস সংকলন রয়েছে। মুসনাদ-ই-আহমদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং জামেয়ী তিরমিযী গ্রন্থসমূহের প্রধান প্রধান এবং অধিকাংশ হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। আরব জাতির ইতিহাস বিষয়ে তাঁর ২০ খণ্ডের একটি গ্রন্থ রয়েছে। সেটির নাম “আল মুনতাযাম”। আমাদের এই কিতাবে তাঁর ওই ইতিহাস গ্রন্থ থেকে বহু তথ্য, ঘটনা ও জীবনী আমরা উদ্ধৃত করেছি। তিনি অনবরত জগত ও বিশ্বের ইতিহাসগুলো লিপিবদ্ধ করতেন যার ফলে তিনি নিজেই ইতিহাসে পরিণত হন। কবির ভাষায় :

مَازِلْتَ تَدْأَبُ فِي التَّارِيْخِ مُجْتَهِدًا * حَتّٰى رَأَيْتُكَ فِي التَّارِيْخِ مَكْتُوْبًا۔

আপনি তো গবেষণা সূত্রে ইতিহাস শাস্ত্র চষে বেড়াচ্ছেন। এক পর্যায়ে আপনিই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ হলেন। তাঁর কতক মাকামাহ প্রবন্ধ ও খুতবা সংকলন রয়েছে। জাল হাদীস বা মিথ্যা হাদীস চিহ্নিত করে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৫১০ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পারিবারিক ভাবে তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন। নুহাস অঞ্চলে তাঁদের ব্যবসা ছিল। একটু বড় হবার পর তাঁর ফুফু তাঁকে হাফিয মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসিরের মসজিদে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি একান্ত মনোযোগিতার সাথে শায়খের সাহচর্যে থাকেন। পড়াশোনা করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইব্‌ন যাগুনীর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ওয়ায ও নসীহত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং ২০ বৎসর বা তার চেয়ে কম বয়সে রীতিমত ওয়ায নসীহত করতে শুরু করেন। আবূ মনসুর জাওয়ালিকী এর নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। শিশুকাল থেকে তিনি দীনদার পরহেযগার ও আত্ম সংযমী হয়ে জীবন-যাপন করেন। অপ্রয়োজনে কারো সাথে মিশতেন না। সন্দেহযুক্ত বস্তু খেতেন না। জুমু'আর নামায ছাড়া অন্য কোন সময় বাড়ির বাহিরে যেতেন না। বাচ্চাদের সাথে মিশে খেলাধুলায় মেতে উঠতেন না। বাদশাহ, মন্ত্রী, আমীর-উমারা ও আলিম, উলামা নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ তাঁর ওয়ায মাহফিলে উপস্থিত হতেন। তাঁর মাহফিলে কমপক্ষে দশ হাজার লোকের সমাগম হত। কখনো কখনো এক লক্ষের বেশি লোক উপস্থিত হত। তিনি প্রায় অবলীলায় গদ্যে-পদ্যে কথা বলেই যেতেন। মোটকথায়

ওয়ায নসীহত ও দাওয়াত তাবলীগে তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। আত্ম মর্যাদা ও সম্মান বোধের তীব্র অনুভূতি ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর গদ্য ও ছন্দময় বক্তব্যে তার প্রতিফলন ঘটত। তাঁর কতক কবিতা এই :

مَا زِلْتُ أُدْرِكُ مَا غَلَا بَلْ مَا عَلَا * وَأُكَابِدُ النَّهْجَ الْعَسِيْرَ الْأَطْوَلُ.

আমি অবিরাম অর্জন করতে থাকি অমূল্য সম্পদ বরং সর্বোচ্চ বিষয় সুদীর্ঘ ও সুকঠিন পথে যাত্রা করি।

تَجْرِى بِي الاٰمَالُ فِيْ حِلْبَاتِهٖ * جَرَى السَّعِيْدِ مُدَى مَا أَمَلَا.

সকল সৌন্দর্য ও সৌকর্য সহকারে আশা আকাংখা গুলো আমার মধ্যে কার্যকর রয়েছে যেমন ভাগ্যবান মানুষ তার প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়ে থাকে।

أَفْضَى بِي التَّوْفِيْقُ فِيْهِ إِلَى الَّذِىْ * أَعْيَا سِوَاىَ تَوَصُّلًا وَتَغَلْغُلًا.

এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র দেয়া সামর্থ আমাকে সেখানে পৌঁছিয়েছে এবং লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে তুলেছে যেখানে অন্যরা ব্যর্থ হয়েছে।

لَوْ كَانَ هٰذَا الْعِلْمِ شَخْصًا نَاطِقًا * وَسَأَلْتُهُ هَلْ زَارَ مِثْلِىْ لَاقَالَ.

এই জ্ঞান ও বুদ্ধি যদি বাক শক্তি সম্পন্ন মানুষ হত এবং আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, আমার মত কারো সাথে তার সাক্ষাত ঘটেছে কিনা তখন সে বলত "না, আমি তেমনটি কাউকে দেখিনি। তাঁর অন্য একটি কবিতা : কেউ কেউ বলেছেন যে, এ কবিতা তাঁর নয় অন্য কারো :

إِذَا قَنَعْتَ بِمَيْسُوْرٍ مِنَ الْقُوْتِ * بَقِيْتَ فِي النَّاسِ حُرًّا غَيْرَ مَمْقُوْتٍ.

তুমি যদি সহজ্যে প্রাপ্ত খাদ্যে তৃপ্ত ও তুষ্ট থাকতে পার তবে তুমি মানব সমাজে স্বাধীনভাবে এবং অন্যের শত্রু না হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

يَا قُوْتُ يَوْمِيْ إِذَا مَا دُرُّ حَلْقُكَ لِيْ * فَلَسْتُ اٰسِىْ عَلٰى دُرٍّ وَيَاقُوْتٍ.

ওহে আমার একদিনের খাদ্য, তুমি যদি আমার গলার মালা হও তবে মনি মুক্তো ও ইয়াকুত পাথর পাবার জন্যে আমি লালায়িত হব না, সেগুলো না পেলে আমি আক্ষেপ করব না।

গদ্যে-পদ্যে তাঁর প্রচুর লেখনী রয়েছে। "লাকতুল জুমানে ফী কানা ও কানা" নামে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস :

أَعْمَارُ أُمَّتِىْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ.

আমার উম্মতের আয়ূ ষাট থেকে সত্তর বছরের মাঝে" সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের আয়ূ দীর্ঘ হয়েছিল, কারণ তখন বন জঙ্গল, মাঠ-প্রান্তর বিস্তৃত ও লক্ষ্যস্থল দূরে ছিল। আরোহী যখন বাসস্থান নগরীর নিকটবর্তী হয়ে এসেছে তখন বলা হয়েছে, বাহন দ্রুত বেগে পরিচালিত করা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিল বসে বসে তাসবীহ পাঠ করা এবং বসে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন কাপড় যতবেশি ময়লা থাকে ততবেশি গরম পানিতে তাপ দিতে হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় যে ব্যক্তি অসিয়ত করে তার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন এটি মূলতঃ কাদা মাটি যেটিকে জ্বলন্ত আগুনের উপর ছাদরূপে

ব্যবহার করা হয়েছে। একদা ওয়ায করার সময় যেদিকে খলীফা মুসতাদী বসেছিলেন সেদিকে তাকালেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সত্য কথা বললে আপনি আমার প্রতি ক্ষেপে যাবেন সেই ভয় করছি আবার যদি আমি তা না বলি তাহলে আপনি নিজের ক্ষতির সম্মুখীন হবেন সেই আশংকা করছি। কেউ আপনাকে "আল্লাহ্কে ভয় করুন বলাটা" আপনারা বিশিষ্ট পরিবার ক্ষমাপ্রাপ্ত বলা অপেক্ষা আপনার জন্যে অধিক কল্যাণকর। হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলতেন আমার কোন কর্মচারী জুলুম ও অন্যায় করেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমি যদি তাকে অপসারণ না করি তাহলে আমি নিজেই অন্যায়কারী ও জালিম বলে গণ্য হব। হে আমীরুল মু'মিনীন, হযরত ইউসুফ (আ) দুর্ভিক্ষের সময় নিজে পেট ভরে খাবার খেতেন না এই ভয়ে যে, তাহলে তিনি ক্ষুধার্তের কথা ভুলে যাবেন। ১৮ হিজরীর দুর্ভিক্ষের বছরে হযরত উমার (রা) পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন এবং বলতেন পেটে ক্ষুধার শব্দ হবে, তৃপ্তির ঢেকুর উঠবে না। আল্লাহ্র কসম যতদিন না মানুষের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ততদিন হযরত উমার (রা) ঘি-গোশত আহার করেননি। বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে খলীফা মুসতাদী ডুকরে, কেঁদে উঠলেন এবং প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ্র পথে সাদকা করে দিলেন। এ সময়ে তিনি বহু বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দিলেন এবং বহু ফকীর মিসকীনকে জামা-কাপড় দান করলেন। ৫১০ হিজরীর প্রাক্কালে আল্লামা ইব্‌নুল জূযী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই হিজরী সনের ১২ রামাদান বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মাগরিব ও ইশার সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর ওফাত হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। মানুষ মাথায় উঠিয়ে তাঁর লাশের খাট বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। বহুলোক তাঁর জানাযায় শরীক হয়েছিল। ইমাম আহমদ (র) এর পাশে আপন পিতার নিকটে আল হারব ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়, সেদিন ছিল জনসমাগমে একটি স্মরণীয় দিন। কথিত আছে যে, মানুষের ভিড়ে ও চাপে, গরমে ও তাপে অসহ্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেদিন বহুলোক রোযা ভেঙ্গে ফেলেছিল, তাঁর সমাধিতে এই কবিতা লিখে রাখার জন্যে তিনি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন :

يَا كَثِيْرَ الْعَفْوِ يَا مَنْ * كَثُرَتْ ذَنْبِيْ لَدَيْهِ۔

ওহে অধিক হারে ক্ষমা মঞ্জুর কারী সত্বা! ওহে মহান প্রভু যাঁর নিকট আমার পাপ ও অপরাধ প্রচুর।

جَاءَكَ الْمُذْنِبُ يَرْجُوْ * الصَّفْحَ عَنْ جُرْمِ يَدَيْهِ۔

অপরাধী আপনার দরবারে এসেছে, কৃতকর্ম ও অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রত্যাশী হয়ে,

أَنَا ضَيْفٌ وَجَزَاءُ * الضَّيْفِ إِحْسَانٌ إِلَيْهِ۔

ওহে প্রভু! আমি এখন আপনার মেহমান। মেহমানের প্রাপ্য হল তার প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করা। তাঁর তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। (১) আবদুল আযীয। ইনি ছিলেন সবার বড়। পিতার জীবদ্দশায় ৫৪ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। (২) এরপর আবুল কাসেম আলী। সে ছিলেন পিতার অবাধ্য। সুখে দুঃখে সব সময় পিতার উপর চাপ সৃষ্টি করত। অর্থকড়ি প্রদানের জন্যে চাপাচাপি করত। পিতা আবদুর রহমান ওয়াসিতে থাকা অবস্থায় এই পুত্র তাঁর কিতাবগুলো হাতিয়ে নিয়ে নিতান্ত স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল। (৩) এরপর হল মুহিউদ্দীন ইউসুফ। তিনি বয়সে ভাইদের মধ্যে ছোট কিন্তু কাজ-কর্ম ও চাল-চরিত্রে সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন। ৫৮০

হিজরী সনে তার জন্ম হয়। পিতার ইনতিকালের পর তিনি ওয়ায ও উপদেশ দানকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি বহুমুখী কর্মে জড়িত হন। গ্রন্থ ও পুস্তকাদি রচনা করেন। সমসাময়িক সকলের উপর নেতৃত্ব প্রদান করেন। এরপর বাগদাদের হিসাব রক্ষাকের পদে নিযুক্ত হন। এরপর বিভিন্ন রাজা বাদশাহের প্রতি রাষ্ট্র দূতের দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষত সিরিয়া অঞ্চলে আইয়ূবী বংশের লোকদের প্রতি খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ওদের পক্ষ থেকে তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ ও উপহার সামগ্রী প্রাপ্ত হন। এগুলো দ্বারা তিনি দামেস্কের নাশ্‌শাবীন অঞ্চলে জূযিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদরাসার জন্যে সহায়-সম্পদ ওয়াকফ করেন, অন্যান্য রাজা বাদশাহের পক্ষ থেকেও তিনি ব্যাপক ধন ঐশ্বর্য লাভ করেন। ৬৪০ হিজরী সনে খলীফা আল মুসতা'সিম বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

চেঙ্গিস খানের পুত্র হারূন তুর্কীর শাসনামলে খলীফার সাথে নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর একাধিক কন্যা সন্তান ছিল। ওদের মধ্যে ৪র্থ জন হল 'মিরআতুয যামান' গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর দৌহিত্র আবুল মুযাফফর ইব্‌ন কাযগালীর মাতা। 'মিরআতুয যামান' গ্রন্থটি একটি সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর ইতিহাস গ্রন্থ। ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁর আল ওয়াফিয়াত গ্রন্থে ইব্‌নুল জূযী (র)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর ও জ্ঞান ভাণ্ডার ও সাহিত্য কীর্তির সুনাম করেছেন।

সুসাহিত্যিক ইমাদ ইস্পাহানী : ৫৯৭ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ। তিনি সাহিত্যিকে ইমাদ ইস্পাহানী নামে সুপরিচিত। বহু গ্রন্থ ও পুস্তক রচনা করেছেন তিনি। কাযী ফাযিলের সম-সাময়িক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর যুগে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। বস্তুত কাযী ফাযিলের যুগে যিনি প্রসিদ্ধ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন নিশ্চয় তিনি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

ইমাদ ইস্পাহানী ৫১৯ হিজরী সনে ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষক শায়খ আবূ মনসূর সাঈদ ইব্‌ন রায্‌যায এর তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হন। সেখানে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর সিরিয়া গমন করেন। সেখানে সুলতানের সচিব পদে কাজ করেন। সুলতান তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত ফারজ ফটকের অভ্যন্তরে স্থাপতি ইমদাদিয়া মাদ্‌রাসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন তাঁকে। মূলত সাহিত্যিক ইমাদ সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে শিক্ষাদান করেছিলেন বলে মাদরাসাটি তাঁর নামে পরিচিত হয়েছিল। তিনি ওই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা তা কিন্তু নয়। সেটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুলতান নুরুদ্দীন মাহমূদ। ইমাদ ইস্পাহানী কিন্তু ওই মাদরাসার সর্বপ্রথম শিক্ষাও নন। তার পূর্বের একাধিক ব্যক্তি সেখানে শিক্ষকতা করেছেন। সুলতান নুরুদ্দীনের জীবনীতে তা আলোচিত হয়েছে। এরপর ইমাদ ইস্পাহানী আইয়ূবী রাজত্বের রাজ-সাহিত্যিক মনোনীত হন। কাযী ফাযিল তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কাযী ফাযিল একদিন তাঁর সাথীদেরকে বললেন আপনারা সাহিত্যিক ইমাদ ইস্পাহানীর উপমা খুঁজে বের করুন। তাঁরা এ প্রসংগে বহু দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করলেন। সেগুলোর কোনটিই কাযী সাহেব গ্রহণ করেননি। তিনি নিজে উপমা দিয়ে বললেন সাহিত্যিক

ইস্পাহানী হলেন বারুদের ন্যায়, বাহিরে ঠাণ্ডা ভিতরে আগুন। তাঁর বহু প্রবন্ধ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জারীদাতুন নাস্‌র ফী শুআরাইল আসর, আলফাতহুল কুদসী, আল বারকুশ শামী এবং অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ। এই হিজরী সনের রামাদান মাসের প্রথমদিকে তাঁর ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সূফীগণের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আমীর বাহাউদ্দীন কারাকূশ : এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন হলেন আমীর বাহাউদ্দীন কারাকূশ, তিনি একজন সুঠামদেহী সুদর্শন চিরকুমার ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। সালাহী তথা আইয়ূবী রাজত্বের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি নিজে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আদিল এর মৃত্যুর পর তিনি রাজ প্রাসাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মিশরের চারিদিকে নিরাপত্তা প্রাচীর সংস্কার করেন। তিনি এটিকে আল মাকসাম পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন। মাকসাম অর্থ বণ্টন স্থল। সাহাবা-ই-কিরাম (রা) মিশরীয় অঞ্চলের গণীমতের মালামাল এখানে বণ্টন করেছিলেন। তিনি জাবাল দূর্গ নির্মাণ করেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁর নিকট আকা অঞ্চল হস্তান্তর করেছিলেন তার মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরীর জন্যে। তিনি সেখানে থাকা অবস্থায় অবরোধ সৃষ্টি হল। বিনিময় প্রদান করে যারা বের হলেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর ইব্‌ন মাশতূব সেখানে প্রবেশ করেন। কথিত আছে যে, তিনি বন্দী হয়েছিলেন এবং দশ হাজার দীনারের বিনিময়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি সুলতান সালাহউদ্দীনের নিকট ফিরে আসেন। তাতে সুলতান ভীষণ খুশী হন। এই হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হবার পর সম্রাট আদিল তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেন এবং তাঁর সহায় সম্পদ ও জায়গা জমি আদিল পুত্র সম্রাট মুহাম্মদের মালিকানায় দিয়ে দেন। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, তিনি কতক অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁর এ সকল বিধি-বিধান সংকলিত করে "আল কামূস ফী আহকামি কারাকূস" নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওই গ্রন্থে বহু কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি সেগুলো তাঁর নামে মিথ্যাচার' করেন সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন এবং তাঁকে বিশ্বাস করতেন। তিনি তেমনটি হলে সুলতান কী করে তাঁর প্রতি আস্থা রাখতেন? আল্লাহ ভাল জানেন।

মাকলাবাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুসতানজিদী : তিনি এই হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত নির্মোহ, দুনিয়া বিরাগী পরহেযগার ও ইবাদতকারী ব্যক্তি। একদা তিনি শুনতে পেলেন যে, সাহরীর সময় মুআয্‌যিন মসজিদের মিনারে উঠে আবৃত্তি করছে :

يَا رِجَالَ اللَّيْلِ جِدُّوْا * رَبَّ صَوْتٍ لَا يَرُدُّ۔

ওহে রাত্রি জাগরণকারী মানুষ প্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন পেশ কর। এই শব্দের মালিক মহান আল্লাহ্ খালিহাতে ফেরত দেন না।

مَا يَقُوْمُ اللَّيْلِ اِلَّا * مَنْ لَهُ عَزْمٌ وَجَدٌّ۔

রাত জেগে ইবাদত করে শুধু তারা যাদের রয়েছে সুদৃঢ় মনোভাব ও অবিচল বিশ্বাস, এই কবিতা শুনে মাকলাবাহ্ কেঁদে উঠলেন এবং মুআযযিনকে ডেকে আরো কতক কবিতা আবৃত্তির অনুরোধ করলেন। তখন মুআযযিন আবৃত্তি করল?

قَدْ مَضَى اللَّيْلُ وَوَلَّى * وَحَبِيْبِىْ قَدْ تَخَلَّا۔

রাত এখন শেষ হয়ে গিয়েছে আর আমার বন্ধু নির্জনতা ও একাকীত্ব গ্রহণ করেছেন। একথা শুনে মাকলাবাহ প্রচণ্ড শব্দে আর্ত চীৎকার দিয়ে উঠেন। এতে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ভোরে হাজার হাজার নগরবাসী তাঁকে দেখতে আসে। ভীষণ ভিড় সৃষ্টি হয় তাঁর লাশের পাশে, সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি তাঁকে এক নজর দেখা। যারা দেখেছে তারা ভাগ্যবান হয়েছে।

আবূ মনসূর ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন শুজা : এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারীদের একজন হলেন আবূ মনসূর ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন শুজা' প্রাকলুসী ওরফে ইব্‌ন নুকতাহ। তাঁর ইনতিকাল হয় বাগদাদে। তিনি দিনের বেলায় বাগদাদের হাটে বাজারে ঘোরাঘুরি করতেন এবং উপদেশমূলক কবিতা আবৃত্তি করতেন। আর রামাদান মাসের রাতের বেলায় সাহরীর জন্যে মানুষকে ডেকে তুলতেন। তিনি একজন ভদ্র আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভাই শায়খ আবদুল গণী যাহিদ ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ভাল মানুষ। বাগদাদে তাঁর একটি খানকাহ ছিল। লোকজন সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করত। তাঁর বহু মুরীদ ও ভক্ত অনুসারী ছিল। তাঁর উপার্জিত অর্থকড়ির কিছুই তিনি সঞ্চয় করে রাখতেন না। এক রাতে তিনি এক হাজার দীনার সাদাকাহ্ করে দেন। অথচ সেদিন তাঁর সাথীগণ রোযা রেখেছিল, ওদের নৈশকালীন খাবারের জন্যে তিনি কিছুই জমা করে রাখেননি। খলীফার মাতা তাঁর এক পরমা সুন্দরী ভাতিজীকে শায়খ আবদুল গণীর নিকট বিয়ে দেন। নববধু সাথে উপহার হিসেবে দেন দশ হাজার দীনার, এক বছর যেতে না যেতে এর সবগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল, একটি লোহার বড় বাটি শুধু অবশিষ্ট ছিল। একদিন এক ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চাচ্ছিল। তিনি লোহার বাটিটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা নিয়ে যাও এবং এটি বিক্রি করে ত্রিশ দিনের খাবারের ব্যবস্থা কর। এই ত্রিশ দিনে আর মানুষের নিকট হাত পাতবে না এবং আল্লাহ্‌র দুর্নাম করবেনা। বস্তুত শায়খ আবদুল গণী একজন ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি একদিন তাঁর ভাই আবূ মনসূরকে বললেন, ধুত্তুরী, তুই শুধু হাটে বাজারে ঘোরাঘুরি করিস আর কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছিস তোর ভাই এই যে আমি, আমি কেমন লোক চিনতে পারিস? আবূ মানসূর তখনই এই দু'টো চরণ আবৃত্তি করে জবাব দিলেন।

قَدْ خَابَ مَنْ شَبَّهَ الْجَزْعَةَ اِلَى دُرَّةٍ * وَقَاسَ قَحْبَتًّ اِلَى مُسْحَيْتِهِ حُرَّةٍ۔

যে ব্যক্তি আকীক পাথরকে মনি মুক্তার সাথে তুলনা করেছে আর বৃদ্ধার হাই তোলার শব্দকে স্বাধীন মহিলার উৎসাহ ব্যঞ্জক আহবানের সাথে তুলনা করেছে সে তো বিফল হইয়েছে।

اَنَا مُغْنِىْ وَاَخِىْ ذَاهِدٌ اِلَى مَرَّةٍ * فِى الدَّارِ بِيُرِىْ ذِىْ حَلْوَةٌ وَدْمِىْ مَرَّةٍ۔

আমি গান গাই আর আমার ভাই হল দুনিয়া বিরাগী, একদিন তাঁর সম্মুখে হযরত উছমান (রা)-এর হত্যা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। হযরত আলী (রা) সেখানে উপকৃত ছিলেন। তখন আবূ মনসূর বললেন, তিনি তো এমন যে, তাঁর সম্মুখে হযরত উছমান (রা) নিহত হলেন অথচ তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তাহলে সিরিয়াতে ইয়াযীদের ওযর এবং অক্ষমতা তাঁর গ্রহণ করা উচিত। এমন মন্তব্যের পর রাফিযী সম্প্রদায় আবূ মনসূরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে রামাদান মাসের একরাতে তিনি লোকজনকে সাহরী খাওয়ার আহবান জানাচ্ছিলেন।

এ সময়ে তিনি খলীফার বাসস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। খলীফা হাঁচি দিলেন। হাঁচির দু'আ শুনে তিনি তার উত্তর দিলেন। হাঁচির উত্তরে খুশী হয়ে খলীফা তাঁকে একশত দীনার উপহার দিলেন এবং রাফেযীদের হাত থেকে তাঁকে নিরাপত্তা দেয়ার শাহী ফরমান জারী করলেন। অবশেষে এই হিজরী সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

আবূ তাহির বারাকাত ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন তাহির : আল খাশুঈ তিনি এই হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। জ্ঞানে-গুণে কীর্তি ও অবদানের বহুক্ষেত্রে তিনি ইব্ন আসাকিরের সমকক্ষ ছিলেন। ইব্ন আসাকিরের ইনতিকালের পর তিনি আরো ২৭ বছর জীবিত ছিলেন। ফলে ইতিহাস ও বিবরণীতে তিনি প্রথম প্রজন্মের সাথে তৃতীয় প্রজন্মের তথ্যও সংযোজন করে গিয়েছেন।

৫৯৮ হিজরী (১২০২ খ্রি.)

সাফাহ অঞ্চলে কাইসূন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবূ উমার মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ এই হিজরী সনে সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। শায়খ আবূ দাঊদ মুহাসিন আল গামী নামের এক ব্যক্তি এজন্যে একটি বড় অংকের অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। ৪হাত পর্যন্ত দেয়াল তৈরীর পর তহবিল শেষ হয়ে যায়। অতঃপর আরিয়াল অঞ্চলের সুলতান মুজাফফর কুকরী ইব্ন যায়নুদ্দীন অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যে বড় অংকের অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। তাতে মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এরপর বুরদী অঞ্চল থেকে খাল খনন করে পানি সরবরাহের জন্য সুলতান অতিরিক্ত এক হাজার দীনার প্রদান করেন। কিন্তু দামেস্ক অধিপতি সুলতান মু'আয্যাম খাল খননে বাধা দেন। এই বলে তিনি ওযর পেশ করেন যে, এখানে বহু মুসলমানের কবর ও সমাধি রয়েছে। খাল খনন করতে গেলে এগুলো বিনষ্ট হবে এবং তাদের প্রতি অসম্মান করা হবে। অবশেষে পানির জন্যে একটি কুপ খনন করা হয় এবং গাধার সাহায্যে ঘোরানো যায় তেমন একটি চরকি স্থাপন করা হল। এর ব্যয় নির্বাহের জন্যে সুলতান বৃহৎ অংকের সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন।

এই হিজরী সনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে খাওয়ারিজম ও ঘুরী বংশের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ইব্নুল আছীর বিস্তারিতভাবে এবং ইব্ন কাছীর সংক্ষিপ্তভাবে এসব বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এই হিজরী সনে মাজদুদ্দীন ইয়াহ্য়া ইব্ন রাবী' নিযামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় উপহারে ভূষিত করা হয়। বড় বড় 'আলিম ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ তাঁর সমীপে উপস্থিত হতেন। এই হিজরী সনে আবুল হাসান আলী ইব্ন সুলায়মান জীলী বাগদাদের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনিও রাজকীয় উপহারে ভূষিত হন।

৫৯৮ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয়

কাযী ইব্ন যাকী : তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্ন আলীা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল আযীয আবুল মাআলী কারাশী তাঁর উপাধি হল মুহিউদ্দীন। তিনি দামেস্কের বিচারক ছিলেন। তাঁর পিতা এবং পিতাসহ দু'জনেই বিচারক ছিলেন। তাঁর প্রপিতাসহ ইয়াহ্য়া ইব্ন আলী তাদের বংশের সর্বপ্রথম দামেস্কের বিচারিক কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি আবুল কাসিম ইব্ন

আসাকিরের নানা ছিলেন। ইব্ন আসাকির ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছে। তবে কারাশী এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি।

শায়খ আবূ শামাহ বলেন, তিনি যদি উমাইয়া বংশের উছমানী গোত্রের লোক হতেন তাহলে ইব্ন আসাকির নিশ্চয়ই তা উল্লেখ করতেন। কারণ তাতে তাঁর নানা এবং মামা মুহাম্মদ ও সুলতানের সম্মান বৃদ্ধি পেত। আর সেটা বিশুদ্ধ তথ্য হলে ইব্ন আসাকিরের নিকট তা গোপন থাকত না, কাযী ইব্ন যাকী তাঁর সিনিয়র বিচারক শরফুদ্দীন আবূ সা'দ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইসরূনের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর সহকারীরূপে বিচারক পদে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের সহকারী নিয়োগ করেননি এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি সমসাময়িককালে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজিত হবার পর যিনি সেখানে খুতবা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি দামেস্কের বিচারক নিযুক্ত হন। একই সাথে হালব প্রদেশের বিচারকার্যের দায়িত্ব ও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াকফ স্টেট তদারকির দায়িত্ব ও তাঁকে দেয়া হয়। অবশ্য তাঁর ইনতিকালের কয়েক মাস পূর্বে তাঁকে ওই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর জামানত গ্রহণ নিয়মে শামসুদ্দীন ইব্ন লায়ছীকে ওই পদে নিযুক্ত করা হয়। ইব্ন যাকী ছাত্রদেরকে যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্রে বেশী মনোযোগ দিতে নিষেধ করতেন। মাদরাসাই নূরিয়াতে তাঁর নিকট থাকা উক্ত শাস্ত্রের গ্রন্থগুলো তিনি ছিঁড়ে ফেলে দেন। ইমাম গায্যালীর (র) রচিত বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশ্বাস বিষয়ক গ্রন্থ "আল মিসবাহ" তিনি নিজে পাঠ করতেন এবং তাঁর ছেলে-মেয়েদেরকে পাঠ করাতেন। সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সমাধির বিপরীতে আল কাল্লাসায় তিনি তাফসীরের দরস দিতেন। এক সময় তাঁর সাথে ইসমাইলিয়াহ সম্প্রদায়ের বিরোধ দেখা দেয়, ওরা তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে তিনি নামায আদায়ের লক্ষে মসজিদে যাবার জন্যে ঘরের ভেতর থেকে মসজিদ পর্যন্ত একটি দরজা করে নেন এবং সে পথে মসজিদে যাতায়াত করতেন। এক পর্যায়ে তাঁর স্মৃতি বিভ্রাট ঘটে। মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে চাইতেন। অবশেষে এই হিজরী সনের শা'বান মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। সাফাহ অঞ্চলের কাসিয়ূন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, হাফিয আবদুল গণী তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তাতে তিনি এভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। খতীব দাওলাঈ ও এই হিজরী সনে মারা যান। তাঁরা দুজন শায়খ হাফিয আবদুল গণীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং তাঁরা দুজনই এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাতে অন্যদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে খতীব দাওলাঈ এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন যিয়াউদ্দীন আবুল কাসিম আবদুল মালিক ইব্ন যায়দ ইব্ন ইয়ামীন তাগলিব দাওলাঈ 'দাওলা' হল মুসেলের একটি জনপদ। ৫১৮ হিজরী সনে তিনি সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে শাফিঈ মাযহাব সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা করেন। আবুল ফাত্হ কারূখীর নিকট সুনান তিরমিযী এবং আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমদ বুরদীর নিকট সুনান নাসাঈ গ্রন্থ পাঠ করেন। এরপর তিনি দামেস্কে আগমন করেন। এখানে খতীব পদে এবং গায্যালিয়াহ দর্শনে অধ্যাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। খতীব দাওলাঈ একজন দুনিয়া বিরাগী, সংযমী, আদর্শবান এবং সত্যের প্রশ্নে আপোষহীন ব্যক্তি ছিলেন। এই হিজরী সরেন ১৯ রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার তিনি ইনতিকাল করেন এবং ক্ষুদ্র ফযলের কবরস্তানে শহীদগণের কবরের পাশে তাঁকে

দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন আবুল ফযল ইব্ন যায়দ ৩৭ বছর খতীবের পদে দায়িত্ব পালন করেন, কউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর পুত্র জামালুদ্দীন মুহাম্মদ এই দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইব্ন যাকী তাঁর পুত্র যাকীকে এই পদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি একটি নামাযে ইমামতি করছিলেন। ইতিমধ্যে জামালুদ্দীনকে ওই পদে নিযুক্ত করার জন্যে আমীর ইলমুদ্দীনের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়। আমীর তাঁকে ওই পদে নিয়োগ করেন। আমৃত্যু তিনি ওই পদে কাজ করে গিয়েছেন এবং ৬৩৫ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ আলী ইব্ন আলী ইব্ন আলীশ আল ইয়ামানী : তিনি এই হিজরী সনে ইনতিকাল করেন, তিনি একজন দুনিয়াত্যাগী ও ইবাদতকারী মানুষ ছিলেন। কাল্লাসাহ অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তে তিনি বসবাস করতেন। তিনি অনেক কারামত ও ব্যতিক্রমী অবস্থার অধিকারী ছিলেন। শায়খ আলামুদ্দীন সাখাভী তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে এসব কারামত ও অলৌকিক ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন। সাখাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে আবূ শামা সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

আবূ ছানা হাম্মাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ : তিনি হলেন হাম্মাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন হাম্মাদ হয়রানী, পেশায় তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। নুরুদ্দীন শহীদের জন্ম বৎসর ৫১১ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। বাগদাদ, মিশর ও অন্যান্য শহরে তিনি হাদীস শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। চলতি হিজরী সনের যুলহাজ্জ মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর কতিপয় কবিতার চরণ :

تَنَقُّلُ الْمَرْءِ فِي الْاٰفَاقِ يُكْسِبُهُ * محاسِنًا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا ببلدَتِهِ۔

মানুষের দেশ বিদেশে বিচরণ তার জন্যে বহু কল্যাণ এনে দেয়। যা তার দেশে থাকলে হয় না।

اَمَا تَرَىٰ الْبَيْدَقَ الشَّطْرَنْجَ اَكْسَبَهُ * حُسْنَ التَّنَقُّلِ حُسْنًا فَوْقَ زِيْنته۔

আপনি কি দেখছেন না দাবা খেলায় রাজার দক্ষ চাল খেলোয়াড়ের জন্যে সুন্দর ফলাফল বয়ে আনে।

সিত্তুল জালীলাহ্ ইয়ানফাছা বিনত আবদুল্লাহ্ : তিনি খলীফা মুসতাদী-এর মুক্তকৃত দাসী। তিনি খলীফার বিশেষ সুবিধাভোগী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন বড় দানশীল মহিলায় পরিণত হন। দান-সাদকা, সেবা-ধর্মী কর্ম তৎপরতা এবং আলিম-ফাযিল ও ফকীর দরবেশের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠেন। বাগদাদে মারূফ কারখী (র)-এর সমাধির পাশে তাঁর সমাধি রয়েছে এবং তাঁর সমাধির নিকট তাঁর অনেক দান-সাদকার স্মারক রয়েছে।

কবি আবূ বকর ইব্ন মুহতাসিব : তিনি হলেন মাহমূদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন সাঈদ মুসেলী, ইব্ন মুহতাসিব নামে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। বাগদাদে তিনি ফিকহ্শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি অন্যান্য শহর-নগরে গমন করেন পড়াশোনা ও জ্ঞান আহরণের জন্যে। তিনি ইব্ন শহর যুরীর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর সাথে পুনরায় বাগদাদ আগমন করেন। তিনি যখন বাগদাদের কাযী ও বিচারক নিযুক্ত হন তখন নিযামিয়াহ মাদরাসার ওয়াকফ ষ্টেটের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। প্রচুর কবিতা রচনা করতেন। মদ ও শুরা সম্পর্কে তাঁর কতক কবিতা রয়েছে যেগুলো অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। সে কারণে আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

৫৯৯ হিজরী সন (১২০৩ খ্রি.)

সাবৃত ইব্‌নুল জাওযী তাঁর মিরআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনের মুহাররম মাসের শেষ দিকে আকাশে নক্ষত্ররাজির মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এগুলো পূর্ব-পশ্চিমে দৌড়াদৌড়ি ও ঢেউয়ের মত উথাল পাতাল করতে থাকে। ফড়িংয়ের মত ডানে বামে উড়াউড়ি করতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের বছর এবং ২৪১ হিজরী সন ব্যতীত অন্য কোনো সময় এমনটি দেয়া যায়নি। এই হিজরী সনে দামেস্ক দূর্গের প্রাচীর নির্মাণ শুরু হয়। আল নাসর ফটকের লাগোয়া পশ্চিম কোনস্থ মিনার থেকে তা শুরু করা হয়। এই হিজরী সনে খলীফা নাসির সুলতান আদিল ও তাঁর পুত্রদের জন্যে রাজকীয় উপহার ও জামা কাপড় প্রেরণ করেন, এই হিজরী সনে সুলতান আদিল তাঁর পুত্র মুসা আল আশরাফকে মার্দিন অবরোধের জন্যে পাঠান। মুসেল ও সানজের সেনা বহর তাঁর সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিল। এরপর যাহিরের মাধ্যমে উভয় পক্ষে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে শর্ত থাকে যে, মার্দিন-শাসক প্রতি বছর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দীনার সুলতান আদিলের বরাবরে পাঠাবে এবং মুদ্রা ও খুতবা সুলতান আদিলের নামে চলবে। সুলতান যখনই তলব করবেন মার্দিন-শাসক তখনই নিজ সৈন্য সামন্ত সহ সুলতানের সমীপে উপস্থিত হবে।

এই হিজরী সনে মুরানিয়াহ খানকা-এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়। শায়খ শিহাবুদ্দীন উমার ইব্‌ন মুহাম্মদ শাহারযুরী সহ একদল সূফী ব্যক্তিকে ওই খানকাহ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁদের জন্যে উপযুক্ত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। এই হিজরী সনে সুলতান আদিল তাঁর প্রতিপক্ষ মালিক আযীযের পুত্র মুহাম্মদ এবং তাঁর ভাইদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিশরে তারা যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল তার পুনরাবৃত্তির আশংকায় তাদেরকে "রাহা" অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। এই হিজরী সনে কুরজ গোত্র 'দুভায়ন' শহরের নিজেদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করে। সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা ও ধনসম্পদ লুট করে। দুভায়ন ছিল আযর বাইযানের একটি শহর। স্থানীয় শাসকের পাপাচারিতা ও মদ্যপানের সুযোগে ওরা এটি দখলের সুযোগ লাভ করে। ওই হতভাগ্য শাসকের দোষে মুসলমানদের উপর কাফিরদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিয়ামত দিবসে তার এই অপরাধ তার গলায় লানতের মালা হিসেবে উত্থিত হবে।

৫৯৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরী : তিনি হলেন সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরীর ভাই। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাহমূদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং পিতার উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। বহু যুদ্ধে অংশ নেয়ার পরও তাঁর পতাকা কখনো ভেঙ্গে পড়েনি। মাযহার ও মতবাদের দিক থেকে তিনি শাফিঈ মাযহাব অনুসরণ করতেন। শাফিঈ মাযহাবের প্রচার ও প্রসার কল্পে তিনি একটি বিশাল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চরিত্র ছিল স্বচ্ছ পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

আমীর আলামুদ্দীন আবূ মনসূর : ৫৯৯ হিজরীতে ওফাত গ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন আমীর আলামুদ্দীন আবূ মনসূর সুলায়মান ইব্‌ন শীরাওয়াহ ইব্‌ন জুনদুর। তিনি সুলতান আদিলের বৈমাত্রীয় ভাই। এই হিজরী সনের ১৯ মুহাররাম তিনি ইনতিকাল করেন।

ইফাতরাস মহল্লার ফিরদাউস ফটকের অভ্যন্তরে মাদরাসার পাশে তাঁর বাসভবনে তাঁকে দাফন করা হয়। ওই গোসলখানা পুরোটা তিনি মাদরাসার জন্যে ওয়াকফ করে দেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে তা কবুল করুন।

কাযী জিয়া শাহারযুরী : তিনি হলেন আবুল ফাযাইল কাসিম ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কাসিম শাহারযুরী মুসেলী। বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন তিনি। সুলতান নুরুদ্দীনের আমলের প্রধান বিচারপতি কামালুদ্দীন শাহারযুরী ছিলেন তাঁর চাচা। ৫৭৬ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর শাসনামলে বিচারপতি কামালুদ্দীন মারা যাবার সময় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জিয়াউদ্দীনকে ওই পদে নিয়োগের ওসিয়ত করে যান। সেই মুতাবিক তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ইব্ন আবী ইসরূনকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে তাঁকে সেখান থেকে অপসারিত করা হয় এবং তার পরিবর্তে তাঁকে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর তাঁকে মুসলের বিচারক নিয়োগ করা হয়। এরপর তাঁকে বাগদাদে তলব করা হয় এবং বাগদাদের গভর্নর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ২বছর চার মাস তিনি ওই পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি পুনরায় খলীফার নিকট বিচারক পদে নিয়োগের আবেদন জানান। তাঁর প্রতি খলীফার অসন্তুষ্টির কারণে খলীফা ওই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফার মায়ের নিকট কাযী জিয়ার স্ত্রীর সিততুল মুলুকের একথা ভাল অবস্থান ছিল। তিনি স্ত্রীকে পাঠিয়ে খলীফার মায়ের নিকট সুপারিশ কামনা করেন। খলীফা মাতা জিয়ার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। মায়ের সুপারিশে খলীফা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাঁকে 'হামা' নগরের বিচারক পদে নিয়োগ দান করেন। কাযী জিয়া একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁর উন্নতমানের একাধিক কবিতা রয়েছে। এই হিজরী সনের রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে 'হামা' নগরে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন নাসর ইব্ন হামযাহ : এই হিজরী সনে মৃত্যুবরণকরী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন নসর আবূ বকর বাগদাদী ওরফে ইব্নুল মুরুস তানিয়া। প্রসিদ্ধ গুণী-জ্ঞানী লোকদের একজন ছিলেন তিনি। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং হাদীসের সংকলনগ্রন্থ তৈরী করেছেন। তিনি একজন জ্যোতির্বিদ্যা-অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। পূর্ব যুগীয় জ্ঞান এবং মানবজাতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ভাল জানা শোনা ছিল, দিওয়ানুল ইসলাম ফী তারীখে দারুস সালাম' নামে তিনি একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটিকে তিনি ৩৬০টি অধ্যায় সুবিন্যস্ত করেছিলেন। তবে গ্রন্থটি খুব একটা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। সীরাতে ইব্ন হুরায়রা নামে তিনি একটি জীবনী সংকলন তৈরী করেছিলেন। তিনি নিজেকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর দাবী করতেন। এজন্যে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। জনৈক কবি তার সমালোচনা করে বলেছেন :

دَعِ الْأَنْسَابَ لَا تَعَرَّضْ لِتَيْمٍ * فَإِنَّ الْهُجْنَ مِنْ وُلْدِ الصَّمِيمِ-

বংশগত তোমার দাবীটি তুমি ছেড়ে দাও, তায়ম বংশের অন্তর্ভুক্ত হবার পেছনে দৌড়াদৌড়ি করো না, কারণ দুর্বলতাটা শক্তি ও দৃঢ়তার প্রসুত।

لَقَدْ أَصْبَحْتَ مِنْ تَيْمٍ دَعِيًّا * كَدَعْوَى حَيْصٍ بَيْصٍ إِلَى تَمِيمٍ-

তুমি তায়ম বংশোদ্ভূতি হবার দাবীদার হয়েছে। যেমন হায়স-বায়স তামীম বংশোদ্ভূত হবার দাবী করেছিল।

ইব্ন নাজা : তিনি হলেন আলী ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন নাজা যায়নুদ্দীন আবুল হাসান দামেস্কী। তিনি একজন খ্যাতিমান ওয়াযকারী ও বক্তা ছিলেন। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তিনি। তিনি একসময় বাগদাদ আগমন করেন। সেখানে ফিক্‌হ শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন এবং হাদীস বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর নিজ জন্মস্থান দামেস্কে ফিরে যান। এরপর পুনরায় সুলতান নুরুদ্দীনের প্রতিনিধি হয়ে ৫৬৪ হিজরী তিনি বাগদাদ আগমন করেন। সেখানে হাদীছের শিক্ষা প্রদান করেন। সুলতান সালাহুদ্দীনও তাঁকে ভালবাসতেন। মিশরে ও তাঁর ভাল প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। যেদিন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে জুমার খুতবা দিয়েছিলেন সেদিন নামাযের পর তিনি এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। বস্তুত এই দিনটি ছিল স্মরণীয় বহু লোক ওই মাহফিলে উপস্থিত ছিল।। খাবার-দাবার ও লেবাসে পোশাকে তিনি রাজা বাদশাদের থেকে উত্তম পন্থা গ্রহণ করতেন। তাঁর নিকট ২০টির অধিক সুন্দরী ক্রীতদাসী ছিল। এগুলোর প্রত্যেকটি এক হাজার দীনার করে ক্রয় করেছিলেন তিনি। তিনি এগুলোর সাথে মিলিত হতেন এবং আমোদ প্রমোদ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিণতি এমন হবে তা কখনো ভাবা যায়নি। মৃত্যুকালে তিনি নিঃস্ব হয়ে মারা গিয়েছেন, কাফন কেনার মত অর্থ ও রেখে যাননি। মিম্বরে বসে একদিন তিনি মন্ত্রী তালাই ইব্ন রাযীকে সম্বোধন করে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন :

مَشِيْبُكَ قَدْ قَضَى شَرْخَ الشَّبَابِ * وَحَلَّ الْبَازُ فِيْ وَكْرِ الْغُرَابِ۔

আপনার বার্ধক্য যৌবনের লাবণ্যকে শেষ করে দিয়েছে কাকের বাসায় বাজ পাখি অবতরণ করেছে।

تَنَامُ وَمُقْلَةُ الْحَدَثَانِ يَقْظَى * وَمَا نَابُ النَّوَائِبِ عَنْكَ نَابٍ۔

তুমি ঘুমোতে থাক আর তোমার যৌবনের চক্ষু সদা (ধ্বংস চিহ্ন) সজাগ থাকে, বিপদের-আগমন তোমার থেকে দুরে নয়।

فَكَيْفَ بَقَاءُ عُمْرِكَ وَهُوَ كَنْزٌ * وَقَدْ أَنْفَقْتَ مِنْهُ بِلَا حِسَابٍ۔

তোমার জীবনকাল অবশিষ্ট থাকবে কীভাবে, এটি তো একটি সঞ্চিত সম্পদ, তুমি সেটি থেকে বেহিসাবী হয়ে খরচ করেছ?

শায়খ আবুল বারাকাত মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন সাঈদ তিকরিতী ওরফে মুআয়্যাদ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিক। তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান ব্যাকরণবিদ ছিলেন আবুল মুবারক ওয়াজিহ। ওয়াজিহ প্রথমে হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করতেন। এরপর হানাফী মাযহাবের-অনুসারী হয়েছিলেন। এরপর সেটি ছেড়ে শাফিঈ মাযহাব অবলম্বী হয়েছিলেন। শায়খ আবুল বারাকাত আলোচ্য ওয়াজিহকে উপলক্ষ করে নিযামিয়াহ মাদরাসার এক ব্যাকরণ সভায় এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন :

أَلَا مُبَلِّغًا عَنِّيْ الْوَجِيْهَ رِسَالَةً * وَإِنْ كَانَ لَا تَجْدِيْ لَدَيْهِ الرَّسَائِلُ۔

আমার পক্ষ থেকে ওয়াজিহকে একটি বার্তা পৌছে দেয়ার কেউ আছ কি? যদিও বা কোন বার্তা তঁর নিকট পৌছায় না।

تَمَذْهَبْتَ لِلنُّعْمَانِ بَعْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ * وَذٰلِكَ لِمَا اَعْوَذَتْكَ الْمَاكِلُ۔

তুমি আহমদ ইব্ন হাম্বলের অনুসারী থাকার পর আবূ হানীফা নুমানের অনুসারী হয়েছে। এমনটি করেছ দুনিয়াবী স্বার্থে রুটি রুজির জন্যে।

وَمَا خَتَّرْتَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ دِيَانَةً * وَلَكِنَّمَا تَهْوِى الَّذِى هُوَ حَاصِلُ.

এরপর তুমি যে ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত গ্রহণ করেছ তাও তোমার দীনদারী ও ধর্মীয় স্বার্থে নয়। তুমি বরং তা-ই লাভ করতে চাও যা সহজে পাওয়া যায়।

وَعَمَّا قَلِيلٍ أَنْتَ لَا شَكَّ صَائِرٌ * إِلَى مَالِكٍ فَانْظُرْ إِلَى مَا أَنْتَ قَائِلُ؟

অবিলম্বে তুমি তো মালিকী মাযহাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। এরপর তুমি কোন মাযহাবে ফিরে যাবে তা ভেবে দেখ?

সিততুল জালীলাহ যামরাদ খাতুন : ৫৯৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন খলীফা নাসির লিদীনীল্লাহ্-এর মাতা এবং খলীফা মুসতাদি-এর স্ত্রী সিততুল জালীলাহ্। তিনি একজন পূণ্যবতী, ইবাদতী, নামাযী, রোযাদার পরোপকারী ও দানশীল মহিলা ছিলেন। মৃত্যুর আগেই তিনি মারূফ কারখী (র)-এর কবরের পাশে নিজের সমাধি তৈরী করে যান। তাঁর জানাযায় বহুলোক শরীক হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুতে পুরো এক মাস শোক প্রকাশ অব্যাহত ছিল। তাঁর পুত্রের খিলাফতের ২৪বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় কার্যে তাঁর নির্দেশ কার্যকর হত, আমীর উমারাহ ও শাসক প্রশাসক বৃন্দ তাঁর অনুগত ছিল।

৫৯৯ হিজরী সনে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনী গ্রন্থে এই হিজরী সনকে তাঁর জন্ম সাল রূপে উল্লেখ করেছেন। ওই গ্রন্থে তিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর, কর্মব্যস্ততা, চাকুরী, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণসহ কতক কবিতা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কতক তাৎপর্যপূর্ণ সুখ-স্বপ্নের কথাও তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন।

এই হিজরী সনে তাতার নেতা চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ঘটে। সে ছিল বাসিকের শাসনকর্তা। সে নিজে এবং জাহেলী শাসন প্রত্যাশী তার সৈন্য সমাপ্তসহ সে বাগদাদে আগমন করে। চেঙ্গিস খান হল তুলু খানের পিতা এবং হালাকু খানের দাদা। হালাকু খানই ৬৫ হিজরী সনে খলীফা মু'তাসিমকে এবং বাগদাদের অধিবাসীদেরকে হত্যা করেছিল। অবিলম্বে তার বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৬০০ হিজরী সনে (১২০৪ খ্রি.)

এই হিজরী সনে ফ্রাংক সম্প্রদায় মুসলমানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্যে এক বিশাল সেনা বহর প্রস্তুত করে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে দেন। তারা বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে কনষ্টান্টিনোপল অতিক্রম করছিল, তারা তখন দেখতে পেল যে, রোমানগণ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। ফলে সুযোগ বুঝে তারা কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করে এবং শক্তি প্রয়োগে তা দখল করে নেয়। একাধারে তারা তিন দিন সেখানে খুন খারাবী ও হত্যা ধর্ষণের অনুমোদন প্রদান করে। নগরীর $\frac{1}{4}$ অংশ তারা জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এই তিন দিন নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া, আহত হওয়া কিংবা নিঃশ্ব হয়ে যাওয়া থেকে কোন রোমানই রেহাই পায়নি। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তাদের অধিকাংশ "বায়া সুফিয়া নামে তাদের প্রধান গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। ফ্রাংকগণ গীর্জা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। ওদের পাদ্রীগণ শত্রুপক্ষকে পড়িয়ে শুনানোর জন্যে এবং

ওসীলা দিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে ইনজিল কিতাব নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারা কিছুই মানেনি। বরং গীর্জাস্থিত সবাইকে হত্যা করে ফেলে। গীর্জায় থাকা বিশাল পরিমাণের স্বর্ণ রৌপ্য, হীরা যহরত ও ধন সম্পদ তারা লুঠ করে নিয়ে যায়। এমনকি ধর্মীয় চিহ্ন ক্রুশ ও প্রাচীরে জড়ানো স্বর্ণ-রৌপ্য ও খুলে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ্‌র শোকর যে, এ যাত্রায় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করলেন। বস্তুত তিনি যা চান তাই হয়।

এরপর দখলকৃত ভূখণ্ড কার রাজত্ব বলবে তা নির্ধারণের জন্যে ফ্রাংক শাসকগণ নিজেদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করল। ফ্রাংক শাসক ছিল তখন তিনজন। (ক) দাওকুল বানাদিকাহ্, তিনি ছিলেন দৃষ্টি শক্তিহীন বৃদ্ধ তাঁর বাহনকে অন্য কেউ টেনে নিয়ে যেত। (খ) মারকাস আফরানসিস এবং (গ) কিনদা বিলান্ড। তৃতীয় ব্যক্তির ভক্ত-অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল। একে একে তিনবারই লটারীতে তার নাম উঠে আসে। ফলে কনষ্টান্টিনোপলের শাসনভার তাকেই দেয়া হয়। অন্য দুজন অন্য এলাকার কিছু অংশগ্রহণ করে এই হিজরী সনে কনষ্টান্টিনোপলের শাসন ক্ষমতা রোমানদের থেকে ফ্রাংকদের হাতে চলে যায়, শুধুমাত্র দ্বীপাঞ্চলের কিছু অংশ রোমানদের হাতে থাকে। ওই অংশটুকু তাসকিরী নামে জনৈক রোমান শাসকের দখলে ছিল। এই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ওই এলাকা নিজ দখলে রেখেছিল এরপর ফ্রাংকগণ সিরিয়া দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কনষ্টান্টিনোপল দখলের মাধ্যমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারা আক্কা নগরীতে আক্রমণ চালায়। গৌর অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি মুসলিম জনপদে তারা লুটতরাজ সংঘটিত করে। অনেক লোককে তারা হত্যা ও বন্দী করে ফেলে। সুলতান আদিল তখন দামেস্কে ছিলেন। তিনি ওদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যে অগ্রসর হন। সহযোগিতার জন্যে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় ও মিশরীয় সৈন্যদেরকে এগিয়ে আসতে বলেন। তিনি আক্কা নগরীর পূর্ব প্রান্তে সৈন্য সমাবেশ করেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। ওদেরকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

এই হিজরী সনে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে ঘোরী বংশ ও খাওয়ারিযামী গোত্রের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেগুলোর বিবরণ অনেক দীর্ঘ। এই হিজরী সনে মুসেলের শাসনকর্তা নুরুদ্দীন এবং সিনজারের শাসনকর্তা কুতুবুদ্দীনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুলতান আদিলের পুত্র আশরাফ এই যুদ্ধে কুতুবুদ্দীনকে সাহায্য করেন। এরপর তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়। কুতুবুদ্দীন তখন নুরুদ্দীনের বোনকে বিয়ে করেন। তার বোন হল আতাবিকিয়্যাহ্ বিন্, ইযযুদ্দীন মাসউদ ইবন মাওদূদ ইব্ন জঙ্গী। এই হিজরী সনে মিশর সিরিয়া জাযীরা, কিবরিসসহ অন্যান্য জনপদে এক বিরাট ভূকিম্প হয়। ইব্নুল আছীর তাঁর 'আল কামিল' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। এই হিজরী সনে মাহমুদ ইব্ন মুহাম্মদ হিময়ারী নামে জনৈক ব্যবসায়ী হাদারা মাওত অঞ্চলের যিফার ও অন্যান্য কতক শহরে নিজের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। ৬১৯ হিজরী এবং তারপরও কিছুকাল সেখানে তার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে।

এই হিজরী মনের জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান জিলীর বিরুদ্ধে মন্ত্রীভবনে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় প্রমাণিত হয় যে, উক্ত প্রধান বিচারপতি ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে ওই সভাতেই

তাঁকে বরখাস্ত করা হয়, তাঁকে ফাসিক বা পাপী ঘোষণা করা হয় এবং তাঁর বিচারিক মুকুট প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। মোট দুই বছর তিন মাস তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এই হিজরী সনে সুলতান রুকনুদ্দীন ইব্‌ন কালাজ আরসালানের মৃত্যু হয়। তিনি দর্শন মতবাদী ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী তিনি তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল দিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পক্ষ থেকে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হয়। হঠাৎ তিনি তাঁর সহোদর ভাই আংকারার শাসনকর্তাকে অবরোধ করে রাখেন। একাদিক্রমে কয়েক বছর এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। ফলে ওই এলাকায় চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি সুলতান রুকনুদ্দীনের হাতে আংকারার শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেন। তবে শর্ত থাকে যে, কতক শহর তাঁর নিকট থাকবে। শর্ত মুতাবিক সুলতান রুকনুদ্দীন, তাঁর ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এরপর বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গ করে তিনি কতক গুপ্ত ঘাতক প্রেরণ করেন তাঁর ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে হত্যা করার জন্যে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁকে বেশী সময় দেননি। এর পাঁচ দিন পরই সুলতান ডায়রিয়া ও পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হন। সাত দিন রোগ ভোগ করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ۔

আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপতি করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি (সূরা দুখান : ২৯)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আফলাহ আরসালান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর বয়স তখনও কম। এক বছর তিনি ক্ষমতায় থাকেন। এরপর তাঁর চাচা কিং খসরু ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। এই হিজরী সনে ওয়াসিত প্রদেশে গুপ্ত ঘাতক দলের বহু সদস্য নিহত হয়। ইব্‌নুল আছীর বলেছেন যে, এই হিজরী সনের রজব মাসে বাগদাদের খানকাহ্‌তে সূফীগণের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তারা সামা বা গীত গযল শ্রবণের আয়োজন করেন। তাঁদের সমাবেশ সূফী জামালুল হুলীয় আবৃত্তি করেন :

أَعَاذِلَتِيْ أَقْصِرِيْ * كَفَى بِمَشِيْبِيْ عَذْلُ۔

ওহে আমাকে সমালোচনা ও তিরস্কারকারিণী! তুমি থেমে যাও। আমাকে তিরস্কারের জন্যে আমার চুলের শ্বেত বর্ণই যথেষ্ট।

شَبَابٌ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ * وَشَيْبٌ كَأَنْ لَمْ يَزَلْ۔

এখন মনে হচ্ছে আমার মধ্যে যৌবন ছিলই না, আর বার্ধক্য যেন চিরস্থায়ী।

وَبَثِّيْ لَيَالِ الْوِصَالِ * أَوَاخِرُهَا وَالْأُوَلُ۔

হায়রে আমার দুঃখ! আমার মিলন রাতসমূহের জন্যে, প্রথম দিকের এবং শেষ দিকের সুখময় মিলন রাতসমূহের জন্যে।

وَصُفْرَةُ لَوْنِ الْمُحِبِّ * عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْغَزَلِ۔

এখন আমার দুঃখ হয় সেই সুখময় মৃত সময় হারানোর জন্যে গযল শ্রবণে প্রেমিকের হলুদ বর্ণ যখন দৃশ্যমান হত।

لَئِنْ عَادَ عَتْبِيْ لَكُمْ * حَلَا لِيَ الْعَيْشُ وَاتَّصِلُ۔

আমার সমালোচনাকারী যদি ফিরে আসে তোমার নিকট, আমার জীবনও ফিরে আসবে এবং আমি আবার মিলিত হব।

فَلَسْتُ أُبَالِيْ بِمَا نَالَنِيْ * وَلَسْتُ أُبَالِيْ بِأَهْلٍ وَمَلٍ۔

আমার উপর এখন যে অবস্থা বিরাজ করছে তাকে আমি কোন পরোয়া করি না। পরিবার পরিজন এবং ধন সম্পদের ব্যাপারেও আমার কোনো পরোয়া নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ গযল শুনে সূফীগণের মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি হল। তাঁরা আন্দোলিত হলেন। তাঁদের একজন ওজ্‌দ ও বিশেষ অবস্থায় উপনীত হল। তাঁর নাম ছিল আহমদ রাযী। তিনি অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। সবাই তাঁকে নাড়া চাড়া করে দেখল। কিন্তু তখন তিনি মৃত। বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত ওই ব্যক্তি একজন নেককার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইব্‌ন সাঈ বলেন লোকটি একজন নেককার পীর ছিলেন। পীরানে পীর সদর আবদুর রহীমের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তাঁর জানাযায় বহু মানুষ শরীক হয়। ইব্‌রায ফটকে তাঁকে দাফন করা হয়।

৬০০ হিজরী সনে আরো যারা ইনতিকাল করেন

আবুল কাসিম বাহাউদ্দীন : তিনি হলেন হাফিয ইব্‌ন হাফিয আবুল কাসিম আলী ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্‌ন আসাকির। ৫২৭ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা আপন সান্নিধ্যে রেখে তাঁকে প্রচুর শিক্ষা দান করেন, পিতার সাথে সাথে তাঁর অধিকাংশ শায়খ ও পীরের নিকট তিনি গিয়েছেন। তাঁর পিতার রচিত ইতিহাস গ্রন্থটি তিনি স্বহস্তে দুবার লিখেছেন। তিনি নিজে বহু কিতাব রচনা করেছেন, বহু শিষ্যকে হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রে শিক্ষা দান করেছেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নুরিয়া দারুল হাদীসে তিনি হাদীসের দরসের দায়িত্ব পালন করেন। এই হিজরী সনের ৮ সফর বৃহস্পতিবার তাঁর ইনতিকাল হয়। বাব আল সাগীরের পূর্ব দিকে সাহাবা-ই কিরামের পূর্ব পাশে তাঁর পিতার পাশে ওইদিন আসরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবর ছিল সংরক্ষিত অংশের বাহিরে।

হাফিয আবদুল গণী মুকাদ্দেসী : তিনি হলেন হাফিয আবদুল গণী ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সারওয়ার হাফিয আবূ মুহাম্মদ মুকাদ্দেসী। তিনি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। আল কামাল ফী আসমাইর রিজলি, আল আহকামুল কুবরা ওয়াস সুগরা প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ৫৪১ হিজরী সনের রাবিউল আখির মাসে জামাঈল নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তার দুই চাচা ইমাম মুওয়াফ্‌ফিকুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন কুদামাহ মুকাদ্দেসী এবং শায়খ আবূ উমার থেকে তিনি চার মাসের বড়। তাঁরা দুজন সপরিবারে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রথমে পূর্ব ফটকের আবূ সালিহ মসজিদে আগমন করেন। সেখান থেকে সাফাহ্-তে স্থানান্তরিত হন। অতঃপর তাঁদের নামে ওই স্থানটি সালিহিয়্যাহ মহল্লা নামে পরিচিত হয়। অতঃপর তাঁরা দিয়ারে বসবাস করেন। হাফিয আবদুল গণী স্থানীয়ভাবে কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন এবং হাদীস শরীফ শ্রবণ করেন। এরপর তিনি এবং তাঁর চাচা মুওয়াফ্‌ফিক ৫৬০ হিজরী সনে বাগদাদ আগমন করেন। শায়খ আবদুল কাদির (র) তাঁদেরকে তাঁর মাদরাসায় আমন্ত্রণ জানান। তিনি কিন্তু সচরাচর সবাইকে তাঁর মাদরাসায় থাকতে দেন না। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে তিনি কল্যাণ, সফলতা এবং বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁদেরকে সসম্মানে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং হাদীস শুনিয়েছিলেন। তাঁদের আগমনের ৫০ দিনের মাথায় শায়খ আবদুল কাদির ইনতিকাল করেন। হাদীসশাস্ত্র ও হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী শাস্ত্রের প্রতি শায়খ

আবদুল গণীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মুওয়াফ্ফিকের আকর্ষণ ছিল ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি। তাঁরা দুজনে শায়খ আবুল ফরজ জাওযী এবং শায়খ আবুল ফাত্হ এর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা ও গবেষণা ধর্মী কাজে নিয়োজিত হন। চার বছর পর তাঁরা দুজনে দামেস্ক আগমন করেন। এরপর শায়খ আবদুল গণী মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া গমন করেন, এরপর দামেস্কে ফিরে আসেন। এরপর জাযীরা ও বাগদাদ গমন করন'। এরপর ইস্পাহানে যান। সেখানে প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেন। সাহাবীদের (রা) নাম সম্বলিত হাফিয আবূ নুআয়মের গ্রন্থটি অধ্যায়ন করেন। গ্রন্থকার বলেন আবূ নুআয়মের স্বহস্তে লিখিত ওই কিতাবের কপি আমার নিকট রক্ষিত আছে। শায়খ আবদুল গণী ওই গ্রন্থের ১৯০টি স্থানে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এতে বানূ খাজনাদী গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি ক্ষেপে যায়। তাঁদের রূদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্যে তিনি চাদরে মুখ ঢেকে সেখান থেকে পালিয়ে যান। পথে তিনি মুসেলে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি আকীল রচিত সমালোচনা-পর্যালোচনা গ্রন্থটি পাঠ করেন। ওই কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য থাকায় হানাফী মাযহাব নুসারীগণ তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। দামেস্কে ফিরে এসে তিনি জুমার নামাযের পর হাম্বলী চত্বরে হাদীসের দরস দিতে শুরু করেন। তাঁর মজলিসে পক্ষে বিপক্ষের বহু লোকের সমাগম হতে লাগল। তিনি কোমল হৃদয় ও প্রচুর ক্রন্দনকারী ব্যক্তি ছিলেন। এখানে সাধারণ মানুষের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে ইব্ন যাকী, জিয়াউদ্দীন দাওলাঈ, নেতৃস্থানীয় শাফিয়ী মতাবলম্বীগণ এবং কতক হাম্বলীপন্থী আলিম-উলামা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেন। তাঁরা নাসিহ হাম্বলীকে তাঁর সাথে বাহাস ও বিতর্ক করার জন্যে তৈরী করে। আন নাস্র গম্বুজে তিনি তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন। তাঁরা তাঁকে বলে দেন যে, বিতর্কের সময় তিনি যেন যথা সাধ্য চীৎকার করে কথা বলেন যাতে প্রতিপক্ষ কথা বলতে গিয়ে এলেমেলো করে ফেলে। শায়খ আবদুল গণী আসরের পর আলোচনার বসার সিদ্ধান্ত দেন। একদিন তিনি মহান আল্লাহ্র কুরসী সম্পর্কে আলোকপাত করছিলেন। তাঁর বক্তব্যে কাযী ইব্ন যাকী এবং জিয়াউদ্দীন দাওলাঈ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেন। ৫৯৫ হিজরী সনের ২৪ যুলকাদাহ সোমবার তাঁরা শায়খ আবদুল গণীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কিল্লাতে এক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা মহান আল্লাহ্র ঊর্ধ্বারোহণ ও নিম্নে অবতরণ এবং নড়াচড়ার শব্দ তাঁর সাথে কথা বলেন। আলোচনা দীর্ঘকাল চলে। দলীল প্রমাণে শায়খ আবদুল গণী তাঁদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। তখন কিল্লার সহকারী প্রশাসক বারগিশ বলল, এরা সবাই ভ্রান্তিতে আর আপনি একাই সত্য পথে আছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাই। জবাব শুনে বারগিশ ক্ষুব্ধ হয় এবং শায়খকে শহর থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এর তিন দিন পর শায়খ বা'আলাবাক্কা শহরে পৌঁছেন এরপর কায়রো গমন করেন। আটাকল শ্রমিকগণ তাঁকে আশ্রয় দেয়। সেখানে তিনি হাদীস পাঠ করতে শুরু করেন। তাতে মিশরের ফকিহগণ তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তাঁকে ওখান থেকে বহিষ্কার করার জন্যে তাঁরা মন্ত্রী সাফীউদ্দীন ইব্ন শোকরকে লিখিত অনুরাধ জানায়। মন্ত্রী সাফীউদ্দীন তাঁকে পশ্চিমা নির্বাসনে পাঠানোর অঙ্গীকার করে এবং শায়খের নামে লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করে। কিন্তু তার নির্দেশনামা শায়খের হাতে পৌছার পূর্বে ৬০০ হিজরী সনের ২৩ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। শায়খ আবূ আমর ইব্ন মারযূকের পাশে কুরাকাহ কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সাবিত বলেন শায়খ আবদুল গণী একজন খোদাভীরু, পরহেযগার ও ইবাদতকারী বান্দা ছিলেন। ইমাম আহমদের (র) মত তিনি প্রতিদিন তিনশত রাকআত নামায আদায় করতেন। রাতে ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় রোযা পালন করতেন। তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত-প্রচুর দানশীল ব্যক্তি। কিছুই সঞ্চিত রাখতেন না। গোপনে তিনি ইয়াতীম-বিধবা ও অসহায় লোকদেরকে সাহায্য করতেন। তালি দেয়া জামা পরিধান করতেন। প্রচুর পড়াশোনা, কিতাব দেখা এবং কান্নাকাটির ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাদীস কণ্ঠস্থ রাখা এবং হাদীসের তত্ত্ব অনুধাবনে তিনি 'যুগশ্রেষ্ঠ' ছিলেন। আমি বলি আমাদের শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মুযী শায়খ আবদুল গণীর 'আল কামাল ফী আসমাইর রিজাল' গ্রন্থটিকে একটি উন্নত পদ্ধতিতে সম্পাদনা করেছেন। ওই কিতাবের প্রায় এক হাজার স্থানে তিনি প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন। ইমাম আল মুযী একজন খ্যাতিমান, দক্ষ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম ছিলেন। তাঁর 'আত তাহযীব' গ্রন্থটি ও একটি অতুলনীয় সাহিত্য কর্ম। শায়খ আবদুল গণী ও শায়খ আল মুযী সে যুগে বর্ণনাকারীদের জীবনীশাস্ত্রে কণ্ঠস্থকরণ, স্মরণ রাখা, নিজে শ্রবণ ও অন্যকে শোনানোর ক্ষেত্রে অতুলনীয় ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হাদীসের মূল অংশ পাঠে ও তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। বুঝতে হবে যে, হিংসুক কখনো সফলতা পায় না এবং সম্মানজনক কিছু অর্জন করতে পারে না।

৬০০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল ফাতুহ আস'আদ ইব্ন মাহমূদ আজালী : ৬০০ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্তদের অন্যতম হলেন চাতিম্মাতুত্ তাতিম্মাহ গ্রন্থের রচয়িতা আসআদ ইব্ন আবুল ফযল ইব্ন মাহমূদ ইব্ন খালাফ আজালী। তিনি শাফিঈ মাযহাবের একজন খ্যাতিমান ফিক্হবিদ ছিলেন। তিনি একজন ভাল ওয়াযকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, এবং আবূ সা'দ হারাভীর 'আল তাতিম্মাহ' গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থরূপে তাতিম্মাতুত্ তাতিম্মাহ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি একজন দুনিয়া বিমুখ ও ইবাদতী বান্দা ছিলেন। শারহু মুশকিলাতিল ওয়াসিত ওয়াল ওয়াজীয নামে তাঁর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রয়েছে। এই হিজরী সনের সফর মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

কবি আল বুনানী : তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না ওরফে কবি আল বুনানী। রাজা-বাদশা, আমীর-ওমারাহ ও খলীফাদের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করতেন। তিনি নিয়মিত প্রশংসা গীতি রচনা করতেন। এক পর্যায়ে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন। তাঁর কবিতা ছিল বুদ্ধি দীপ্ত। তিনি একজন চতুর ও সাবধানী কবি ছিলেন। তিনি বলেছেন :

ظُلْمًا تَرَى مَغْرَمًا فِي الْحُبِّ تَزْجِرُهُ * وَغَيْرُهُ بِالْهَوَىٰ أَمْسَيْتَ تُنْكِرُهُ.

প্রেম বিষয়ক অবিচারকে তুমি ক্ষতিকর মনে করছ এবং সেটিকে ধমক দিচ্ছ। প্রেম ঘটিত অন্যান্য বিষয়কেও তুমি প্রত্যাখ্যান ও অপছন্দ করছ।

يَا عَاذِلَ الصَّبِّ لَوْ عَايَنْتَ قَاتِلَهُ * لِوَجْنَةٍ وَعَذَارٍ كُنْتَ تَعْذِرُهُ.

ওহে প্রেমাসক্তির সমালোচক! প্রেমরূপ কুমারী হন্তাকে যদি তুমি সচক্ষে দেখতে তাহলে তুমি তার ওযর ও অক্ষমতা মেনে নিতে।

اَفْدِى الَّذِى بِسِحْرِ عَيْنَيْهِ يُعْلِمُنِىْ * إِذَا تَصَدَّى لِقَتْلِىْ كَيْفَ اَسْحَرُهُ.

আমি উৎসর্গ হই তার জন্যে চোখের যাদুতে যে আমাকে খুন করে। সে যখন আমাকে খুন করতে প্রস্তুত হয় আমি তাকে কী করে যাদু করি।

يَسْتَمْتِعُ اللَّيْلَ فِىْ نَوْمٍ وَاَسْهَرُهُ * اِلَى الصَّبَاحِ وَيَنْسَانِىْ وَاَذْكُرُهُ.

সে রাতভর নিদ্রাসুখ ভোগ করে আর আমি জেগে থাকি তার জন্যে ভোর পর্যন্ত। সে আমাকে ভুলে যায় আর আমি তাকে স্মরণ করি।

আবূ সাঈদ হাসান ইব্ন খালিদ : ইব্নুল মুবারক খ্রিস্টান মাযদানী। তাঁর উপাধি ওয়াহীদ। শৈশব থেকে প্রাচীন ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি ব্যাপকভাবে এই শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। উচ্চ মানের কবিতা রচনায় তাঁর ব্যাপক দখল ছিল। অভিশপ্ত এই ব্যক্তির একটি কবিতা এই :

اَتَانِىْ كِتَابٌ اَنْشَاتُهُ اَنَامِلُ * حُوْتُ اَبْحُرًا مِنْ فَيْضِهَا يَغْرُقُ الْبَحْرُ.

আমার নিকট একটি কিতাব এসেছে যেটি হাতের তৈরী। এটি সমুদ্রের মাছ মাছের লালায় সমুদ্র ডুবে যায়।

فَوَا عَجَبًا اَنَّى الثُّوتُ فَوْقَ طَرْسِهِ * وَمَا عَوَّدَتْ بِالْقَبْضِ اَنْمِلَهُ الْعَشْرِ.

এ কি অবাক ব্যাপার ঢাল থেকে তার রশি বড়। দশ আঙ্গুল তা ধরে রাখতে অভ্যস্ত নয়।

لَقَدْ اَثَّرَتْ صَدْغَاهُ فِىْ لَوْنِ خَدِّهِ * وَلَا حَا كَكَفْئٍ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ.

তার যুলফিদ্বয় তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চোখ দুটো ঝলমল করছে কাঁচের উল্টো দিকের প্রতিচ্ছবির ন্যায়।

تَرٰى عَسْكَرًا لِلرُّوْمِ فِى الزَّيْحِ مُذْبَدَتْ * كَطَائِفَةٍ تَسْعٰى لِيَوْمٍ هِيَاجٍ.

এগুলো দৃশ্যমান হবার পর তোমার মনে হবে যে, এগুলো রোমান সৈন্যদল। যুদ্ধ দিবসে যেগুলো শত্রু পানে ধাবিত হয় প্রচণ্ড গতিতে।

اَمِ الصُّبْحُ بِاللَّيْلِ الْبَهِيْمِ مَوَشَّحٌ * حَكَى اَبْنُوْسًا فِىْ صَحِيْفَةِ عَاجٍ.

অথবা মনে হবে অন্ধকার রাতে আলোর প্রভা, যেমন হাতির দাঁতের উপর লিপির-ছটা।

لَقَدْ غَارَ صُدْغَاهُ عَلٰى وَرْدِ خَدِّهِ * فَسَيَّجَهُ مِنْ شَعْرِهِ بِسِيَاجٍ.

তার যুলফিদ্বয় তার মুখমণ্ডলের গোলাপ ফুলে লুটতরাজ চালিয়েছে আর তার চুল গুলো সেখানে নিরাপত্তা রক্ষীর ভূমিকা পালন করছে।

ইরাকী মুহাম্মদ ইব্ন ইরাকী : তিনি হলে রুকনুদ্দীন আবুল ফযল কাযভীনী হামাদানী ওরফে তাঊসী। মুনাযারাহ, তর্কশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যায় তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। রিযাউদ্দীন হানাফী নিশাপুরী থেকে তিনি এই পারদর্শিতা অর্জন করেন। এই বিষয়ে তিনি তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, এগুলোর মধ্যে মধ্যম পুস্তকটি সর্বোত্তম। তিনি হামাদানে অবস্থান কালে বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিবর্গ তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন। জনৈক নিরাপত্তাকর্মী তাঁর জন্যে একটি মাদরাসা নির্মাণ করে দেন। সেটি হাজিবিয়্যাহ মাদরাসা নামে পরিচিত। কারো কারো মতে তাঊস ইব্ন কায়মান তাবিঈ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে তাঊসী বলা হয়।

৬০১ হিজরী সন (১২০৫ খ্রি.)

এই হিজরী সনে এই হিজরী সনে খলীফা আল নাসির যুবরাজরূপে ঘোষিত তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ওরফে যাহিরের ওই মর্যাদা প্রত্যাহার করে নেন। ইতিমধ্যে সাত বছর কিন্তু ওই যুবরাজের নামে খুতবা পাঠ করা হয়ে গিয়েছিল। খলীফা তাঁর অপর পুত্র আলীকে যুবরাজ ও তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আলী মৃত্যুবরণ করেন এবং খলীফার উত্তরাধিকারিত্ব পুনরায় যাহিরের নিকট ফিরে আসে এবং পিতা নাসিরের মৃত্যুর পর যাহির খলীফা হবার মর্মে বায়'আত গ্রহণ করা হয়।

এই হিজরী সনে রাজধানীর অস্ত্রাগারে এর ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। এতে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম মিলিয়ে প্রায় ৪০ লক্ষ দীনারের মালপত্র পুড়ে যায়। জনগণের মাঝে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সুলতানগণ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম উপহার পাঠায় খলীফার নিকট। অবশেষে যা নষ্ট হয়েছে তার অধিক সাজ সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়। এই হিজরী সনে কুরজ সম্প্রদায় মুসলিম অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ পরিচালিত করে। বহু মুসলমানকে তারা হত্যা করে এবং বহু মুসলমানকে বন্দী করে। এই হিজরী সনে মক্কা শরীফের শাসনকর্তা কাতাদা আল হুসায়নী এবং মদীনা শরীফের শাসনকর্তা সালিম ইব্‌ন কাসিম হুসায়নীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাতাদা মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সালিম হুসায়নীকে সেখানে অবরুদ্ধ করে রাখে। হুজরা শরীফের পাশে নামায পড়ে দু'আ অন্তে সালিম অবরোধ মুকাবিলার জন্যে বের হন । তিনি অবরোধ ভেঙ্গে কাতাদাকে তাড়া করে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন এবং মক্কা শরীফে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ইতিমধ্যে কাতাদা গুপ্তচর পাঠিয়ে সালিমের সেনাপতিদেরকে প্রলুব্ধ করে এবং তাদেরকে সালিমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা সালিমের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দেয়, ফলে সালিম অবরোধ প্রত্যাহার করে নিরাপদে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।

এই হিজরী সনে সুলতান গিয়াসুদ্দীন কিং খসরু ইব্‌ন কুলজ আরসালান ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন কুলজ রোমান শহর হলো দখল করে নেন। আপন ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে তিনি এগুলো নিজ করায়ত্বে নিয়ে আসেন। এতে তাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁর সৈন্য সংখ্যা বেড়ে যায় এবং আমীর-উমারা ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সামিসাত রাজ্যে আফজাল ইব্‌ন সালাহুদ্দীন তাঁর নামে খুতবা পাঠ করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই হিজরী সনে এক অভিনব ঘটনা ঘটে। ইউফ্রেটিস নদীতে নেমে একদিন এক ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে সাতরাতে থাকে। তার চাকরকে সে তার জামা কাপড় রাখতে দেয়। এক পর্যায়ে সে নদীতে ডুবে যায়। পরবর্তীতে তার পাগড়ীতে একটি চিরকুট পাওয়া যায়। তাতে লিখা ছিল :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كَانَ لِيْ أَمَلٌ * قَصُرَبِيْ عَنْ بُلُوْغِهِ الْأَجَلُ۔

ওহে লোক সকল! আমার একটা বড় আশা ও আকাংখা ছিল। কিন্তু আমার হায়াত ও [illegible] তা পূরণে ব্যর্থ হয়। তা পূরণের আগে আয়ু ফুরিয়ে যায়।

فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ رَجُلٌ * أَمْكَنَهٗ فِيْ حَيَاتِهِ الْعَمَلُ۔

সুতরাং নিজ আয়ু ও জীবনকালে কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তির কর্তব্য হল তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র তাকওয়া অর্জন করা।

مَا اَنَا وَحْدِىْ بِفَنَاءِ بَيْتٍ * يَرٰى كُلٌّ اِلٰى مِثْلِهٖ سَيَنْتَقِلُ.

আমি একাই গৃহ পার্শ্বে নই, সবাইকে এই পর্যায়ে অবতরণ করতে হবে।

৬০১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল হাসান আলী ইব্ন আনতার ইব্ন ছাবিত হুল্লী : তিনি শুমায়ম নামে সমাধিক পরিচিত। তিনি একজন পীর, ভাষা বিশেষজ্ঞ, কবি ও সুসাহিত্যিক ব্যক্তি ছিলেন। হামাসাহ নামে তাঁর একটি কবিতা সংকলন রয়েছে। কবি আর তামামের হামাসা কাব্যগ্রন্থ থেকে এটি অনেক উন্নত। তাঁর কতক খামারিয়াত বা মাদক বিষয়ক কবিতা রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, কবি আবূ নুওয়াসের খামারিয়াত থেকে তাঁর খামারিয়াত কবিতা উন্নত। আবূ শামাহ আল যায়ল গ্রন্থে লিখেছেন আুল হাসান হুল্লী দ্বীন পালনে অলস ছিলেন। বোকামী ও হাস্য রসিকতা ছিল তাঁর অন্যতম চরিত্র। তাঁর একটি হামাসাহ গ্রন্থ এবং একাধিক পুস্তিকা রয়েছে।

ইব্নুস সাঈ বলেন, কবি আবুল হাসান এক সময় বাগদাদ আগমন করেন এবং ইব্নুল খাশ্শাব থেকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট থেকে ভাষা ও আরবি কবিতায় দক্ষতা অর্জন করেন। এরপর তিনি মুসেলে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ এই :

لَا تَسْرَحَنَّ الطَّرْفَ فِىْ مُقَلِ الْمَهَا * فَمَصَارِعُ الْاٰجَالِ فِى الْاٰمَالِ.

ব্যাপক আকাংখার কোটরে দৃষ্টি ব্যাপ্ত করবে না, কারণ আকাংখার পরিমণ্ডলে মৃত্যুর ঘাটি হয়ে থাকে।

كَمْ نَظْرَةٍ اَرْدَتْ وَمَا اَخَّرَتْ * وَكَمْ يَدٍ قَبَّلَتْ اَوَانَ قِتَالٍ.

কত দৃষ্টি পতিত হয়েছে বিলম্বিত হয়নি এবং কত হাত যুদ্ধক্ষণকে চুম্বন করেছে।

سَنَحَتْ وَمَا سَمِحَتْ بِتَسْلِيْمَةٍ * وَاَغْلَالُ التَّحِيَّةِ فِعْلَةُ الْمُحْتَالِ.

সেগুলো কার্যকর থেকেছে সালাম পেয়েও সমঝোতামুখী হয়নি। বস্তুত অভিবাদনের জিঞ্জির প্রতারকদের কৌশল।

আবূ নসর মুহাম্মদ ইব্ন সাদুল্লাহ : ৬০১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন আবূ নসর মুহাম্মদ ইব্ন সাদুল্লাহ ইব্ন নসর ইব্ন সাঈদ আরতাহী। তিনি একজন সুদর্শন, সম্মানী, দানবীর, হাম্বলী মাযহাবানুসারী ওয়ায়েয ও কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

نَفْسُ الْفَتٰى اِنْ اَصْلَحَتْ اَحْوَالَهَا * كَانَ اِلٰى نَيْلِ الْمُنٰى اَحْوٰى لَهَا.

যুবক মন যদি তার সকল অবস্থা পরিশোধন করে তাহলে লক্ষ্য অর্জন তার জন্যে অধিকতর কার্যকর হয়।

وَاِنْ تَرَاهَا سَدَّدَتْ اَقْوَالَهَا * كَانَ عَلٰى حَمْلِ الْعُلٰى اَقْوٰى لَهَا.

তুমি যদি দেখতে পাও যে, সে তার কথাবার্তা সঠিকভাবে ব্যক্ত করছে তাহলে উচ্চ মর্যাদা অর্জনে তা অধিকতর শক্তিশালী হবে।

فَإِنْ تَبَدَّتْ حَالُ مَنْ لَهَا لَهَا * فِيْ قَبْرِهِ عِنْدَ الْبَلْى لِهَا لِهَا.

এই জগতে যদি তার অবস্থা বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হয় তাহলে কবরের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সে নিশ্চিত ভীত সন্ত্রস্ত ও উত্তর দানে ব্যর্থ হবে।

আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন মাসউদ : তিনি হলেন আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন মাসউদ ইব্ন মুহাম্মদ কুরতুবী আল খাযরাজী। তিনি একাধারে তাফসীর, ফিক্হ, গণিত, ফারাইয, ব্যাকরণ, ভাষা, অলংকার শাস্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইমাম ও পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অনেক মানসম্মত গ্রন্থ ও উচ্চস্তরের কবিতা রয়েছে। তিনি বলেছেন :

وَفِيْ الْوَجْنَاتِ مَا فِي الرَّوْضِ لَكِنْ * لِرَوْنَقِ زَهْرِهَا مَعْنًى عَجِيْبٌ.

প্রিয়ার মুখমণ্ডলে তাই আছে যা থাকে ফুল বাগানে। কিন্তু প্রিয়ার মুখের লাবণ্যে এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

وَأَعْجَبُ مَا التَّعَجُّبُ مِنْهُ * إِنِّيْ لَنَيَارٍ تَحْمِلُهُ عَصِيْبُ.

সেটি কী যে অবাক করা ব্যাপার! তার ওই রূপের আকর্ষণে আমি পাগল পারা ও বিমুগ্ধ।

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন বুরতাইস সিনজারী : তিনি ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ইব্ন মাওদুদের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি সাহসী সৈনিক, সুদর্শন, দক্ষ সাহিত্যিক ও মধুরভাষী কবি ছিলেন। মূসা ইব্ন আদিলের ভাই ইউসুফের মৃত্যুতে মূসার নিকট পাঠানো শোকবাণী স্বরূপ তিনি এই কবিতা রচনা করেন :

دَمُوْعُ الْمَعَالِيْ وَالْمَكَارِمِ أَذْرَفْتُ * وَرَبْعُ الْعُلٰى قَاعٌ لِفَقْدِكَ صَفْصَفُ.

মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিদের অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে এবং তোমার বিয়োগ বেদনায় মর্যাদা বা মুখমণ্ডল সমতল জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে।

غَدَاةَ الْجُوْدُ وَالْمَعْرُوْفُ فِيْ اللَّحْدِ ثَاوِيًا * غَدَاةَ ثَوٰى فِيْ ذٰلِكَ اللَّحْدِ يُوْسُفُ.

যেদিন প্রভাতে ইউসুফ কবরে সমাহিত হয়েছে দান-দক্ষিণা ও সৎকর্ম সেদিন ওই কবরে স্থান গ্রহণ করেছে।

مَتٰى خَطَفَتْ يَدُ الْمَنِيَّةِ رُوْحَهُ * وَقَدْ كَانَ لِلْأَرْوَاحِ بِالْبَيْضِ يَخْطِفُ.

মৃত্যুর হাত যখন তাঁর প্রাণ ছিনিয়ে নিল, অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি শত্রুর প্রাণ হরণ করতেন।

سَقَتْهُ لَيَالِي الدَّهْرِ كَأْسَ حِمَامِهَا * وَكَانَ بسقيي الْمَوْتَ فِي الْحَرْبِ يُعْرَفُ.

যুগ পরিক্রমা তাঁকে মৃত্যুর শরাব পান করিয়েছে, অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যকে মৃত্যু শরাব পান করানোর ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

فَوَا حَسْرَتَا لَوْ يَنْفَعُ الْمَوْتَ حَسْرَةٌ * وَوَاسَفًا لَوْ كَانَ يَجْدِي التَّأَسُّفُ.

হায় হায়, আক্ষেপ যদি মৃত্যু ঠেকানোতে কোন কাজ দিত! হায় আফসোস! আফসোস যদি পরবর্তী আক্ষেপ রোধ করত!

وَكَانَ عَلَى الْأَرْزَاءِ نَفْسِيْ قَوِيَّةٌ * وَلٰكِنَّهَا عَلٰى حَمْلِ ذَا الرِّزْءِ تَضْعُفُ.

শোক ও বেদনা সহ্য করতে আমার আত্মা কিন্তু সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। কিন্তু এই মহাশোক সহ করতে আমার আত্মা সক্ষম।

আবুল ফযল ইব্ন ইলয়াস ইব্ন জামি আরাবলী : তিনি নিযামিয়া মাদরাসায় ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শর্ত শাস্ত্রে লিখনীতে তিনি অনন্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি ভাল কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

أَمُمَرِّضَ قَلْبِيْ مَالِهجْرِكَ آخِرُ * وَمُسْهِرُ طَرْفِيْ هَلْ خَيَالُكَ زَائِرُ ؟

ওহে আমার হৃদয়কে ব্যধিগ্রস্তকারী তোমার বিরহের কি কোন শেষ আছে? ওহে আমার চক্ষুকে নির্ঘুম কারী তুমি কি আমার সাথে দেখা করবে?

وَمُسْتَعْذِبُ التَّعْذِيْبِ جَوْرًا بِصَدِّهِ * أَمَالَكَ فِيْ شَرْعِ الْمَحَبَّةِ زَاجِرُ ؟

ওহে অন্যায় পথে আমার নির্যাতনকারী! প্রেম ভালবাসার পথে তোমায় কি কেউ ধমক দিচ্ছে?

هَنِيْئًا لَكَ الْقَلْبُ الَّذِيْ قَدْ وَقَفْتُهُ * عَلٰى ذِكْرِ أَيَّامِيْ وَأَنْتَ مُسَافِرُ ـ

তোমায় সুস্বাগতম আমার হৃদয় মাঝে। আমি আমার হৃদয়কে ওয়াকফ করে দিয়েছি স্মৃতি রোমন্থনে, আর তুমি তো মুসাফির হয়ে আছ।

فَلَا فَارَقُ الْحُزْنِ الْمُبَرِّحِ خَاطِرِيْ * لِبُعْدِكَ حَتّٰى يَجْمَعَ الشَّمْلَ قَادِرُ ـ

আমার অন্তর তো তোমার বিরহের সীমাহীন বেদনা পরিত্যাগ করতে পারছে না, বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো গুছিয়ে আনতে পারছে না।

فَإِنْ مُتَّ فَالتَّسْلِيْمُ مِنِّيْ عَلَيْكُمْ * يُعَاوِدُكُمْ مَا كَبَّرَ اللّٰهَ ذَاكِرُ ـ

তুমি যদি মৃত্যুবরণ করে থাক তবে আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সালাম। আল্লাহ্র যিকিরকারী মানুষ যতদিন আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে ততদিন আসার পক্ষ হতে তোমার প্রতি সালাম অব্যাহত থাকবে।

আবূ সাআদাত হুলিয়্য : তিনি রাফিযী মতাবলম্বী বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। প্রতি জুমুআবারে তিনি যুদ্ধ পোশাক পরিধান করে তাঁর বাসস্থানের দরজার পেছনে বসে থাকতেন। আর লোকজন জুমুআর জামাতে হাজির হত। তিনি অপেক্ষায় থাকতেন যুগের ত্রাণকর্তা মুহাম্মদ ইব্ন হাসান যেন সামুরার ভূগর্ভস্থ দূর্গ হতে বের হয়ে আসেন ইমাম মাহদীর সাহায্যার্থে তাঁর তরবারি নিয়ে জনগণের উপর হামলে পড়েন।

আবূ গালিব ইব্ন কামনূনাহ ইয়াহূদী : এই ব্যক্তি একজন ভাল লিপিকার ছিল। ইব্ন মুকিল্লাহ্ এর হস্তলিপির চেয়ে তাঁর হস্তলিপি অধিক মজবুত ও আকর্ষণীয় ছিল। এই মালঊন (অভিশপ্ত) এই হিজরী সনে ওয়াসিতের মাতমুরাহ প্রদেশে মৃত্যুবরণ করে। ইব্নুস সাঈ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আবূ গালিব ইয়াহূদীর কথা উল্লেখ করেছেন।

৬০২ হিজরী সন (১২০৬ খ্রি.)

এই হিজরী সনে গযনী অধিপতি শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন সাম ঘুরী এবং জুদী পর্বতের পার্বত্য জনগোষ্ঠী খোক্কার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রলংয়কারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খোক্কার সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে করে মুরতাদ হয়ে গিয়ে ছিল। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী তাদেরকে

যুদ্ধে পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তাদের অগণিত ধন সম্পদ তিনি হস্তগত করেন। তাদের জনৈক গুপ্তঘাতক সুলতানকে হত্যা করার জন্যে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। অবশেষে এই হিজরী সনের শাবান মাসের প্রথমদিকে এশার নামাযের পর এই আততায়ী তাঁকে হত্যা করে। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী অত্যন্ত দানশীল, সৎচরিত্র এবং যুদ্ধাভিজ্ঞ শাসক ছিলেন। তিনি যখন খুন হন তখন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর মজলিসে ছিলেন। তিনি সুলতানের দরবারে ওয়ায নসিহত করতেন এবং সুলতানকে ও ধর্মোপদেশ দিতেন। মাহফিলে ইমাম রাযী যখন বলতেন, 'ওহে সুলতান, আপনার এই রাজত্ব থাকবে না, এই রাযী ও থাকবে না আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন তো মহান আল্লাহ্র নিকট" তখন সুলতান কেঁদে জার জার হয়ে যেতেন। সুলতান খুন হবার পর কেউ কেউ ইমাম রাযীর প্রতি খুনের দায় চাপানোর চেষ্টা করেছিল। তাতে ইমাম রাযী ভয় পেয়ে গেলেন এবং মন্ত্রী মুআইয়িদুল মুলক ইব্ন খাজার আশ্রয়ে গিয়ে উঠেন। তিনি ইমামকে সেখান থেকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। এরপর মামলূক বংশের জনৈক তাজুদ্দুর গযনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এরপর বহু ঘটনা ঘটেছে যেগুলোর বিবরণ সুদীর্ঘ। ইব্নুল আছীর ও ইব্নুস সাঈ সেগুলো বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এই হিজরী সনে কুর্জ সম্প্রদায় মুসলিম শহরগুলোতে ব্যাপক লুট তরাজ পরিচালনা করে। তারা আখলাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা বহু মুসলমানকে হত্যা এবং বহু মুসলমানকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ব্যাপক হারে মুসলিম জনগণ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

এই হিজরী সনে আরবিল শাসক মুযাফফর উদ্দীন খোকরী আযার বায়যানের শাসক সুলতান আবূ বর ইব্ন বাহলুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করে। মুরাগার শাসনকর্তা তার সহযোগিতায় বের হয়। আযার বায়যানের শাসকের অপরাধ এই ছিল যে, তিনি কুর্জদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং রাত দিন নেশা পানে মত্ত থাকতেন। অবশ্য এই অভিযানে তারা সকল হয়নি। এরপর বাহলূল শাহ কুর্জ-অধিপতির কন্যা বিয়ে করেন। ফলে ওদের আক্রমণ থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।

এই হিজরী সনে খলীফা নাসিরুদ্দীন মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন নাসিরুদ্দীন মাহদী নাসির আলাভী হাসানীকে, তিনি এই মন্ত্রীত্বের সাথে তাঁকে রাজকীয় উপহার সামগ্রী ও প্রদান করেন। নামাযের সময় তাঁর সম্মুখে এবং তার প্রবেশ দ্বারে ঢোল তবলা বাজানো হত। এই হিজরী সনে আরমান রাজ্যের শাসনকর্তা ইব্ন লাভিন হালাব আক্রমণ করে। সে সেখানে খুন খারাবি ও লুটতরাজ চালায়। অনেক লোককে বন্দী করে। তার মুকাবিলার জন্যে সম্রাট যাহির গাযী ইব্ন নাসির বের হন। এই সংবাদ শুনে ইব্ন লাভিন পালিয়ে যায়, সম্রাট যাহির সেখানে গিয়ে ইব্ন লাভিনের তৈরী দূর্গটি ধুলিস্মাৎ করে দেন। এই হিজরী সনে পূর্ব ফটকের পাশে অবস্থিত রোমান সেতুটি বিধ্বংস্ত হয়। এর পাথর গুলো মন্ত্রী সফিউদ্দীন শুকর-এর মধ্যস্থতায় উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজে লাগানো হয়। ৬০৪ হিজরী সনে এটির নির্মাণ সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পন্ন হয়।

৬০৩ হিজরী সনে (১২০৭ খ্রি.) ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শরফুদ্দীন আবুল হাসানা তিনি হলেন শরফুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী জামালুল ইসলাম শাহারযূরী। এই হিজরী সনের হিমর্স নজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এক সময়

তিনি আমিনিয়া মাদরাসা এবং বুরাদাহ এর বিপরীত দিকে অবস্থিত জুমা মসজিদে শিক্ষকতা করতেন। মাযহাব ও মতভেদমূলক শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তাঁকে হিম্‌সে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈসা ইব্‌ন ইউসুফ নকী : তিনি হলে ঈসা ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আহমদ আল ইরাকী। তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি ও আমিনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। পশ্চিম মিনারের হুজরা খানায় থাকতেন। এক যুবক তাঁর খেদমতে নিয়োজিত ছিল। তাঁকে এখানে সেখানে নিয়ে যেত। একদিন তাঁর কত গুলো দিরহাম হারিয়ে যায়। তিনি যুবক খাদিমকে চুরি করেছে বলে অপবাদ দেন। কিন্তু দাবীর সমর্থনে তাঁর কোনো প্রমাণ ছিল না। আবার ছেলেটি শায়খকে তার সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হবার অপবাদ দেয়। জনসাধারণ মনে করত যে, শায়খের নিকট কোনো অর্থকড়ি ছিল না। পরিস্থিতি এমন হল যে, দিরহাম ও গেল ইজ্জত ও নষ্ট হল। ৭ যুলকাদাহ জুমাবারে পশ্চিম মিনারস্থিত তাঁর বাসস্থানে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগানা ঝুলন্ত পাওয়া যায়। তিনি আত্মহত্যা করেছেন এ অপরাধে মানুষ তাঁর জানাযাহ আদায়ে বিরত থাকে। তখন শায়খ ফখরুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্‌ন আসাকির এগিয়ে এলেন এবং তাঁর জানাযাহ আদায় করলেন। কিছু লোক তাঁর সাথে জানাযায় শরীক হয়। আবূ শামা বলেন মূলত সম্পদ হারানো এবং ইজ্জত বিনষ্ট হওয়ায় জীবনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ পথে পা বাড়ান। আবূ শামাহ আরো বলেন এমন একটি দুর্ঘটনার মুখোমুখি আমি ও হয়েছিলাম। দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন। শায়খ ঈসা ইব্‌ন ইউসুফের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থাপক শায়খ জামাল মিশরী আমিনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

আবুল গানাইম বাগদাদী : তিনি ইজুদ্দীনের সাথে সেনা সদস্যদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাতে তিনি প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেছিলেন। যখনই তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকড়ির মালিক হতেন তখনই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত এক লোকের নামে ধন সম্পদ ক্রয় করে রাখতে তাঁর মৃত্যু যখন সমুপস্থিত তখন তিনি তাঁর সাথী ব্যক্তিকে ডেকে অসিয়ত করবেন যে, তার নামে ক্রয় করা তাঁর নিজের সম্পদ যেন তাঁর নিজের সন্তানদের জন্যে ব্যয় করা হয়। নিজের সন্তানদেরকে ত্যাজ্য সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার অসিয়ত করে তিনি মারা যান। এর অল্প কিছুদিন পর অসী ব্যক্তি অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখনই তার নিজের নামে থাকা সম্পদ মূলত আবুল গানাহীমের ওয়ারিশদের প্রাপ্য সম্পদ মর্মে স্বাক্ষী রাখার জন্যে লোকজন ডেকে আনল। কিন্তু তার নিজের ওয়ারিশগণ তার কথা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এ বিষয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ওই লোক মারা যায়। অতঃপর, তার ওয়ারিশগণ ওই সম্পত্তি নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যায়। আবুল গানাইমের সন্তানদেরকে কিছুই দেয়নি।

আবুল হাসান আলী ইব্‌ন সুআদ ফারসী : ৬০২ হিজরী সনে ওফাত প্রাপ্তদের অন্যতম হলেন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন সুআদ ফারসী। তিনি বাগদাদে ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নিযামিয়াহ মাদরাসায় পুনরায় তা পাঠ করেন। এরপর নিযামিয়াহ মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পান। খলীফার মাতাকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওই মাদরাসায় ও অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। অতিরিক্ত দায়িত্বরূপে বিচারপতি আবু তালিব বুখারীর সহযোগী বিচারক হবার প্রস্তাব

আসে। তিনি ওই প্রস্তাবে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু তাঁকে ওই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হয়। অল্প কিছুদিন তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মাথায় পশমী কাপড় পেঁচিয়ে নেন এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। আর নিজের পক্ষে ঘোষণা দেন যে, তিনি বিচারকের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়েছেন। এরপর তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যান। অবশেষে এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখ জুমাবার ইনতিকাল করেন।

আল খাতুন : ৬০২ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন সুলতান ঈসা ইব্ন আদিল আল মুআয্যামের মাতা আল খাতুন। সাফাহ কাসিয়ুনের মুআয্যামিয়া মাদরাসার গম্বুজের নীচে তাঁকে দাফন করা হয়।

আমীর মুজীরুদ্দীন তাশতুগীন মুসতানজিদী : তিনি হাজ্জ কাফেলার নেতা এবং খুজিস্তানের প্রশাসক ছিলেন। তিনি একজন উত্তম চরিত্রের ইবাদতী শায়খ ও মুর্শিদ ছিলেন। অবশ্য শিয়া মাযহাবের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। জুমাদাল আখির মাসের ২ তারিখ তাসতুরে তাঁর ইনতিকাল হয়। সেখান থেকে তাঁর লাশ কুফাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর অসিয়ত মুতাবিক হযরত আলী (রা)-এর মাযারের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। ইবনুস সাঈ তার ইতিহাস গ্রন্থে তাই লিখেছেন। আবূ শামা লিখেছেন যে, তিনি তাশতুগীন ইব্ন আবদুল্লাহ মুকতাফাবী। আমীরুল হাজ্জ হজ্জ কাফেলার নেতা। লোকজন নিয়ে ২৬ বার তিনি হজ্জ আদায় করেছেন। আরব অঞ্চলে তিনি রাজার হালে থাকতেন। মন্ত্রী ইব্ন ইউনুস একবার খলীফার নিকট অভিযোগ করে যে, তাশতুগীন সুলতান সালাহুদ্দীনের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে। তাতে খলীফা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, অভিযোগটি মিথ্যা ছিল। খলীফা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে খুজিস্তানের জায়গীর দান করেন এবং পুনরায় আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করেন। তিনি একজন সাহসী, দানশীল, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্বল্পভাষী লোক ছিলেন। একাধারে সাতদিন অতিবাহিত হয়ে যেত তিনি কোনো কথা বলতেন না। তিনি খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। একদিন এক বিপদগ্রস্ত লোক আর্তচীৎকার করে তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিল, তিনি তার কোনো জবাব দেননি। লোকটি বলল, আপনি কি গাধা?" তিনি বললেন, "না", তাঁর অবস্থান পরিচিতি দিয়ে ইব্ন তাআবিয়ী বলেছেন :

وَأَمِيْرٌ عَلَى الْبِلَادِ مَوْلَى * لَا يُجِيْبُ الشَّاكِي بِغَيْرِ السُّكُوْتِ۔

তিনি শহর আমীর, সাহায্যকারী, অভিযোগকারী জবাব দেন নীরবে।

كُلَّمَا زَادَ رِفْعَةً حَطَّنَا * اللّٰهُ بِتَغْفِيْلِهِ إِلَى الْبَهْمُوْتِ۔

তিনি যত উপরে উঠে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তত নীচে নামিয়ে দেন।

একবার তাঁর একজন দারোয়ান তাঁর বিছানা চুরি করে নেয়। লোকজন তার নিকট থেকে চুরির স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিল। সে যখন বিছানা নিয়ে যায় তখন আমীর তাশতুগীন তা দেখেছিলেন। তখন তিনি লোকজনকে বললেন তোমরা এই বিসয়ে কাউকে শাস্তি দিওনা এটি এমন এক ব্যক্তি নিয়েছে যে ফেরত দিবে না এবং সে এটি নেয়ার সময় এমন একজন তা দেখেছেন যিনি সেটির উপর আর ঘুমোবেন না। আমীর তাশতুগীনের বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

একবার এক ঘটনা ঘটেছিল যে, তিনি ৩০০ বছরের জন্যে একটি জমি ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন জনৈক কৌতুককারী বলল, এই ব্যক্তির মৃত্যুতে বিশ্বাস নেই। তার বয়স এখন ৯০ বছর আর সে জমি ভাড়া নিয়েছে ৩০০ বছরের জন্যে। তার কথা শোনে সকলে হেসে উঠল। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৬০৩ হিজরী সন (১২০৭ খ্রি.)

এই হিজরী সনে পূর্ব এশিয়ায় ঘুরী বংশ ও খাওয়ারিযমী বংশের মধ্যে বহু দ্বন্দ্ব সংঘাত সংঘটিত হয়। সম্রাট খাওয়ারিযম শাহ ইব্ন টাক্স তালিকান নগরসমূহ দখল করে নিয়েছিল। এই হিজরী সনে মহামান্য খলীফা বাগদাদের বিচারপতি পদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দামিগানীকে নিয়োগদান করেন। এই হিজরী সনে মহামান্য খলীফা শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর (র) দৌহিত্র আবদুস সালাম ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাবের পাপাচারিতা ও গোমরাহীর কারণে তার কর্মতৎপরতায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর পূর্বে তিনি তার ধন-সম্পদ ও কিতাবপত্র পুড়িয়ে দেন। কারণ, লাইব্রেরীতে দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তক ছিল। তাতে শায়খ আবদুস সালাম এত নিঃশ্ব হয়ে পড়েন যে জনগণের নিকট সাহায্য চাইতে হয়। মূলত: এর কারণ হল তাঁর আবুল ফারজ ইব্নুল জাওযীর বিরুদ্ধাচরণ করা। তিনি ইব্নুল জাওযীর বিরুদ্ধে মন্ত্রী ইব্নুল কাদ্দাবের কানভারী করেছিলেন যার ফলে মন্ত্রী শায়খ ইব্নুল জাওযীর কতক কিতাব পুড়িয়ে দেয় এবং অবশিষ্ট কিতাবগুলো বাজেয়াপ্ত করে এবং পাঁচ বছরের জন্যে তাঁকে ওয়াসিতে নির্বাসনে পাঠায়। মানুষের বলে, জুহুমের প্রতিকারে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। কুরআন মজীদে আছে وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ সূরা শূরা : ৪০)। সূফীগণ বলেন, পথেই ধরা পড়ে। চিকিৎসকগণ বলেন, প্রকৃতি বদলা নেয়।

এই হিজরী সনে ফ্রাংকগণ হিমস প্রদেশে অভিযান পরিচালনা করে। সুলতান আসাদউদ্দীন শিব্কুহ ওদের প্রতিরোধ করেন। হালব অধিপতি সুলতান আয-যাহির তাঁকে সহায়তা করেন। ফলে মহান আল্লাহ ফ্রাংকদের অনিষ্ট থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করেন। এই হিজরী সনে বাগদাদে এক অভিনব ঘটনা সংঘটিত হয় মদ পান নিয়ে দুই যুবক নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে ছুরিকাঘাত করে। সে নিহত হয়। হত্যাকারী পালিয়ে যায়। একজন পর্যায়ে সে ধরা পড়ে। শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়। তার সাথে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল তাতে লিখছিল :

قَدِمْتُ عَلَى الْكَرِيْمِ بِغَيْرِ زَادٍ * مِنَ الْأَعْمَالِ بِالْقَلْبِ السَّلِيْمِ-

আমি আমল ও সৎকর্মের কোন পাথেয় ছাড়াই মহান দানশীলের সমীপে আভাসন করেছি। আমি আগমন করেছি শুধু স্বচ্ছ অন্তঃকরণ নিয়ে।

وَسُوْءُ الظَّنِّ اَنْ تُعْتَدَّ زَادًا * اِذَا كَانَ الْقُدُوْمُ عَلَى كَرِيْمِ-

মহান দানশীলের দরবারে আগমন কালে কর্ম ও কীর্তিকে পাথেয় ও সম্বল দাবী করা মন্দ ধারণা বটে।

৬০৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ফিক্‌হবিদ আল-মনসূর : ৬০৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন ফকীহ আবূ মনসূর, আবদুর রহমান ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন নুমান নাবালী। তাঁর উপাধি ছিল কাযী শুরায়হা। তাঁর মেধা, সম্মান, পূণ্যাসক্তি ও পূর্ণ চরিত্র অর্জনের প্রেক্ষিতে তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রথমে তিনি নিজ শহরের বিচারক পদে নিযুক্ত হন। এরপর বাগদাদ আগমন করেন। সেখানে তাঁকে রাষ্ট্রের উচ্চ পদে যোগদানের আহবান জানানো হয়, তিনি ওই প্রস্তাবে সাড়া দেননি, অতঃপর আমীর তাশতুগীন তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত সচিব পদে কাজ করানোর শপথ করেন। তিনি ২০ বছর ওই পদে নিয়োজিত থেকে তাঁর সেবা করেন। একপর্যায়ে মন্ত্রী ইব্‌ন মাহদী তাঁর নামে মাহদীর নিকট মিথ্যা অভিযোগ পেশ করে। ফলে তাঁকে তাশতুগীনের প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়। অবশেষে এই হিজরী সনে বন্দী অবস্থায় সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার উক্ত মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বলা হয় যে, "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন শায়খ আবদুল কাদের : তিনি একজন আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুত্তাকী ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর সন্তানদের মধ্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর অন্যান্য সন্তানগণের ন্যায় তিনি কোনো পদ-পদবী ও কর্তৃত্বের জন্যে লালায়িত হননি। দুনিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল খুবই কম আর তিনি ছিলেন আখিরাত অভিমুখী, বহু শায়খ ও মুহাদ্দিসের নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা করেছেন তাঁর নিকট থেকে বহু শাগরিদ-শিষ্য হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

আবুল হায্‌ম মক্কী ইব্‌ন যিয়ান : তিনি হলেন আবুল হাযম মক্কী ইব্‌ন যিয়ান ইব্‌ন শিবাহ ইব্‌ন সালিহ আল মাকসীনি। মাকসীন হল সিনজার প্রদেশের একটি গ্রাম। তিনি মুসেলে বড় হয়েছেন। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণে তাঁর ব্যাপক দক্ষতা ছিল। এক পর্যায়ে তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং ইব্‌নুল খাশ্‌শাব, ইব্‌নুল কাসসার ও কামাল আম্বারীর নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এক সময় তিনি সিরিয়া গমন করেন। সেখানে বহুলোক তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়। শায়খ আলামুদ্দী সাখাভী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি অন্ধ ছিলেন। সাহিত্যিক আবুল 'আলা আল মাআবরীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। কারণ, সাহিত্যে পারদর্শিতা এবং অন্ধত্বের দিক দিয়ে দুজনের মধ্যে মিল ছিল। আবুল হাযাম মক্কীর কতক কবিতা এই :

اِذَا احْتَاجَ النَّوَالُ اِلَى شَفِيْعٍ * فَلَا تَقْبَلْهُ تُصْبِحُ قَرِيْرَ عَيْنٍ۔

দানশীল ব্যক্তি যখন কাউকে সুপারিশকারী বানাতে চায় তুমি তখন সুপারিশকারী হবে না তাহলে তুমি প্রিয় ও পছন্দনীয় হয়েই থাকবে।

اِذَا عِيْفَ النَّوَالُ لِفَرْدِ مَنٍّ * فَاَوْلَى اَنْ يُعَافَ لِمُنَّتَيْنِ۔

দানশীল যদি খোঁটা দেয়া ও অনুকম্পাদ প্রদর্শন থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় তবে অনুকম্পাদ প্রদর্শনকারীর জন্যে ক্ষমা প্রাপ্তিই অগ্রাধিকার যোগ্য।

نَفْسِى فِدَاءٌ لاَغْيَدٍ غَنْجٍ * قَالَ لَنَا الْحَقَّ حِيْنَ وَدَّعَنَا.

বিদায় বেলায় যিনি আমাদেরকে হক ও সত্য উপদেশ দিয়েছেন তাঁর জন্যে আমার প্রাণ উৎসর্গকৃত।

مَنْ وَدَّ شَيْئًا مِنْ حُبِّهِ طَمَعًا * فِىْ قَحْلِهِ لِلْوَدَاعِ وَدَّعَنَا.

কোনো ব্যক্তি মনের টানে যদি কোনো কিছুকে ভালবাসে তাহলে তার বিদায় বেলায় সে তার জন্যে আত্মবির্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে।

ইকবাল আল খাদিম : তিনি হলেন জামালুদ্দীন সুলতান সালাহুদ্দীনের অন্যতম সেবক। শাফিঈ ও হানাফী পাঠশালার ওয়াকফদাতা, এ দুটো ছিল মূলতঃ বাসস্থান। তিনি এ দুটোকে মাদরাসা ও পাঠশালায় পরিণত করেন। এ দুটো প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিনি বিশাল অংকের সম্পর্ক ওয়াকফ করে যান। মোট ওয়াকফ সম্পত্তির ২/৩ অংশ প্রদান করেন শাফিঈ পাঠশালার জন্যে আর ১/৩ অংশ দান করেন হানাফী পাঠশালার জন্যে। ৬০৩ হিজরী সনের এই বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির ওফাত হয়।

৬০৪ হিজরী সন (১২০৮ খ্রি.)

এই হিজরী সনে হাজী সাহেবান হজ্জ শেষে বাগদাদে ফিরে আসেন চরম ক্ষোভ সহকারে। এই সফরে সদর জাহান বুখারী হানাফীর দুর্ব্যবহারে তাঁরা ক্ষোভ ও অভিযোগ পেশ করতে থাকেন। বস্তুত সদর জাহান বুখারী একটি পুস্তক নিয়ে বাগদাদ আগমন করে। খলীফা তাকে স্বসম্মানে বরণ করেন এবং তার সম্মানে এক মাহফিলের আয়োজন করেন। ওই বছরে সদর জাহান হজ্জের সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তার কারণে অন্যান্য হাজীগণ চরম সংকটে পতিত হয়। কি পানি পান, কি খাবার দাবার সর্বত্র তার অমানবিক আচরণে সকলে চরম দুঃখ ভোগ করে। তার কারণে এই সফরে প্রায় ছয় হাজার ইরাকী হাজী মৃত্যুবরণ করেন। বলা হয় যে, সে তার খাদেমদেরকে নির্দেশ দিত সবার আগে পানশালাগুলোতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্যে। তারা সেখানে নিযন্ত্রণ গ্রহণ করত এবং অন্যান্য হাজীদেরকে পানি গ্রহণে বাধা দিত। নিজেরা পানি নিয়ে সদরের তাঁবুর আশেপাশের মরুভূমিতে ছিঁটিয়ে দিত নিজেদের বাহনে রাখা মাটিতে উদগত সবজি ও ক্ষেতে প্রদান করত। তারা সাধারণ মানুষ, মুসাফির এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষক হাজী সাহেবদেরকে কোনো পানি পান করতে দিত না। হজ্জ সমপান্তে অন্যান্যদের সাথে যখন শায়খ সদর বাগদাদে ফিরে আসে। তখন জনগণ তার প্রতি লা'নত ও অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে। অভিজাতবর্গ তার সম্মানে কোনো সম্বর্ধনার আয়োজন করেনি। খলীফাও তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কবিকে প্রেরণ করননি। অবস্থা বেগতিক দেখে সে বাগদাদ ছেড়ে চলে যায়। এ সময়ে ক্ষুদ্র জনতা তার পেছনে লাগে এবং তাকে লা'নত দেয়। লোকজন তাকে সদর-ই-জাহান্নাম বা জাহান্নামের প্রধানরূপে আখ্যায়িত করে। আমরা মহান আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাহানি থেকে আশ্রয় কামনা করি এবং তাঁর দয়া ও রহমত অধিকহারে প্রাপ্তির প্রার্থনা করি।

এই হিজরী সনে খলীফা তাঁর মন্ত্রী ইব্ন মাহদী আলাভীর উপর অবরোধ আরোপ করেন। কারণ গোপন সুত্রে জানা গিয়েছিল যে, উক্ত মন্ত্রী খলীফা হবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছিল, কেউ কেউ অন্য মন্তব্যও করেছেন। মোটকথা উক্ত মন্ত্রীকে তাশতুগীনের গৃহে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং

সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ওই মন্ত্রী একজন স্বৈরাচারী জালিম ও সত্যদ্রোহী ব্যক্তি ছিল। তার সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন :

خَلِيْلَيَّ قُوْلَا لِلْخَلِيْفَةِ وَانْصَحَا * تَوَقَّ وَقِيْتَ السُّوْءَ مَا أَنْتَ صَانِعُ.

ওহে আমার বন্ধু দুজন! তোমরা উপদেশরূপে খলীফাকে বলে দাও, আপনি সতর্ক ও সাবধান হোন তাহলে আপন কর্মকাণ্ডে বিপদ মুক্ত থাকতে পারবেন।

وَزِيْرُكَ هٰذَا بَيْنَ أَمْحَرَيْنِ فِيْهِمَا * صَنِيْعُكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ضَائِعُ.

ওহে জগতশ্রেষ্ঠ মহান খলীফা! আপনার এই মন্ত্রী এমন কাজে লিপ্ত রয়েছে যার ফলে আপনার সৎকর্মগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

فَإِنْ كَانَ حَقًّا مِنْ سُلَالَةِ حَيْدَرٍ * فَهٰذَا وَزِيْرٌ فِي الْخِلَافَةِ طَامِعُ.

সে যদি প্রকৃতই আলী হায়দার (র)-এর উত্তর পুরুষ হয়ে থাকে, তবে আমি বলছি যে, সে খিলাফতের পদ প্রাপ্তির জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

وَإِنْ كَانَ فِيْمَا يَدَّعِيْ غَيْرَ صَادِقٍ * فَأَضْيَعُ مَا كَانَتْ لَدَيْهِ الضَّائِعُ.

তাদের দাবীতে সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার নিকটে থাকা সকল সৎকর্ম বাতিল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, উক্ত মন্ত্রী ঐশ্বর্য-বিরাগী, সৎ চরিত্র ও সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। মহান আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

এই হিজরী সনের রামাদান মাসে খলীফা ২০টি সরাইখানা ও ভোজনালয় তৈরী করেন। সেখানে দরিদ্র রোযাদারগণকে ইফতারী দেয়া হত। প্রতিদিন বড় পরিমাণের খাবার রান্না করা হত সেখানে। প্রচুর চাপাতি, রুটি এবং হালুয়াও থাকত। এটি হজ্জের মওসুমে কুরায়শদের হাজী আপ্যায়নের সাথে তুলনীয়। হযরত আবূ তালিব হাজী আপ্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ছিলেন হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বে। জাহেলী যুগে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন পতাকা বহন এবং পরামর্শসভা পরিচালনার দায়িত্ব ও কুরায়শদের হাতে ছিল। যথাস্থানে এ সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। আব্বাসী শাসনামলে এই পদ-পদবী গুলো পূর্ণতা লাভ করেছিল।

এই হিজরী সনে খলীফা আল নাসির শায়খ শিহাবুদ্দীন শাহার যূরী এবং সিলাহদার সিনকারকে উচ্চমূল্যের রাজকীয় উপহার সহকারে সুলতান আদিলের নিকট প্রেরণ করেন। তাতে গলার মালা ও দুটো কংকন ছিল। সুলতান আদিলের সকল সন্তানের জন্যেও রাজ-উপহার প্রেরিত হয়েছিল। এই হিজরী সনে সুলতান আদিলের পুত্র আওহাদ মিয়া ফারিকায়নের শাসনকর্তা শরফুদ্দীন বেকটামিরকে হত্যা করে সেখানকার ক্ষমতা দখল করেন। শাসনকর্তা শরফুদ্দীন একজন সুদর্শন টগবগে তরুণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জনৈক ক্রীতদাস তাঁকে হত্যা করে। পরে ওই খুনীকে ও হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে রাজ্যটি নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ে এবং আওহাদ ইব্‌ন আদিল এই সুযোগে তা দখল করে নেন।

এই হিজরী সনে দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের পর সম্রাট খাওয়ারিযম শাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন তাকাশ মা ওয়ারাআন নাহার অঞ্চল দখল করে নেন। এ সময়ে তাঁর জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের

এক পর্যায়ে খাওয়ারিযম শাহের নিকট হতে মুসলিমগণ পিছু হটে যায়। তাঁর অল্প কতক সহযোগী তাঁর সাথে থেকে যায়। এই সুযোগে কাফিরগণ বহু মুসলমানকে হত্যা করে এবং বহুলোককে বন্দী করে। বন্দীদের মধ্যে খাওয়ারিযম শাহও ছিলেন। তাঁকে যে ব্যক্তি বন্দী করেছিল সে জানত না যে, ইনি সম্রাট এবং ইনি খাওয়ারিযম শাহ। মাসঊদ নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত সেনাপতি ও তাঁর সাথে বন্দী হয়েছিল। মুসলমানগণ নিজ নিজ অস্থানে ফিরে যাবার পর সুলতানকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু তাঁকে তো পাওয়া যায় না। সুলতানের অবস্থান নিয়ে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতভেদ দেখা দেয়। এই এমতাবস্থায় খোরাসানের প্রশাসকি পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। কেউ কেউ শপথ করে বলতে থাকে যে, সুলতান নিহত হয়েছেন।

এ দিকে সেনাপতি মাসঊদ ও সুলতান তো বন্দী হয়ে আছেন। সেনাপতি সুলতানকে বলল, এ পরিস্থিতিতে আপনার সম্রাট পরিচিতি বর্জন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখন আপনি পরিচয় দিবেন যে, আপনি আমার ক্রীতদাস। সুলতান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর সুলতান তাঁর সেনাপতির সেবায় নিয়োজিত হন। তাঁকে জামা কাপড় পড়িয়ে দিচ্ছেন। পানি পান করাচ্ছেন। খাবার রান্না করে তাঁর সম্মুখে হাজির করছেন। এবং একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে তাঁর পূর্ণ সেবায় নিয়োজিত থাকেন। সে ব্যক্তি তাঁদেরকে বন্দী করেছিল একদিন সে বলল, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এই লোক অবিরাম আপনার খিদমত করে যাচ্ছে আচ্ছা বলুন তো আপনি কে? তিনি বললেন, আমি সেনাপতি মাসঊদ। এটি আমার ক্রীতদাস, ওই ব্যক্তি বলল, আমার স্বদেশী সেনাপতিগণ যদি জানতে পারে যে, আমি একজন শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিকে বন্দী করে আবার ছেড়ে দিয়েছি তবে তা আমার জন্যে বিপজ্জনক হবে নতুবা আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারতাম। মাসঊদ বললেন আমি এখন আমার পরিবার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন আছি। কারণ, তারা ধরে নিবে যে, আমি নিহত হয়েছি এবং তারা শোক ও আহাজারিতে বিচলিত হয়ে পড়বে। এখন আপনি যদি আমাকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে রাজী হন এবং আমার পরিবারের নিকট থেকে মুক্তিপণ নিয়ে আসার জন্যে কাউকে পাঠান তবে তা ভাল হবে। সে তাতে রাজী হল এবং মুক্তিপণ নিয়ে আসার জন্যে একজন লোক নির্ধারণ করল। সেনাপতি মাসঊদ বললেন, শুধু সেই লোক গেলে আমার পরিবার তো তাকে চিনবে না। যদি তার সাথে আমার এই ক্রীতদাসকে পাঠানো হয় তাহলে তারা তাকে চিনবে, আমার জীবিত থাকার সংবাদে খুশী হবে এবং মুক্তিপণ সংগ্রহে উদ্যোগী হবে। লোকটি তাতে রাজী হল। সে তাদের দুজনকে প্রস্তুত করে দিল এবং তাদের দুজনকে পাহারা দিয়ে খাওয়ারিযম শাহের শহরে পৌঁছানোর জন্যে একজন লোক পাঠাল। শহরের কাছাকাছি পৌঁছার পর শাহ তাড়াতাড়ি তাঁর শহরে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে দেখে লোকজন মহা খুশী। পুরো শহরে শাহের আগমনের সুসংবাদ প্রচার করা হল। সম্রাট তাঁর নিয়মিত কার্যে যোগ দিলেন। তাঁর নিহত হবার সংবাদে প্রশাসনের যে সকল স্থানে অনিয়ম হয়েছিল তা সংশোধন করলেন। এরপর তিনি হেরাত নগরী অবরোধ করে তা দখল করেন। যে ব্যক্তি খাওয়ারিযম শাহকে বন্দী করেছিল সে একদিন সেনাপতি মাসঊদকে বলল, খাওয়ারিযম শাহ তো নিহত হয়েছেন। মাসূদ বললেন, না, তিনি নিহত হননি বরং আপনি যাকে বন্দী করেছিলেন তিনিই খাওয়ারিযাম শাহ। সে বলল, তাহলে আপনি আমাকে তা জানাননি কেন যাতে আমি সসম্মানে তাঁকে তাঁর দেশে ফেরত পাঠাতাম। মাসঊদ বললেন, আমি ভয়

পেয়েছিলাম যদি আপনি তাকে হত্যা করেন। সে বলল, আপনি তাঁর নিকট আমাকে নিয়ে চলুন। তাঁরা শাহের নিকট গেলেন। তিনি তাদের দুজনকে স্বসম্মানে বরণ করলেন এবং সদাচরণ করলেন। সমরকন্দের শাসনকর্তা যে বিশ্বাস ভঙ্গ ও নিমকহারামী করেছিল সে তার অধীনে বন্দী থাকা সকল খাওয়ারিযমীকে হত্যা করে। সে একেকজন খাওয়ারিযম লোককে দু টুকরো করে জবাই করা বকরীর ন্যায় বাজারের প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রাখে। সে খাওয়ারিযাম শাহের কন্যা স্বীয় স্ত্রীকে ও হত্যার চিন্তা করেছিল কিন্তু পরে তাকে হত্যা করেনি বরং একটি কুঠরীতে বন্দী করে নির্যাতন চালায়। এই সংবাদ অবহিত হবার পর খাওয়ারিযাম শাহ সমরকন্দ অভিমুখে অভিযান প্রেরণ করেন। সমরকন্দ দখল করে প্রায় দু লক্ষ লোককে হত্যা করেন এবং সেখানকার শাসনকর্তাকে সুরক্ষিত দূর্গ থেকে বের করে এনে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেন। তার অধস্তন বংশধরদেরকেও হত্যা করেন। ওই বংশের এক ব্যক্তিকেও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেননি। ওই অঞ্চল পুরোটাই খাওয়ারিযম শাহের শাসনাধীন হয়। এই হিজরী সনে খুতা নগরীর সম্রাট এবং তাতারী সম্রাট কশলী খানের মধ্যে চীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খুতা সম্রাট তাতারদের বিরুদ্ধে খাওয়ারিযাম শাহের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং যুক্তি দেখায় যে, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারলে নির্ঘাত আপনার দেশ আক্রমণ করবে। অন্যদিকে তাতারগণ ও খোতানীদর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য কামনা করে এবং বলে যে, ওরা আমাদেরও শত্রু আপনাদেরও শত্রু। সুতরাং আপনি আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসুন। খাওয়ারিযাম শাহ্ উভয় পক্ষের নিকট পত্র লিখেন এমনভাবে যাতে উভয়পক্ষ খুশী হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি কোনো পক্ষেই যোগ দেননি। খুতানীদের উপর প্রচণ্ড ভাবে হামলে পড়ে তাতারীগণ। খোতানীগণ পরাজিত হয় এবং তাদের অধিকাংশ লোক নিহত হয়। তাতারীগণ বিজয়ী হয়ে খাওয়ারিযাম শাহের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে তাতারী ও খাওয়ারিযামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হয়। উভয়পক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। খাওয়ারিযাম শাহ শংঙিত হয়ে পড়েন এবং কুশলী খান অধিকার করবে এই আশংকায় বহু জনপদ ধ্বংস করে দেন। হঠাৎ চেঙ্গিস খান এসে কুশলী খানের উপর চড়াও হয়। ফলে কুশলী খান খাওয়ারিযাম শাহকে বাদ দিয়ে চেঙ্গিস খানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর আরো বহু ঘটনা ঘটে যা আমরা অচিরেই উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

এই হিজরী সনে তারাবহুসের ফ্রাংকগণ হিমস রাজ্য ও তদসংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জঘন্যভাবে লুটতরাজ ও দস্যুতা চালায়। হিমসের শাসনকর্তা আসাদুদ্দীন ওদের প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়েন। ফলে হালাবের শাসনকর্তা আয-যাহির তাঁর সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। সুলতান আদিল ও তাঁর সাহায্যে মুসলিম সেনা দল নিয়ে মিশর থেকে বের হন। দ্বীপাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে তিনি নির্দেশ দেন যাতে তারা তাঁর নিকট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এক পর্যায়ে আক্কা রাজ্যে এসে সকল পক্ষের সেনাবাহিনী একত্রিত হয়। তারা আক্কা অবরোধ করে। কারণ, সেখানকার লোকজন কতক মুসলমানকে বন্দী করে রেখেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে আক্কার শাসনকর্তা সন্ধিচুক্তি সম্পাদন ও বন্দীদেরকে ফেরত দেয়ার প্রস্তাব দেয়। সুলতান আদিল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর আদিল সম্মুখে অগ্রসর হন এবং হিমসের কাছাকাছি স্থান বুহায়রাতে যাত্রাবিরতি করেন। এরপর তারাবহুস গমন করেন। প্রচণ্ড হামলা চালান সেখানকার শহর-নগর

ও জনপদে। সেখানে তিনি ১২ দিন অবস্থান করেন এবং অবিরাম শত্রু নিধন, বন্দী এবং শত্রু সম্পত্তি অধিকার করতে থাকেন। এরপর ফ্রাংকগণ বাধ্য হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং সুলতান আদিল দামেস্কে ফিরে আসেন।

এই হিজরী সনে আযার বাইযানের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন আবূ বকর ইব্‌ন বাহলুল শক্তিমান শাসনকর্তার অনুপস্থিতিতে মুরাগাহ নগরী দখল করে নেন। কারণ, ওই নগরীর মুল শাসনকর্তার মৃত্যুর পর তাঁর এক নাবালক পুত্র সে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর এক সেবক শাসনকর্তার পক্ষে কাজ-কর্ম পরিচালনা করত। এই হিজরী সনে জিলক্বাদ মাসের প্রথম দিকে মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান জাওযী প্রধান বিচারপতি আবুল কাসিম ইব্‌ন দামিগানীর সমীপে উপস্থিত হন। বিচারপতি তাঁকে স্বসম্মানে বরণ করেন এবং বাগদাদের দুপাশের সীমান্ত প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে রাজকীয় উপহারে ভূষিত করেন। এর দশদিন পর তিনি দারবুশ শরীফ ফটকে আপন পিতা আবুল ফারজ জাওযীর আসনে উপবেশন করেন ওয়ায ও নসীহত করার জন্যে। বহু মানুষ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়। এর চারদিন পর তিনি আবূ হানীফা জিয়াউদ্দীন আহমদ ইব্‌ন মাসউদ হানাফীর আসনে উপবেশন করেন শিক্ষা প্রদানের জন্যে। বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তার দরসে সমবেত হয়। এই হিজরী সনের রামাদান মাসে খলীফা পক্ষ হতে রাজকীয় উপহার নিয়ে বাহকগণ সুলতান আদিল ও তাঁর পুত্রগণের নিকট হাজির হয়। সুলতান আদিল তদীয় পুত্র মুআযযাম ও আশরাফ মন্ত্রী শফিউদ্দীন শাকার এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ রাজকীয় পোশাক পরিধান করত যোহর নামাযের সময় আল হাদীস দরজা দিয়ে দূর্গে প্রবেশ করে এবং খলীফা প্রতি তাঁদের আনুগত্য পুনর্ব্যক্তি করে। বস্তুত এটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন, এই হিজরী সনে শরফুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়নুল কুয়াত আবদুর রহমান দামেস্কের রাওয়াহিয়া মাদরাসায় শিক্ষাদান শুরু করেন। এই হিজরী সনে শায়খ খায়র ইব্‌ন বাগদাদী হাম্বলী মাযহাব ছেড়ে শাফিঈ মাযহাবে অধিভুক্ত হন এবং মাদরাসা-ই-উম্মুল খলীফাতে শিক্ষা দানে নিয়োজিত হন। সকল মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর সমীপে উপস্থিত হন।

৬০৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আমীর বিনয়ামীন ইব্‌ন আবদুল্লাহ : তিনি খলীফা নাসিরের সেনাপতি ছিলেন। জ্ঞান, বুদ্ধি ও সততায় তিনি সেনাপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। জনৈক খ্রিস্টান সৈনিক কৌশলে তাঁকে বিষ পান করিয়ে দিয়েছিল এবং তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। যে সৈনিক তাকে বিষ পান করিয়েছিল তার নাম ইব্‌ন সাওয়া। আইন অনুযায়ী খলীফা ওই খুনী সৈনিককে বিনয়ামীনের পুত্রদের নিকট সোর্পদ করেন। মন্ত্রী ইব্‌ন মাহদী তার পক্ষে ক্ষমা মঞ্জুরীর সুপারিশ করে বলেছিলেন যে, খ্রিস্টানগণ এই ব্যক্তির জন্যে পঞ্চাশ হাজার দীনার ব্যয় করেছে। তার ক্ষতি হলে ওরা ক্ষুব্ধ হতে পারে মন্ত্রীর সুপারিশের জবাবে খলীফা লিখেছিলেন :

إِنَّ الْاَسْوَدَ اَسْوَدُ الْغَابِ هِمَّتُهَا * يُوْمَ الْكَرِيْهَةِ فِيْ الْمَسْلُوْبِ لَا السَّلَبِ۔

গভীর বনের সিংহ হল প্রকৃত সিংহ। শিকারের সময় তার সাহসও লক্ষ্য থাকে অন্যের প্রাণ হরণ করা নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়া নয়।

বিনয়ামীনের পুত্র পিতৃহন্তা খ্রিস্টান সৈনিককে গ্রহণ করে এবং তাকে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। অন্যদিকে খলীফা নাসির খুনী সৈনিকের পক্ষে সুপারিশ করার অপরাধে মন্ত্রী ইব্‌ন মাহদীকে গ্রেপ্তার করেন যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হাম্বল ইব্‌ন আবদুল্লাহ : ৬০৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন হাম্বল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফারাজ, ইব্‌ন সাআদাত আল-রুসাফী আল-হাম্বলী। মাহদী জামে মসজিদের মুকাব্বির ছিলেন তিনি। ইব্‌ন হুসায়ন .... আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা সূত্রে ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদের বর্ণনাকারী ছিলেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ইমাম আহমদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থ নিয়ে তিনি বাগদাদ থেকে বের হন। আর বলে তিনি এটি পাঠ করে শোনান। দামেস্কের শাসনকর্তা তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তাঁকে সাদরে বরণ করা হয়। সেখানে জনগণ তাঁর নিকট থেকে মুসনাদ গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করে। আদিল পুত্র মুআয্‌যাম তাঁকে খুবই সম্মান করত। তাঁর নিকট গিয়ে তিনি অনেক সুস্বাদু খাবার খেতেন। ফলে প্রায় সময় তিনি বদহজমে ভুগতেন। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি অভাবী লোক ছিলেন। কম খাবার খাওয়ার কারণে নাড়িগুলো ছিল সংকীর্ণ। বাগদাদে থাকা অবস্থায় তাঁর জীবন যাত্রা ছিল দুঃখ কষ্টে পূর্ণ। আল কিন্দী যখন মুআয্‌যামের নিকট যেতেন হাম্বলের অবস্থান জানতে চাইতেন। উত্তরে মুআয্‌যাম বলতেন যে, তিনি বদ হজমে ভুগছেন। তখন কিন্দী বলতেন ওকে ভাল খাওয়াবেন তাহলে ভাল হয়ে যাবে। মুআযযাম হাসতেন, এরপর মুআয্‌যাম তাঁকে বিশাল পরিমাণে ধন-সম্পদ দান করেন বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ৫১০ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ইব্‌ন তাবারযাদ তাঁর সমবয়সী ছিলেন। ৬০৭ হিজরী সনে ইব্‌ন তাবারযাদ ইনতিকাল করেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ঈসা : তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আবুল হাসান মারূযী বাগদাদী। তিনি একজন নামকরা ওয়াযকারী ছিলেন। ইব্‌ন আবুল ওয়াক্‌ত ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। ইব্‌নুল জাওযীর নিকট ওয়াযশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি ইব্‌নুল জাওযীর বিরোধিতা শুরু করেন। বাব আল-নাসীরার কতক লোক তাঁর সমর্থনে সমবেত হয়। শেষ বয়সে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। শীতকালে চরম ঠাণ্ডার সময়ে একদিন তিনি গোসল করেন। তাতে তাঁর যৌনাঙ্গ ফুলে যায় এবং এই হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর যায়নুদ্দীন কুরাজা সিলাহী : তিনি সারখাদ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। যালাকা নদীর নিকট ক্ষুদ্র ফটকের পাশে তার একটি বাড়ি ছিল। ইব্‌ন তুমায়রাকের সমাধির পাশে সাফাহের পথিমধ্যে গম্বুজের ভেতরে তাঁর সমাধি রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর সুলতান আদিল তাঁর পুত্র ইয়াকুবকে সারখাদ রাজ্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

ডাক্তার আবদুল আযীয : ৫০৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হলেন ডাক্তার আবদুল আযীয। তাঁর মৃত্যু হয় আকস্মিক। সা'দউদ্দীন আশরাফী হলেন তাঁর পুত্র। কবি ইব্‌ন ইন্নীন তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন :

فِرَارِىْ وَلَا خَلْفَ الْخَطِيْبِ جَمَاعَةٌ * وَمَوْتٌ وَلَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ طَبِيْبُ.

আমার পলায়ন, আমি পালিয়ে যাচ্ছি, খতীবের পেছনে কোনো জনসমষ্টি নেই। মৃত্যুর সময়, আবদুল আযীয কোনো প্রকারের ডাক্তার ও চিকিৎসক নয়।

আফীফ ইব্ন দারাহী : তিনি উমাইয়া জামে মসজিদের পশ্চিম প্রান্তীয় হানাফী কক্ষের ইমাম ছিলেন।

আবূ মুহাম্মদ জাফর ইব্ন মুহাম্মদ : তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইউসুফ আরাবিলী। শাফিঈ মাযহাবের ফিক্হ, অংক, ফারাইয, সাহিত্য ও ব্যাকরণ ও কুরআন কেন্দ্রিক অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর কবিতার কতক এই :

لَا يَدْفَعُ الْمَرْءُ مَا يَأْتِيْ بِهِ الْقَدْرُ * وَفِي الْخُطُوْبِ إِذَا فَكَّرْتَ مُعْتَبَرٌ۔

তাকদীর যা নিয়ে আসে তা প্রতিরোধ করার শক্তি মানুষের নেই। তুমি যদি ভেবে দেখ তাহলে বুঝতে পারবে যে, বিপদাপদের মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে।

فَلَيْسَ يُنْجِيْ مِنَ الْأَقْدَارِ إِنْ نَزَلَتْ * رَأْيٌ وَحَزْمٌ وَلَا خَوْفٌ وَلَا حَذَرٌ۔

তাকদীর মুতাবিক কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এসে পড়লে বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, ভয় কিংবা সাবধানতা কোনোটাই সেটি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

فَاسْتَعْمِلِ الصَّبْرَ فِيْ كُلِّ الْأُمُوْرِ وَلَا * تَجْزَعْ لِشَيْءٍ فَعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ۔

সর্ব বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করবে, কোনো কিছুতেই অস্থির হবে না, তোমার ধৈর্যের পরিণাম কিন্তু বিজয় ও সফলতা,

كَمْ مَسَّنَا عُسْرٌ فَسَرَّفَهُ اللهُ * عَنَّا وَوَلَّى بَعْدَهُ يُسْرٌ۔

কতই না সংকট ও দুঃখ আমাদের উপর এসেছে মহান আল্লাহ্ আমাদের থেকে সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। এবং এরপর আমাদের নিকট স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ এসেছে।

لَا يَيْئَسِ الْمَرْءُ مِنْ رَوْحِ الْإِلٰهِ فَمَا * يَيْأَسُ مِنْهُ إِلَّا عُصْبَةٌ كَفَرُوْا۔

মহান আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপারে মানুষ যেন নিরাশ না হয়। তা হতে নিরাশ হয় শুধু কাফির সম্প্রদায়।

إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّ الدَّهْرَ ذُوْ دُوَلٍ * وَأَنَّ يَوْمَيْهِ ذَا أَمْنٌ وَّ ذَا خَطَرٍ۔

আমি নিশ্চিত জানি যে, সময় পরিবর্তনশীল, তার দুদিনের একদিন শান্তিময় আর একদিন বিপদসংকুল।

৬০৫ হিজরী সন (১২০৯ খ্রি.)

এই হিজরী সনের মুহাররাম মাসে খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ্ এর প্রতিষ্ঠিত মেহমান খানা ও ভোজনালয়ের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। বাগদাদের পশ্চিম প্রান্তে হাজী সাহেবান ও মুসাফিরদের জন্যে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাজী সাহেবান ও মুসাফিরগণ যতদিন এখানে অবস্থান করতেন ততদিন তাদের খাবারের আয়োজন থাকত। কারো অন্যত্র সফরের সময় হলে তাকে সফরের সাজ সরঞ্জাম, জামা কাপড় ও একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হত। মহান আল্লাহ্ ওই খলীফাকে কল্যাণময় প্রতিদান প্রদান করুন।

এই হিজরী সনে আবুল খাত্তাব ইব্ন দিহ্য়া কালবী তাঁর ইরাকী সফর থেকে ফিরে আসেন। এই সফরে তিনি সিরিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে মন্ত্রী সাফী-এর মজলিসে তিনি এবং ভাষা ও

সাহিত্যের পণ্ডিত শায়খ তাজুদ্দীন আবুল ইয়ামান কিন্তু একত্রিত হন। কথা প্রসংগে ইব্ন দিহয়া সুপারিশ বিষয়ক হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য انما كنت خليلا من وراء وراء (আমি মহান আল্লাহ্‌র বন্ধু ছিলাম) পর্যন্ত পৌঁছেন। এতো হামযা বর্ণে যবর যোগে তিনি وَرَاءَ وَرَاءَ পাঠ করেন। তখন কিন্দী বললেন এখানে যবরের পরিবর্তে পেশ যোগে وَرَاءُ وَرَاءُ হবে। তখন ইব্ন দিহয়া মন্ত্রী ইব্ন শাকারকে বললেন, এই ব্যক্তি কে? মন্ত্রী বললেন, ইনি আবুল ইয়ামান কিন্দী। তখন ইব্ন দিহয়া কিন্দীকে তিরস্কার করে কথা বললেন ইব্ন দিহয়া দুঃসাহসী ছিলেন। উত্তরে কিন্দী বললেন, ওতো কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করছে। তখন আবূ শামাহ বললেন, উভয় রূপের শব্দ বর্ণিত হয়ে আসছে। এখানে যেরযোগে পাঠ করার বর্ণনাও রয়েছে। এই হিজরী সনে খতীব ফখরুদ্দীন ইব্ন তায়মিয়াহ হজ্জ সম্পন্ন করে হাররান হয়ে বাগদাদ ফিরে আসেন এবং বদর ফটকে ওয়ায করার জন্যে আসন গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইব্নুল জাওযী সেখানে ওয়ায করতেন। একদিন কথা প্রসংগে তিনি বললেন :

وَابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ * لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الْبُزْلِ الْقَنَاعِيسِ۔

দু'বছরের উষ্ট্র ছানা শিং যার এখনো মাথার সাথে মিশানো, সে তো বয়স্ক ও পূর্ণদেহী উটকে আক্রমণ করার সামর্থ রাখে না।' এতদ্বারা তিনি ইব্নুল জাওযী ইউসুফের প্রতি তিরস্কারমূলক ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, ইব্নুল জাওযী ইউসুফ ছিলেন তখন ২৫ বছরের যুবক।

এই হিজরী সনের ৯ মুহাররাম জুমাবার এক আফ্রিকী ক্রীতদাস মাতাল অবস্থায় দামেস্কের জামে মসজিদের আল মাকসূরাহ দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তার হাতে ছিল উন্মুক্ত তলোয়ার। লোকজন ফজরের নামাযের অপেক্ষায় বসা ছিল। সে তরবারি নিয়ে হামলা চালায় মুসল্লীদের উপর। তাতে তিন থেকে চারজন লোককে সে হত্যা করে। তরবারি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে। তার তরবারি ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। সেদিনই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

এই হিজরী সনে শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ার্দী সুরতান আদিলের জন্যে প্রচুর হাদিয়া তোহফা নিয়ে দামেস্ক হতে ফিরে আসেন। সেনাবাহিনী তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। ওই সাথে তাঁর নিজের জন্যেও প্রচুর ধন সম্পদ ছিল। ইতিপূর্বে তিনি দুনিয়া বিমুখ গরীব ব্যক্তি ছিলেন। দামেস্ক থেকে ফিরে এসে তিনি ওয়ায নসীহত ছেড়ে দিয়ে খানকা কেন্দ্রিক হয়ে গেলেন, নিজের হাতে থাকা ধন-সম্পদের দিকে নজর দিলেন। অতঃপর, ফকীর-মিসকীন ও অভাবী লোকদের মাঝে সেগুলো অকাতরে বিলি বণ্টন শুরু করলেন। তাঁর অনুদান পেয়ে বহু লোক স্বচ্ছলতা ফিরে পায়। এ প্রসংগে মুহিউদ্দীন ইব্নুল জাওযী একদিন তাঁর ওয়ায মাহফিলে বললেন, অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ অর্জন করে যোগ্য প্রার্থীদের জন্যে তা ব্যয় করার কোনো যুক্তি নেই। এ ধরনের সম্পদ অর্জনের চেয়ে তা ছেড়ে দেয়াই উত্তম। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দাতার উদ্দেশ্য থাকে দান-অনুদানের মাধ্যমে নিজেকে মর্যাদাশীল ও সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। সুতরাং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের সাবধান থাকা উচিত। কারণ, দুনিয়া যা প্রতারণা পূর্ণ, বড় বড় আলিম-উলামাকে ও এটি কৌশলে প্রতারিত করে। শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ার্দী যে ফাঁদে পড়েছিলেন পরবর্তীতে ইব্নুল জাওযী তার চেয়ে ও অধিক প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন এই হিজরী সনে ফ্রাংকগণ হিমস নগরী আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। এলক্ষ্যে তারা সংশ্লিষ্ট সেতু পার

হচ্ছিল। মুসলিম সৈন্যগণ তা টের পেয়ে যায় এবং ওদেরকে ধাওয়া করে। ওরা পালিয়ে যেতে থাকে ওদের বহু লোককে মুসলমানগণ ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। মুসলমানগণ ওদের থেকে বহু ধন-সম্পদ গণীমতরূপে দখল করে নেয়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার।

এই হিজরী সনে জাযীরার শাসনকর্তা নিহত হয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থানে সে একজন নষ্ট মানুষ ছিল। সে হল সম্রাট সিনজার শাহ ইব্ন গাযী ইব্ন মওদূদ ইব্ন জঙ্গী ইব্ন আকসিংকার আতাবেকী। সে ছিল মুসেলের শাসনকর্তা নূরুদ্দীনের চাচাত ভাই। আপন পুত্র গাযীই তাকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল পিতার অবর্তমানে তার নিজের শাসন ক্ষমতা দখল করা। কৌশলে সে তার পিতার নিকট প্রবেশ করে। তার পিতা তখন একাকী এবং নেশায় বুঁদ হয়েছিল। সে একে একে ১৪টি ছুরিকাঘাত করে পিতাকে এবং শেষে জবাই করে দেয়। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সে এটা করেছিল বটে কিন্তু সে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। বরং তার ভাই মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করে। খুনী গাযীকে সেদিনই গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সে ক্ষমতাও পেলনা জীবনও হারাল। তবে এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ জনগণকে সিনজারশাহের জুলুম অত্যাচার এবং গাযীর পাপাচারিতা থেকে মুক্ত করেছেন।

৬০৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন বখতিয়ার : তিনি ইব্নু সিনদাই নামে পরিচিত ছিলেন ইব্নুল হুসায়ন সূত্রে ইমাম আহমদের (র) মুসনাদ গ্রন্থের তিনি শেষ বর্ণনাকারী। তিনি ফিক্হ, বিচার ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসনে প্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান। তিনি নিজে ও একজন আস্থাভাজন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত এবং হাদীস বর্ণনায় সাবধানী লোক ছিলেন। তাঁর একটি কবিতা এই :

وَلَوْ اَنَّ لَيْلِيْ مَطْلَعُ الشَّمْسِ دُوْنَهَا * وَكَانَتْ من وَرَاءَ الشَّمْسِ حِيْنٌ تَغِيْبُ۔

রাতের পরে সূর্যোদয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তদ্রূপ সূর্যোদয়ের পরে এমন একটা সময় আসবে যখন তা অস্তাচলে যাবে।

لَحَدَّثَتْ نَفْسِيْ بِاَنْتِظَارِ نَوَالِهَا * وَقَالَ الْمُنٰى لِيْ اِنَّهَا لَقَرِيْبٌ۔

আমার মন উদ্দেশ্য পূরণের অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ, কাম্যবস্তু আমাকে বলে যে, সে খুব নিকটে আছে।

মিশরের প্রধান বিচারপতি : এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন মিশরের প্রধান বিচারপতি সদরুদ্দীন আবদুল মালিক ইব্ন দিরবাম আলমারদানী আল কুর্দী।

৬০৬ হিজরী সন (১২১০ খ্রি.)

এই হিজরী সনের মুহাররাম মাসে হানাফী শায়খ নাজমুদ্দীন খলীফা সুলতান আদিলের পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে দামেস্ক থেকে বাগদাদ পৌঁছেন। তাঁর সাথে প্রচুর হাদিয়া-তোহফা ছিল। এক সময় সেখানে ইয়াতীম ও উম্মাদের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়া না হওয়া বিষয়ে নিযামিয়া শায়খ মজদুদ্দীন ইয়াহ্য়া ইব্ন রাবী' এবং হানাফী শায়খ নাজমুদ্দীনের মধ্যে বাহাছ ও বিতর্ক

অনুষ্ঠিত হয়। হানীফা শায়খ উক্ত সম্পদে যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেন। শাফিঈ পন্থী শায়খ উক্ত দলীলের বিরোধিতা করেন। প্রত্যেক জোরালো ভাবে নিজ নিজ অভিমতের পক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করেন। বাহাছ ও বিতর্ক সভাটি অনষ্ঠিত হয়েছিল মন্ত্রী ইব্‌ন শাকারের উপস্থিতিতে। জুমাদাল আখিরাহ মাসের ৫ তারিখ শনিবার দামেস্কের শাফিঈ ইমাম শায়খ জামাল ইউনুস ইব্‌ন বদরান মিশরী সুলতান আদিলের বার্তা প্রাপ্ত হয়ে বাগদাদ পৌছেন। সরকারী সৈন্যগণ তাঁকে সেখানে অভ্যর্থনা জানায়। আরবালের শাসনকর্তা মুযাফফরউদ্দীন কুকরীর ভাতিজা ও তাঁর সাথে সেখানে গমন করে। চিঠিতে আরবাল-শাসনকর্তার দোষ স্বীকার এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার আবেদন ছিল, তার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই হিজরী সনে সুলতান আদিল খাবুর ও নসীবায়ন অঞ্চল দখল করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত সিনজার অবরোধ করে রেখেছিলেন কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। অতঃপর সেখানকার শাসনকর্তার সাথে সন্ধিস্থাপন করে তিনি ফিরে যান।

৬০৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

কাযী আসআদ ইব্‌ন মামাতী : তিনি হলেন আবুল মুকারিম আসআদ ইব্‌ন খাতীর আবূ সাঈদ মুহায্‌যাব ইব্‌ন মীনা ইব্‌ন যাকারিয়্যা আসআদ ইব্‌ন মামাতী ইব্‌ন আবূ কুদামাহ ইব্‌ন আবূ মালীহ আল মিশরী। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ও কবি ছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীনের শাসনামলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন মিশরের দিওয়ানী কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বহু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। সীরাতে সালাহুদ্দীন এবং কালীলা ওয়া দিমনাহ তাঁর অমর কীর্তি। একটি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে তাঁর। মন্ত্রী ইব্‌ন শাকার মন্ত্রীত্ব পাবার পর তিনি হালাবে পালিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। দামেস্কে ছাকীলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় এবং ছাকীলের পরিচিতি দিয়ে তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

حَكَى نَهْرَيْنِ وَمَا فِى الْاَرْضِ * مَنْ يَحْكِيْهِمَا اَبَدًا۔

তিনি তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে দুটো নদীর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, এই দুটো নদীর বৈশিষ্ট্য চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার অন্য মত কেউ কোনদিন আসবে না।

حَكَى فِىْ خُلُقِهٖ ثَوْرًا * اَرَادَ وَفِىْ اَخْلَاقِهٖ بَرَدًا۔

তিনি তার চরিত্রের মাধ্যমে ছাওর নদীর চিত্র ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি তাঁর আচরণে বারাদ নদীর রূপ ব্যক্ত করেছেন।

আবূ ইয়াকুব ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল : ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুস সালাম লুমআনী। হানাফী মাযহাবের উচ্চপর্যায়ের লোকদের একজন ছিলেন তিনি। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলেন। সুলতান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। মূল বিষয়াদিতে তিনি মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী ছিলেন। শাখা বিষয়সমূহের জ্ঞানে তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর পিতা ও চাচার নিকট পড়াশোনা করেন তিনি। বিরোধপূর্ণ মাসআলা, বাহাছ ও বিতর্ক শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল ঈর্ষনীয়। প্রায় ৯০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাসান : তিনি ইব্ন খুরাসানী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শেষ যুগের মুহাদ্দিছগণের একজন ছিলেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নিজের দেয়া খুতবা এবং অন্যান্য খতীবের খুতবা সংগ্রহ করে তিনি একটি খুতবা সংকলন তৈরী করেছিলেন। তাঁর হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিল।

আবুল মাওয়াহিব মাতূক ইব্ন মানি : ইব্ন মাওয়াহিব আল খাতীব আল বাগদাদী। তিনি আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছেন ইব্নুল খাশশাবের নিকট। তাঁর নিজস্ব খুতবাসমূহের একটি সংকলনগ্রন্থ তৈরী করেছিলেন। ঐ তিনি একজন খ্যাতিমান শায়খ ছিলেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তাঁর কতক কবিতা এই :

وَلَا تَرْجُوْ الصَّدَاقَةَ مِنْ عَدُوٍّ * يُعَادِيْ نَفْسَهُ سِرًّا وَّجَهْرًا۔

শত্রুর নিকট বন্ধুত্ব আশা করো না, সে প্রকাশ্যে অপকাশ্যে নিজের বিরুদ্ধেই শত্রুতা পোষণ করে থাকে।

فَلَوْ اَجَدْتَ مَوَدَّتُهُ اِنْتِفَاعًا * لَكَانَ النَّفْعُ مِنْهُ اِلَيْهِ اَجْرًا۔

তার বন্ধুত্বের কারণে তুমি যদি উপকৃত হও তবে সেটি তার জন্যে তারই উপকার।

ইব্ন খারাফ : ৬০৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন ইব্ন খারূফ। তিনি হলেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আবুল হাসান ইব্ন খারূফ। তিনি স্পেনের অধিবাসী ছিলেন তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যাকরণবিদ ও সীবাওয়াইহ'র গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ছিলেন, একসময় তিনি মাগরিব অধিপতির নিকট উপনীত হন। তিনি তাঁকে এক লক্ষ দীনার উপহার দেন। তিনি আল জুযাবীর "জুমাল" গ্রন্থটির ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না। শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। রাত কাটাতেন হোটেল মোটেলে তিনি বিয়ে-শাদী করেননি। ফলে অনৈতিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হন। শেষ জীবনে তাঁর বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। ফলে খালি মাথায় হাটে-বাজারে ঘুরাঘুরি করতেন। ৮৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবূ আলী ইয়াহ্য়া ইব্ন রাবী : তিনি হলেন আবূ আলী ইয়াহ্য়া ইব্ন রাবী' ইব্ন সুলায়মান ইব্ন হাররাব আল ওয়াসেতী আল বাগদাদী। নিযামিয়া মাদরাসায় ফাযলানের নিকট পড়াশোনা করে। একাধিকবার নির্বাচিত পাঠ পুনঃপুন আদায় করেন। এক পর্যায়ে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্য়ার নিকট গমন করেন। তাঁর নিকট থেকে বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ধারা সংগ্রহ করেন। এরপর বাগদাদ ফিরে আসেন। এখানে তিনি নিযামিয়াহ মাদরাসার অধ্যাপক এবং সংশ্লিষ্ট ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রভুত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। মাযহাব শাস্ত্রে তাঁর ভাল দখল ছিল। ৪ খণ্ড বিশিষ্ট তাঁর একটি তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে যা তখন পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ইবন সামআনীর তারীখ খাতীব ও তার পাদটীকার সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরী করেন। প্রায় ৮০ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

ইব্নুল আছীর : তিনি হলেন মুবারক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল করীম ইব্ন আবদুল ওয়াহিদ মাজদুদ্দীন আবূ সাআদাত শায়বানী জাযরী শাফিঈ। ইব্নুল আছীর নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুলতান আফজলের শাসনামলের মন্ত্রী জিয়াউদ্দীন নাসিরুল্লাহ্ এবং আল কামিল ফিত তারীখ গ্রন্থের রচয়িতা হাফি ইজ্জুদ্দীন আবুল হাসান তাঁর ভাই। আবূ সা'আদাত ৫৪৪ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শরীফ ও কুরআন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং এই বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেন। তিনি বসবাস করতেন মুসেলে। ধর্মীয় প্রায় সকল শাস্ত্রে তাঁর লেখালেখি রয়েছে। জামিউল উসুলিস্ সিত্তাহ তাঁর অন্যতম গ্রন্থ। এতে মুআত্তা, সহীহ বুখারী সহীহ মুসলিম, সুনানু আবূ দাউদ, সুনান নাসাঈ এবং সুনান তিরমিযীর বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। ইব্ন মাজাহ সম্পর্কে এটিতে কোনো আলোচনা নেই। আন নিহায়া ফী গারিবিল হাদীস, শারহু মুসনাদ-ই-শাফিঈ, চার খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীর এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রচুর পুস্তিকা ও গ্রন্থ রয়েছে। মুসেলের শাসকগোষ্ঠির নিকট তাঁর খুব কদর ছিল। নূরুদ্দীন আসালান শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর মন্ত্রীত্বের আমন্ত্রণপত্র নিয়ে তিনি তাঁর দাস লুলুকে ইব্নুল আছীরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব নিয়ে সুলতান নিজে এলেন তাঁর নিকট, তিনি ওই প্রস্তাব গ্রহণে অপারগত প্রকাশ করে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, ব্যাপক ইল্‌ম-প্রচারের মাধ্যমরূপে আমার পরিচিতি রয়েছে এখন স্বজনপ্রীতি ও জুলুম-অবিচারের এ সব পদ-পদবীতে জড়িত হওয়া আমার জন্যে সমীচিন হবে না। অতঃপর সুলতান তাঁকে অব্যাহতি দেন।

আবূ সা'আদাত ইব্নুল আছীর বলেন আমি সাঈদ ইব্ন দাহ্হানের নিকট আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করতাম, তিনি আমাকে কবিতা রচনার নির্দেশ দিতেন কিন্তু আমি তা পারতাম না। ওই শায়খের মৃত্যুর পর একরাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি যে, তিনি আমাকে কবিতা রচনার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে বললাম যে, আপনি নমুনা স্বরূপ কতক পংক্তি রচনা করে দিন তাহলে আমি তা দেখে কবিতা রচনা করতে পারব। তখন তিনি এই কবিতা রচনা করলেন :

حُبِّ الْعُلَا مُدْمِنًا اِنْ فَاتَكَ الظَّفُرُ * فَقُلْتُ اَنَا: وَخَدِّ خَدَّ الثَّرٰى وَاللَّيْلُ مُعْتَكِرٌ۔

একবার বিজয় তোমার হস্তচ্যুত হলে অবিরাম ভালবেসে যাও উচ্চপদ অর্জনকে। তখন আমি কবিতাংশ জুড়ে দিয়ে বললাম, গভীর রাতে তুমি সুরা তারকার আকৃতি অংকন করবে।

فَالْعِزُّ فِىْ صَهَوَاتِ اللَّيْلِ مَرْكَزُهٗ * وَالْمَجْدُ يَنْتَجِهُ الْاِسْرَاءُ وَالسَّهُرُ۔

ইজ্জত সম্মান ও সফলতার কেন্দ্রস্থল হল রাতের মধ্যাংশ। আর রাত্রি জাগরণ ও রাত্রিভ্রমণ হল মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের ভিত্তি।" আমার কবিতাংশ শুনে তিনি খুশী হলেন এবং বললেন, তুমি খুব ভাল কবিতা রচনা করেছ। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং এই নিয়মে আমি প্রায় ২০টি পংক্তি রচনা করি। এই হিজরী সনে যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে ৬২ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর ভাই তাঁর জীবনী উল্লেখ করে বলেন, "তিনি একাধিক শাস্ত্রে তথা ফিক্‌হ, উসূল, ব্যাকরণ, হাদীস ও ভাষা বিজ্ঞানে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, গণিত ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষা শাস্ত্রে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজি রয়েছে। তাঁর কিছু ক্ষুদ্র পুস্তিকাও রয়েছে। দীন-অনুসরণে তিনি ছিলেন কঠিন ও কঠোর, এক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি আপোষহীনভাবে নীতি ও পথে অবিচল ছিলেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী।

৬০৬ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়েছে

আল মাজদ আল মুতরিযী খাওয়ারিযমী : তিনি আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁর একাধিক উঁচুস্তরের গ্রন্থ রয়েছে।

সুলতান আল মুগীছ : ৫০৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন সুলতান আল মুগীছ ফাতহুদ্দীন উমার ইব্ন সুলতান আদিল। কাসিয়ুনে তাঁর ভাই মুআয্যামের সমাধির পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতান মাসঊদ ইব্ন সালাহুদ্দীন : তিনি রা'সুল আয়ন মাদরাসায় ইনতিকাল করেন। এরপর তাঁকে হালাব রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ফখরুদ্দীন রাযী : ৫০৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন মুহাম্মদ ইব্ন উমার ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী কারাশী তায়মী-বকরী আবুল মাআলী আবূ আবদুল্লাহ্ ওরফে ফখর রাযী। তিনি ইব্ন খতীব আর-রায় নামেও পরিচিতি ছিলেন। তিনি শাফেঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফিক্হবিদ ছিলেন। বড় ছোট মিলিয়ে প্রায় দু'শত গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। আততাকসীরুল হাফিল, আল মাতা-নিবুল আলিয়া, আল মাবাহিছুশ শরকিয়্যাহ, আল আরবাঈন, আল মাহসূল প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একটি বৃহদাকৃতি পাণ্ডুলিপিতে তিনি ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনী রচনা করেছেন। এতে বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আরো বহু চমৎকার মন্তব্য পাওয়া যায়। আমি তাবাকাতুশ শাকিইয়্যাহ গ্রন্থে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি। খাওয়ারিযমী সম্রাটগণ এবং অন্যান্য রাজা বাদশাহদের নিকট তাঁর সম্মানজনক অবস্থান ছিল। বিভিন্ন শহরে তাঁর জন্য বহু মাদরাসা নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তিনি নগদ আশি হাজার দীনার স্বর্ণমুদ্রা এবং বহু মূল্যের অন্যান্য ধনরত্নের মালিক ছিলেন। তাঁর মালিকানায় ৫০জন তুর্কী ক্রীতদাস ছিল। বহু রাজা বাদশা উজীর-নাজীর, আলিম-উলামা, গুণীজন ও সাধারণ জনগণ তাঁর ওয়ায মাহফিলে উপস্থিত হত। তিনি বিশেষ কিছু ইবাদত বন্দেগী ও ওযীফা আদায় করতেন। কারমিয়া সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। তিনি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন, তারাও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাঁর মানহানি ও অনিষ্ট সাধনে তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। কালাম শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বলতেন যে, যে ব্যক্তি শায়খদের মাযহাব মেনে চলবে সে সফল কাম হবে। মৃত্যুকালে তাঁর অসিয়তের বিবরণ আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কালাম ও বিতর্ক শাস্ত্র বিশিষ্ট মাযহাব ত্যাগ করে পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণের পথে ফিরে এসেছিলেন। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা আল যায়ল গ্রন্থে তাঁর জীবনী প্রসংগে লিখেছেন তিনি ওয়ায মাহফিলে যেতেন ওয়ায করতেন। কারামিয়াহ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর কঠোর মন্তব্য করতেন এবং তাদের তীব্র সমালোচনা করতেন। তারাও তাঁর বিরুদ্ধে লেগে থাকত সর্বক্ষণ এবং তাঁকে গালি গালাজ করত এবং কুফরী ফতোয়া দিত। কেউ কেউ বলেছেন তারা তাঁকে বিষ পান করিয়ে দেয়ার জন্যে লোক নিয়োগ করে ছিল এবং ওই বিষ পান করে তাঁর মৃত্যু হয়। তাতে কারামিয়া সম্প্রদায় আনন্দ প্রকাশ করে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের সাথে অনৈতিক সম্পর্কের অপবাদ দিয়েছিল। তাঁর ওফাত হয়েছিল যিলহজ্জ মাসে। বস্তুত: তাঁর ব্যক্তি মর্যাদা ও কর্ম অবদান প্রশ্নবিদ্ধ করার কোন অবকাশ নেই।

তবে তিনি ক্ষমতাসীন রাজা বাদশাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতেন এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনে সীমাহীন লালায়িত ছিলেন। এটি তো আলিম উলামাদের নীতি নয়। এজন্যে তিনি সমালোচিত হয়েছেন জঘন্যভাবে। তাঁর কতক অশালীন বক্তব্যের জন্যে সমালোচনা ও বেআদবীর তীক্ষ্ণবানে জর্জরিত হয়েছেন তিনি। যেমন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন قال محمد البادى গ্রামের অধিবাসী মুহাম্মদ (সা) বলেছেন। আর নিজের প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন قال محمد الرازى মুহাম্মদ রাযী বলেছেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘ বর্ণনা দ্বারা প্রতিপক্ষের সংশয় ও সন্দেহমূলক বাক্য প্রতিষ্ঠা করতেন আর স্বল্প ইঙ্গিতে তার উত্তর দিয়ে দিতেন। জীবনীকার বলেন যে, আমি জানতে পেরেছি মৃত্যুকালে তিনি গবাদি পশু, জায়গা জমি ও অন্যান্য সম্পদ ছাড়া শুধু নগদ রেখে গিয়েছিলেন দুই লক্ষ দীনার-স্বর্ণমুদ্রা। মৃত্যুকালে তিনি দুপুত্র সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। এদের প্রত্যেকে চল্লিশ হাজার দীনার করে গ্রহণ করে, তাঁর বড় ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন টাকাশের বডি গার্ড রূপে কাজ করেছিল। ইব্‌নুল আছীর তাঁর আল কামিল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৬০৬ হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খতীব আর রায় ফকীহ, শাফিঈ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা ফখরুদ্দীন রাযী ইনতিকাল করেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে তিনি ইমামুদ্দুনিয়া বা বিশ্ব ইমাম ছিলেন। আমি জেনেছি যে, ৫৪৩ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

إِلَيْكَ إِلٰهَ الْخَلْقِ وَجْهِيْ وَوِجْهَتِيْ * وَأَنْتَ الَّذِيْ أَدْعُوْهُ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ۔

ওহে জগতের ইলাহ্! আমার মুখমণ্ডল আপনার অভিমুখী আমার কিবলাহ আপনি। আপনিই সেই মহান সত্বা গোপনে ও প্রকাশ্যে আমি যাকে ডাকি।

وَأَنْتَ غِيَاثِيْ عِنْدَ كُلِّ مُلِمَّةٍ * وَأَنْتَ مَلَاذِيْ فِيْ حَيَاتِيْ وَفِيْ قَبْرِيْ۔

প্রত্যেক সংকটে আপনি আমার উদ্ধারকারী ইহজগতে ও পরজগতে আপনিই আমার আশ্রয়স্থল ইব্‌ন সাঈ ইয়াকূত হামাভী থেকে ফখরুদ্দীনের এক পুত্রের বরাতে ফখরুদ্দীন থেকে বর্ণনা করেছেন :

تَتِمَّةُ أَبْوَابِ السَّعَادَةِ لِلْخَلْقِ * بِذِكْرِ جَلَالِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْحَقِّ۔

জগতের জন্যে সৌভাগ্যের পূর্ণতা হল একক অদ্বিতীয় ও মহামহিম আল্লাহ্‌র যিকর করা।

مُدَبِّرُ كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ بِأَسْرِهَا * وَمُبْدِعُهَا بِالْعَدْلِ وَالْقَصْدِ وَالصِّدْقِ۔

সকল সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী ও পরিচালনাকারী এককভাবে তিনিই। সততা, যথার্থ এবং পরিমাণ মত এগুলোর স্রষ্টাও তিনি।

أَجَلَّ جَلَالُ اللّٰهِ عَنْ شِبْهَةِ خَلْقِهٖ * وَانْصُرْ هٰذَا الدِّيْنَ فِي الْغَرْبِ وَالشرق۔

আপনি সৃষ্টি জগতের সাথে তুলনীয় হওয়া থেকে মহান আল্লাহ্‌র অবস্থান বহু ঊর্ধ্বে, তোমরা প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য কর।

إِلٰهٌ عَظِيْمُ الْفَضْلِ وَالْعَدْلِ وَالْعُلٰى * هُوَ الْمُرْشِدُ الْمُغْوِيْ هُوَ الْمُسْعِدُ الْمُشْقِيْ۔

তিনি ইলাহ, মাবূদ, তাঁর সম্মান ন্যায়পরায়ণতাও মর্যাদা সুমহান। তিনি হিদায়াতদাতা, তিনি গোমরাহকারী, তিনি সৌভাগ্য দানকারী এবং তিনি দুর্ভাগ্য দানকারী।

ফখরুদ্দীন রাযী এই কবিতাও আবৃত্তি করতেন :

وَاَرْ وَاُحُنَا فِىْ وَحْشَةٍ مِنْ جُسُوْمِنَا * وَحَاصِلُ دُنْيَانَا اَذًى وَّوَبَالٍ۔

আমাদের রূহগুলো আমাদের দেহে অবস্থিত থাকে। আমাদের দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডের ফলাফল দুঃখ-কষ্ট ও দায় বহনের গ্লানি।

وَلَمْ تَسْتَفِيْدَ مِنْ بَحْثِنَا طُوْلُ عُمْرِنَا * سِوَى اَنْ جَمَعْنَا فِيْهِ قِيْلَ وَقَالُوْا۔

আমাদের দীর্ঘজীবনের পাঠ থেকে আমরা কোনো কল্যাণই অর্জন করতে পারিনি। আমরা শুধু খোশগল্পের বোঝাই বৃদ্ধি করেছি।

এরপর তিনি বলতেন যে, আমি তর্কশাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এগুলো কোনো কোনো পিপাসার্ত ব্যক্তির জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করতে পারে না। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করতে পারে না। মুক্তির নিকটতম পথ পেয়েছি আমি কুরআনের পথ। কুরআন মজীদে আমি অন্যতম ইতিবাচক আয়াত পেয়েছি اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (দয়াময়, আরশে সমাসীন, সূরা তাহা : ৫) এবং اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (তারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে, সূরা ফাতির : ১০), আর অন্যতম নেতিবাচক আয়াত পেয়েছি لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, সূরা শূরা : ১১) এবং هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا (তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকে জান? সূরা মারয়াম : ৬৫)।

৬০৭ হিজরী সনে (১২১১ খ্রি.)

শায়খ আবূ শামাহ উল্লেখ করেছেন যে, এই হিজরী সনে মুসেল সিনজার, ইববাল উপদ্বীপের শাসনকর্তাগণ, হালবের শাসনকর্তা যাহির এবং রোম-সম্রাট সকলে এমনিভাবে সুলতান আদিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর রাজ্য দখল করাই হল তাদের উদ্দেশ্য। তাছাড়া রোমান অধিপতি কিংজার ইব্ন কালজ আসালানের নামে খুতবা পাঠ করাও তাদের লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধকৌশল হিসেবে তারা কুর্জ সম্প্রদায়কে খিলাত রাজ্য অবরোধের আহবান জানায়। খিলাতের শাসনকর্তা ছিলেন আদিল পুত্র আওহাদ। এটি তো আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সীমালংঘন। কুর্জ সম্প্রদায় তাদের শাসনকর্তা ইওয়ানীকে নিয়ে অগ্রসর হয় এবং খিলাত রাজ্য অবরোধ করে। শাসনকর্তা আওহাদ তখন মহাসংকটে পতিত হন। তিনি বলেন এ যে, বড় দুঃসময়, এদিকে মহান আল্লাহ্ একটি সুব্যবস্থা করে দিলেন। রবিউল আখির মাসের ৯ তারিখ ওদের অবরোধ কঠোর রূপ লাভ করল। তাদের শাসনকর্তা ইওয়ানী তাঁর অশ্বে আরোহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পায়চারী করছিল। হঠাৎ তার অশ্ব যুদ্ধ কৌশল হিসেবে খননকৃত এক পরিখার মধ্যে পড়ে যায়, তাতে নগরবাসী লোকজন দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে বন্দী করে ফেলে। ফলে কুর্জ সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ করে। ইওয়ানীকে সুলতান আওহারের সম্মুখে হাজির করা হয়। তিনি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং তার সাথে সদাচরণ করেন। তিনি কতক শর্ত সাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব করেন। শর্তগুলো হল দু'লক্ষ দীনার মুক্তিপণ পরিশোধ করা, দু'হাজার মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দেয়া, আওহাদের

রাজ্যের নিকটবর্তী ২১টি দূর্গ হস্তান্তর করা, তার কন্যাকে আওহাদের ভাই আশরাফের নিকট বিয়ে দেয়া এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আওহাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়া। কুর্জ-শাসনকর্তা ইওয়ানী এ শর্তগুলো মেনে নেয় এবং শপথ সহকারে এগুলো পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরপর আওহাদ এগুলো অনুমোদনের জন্যে তাঁর পিতা আদিলের নিকট প্রেরণ করেন। এই ক্রান্তি লগ্নে সুলতান আদিল সরাসরি যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিলেন। এ সংকটময় মুহূর্তে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এই সুসংবাদ এল। এটা মূলত তাঁদের শক্তি মত্তায় আসেনি, মহান আল্লাহ্র দয়ায় এমনটি হয়েছে। এতে সুলতান আদিল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং পুত্রের সকল প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়ে দিলেন। দ্রুত এই সংবাদ বিদ্রোহী শিবিরও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী শাসনকর্তাগণ ভয়ে কাবু হয়ে পড়ল এই অপকর্মে একে অন্যকে দোষারোপ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করতে লাগল। সুলতান তাদের ওজর আপত্তি গ্রহণ করলেন এবং দৃঢ়ভাবে চুড়িগুলো নবায়ন করলেন, তখন থেকে রাজ্যে নতুনভাবে শান্তি, স্থিতি ও উন্নয়নের যাত্রা শুরু হল। কুর্জ-শাসনকর্তা আওহাদের দেয়া শর্তগুলো পূরণ করল। আশরাফ তার কন্যাকে বিয়ে করল এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আবূ শামা উল্লেখ করেছেন যে, কুর্জ শাসনকর্তার রাজকীয় জ্যোতিষী নক্ষত্র পর্যালোচনা করে উক্ত ঘটনার একদিন পূর্বে তাকে বলেছিল যে, আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি আগামীকাল আসরের আযানের সময় খিলাত-দূর্গে প্রবেশ করবেন তবে এই পোশাকে নয় অন্য পোশাকে। বস্তুত ঘটনা তাই ঘটেছিল আসরের আযানের সময় শাসনকর্তা ইওয়ানী খিলাত দূর্গে প্রবেশ করেছিলেন বন্দী অবস্থায়।

মুসেল সম্রাট নূরুদ্দীনের মৃত্যু : মুসেল অধিপতি সুলতা নূরুদ্দীন শাহ ইব্ন ইজ্জুদ্দীন মাসঊদ ইব্ন কুতুবুদ্দীন মাওদূদ জঙ্গী সুলতান আদিলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ৩০ হাজার দীনার দেনমোহর ধার্য্য করে বিয়ে কবুল করার জন্যে তিনি তাঁর উকীলকে প্রেরণ করেন সুলতান আদিলের দরবারে। উক্ত উকীল পথে থাকা অবস্থায় সুলতান নুরুদ্দীন ইনতিকাল করেন। উকীল তা জানতে পারেনি। ফলে উকীল রাজ দরবারে এসে বিয়ে সম্পন্ন করে। বস্তুত এই বিয়ে সম্পন্ন হয় সুলতান নুরুদ্দীন মৃত্যুর পর। ঐতিহাসিক ইব্নুল আছীর তাঁর আল কামিল গ্রন্থে সুলতান নুরুদ্দীনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সাহসের ইতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সুলতানের শাসনকাল ছিল ১৭ বছর ১১ মাস। পক্ষান্তরে, আবুল মুযাফফর সিবত সুলতানকে একজন জালিম, স্বৈরাচারী, কৃপণ ও রক্ত পিপাসুরূপে চিত্রিত করেছেন। মহান আল্লাহই ভাল জানেন। সুলতান নুরুদ্দীনের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আল যাহির ইজ্জুদ্দীন মাসঊদ সিংহাসনে আরোহণ করে। সে তার রাষ্ট্রীয় কাজ কর্মের ভার তার ক্রীতদাস বদরুদ্দীন লুলুর হাতে অর্পণ করে। পরবর্তীতে বদরুদ্দীন লুলু নিজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়।

আবূ শামা বলেছেন, এই হিজরী সনে ৭ শাওয়াল জায়নামায বা ঈদগাহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পথচারী ও গবাদি পশু পদচারণা থেকে রক্ষার জন্যে ময়দানের চারিদিকে চারটি উঁচু দেয়াল তৈরী করা হয়। কিবলার দিকে পাথরের একটি মিহরাব ও একটি মিম্বার তৈরী করা হয়। এর উপরে একটি গম্বুজ বানানো হয়। এরপর ৬১৩ হিজরী সনে এটির কিবলার দিকে দুটো মিনার তৈরী করা হয় এবং একটি কাঠের মিনার বানানো হয়। এটির জন্যে একজন খতীব ও দুজন

বেতনধারী ইমাম নিয়োগ করা হয়। অবশ্য দ্বিতীয় মিনারটি নির্মাণ সম্পন্ন হবার পূর্বে সুলতান আদিলের ওফাত হয়। এ কাজগুলো মন্ত্রী সাফী ইব্‌ন শাকারের তত্ত্বাবধানে হয়েছে।

এই হিজরী সনের ২ শাওয়াল উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাগুলো ডাকবক্সের দিক থেকে সংস্কার শুরু করা হয়েছিল। পুরাতন দরজাগুলো বাদ দিয়ে হলুদাভ পিতলের দরজা লাগানো হয়েছিল। এই হিজরী সনে পানির ফোয়ারা, বাগান ও পানি শোধনাগারের সংস্কার করা হয়েছিল। সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে একজন বেতনভুক্ত ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই মসজিদের প্রথম ইমাম হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নাকীস আল মিশরী। তাঁকে জামে মসজিদের চোঙ্গা (হর্ণ) বলা হত। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ এবং মধুর। তিনি যখন শায়খ আবূ মানসূরের দরসে হাদীস পাঠ করতেন তখন বহুলোক সেখানে জড়ো হয়ে যেত। ৫০৭ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে সম্রাট কুবরুস ওরফে ইলয়ানের নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী আক্কা থেকে সমুদ্র উপকূলবর্তী দিময়াতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা রাতে নগর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং নগরের একাংশে লুটতরাজ চালায়। সেখানে খুন-খারাবী ও জনগণকে বন্দী করে। ওই রাতেই তারা নিজ শিবিরে ফিরে আসে। প্রতিরোধ বাহিনী তাদেরকে ধরতে পারেনি, অবশ্য ইতিপূর্বেও তারা এমনটি করেছিল। অন্য কেউ এরূপ করতে পারেনি কখনো।

এই হিজরী সনে ফ্রাংক সম্প্রদায় বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। সুলতান আল-মুআয্‌যাম তাদের প্রতিরোধে অগ্রসর হন। এই হিজরী সনে শায়খ আবুল মুযাফফর শামসুদ্দীন ইব্‌ন কারূর আল-হানাফী ওয়ায ও নসীহতের মজলিস পরিচালনা শুরু করেন। তিনি শায়খ ইব্‌নুল জাওযীর চতুর্থ কন্যার পুত্র এবং মিরআতুয যামান গ্রন্থের রচয়িতা। প্রভুত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর চেহারা আকর্ষণীয় এবং কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল। তিনি ওয়ায করতেন চমৎকার। তাঁর নানার উসিলায় জনগণ তাঁকে খুবই স্নেহ করত। তিনি বাগদাদ থেকে একবার দামেস্কে গমন করেন। সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাঁকে সসম্মানে বরণ করে নেয়। সেখানে তিনি কিছুদিন শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। প্রতি শনিবার তিনি হযরত আলী ইব্‌ন হুসায়ন যায়নুল আবেদীনের মাযারের ফটকে ওয়ায-মাহফিল অনুষ্ঠান করতেন। বহুলোক তাঁর মাহফিলে যোগ দিত। আশেপাশের আঙ্গিনা প্রাঙ্গন শ্রোতায় ভরে যেত। কোন কোন দিন নারী পুরুষ মিলিয়ে শ্রোতার সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছত। লোকজন শনিবার রাতটি মসজিদে কাটাত। বিভিন্ন দু'আ কালাম ও খতম-যিকরে রাত অতিবাহিত করত যাতে ওয়ায মাহফিলে বসার জায়গা পায়। তাঁর ওয়ায শেষ হলে তারা নিজ নিজ বাসস্থানের দিকে রওয়ানা করত। তখন তাদের মুখে শুধু তাঁর কথাই উচ্চারিত হত। শায়খ এমনটি বলেছেন, আমি শায়খকে এমন বলতে শুনেছি ইত্যাদি। এতে তারা সৎকর্মে উৎসাহিত হত আর মন্দকাজ থেকে বিরত থাকায় শিক্ষা পেত। সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও তাঁর মাহফিলে উপস্থিত হতেন। শায়খ তাজুদ্দীন আবু ইয়ামান কিন্দী ও তাঁর মাহফিলে উপস্থিত হতেন। মাযারের পাশে গম্বুজের নীচে তিনি বসতেন। স্থানীয় শাসনকর্তা মুতামিদ, বারর্ এর শাসনকর্তা ইব্‌ন তামীরক সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ামত সেখানে আসতেন। রবিউল আউয়াল মাসের ৫ তারিখ শনিবার তিনি মাহফিলে বসে শ্রোতাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। এবং তাঁর সংগৃহীত তাওবাকারীদের কর্তিত চুল মাহফিলে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। তিনি ওই চুলগুলোকে বিভিন্ন আকারে ভাঁজ করে

রাখেন যাতে সেগুলো দেখে মানুষ উত্তেজিত হয়। চুলগুলো উপস্থিত করা হল। এগুলো দেখে মানুষ এক গগন বিদারি আর্ত-চীৎকার দিয়ে উঠল। শোকে তারা ভীষণভাবে কান্নাকাটি করল এবং ওই রকম করে নিজেদের চুল কেটে নিল। মজলিস শেষে তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলে শাসনকর্তা মুবাদিরুদ্দীন মুতামিদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। মুতামিদ একজন ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি শায়খকে সাথে নিয়ে তাঁর বাহনে উঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁর চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। তিনি আল-ফারজ দরজা দিয়ে সেখান থেকে বের হলেন এবং ঈদগাহে রাত কাটালেন। পরদিন সকালে আল কাসওয়ার উদ্দেশ্যে বাহনে সাওয়ার হলেন। বহুলোক তাঁরা সাথী হল। তারা সকলে জিহাদের নিয়তে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে ছুটছিল। তাঁর সাথে যুমলাকার পক্ষ থেকে ৩০০জন যোদ্ধা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আফয়াক গিরি ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলাম। সেখানে ফ্রাংকদের দোর্দাণ্ড প্রতাপ। তাদের ভয়ে শূন্যে পাখি ওড়ার সাহস নেই। আমরা যখন নাবলুস পৌঁছলাম শাসনকর্তা মুআয্‌যাম আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। বর্ণনাকারী বলেন ইতিপূর্বে তাঁর সাথে কখনো আমার সাক্ষাত হয়নি। তিনি তাওবাকারীদের বিভিন্ন আকারের চুল রাশি সেগুলোকে চুম্বন ও চোখে মুখে লাগাতে শুরু করেন। আবেগে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠেন। প্রতিপক্ষের সাথে শায়খ আবুল মুযাফফর নাবলুসে সম্মুখ যুদ্ধে মিলিত হবার একটি তারিখ নির্ধারণ করলেন। মুসলমানদেরকে তিনি জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন। বস্তুত ওই দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। যথাসময়ে শায়খ আবুল মুযাফফর তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে ফ্রাংকদের দিকে যাত্রা করলেন। শাসনকর্তা মুআযযাম ও তাঁর সাথে ছিল। যুদ্ধ শুরু হল মুসলমানগণ ফ্রাংক সম্প্রদায়ের বহু লোককে হত্যা করল এবং ওদের প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করে নিরাপদে ফিরে এল। শাসনকর্তা মুআয্‌যাম তূর পর্বতে শীষ ঢালাই এবং ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে আক্রমণে সহযোগিতা পাবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করলেন। এতে তাঁর বহু অর্থ ব্যয় হয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রাংকগণ সুলতান আদিলের নিকট আত্মসমর্পণ করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেয়। সুলতান তাদের আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদ করেন মুআয্‌যামের বহু টাকা ব্যয়ে নির্মিত দূর্গ ও প্রাচীর ভেঙ্গে দেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৬০৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ আবূ উমার : তিনি কুরআনী জ্ঞানান্বেষী দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্যে সাফ্‌হ কাসিয়ূন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশপরিচয় হল মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ শায়খ আবূ উমার মুকাদ্দেসী। তিনি শায়খ মুওয়াফ্‌ফিকুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামার ভাই। আবূ উমার কিন্তু মুওয়াফ্‌ফিকুদ্দীনের চাইতে বয়সে বড়। কারণ, তিনি ৫২৮ হিজরী সনে সাবিয়া নগরীতে কারো কারো মতে জামাঈল নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ আবূ উমার তাঁকে লালন পালন করেন এবং তাঁকে বিয়ে দেন। তিনি তাঁর সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর নিতেন। বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকা থেকে এসে তাঁরা মসজিদে আবূ সালিহ-তে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে সাফ্‌হ অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে তখন

দিয়ার আল-হাওরানী ব্যতীত কোনো দালান কোঠা ছিল না। তিনি বলেন মসজিদে আবূ সালিহি-তে অবস্থান করার কারণে আমাদেরকে সালিহীন নামে ডাকা হত। আমরা মূলতঃ সালিহ ও সৎকর্মশীল বলে নয়। আমাদের পরিচিতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওই এলাকা সালিহিয়্যাহ নামে পরিচিত হয়। শায়খ আবূ উমার সেখানে আবূ আমরের পাঠ রীতিতে কুরআন মজীদ পাঠ করেন এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে আল-খারকী রচিত মুখতাসার গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন। এরপর তাঁর ভাই মুওয়াফ্‌ফিক ওই গ্রন্থটির ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন এবং নিজ হাতে তা লিখেন। তিনি ইমাম রাগভী (র)-এর তাফসীর, আবূ নুআয়মের হলিয়্যাহ এবং ইব্‌ন বাত্‌তার ইবানাহ গ্রন্থটি ও নিজ হাতে লিখেন। তিনি তাঁর নিজের পরিবারের জন্যে এবং জনগণের কল্যাণে কুরআন করীমের অনেক পাণ্ডুলিপি বিনা পারিশ্রমিকে নিজ হাতে লিখে বিতরণ করেন। তিনি প্রচুর ইবাদত বন্দেগী, সংযম ও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি আজীবন রোযা রাখতেন এবং সব সময় হাসি-মুখ হয়ে থাকতেন। প্রতিদিন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কুরআন মজীদের $\frac{১}{৭}$অংশ করে তিলাওয়াত করতেন। চাশতের নামায আদায় করতেন আট রাকআত। তাতে এক হাজার বার সূরা ইখলাস বা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করতেন। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার "মাগারাত-আদদম" যিয়ারতে যেতেন। যাবার পথে ফকীর মিসকীন ও ইয়াতীম-বিধবাদেরকে দান দক্ষিণা করে যেতেন, তিনি কোন হাদিয়া তোহফা ও উপহার-উপঢৌকন পেলো নিজের পরিবার-পরিজন ও ফকীর-মিসকীনদেরকে দিয়ে দিতেন। পোশাক-আশাকে তিনি ছিল একেবারেই সাদাসিধে। অনেক সময় দিনের পর দিন চলে যেত তিনি পায়জামা ও ভাল জামা পরিধান করতেন না। নিজের থেকে কখনো কখনো তিনি সাদকা করে দিতেন কিংবা মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় কমতি হলে তা পূর্ণ করে দিতেন। তিনি, তাঁর ভাই, তাঁর খালাতহ ভাই হাফিয আবদুল গণি এবং তাঁর ভাই শায়খ ইমাদ ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সুলতান সালাহুদ্দীনের সমর অভিযানে সব সময় অংশ নিতেন। বায়তুল মুকাদ্দাস বিষয়ে, নদী উপকুল দখল এবং অন্যান্য বিজয় অভিযানে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন। একদিন সুলতান আদিল শায়খ আবূ উমারের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে তাঁদের খাস কামরায় আগমন করেন। আবূ উমার তখন নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। সুলতানের আগমনে তিনি নামায সংক্ষিপ্তও করেননি ছেড়েও দেননি। সুলতান এক জায়গায় বসে পড়লেন। আর উমার তাঁর নির্ধারিত নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুলতানের দিকে একবারও তাকায়নি। জনৈক দানশীল ও বিত্তশালী ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় তিনি জামে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। ছাদ পর্যন্ত দেয়াল উঠার পর ওই অনুদান শেষ হয়ে যায়। এরপর আরবাল-সম্রাট মুযাফফর কুকরী একটি অনুদান প্রদান করেন এবং তাদ্দারা অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হয়। শায়খ আবূ উমার ওই মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন। তিনি ওই মসজিদে খুতবা দিতেন। তাঁর পরনে থাকত সাধারণ পোশাক। তার চোখে মুখে দেখা যেত খোদাভীতি ও পরহেযগারীর জ্যোতির্ময় আভা। "খুলে যাওয়া মিশক-আম্বরের ঘ্রাণ আপনি লুকাবেন কীভাবে"? ওই মসজিদের মিম্বরে ওঠার জন্যে ছিল তিনটি ধাপ আর চতুর্থ ধাপ ছিল বসার জন্যে। নবী করীম (সা)-এর মিম্বরও তেমন ছিল। আবুল মুযাফফর বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি শায়খ আবূ উমারের ওই মসজিদে জুমার নামাযে উপস্থিত হন। সেদিন সেখানে শায়খ আবদুল্লাহ বুতানীও উপস্থিত ছিলেন। শায়খ আবূ উমার খুতবার শেষ প্রান্তে সুলতানের

জন্যে দু'আ করার সময় বললেন "আল্লাহুম্মা আসলিহ আবদাকা আল আদিল সায়ফাদ্দীন আবা বকর ইব্ন আইয়ূব" অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আপনার বান্দা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ সায়ফুদ্দীন আবূ বকর ইব্ন আইয়ূবকে সংশোধন করে দিন।" এ কথা শুনে শায়খ আবদুল্লাহ বুতানী ক্ষুব্ধ হয়ে হাতে জুতা জোড়া নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন এবং জুমার নামাযই ছেড়ে দিলেন। নামায শেষে আমরা শায়খ বুতানীর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট জানতে চাইলাম যে, কেন তিনি আবূ উমার শায়খের প্রতি রাগ করেছেন। তিনি বললেন যে, শায়খ আবূ উমার ওই জালিম সুলতানীকে আদিল ও ন্যায়পরায়ণ বলতে আমি রাগ করেছি এবং তার পেছনে নামায পড়িনি। বর্ণনাকারী বলেন আমরা এই আলাপচারিতায় থাকা অবস্থায় শায়খ আবূ উমার সেখানে হাজির হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি রুটি ও দু'টো শসা। তিনি রুটিটি ছিড়লেন এবং বললেন, শায়খ! নামাযের কী হল? এরপর তিনি বললেন, পারস্য সম্রাট সম্পর্কে মন্তব্য করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন بُعِثْتُ فِيْ زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ كِسْرٰى আমি ন্যায়পরায়ণ পারস্য সম্রাট কিসরার যুগে প্রেরিত হয়েছি। তার কথা শুনে শায়খ বুতানী স্বস্তির হাসি হাসলেন এবং হাত বাড়িয়ে রুটি নিয়ে তা খেলেন। এরপর শায়খ আবূ উমার চলে গেলেন। তাঁর প্রস্থানের পর শায়খ বুতানী আমাকে বললেন, ওহে মুরব্বী শুনুন, এই লোক নিশ্চয়ই খুব ভাল মানুষ। আবূ শামাহ বলেন শায়খ বুতানী শীর্ষস্থানীয় সৎ-মানুষ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। শায়খ আবূ উমারের দশ বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। শায়খ আবূ উমার শীর্ষস্থানীয় পরহেযগার ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সুলতান সম্পর্কে তাঁর শিথিল বক্তব্য তিনি মেনে নেননি। তাঁর জুমুআ ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে বলা যায় যে, হয়ত তখন তিনি মুসাফির ছিলেন। মুসাফিরের জন্যে জুমুআ আদায় করা অত্যাবশ্যক নয়। আর শায়খ উমার ও ওযর পেশ করে বলেছেন যে, তিনি আদিল শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত করেননি বরং সেটি 'সম্মানিত' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন কথার কথা বলা হয় সালিম (নিরাপদ), গানিম (গণিমত অর্জনকারী), মাসঊদ (ভাগ্যবান) ও মাহমূদ (প্রশংসিত)। ক্ষেত্র বিশেষে এই জাতীয় শব্দগুলো তার বিপরীত অর্থ প্রদান করে। অনুরূপভাবে 'আদিল' শব্দটি ও রাজা বাদশাহ ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের উপাধিরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় শামসুদ্দীন (দীনের সূর্য), বদরুদ্দীন (দীনের পূর্ণিমা চাঁদ) তাজুদ্দীন (দীনের মুকুট) ইত্যাদি। শাফিঈ, হাম্বলী শব্দও এভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ইমামের কর্ম ও আদর্শের পরিপন্থী কাজ করলেও সে ওই ইমামের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজেকে শাফিঈ হাম্বলী বলে জাহির করে। আদিল শব্দটিও বহু অর্থবোধক। আল্লাহ্ ভাল জানেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, শায়খ আবূ উমার যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন মূলত তার কোনো ভিত্তিও গ্রহণযোগ্য উৎস নেই। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে ও এটি পাওয়া যায় না। শায়খ আবুল মুযাফফর এবং আবূ শামাহ্ কর্তৃক এই হাদীস গৃহীত হওয়া সত্যিই বিস্ময় কর। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এরপর আবুল মুযাফফর তাঁর গ্রন্থে শায়খ আবূ উমারের গুণাবলী, গৌরব গাঁথা, কারামত এবং তাঁর নিজের চোখে দেখা ও অন্যান্যদের দেখা সৎকর্মাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন শায়খ সৎ আবূ উমার চরিত্র ও আদর্শে পূর্বসূরী বুযুর্গ ব্যক্তিদের অনুসারী ছিলেন। শুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও কিতাব-সুন্নাহ পালনে সুদৃঢ় ছিলেন। বেদআতীদের সংস্পর্শে যেতে তিনি নিষেধ করতেন। যে সকল পূণ্যবান মানুষ প্রিয়নবী (স)-এর সুন্নতের অনুসারী

তাঁদের সংস্পর্শে থাকার নির্দেশ দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে এই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন—

أُوصِيكُمْ بِالْقَوْلِ فِي الْقُرْآنِ * بِقَوْلِ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْإِتْقَانِ۔

আমি তোমাদেরকে কুরআনের বাণী অনুসরণের অসিয়ত করে যাচ্ছি। সত্যপন্থীও সত্যে অবিচল ব্যক্তিবর্গের কথা মেনে চলার উপদেশ দিচ্ছি।

لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا بِفَانٍ * لٰكِنَّ كَلَامَ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ۔

এই কুরআন সৃষ্ট নয়। এটি ধ্বংসযোগ্যও নয়। বরং এটি মহাবিচারক-সর্বাধিপতি মহান আল্লাহ্র কালাম ও বাণী।

آيَاتُهُ مُشْرِقَةُ الْمَعَانِيْ * مَتْلُوَّةٌ لِلّٰهِ بِاللِّسَانِ۔

এটির আয়াতগুলোর মর্ম দেদীপ্যমান, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুখে এটি তিলাওয়াত করা হয়।

مَحْفُوظَةٌ فِي الصَّدْرِ وَالْجِنَانِ * مَكْتُوبَةٌ فِي الصُّحُفِ بِالْبَنَانِ۔

এই কুরআন সংরক্ষিত আছে বক্ষে ও হৃদয়ে হাতে অংকিত ও লিপিবদ্ধ করা আছে গ্রন্থে।

وَالْقَوْلُ فِي الصِّفَاتِ يَا إِخْوَانِيْ * كَالذَّاتِ وَالْعِلْمِ مَعَ الْبَيَانِ۔

ভাইগণ! স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতায় এই বাণী মহান আল্লাহ্র সত্তা ও জ্ঞানের ন্যায় উজ্জ্বল।

إِمْرَادُهَا مِنْ غَيْرِ مَا كُفْرَانِ * مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ وَلَا عُطْلَانِ۔

এটিকে চলমান রাখবে, অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করবে না। রূপকথা প্রদান ও অস্তিত্ব হীনতার ধারণা বাদ দিয়ে এটির অবস্থান নিশ্চিত করবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন :

أَلَمْ يَكُ مُلْهَاةً عَنِ اللَّهْوِ أَنَّنِيْ * بَدَا لِيْ شَيْبُ الرَّأْسِ وَالضُّعْفِ وَالْأَلَمِ۔

আমার সফেদ বর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, দেহে দুর্বলতা ও ব্যথা বেদনা দেখা দিয়েছে এটি আমাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে এবং আমোদ প্রমোদ থেকে বারণকারী নয়?

أَلَمَّ بِيَ الْخُطْبُ الَّذِيْ لَوْ بَكَيْتُهُ * حَيَاتِيْ حَتّٰى يَذْهَبَ الدَّمْعُ لَمْ أَلَمْ۔

আমার উপর এত বালা মুসিবত এসেছে যে, সেগুলোর যন্ত্রণায় আমি যদি জীবনভর কেঁদে কেঁদে চোখের পানি শেষ করে দিই তবুও সেগুলো দূর হবে না।

তিনি বলেন একপর্যায়ে কি শায়খ আবূ উমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকদিন এভাবে কেটে যায়। তিনি এ সময়েও কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন দু'আ-কালাম ও ওযিফার সামান্যও ছেড়ে দেননি। অবশেষে চলতি হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ২৯ তারিখ মঙ্গলবার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন। গৃহাঙ্গনে তাঁকে গোসল দেয়া হয় এবং তাঁর সমাধিস্থলে নেয়া হয়। অসংখ্য-অগণিত লোক তাঁর জানাযায় শরীক হয়। আমীর-উমারাহ, আলিম-উলামা ও সুলতান সম্রাটসহ রাজ্যের প্রায় সকল মানুষ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। এই দিবস ছিল স্মরণীয় দিবস। প্রচণ্ড গরমের দিনও ছিল বটে। কিন্তু দেখা গেল একখণ্ড মেঘ এসে মানুষকে ছায়া দিচ্ছে। ওই মেঘ খণ্ড থেকে মৌমাছির ন্যায় গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। মানুষ তাঁর কাফনের অবশিষ্টাংশ এবং ব্যবহৃত

অন্যান্য জামা কাপড় উচ্চ মূল্যে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছিল। সাহিত্যিক ও কবিগণ বিয়োগান্তক ভাষায় তাঁর শোকগাথা রচনা করল। তাঁকে নিয়ে অনেকে ঘুমের মধ্যে শুভ স্বপ্ন দেখেছিল। মৃত্যুকালে তিনি তিনটি পুত্র সন্তান রেখে যান। একজন হলেন উমার তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে আবূ উমার বা উমারের পিতা বলা হত। একজন হলেন শারফ আবদুল্লাহ। পিতার মৃত্যুর পর ইনি খতীবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ইজ্জ আহমদের পিতা। একজন হলেন আবদুর রহমান। শারফ আবদুল্লাহ এর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুর রহমান খতীবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এই তিনজন হলেন আবূ উমারের পুত্র সন্তান। মৃত্যুকালে তিনি একাধিক পূণ্যবতী কন্যা সন্তান রেখে যান। তারা সকলে ভাল ঈমানদার, ইবাদতকারী ও আনুগত্যশীলা ছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মহান আল্লাহ্ বলেছেন مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَّأَبْكَارًا (আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী, সূরা তাহরীম : ৫)। আবুল মুযাফফর আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কবর মাগারাহ আলজূ এর পথে দিয়ার-ই-হাওরানীর বিপরীত গলিতে অবস্থিত।

শায়খুল হাদীস ইব্ন তাবারযাদ : তিনি হলেন উমার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মামার ইব্ন ইয়াহয়া ওরফে আবূ হাফস ইব্ন তাবারযাদ বাগদাদী দারাকায্যী। ৫১৫ হিজরী সনে তাঁর জন্ম। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং অনেক ছাত্র-শিষ্যকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি একজন তেজস্বী, মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি ছিলেন। দার আল-কায্য মাদরাসায় তিনি বাচ্চাদেরকে আদব-কায়দা ও ইসলামী কৃষ্টি-কালচার শিক্ষা দিতেন। মুকাব্বির হাম্বল ইব্ন আবদুল্লাহ-এর সাথে তিনি দামেস্ক আগমন করেছিলেন। সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁদের দুজনের সান্নিধ্যে এসে হাদীস শিক্ষা করে। এই সফরে তাঁরা অনেক ধন-সম্পদ অর্জন করেন। এরপর তাঁরা দুজনে বাগদাদ ফিরে যান। ৬০৩ হিজরী সনে হাম্বল ইনতিকাল করেন। আর ইনি আরো কয়েক বছর বেঁচে থেকে এই হিজরী সন অর্থাৎ ৬০৭ হিজরী সনের ৯ রজব ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি অনেক ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর কোনো ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী ছিল না। সেগুলো বায়তুল মালে জমা হয়। তাঁকে "আল হারব" ফটকে দাফন করা হয়।

সুলতান আরসালান শাহ : তিনি মুসেলের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর নাম নুরুদ্দীন। তিনি নুরুদ্দীন শহীদের ভাই। তাঁর কিছু জীবন বৃত্তান্ত আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কেউ শাফিঈপন্থী ছিল না। শাফিঈ মাযহাবের শিক্ষক ও প্রচার-প্রসারের জন্যে তিনি মুসেলে একটি বৃহৎ মাদরাসা স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর সমাধি। ৬০৭ হিজরী সনের সফর মাসে রবিবার রাতে তাঁর ওফাত হয়।

ইব্ন সাকীনা আবদুল ওহাব ইব্ন আলী : তাঁর উপাধি জিয়াউদ্দিন। তিনি সূফী ইব্ন সাকীনাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে আবদাল বলে গণ্য করা হত। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। একাধিক শহরে নগরে সফর করে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। ৫১৯ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। আবুল ফারাজ ইব্ন জাওযীর শিষ্য ছিলেন তিনি। তাঁর মজলিসগুলোতে নিয়মিত

উপস্থিত থাকতেন। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচুর উপস্থিতির কারণে তাঁর জানাযার দিনটি একটি স্মরণীয় দিনে পরিণত হয়েছিল।

মুযাফফর ইব্‌ন সাসীর : ৬০৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন মুযাফফর ইব্‌ন সাসীর। তিনি বাগদাদের অধিবাসী এবং বিশিষ্ট ওয়ায়েজ ও সূফী সাধক ছিলেন। ৫২৩ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন স্থানে, মসজিদসমূহে এবং পাড়ায় মহল্লায় গিয়ে গিয়ে তিনি মানুষকে ওয়ায় নসীহত শোনাতেন। স্বভাবত তিনি খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি এসে চুপি চুপি তাঁকে বলল, "আমি অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত। তিনি বললেন, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পাঠ কর তাহলে বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। একদিন তিনি এক কসাইকে দেখলেন যে, সে খারাপ গোশত বিক্রি করছে আর চীৎকার দিয়ে বলছে" কসম করলে ঠকবে না এবং বিক্রেতার গোশত ক্রয় করার কেউ আছেন কি? তখন তিনি বললেন, তুমি কসম ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তোমার চীৎকার আমলে আনা যাবে না।

তিনি বলেছেন, একদিন আমি ইয়াকূবা নামক স্থানে একটি ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠান করি। আমার জন্যে হাদিয়ার ঘোষণা দিয়ে শ্রোতাদের একজন বলল আমার নিকট শায়খের জন্যে এক নিসফিয়্যাহ বরাদ্দ আছে। অন্য একজন ও তাই বলল। এভাবে প্রায় ৫০ নিসফিয়াহ-এর ঘোষণা শোনা গেল। তখন আমি মনে মনে বললাম আজ রাতের মধ্যে আমি বিত্তশালী হয়ে যাব এবং আমি ব্যবসায়ী হয়ে নিজ শহরে ফিরে যাব। কিন্তু সকালে উঠে দেখি আমার সম্মুখে যবের ছোট্ট একটি স্তূপ, তখন আমাকে বলা হল যে, গত রাতে আপনাকে দেয়া নাসীফাসমূহের সমষ্টি। তখন আমি বুঝলাম যে, নাসীফাহ হল যাবাদিয়্যাহ-এর ন্যায় ওদের একটি পরিমাপ পাত্র।

তিনি বলেছেন যে, একবার বাসিরা নামক স্থানে আমি একটি ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠান করেছিলাম। হাদিয়াস্বরূপ ওরা আমার জন্যে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল। সেগুলো যে কি বস্তু তা রাতে আমার জানা ছিল না। ভোরে উঠে দেখি ওগুলো হল কতগুলো মহিষের শিং ও পশম। ওদের একজন ডেকে ডেকে বলছিল, তোমাদের নিকট শায়খের শিং ও পশম যা আছে সব এনে উপস্থিত কর। তখন আমি বললাম, এগুলোর আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমরা এগুলোকে যা ইচ্ছে করতে পার। আবূ শামাহ এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

৬০৮ হিজরী সন (১২১২ খ্রি.)

এই হিজরী সনের যখন সূচনা হয় তখন সুলতান আদিল তূর অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন তাঁর প্রতিরক্ষা দূর্গ তৈরির জন্যে। এ সময়ে সংবাদ এল যে, আবদুল মুমিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তালীতালাহ্ অঞ্চলে ফ্রাংক সম্প্রদায়কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং বল প্রয়োগে ওদের দেশ জয় করে নেন। ওদের অনেক লোককে তিনি হত্যা করেন। এই হিজরী সনে মিশর ওকায়রোতে এক প্রচণ্ড ভূমি কম্প হয়। বহু বাড়ি ঘর তাতে ভেঙ্গে পড়ে। কুর্ক ও শাবীক অঞ্চলে ভূমিকম্প আঘাত হানে। মাটি চাপা পড়ে বহু মহিলা ও শিশু সেখানে প্রাণ হারায়। দামেস্কের পশ্চিমাঞ্চলে আতিকার সমাধির পাশে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আকাশ থেকে আগুন অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এই হিজরী সনে বাতিনিয়া ইসলামিয়া নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব

হয়। তারা হারাম কর্ম-সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের উপর দণ্ড কার্যকার করে। তারা বহু পাঞ্জেগানা ও জুমা মসজিদ তৈরী করে। সিরিয়ায় অবস্থানরত তাদের সতীর্থদের নিকট তারা এই রীতি-পদ্ধতিতে কার্যক্রম চালিয়ে যাবার লিখিত নির্দেশ প্রদান করে। তাদের নেতা জালালুদ্দীন খলীফাকে তাদের পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করে। ওদের একদল লোক এই হিজরী সনে হজ্জে গমনের উদ্দেশ্যে বাগদাদ আগমন করে। সেখানে ওদেরকে রাজকীয় ভাবে সম্মান জানানো হয়। কিন্তু তারা আরাফাত ময়দানে পৌঁছার পর ওদের একজন মক্কার শাসনকর্তা কাতাদা হুসায়নীর অনুরূপ এক ব্যক্তিকে কাতাদা হুসায়নী মনে করে হত্যা করে ফেলে, ফলে সুদানী এবং ইরাকী অভ্যাগতদের মধ্যে প্রচণ্ড ফিতনা-ফাসাদ ও মারামারি শুরু হয়। ইরাকীদের অনেক ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে যায়। ওদের বহু লোক নিহত হয়। সম্রাট আশরাফ এই হিজরী সনে যাহিরের চাচাত ভাই খিযির ইব্‌ন সালাহুদ্দীন থেকে আল রায়স প্রাসাদটি ক্রয় করে নেন এবং সেটিকে একটি জগত জোড়া চমৎকার ও দর্শনীয় প্রাসাদে রূপান্তরিত করেন। আধুনিককালে সেটি আল-দাহশা প্রাসাদ নামে পরিচিত।

৬০৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ

শায়খ ইমাদুদ্দীন : তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউনুস শাফিঈ মাযহাব পন্থী খ্যাতিমান ফিক্‌হবিদ এবং বহু গ্রন্থ-পুস্তকের রচয়িতা। মুসেলে তিনি শাফিঈ মাযহাবের শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন। নূরুদ্দীন আরসালানের মৃত্যুর পর তিনি রাজকীয় প্রতিনিধিরূপে বাগদাদে প্রেরিত হয়েছিলেন। পানির শুদ্ধতা-বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর মধ্যে ভীষণ সংশয় কাজ করত। ওযূ-গোসলে তিনি প্রচুর পানি ব্যয় করতেন। ধন-সম্পদের যাকাতের ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট সম্পদ পরিশোধের প্রবক্তা ছিলেন। যেমন বলা হত যে, তোমরা তোমাদের পানীয় দ্রব্যের পোকাগুলো (মৌমাছি জাতীয়) সারিবদ্ধভাবে রাখবে এবং বাচ্চাসহ উটগুলো বেঁধে রাখবে। অবশ্য তিনি যদি এর বিপরীত অভিমতটি পোষণ করতেন তবে ভাল হত। একদিন কাযী আলবানের সাথে তাঁর দেখা হয়। কাযী তাঁকে বলল, "সম্মানিত শায়খ! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একটি অঙ্গ ধৌত করতে এক লোটা পানি ব্যয় করে থাকেন তাহলে খাদ্যের যে লোকমা বা গ্রাস মুখে পুরে দেন সেটি ধুয়ে নেন না কেন যাতে আপনার কাল্‌ব ও অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন হয়? তাঁর কথার মর্ম শায়খ নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং ওই অভ্যাস বর্জন করেছিলেন। তিনি ৬০৮ হিজরী সনের রজব মাসে ৭৩ বছর বয়সে মুসেলে ইনতিকাল করেন।

তাজুদ্দীন ইব্‌ন হামদূন : তিনি হলেন আবূ সা'দ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হামদূন। তাযকিরাতুল হামদুনিয়্যাহ্ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তিনি একজন সম্মানিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। বংশ তালিকা বিষয়ক গ্রন্থগুলো এবং অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহে তিনি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। খলীফা আল আদুদী তাঁকে মারিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি মাদায়েন শহরে ইনতিকাল করেন। তাঁর লাশ নিয়ে আসা হয় কুরায়শী গোরস্থানে এবং সেখানে তাঁকে দাফ করা হয়।

রোমান সম্রাট খসরু শাহ : তিনি হলেন খসরু শাহ ইব্‌ন কালাজ আরসালান খান। ৬০৮ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কায়কাবুস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

৬১৫ হিজরী সনে তার মৃত্যুর পর তার ভাই কায়কোবাদ সারিমুদ্দীন বারগুশ আল আদিলী ক্ষমতা গ্রহণ করে। সে তখন দামেস্কে অবস্থিত সেনাছাউনীর উপ-প্রধান ছিল। খসরু শাহ সফর মাসে মৃত্যুবরণ করে এবং মুযাফ্ফরিয়া মসজিদের পশ্চিমে তার সমাধিতে সমাহিত হয়। এই ব্যক্তিই হাফিয আবদুল গণী মুকাদ্দেসীকে মিশরে নির্বাসিত করেছিল এবং তাঁর সম্মুখে নতুন আসার অনুষ্ঠান করেছিল। হাফিয আবদুল গণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ইব্ন যাকী এবং খতীব দাওলাঈ ও ছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন এবং মহান ন্যায়বিচারক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরে গিয়েছেন।

আমীর ফখরুদ্দীন সারাকুস : তাঁকে জাহারকুস বলা হত। সালাহিয়্যাহ সাম্রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি সাফাহের খাতূন সমাধিস্থলের বিপরীতে সারাকুস গম্বুজ তাঁর নামেই পরিচিত। সেখানে তাঁর সমাধিও বটে। ঐতিহাসিক ইব্ন খালিলকান বলেন, কায়রোর কায়সারিয়্যাতুল কুবরা অট্টালিকা তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। এটির উপরি অংশে তিনি ঝুলন্ত মসজিদ ও প্রাঙ্গন তৈরী করেছিলেন একাধিক ব্যবসায়ী ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, সৌন্দর্য, বিশালত্ব ও সুদৃঢ় নির্মাণ শৈলীতে এই প্রাসাদের সাথে তুলনা হতে পারে তেমন কোনো স্থাপনা কোনো শহরে তারা দেখেনি। জাহারকুম শব্দের অর্থ চার ব্যক্তি। তিনি সুলতান আদিলের পক্ষে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন বানিয়াস ও তীনীন প্রদেশে। মৃত্যুকালে তিনি একটি নাবালক পুত্র সন্তান রেখে গিয়েছিলেন। তখন সুলতান আদিল ওই নাবালক ছেলেকে পিতার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন এবং তার জন্যে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন আমির সারিমুদ্দীন কাতলুবা তানিসী। ওই শিশুর মৃত্যুর পর আমীর সারিমুদ্দীন নিজে ওই পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ৬১৫ হিজরী পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন।

শায়খ আবুল কাসিম আবূ বকর : তিনি হলেন মনসূর ইব্ন আবদুল মুনইম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফযল ফারাবী নিশাপুরী তিনি শায়খুল কবির আবুল ফাত্হ নামে ও পরিচিতি ছিলেন। স্বীয় পিতা আবদুল মুনইম প্রপিতামহ মুহাম্মদ এবং অন্যান্য শায়খের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন, ইব্নুস সালাহ ও অন্যরা তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। এই হিজরী সনের শাবান মাসে ৮৫ বছর বয়সে নিশাপুরে তিনি ইনতিকাল করেন।

কাসিমুদ্দীন তুর্কম্যানী আল আকীবী : তিনি নগর প্রশাসকের পিতা ছিলেন। এই হিজরী সনের শাওয়াল মাসে তাঁর ওফাত হয়। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৬০৯ হিজরী সন (১২১৩ খ্রি.)

এই হিজরী সনে ফ্রাংক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে সুলতান আদিল, তাঁর পুত্র কামিল, মুআয্যাম ও ফাইয মিশরের দিময়াতে একত্রিত হন। শীর্ষস্থানীয় সেনাপতি সামাহ আল জাবালী তাঁদের অনুপস্থিতিকে ক্ষমতা দখলের মোক্ষম সুযোগ মনে করল। আজালূন ও কাওকাব সেনাছাউনী তার অধীনে ন্যস্ত ছিল। শহর দুটো কুক্ষিগত করার জন্যে সে দ্রুত দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করে। তার রাষ্ট্রদ্রোহের কথা অবগত হয়ে সুলতান আদিল তদীয় পুত্র মুআয্যামকে তার প্রতিরোধে প্রেরণ করেন। সামাহ আল জাবালী আল কুদস এলাকায় পৌছার পূর্বে মুআয্যাম সেখানে পৌছে যান এবং সামাহ-এর উপর হামলা চালান। তাল

সামলাতে না পেরে সামাহ এবং ইয়াহূদী গীর্জায় আশ্রয় নেয়, সে বৃদ্ধ লোক ছিল এবং নাকরাস রোগে আক্রান্ত ছিল। মুআযযাম তাকে আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানাচ্ছিল নম্রতা ও বিনয়ের সাথে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। এরপর তার যুদ্ধের বাহন, জীব জন্তু ধন-সম্পদ অধিকার করে তাকে কুর্ক দূর্গে বন্দী করে রাখা হয়। তার থেকে অধিকার করা ধন-সম্পদের মূল্য কোটি দীনার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে তার সালামত ফটকের অভ্যন্তরস্থ ঘরবাড়ি, হাম্মামখানা এবং বাদরাঈ যেটিকে শাফিঈ মাযহাবের মাদরাসা বানিয়েছেন সেই বাড়ি অন্তর্ভুক্ত। কাওকাব দূর্গ ধ্বংস করে দেয়া হয়। সেখানকার অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম তূর দূর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই হিজরী সনে ইব্ন শাকার মন্ত্রীকে পদচ্যুত করা হয়। তার সকল ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশে নির্বাসন দেয়া হয়। এই মন্ত্রী ইব্ন শাকার হাফিয আবদুল গণিকে মিশর থেকে বহিষ্কার করার জন্যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিল। ইতিপূর্বে কিন্তু তাঁকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সে মিশরীয় কর্তা ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল তাঁকে পশ্চিমা দেশে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে। ওই নির্দেশনামা কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছানোর পূর্বে হাফিয আবদুল গণির (র) ইনতিকাল হয়ে যায়। অন্যদিকে মহান আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন যে, এই জালিম মন্ত্রী ভূমিকম্প আযাব-গযব ও দুঃখ কষ্টের স্থান পূর্বাঞ্চলে নির্বাসিত হবে। পূর্ণ প্রতিফলরূপে মহান আল্লাহ তাকে পবিত্র ভূমি থেকে বহিষ্কার করে দেন।

কুবরুস সম্রাট ইনতাকিয়া রাজ্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম রাজ্যসমূহের উপর জোর-জবরদস্তি ও জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল। বিশেষত ইনতাকিয়া প্রদেশের পার্শ্ববর্তী তুর্কীম্যান মুসলমানদের উপর তার অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে বহু মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাদের গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ্র ইঙ্গিতে তারা একটি মহা সুযোগ পেয়ে যায়। এক পার্বত্য এলাকায় নাগালের মধ্যে পেয়ে তারা তাকে খুন করে ফেলে এবং তার মাথা নিয়ে শহর থেকে শহর প্রদিক্ষণ করে। এরপর তারা ওই মাথা মিশরে সুলতান আদিলের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তারকর্তিত মাথা বিভিন্ন স্থানে প্রদিক্ষণ করা হয়। এই সেই ব্যক্তি যে দিময়াতের পার্বত্য পথে দুবার মিশরে আক্রমণ করেছিল এবং বহু মানুষকে খুন ও বন্দী করেছিল, মুসলিম শাসকগণ তখন তাকে প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়েছিল।

৬০৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সুলতান আল আওহাদ : সুলতান আল আওহাদ এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন।

নাজমুদ্দীন আইয়ূব : তিনি ছিলেন খিলাত প্রদেশের শাসনকর্তা। সুলতান আছিল তাঁর পিতা। কথিত আছে যে, তিনি জনগণের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতেন। অনেক খুন খারাবী ও নরহত্যায় জড়িত হয়েছিলেন। ফলে অল্পবয়সে মহান আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দিয়ে দেন। এরপর তাঁর ভাই আশরাফ মূসা ওই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁর ভেতর-বাহির ছিল স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। প্রজাসাধারণের প্রতি তিনি সদাচার করেন। জনসেবায় আন্তরিক ছিলেন তিনি। জনগণ তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসত।

মক্কা শরীফের ফিক্‌হবিদ মুহাম্মদ : ৬০৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন মুকাররামার খ্যাতিমান ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ সায়ফ ইয়ামানী। আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল কাফাসী ও এই হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। তিনি একজন কিরআত বিশেষজ্ঞ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি প্রচুর বই পুস্তক লিখে গিয়েছেন। বহু শায়খ থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। সুফিয়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ : তিনি হলেন আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুহাম্মদ দীবাকী। তিনি সার্ভের অধিবাসী ছিলেন। আরবি ব্যাকরণে আল্লামা যামাখশারীর লিখা 'আল-মুফাস্‌সাল গ্রন্থের তিনি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম দিয়েছেন আল-মুহাসসাল। তিনি একজন জবরদস্ত ও বিজ্ঞ আলিম ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছিলেন। ৯২ বছর বয়সে এই হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

শায়খ সালিহ মাহমূদ : তিনি হলেন আবূ বাকা মাহমূদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন মুকারিম আল নাআলী আল-হাম্বলী। তিনি খুবই ইবাদত গুজার বান্দা ছিলেন। মুজাহাদা বা আত্ম অনুশীলন এবং বিভিন্ন স্থানে সফর-ভ্রমণে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে। আল আরজ ফটকে তিনি একটি খানকাহ্ তৈরী করেছিলেন। আলিম ও উলামা ও বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গ তাঁর খানকাতে মিলিত হতেন। সুনূর বায়তুল মুকাদ্দাসের অঞ্চলের আলিমগণ ও এখানে আগমন করতেন। আগত মেহমানদের প্রতি তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাদের সাথে সদাচার ও ভাল ব্যবহার করতেন। তিনি কুরআন শরীফ ও হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তিনি জনগণকে নিয়মিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতেন। ৮০ বছর বয়সে এই হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

৬১০ হিজরী সন (১২১৪ খ্রি.)

এই হিজরী সনের সুলতান আদিল নির্দেশ দিলেন যে, জুমার দিবসে জামে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট সড়কগুলোর প্রবেশ মুখে লোহার শিকল ঝুলিয়ে দিতে হবে। যাতে ঘোড়াগুলো মসজিদের কাছাকাছি আসতে না পারে। তিনি এটা করেছিলেন ঘোড়ার অত্যাচার থেকে পদব্রজী মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্যে এবং নামাযে আগমনকারী মুসল্লীদেরকে ভিড় ভাট্টার জঞ্জাল থেকে রক্ষা করার জন্যে। এই হিজরী সনে হালবের শাসনকর্তা গাযী যাহির একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তিনি দামেস্ক অধিপতি সুলতান নাসিরের পিতা। তিনি দামেস্ক অভ্যন্তরে নাসিরিয়্যা নামে দুটো দূর্গ ওয়াকফ দান করেছেন। একটি ফিরদাউস ফটকের অভ্যন্তরে অপরটি সাফাহ অঞ্চলে। এগুলোর প্রাচীর খুবই মজবুত সুদৃঢ়। বলা হয় যে, এমন উন্নত দূর্গ সাধারণত দেখা যায় না। তাতার সম্রাট হালাকু খান তাতার সৈন্যদেরকে নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। এই হিজরী সনে হস্তীবহর আসে মিশর থেকে। তিনি কুর্জ-অধিপতির নিকট উপহার পাঠান। তাঁর এই অভূতপূর্ব আচরণ দেখে জনগণ অবাক হয়ে যায়। এই হিজরী সনে সুলতান যাহির খিযর ইব্‌ন সুলতান সালাহুদ্দীন হজ্জের উদ্দেশ্যে হালব থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। লোকজন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করল, তাঁর চাচাত ভাই সুলতান মুআযযাম তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা

জানান। মক্কা শরীফ পৌঁছার সামান্য পথ বাকী ছিল তখনই মিশর অধিপতি কামিলের লোকজন তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। তারা বলে যে, আপনি তো ইয়ামান রাজ্য দখল করতে এসেছেন। তিনি ওদেরকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি হজ্জ সম্পাদন করি। ওরা বলল, তা হবে না, আপনাকে ফিরিয়ে দিতে আমরা আদিষ্ট আছি। এ সময়ে কিছু লোক তাঁর পক্ষ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তিনি তাতে ফিতনা ও বিশৃংখলার আশংকা করলেন। অতঃপর তিনি হজ্জের ইহরাম ছেড়ে দিয়ে সিরিয়া ফিরে গেলেন। তাঁর বিনা হজ্জে প্রত্যাবর্তনে অনেক লোক দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে মহান আল্লাহ্ তাঁর এই সদাচার কবুল করুন।

এই হিজরী সনে খোরাসানের অধিবাসী জনৈক হানাফী সিক্‌হাঠদের একটি চিঠি শায়খ তাজুদ্দীন আবুল ইয়ামান কিন্দীর নিকট পৌঁছে। তাতে তিনি জানিয়ে দেন যে, তাতারদের অবস্থানে সরে জমিনে দেখার জন্যে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন তাকাশ পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে তাঁর তিন সাথীসহ তাতারদের শহরে ঢুকে পড়েছেন। ওরা তাঁদেরকে চিনতে পারেনি। তারা তাঁদেরকে ধরে ফেলেছে এবং প্রহারে প্রহারে দুজনকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু তাঁরা কে, কোত্থেকে এসেছে তার কোনো তথ্যই ওদেরকে জানায়নি। তাতারগণ সম্রাট মুহাম্মদ এবং তাঁর এক সাথীকে বন্দী করে রেখেছে। এক রাতে সুযোগ পেয়ে সুলতান এবং তাঁর সাথী পালিয়ে আসেন। এবং সুলতান তার রাজ্যে ফিরে আসেন। সুলতান এর পূর্বে ও একবার সেনাপতি মাসউদের সাথে শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

এই হিজরী সনে গচ্ছিত সম্পদ অন্বেষণকারী দলের আবির্ভাব ঘটে। তারা মাটি খনন করে গচ্ছিত সম্পদ উদ্ভাবের পেশায় নিয়োজিত হয়। তারা হালব রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন করতে শুরু করে। এতে করে তারা মাটির নীচ থেকে ৭৫ রিত্‌ল স্বর্ণ এবং ২৫ রিত্‌ল রূপা উদ্ধার করে।

৬১০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ আহমদ হানাফী : তিনি হলেন শায়খ আবুল ফযল আহমদ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন আলী রাসানী। বাগদাদের ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মাযার সংলগ্ন মাদরাসার অধ্যাপক ছিলেন তিনি। বিভিন্ন অন্যায় অবিচারের অভিযোগ তাঁর নিকট পেশ করা হত। তিনি সেগুলোর তদন্ত করতেন। ওই কবর স্থানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

শায়খ আবুল ফযল ইব্‌ন ইসমাঈল : ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন ফখরুদ্দীন হাম্বলী, তিনি ইব্‌ন মাসিতাহ নামে পরিচিতি ছিলেন। তাকে ফখর গোলাম ইব্‌ন মুনাও বলা হত। মতভেদযুক্ত মাসআলাসমূহ নিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। খলীফার জামে মসজিদে তিনি নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করতেন। খলীফার ঘনিষ্ঠজনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। এক পর্যায়ে তাঁকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। ফলে বেকার অবস্থায় ঘরে বসে থাকতেন। দিনে দিনে তিনি কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হলেন। ঘরে কোনো অর্থকড়ি ছিল

না। অবশেষে তিনি মৃত্যুবর করেন। তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিল নাম মুহাম্মদ। সে ছিল সত্যদ্রোহী শয়তান, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের নিকট জনগণ সম্পর্কে মিথ্যা দুর্নাম ও অপবাদ দিয়ে বেড়াত। এক পর্যায়ে তার জিহ্বা কেটে দেয়া হয় এবং তাকে বন্দী করে রাখা হয়। কারারুদ্ধ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মন্ত্রী মুইয্যুদ্দীন আবুল মাআলী : ৬১০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন সাঈদ ইব্ন আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন হাদীদাহ্। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কুতবাহ ইব্ন আমির ইব্ন হাদীদাহ আনসারীর (র) বংশধর। ৫৮৪ হিজরী সনে তিনি শাসনকর্তা নাসিরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর ইব্ন মাহদী দুতিয়ালিতে তিনি মন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হন এবং পালিয়ে মুরাগাহতে চলে যান। ইব্ন মাহদীর মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ ফিরে আসেন। তখন থেকে সম্মান ও ইজ্জতের সাথে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি বড় রকমের দানশীল এবং মানব কল্যাণী ব্যক্তি ছিলেন। এই হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

সিনজার ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাসিরী খলীফাতী : তিনি প্রচুর ধন সম্পদ ও জায়গা জমির মালিক ছিলেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি ছিলেন কঠিন প্রকৃতির কৃপণ ও বখীল। ঘটনাক্রমে ৫৮৯ হিজরী সনে তিনি আমীর-ই-হাজ্জ বা হজ্জ কাফেলার প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। পথে স্বল্প সংখ্যক বেদুঈন লোক এসে তাদের কাফেলাকে বাধা দেয়। সিনজারের সাথে পাঁচশত অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু বেদুইনদের উপস্থিতি দেখে তিনি ভয় পেয়ে যান। ওরা তাঁর নিকট ৫০ হাজার দীনার চাঁদা দাবী করে। তিনি হাজীদের নিকট থেকে ওই অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বেদুইনদেরকে দিয়ে দেন। হজ্জ শেষে বাগদাদ ফিরে আসার পর ঘটনাটি খলীফার গোচরীভূত হয়। তিনি সিনজার থেকে পঞ্চাশ হাজার দীনার ক্ষতিপূরণ উশুল করে হাজীদেরকে দিয়ে দেন এবং সিনজারকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করে চাশতুগীনকে ওই পদে নিয়োগ করেন।

কাযী সালামিয়্যাহ : তিনি হলেন যহীরুদ্দীন আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন নাসর ইব্ন আসকার, তিনি শাফিঈ মাযহাবের খ্যাতনামা ফকীহ ও সুসাহিত্যিক ব্যক্তি ছিলেন। লিখক আল ইমাদ আল জারীদাহ গ্রন্থে এবং ইব্ন খাল্লিকান আল ওয়াফিয়্যাত গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। ইব্ন খাল্লিকান তাঁর খুব প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, মক্কী নামের খানকা কেন্দ্রিক জনৈক শায়খ এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে তিনি কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

اَلاَ قُلْ لِمَكِّيٍّ قَوْلَ النَّصُوْحِ * وَحَقُّ النَّصِيْحَةِ اَنْ تُسْتَمَعَ۔

শায়খ মক্কীকে একটি উপদেশমূরক কথা বলে দিন। উপদেশ দানের দাবী হল ওই উপদেশ শ্রবণ করা।

مَتَى سَمِعَ النَّاسُ فِيْ دِيْنِهِمْ * بِاَنَّ الْغِنَا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ۔

মানুষ কখন শুনেছে যে, তাদের দীন ধর্মের মধ্যে আছে যে, গান-বাদ্য সুন্নত এবং অনুসরণযোগ্য।

وَاَنْ يَاكُلُ الْمَرْءُ اَكْلَ الْبَعِيْرِ * وَيَرْقُصُ فِي الْجَمْعِ حَتَّى يَقَعَ۔

এটাও কবে শুনেছে যে, দ্বীনের মধ্যে আছে যে, মানুষ উটের মত গো গ্রাসে খাদ্য গিলতে থাকবে আর আসরের মধ্যে নাচন কুর্দন করতে করতে মাটিতে পড়ে যাবে?

وَلَوْ كَانَ طَاوِى الْحَشَا جَائِعًا * لَمَا دَارَ مِنْ طَرْبٍ وَّاسْتَمَعَ ـ

পেটের ক্ষুধায় চামড়া কুঁচকিয়ে গেলেও বাদ্য আসক্তি ও শ্রবণ আকর্ষণের কারণে তা ছেড়ে যাবে না?

وَقَالُوْا سَكِرْنَا بِحُبِّ الْإِلٰهِ * وَمَا اَسْكَرَ الْقَوْمَ اِلَّا الْقَصَعُ ـ

আর তারা বলে যে, আল্লাহ প্রেমে আমরা বেহুঁশ হয়ে পড়েছি। মূলত ওই সম্প্রদায়কে নেশাগ্রস্ত হয়েছে মদের বাটি ও সুরার পেয়ালা।

كَذٰلِكَ الْحَمِيْرُ اِذَا اُخْصِبَتْ * يَهِيْجُهَا رِيُّهَا وَالشِّبَعُ ـ

গাধার অবস্থাও সেরূপ। সেটি যখন পেট পুরে খাবার গিলে তখন তার তৃপ্তি ও প্রশান্তি তাকে উত্তেজিত ও তন্দ্রচ্ছিন্ন করে তোলে।

تَرَاهُمْ يَهُزُّوْا لَحَاهُمْ اِذَا * تَرَنَّمَ حَادِيْهِمْ بِالْبِدَعِ ـ

আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদের গযল গায়ক যখন বিদাআত বিষয়াদি সম্বলিত গযলের সুর তোলে তখন তার প্রতি উচ্চারণে তাদের চোয়াল আন্দোলিত হতে থাকে।

فَيَصْرُخُ هٰذَا وَهٰذَا يَئِنُّ * وَيَبْسُ لَوْ تَلَيَّنَ مَا انْصَدَعَ ـ

তখন কেউ চীৎকার জুড়ে দেয় আবার কেউ গুণগুনিয়ে ক্রন্দন শুরু করে। এবং যা ফাঁক হয় তা আবার জোড়া লাগে।

তাজুল উমানা : তিনি হলেন আবুল ফযল আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন আসাকির। তিনি একটি হাদীস সমৃদ্ধ বংশের সদস্য। তাঁর ভাই যায়নুল ফখর ওয়াল উমানা থেকে তিনি বড়। তদীয় চাচা হাফিয আবুল কাসিম ও সাইন থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি আলকিন্দির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই হিজরী সনের ২ রজব রোববার তিনি ইনতিকাল করেন। আল কাদাম মসজিদের মিহরাবের সম্মুখে তাঁকে দাফন করা হয়।

আল-কালবী : ৬১০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন নামসাবাহ আল কালবী। তিনি তাজুল আলী হুসায়নী নামেও পরিচিত ছিলেন, আমিদ নগরে তিনি ইব্‌ন দিহ্‌য়া এর সাথে মিলিত হন। ইব্‌ন দিহয়া মূলতঃ দিহয়া কালবী সাহাবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু হযরত দিহয়া কালবী (র)-এর কোনো বংশধর ছিল না। ইব্‌ন দিহয়ার সাথে তাজুল আলী হুসায়নীর সাক্ষাত হবার পর তাঁর মুসিলিয়্যাহ মাসআলা সম্পর্কে তিনি তাঁকে মিথ্যাচারের অপবাদ দেন।

খ্যাতিমান চিকিৎসক আল মুহাযযাব : তিনি হলেন আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুকবিল আল মুসেলী। হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তিনি। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি সে সময়ে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁর রচিত ভাল গ্রন্থ রয়েছে। তিনি একজন ব্যাপক দানশীল ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

আল কানূন গ্রন্থ প্রণেতা আল-জাযূলী : তিনি হলেন আবূ মূসা ঈসা ইব্ন আবদুল আযীয আল জাযূলী আল বুরদাকিনী। জাযূল হল বারবার গোত্রের একটি শাখা গোত্র। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ ও মিশরের অধিবাসী ছিলেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাড়া জাগানো ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ আল-কানূন গ্রন্থ তিনিই রচনা করেন। এরপর তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে তিনি এই গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। শিষ্যদের সকলেই স্বীকার করেছে যে, গ্রন্থটির বহু স্থানে মর্ম উদ্ধারে তারা অক্ষম ছিল। আল্লামা জাযূলী ছাত্রাবস্থায় মিশর আগমন করেন এবং ইব্ন বারী এর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন, এরপর তিনি নিজ শহরে ফিরে যান এবং মরক্কোতে খতীব পদে নিয়োগ লাভ করেন। এই হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এই হিজরী সনের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আল্লাহ ভাল জানেন।

৬১১ হিজরী সন (১২১৫ খ্রি.)

এই হিজরীতে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ তাঁর জনৈক ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির নেতৃত্বে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। সেনাপতি তার এই অভিযানে কিরমান, মুকরান ও সিন্ধু রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন বহু নগর জয় করে। ওই সব জনপদে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহের নামে খুতবা পাঠ হতে থাকে। সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ তাতার সম্প্রদায় ও কুশলী খানের পুনঃ আক্রমণের ভয়ে সমরকন্দ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যেতেন না।

ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন এই হিজরী সনে উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অংশে মোজাইক করার কাজ শুরু হয়। সাবউল কাবীর-এর দিক থেকে তার সূচনা করা হয়। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ছিল উঁচু নীচু ও খানা খন্দকে ভরা। এটির মোজাইককরণ ও সমান করার কাজ শুরুর ফলে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। এই হিজরী সনে কীমাযিয়্যাহ প্রান্তের পুকুর ও দীঘিটিকে সম্প্রসারিত করা হয়। এর ফলে নুরিয়া দারুল হাদীস মাদরাসার জন্যে ওয়াকফ করা বহু ঘর-বাড়ি ও হাম্মামখানা বিনষ্ট হয়।

এই হিজরী সনে সুলতান আল মুআয্যাম জাবিয়াহ ফটকের সম্মুখে আতিকাহ কবরস্থানের পাশে আযযামী হোটেল তৈরী করেন। সুলতান মুআয্যাম এই হিজরী সনে ইব্ন কুরাজা থেকে সারখাদ দূর্গ বুঝে নেন এবং তাকে বিনিময়ে অন্যকিছু দান করে। এরপর এই দূর্গ তাঁর ক্রীতদাস ইজ্জুদীন আইবেক মুআযযামীর নিকট হস্তান্তর করেন। ৬৪৪ হিজরী সনে নাজমুদ্দীন আইয়ূব কর্তৃক দখল করার পূর্ব পর্যন্ত এই দূর্গ ইজ্জুদ্দীনের হাতেই ছিল। এই হিজরী সুলতান মুআয্যাম হজ্জব্রত পালন করেন। যুলকাদাহ মাসের ১১ তারিখ তিনি কুর্ক থেকে যাত্রা শুরু করেন। ইব্ন মুসিক, তদীয় পিতার ক্রীতদাস, তাঁর গৃহশিক্ষক ইজ্জুদ্দীনসহ বহু লোক তাঁর সফর সঙ্গী হয়। তিনি তাবূক ও উলার পথে অগ্রসর হন। পথে তিনি নিজ নামে মুআযযামী পানি শোধনাগার ও অন্যান্য কারখানা নির্মাণ করেন। তিনি যখন মদীনা শরীফ এসে পৌঁছেন তখন মদীনা শরীফের গভর্নর সালিম তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও উচ্চ সম্বর্ধনা জানান। তিনি মদীনা শরীফের চাবি তাঁর নিকট হস্তান্তর করেন। পরম একাগ্রতা ও সম্মানে তিনি সুলতানের সেবায় নিয়োজিত হন। পক্ষান্তরে মক্কার গভর্নর কাতাদা তাঁর আগমনে সামান্য শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেনি। এজন্যে তিনি

মক্কা শরীফও যাননি হজ্জও সম্পন্ন করেননি। তিনি কিরান হজ্জের ইহরাম করেছিলেন। তিনি ইহরাম ছেড়ে দিলেন। মালপত্র যা নিয়ে গিয়েছিলেন তা আশেপাশের লোকজনকে সাদকাস্বরূপ দিয়ে দিলেন এবং নিজ শহরে ফিরে এলেন। মদীনার গভর্নর সালিমকে তিনি সাথে নিয়ে এলেন এবং মক্কার গভর্নর কাতাদার বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা সম্পর্কে তদীয় পিতা সুলতান আদিলের নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। সুলতান আদিল তখন সালিমের নেতৃত্বে একটি সেনাবহর প্রেরণ করলেন কাতাদাকে ক্ষমতাচ্যুত ও পাকড়াও করার জন্যে। সংবাদ পেয়ে কাতাদা মক্কা নগরী ছেড়ে বন-বাদাড়ে ও পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে যায়। সুলতান মু'আযযাম তাঁর এই যাত্রায় হজ্জ যাত্রায় বিভিন্ন স্থানে জনহিতকর অনেক কাজ করে গিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে তার প্রতিফল দান করুন।

এই হিজরী সনে দামেস্কের অধিবাসিগণ কাগজের মধ্যে সুলতান আদিলের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিল। এরপর সেগুলো বাজেয়াপ্ত ও মাটিতে দাফন করে দেয়া হয়। এই হিজরী সনে ইয়ামানের গভর্নর মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সেনাধ্যক্ষগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুলায়মান ইব্ন শাহান শাহ ইব্ন তাকীয়ুদ্দীন উমার ইব্ন শাহান শাহ ইব্ন আয়ূবকে শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর সুলতান আদিল তদীয় পুত্র আল কামিলাকে সংবাদ পাঠান যে, তিনি যেন নিজ পুত্র ইদসীসকে ইয়াসান দখলের জন্যে অভিযানে প্রেরণ করেন। আল কামিল তদীয় পুত্র ইদসীসকে প্রেরণ করেন। ইদসীস ইয়ামান দখল করে এবং সেখানে চরম নির্যাতন ও খুন খারাবী পরিচালিত করে। শুধু সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণির আটশত ব্যক্তিকে হত্যা করে। সাধারণ মানুষ তো প্রচুর। ইদসীস ছিল সে যুগের নিকৃষ্টতম শাসক। পাপাসক্তি ও কুকর্মে সে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দীনদারী ও লজ্জা-শরমে সে ছিল সবার পেছনে। তার পাপাচারিতা ও কুকর্ম সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এমন সব তথ্য উপস্থাপন করেন যা শুনে শরীর শিহরিত হয় অন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। আমরা মহান আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি।

৬১১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ইবরাহীম ইব্ন আলী : তিনি হলেন ইব্রাহীম ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ব্যাকরূস। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ফিক্হবিশারদ ছিলেন। তিনি ফাতাওয়া দিতেন, বিতর্ক সভা করতেন এবং বিচারকদের সুম্মুখে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যুক্তি পেশ করতেন। এরপর এক পর্যায়ে তিনি এসব কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং নাভা ফটকে নিরাপত্তারক্ষী পদে নিযুক্ত হন। এ সময়ে তিনি পুলিশি মানসিকতায় জনগণকে প্রহার করতেন এবং ভীষণভাবে নির্যাতন করতেন। এরপর নিজেই প্রহৃত হন। প্রহারে প্রহারে তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর ইউফ্রেটিসে তাঁর লাশ ফেলে দেয়া হয়। তাঁর মৃত্যুকে জনসাধারণ যারপর নাই আনন্দিত হয়। তাঁর পিতা খুব ভাল মানুষ ছিলেন।

আবদুস সালাম ইবৃন আবদুল ওহহাব : তিনি হযরত শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর দৌহিত্র। তাঁর পিতা একজন নেককার মানুষ ছিলেন। তিনি কিন্তু দর্শন শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্টতার অপবাদে অভিযুক্ত ছিলেন। এই বিষয়ে কতক বই পুস্তক ও তাঁর নিকট পাওয়া গিয়েছে। তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর

মত অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে একথা প্রযোজ্য যে, দাদাগণ কতই না ভাল আর বংশধর কতই না মন্দ! তাঁর পিতা একদিন তাঁর গায়ে বুখারার তৈরী কাপড় দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের কথা শুনেছি। এতো দেখছি বুখারী পোশাক পরিহিত অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, এতো আশ্চর্য ব্যাপার! আলোচ্য আবদুস সালামের সাথে শায়খ ইব্‌নুল জাওযীর দৌহিত্র আবুল কাসিমের বন্ধুত্ব ছিল। আবুল কাসিম একজন পাপাচারী ও পাপ-পরিকল্পনাকারী ব্যক্তি ছিল। তারা দুজনে মদ্যপান ও সত্যদ্রোহিতায় ঐক্যবদ্ধ হত। মহান আল্লাহ ওদের মুখমণ্ডল বিশ্রী করে দিন।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন মুবারক আল বাযযার : তিনি ইব্‌ন আখদার বাগদাদী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বহু হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি একজন মুহাদ্দিছ, হাফিয-ই-হাদীস এবং প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাঁর একাধিক কল্যাণধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। তিনি একজন সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জানাযায় বহু মানুষ অংশ নিয়েছিল।

হাফিয আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আনজাব : তিনি হলেন আবুল মাকারিম মুফায্‌যাল ইব্‌ন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবুল মুগীছ মুফাররিজ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান লাখমী মুকাদ্দেসী ইস্কান্দরী মালিকী, তিনি আল্লামা সালাফ এবং আবদুর রহমান মুনযেরীর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার মালিকিয়্যাহ মাদরাসায় তিনি অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে তিনি উপ-প্রধান প্রশাসকও ছিলেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই:

أَيَا نَفْسُ بِالْمَأْثُورِ عَنْ خَيْرِ مُرْسَلٍ * وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ تَمَسَّكِيْ.

ওহে মানুষ! শ্রেষ্ঠ রাসূল (সা) থেকে এবং তাঁর সাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে উদ্ধৃত হাদীসগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

عَسَاكِ إِذَا بَالَغْتِ فِي نَشْرِ دِيْنِهِ * بِمَا طَابَ مَنْ عُرْفٍ لَهُ أَنْ تَمَسَّكِي.

আশা করা যায় যে, তুমি যদি তাঁর দীন প্রচারে যথাসাধ্য চেষ্টা কর তাহলে তুমি ইতিবাচক প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

وَخَافِيْ غَدًا يَوْمَ الْحِسَابِ جَهَنَّمَا * إِذَا لَفَحَتْ نِيْرَانُهَا تَمَسَّكِي.

আগামীকালের হিসাব দিবসের জাহান্নামযোগ্য হবার ভয় পোষণ কর। এই জাহান্নাম তাঁর অগ্নি ফুলকি ও শিখাকে যখন তোজোদ্দীপ্ত করবে, সুতরাং তুমি হাদীসসমূহকে আঁকড়ে ধর। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন যে, এই হিজরী সনে কায়রোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬১২ হিজরী সন (১২১৬ খ্রি.)

এই হিজরী সনে দামেস্কে বিশালায়তনের আদিলিয়্যাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। এই হিজরী সনে কাযী ইব্‌ন যাকী তাঁর চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন এবং তদস্থলে কাযী জামালুদ্দীন ইব্‌ন হারাস্তানীকে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য

পরিচালনা করেন। কথিত আছে যে, তিনি আল কাউয়াসীন ফটকের পাশে নুরিয়া মাদরাসার সন্নিকট মুজাহিদিয়্যা মাদরাসায় বসে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এই হিজরী সনে সুলতান আদিল মাদকদ্রব্য ও গায়ক গায়িকার রেজিষ্ট্রেশন ফী ও জামানত প্রথা বাতিল করে সে দেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে কল্যাণময় প্রতিফল দান করুন। এই প্রথা বাতিল করার কারণে জনগণের মধ্যে এই অনাচার বহুলাংশে কমে যায়, এই হিজরী সনে মক্কার গভর্নর কাতাদা তার সংগী-সাথীদেরকে মদীনা শরীফের শাসনকর্তা ও সেখানকার জনগণকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সেখানকার অনেক গাছপালা সে কেটে ধ্বংস করে দেয়। মদীনাবাসী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সে পরাজিত ও নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। মদীনার শাসনকর্তা তখন সিরিয়াতে অবস্থান করছিলেন। তিনি মক্কার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সুলতান আদিলের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সুলতান তাঁর সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। পথে শাসনকর্তার মৃত্যু হয়, সৈনিকগণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জুমাযের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা মক্কার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। সাফরাতে মক্কার শাসনকর্তার মুখোমুখি হয় তারা। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক পর্যায়ে মক্কীগণ পালিয়ে যায়। জুমায প্রচুর ধন-সম্পদ দখল করে নেয়। শাসনকর্তা কাতাদাহ মক্কা ছেড়ে ইয়াম্বুতে পলায়ন করে। জুমাযের সৈন্যগণ তার পিছু ধাওয়া করে ইয়াম্বুতে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তার জীবনযাত্রা সংকটাপন্ন করে রাখে।

এই হিজরী সনে ফ্রাংক সম্প্রদায় ইসমাইলিয়্যাহ জনপদে আক্রমণ চালায়। সেখানে তারা প্রচুর খুন খারাবি সংঘটিত এবং ধন-সম্পদ লুট করে। এই হিজরী সনে রোমান সম্রাট কায়কাবুস ফ্রাংকদের হাত থেকে ইনতাকিয়া জনপদ দখল করে নেয়। এরপর আরসিনের শাসনকর্তা লাঙিন রোমানদের হাত থেকে তা দখল করে নেয়। তাদের হাত থেকে অতঃপর সেটি দখল করে নেয় তারাবহুসের ইব্রীস। এই হিজরী সনে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ মুহাম্মদ ইব্ন তাকাশ বিনা যুদ্ধে গযনী অধিকার করেন। এই হিজরী সনে খলীফা নাসির লিদীনিল্লাহ্ এর উত্তরাধিকারী ও যুবরাজ আবুল হাসান আলী ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে খলীফা ভীষণভাবে মর্মাহত হন। যুবরাজ আবুল হাসান আলীর মৃত্যুতে আস-খাস ও নেতা-কর্মী নির্বিশেষে সকল জনগণ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। তাঁর দান সাদকা ও বৃহত্তর পর্যায়ে জনসেবার ফলশ্রুতিতে এমনটি হয়েছিল, বলা হয়ে থাকে যে, বাগদাদের একটি ঘর ও তাঁর জন্যে শোক গ্রস্থ না হয়ে থাকেনি। তাঁর জানাযার দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। নগরবাসী তার শোকে দিন রাত কেঁদেছে। হযরত মারূফ কারখীর কবরের নিকটে তাঁর দাদীর কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়, এই হিজরী সনের ২০ যুলকাদাহ জুমাবারে তাঁর মৃত্যু হয়। আসরের নামাযের পর তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে রাষ্ট্রদ্রোহী ও খলীফার বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি মুনকিলীর কর্তৃত্ব মাথা বাগদাদে আসে। ওই মাথা রাজপথে প্রদিক্ষণ করানো হয়। কিন্তু আপন পুত্র ওযুর রাজের মৃত্যুর কারণে খলীফা ওই বিদ্রোহীর কর্তৃত মাথা দেখেও পরিপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করতে পারেননি। বস্তুত দুনিয়া যতটুকু ক্ষতি করে ততটুকু আনন্দ দেয় না। যুবরাজ আবুল হাসান আলী মৃত্যুকালে দুজন পুত্র সন্তান রেখে যান। একজন আল মুতাইয়াদ আবূ আবদুল্লাহ্ হুসায়ন এবং অপরজন আল মুওয়াফফাক আবুল ফযল ইয়াহ্য়া।

৬১২ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

হাফিয আবদুল কাদির রাহাভী : তিনি হলেন হাফিয আবদুল কাদির ইব্ন আবদুল কাদির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আবূ মুহাম্মদ। তিনি একাধারে হাফিয, মুহাদ্দিছ, গবেষক, লিখক, আস্থাবান ও গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। জনৈক মুসেলী ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। কেউ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন জনৈক জাওয়াবীর ক্রীতদাস ছিলেন। মুসেলের দারুল হাদীসের তিনি পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি হাররান গমন করেন এবং এরপর তিনি অন্যান্য দেশে গমন করেন। বহু শায়খ থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বাহরাইনে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। ৫৩৬ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন দীনদার ও পূণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আল-ওয়াজিহ : তিনি হলেন আবূ বকর আল মুবারক ইব্ন সাঈদ ইব্ন দাহ্হান আল ওয়াসেতী তাঁর উপাধি ছিল আল ওয়াজিহ। আরবি ব্যাকরণে তাঁর ভাল দখল ছিল। ওয়াসিতে তাঁর জন্ম হয়। ছাত্রজীবনে তিনি বাগদাদ আগমন করেন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশোনা করেন। এ শাস্ত্রে তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন এবং বহু আরবি কবিতা মুখস্থ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথম জীবনে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করতে থাকেন। পরে তিনি শাফিয়ী মাযহাব গ্রহণ করেন। নিযামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন :

فَمِنْ مُبَلِّغٌ عَنِ الْوَجِيْهَ رِسَالَةً * وَاِنْ كَانَ لَا تَجْدِى اِلَيْهِ الرَّسَائِلُ۔

আমার পক্ষ থেকে আল ওয়াজিহকে একটি বার্তা পৌছে দেয়ার কেউ কি আছে? অবশ্য তার নিকট কোন বার্তা তার তো কোন উপকার করতে পারবে না।

تَمَذْهَبْتَ لِلنُّعْمَانِ بَعْدَ ابْنِ حَنْبَلٍ * وَذٰلِكَ لِمَا اَعْوَزَتْكَ الْمَاكُلُ۔

তুমি তো আহমদ ইব্ন হাম্বলের মাযহাব গ্রহণের পর নু'মান ইব্ন সাবিতের মাযহাব গ্রহণ করেছ, এটা হয়েছে তোমার রুটি রুযীর আকর্ষণে।

وَمَا اَخَذْتَ بِرَأْيِ الشَّافِعِىِّ دِيَانَةً * وَلٰكِنَّمَا تَهْوِى الَّذِى هُوَ حَاصِلُ۔

তুমি যে শাফিঈ মাযহাবে দীক্ষিত হয়েছ তাও তোমার দীনদারীর প্রেক্ষিতে নয়। বরং দুপয়সা অর্জনের আকাংখায় তুমি তা করেছ।

وَعَمَّا قَلِيْلٍ اَنْتَ لَا شَكَّ صَائِرٌ * اِلَى مَالِكٍ فَانْظُرْ اِلَى مَا اَنْتَ قَائِلُ۔

অবিলম্বে তুমি ইমাম মালিকের অনুসারী হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তুমি কোন দিকে যাচ্ছ তা ভেবে দেখ।

তিনি বহু কাহিনী উপমা ও কৌতুক মুখস্থ করেছিলেন। একই সাথে আরবি, তুর্কী, অনারবী, রোমান, আফ্রিকী ও যানজী ভাষায় তিনি বুঝাতে পারতেন। কবিতা রচনা ও গ্রন্থনায় তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

وَلَوْ وَقَفَتْ فِىْ لُجَّةِ الْبَحْرِ قَطْرَةٌ * مِنَ الْمُزْنِ يَوْمًا ثُمَّ شَاءَ لِمَازَهَا۔

বৃষ্টি উৎস থেকে যদি থেকে যদি এক ফোঁটা পানি সমুদ্রের ঢেউয়ে পতিত হয় এবং এরপর সে তার কাঙ্খিত বিষয় কামনা করে :

وَلَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا فَاضْحَى مُلُوْكُهَا * عَبِيْدًا لَهُ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبُ مَا زَهَا.

সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হয় আর পূর্ব পশ্চিমের সকল রাজা বাদশা তার গোলাম হয় তবু সে তৃপ্ত হবে না।

তাজনীস গ্রন্থে তার উদ্ধৃত কবিতার একাংশ হল :

أَطَلْتُ مُلَامِيْ فِيْ اِجْتِنَبِي لمعشر * طغام لئام جودهم غير مرتجي.

লোভী অর্থ গৃধু ও নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি মাধ্যমে আমি তাদের দীর্ঘ সমালোচনাও নিন্দাবাদে নিয়োজিত রয়েছি। ওরা এত নীচ যে, ওদের নিকট থেকে কোনো প্রকারের দানশীলতা আশাই করা যায় না।

حَمَوْا مَالَهُمْ وَالدِّيْنُ وَالْعَرْضُ مِنْهُمْ * مُبَاحٌ فَمَا يَخْشَوْنَ مَنْ عَابَ اَوْ هَجَا.

তারা তাদের ধন সম্পদ ও বিত্ত বৈভব রক্ষা করে থাকে সযতনে। পক্ষান্তরে তাদের দ্বীন ও ইজ্জত থাকে অরক্ষিত। কোন সমালোচনা কারী ও দুর্নামকারীকে তারা মোটেই ভয় করে না।

اِذَا شَرَعَ الْاَجْوَادُ فِي الْجُوْدِ مِنْهَجًا * لَهُمْ شَرَعُوْا فِي الْبُخْلِ سَبْعِيْنَ مِنْهَجًا.

দানশীলগণ তাদের জন্যে দান-দক্ষিণার কোনো পথ ও আদর্শের সূচনা করলে তারা কার্পণ্যের সত্তরটি পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

আল ওয়াজিদ প্রচুর চমৎকার কবিতারাশি ও উচ্চ মানের সাহিত্য সম্পদ রচনা করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা কবি বুহতারীর কবিতার কাছাকাছি পৌঁছে যেত। জীবনীকারগণ বলেন যে, কবি আল ওয়াজিহ কখনো ক্রোধান্বিত হতেন না। একদিন এক ঘটনা ঘটে যায়। কয়েকজন লোক একজনের সাথে বাজি ধরে যে, সে যদি কবি আল ওয়াজিহকে ক্ষেপিয়ে তুলতে ও ক্রোধান্বিত করে তুলতে পারে তাহলে সে এই বস্তু পাবে। ওই ব্যক্তি আল ওয়াজিহ-এর নিকট আসে। তাকে আরবি ভাষা সংক্রান্ত একটি বিষয় জিজ্ঞেস করে। আল ওয়াজিহ তাকে সঠিক জবাবটি দিয়ে দেন। কিন্তু ওই লোক বলল, "মহোদয়! আপনি তো ভুল উত্তর দিলেন। তিনি ভিন্ন বাক্য ব্যবহার করে ওই সঠিক জবাবটি আবার প্রদান করলেন। এবার লোকটি বলল, আপনি মিথ্যা বলেছেন। আপনি তো আরবি ব্যাকরণ রীতি ভুলেই গিয়েছেন। এবার ওয়াজীহ বললেন, ওহে আগন্তুক! আপনি সম্ভবত আমার মন্তব্য বুঝে উঠতে পারেননি। সে বলল, না তা নয় আপনি বরং ভুল জবাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে আপনি শুদ্ধ জবাব দিয়ে দিন আমি আপনার নিকট থেকে শিখব। এবার ওই আগন্তুক শক্ত ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলল। তার কথায় তিনি রাগ করলেন না বরং হেসে বললেন আপনি যদি কোনো বাজি বীর থাকেন তবে তাতে আপনি পরাজিত হলেন। আপনার উদাহরণ হল সেই ক্ষুদ্র মশার ন্যায় যে একবার উড়ে গিয়ে এক হাতির পিঠে পড়ল। এরপর উড়াল দিতে গিয়ে সে হাতিকে বলল, তুমি আমাকে কিন্তু ধরে রাখ আমি উড়াল দিয়ে চলে যেতে চাচ্ছি। তখন হাতি তাকে বলল, তুমি উড়াল দিতে গেলে তোমাকে ধরে রাখার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, তুমি যে আমার পিঠে এসে

পড়েছ তা আমি বুঝতেই পারিনি। আল্লামা ওয়াজীহ্ এই হিজরী সনের শা'বান মাসে ইনতিকাল করেন। আল ওয়ারদিয়্যাহ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবূ মুহাম্মদ আবুল আযীয ইব্ন আবুল মাআলী : ইব্ন গুনায়মাহ। তিনি ইব্ন মানীনা নামে পরিচিত ছিলেন। ৫১৫ হিজরী সনে তাঁর জন্ম হয়। বহু শায়খ ও মুহাদ্দিছের নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা করেছেন। বহু ছাত্র ও শিষ্যকে তিনি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। ৯৭ বছর বয়সে এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৬১২ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

শায়খুল ফিকহ কামালুদ্দীন মওদূদ : তিনি হলেন কামালুদ্দীন মওদূদ ইব্ন শাগূরী। শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করতেন তিনি। উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদেরকে ফিক্হ শাস্ত্র ও শারহুত তান্বীহ গ্রন্থ পড়তেন। পাঠ দানকালে তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে পড়াতেন যাতে ছাত্রগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। শহীদী কবরস্থানের উত্তরে বাব আল সাগীরের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবরের উপর একটি কবিতা অংকিত রয়েছে। ইতিহাসবিদ আবূ শামাহ তা উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৬১৩ হিজরী সন (১২১৭ খ্রি.)

আবূ শামাহ বলেছেন : এই হিজরী সনে আন নাসর গম্বুজ নির্মাণের লক্ষ্যে কাঠের খিলান চতুষ্টয় আনয়ন করা হয়। কবি মিস্ত্রীদের মাপে এর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৩২ গজ। এই হিজরী সনে আত তা'মুল আতীকাহ্ ভবনের বিপরীতে বাব আস সিরর এর পরিখাটির সংস্কার কাজ শুরু হয়। এটিই বর্তমানে সম্রাটের আস্তাবল নামে পরিচিত। এই পরিখা সংস্কারে সুলতান নিজেই সশরীরের মাটি বহন করেছেন। তাঁর ক্রীতদাসগণ ও তাঁর উপস্থিতিতে মাটি বহন করে সবুজ প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাই এবং তার দাসগণ ও এই কাজে সশরীরে অংশ নেয়, তারা পানাক্রমে এই কাজে শ্রম প্রদান করে। এই হিজরী সনে শাগুরের অধিবাসী এবং আকীবার অধিবাসীদের মধ্যে এক মারাত্মক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। রাহবাহ এবং সায়ারিফ নামকস্থানে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সংবাদ পেয়ে সশস্ত্র সরকারী বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। সুলতান মুআয্যাম নিজে সেখানে গমন করেন। তিনি দুষ্কৃতিকারীদেরকে গ্রেপ্তার করেন। এই হিজরী সনে ঈদগাহের জন্যে একজন স্বতন্ত্র খতীব নিযুক্ত করা হয়। সর্বপ্রথম এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সগীর মুঈদ আল ফালাকিয়্যাহ। এরপর এই পদে নিযুক্ত হন বাহাউদ্দীন ইব্ন আবুল য়ুসর। এরপর বানূ হাসসান বা হাসসান বংশধরগণ এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এখনও সেখানে পৃথক খতীব নিয়োগের নীতি প্রচলিত রয়েছে।

৬১৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সম্রাট আবূ মনসূর যাহির : গাযী ইব্ন সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আইয়ুব। তিনি একজন ভালো শাসক ছিলেন। উন্নত চরিত্র ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর মধ্যে কিছুটা বিচার বহির্ভূত মানসিকতা ছিল। লঘু অপরাধে তিনি গুরুদণ্ড প্রদান করতেন। আলিম-উলামা, কবি-সাহিত্যিক ও গরীব-মিসকীনদেরকে তিনি সম্মান করতেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর রাজ কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। আপন পিতার সাথী হয়ে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি

ছিলেন। তিনি সুচিন্তিত মতামত দিতেন, যথোপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করতেন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতেন। ৪৪ বৎসর আয়ু পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিদায়ের পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আল আযীয শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন তার বয়স ছিল তিন বছর। তাঁর কিন্তু বয়স্ক আরো পুত্র সন্তান ছিল। কিন্তু যুবরাজ ঘোষিত এই পুত্র ছিল তাঁর চাচা সুলতান আদিলের কন্যার ঔরসজাত। ওই বাচ্চার মামা ছিল সুলতান আল-আশরাফ, আল-মুআয্‌যাম ও সুলতান আল-কামিল। তার নানা এবং মামাগণ তার যুবরাজ ঘোষণায় কোনো বাধা প্রদান করেনি। তার অন্য কোন ভাইকে যুবরাজ ঘোষণা ও শাসক নির্ধারণ করলে সুলতান আদিল বা তার হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিত। অথচ তাকে শাসক ঘোষণা করায় তারা নানা সুলতান আদিল ও তার মামাগণ তার পক্ষে জনগণের আনুগত্য ও বায়'আত গ্রহণ করে দেন। তার মামা আল-মুআয্‌যাম একবার তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছা গিয়াসউদ্দিন মাহমূদের পক্ষে শাসন কার্য পরিচালনায় নিয়োজিত হয় শিহাবুদ্দীন তুঘ্রিল বেগ আল রুমী আল তুওয়াশী। শিহাবুদ্দীন তুঘ্রিল বেগ একজন দীনদার ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন।

যায়দ ইব্‌ন হাসান : তিনি হলেন যায়দ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আসামাহ। তিনি সমসাময়িক যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম ও শায়খ ছিলেন। তাজুদ্দীন আবুল ইয়ামান আলকিন্দী নামে তিনি সুপরিচিতি ছিলেন। বাগদাদে তাঁর জন্ম হয়। সেখানে তাঁর শৈশব কাটে। সেখানে পড়াশোনা করেন। এরপর দামেস্ক গমন করেন। সেখানে বসবাস করেন। আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রসহ অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি সমসাময়িক পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনের শীর্ষে আরোহন করে। তাঁর যুগের আলিম-উলামা তাঁর দ্বারা উল্লেখ যোগ্যভাবে উপকৃত হন। তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হয়। প্রথম অবস্থায় তিনি হাম্বলী মাযহাবানুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন। ৫২০ হিজরী সনের ২৫ শাবান তাঁর জন্ম হয়। দশ বছর বয়সে তিনি বর্ণনাসূত্র সহ কুরআন মজীদ পাঠ করেন। বড় বড় শায়খ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে তিনি বহু হাদীস গ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্র এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে এবং এই শাস্ত্রগুলোর বিশেষত্ব ব্যক্তিত্ব রূপে তিনি দুনিয়া জোড়া খ্যাতি লাভ করেন। ৫৬৩ হিজরী সনে তিনি সিরিয়া গমন করেন। এরপর তিনি মিশরে অবস্থান করেন এবং বিচারপতি ফযলের সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর পুনরায় দামেস্কে ফিরে আসেন এবং আল 'আজাম ভবনে বসবাস করতে থাকেন। রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা ও মন্ত্রী-সচিবদের নিকট তাঁর প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আলিম-উলামা, রাজা-বাদশা এবং তাদের পুত্র পৌত্রগণ নিয়মিত তাঁর দরবারে যাতায়াত করত। সুলতান সালাহুদ্দীনের পুত্র দামেস্কের শাসনকর্তা আল-আফযাল বার বার তাঁর বাসস্থানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। তাঁর ভাই মুহসিন এবং আল মুআয্‌যাম ও তাই করতেন। আল আজম ভবনে তিনি আল্লামা যামাখশরী রচিত "আল মুফাসসাল" কিতাবটির পাঠ দান করতেন। যে ব্যক্তি এই কিতাব মুখস্থ করত সুলতান আল মুআয্‌যাম তাকে ত্রিশ দীনার বখশিশ প্রদান করতেন। আল আজম ভবনে তার মজলিসে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সকল পণ্ডিতজন উপস্থিত হতেন। শায়খ আলামুদ্দীন সাখাভী, ভাষাবিদ ইয়াহয়া ইব্‌ন মু'তী আল ওয়াজীহ এবং ফখর আত তুর্কী সহ সকলে আগ্রহ সহকারে সেখানে অংশ নিতেন। বিচারপতি ফাযিল তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আল্লামা সাভী

বলেছেন সে তাঁর নিকট এমন সব জ্ঞান ও শিক্ষা পাওয়া যেত যা অন্য কারো নিকট পাওয়া যেত না। আশ্চর্য বিষয় হল সীবাওয়াইহ তাঁর গ্রন্থের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁর নাম হল আমর আর গ্রন্থকারের নাম যায়দ। এ প্রসংগে আমি গ্রন্থকার বলি :

لَمْ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ عَمْرٍو مِثْلَهٗ * وَكَذَا الْكِنْدِيُّ فِيْ اٰخِرِ عَصْرٍ۔

আমরের যুগে তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ ছিল না আর কিন্দীর অবস্থা ও তথৈবচ।

فَهُمَا زَيْدٌ وَعَمْرٌو اِنَّمَا * بُنِيَ النَّحْوُ عَلٰى زَيْدٍ وَعَمْرٍو۔

তারা দুজন বলেন যায়দ এবং আমর। আর আরবি ব্যাকরণে উদাহরণের ভিত্তিই হল যায়দ এবং আমর। আবূ শামা বলেছেন যে, এ প্রসঙ্গে ৫৯২ হিজরীর ইতিহাস আলোচনায় উল্লেখকৃত ইব্‌ন দাহহান বলেছেন :

يَا زَيْدُ زَادَكَ رَبِّيْ مِنْ مَوَاهِبِهٖ * نِعَمًا يُقْصِرُ عَنْ اِدْرَاكِهَا الْاَمَلُ۔

ওহে যায়দ! আমার প্রতিপালক আপন কোষাগার থেকে আপনাকে এত বেশি নে'য়ামত দান করুন যা বুঝতে আশা আকাঙ্খা অপারগ হয়ে যায় :

اَلنَّحْوُ اَنْتَ اَحَقُّ الْعَالَمِيْنَ بِهٖ * اَلَيْسَ بِاسْمِكَ فِيْهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ۔

আরবি ব্যাকরণের জ্ঞানে আপনি হলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আপনার নামেই তো সে বিষয়ে উদাহরণ বর্ণনা করা হয়।

আল্লামা সাখাভী (র) একটি উচ্চস্তরের কবিতার মাধ্যমে তাঁর গুণকীর্তন করেছেন। আবূ মুযাফফর সাবাত ইব্‌নুল জাওযী তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন আমি তাঁর নিকট কুরআন মজীদ পাঠ শিখেছি। তিনি একজন কীর্তিমান কবি ও চরিত্রবান মানুষ ছিলেন। তাঁর মজলিসে একবার বসলে কেউ বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে উঠত না। তাঁর রচনা অতুলনীয় তাঁর হস্তাক্ষর চমৎকার এবং তাঁর কবিতা ছিল উচ্চ পর্যায়ের। তাঁর রচিত একটি বড় কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। এই হিজরী সনের ৬ শাওয়াল সোমবার তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর এক মাস সতের দিন। দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সালেহিয়্যাহ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁরা একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এটিতে ৭৬১ কপি গুরুত্ব পূর্ণ বই-পুস্তক ছিল। তিনি তাঁর লাইব্রেরীটি তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস নজীবুদ্দীন ইয়াকূতের নামে ওয়াক্‌ফ করে দেন। কুরআন হাদীস, ফিক্‌হ ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের জন্যেও তিনি তাঁর কিতাবগুলো ওয়াকফ করেন। এরপর ওই গ্রন্থগুলোকে ইব্‌ন সিনান হালবিয়্যা ভবনের একটি বিরাট কক্ষে সংরক্ষিত করা হয়। এই ভবন ছিল ইমাম যায়নুল আবেদীনের (রা) মাযারের পাশে। পরবর্তীতে গ্রন্থগুলো ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে যায়। এর কতগুলো বিক্রি করে দেয়া হয়। মাত্র স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ ওই রক্ষণাগারে মজুদ ছিল। ইব্‌ন সিনান ভবনটি বর্তমানে হালবিয়্যা ভবন নামে পরিচিত। তিনি মৃত্যুকালে প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে যান। তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সুদর্শন তুর্কী ক্রীতদাসের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। শায়খ যায়দ ইব্‌ন হাসান একজন কোমল হৃদয় ও উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর শাগরিদ ও শিষ্যদের প্রতি তার আচরণ ছিল অমায়িক। ছাত্রদের

প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। অবশ্য বার্ধক্যে পৌঁছে যাবার পর তিনি দাঁড়ানোর রীতিটি ছেড়ে দেন। এবং এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

تَرَكْتُ قِيَامِيْ لِلصَّدِيْقِ يَزُوْرُنِيْ * وَلَا ذَنْبَ لِيْ إِلَّا الْإِطَالَةَ فِيْ عُمْرِيْ.

আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসা আমার বন্ধুকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানানোর রীতি আমি ছেড়ে দিয়েছি, তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো দোষ নেই, শুধু দীর্ঘায়ুজনিত দুর্বলতাই এর কারণ।

فَإِنْ بَلَغُوْا مِنْ عَشْرِ تِسْعِيْنَ نِصْفَهَا * تَبَيَّنَ فِيْ تَرْكِ الْقِيَامِ لَهُمْ عُذْرِيْ.

ওরা যদি নব্বই দশকের অর্ধাঅর্ধি বয়স পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা বর্জনে আমার অপারগতার কথা তারা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারবে।

তিনি সম্রাট মুযাফফর শাহানশাহ-এর প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেছেন তার একাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল। ইব্‌নু সাঈ তার ইতিহাস গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন :

وِصَالُ الْغَوَانِيْ كَانَ أَوْرَى وَأَرْجَا * وَعَصْرُ التَّدَانِيْ كَانَ أَبْهَى وَأَبْهَجَا.

তিনি ছিলেন হিংসুকের সাথে এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী। আশা ভরসার কেন্দ্র বিন্দু। নৈকট্য স্থাপনে অগ্রণী এবং সুদর্শন ব্যক্তিত্ব।

لَيَالِيْ كَانَ الْعُمْرُ أَحْسَنَ شَافِعٍ * تَوَلَّى وَكَانَ اللَّهْوُ أَوْضَحَ مَنْهَجَا.

যখন তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ওই ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে সুপারিশকারী ছিল। আর ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর মনমানসিকতায় কিছুটা ক্রীড়া কৌতুকের প্রতি আকর্ষণ ছিল।

بَدَا الشَّيْبُ فَانْجَابَتْ طَمَاعِيَةُ الصِّبَا * وَقَبَّحَ لِيْ مَا كَانَ يَسْتَحْسِنُ الْحَجَا.

তাঁর বার্ধক্য প্রকাশিত হল ফলে প্রেম-আকাংখা আত্মগোপন করল, কিন্তু হাসি তামাসা ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আমার দৃষ্টিতে মত্ত বলে চিহ্নিত হল।

بِلَهْنِيَةٍ وَلَّتْ كَأَنْ لَمْ أَكُنْ بِهَا * أَجُلِيْ بِهَا وَجْهَ النَّعِيْمِ مُسَرَّجَا.

তৃপ্তি সহকারে সে আমোদ প্রমোদে ডুবেছিল, যেন আমি সেখানে ছিলাম না। এগুলোর মাধ্যমে সে আমোদ প্রিয় মানুষদের আনন্দ বৃদ্ধি করেছে।

وَلَا اخْتَلْتُ فِيْ بُرْدِ الشَّبَابِ مُجَرَّرًا * ذُيُوْلِيْ إِعْجَابًا بِهِ وَتَبَرُّجَا.

তার বিক্রয় কর্মে আনন্দিত হয়ে আমি কিন্তু যৌবনের চাদর ছেড়ে দিয়ে পা পিছলে পড়ে যাইনি।

أَعَارَكَ غَيْدَاءُ الْمَعَاطِفِ طِفْلَةً * وَأَغْيَدُ مَعْسُوْلِ الْمَرَاشِفِ أَدْعَجَا.

আনন্দ ফুর্তির আকর্ষণ তোমাকে কৈশোরের মানসিকতায় প্রতারিত করেছে।

تَقَضَّتْ لَيَالِيْهَا بِطِيْبٍ كَأَنَّهُ * لِتَقْصِيْرٍ مِنْهَا تَخْتَطِفُ الدُّجَا.

রাতের পর রাত আমোদ আহলাদে কেটে গিয়েছে, মনে হচ্ছিল যে, রাতগুলো হোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে।

فَإِنْ أَمْسَ مَكْرُوْبَ الْفُوَأْرِ حَزِيْنُهُ * أُعَاقِرُ مِنْ دُرِّ الصَّبَابَةِ مَنْهَجًا۔

আমি যদি কোন যদিন পেরেশান ও দুঃখ বোধ করি তখন প্রেমাসক্তি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে আনন্দের অন্য পথ তৈরি করে নেয় নিই।

وَحِيْدًا عَلَى أَنِّيْ بِفَضْلِي مُتَيَّمٌ * مروعا باعداء الفضائل مزعجا۔

এটি অনন্য বিষয়। আমার মর্যাদায় আমি তৃপ্ত, অতিরিক্ত মর্যাদা অর্জনে আমি সদা তৎপর,

فَيَارُبَّ دِيْنِيْ قَدْ سَرَدْتُ وَسَرَّنِيْ * وَابْهَجْتُهُ بِالصَّالِحَاتِ وَأَبْهَجَا۔

ওহে আমার ধর্মীয় প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ ; আমি তাকে খুশী করেছি, সেও আমাকে খুশী করেছে। সৎকর্ম দিয়ে আমি তাকে চমৎকৃত করেছি সেও অনুরূপ করেছে।

وَيَارُبَّ نَادٍ قَدْ شَهِدْتُ وَمَاجِدٍ * شَهِدْتُ دَعْوَتَهُ فَتَلَجْلَجَا۔

ও শ্রোতা, আমি বহু মাহফিলে আসরে উপস্থিত হয়েছি, তার দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে অস্পষ্টতা ও জট লেগে গিয়েছিল।

صَدَعْتُ بِفَضْلِيْ نَقْصَهُ فَتَرَكْتُهُ * وَفِيْ قَلْبِهِ شَجْوٌ وَفِيْ حَلْقِهِ شَجَا۔

আমার মর্যাদা ও সম্মানের আঘাতে আমি তার ত্রুটিগুলো কুঁড়িয়ে তুলছি, অতঃপর তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি যে, তার মনে রয়েছে দুঃখ তার গলায় বেঁধে রয়েছে কাঁটা।

كَأَنَّ ثَنَائِيْ فِيْ مَسَامِعِ حَسَدِيْ * وَقَدْ ضَمَّ أَبْكَارَ الْمَعَانِيْ وَأَدْرَجَا۔

ভাব গম্ভীর ও উন্নত ভাষায় আমার প্রশংসা আমার হিংসুকের কানে যেন : তীক্ষ্ণধার তরবারি।

حُسَامُ تَقِي الدِّيْنِ فِيْ كُلِّ مَارِقٍ * يَقُدُّ إِلَى الْأَرْضِ الْكُمَى الْمُدَجَّجَا۔

যেটি সর্ব-সংঘর্ষে দীনকে রক্ষা করে। পূর্ণ অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত বীরযোদ্ধা যেটি পরিচালনা করে।

মুযাফফর শাহের ভাই মুইয্যুদ্দীন ফাররূখ শাহ ইব্‌ন শাহানশাহ ইব্‌ন আইয়ূবের প্রশংসায় তিনি বলেছেন :

هَلْ أَنْتَ رَاحِمُ عَبْرَةٍ وَمَدَلَّهِ * وَمُجِيْرُ صَبٍّ عِنْدَ مَا مِنْهُ وَهِيَ۔

আপনি কি নয়নাশ্রুর প্রতি দয়া দেখাবেন? প্রেম পাগল যাযাবরকে আশ্রয় দিবেন।

هَيْهَاتَ يَرْحَمُ قَاتِلٌ مَقْتُوْلَهُ * وَسِنَانُهُ فِي الْقَلْبِ غَيْرُ مُنَهْنَهٍ۔

হত্যাকারী তার নিহত ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখাবে তা তো সুদূর পরাহত, তার আঘাত তার অন্তরে থাকে অফুরান।

مُذْ بَلَّ مِنْ ذَاكَ الْغَرَامِ فَإِنَّنِيْ * مُذْ حَلَّ بِيْ مَرَضُ الْهَوٰى لَمْ أَنْقَهِ۔

ওই প্রেম রোগ যখন থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে তখন থেকে আমি আর তা থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

اِنِّيْ بَلِيْتُ بِحُبِّ اَغْيَدَ سَاحِرٍ * بِلِحَاظِهٖ رُخِّصَ الْبَنَانُ بِزَهْوِهٖ۔

আমি তো এক কুশলী যাদুকরের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে পড়েছি। যার যাদুর প্রভাবে ফুল বাগান তার পত্র পল্লবে সুশোভিত ও আন্দোলিত হয়ে উঠে।

اَبْغَشَ شِفَاهَ تَدَلُّهِيْ مِنْ وَالِهٖ * وَمَتٰى يَرُقُّ مُدَلِّلٌ لِمُدَلَّهٖ۔

আমি তো আমার প্রেমিকের প্রেমাসক্তি থেকে মুক্তি চাই। কিন্তু প্রেমিক কি তার প্রেমাস্পদকে মুক্ত হবার জন্যে ঝাঁর ফুঁক করে?

كَمْ اٰهَةٍ لِيْ فِيْ هَوَاهُ وَاَنَّةٍ * لَوْ كَانَ يَنْفَعُنِيْ عَلَيْهِ تَاَوُّهِيْ۔

আমার কান্নাকাটি ও আহাজারির যদি তার প্রেম থেকে মুক্তি পেতে কাজে আসত তাহলে আমি বহু কান্নাকাটি করতাম, বহু আহাজারি করতাম।

وَمَارِبٍ فِيْ وُصْلِهٖ لَوْ اَنَّهَا * تُقْضٰى لَكَانَتْ عِنْدَ مَبْسَمِهٖ الشُّهٰى۔

তার সাথে মিলনেও অনেক বাকী ও প্রতিবন্ধতা রয়েছে। সেগুলো অতিক্রম করা গেলে অবশ্য প্রেমের হাসি হাসা যেত।

يَا مُفْرَدًا بِالْحُسْنِ اِنَّكَ مُنْتَهٍ * فِيْهِ كَمَا اَنَا فِي الصَّبَابَةِ مُنْتَهِىْ۔

ওহে সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় অনন্য মানুষ। আপনি সৌন্দর্যে পূর্ণতা লাভ করেছেন যেমন আমি প্রেমাসক্তিতে পূর্ণতা অর্জন করেছি।

قَدْ لَامَ فِيْكَ مَعَاشِرٌ كَيْ اَنْتَهِيْ * بِاللَّوْمِ عَنْ حُبِّ الْحَيَاةِ وَاَنْتَ هِيْ۔

আপনার প্রেমে মজে যাবার কারণে আমাকে বহু মানুষ গালমন্দ করেছে এবং হুমকি তিরস্কারের মাধ্যমে আমাকে প্রেমজগত ছেড়ে বেরিয়ে আসার আহবান জানিয়েছে।

اَبْكِيْ لَدَيْهِ فَاِنَّ اَحْسَنُ يَلُوْعَةٍ * وَتَشَهُّقِيْ اَرْمِيْ بِطَرْفٍ مُقَهْقَهٍ۔

সে কথা শুনে আমি অঝোর ধারায় কেঁদেছি :

يَا مَنْ مَحَاسِنُهٗ وَحَالِيْ عِنْدَهٗ * حَيْرَانُ بَيْنَ تَفَكُّرٍ وَتَكَفُّهٖ۔

ওহে আমার প্রেমাস্পদ! যার সৌন্দর্য এবং যার সম্পর্কে আমার অবস্থান চিন্তা ভাবনা এবং স্বাদ-মজায় দোদুল্যমান।

ضِدَّانِ قَدْ جُمِعَا لِلَفْظٍ وَاحِدٍ * لِيْ فِيْ هَوَاهُ بِمَعْنَيَيْنِ مُوَجَّهٖ۔

তার ভালবাসায় আমার নিকট একই শব্দে দুটো বিপরীত অর্থ একত্রিত হয়েছে।

اَوَلَسْتَ رَبَّ فَضَائِلٍ لَوْ حَازَ * اَدْنَاهَا وَمَا اَهْلٰى بِهَا غَيْرِيْ زُهٰى۔

আপনি কি এমন সর্বমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন যার ক্ষুদ্রতম অংশ আর অন্যের বৃহত্তর অংশ তুলনা করলে আপনার অংশটি বিজয়ী হবে। সুলতান সালাহুদ্দীনের হত্যা ষড়যন্ত্রে

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়দাতা আম্মারাহ ইয়ামাচীর মৃত্যুদণ্ডে পরিস্থিতি বর্ণনায় তাজুদ্দীন কিন্দীর কবিতা :

عَمَّارَةٌ فِي الْإِسْلَامِ اَبْدٰى خِيَانَةً * وَحَالَفَ فِيْهَا بِيْعَةً وَصَلِيْبًا۔

মুসলমান আম্মারাহ এক পর্যায়ে বিশ্বাস ঘাতকতায় জড়িয়ে পড়ে। এই সুত্রে সে গীর্জা ও ক্রুশচিহ্নের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

فَاَمْسٰى شَرِيْكَ الشِّرْكِ فِي بَغْضِ اَحْمَدَ * وَاَصْبَحَ فِي حُبِّ الصَّلِيْبِ صَلِيْبًا۔

আহমদের প্রতি বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে সে শিরকবাদের সদস্য হয়ে যায় এবং ক্রুশ চিহ্নের ভালবাসায় দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল হয়ে যায়।

وَكَانَ طِبِيب الْمُلْتَقٰى اِنْ عَجَمْتَهٗ * تجد مِنْهُ عُوْدًا فِي النِّفَاقِ صَلِيْبًا۔

সে একজন ভাল লোক ছিল। এখন তুমি তাকে যাচাই করলে দেখতে পাবে যে, মুনাফিকীতে প্রত্যাবর্তনে তার মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছা রয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন :

صَحِبْنَا الدَّهْرَ اَيَّامًا حَسَّانًا * نَعُوْمُ بِهِنَّ فِي اللَّذَّاتِ عَوْمًا۔

আমাদের যুগ যুগান্তের পরিক্রমায় আমরা বহু সুন্দর দিনের সাহচর্য পেয়েছি। ওসব নিয়ে আমরা আরামে দিন কাটিয়েছি।

وَكَانَتْ بَعْدَ مَا وَلَّتْ كَاَنِّيْ * لَدٰى نُقْصَانِهَا حُلْمًا وَنَوْمًا۔

ওই দিবসগুলো চলে যাবার পর আমি ওই দিবসগুলো হারিয়ে ফেলার পর সেগুলোকে এখন নিদ্রা ও স্বপ্ন মনে হচ্ছে :

اَنَاخَ بِيَ الْمَشِيْبُ فَلَا يُرَاحُ * وَاِنْ اَوْسَعْتُهٗ عِتَبًا وَلَوْمًا۔

বার্ধক্য আমার উপর এসে জমে বসেছে আমি এখন তাকে যত গালমন্দ করি সে যাচ্ছে না।

نُزِيْلُ فَلَا يَزَالُ عَلَى التَّاَنِّيْ * يَسُوْقُ اِلَى الرَّدِّيِّ يَوْمًا فَيَوْمًا۔

আমি ওই বার্ধক্যকে ফেলে দিই। কিন্তু সে দূরীভূত হয় না। বরং দিনে দনি পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

وَكُنْتُ اُعُدُّ لِيْ عَامًا فَعَامًا * فَصِرْتُ اَعُدُّ لِيْ يَوْمًا فَيَوْمًا۔

একটা সময় ছিল যখন আমি যৌবনের জন্যে-তারুণ্যের জন্যে বছর বছর প্রস্তুতি নিতাম। আর এখন আমি দিনে দিনে দুর্বলতায় ও বার্ধক্যে ফিরে যাচ্ছি।

আল হজ্জ মুহাম্মদ ইবন হাফিয আবদুল গণী মুকাদ্দেসী : ৫৬৬ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে বহু হাদীস শেখান। একপর্যায়ে তিনি বাগদাদ গমন করেন। এবং সেখানে মুসনাদ-ই-আহমদ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন। দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করতেন। সুলতান মুআয্যামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। তিনি একজন সৎ, দীনদার, পরহেযগার ও হাদীসের হাফিয ব্যক্তি ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি এবং তাঁর পিতার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন।

আবুল ফাতূহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুবারক : ৬১৩ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন আবুল ফাতূহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুবারক আল খালাখিলী আল বাগদাদী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন। খলীফা এবং সুলতান আশরাফ ইব্‌ন আদিলের মধ্যে দুতিয়ালীও বার্তাবাহকের কাজ করতেন তিনি। তিনি একজন সত্যবাদী আস্থাভাজন, দীনদার ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন।

শরীফ আবূ জাফর : তিনি হলেন শরীফ আবূ জাফর ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল আলাভী আল হুসায়নী। তাঁর পিতার মৃত্যুর তিনি বসরাতে ছাত্র বিষয়ক দায়িত্বশীলের পদ অলংকৃত করেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক সম্মানী এবং বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শায়খ ছিলেন। বিশেষত বংশ-ইতিহাস; আরব ইতিহাস এবং কাব্যশাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক জানাশোনা ছিল। খলীফা নাসিরের অন্যতম সভাষদ ছিলেন তিনি। তাঁর মানসম্পন্ন কবিতার একাংশ এই :

لِيَهْنِكَ سَمْعٌ لَا يُلَائِمُهُ الْعَذْلُ * وَقَلْبٌ قَرِيحٌ لَا يَمُلُّ وَلَا يَسْلُوْ۔

শ্রবণেন্দ্রিয় তার প্রতি নিবিষ্ট হোক, নিন্দা-সমালোচনা তার জন্যে সমীচিন নয়। অন্তর আঘাতপ্রাপ্ত কিন্তু সেটি বিরক্ত নয়।

كَانَّ عَلَيَّ الْحُبُّ اَضْحٰى فَرِيْضَةً * فَلَيْسَ لِقَلْبِيْ غَيْرُهٗ اَبَدًا شُغْلُ۔

তার প্রতি ভালবাসা পোষণ যেন আমার জন্যে ফরয হয়ে গিয়েছে, তার চিন্তা ব্যতীত আমার অন্তরে অন্য কিছুর স্থান নেই।

وَاِنِّيْ لَاَهْوٰى الْهِجْرَ مَا كَانَ اَصْلُهٗ * دَلَالًا وَلَوْ لَا الْهِجْرُ مَا عَذَابَ الْوَصْلُ۔

আমি তাঁর বিরহ ততক্ষণ কামনা করি যতক্ষণ ওই বিরহ আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে বস্তুত বিচ্ছেদ ও বিরহ ব্যতীত মিলনে স্বাদ নেই।

وَاَمَّا اِذَا كَانَ الصَّدُوْدُ مَلَالَةً * فَأَيْسَرُ مَا هَمَّ الْحَبِيْبُ بِهِ الْقَتْلُ۔

পক্ষান্তরে বিচ্ছেদ, বিরহ ও প্রতিবন্ধকতা যদি দুঃখ ও বেদনার দিকে ধাবিত করে তাহলে প্রেমিকের সহজ চিন্তা হল আত্মহত্যা করা।

আবূ আলী মাযীদ ইব্‌ন আলী : ইব্‌ন মাযীদ ওরফে ইব্‌ন খাশ গুরী। তিনি একজন নামকরা কবি ছিলেন। তিনি নুমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি নিজে একটি কাব্যগ্রন্থ সংকলন করেন। ইবনুস সাঈ তাঁর কবিতার একাংশ উদ্ধৃত করেছেন যেমন :

سَأَلْتُكِ يَوْمَ النَّوٰى نَظْرَةً * فَلَمْ تَسْمَحِيْ فَعَزَّالأسلام۔

বিদায় দিবসে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার দিকে তাকাতে। তুমি তাতে সায় দাওনি। সুতরাং সম্পর্কচ্যুতিতেই শান্তি ও নিরাপত্তা।

فَاَعْجَبُ كَيْفَ تَقُوْلِيْنَ لَا * وَوَجْهُكِ قَدْ خُطَّ فِيْهِ نَعَمْ۔

আমি অবাক হই এজন্যে য, তুমি "না" বললে কীভাবে! অথচ তোমার মুখমণ্ডলে "হাঁ" বলার রেখা ফুটে উঠেছিল।

أَمَّا النُّوْنُ يَا هٰذِهِ حَاجِبٌ * أَمَّا الْعَيْنُ عَيْنٌ أَمَّا الْمِيْمُ فَمٌ.

ওহে প্রেমিকা! نَعَمْ এবং হাঁ বলার ক্ষেত্রে নূন বর্ণটি বাধা ছিল, নতুবা আঈন বিশিষ্ট চক্ষু এবং মীম বিশিষ্ট মুখতো তা বলার জন্যে উদগ্রীব ছিল।

আবুল ফযল রিশওয়ান ইব্ন মনসূর : ইব্ন রিশওয়ান আল কুর্দী ওরফে নাকাফ। আরবিলে তাঁর জন্ম। সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত ছিলেন। তিনি একজন ভাল কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। সুলতান আদিলের অধীনে চাকুরী করেছেন তিনি। তার কবিতার একাংশ এই :

سَلِيْ عَنِّي الصَّوَارِمَ وَالرِّمَاحَا * وَخَيْلًا تَسْبِقُ الْهَوْجَ الرِّيَاحَا.

তুমি আমার নিকট চাও তীক্ষ্ণ তরবারি, বর্শা, এং অশ্বদল যেগুলো দ্রুতগামিতায় বাতাসকে ছাড়িয়ে যায়,

وَأَسَدًا حَبِيْبُهَا سَمْرُ الْعَوَالِيْ * إِذَا مَا الْأَسَدُ حَاوَلَتِ الْكِفَاحَا.

তুমি সিংহও চাইতে পার। যে সিংহের নিয়ন্ত্রক তাকে উঁচু পর্বতে বিচরণ করতে দেয় যদি সিংহটি বিচরণ করতে চায়।

فَإِنِّيْ ثَابِتٌ عَقْلًا وَلِيًّا * إِذَا مَا صَائِحٌ فِي الْحَرْبِ صَاحَا.

কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীত বিহবল ব্যক্তি যখন বুক ফাটা চীৎকার করে তখন ও আমি ধীরস্থির ও সুস্থ মনে অবিচল থাকি।

وَأُوْرِدُ مُهْجَتِيْ لُجَجَ الْمَنَايَا * إِذَا مَاجَتْ وَلَمْ أَخْفِ الْجِرَاحَا.

মৃত্যুর সাগর যখন ঢেউ খেলতে থাকে তখন আমি আমার প্রাণকে তার মধ্যে নিক্ষেপিত করি, আঘাতপ্রাপ্তও জখম হৃদয়কে আমি ভয় করি না।

وَكَمْ لَيْلٍ سَهِرْتُ وَبِتُّ فِيْهِ * أُرَاعِي النَّجْمَ أَرْتَقِبُ الصَّبَاحَا.

বহু রাত আমি নির্ঘুম কাটিয়েছি, ওই রাতগুলো আমি অতিবাহিত করেছি তারকারাজি দেখে দেখে এবং প্রভাত অপেক্ষায়।

وَكَمْ فِيْ فَدْفَدٍ فَرَسِيْ وَنَضْوِيْ * بِقَائِلَةِ الْهَجِيْرِ غَدًا وَرَاحَا.

আমার অশ্বের ক্ষুরাঘাতে ও পদাঘাতে সকাল বিকাল কত দুপুরে ঘুমানো আয়েশী মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

لَعَيْنُكِ فِي الْعَجَاجَةِ مَا أُلَاقِيْ * وَأَثْبُتُ فِي الْكَرِيْهَةِ لَا بَرَاحَا.

তোমার নয়নের শপথ, আমি যে সংঘর্ষের মুখোমুখি হই তার ধুলিঝড়ে ওরা হারিয়ে যায়। শত দুর্যোগেও আমি অটল, অবিচল ও সু-স্থির থাকি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্য়া : ইব্ন হিবাতুল্লাহ আবূ নাসর আন নুহাসুল ওয়াসিতী, তিনি সিবতের নিকট যে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ :

وَقَائِلَةٍ لَمَّا عُمِّرْتُ وَصَارَ لِيْ * ثَمَانُوْنَ عَامًا عِشْ كَذَا وَابْقَ وَاسْلَمِ.

বহু মহিলা আছে যারা আমার আশি বছর বয়স হয়ে যাবার পরও বলে তুমি যথারীতি বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবি ও নিরাপদ থাক।

وَدُمْ وَانْتَشِقْ رُوْحَ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ * لَأَطْيَبُ مِنْ بَيْتٍ بِصَعْدَقٍ مُظْلِمِ.

আর চালিয়ে যাও, জীবনের প্রাণ চলমান রাখ কারণ অন্ধকার ঘর থেকে এটি অতি উত্তম।

فَقُلْتُ لَهَا عُذْرِىْ لَدَيْكِ مُمَهَّدٌ * بِبَيْتِ زُهَيْرٍ فَاعْلَمِىْ وَتَعَلَّمِىْ۔

আমি তাকে বললাম, আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য কবি যুহায়রের কবিতার চরণে বিবৃত রয়েছে, তুমি তা শোন এবং শিখে নাও।

سَئِمْتُ تَكَالِيْفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَّعِشْ * ثَمَانِيْنَ حَوْلًا لَاحَالَةَ يَسْأَمِ۔

আমি জীবনের কষ্ট হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি, যে ব্যক্তি আশি বৎসর আয়ু পায় সে অবশ্যই জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

৬১৪ হিজরী সন (১২১৮ খ্রি.)

এই হিজরী সনের ৩ মুহাররাম উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের অংশে টাইলস লাগানো সমাপ্ত হয়। দামেস্কের শাসনকর্তা মুতামিদ মুবারিদুদ্দীন ইব্রাহীম এ উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হন এবং যিয়ারতী ফটকের পাশে শেষ পাথরটি নিজ হাতে স্থাপন করে ওই কাজের পূর্ণতা ঘোষণা করেন। এই হিজরী সনে বাগদাদের নিকটে ইউফ্রেটিস নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে ফুলে উঠে। সমাধিস্থল ডুবিয়ে দেয়ার মাত্র দুআঙ্গুল বাকী থাকে। এরপর পানি আরো বেড়ে যায় এবং বাগদাদ নগরী পানিতে তলিয়ে যায়। সাত দিন আট রাত এমনটি চলতে থাকে। মানুষ মৃত্যু নিশ্চিত জেনে নেয়। এরপর মহান আল্লাহ্ দয়া করেন। পানি কমতে থাকে। নদীর পানি নদীতে ফিরে যায়। তখন বাগদাদ হয়ে একটি বিধ্বস্ত নগরী। অধিকাংশ ঘর বাড়ি ভেঙ্গে চুরে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। এই হিজরী সনে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন ফাদলান নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিচারকগণ তাঁর নিকট আসতে থাকেন। এই হিজরী সনে সদর ইব্ন হামরাওয়াইহ সুলতান আদিলের পক্ষ থেকে খলীফার জন্যে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়। এই হিজরী সনে তদীয় পুত্র ফখর ইব্ন কামিল সুলতান মুআযযামের নিকট আগমন করে এবং নিজ পুত্র ইয়ামানের শাসনকর্তা ইকসীসের সাথে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। বিশালাংকের দেন মোহর ধার্য করে দামেস্কে ওই বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই হিজরী সনে চার লক্ষ সৈন্য নিয়ে মতান্তরে সাত লক্ষ সৈন্য নিয়ে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ মুহাম্মদ ইব্ন তাকাশ হামদান থেকে বাগদাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। খলীফা তার কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সৈন্যদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ খলীফার নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে, পূর্ববর্তী সেলজুক নৃপতিগণ খলীফার নিকট থেকে যে সুযোগ ও অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছিল তাঁকেও যেন সে অধিকার প্রদান করা হয় এবং বাগদাদে খলীফার নামের পরিবর্তে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। খলীফা তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেননি। তিনি শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে সুলতানের নিকট পাঠালেন আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের জন্যে। শায়খ শিহাবুদ্দীন সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সুলতানের আশেপাশে বহু আমীর-উমারা ও শাসনকর্তা। সুলতান দাসী কাষ্ঠের তৈরী একটি সিংহাসনে স্বর্ণের গদিতে বসে আছেন। পাঁচ দিরহাম মূল্যের বুখারায় বানানো একটি জুব্বা তাঁর গায়ে। মাথায় এক দিরহাম মূল্যের চামড়ার টুপি। শায়খ তাঁকে সালাম দিলেন। অহংকার বশত সুলতান সালামের জবাব দেননি। তাঁকে বসতে ও বলেননি। শায়খ সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে

একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। বক্তৃতায় তিনি আব্বাসী বংশের মান-মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় উল্লেখ করলেন। আব্বাসীদের প্রতি অন্যায় আচরণ নিষিদ্ধজনিত একটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিলেন। দোভাষী এসব বক্তব্য সুলতানকে বুঝিয়ে দিল। উত্তরে সুলতান বললেন, কর্মরত খলীফা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য যথার্থ নয়। বরং আমি যখন বাগদাদে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করব তখন একজন যোগ্য ও যথার্থ এ মানসম্পন্ন খলীফা নিযুক্ত করব। আর আব্বাসীয়দের প্রতি অন্যায় আচরণের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমি জানি; আমি কোনো আব্বাসী সদস্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করিনি, কষ্ট দিইনি। কিন্তু এই খলীফা তাঁর কারাগারে এখনো বহু আব্বাসীয় ব্যক্তিকে বন্দী করে রেখেছেন। দিনের পর দিন বছরের পর বছর তাঁরা বন্দীত্ব জীবন যাপন করছেন। এমনকি সেখানে তাঁদের ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করছে। সুতরাং এই খলীফাই আব্বাসীয়দেরকে কষ্ট দিচ্ছেন। এরপর শায়খ সোহরাওয়ার্দী কোন জবাব নিয়ে খলীফার নিকট ফিরে আসেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ ও তাঁর সেনাদলের উপর একটি বিশালাকারের বরফ খণ্ড অবতীর্ণ করেন। ি নদিন ওই বরফ খণ্ড তাদের মাথার উপরে অবস্থান করে। তাদের তাঁবু ছাউনী সব ধ্বংস হ‍ে ‍ায়। সৈনিকদের হাত পা কেটে যায়। গণ-গযবে তারা পতিত হয়। অতঃপর ব্যর্থ মনোরথে ‍হান আল্লাহ্ তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। সর্বাধিক প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত।

সুলতান আদিল ও ফ্রাংকদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি এই হিজরী সনে ভঙ্গ হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে সুলতান আদিল মিশর ছেড়ে বের হন এবং বীসানে তাঁর পুত্র মুআযযামের সাথে মিলিত হন। এই সুযোগে ফ্রাংকগণ আক্কা থেকে যাত্রা করে আদিলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে। উপকুলীয় শাসনকর্তাগণ তাদের সাথে যোগ দেয়। শত্রুপক্ষের বিশাল সেনাবাহিনী এবং নিজ সৈন্যের স্বল্পতা দেখে সুলতান আদিল পালিয়ে যাবার মনস্থ করলেন। তখন তাঁর পুত্র মুআয্যাম বলল পিতা! কোথায় যাচ্ছেন? অনারবী ভাষায় পিতাকে বকাঝকা করে মুআয্যাম বললেন, আপনার মামলূক ও ক্রীতদাসগণ সিরিয়া দখল করে নিয়েছে আর আপনি জনগণকে অরক্ষিত রেখে পালিয়ে যাচ্ছেন। এরপর সুলতান আদিল দামেস্ক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানকার শাসনকর্তা মুতামিদকে ওই নগর ফ্রাংকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। প্রয়োজনীয় রসদপত্র নগরের অরক্ষিত স্থান থেকে সেনাছাউনী ও দূর্গের মধ্যে স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন। দারিয়া, হাজ্জাজের প্রাসাদ এবং শাগুর অঞ্চলের পানি ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ফ্রাংকদের আক্রমণের সংবাদে জনগণের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা কাকুতি মিনতি সহকারে মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ প্রার্থনা করতে থাকে। জামে মসজিদে মানুষের আহাজার ও কান্নার রোল উঠে। ইতিমধ্যে সুলতান ফিরে আসেন এবং মারজ-আল-সফরে অবস্থান নেন। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তাদেরকে নির্দেশ দেন ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্যে এগিয়ে আসতে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন হিমসের শাসনকর্তা আসাদুদ্দীন। লোকজন তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি আল ফারজ ফটক দিয়ে প্রবেশ করেন। মারিস্তানের পাশে সিতত্তুশ শামে সালাম নিবেদন করে তিনি নিজ বাসস্থানে গমন করেন। শাসনকর্তা আসাদুদ্দীনের আগমনে জনগণের ভয়ভীতি কেটে যায়। তারা সাহসী হয়ে উঠে। প্রত্যুষে তিনি সুলতান আদিলের সাথে সাক্ষাতের জন্যে মারজ আস সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা

করেন। অন্যদিকে ফ্রাংকগণ বীসানে অবতরণ করে এবং তাঁবু স্থাপন করে। তারা সেখানকার খাদ্য শস্য ধন সম্পদ ও গবাদি পশু লুট করে। সেখানে বহু মানুষকে খুন ও বন্দী করে। বীমান থেকে বানিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তারা খুন খারাবি ও লুট তরাজের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এরপর তারা জাওলান হয়ে নাওয়ার দিকে বের হয়। সুলতান মুআযযাম সসৈন্যে বের হয়ে আল কুদস ও নাবলুসের মধ্যবর্তী আকাবা-আল লাবানে অবস্থান গ্রহণ করেন আল কুদসকে ওদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে। কারণ, আল কুদসকে রক্ষা করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এরপর ফ্রাংকগণ আততূর দূর্গ অবরোধ করে। দূর্গে অবস্থান কারী সৈনিকদেরকে দূর্গ ত্যাগে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। অবশেষে মুসলিম বন্দীদেরকে নিয়ে ফ্রাংকগণ আককাতে ফিরে যায়। অতঃপর সুলতান মুআযযাম তূর দূর্গে আসেন এবং বন্দী সৈনিক ও সেনাপতিদেরকে উদ্ধার করে রাজকীয় উপহারে ভূষিত করেন। এরপর পিতা-পুত্র দুজনে তূর দূর্গ ধ্বংস করে ফেলতে একমত হন। এই বিষয়ে পরে আলোচনা হবে।

৬১৪ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ আল ইমাদ : তিনি হলেন আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সারূর আল মুকাদ্দেসী। খ্যাতিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খ আবদুল গণী মুকাদ্দেসী তাঁর ভাই। শায়খন ইমাদী তাঁর ভাই আবদুল গণী থেকে দু বছরের গ্রন্থটি। ৫৫১ হিজরী সনে একদল লোকের সাথে তিনি দামেস্কে আগমন করেন। তিনি দুবার বাগদাদ গমন করেন। হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। তিনি একজন ইবাদতী, সংযমী, পরহেযগার ও প্রচুর রোযা পালনকারী ব্যক্তি ছিলেন। পুরো বৎসর তিনি একদিন রোযা রাখতেন একদিন রোযা ছাড়তেন। তিনি একজন ও ফিক্‌হ বিশারদ ও মুফতী ছিলেন। তিনি শাখা মাসআলাসমূহ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। মূল বিধি বিধান সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছিলেন কিন্তু সেটি সমাপ্ত করতে পারেননি। শায়খ মুওয়াফফিকের সাথে তিনি হাম্বলী মিহরাবে ইমামতি করতেন। প্রথমদিকে তাঁরা মিহরাব ব্যতীত নামায আদায় করতেন। ৬১৭ হিজরী সনে তারা মিহরাবে নামায আদায় শুরু করেন। ছুটে যাওয়া ও কাযা হয়ে যাওয়া নামায তিনি জামাআতের সাথে আদায় করতেন এবং তিনি তাতে ইমামতি করতেন। তিনিই প্রথম এই প্রথা চালু করেন। একদিন রোযা রেখে ইফতার করে মাগরিবের নামায আদায় করে তিনি বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ মুওয়াফফিক তাদের জায়নামাযের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জানাযায় ইমামতি করেন। এরপর তাঁর সাফাহ-তে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বহু লোকের উপস্থিতির কারণে দিনটি স্মরণীয় দিনে পরিণত হয়। সাবাত ইব্‌নুল জাওযী বলেন সেদিন মুসল্লিগণের অবস্থান আল কাহফ থেকে শুরু করে মাগারা আলদাম হয়ে মানতুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাদের অবস্থান এত ঘন ও লাগালাগি ছিল যে, তিল ছিঁটিয়ে দিলে একটি তিল ও মাটিতে পড়ত না বরং মানুষের মাথায় গিয়ে পড়ত। তিনি আরো বলেন দাফন শেষে ওই রাতে বাড়ী এসে আমি তাঁকে নিয়ে ভাবতে থাকি। তাঁরা জানাযা ও তাতে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতির বিষয়টি চিন্তা করতে থাকি। আমি তখন বলেছিলাম যে, মানুষটি তো নেককার ও পূণ্যবান মানুষ। সম্ভবত তাঁকে কবরে রাখার পর তিনি তাঁর

প্রতিপালকের দিকে তাকিয়েছিলেন। এ সময়ে আল্লামা ছাওরীর কবিতার কথা আমার মনে পড়ে গেল, যেগুলো মৃত্যুর পর স্বপ্নের মধ্যে তিনি তাঁর জনৈক ভক্তকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সেগুলো হল :

نَظَرْتُ اِلٰى رَبِّىْ كَفَاحًا فَقَالَ لِىْ * هَنِيْئًا رِضَائِىْ عَنْكَ يَا ابْنَ سَعِيْدٍ۔

আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি তাকিয়েছি সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্ন সাঈদ আমার সন্তুষ্টি পাবার জন্যে তুমি সানন্দে এগিয়ে আস।

لَقَدْ كُنْتَ قَوَّامًا اِذْ اَظْلَمَ الدُّجَا * بِعَبْرَةِ مُشْتَاقٍ وَقَلْبِ عَمِيْدٍ۔

রাত্রি যখন গভীর হত তুমি তো অশ্রুসজল নয়নে আর দৃঢ়চিত্ত কাল্‌ব নিয়ে আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদতে মগ্ন থাকতে।

فَدُوْنَكَ فَاخْتَرْ اَىَّ قَصْرٍ اَرَدْتَهُ * وَزُرْنِىْ فَاِنِّىْ عَنْكَ غَيْرَ بَعِيْدٍ۔

নিয়ে নাও, যে প্রাসাদটি তোমার পছন্দ হয় সেটি বুঝে নাও, আর আমার দর্শন লাভ কর, আমি তোমার থেকে দূরে নাই।

আমি মনে মনে বললাম আমার আশা যে, আল্লামা দাওরী যেমন মহান আল্লাহ্‌কে দেখেছেন শায়খ ইমাদও মহান আল্লাহ্‌কে দেখেছেন। এসব ভেবে ভেবে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে আমি শায়খ ইমাদকে দেখলাম তাঁর গায়ে সবুজ চাদর এবং মাথায় সবুজ পাগড়ি। বাগানের মত বিস্তৃত এক জায়গায় তিনি সহাবস্থান করছেন। বিশালাকারের এক সিঁড়ি বেয়ে তিনি উপরের দিকে উঠছেন। আমি বললাম, শায়খ ইমাদুদ্দীন! আপনার রাত কেমন কেটেছে? আল্লাহ্‌র কসম আমি তো আপনাকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে অভ্যাসগতভাবে মুচকি হাসলেন এবং বললেন :

رَأَيْتُ اِلٰهِىْ حِيْنَ اُنْزِلْتُ حُفْرَتِىْ * وَفَارَقْتُ اَصْحَابِىْ وَاَهْلِىْ وَجِيْرَتِىْ۔

আমাকে যখন কবরে রাখা হল, আমি যখন আমার বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের থেকে পৃথক হলাম তখন আমি আমার ইলাহ্ ও মা'বূদকে দেখতে পেলাম।

وَقَالَ جُزِيْتَ الْخَيْرَ عَنِّىْ فَاِنَّنِىْ * اَضِيْتُ فَهَا عَفْوِىْ لَدَيْكَ وَرَحْمَتِىْ۔

তিনি বললেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে কল্যাণময় প্রতিদান পেয়েছ, কারণ আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। সুতরাং এই যে, তোমার নিকট আক্কার ক্ষমা ও দয়া তুমি এগুলো গ্রহণ কর।

دَأَبْتَ زَمَانًا تَأْمُلُ الْعَفْوَ وَالرِّضَا * فَوُقِيْتَ نِيْرَانِىْ وَلُقِّيْتَ جَنَّتِىْ۔

যুগের যুগ তুমি আমার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তি ও সন্তুষ্টি মঞ্জুরীর আশায় পথ চলেছ; ফলে তুমি আমার জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছ এবং আমার জান্নাত লাভ করেছ।

বর্ণনাকারী বলেন, এ স্বপ্ন দেখে আমি ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠি এবং পংক্তিগুলো লিখে নিই। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

কাযী জামালুদ্দীন : তিনি হলেন আবদুস সামাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল ফযল আবুল কাসিম আনসারী ইব্ন হারাসতানী। দামেস্কের প্রধান বিচারপতি ছিলেন তিনি। ৫২০ হিজরী

সনে তাঁর জন্ম হয়। তার পিতা ছিলেন হারাসতানের অধিবাসী। এক পর্যায়ে তাঁর পিতা তাওমা ফটকে আগমন করেন এবং যায়নবী মসজিদে ইমামতিতে নিযুক্ত হন। তাঁর এই পুত্র অত্যন্ত যোগ্যতা ও সুনামের সাথে বড় হন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এমন বহু শায়খের নিকট থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেন ইব্ন আসাকির যাঁদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছিলেন। খিযির হুজরাতে তিনি হাদীসের দরস দিতেন। এবং তার পাশেই সমসময় নামায আদায় করতেন। জামে মসজিদেই জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। তাঁর বাসস্থান ছিল হুরিয়াতে আল মুজাহিদিয়্যা মাদরাসায় তিনি অধ্যাপনা করতেন। বহুদিন তিনি এই পূণ্য কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইব্ন আসরূনের প্রতিনিধিরূপে কিছুদিন বিচার কার্য পরিচালনা করেন। এরপর তিনি তা ছেড়ে দিয়ে গৃহ কেন্দ্রিক জীবন যাপন শুরু করেন। নিয়মিত জামে মসজিদে নামায আদায় অব্যাহত রাখেন। এরপর সুলতান আদিল কাযী ইব্নুয যাকীকে বিচারপতির পদ থেকে অপসারণ করে কথা জামালুদ্দীনকে ওই পদ গ্রহণে বাধ্য করেন তখন ার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁকে আযিযিয়্যাহ মাদরাসায় অধ্যাপনার দায়িত্ব ও প্রদান করা হয়। সুলতান আদিল কাযী ইব্নুয যাকী থেকে সত্যায়ন ক্ষমতা প্রত্যাহার করে তা ফখরুদ্দীন ইব্ন আসাকিরকে প্রদান করেন। ইব্ন আবদুস সালাম বলেন ইব্নুল হারাস্তানীর চেয়ে অধিক বিবেচনা শক্তি সম্পন্ন অন্য কাউকে আমি দেখিনি। আল্লামা গাযযালী লিখিত আল ওয়াসীত গ্রন্থটি তাঁর মুখস্থ ছিল। একাধিক ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, কাযী ইব্নুল হারাস্তানী অন্যতম ন্যায় বিচারক ও সত্য প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। সত্য প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তিনি কারো সমালোচনার পরোয়া করতেন না। তাঁর পুত্র ইমাদুদ্দীন দামেস্কের জামে মসজিদে খুতবা দিতেন, তাঁকে আশরাফিয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব ও দেয়া হয়। তাঁর পুত্র সেখানে তাঁর সহযোগীরূপে কাজ করতে। কাযী জামালুদ্দীন হারাস্তানী মুজাহিদিয়া মাদরাসায় বসে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তিনি অধিক বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সুলতান তাঁর জন্যে তুল তুলে নরম গদি ও বিছানা পাঠিয়ে দেন। তাঁর পুত্র তাঁর সম্মুখে থাকত। পিতা ওখান থেকে উঠে গেলে পুত্র সেখানে বসত। পরবর্তীতে কোন কারণে তিনি তাঁর পুত্রকে নিজের সহযোগীর পদ থেকে বাদ দিয়ে দেন। শামসুদ্দীন ইব্ন সিরাজীকে তাঁর সহযোগী নিযুক্ত করেন। তিনি পূর্বদিকের কার্যালয়ে তাঁর বিপরীতে বসতেন। তাঁর সাথে শামসুদ্দীন ইব্ন সিনা-আদ দৌলাহ্কে ও তাঁর সহযোগী নিযুক্ত করেন। শারফুদ্দীন ইব্ন মুসেল হানাফীকেও সহযোগী নিযুক্ত করা হয়। তিনি মাদরাসার মিহরাবে বসতেন, কাযী জামালুদ্দীন দু'বছর চার মাস বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এই হিজরী সনের ৪ যিলহজ্জ শনিবার ৯৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দামেস্কের জামে মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাফাহ কাসিয়ূনে তাঁকে দাফন করা হয়।

আমীর বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল কাসিম : তিনি আল কুদসে স্থাপিত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন খ্যাতিমান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সবসময় শহীদ হওয়াটা কামনা করতেন। এরপর তূর দূর্গে ফ্রাংকদের হাতে তিনি নিহত হন। আল কুদসে নিজের তৈরী সমাধিতে তাঁকে দাফন করা হয়। এখনো জনগণ তাঁর কবর যিয়ারত করে।

শুজা মাহমূদ ওরফে ইব্ন দিমাগ : তিনি সুলতান আদিলের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। হাস্য-রস ও কৌতুকী মানুষ ছিলেন তিনি। বিভিন্ন চুটকি বলে তিনি সুলতানকে হাসাতে পারতেন। তিনি এ পথে বহু অর্থ সম্পদ অর্জন করেন। ফ্রাংক ফটকের অভ্যন্তরে ছিল তাঁর বাসস্থান। তাঁর স্ত্রী

অতঃপর ওই বাসস্থানকে শাফিঈ ও হানাফী মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন। এবং ওই মাদরাসা পরিচালনার জন্যে বহু সম্পদ ওয়াকফ করে দেন।

মহিলা শায়খ দাহনুল লূয : তিনি একজন জ্ঞান সমৃদ্ধ শায়খা, পূণ্যবতী, ইবাদতকারিণী এবং দুনিয়াবিমুখ মহিলা ছিলেন। দামেস্কের মহিলা আলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তার উপাধি ছিল দাহনুল লূয। তিনি নূরজাহানের কন্যা। নূরজাহানের কন্যা সন্তানদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর সহায় সম্পদ তাঁর বোন বিনতুল আসবাহ-এর সমাধির জন্যে ওয়াকফ করে যান।

৬১৫ হিজরী সন (১২১৯ খ্রি.)

এই হিজরী সনের সূচনায় সুলতান আদিল মারজ আল সফরে অবস্থান করছিলেন ফ্রাংকদের মুকাবিলা করার জন্যে। তিনি তাঁর পুত্র মুআযযামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আত তূর দূর্গ ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে। তিনি তা ধ্বংস করে দেন এবং সেখানকার অস্ত্র শস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। ফ্রাংকগণ ওই অস্ত্রাগার দখল করে নিতে পারে এই আশংকায় এমনটি করা হয়েছিল। এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে ফ্রাংকগণ দিময়াত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। জুমাদাল উলা মাসে তারা বুরজ আল সালসালাহ দূর্গ দখল করে নেয়। এটি একটি মজবুত ও সুরক্ষিত দূর্গ ছিল। এটি মিশর নগরীর তালা নামে খ্যাত ছিল। এই হিজরী সনে সুলতান মুআয্যাম ও ফ্রাংক সম্প্রদায় কীমূনে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুআয্যাম তাদেরকে পরাস্ত করে তাদের বহুলোককে হত্যা করেন এবং পলায়নরত সৈনিকদের একশজনকে বন্দী করেন। ওদেরকে অবনত মস্তকে আল কুদসে ঢুকিয়ে দেন।

একের পর এক রাষ্ট্র প্রধানের মৃত্যুতে এই হিজরী সনে মুসেলে ভয়াবহ বিপদ দেখা দিয়েছিল। সেখানকার রাজাকার আসালানের পুত্রদের মধ্যে যেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিল সেই মারা যাচ্ছিল। এই সুযোগে তাদের পিতার মামলূক ও ক্রীতদাস বদরুদ্দীন লুলু শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, এই হিজরী সনে রোমান সম্রাট কায়কারিস সিনজার হালব রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। সামিসাতের শাসনকর্তা আফযাল ইব্‌ন সালাহুদ্দীন তাকে এই কাজে সহযোগিতা করে। আদিল পুত্র সুলতান মূসা আল আশরাফ ওই অভিযানে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন এবং রোমান সম্রাটকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তারা অপমান সহকারে ফিরে যায়। এই হিজরী সনে সুলতান আশরাফ তাঁর শাসনাধীন রাজ্যগুলোর সাথে সিনজার রাজ্যকেও অন্তর্ভূক্ত করেন।

এই হিজরী সনে সুলতান আদিল ইনতিকাল করেন। এর ফলে ফ্রাংকগণ দিময়াত দখল করে নেয়। অতঃপর দিময়াতের সুড়ঙ্গ পথে তারা মিশর আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হয়। চার মাস তারা মিশর অবরোধ করে রাখে। সুলতান শামিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি ও যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। ওই সময়ে তারা মিশরের তালা খ্যাত বুরজ আল-সাল-সালাহ দূর্গ দখল করে নেয়। এই দূর্গটি নীল নদের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপে অবস্থিত ছিল। সেখান থেকে দিময়াতে যাবার পথ রয়েছে। দিময়াত হল উপকূলবর্তী একটি শহর। ওই সংরক্ষিত এলাকার এক মাথা দিময়াতের সঙ্গে সংযুক্ত আর অন্যদিক নদীর অপর দিকে। এটির উপর ও একটি পুল ছিল।

এখানে অন্য একটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল যাতে সওয়ারী ও বাহন মুল সমুদ্র থেকে নীলনদে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু ফ্রাংকগণ যখন এই সুরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ দূর্গ দখল করে নেয়, তখন মুসলমানদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা এটিকে ভীষণ বিপদরূপে গ্রহণ করে। মারজ আল সফরে অবস্থানকারী সুলতান আদিল এই সংবাদ অবগত হবার পর তিনি এ জন্যে ভীষণ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মুসলমানদের ধ্বংসের আশংকায় বুক চাপড়িয়ে আহাজারি করেন। তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন। এই সুত্রে জুমাদাল আখিরাহ মাসের ৭ তারিখ জুমাবারে গালিকীন গ্রামে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর পুত্র মুআযযাম দ্রুত ছুটে আসেন এবং তাঁর মালপত্র গুছিয়ে চারিদিকে ঘেরা একটি বাহনে করে তাঁর মরদেহ দূর্গের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। সাথে মাত্র একজন সেবক পাঠান। অবস্থা এমন যে, সুলতান খুবই অসুস্থ। পথে কোনো সেনাপতি সালাম জানাতে এলে তাকে বলা হত যে, সুলতান খুবই অসুস্থ সালামের উত্তর দেয়ার সামর্থ নেই। এভাবে দূর্গে প্রবেশের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁকে সেখানে দাফন করে রাখা হয়। এরপর তাঁর নিজের তৈরী আদিলিয়া কবরস্থানে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। সুলতান আদিল যাঁর পূর্ণ নাম হল সুলতান সায়ফুদ্দীন আবূ বকর ইব্ন আইয়ূব ইব্ন শাদী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। চরিত্রিক পবিত্রতা, দীনদারী বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার সমন্বয়ে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত রাষ্ট্র নায়ক। তাঁর রাজত্বে তিনি মদ-জুয়া গান-বাজনা ও মাদক-নেশা সহ সফল প্রকারের হারাম কাজ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মিশরের শেষ সীমা থেকে শুরু করে ইয়ামান সিরিয়া, জাযীরা হয়ে হামাদান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে ছিল। তাঁর ভাই সালাহুদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি হালব ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। হালব রাজ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গাযী যাহিরের হাতে রেখে দেন কারণ, যাহির তাঁর কন্যা সিত্ত খাতুন সাফিয়্যাকে বিয়ে করেছিল। সুলতান আদিল অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট, ক্ষমা-পরায়ণ, দুঃখ দূর্দশায় ধৈর্যধারণকারী ও জিহাদে স্বশরীরে অংশগ্রহণকারী সম্রাট ছিলেন। ফ্রাংকদের মুকাবিলায় প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি নিজে এবং তাঁর ভাইকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত এবং বিজয় অর্জনকারী ছিলেন। তিনি একজন দানশীল নৃপতি ছিলেন। দূর্ভিক্ষ ও অভাবের সময় তিনি মিশরে গরীব মিসকীনদেরকে বহু অর্থকড়ি দান করেছেন। দূর্ভিক্ষের পরের বছর মিশর ও তার শহরতলীতে প্রায় এক লক্ষ গরীব মিসকীনের লাশের কাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। অসুস্থতার সময় তিনি ব্যাপকহারে দান-সাদকা করেন। এ সময়ে তার নিকট থাকা সকল অর্থকড়ি এমনকি তাঁর গাড়ী-ঘোড়াও তিনি দান করেন দেন। তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রচুর খাবার খেতেন। আবার খুব বেশি রোযাও রাখতেন। একেক দিনে তিনি প্রচুর উন্নত খাবার খেতেন। এরপর ঘুমানোর সময় দামেস্কের মাপে এক রিত্ল প্রায় আধা সের শুকনো মিষ্টি হালুয়া খেতেন। গোলাপ ফুল ফোঁটার মৌসুমে তাঁর নাকের মধ্যে রোগ দেখা দিত। এজন্যে এ সময়ে তিনি দামেস্কে থাকতে পারতেন না। এই মৌসুম শেষ হলে তিনি সেখানে ফিরে আসতেন। মারজ আল সাফরে তাঁর জন্যে বিশেষ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত অতঃপর তিনি ওই শহরে প্রবেশ করতেন।

সুলতান আদিল ৭৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর অনেক সন্তান সন্তুতি ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আল কামিল, দামেস্কের শাসনকর্তা ঈসা

আল মুআয্যাম। কিলাত হাররান ও জাযীরার শাসনকর্তা মূসা আল আশরাফ, আওহাদ আইয়ূব, ইতি সুলতান আদিলের মৃত্যুর পূর্বেই মারা যান। ফাইয ইব্রাহীম, রাহা-র শাসনকর্তা মুযাফফার গাযী আযীয উসমান, আমজাদ হাসান, মুকীত মাহমূদ, জা'বার শাসনকর্তা হাফিয আরসালান, সালিহ ইসমাঈল, কাহির ইসহাক, মুজীরুদ্দীন ইয়াকূব, কুতুবুদ্দীন আহমদ, খলীল, তকীউদ্দীন আব্বাস ইনি ভাই বোনদের মধ্যে সবার শেষে ইনতিকাল করেন, ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। সুলতান আদিলের একাধিক কন্যা সন্তান ছিল। হালবের শাসনকর্তা যহীর গাযীর স্ত্রী সাফিয়া খাতুন এবং দামেস্কের শাসনকর্তা নাসির ইউসুফের দাদী সুলতান আযীযের মাতা ছিল কন্যাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সুলতান নাসিরের নামে দুটো শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি দামেস্কে অন্যটি সাফাহে। হালাকু খান এই নাসিরকেই হত্যা করেছিল।

ফ্রাংকদের দিময়াত দখল : সুলতান আদিলের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার পর এই সংবাদ তদীয় পুত্র আল কামিলের নিকট ও পৌছল। আল-কামিল তখন ফ্রাংকদের মুকাবিলা করার জন্যে দিময়াতের সুড়ঙ্গ পথে অবস্থা করছিলেন। সুলতানের মৃত্যু সংবাদে মুসলমানদের শক্তি সাহস হ্রাস পেল। তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। ইতিমধ্যে অন্য একটি দুঃসংবাদ সুলতান কামিলের নিকট পৌছল যে, সেনাপতিদের সর্বাধিক শক্তিশালী ইব্ন মাশতুব পরবর্তী সুলতান রূপে আল-কামিলের পরিবর্তে তাঁর ভাই আল-ফাইযের হাতে বায়'আত করার পরিকল্পনা করছে। এ সংবাদ শুনে আল-কামিল একাই মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ বিপদ মুকাবিলার জন্যে তিনি মিশর গিয়ে পৌছেন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে ফ্রাংকদের মুকাবিলায় নিয়োজিত সৈনিকদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়, তারা মনে করে মিশরে সুলতানের মৃত্যুর চেয়েও অধিক গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেছে। ফলে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সুযোগ বুঝে ফ্রাংকগণ বিনা বাধায় মিশরীয় এলাকায় প্রবেশ করে। আল কামিলের সৈন্য-সামন্ত ও ধন-সম্পদ দখল করে নেয়। এখানে এক হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বস্তুত এটাই সর্বজ্ঞানী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ফায়সালা। আল-কামিল মিশরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি যা ধারণা করেছিলেন তার কিছুই ঘটেনি এটা ছিল ফ্রাংকদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ কৌশল। ইতিমধ্যে সেনাপতি ইব্ন মাশতূব পালিয়ে সিরিয়া চলে যায়। শাসনকর্তা আল কামিল তখনই স্বসৈন্যে ফ্রাংকদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পরিস্থিতিতো তখন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। অনেকগুলো মুসলিম শহর তারা দখল করে নিয়েছে। বহু মানুষকে হত্যা করেছে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার বেদুইন ও গ্রাম্য লোকেরা নগরবাসীদের সহায় সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। ওরা ফ্রাংকদের চেয়ে অধিক ক্ষতি সাধন করে। এবং আল কামিল ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেন যাতে তারা কায়রোতে প্রবেশ করতে না পারে। তিনি তাঁর ভাইদের অবিলম্বে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। ফ্রাংকদের সমগ্র মিশরীয় এলাকা দখলের পূর্বে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্যে তিনি ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। চারিদিক থেকে মুসলিম সৈন্যগণ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। সর্বপ্রথম তাঁর ভাই আল আশরাফ এসে হাজির হন। এরপর আসেন আল মুআয্যাম। এরপর ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ বিগ্রহের কথা পরে আলোচনা করব।

এই হিজরী সনে মহিউদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবুল ফারজ ইব্ন জাওযী বাগদাদের মহা হিসাব রক্ষক নিযুক্ত হন। অবশ্য তাঁর পিতার নিয়মানুসারে তিনি ওয়ায নসীহতের মজলিস অব্যাহত রাখেন। সাথে সাথে হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সুচারুরূপে। এই হিজরী সনে কাহীল ব্রীজের নিকট শিবলিয়্যাহ সমাধির বিপরীতে বদরিয়্যাহ সমাধির দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় আল-মুআযযামের উপর। এই এলাকাটি হাসান ইব্ন দায়াহ-এর নামের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনি এবং তাঁর ভাইগণ সুলতান নরুদ্দীন মাহমূদ জঙ্গীর শীর্ষস্থানীয় সেনাপতি ছিলেন। এটির ৬৪০ গজ দূরত্বে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। জুমাবারে সেখানে খুতবা দেয়া হত। এই হিজরী সনে সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাকাস মারজ-আল সফরে অবস্থানকারী সুলতান আদিলের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেছিলেন। সুলতান আদিল ওই দূতের সাথে দামেস্কের খতীব জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক দাওলাঈকে পাঠিয়ে দেন। শায়খ মুওয়াফ্ফিক উমার ইব্ন ইউসুফকে বাগদাদের ভারপ্রাপ্ত খতীবের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি বায়তুল আবারের খতীব ছিলেন। খতীব জামালুদ্দীন সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাকাসের সাথে মুখোমুখি আলোচনা চালিয়ে যান। তিনি যখন সেখা থেকে ফিরে আসেন তার পূর্বে সুলতান আদিলের মৃত্যু হয়।

এই হিজরী সনে মুসেলের শাসনকর্তা ইযযুদ্দীন মাসউদ ইব্ন আরসালান শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। একপর্যায়ে সে নিহত হয় এবং আতাবেকী পরিবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ সময়ে তাঁর পিতার ক্রীতদাস বদরুদ্দীন লুলু ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই হিজরী মনে সুলতান আদিলের মৃত্যুর পর মন্ত্রী সাফিউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী ইব্ন শাকার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ থেকে রাজধানীতে ফিরে আসেন। তাঁর প্রশংসায় সাহিত্যিক আলামুদ্দীন একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাতে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। তাঁর সমসাময়িক লোকজন বলেছেন যে, মন্ত্রী সাফিউদ্দীন একজন বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গরীব মিসকীনদেরকে ভালবাসতেন। মন্ত্রী-সচিব ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে পথ চলার সময়ও তিনি জনগণকে সালাম দিতেন। কিন্তু এই বৎসর তিনি ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হন। কারণ, তাঁকে দেশান্তর করা ও দেশে ফিরিয়ে আনার নাটের গুরু শাসনকর্তা কামিল তাঁর বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করে তাঁর ভাই মুআয্যামকে চিঠি লিখেন। ফলে, শাসনকর্তা মুআয্যাম তাঁর সকল সহায় সম্পদ ও মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেন। তাঁর পুত্রকে বিভিন্ন দপ্তরের পরিদর্শন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। পিতার অবর্তমানে এই পুত্র তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করত। মুআযযামের পিতা সুলতান আদিল গান-বাজনা, মদ-জুয়া ও এ জাতীয় অশ্লীল কাজ-কর্মের কর ও ট্যাক্স বাতিল করে এগুলো নিষিদ্ধ করেছিলেন কিন্তু এই বছরের রজব মাসে মুআয্যাম ওই ট্যাক্স ও কর পুনর্বহাল করে। আদিলের সময়ে তাঁর কড়াকড়ি নজরদারির কারণে কেউই প্রকাশ্যে মদ ও নেশাকর দ্রব্য দামেস্ক থেকে স্থানান্তর করতে পারেনি। মহান আল্লাহ সুলতান আদিলকে পুরস্কৃত করুন আর মুআয্যামকে কল্যাণময় প্রতিফল থেকে বঞ্চিত করুন। অবশ্য মুআয্যাম আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে যে, ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নিয়োজিত রাখার ব্যয় নির্বাহের জন্যে সে এমনটি করেছে। কারণ, ওই বিশালাংকের ব্যয় নির্বাহের পর্যাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ছিল না। বস্তুত

এটি তার অজ্ঞতা, দীন পালনে কুফরী ও প্রকৃত বিষয় অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচায়ক। কারণ, এমন পদক্ষেপ শত্রুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অবস্থান বিজয় হতে সাহায্য করেন মুসলিম সৈন্যদেরকে রণে ভঙ্গ দিতে প্ররোচিত করে অতঃপর, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে মহান আল্লাহ্ বলেন, إِذَا عَصَانِيْ مَنْ يُّعْرِفُنِيْ سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِيْ আমাকে যারা চিনে তারা যখন আমার নাফরমানী করে এবং আমার অবাধ্য হয় তখন আমাকে চেনে না এমন লোককে তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়ে দিই। বস্তুত এটা স্পষ্ট ব্যাপার। বুদ্ধিমানের নিকট এটি গোপন নয়।

৬১৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বিচারপতি শারফুদ্দীন : তিনি হলেন আবূ তালিব আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়নুল কুযাত আবদুর রহমান ইব্‌ন সুলতান ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া লাখমী আল-বাগদাদী, তিনি অন্ধ ছিলেন। ইলমুল আওয়াইল (علم الا وائل) বা প্রথম যুগের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর গভীর অবগতি ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি যাহিরিয়্যা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইব্‌নুস সাঈদ তাঁর মূল্যায়নে বলেছেন : الداؤدى المذهب المعرى ادبا واعتقادا তিনি মাযহাবের দিক থেকে দাউদের অনুসারী সাহিত্যকর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি আল মা'আরবীর অনুসারী তাঁর কতক কবিতা এই :

إِلَى الرَّحْمٰنِ اَشْكُوْ مَا اُلَاقِيْ * غَدَاةَ غَدَوْا عَلٰى هَوَجِ النِّيَاقِ۔

ওরা যখন উষ্ট্রীর পিঠে বসে অন্যত্র যাত্রা করেছিল তখনকার সেই প্রত্যুষে আমি যে দুঃখ ও বেদনা অনুভব করেছি তা ব্যক্ত করছি দয়াময় আল্লাহর সমীপে :

سَأَلْتُكُمْ بِمَنْ زَمَّ الْمَطَايَا * أَمُرٌّ بِكُمْ اَمُرٌّ مِنَ الْفِرَاقِ۔

যে ব্যক্তি উট প্রস্তুত করেছিল, তোমার এই যাত্রা কি বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার যাত্রা?

وَهَلْ ذُلٌّ اَشَدُّ مِنَ التَّنَائِيْ * وَهَلْ عَيْشٌ اَلَذُّ مِنَ التَّلَاقِ۔

হায়! প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে পরস্পর দূরত্বের বেদনা ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা আছে কি? আবার পরস্পর মিলন ও সাক্ষাতের চেয়ে অধিক সাধ ও আনন্দের কোনো জীবন আছে কি?

কাযী আবুল কাসিম ইমাদুদ্দীন : ৬১৫ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন বাগদাদের প্রধান বিচারপতি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন দামিগাণী আল-হানাফী। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং হানাফী ফিকহ-তে গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। দুবারে তিনি প্রায় ১৪ বছর বাগদাদের বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এজন চরিত্রবান, অংক ও ফারাইয শাস্ত্রে দক্ষ এবং ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টন বিধিতে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন।

আবুল ইয়ামান নাজাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাবশী : তিনি সুদানী নাগরিক ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল নাজমুদ্দীন। খলীফা নাসিরের মুক্ত করা ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। খলীফা ভবনের শান্তিরক্ষী বলতে তাঁকে। তিনি খলীফাকে ছেড়ে কোথাও যেতেন না। তাঁর মৃত্যুতে খলীফা প্রচণ্ড দুঃখ পান। তাঁর জানাযায় বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। তাঁর মৃতদেহের সম্মুখে ১০০ গরু, ১০০০ বকরী, খেজুর, রুটি ও অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রীর স্তুপ তৈরী করা হয়েছিল দান-সাদকার জন্যে।

তাজ এর নীচে খলীফা নিজে ওই জানাযায় ইমামতি করেছিলেন। সেদিন উপস্থিত জনগণের মধ্যে তার পক্ষে খলীফা দশ হাজার দীনার সাদকা করেছিলেন। অনুরূপভাবে দুই হারাম শরীফে অবস্থানকারী লোকজনের মধ্যেও দান-সাদকা করা হয়েছিল। খলীফা এ উপলক্ষে তাঁর বহু ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়ে দেন এবং পাঁচশত কুরআন শরীফ ওয়াকফ করে দেন।

আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ ইব্‌ন উলওয়ান : ইব্‌ন মুহাজির ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাজির আল মুসেলী। নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন। এরপর তিনি মুসেলে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করেন ফাতাওয়া প্রদান ও বদরুদ্দীন লুলুর মাদরাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ ও পূণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

আবূ তাইয়েব রিযকুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া : ইব্‌ন রিযকুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন খলীফাহ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন রিযকুল্লাহ্ ইব্‌ন গানিম ইব্‌ন গিলাম আল তাআখদুররী। তিনি একজন ভ্রমণ বিলাসী মুহাদ্দিস, হাফিযুল কুরআন, আস্থাভাজন, সাহিত্যিক ও কবি ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আবুল আব্বাস : তিনি হলেন আবুল আব্বাস আমেদ ইব্‌ন বারতাকুশ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল ইমাদী। তিনি সিনজারের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সুলতান ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মুক্ত করা ক্রীতদাস এবং তাঁর সহচর। আর আমেদ ছিলেন দীনদার, কবি ও বড় অংকের অর্থ-সম্পদের মালিক। কিন্তু এক পর্যায়ে সুলতান কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী তাঁর সকল ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেন এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁরা কারাবন্দী থাকার কথা কর্তৃপক্ষ ভুলে গিয়েছিল। এবং মনের দুঃখ ও ক্ষোভ বুঝে নিয়ে ইনতিকাল করেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

تَقُوْلُ وَقَدْ وَدَعْتُهَا وَدُمُوْعُهَا * عَلَى خَدِّهَا مِنْ خَشْيَةِ الْبَيْنِ تَلْتَقِيْ-

আমি তাকে (প্রেমিকাকে) বিদায় জানানোর পর বিরহ বিচ্ছেদের আশংকায় তার দুচোখে অশ্রু-গড়িয়ে পড়ছিল এবং বলছিল।

مضى اُكْثَرُ الْعُمُرُ الَّذِىْ كَانَ نَافِعًا * رُوَيْدَكَ فَاعْمَلْ صَالِحًا فِى الَّذِىْ بِقِّى-

তোমার যিন্দেগীর অধিকাংশ তো ক্ষয় যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে তাতে পূর্ণ কর্ম ও সৎকর্ম সম্পন্ন কর।

৬১৬ হিজরী সন ১২২০ খ্রি.)

এই হিজরী সনে বাগদাদের মহা হিসাব রক্ষক শায়খ মহিউদ্দীন ইব্‌নুল জাওযী সকল প্রকারের অশ্লীল কার্যক্রম এবং গান বাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এটি ছিল শাসনকর্তা মুআয্‌যামের নির্দেশের বিপরীত বৎসরের শুরুতে তিনি এ নির্দেশ প্রদান করেন।

চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ও তাতারগণের জীয়হূন নদী অতিক্রম : এই হিজরী সনে তাতারগণ তাদের শাসক চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে নিজেদের জনপদ ছেড়ে এসে জীয়হূন নদী অতিক্রম করে। তারা মূলত: চীনের তুমগাজ পর্বতের পার্বত্য অধিবাসী ছিল। অন্যান্য তাতারীদের চেয়ে এই জনগোষ্ঠির ভাষা ছিল ভিন্ন। তবে যুদ্ধ-বিগ্রহে এরা ছিল সর্বাধিক সাহসী ও ধৈর্যশীল।

তাদের জীহূন নদী অতিক্রমের কারণ হল তারা তাদের নেতা চেঙ্গিস খান অনেক অর্থকড়ি সহকারে একদল ব্যবসায়ীকে খাওয়ারিযাম শাহের এলাকায় পাঠিয়েছিল তার পরণের জন্যে বেশি পরিমাণে জামা কাপড় কিনে নিয়ে যাবার জন্যে। ব্যবসায়ী দল খাওয়ারিযামী নগরে প্রবেশের পর সেখানকার শাসনকর্তা সুলতান খাওয়ারিযাম শাহকে পত্র মারফত জানায় যে, এই ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট বহু অর্থ-কড়ি ও ধন-সম্পদ রয়েছে। সুলতান জবাবে নির্দেশ দেন যেন ওদেরকে হত্যা করে ওদের মালপত্র লুট করে নেয়া হয়। নির্দেশ তামিল করা হল। চেঙ্গিস খানের নিকট এ দুঃসংবাদ পৌঁছার পর সে খাওয়ারিযাম শাহকে ধমকিয়ে সাবধান করে দিয়ে বলে যে, তিনি কাজটা ভাল করেননি। ধমক পেয়ে সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ্ তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শে চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খাওয়ারিযামে শাহ তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করলেন। তারা তখন কুশলী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সুযোগ বুঝে খাওয়ারিযাম শাহ ওদের ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে আসেন এবং শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। এরপর চেঙ্গিস খান তার দলবল নিয়ে খাওয়ারিযামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়। চারদিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে, ওরা যুদ্ধ করছিল ওদের নারী ও শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্যে আর মুসলমানগণ যুদ্ধ করছিল নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে। মুসলমানগণ জানত যে, রণে ভঙ্গ দিলে ওরা কিন্তু একেবারে সমূলে ধ্বংস করে দিবে। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এমন কি অশ্বগুলো রক্ত নদীতে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। মুসলমানদের পক্ষে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তাতারদের নিহতের সংখ্যা তার বহুগুণ বেশী। এরপর উভয় পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়। খাওয়ারিযাম শাহ বুখারা ও সমরকন্দে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ওই নগরীদ্বয়কে সুরক্ষিত করেন এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধে অংশ নেয়নি তেমন বহু সৈন্যের সমাবেশ ঘটান। তিনি নিজে নিজ শহরে এসে অধিকহারে সৈন্য প্রস্তুত করেন যুদ্ধের জন্যে। চেঙ্গিস খান তাতারী সৈন্যদেরকে নিয়ে বুখারা অবরোধ করে। তার সাথে ছিল বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। তিনদিন অবরোধ স্থায়ী হয়। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীগণ তার নিকট শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দেয়। সে শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বিনা যুদ্ধে বুখারাতে প্রবেশ করে। সে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ওদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু চারিদিকে পরিখা থাকার কারণে দূর্গে প্রবেশে তারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ফলে ওই দূর্গ অবরোধ করে তারা স্থানীয় জনগণকে ওই পরিখা ভরাটে বাধ্য করে। তাতারগণ বড় বড় মাটির চাকা এনে পরিখার মধ্যে ফেলছিল আর সেগুলো স্থূল ভাগের সমতল করে তুলছিল। অতঃপর বল প্রয়োগে দশদিনের মধ্যে তারা ওই দূর্গ জয় করে নেয়। দূর্গে থাকা লোকজনকে তারা হত্যা করে। এরপর তারা শহরাঞ্চলে আগমন করে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভাল ভাল দ্রব্য সামগ্রী তাদের সৈন্যদের জন্যে নিয়ে যায়। এ সময়ে তারা অসংখ্য শহরবাসীকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার পরিজনের সামনে ধর্ষণ ও অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়। নিজের নারী ও শিশুর ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে অনেক মুসলমান ওদেরকে বিরুদ্ধে হাতাহাতি-মারামারিতে লিপ্ত হয় এবং নিহত হয়। কতক মুসলমান বন্দী হয়। যারা বন্দী হয় তারা ওদের হাতে নানা প্রকারে নির্যাতনের শিকার হয়। শহরে নারী-পুরুষ ও শিশুদের আহাজারি কান্নার রোল উঠে। এরপর তাতারগণ বুখারা ঘর দুয়ার ও মাদরাসা মসজিদে

আগুন ধরিয়ে দেয়। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এককালের সমৃদ্ধ বুখারা শহর। এরপর তারা বোখারা ছেড়ে সমরকন্দের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এই হিজরী সনের শুরুতে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরামর্শকদের পরামর্শে ফ্রাংকদের বিজয় লাভের আশংকায় শাসনকর্তা মুআয্যাম এই নির্দেশ দেন। কারণ, ফ্রাংকগণ যদি বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করতে পারে তাহলে তার মাধ্যমে সমগ্র সিরিয়ান অঞ্চল দখলের সুযোগ পেয়ে যাবে। মুহাররামের প্রথম দিনেই প্রাচীর ধ্বংসের কাজ শুরু করা হয়। ফ্রাংকগণ রাতে কিংবা দিনে আক্রমণ চালাতে পারে। এই আশংকায় সেখানকার অধিবাসীগণ ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। তাদের সহায় সম্পদ রেখে তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। বলা হয় যে, ওদের ছেড়ে যাওয়া দ্রব্য সামগ্রী খুব সস্তায় বিক্রি হতে থাকে। এক কিনতার যায়তূন তখন বিক্রি হয় দশ দিরহামে আর এক রিত্ল পিতল বিক্রি হয় অর্ধ দিরহামে। জনগণ সাখরা ও আল আকসা মসজিদে এসে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ মুনাজাত ও আহাজারি পেশ করতে থাকে। অবশ্য এটা শাসনকর্তা মুআযযামের অপর একটি অপকর্ম। পূর্ববর্তী বৎসরে সে যে অশালীন কাজ করেছিল এটি ছিল তার সেই অপরাধের সাথে নতুন সংযোজন। এজন্যে মুআয্যামের সমালোচনা করে জনৈক কবি বলেছেন :

فِيْ رَجَبٍ حَلَّلَ الْحُمَيَّا * وَأَخْرَبَ الْقُدْسَ فِي الْمُحَرَّمِ -

রজব মাসে সে শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বৈধতা দান করেছে আর এ বছরের মুহাররাম মাসে বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করেছে।

এই হিজরী সনে ফ্রাংক সম্প্রদায় দিনিয়াত রাজ্যে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তারা স্বাচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় ওই রাজ্যে প্রবেশ করে। তারা সেখানকার পুরুষদেরকে হত্যা করে নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে। নারীদের সাথে পাশাবিক আচরণ করে। জামে মসজিদের মিম্বর, আঙ্গিনার পাথরগুলো এবং নিহত ব্যক্তিদের মাথা দ্বীপাঞ্চলে ফেলে দেয়। মসজিদকে তারা গীর্জায় পরিণত করে। এই হিজরী সনে শাসনকর্তা মুআয্যাম কাযী যাকী উদ্দীন ইব্‌ন যাকীর প্রতি ক্রোধান্বিত হন। কারণ, তাঁর ফুফু সি্তুশ্ শাম বিনত আইয়ূব তার বাসগৃহে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং কাযী ইব্‌ন যাকীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অসিয়ত শোনার জন্যে। কাযী ইব্‌ন যাকী সাক্ষী সহ তাঁর নিকট গমন করেন এবং তাঁর বক্তব্য মত অসিয়ত লিপিবদ্ধ করেন। তখন মুআয্যাম কাযী সাহেবকে এই মর্মে দোষারোপ করে যে মুআয্যামের অনুমতি না নিয়ে তিনি তাঁর ফুফুর নিকট গিয়েছেন এবং স্বাক্ষীসহ তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করেছেন। আবার ঘটনা ক্রমে কার্য। ইব্‌ন যাকী আযিযিয়্যাহ অঞ্চলের তহশীলদার থেকে হিসাব তলব করেছিলেন এবং তাকে হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করেছিলেন। শাসনকর্তা মুআয্যাম তাঁর পিতার শাসনামল থেকে বিচারপতি ইব্‌ন যাকীকে অপসন্দ করতেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি ইব্‌ন যাকীকে গোপনে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। তিনি একটি বিষের প্যাকেটে একটি জুব্বা ও একটি কটি পাঠিয়ে দেন। জবাবটি সাদা এবং কটি হলুদ ছিল। কেউ বলেছেন দুটোই লাল ছিল। শাসনকর্তা তাঁর বাহককে শপথ করিয়ে নেন যেন বিচারপতি ইব্‌ন যাকীকে এ দুটো পরিয়ে দেয় এবং এ দুটো পরিধান করেই তিনি বিচার কার্য পরিচালনা করেন। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী যে, বাহক যখন আসে তখন তিনি তাঁর বাসগৃহের বৈঠকখানায় এবং বিচারকার্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সুতরাং এটি

পরিধান না করে কোন উপায় ছিল না। এরপর তিনি গৃহে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন। এর পরবর্তী বছর সফর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কবি শারফ ইব্‌ন ইন্নিন যারঈ প্রকাশ্যে ইবাদত বন্দেগী করছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি জামে মসজিদে ইতিকাফ করেছিলেন। এ সময়ে মুআয্‌যাম তাঁর জন্যে মদ ও পাশা খেলার সরঞ্জাম পাঠায় যাতে তিনি এগুলো নিয়ে মত্ত থাকেন। তখন ইব্‌ন ইন্নিন তাঁর নিকট লিখে পাঠান :

يَاأَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُعَظَّمُ سُنَّةٌ * أَحْدَثْتَهَا تَبْقَى عَلَى الْآبَادِ.

ওহে শাসনকর্তা মুআয্‌যাম, আপনি একটি নিয়ম প্রবর্তন করেছেন, এটি অনন্তকাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

تَجْرِي الْمُلُوكُ عَلَى طَرِيقِكَ بَعْدَهَا * خَلْعُ الْقُضَاةِ وَتُحْفَةُ الزُّهَّادِ.

এরপর থেকে রাজা বাদশাগণ আপনার পথেই চলতে থাকবে বিচারপতিদেরকে পদচ্যুত করবে আর তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায়ের উপহার পাঠাবে। মুআযযামের এই কাজটিও অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয়। বিচারপতি ইব্‌ন যাকীর সহকারী বিচারপতি ছিলেন চারজন। (১) শামসুদ্দীন ইব্‌ন শীরামী। তিনি হযরত আলীর (রা) মাযারের ইমাম ছিলেন। মাযার সংলগ্ন এজলাসে তিনি বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। কখনো কখনো তিনি কালো প্লাষ্টারের বিপরীত ছাদের দিকে আসতেন। (২) শামসুদ্দীন ইব্‌ন সুন্নীআদ দৌলাহ। তিনি গাযালিয়্যাহ-এর নিকটবর্তী সুলতান সালাহুদ্দীনের সমাধির বিপরীতে আল কাল্লামাহ প্রাসাদে স্থাপিত এজলাসে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। (৩) কামালুদ্দীন মিশরী। তিনি বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। উছমানের মাযারের পাশে আল কামালী এজলাসে তিনি বিচারিক কার্যক্রম চালাতেন। (৪) শরফুদ্দীন হানাফী মুসেলী। জিবরূনের তুরখানিয়া মাদরাসায় তিনি বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

৬১৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সিত্তুশ শাম : তিনি হলেন সিততুশশাম বিনত আইয়ূব ইব্‌ন শাদী। তিনি অনেক শাসনকর্তার বোন, তাঁদের সন্তানদের ফুফু এবং অনেক শাসনকর্তার মাতা। বারানিয়াহ ও জুওয়ানিয়াহ মাদরাসা দুটোর ওয়াকফকারিণী তিনি। তাঁর মাহরামগণের মধ্যে ৩৫জন শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন তাঁর সহোদর ভাই ইয়ামানের শাসনকর্তা মুআয্‌যাম তুরান শাহ ইব্‌ন আইয়ূব তিনি তাঁরই কবরের পাশে অর্থাৎ লাগোয় তিন কবরের সর্ব পশ্চিমে কবরে দাফন কৃত আছেন। দ্বিতীয়টি হল তাঁর স্বামী ও চাচাত ভাই হিমসের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসাদুদ্দীন শীরকূহ ইব্‌ন শাদীর। সিততুশ্ শাম তাঁর স্বামী এবং পুত্র হুসামুদ্দীনের পিতা উমার ইব্‌ন লাজীনের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দীনকে বিয়ে করেছিলেন। সিততুশ শাম এবং তাঁর পুত্র হুসামুদ্দীন উমার তৃতীয় কবরে শায়িত রয়েছে। পাঠ প্রদান ও গ্রহণের স্থানের লাগোয়া এই কবর স্থাপিত হয়েছে। এই সমাদি এবং মাদরাসা তাঁর পুত্র হুসামুদ্দীন উমার ইব্‌ন লাজীনের নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হুসামিয়া নামে পরিচিত হয়েছে। তাঁর মামা সালাহুদ্দীনের নিকট তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় আলিমরূপে গণ্য হতেন। সিততুশশাম একজন প্রচুর দানশীল

এবং গরীব-মিসকীন ও অভাবীদের সাহায্যকারিণী মহিলা ছিলেন। প্রতি বছর হাজার হাজার দীনার ব্যয় করে তিনি তাঁর বাড়িতে বহু পানীয় ও ওষধ তৈরী এবং গবাদি পশু জবাই করে জনগণের মাঝে বিতরণ করতেন। এই হিজরী সনের অর্থাৎ ৬১৬ হিজরী সনের ১৬ যিলকাদাহ জুমাবার আসরের নামাযের পর তাঁর নিজ বাসভবনে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর এই বাসভবন পরে মাদরাসায় রূপান্তরিত করা হয়। এটি শামিয়া জুওয়ানিয়া হাসপাতালের পাশে। এরপর শামিয়া বুরনিয়া কবরস্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর জানাযায় বহু লোকের সমাগম ঘটে।

আল ইরাব ও আল লুবাব প্রণেতা আবুল বাকা : ৬১৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন আবুল বাকা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আবদুল্লাহ আল আকবারী আল হাম্বলী। তিনি ছিলেন অন্ধ। আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। "ইরাবুল কুরআনিল" আযীয এবং "আল লুবাব ফীন নাহবী" তাঁর অসাধারণ কীর্তি। আল মাকামাত, যামাখশারীর মুফাসসাল এবং আল মুতানাব্বীর দিওয়ান প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। গণিত শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি একজন পূণ্যবান ও দীনদার মানুষ ছিলেন। প্রায় ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্রাজ্ঞ ভাষাবিদ, ফিক্হবিদ, তাকিক এবং মৌলিক শাস্ত্রসমূহে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কাযী ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, আল মাকামাত গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন পশ্চিমাদেশের আনকা পাখি শাহিক পর্বতে উড়ে আসত যেখানে রাসস সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। সুযোগ বুঝে পাখিটি স্থানীয় শিশুদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। লোকজন তাদের নবী হানযালাহ্ ইব্ন সাফওয়ানের নিকট ওই পাখির অত্যাচারের কথা জানায়। তিনি পাখির জন্যে বদদু'আ করেন। ফলে সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পাখিটির মুখমণ্ডল ছিল মানুষের মুখমণ্ডলের ন্যায় আর তার সর্বাঙ্গ ছিল পাখির ন্যায়। আল্লামা যামাখশারী তাঁর "রবীউল আবরার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আনকা পাখির আবির্ভাব ঘটেছিল হযরত মূসা (আ)-এর যুগে। পাখিটির চারিদিকে চারটি পাখা ছিল। তার মুখমণ্ডল ছিল মানুষের মত। অন্যান্য প্রাণির সাথে এর মিল ছিল। এটি খালিদ ইব্ন সিনান আবাসীর যুগ পর্যন্ত বেঁচে থেকেছিল, খালিদের সময় ছিল হযরত ঈসা (আ) ও মহানবী (সা)-এর মধ্যবর্তী সময়। খালিদ ইব্ন সিনান পাখিটির জন্যে বদদু'আ করেছিলেন এবং সেটি মারা গিয়েছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন যে, মুইয্য আল ফাতেমীর নিকট একটি কিংভূত কিমাকার ও অদ্ভূত রকমের পাখি আনয়ন করেছিল। সেটিকে "পশ্চিমা আনকা" নামে অভিহিত করা হয়। আমি (গ্রন্থকার) বলি খালিদ ইব্ন সিনান এবং হানযালাহ্ ইব্ন সাফওয়ান দুজনই ফাতয়াতের সময় ও হযরত ঈসা (আ) এবং মহানবী (সা)-এর মধ্যবর্তী সময়ের লোক ছিলেন। এদের দুজনই পূণ্যবান ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের কেউই নবী ছিলেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِاَنَّهُ * لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

আমি ঈসা (আ)-এর নিকটতম নবী। কারণ, আমার আর তাঁর মাঝে কোনো নবী নেই। এটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল কাসিম : তিনি হলেন আলী ইব্ন হাফিয বাহাউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ কাসিম ইব্ন হাফিয-আল কবীর আবুল কাসিম আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আসাকির দামেস্কী। তিনি বহু শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। হাদীস সংগ্রহে তিনি বহু স্থান সফর করেন। এই হিজরী সনে বাগদাদে তিনি ইনতিকাল করেন। তাপ ও গরম থেকে রক্ষায় পাখার ভূমি সম্পর্কে তাঁর রচিত কবিতা উল্লেখ করার মত। তিনি বলেছেন :

وَمِرْوَحَةٌ تَرُوْحُ كُلَّ هَمٍ * ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ لَا بُدَّ مِنْهَا۔

পাখা তো সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়। তিন মাস তো তা সেটি ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

حَزِيْرَانٍ وَتَمُوْزُوَابٍ * وَفِىْ اِيْلُوْلٍ يَغْنِىْ اللهُ عَنْهَا۔

বৎসরের কয়েকটি মাসে মহান আল্লাহ্ পাখার মুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করেন।

কবি ইব্ন দাভী : এই হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন কবি ইব্ন দাভী। ইব্ন সাঈ তাঁর উচ্চস্তরের কবিতার একাংশ উল্লেখ করেছেন এই হিজরী সনে আবূ সাঈদ ইব্ন ওয্যানে দাভী ও ইনতিকাল করেছেন। বাগদাদে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বড় হয়েছিলেন বাগদাদে এবং মারা ও গিয়েছেন সেখানে। তিনি সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন। জ্ঞান জগতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। মতভেদযুক্ত মাসআলাসমূহে তিনি যুক্তিপূর্ণ কথা বলতেন, তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

اَرٰى قِسْمَ الْاَرْزَاقِ اَعْجَبَ قِسْمَةٍ * لِذِىْ دَعَةٍ وَمُكْدِيَةٍ لِذِىْ كَدٍّ۔

জীবিকার বণ্টন বস্তুত এক আশ্চর্যজনক বণ্টন। পরিশ্রমী ও প্রতারণাকারী সকল পক্ষের জন্যে বণ্টন রীতি অবাক করা বিষয়।

وَاَحْمَقُ ذُوْمَالٍ وَاَحْمَقُ مُعْدِمٌ * وَعَقْلٌ بِلَاحَظٍّ وَعَقْلٌ لَهُ حَدٌّ۔

নির্বোধ ও বেওকুফ বহু মানুষ ধন-ঐশ্বর্যের মালিক আবার বহু নির্বোধ কপর্দকহীন নিঃস্ব। বহু বুদ্ধিমান অভাবী আবার বহু বুদ্ধিমান সীমিত সম্পদের মালিক।

يَعُمُّ الْغِنٰى وَالْفَقْرُذَا الْجَهْلِ وَالْحُجَا * وَلِلّٰهِ مِنْ قَبْلِ الْاُمُوْرِ وَمِنْ بَعْدُ۔

স্বচ্ছলতা ও দারিদ্য নির্বোধ ও বুদ্ধিমান উভয় পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। সকল বিষয়ের পূর্বাপর সবটুকুই মহান আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে।

আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্য়া ইব্ন কাসিম : ইব্নুল ফারাজ ইব্ন দিরা ইব্ন খিযির শাফিঈ। তাজুদ্দীন তিকরীতির তিনি শায়খ। তিনি তিকরীতে বিচারক পদে ও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর তিনি বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তাফসীর, ফিক্হ সাহিত্য ব্যাকরণ ও ভাষা বিজ্ঞানে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁর প্রচুর রচনা গ্রন্থ রয়েছে। তিনি স্বহস্তে তাঁর নিজের জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার একাংশ এই :

لَا بُدَّ لِلْمَرْءِ مِنْ ضَيْقٍ وَّمِنْ سَعَةٍ * وَمِنْ سُرُوْرٍ يُوَافِيْهِ وَمِنْ حُزْنٍ۔

মানবজীবনে স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাতে সুখ যেমনি আসে দুঃখ তেমনি আসে।

وَاللّٰهُ يَطْلُبُ مِنْهُ شُكْرَ نِعْمَتِهِ * مَادَامَ فِيهَا وَيَبْغِي الصَّبْرَ فِي الْمِحَنِ۔

মানুষ যতক্ষণ আল্লাহ্র নেয়ামতের মধ্যে থাকে ততক্ষণ মহান আল্লাহ তার পক্ষ থেকে নে'য়ামতের কৃতজ্ঞতা দাবী করেন আর বান্দার দুঃখের সময় তার ধৈর্য দাবী করেন।

فَكُنْ مَعَ اللّٰهِ فِي الْحَالَيْنِ مُعْتَنِقًا * فَرْضَيْكَ هٰذَيْنِ فِي سِرٍّ وَفِي عَلَنٍ۔

সুতরাং তুমি উভয় অবস্থায় মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালন কর। তাহলে গোপন ও প্রকাশ্যে এ দুটো অবস্থান তোমাকে সন্তুষ্ট রাখবে।

فَمَا عَلَى شِدَّةٍ يَبْقَى الزَّمَانُ يَكُنْ * وَلَا عَلَى نِعْمَةٍ تَبْقَى عَلَى الزَّمَنِ۔

এমন নয় যে, দুঃখ বেদনার যুগ চিরস্থায়ী হবে। আবার এও নয় যে, নে'য়ামত ও সুখ সর্বদা বিরাজমান থাকবে। তাঁর কবিতার অপর এ অংশ :

اِنْ كَانَ قَاضِي الْهَوٰى عَلَيَّ وَلِيَّ * مَا جَارَ فِي الْحُكْمِ مَنْ عَلَيَّ وَلِيَّ۔

প্রেমাসক্তি বাস্তবায়নকারীকে যদি আমার বিচারক বানানো হয় তবে বিচারে সে আমার প্রতি জুলুম করবে না।

يَا يُوسُفِيَّ الْجَمَالُ عِنْدَكَ لَمْ * تَبْقَ لِي حِيلَةٌ مِنَ الْحِيَلِ۔

ওহে আমার ইউসুফ রূপের সাগর। তোমার নিকট পৌঁছার জন্যে যত কৌশল তার কোনটাই আমি বাদ রাখিনি।

اِنْ كَانَ قُدَّ الْقَمِيصُ مِنْ دُبُرٍ * فَفِيكَ قُدَّ الْفُؤَادُ مِنْ قُبُلٍ۔

হযরত ইউসুফের জামা ছেঁড়া হয়েছিল পেছনের দিকে। আর তোমার প্রেমে আমার হৃদয় ছিঁড়েছে সম্মুখের দিক থেকে।

আল 'জাওয়াহির' গ্রন্থের রচয়িতা : ৬১৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন বলেন শায়খ ইমাম জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাজম। ইব্ন শাম ইব্ন নাযার ইব্ন আশাইর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শাস আল জুযামী মালিকী। তিনি একজন অভিজ্ঞ ফিক্হবিদ ছিলেন। আল জাওয়াহিরুছ ছামীনাহ ফী মাযহাব-ই-আহলিল মাদীনাহ" গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। শাখা মাস আলাহসমূহের জন্যে এটি একটি বহুল উপকারী গ্রন্থ। ইমাম গায্যালীর (র) "আল ওয়াজীজ" গ্রন্থ অনুসরণে তিনি এটি সম্পাদনা করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেছেন, এই কিতাব তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সম্মানের ব্যাপকতা প্রমাণ করে, মিশরের মালিকী মাযহাবানু সারিগণ যেন এই কিতাব নিয়ে ইতিকাফে বসে থাকত। ইমাম জামালুদ্দীন মিশরে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। দিনিয়াতে তাঁর ইনতিকাল হয়। মহান আল্লাহর ভাল জানেন।

৬১৭ হিজরী সন (১২২১ খ্রি.)

এই হিজরী সনে চেঙ্গিস খানের অত্যাচার-নির্যাতনে চারিদিকে কান্না ও আহারাজারির রোল উঠে চেঙ্গিস খানের মুল নাম তিমুজীন। চীন সীমান্ত থেকে শুরু করে ইরাক পর্যন্ত এবং আবাবিল

ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে চেঙ্গিস ও তার সাথী তাতার দুর্বৃত্তদের ধ্বংস যজ্ঞে চরম বিপর্যায় সৃষ্টি হয়। তারা এক বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ এই বৎসরে ইরাক, জাযীরা, সিরিয়া ও মিশর ব্যতীত অন্য সকল রাজ্য নিজেদের করায়ত্ত্ব করে নেয়। খারিযিমিয়্যাহ, কাফ জাক, কুর্জ, লান খাযির সহ সকল মানব সম্প্রদায়কে তারা পদানত করে নেয়। এই বছর তারা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে অগণিত মানুষ হত্যা করে। মোট কথা তারা যে দেশে প্রবেশ করেছে সে দেশের যুদ্ধ যোগ্য পুরুষ এবং বহু নারী ও শিশুকে খুন করেছে। তাদের প্রয়োজন মত ধন সম্পদ লুট করে অবশিষ্ট ধন সম্পদ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি গাঁইটে গাঁইটে রেশমী সুতা যা তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আর নিজেরা তাকিয়ে তাকিয়ে ওই দহন যজ্ঞ দেখেছে। ঘর দুয়ার পুড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত মসজিদ মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মুসলিম পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা যুদ্ধ ঢাল রূপে ব্যবহার করেছে। যারা যুদ্ধ ঢালরূপে ব্যবহৃত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে তৎসাক্ষাৎ হত্যা করেছে। আল্লামা ইব্নুল আছীর তাঁর আল কামিল গ্রন্থে তাদের ধ্বংস যজ্ঞের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গুরুতর অধ্যায়ের সূচনায় তিনি একটি ভূমিকা লিখেছেন। তিনি বলেছেন "আমরা বলি যে, এই অধ্যায়ে সেই গুরুতর বিষয়ের বর্ণনা থাকবে যার নযীর খুঁজে পেতে ইতিহাস অক্ষম। সাধারণভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের লোমহর্ষক অত্যাচারের শিকার হয়েছে। যদি কেউ একথা বলে যে, হযরত আদম (আ)-এর পৃথিবীতে আগমন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জগত এমন বিপদের সম্মুখীন হয়নি তবে তার কথা সঠিকই হবে। কারণ, ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় ঘটনা নেই যা এই ধ্বংসযজ্ঞের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। ঐতিহাসিকগণ পৃথিবীর জঘন্য জুলুম নির্যাতনের বিবরণে বুখত নসরের ইয়াহূদী নিধন ও বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার বিবরণ পেশ করেন। কিন্তু দেশে দেশে তাতার দুর্বত্তদের হাজারো বাসস্থান ও উপাসনালয় ধ্বংসের তুলনায় বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস এবং একটি শহরে তারা যত সংখ্যক মানুষ খুন করেছে তার তুলনায় পূর্বোক্ত ঘটনায় নিহত ইয়াহূদীর সংখ্যা নামমাত্র। মূলত পৃথিবীতে এই পর্যন্ত এমন বীভৎস ঘটনা ঘটেনি সম্ভবত ভবিষ্যতেও পৃথিবী এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে না। তবে ইয়াজূদ মাজূজের বিষয়টি আলাদা। আর দাজ্জাল তারা যেখাে যাবে নিজেদের অনুগতদেরকে জীবিত রাখবে এবং বিরোধদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু এই দুর্বৃত্ত দল কাউকেই জীবিত রাখেনি। তারা নারী, পুরুষ এবং শিশুদেরকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মহিলার পেট চিরে গভস্থিত শিশুকে হত্যা করেছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। এই দুর্যোগ জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল বায়ু তাড়ানো মেঘের মত। কারণ, এই তাতার সম্প্রদায় একটিদল চীন থেকে যাত্রা করে তূর্যাস্তানের শহর সমূহ যথা কাশগড় বিলাসাগুনে গিয়েছে সেখান থেকে মাওয়ারান নাহারের শহরসমূহ যেমন সমরকন্দ, বখারা প্রভৃতিহ শহরে গিয়েছেন। তারা ওই শহর গুলো দখল করেছে এবং কী বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে তা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। ওদের একাংশ খোরাসান গিয়ে সেখানে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালিয়েছে। সেখান থেকে গিয়েছে রায়, হামদান, পার্বত্য নগরসমূহ হয়ে ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত। এরপর গিয়েছে আযারবায়যান ও আরানিয়াহ শহরে এক বৎসরের কম সময়ের মধ্যে তারা এই সকল শহর নগর ও জনপদে ধ্বংস

যজ্ঞ ও খুন খারাবি চালিয়ে এগুলোকে বিরান করে দিয়েছে। এখানকার সকল অধিবাসীকে তারা খুন করেছে। ঘটনাক্রমে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে হয়ত বা দুচারজন বেঁচে গিয়েছিল। এরপর তারা দরবন্দ শিরওয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা সেখানকার শহরগুলো দখল করে নেয়। প্রেসিডেন্টের ভাসভবন সেনাদূর্গ ছাড়া অন্য কিছুই অক্ষত থাকেনি। এরপর তারা কাছাকাছি অবস্থিত আললান ও লাকার্য শহরে প্রবেশ করে। এর আশেপাশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসস্থানে ও তারা গমন করে। সেখানে তারা কঠিন নিধন যজ্ঞ পরিচালনা করে। এরপর যায় কাফজাক শহরে। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশ তূর্কী। যারা তাদের মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হয়েছিল তাদেরকে তারা হত্যা করেছে। অবশিষ্টগণ গিয়ায পালিয়ে গিয়েছিল। এবং তারা সেখানকার জনপদগুলো দখল করে নেয় ওদের একদল গযনী ও তার আশেপাশে ভারতীয় রাজ্যগুলো যেমন সাহাস্তান, কিরমান ইত্যাদিতে প্রবেশ করে। এ সকল শহরে নগরে তারা এত জঘন্য হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালায় যা কোনো দিন কোনো বর্ণ শ্রবণ করেনি। আলেকজান্ডার যে ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়ার রাজা হয়েছিলেন বলে কথিত আছে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, তিনি ও এক বৎসরের মধ্যে তা করতে পারেন নি। এ সকল দেশ ও জনপদের মালিক হতে তাঁর ২০ বৎসর লেগেছিল, দ্বিতীয়ত তিনি মানুষ খুন করেননি বরং মানুষের আনুগত্য পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই দুর্বৃত্তদল এক বৎসর সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম জনবহুল, সুন্দরতম ও ন্যায়পরায়ণ জনগোষ্ঠির বাসস্থান দখল করে নেয়। তাছাড়া যে সকল জনপদে তারা প্রবেশ করেনি সে সকল জনপদের জনগণ সদা শংকিত ও ভীত সন্ত্রস্ত থেকেছে তাদের আগমন আশংকায়। ওই অপবিত্র আত্মার ঘাতকদল সূর্যকে সিজদা করত। কোনো কিছুই তারা নিষিদ্ধ জ্ঞান করত না। জীব-জন্তু, জীবিত-মৃত যা পেত তা খেত। আল্লাহ্‌র লা'নত তাঁদের উপর। ইব্‌নুল আছীর আরো বলেন যে, ওরা এমন অনাচার সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছিল এজন্যে যে, তাদেরকে বাধা দেয়ার মত কোন শক্তি তখন বিদ্যমান ছিল না। কারণ, সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ মুহাম্মদ সমসাময়িক সকল রাজা বাদশাকে হত্যা করে নিজে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী বৎসর তাতারগণ তাঁর উপর আক্রমণ চালালে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যান। তারা তাঁর পশ্চাদ্ধাভন করে। তিনি কোথায় পালিয়ে গেলেন তা কেউ জানতে পারেনি। কোন এক সামুদ্রিক দ্বীপে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে পুরো অঞ্চলে তাতারদেরকে বাধা দেয়ার কেউ থাকল না। জনপদ রক্ষার কেউ অবশিষ্ট রইল না। لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا (যাতে মহান আল্লাহ্ তাঁর নির্ধারিত বিষয় বাস্তবায়ন করতে পারেন, সূরা আনফাল : ৪৪)। সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তন মহান আল্লাহ্‌র নিকট। এরপর ইবনুল আছীর উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। প্রথমে তিনি তাই উল্লেখ করেছেন পূর্ববর্তী বৎসরের ঘটনায় আমরা যা উল্লেখ করেছি যে,.চেঙ্গিস খান অনেক অর্থকড়ি দিয়ে একদল তাতার ব্যবসায়ী পাঠিয়েছিল বড় পরিমাণে জামা কাপড় কিনে নেয়ার জন্যে। খাওয়ারিযাম শাহ ওই অর্থকড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এতে চেঙ্গিস খান ক্রুদ্ধ এবং খাওয়ারিযাম শাহকে ধমক দেয়। খাওয়ারিযাম শাহ সশরীরে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হন। চেঙ্গিস তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী কুশলী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। তখন খাওয়ারিযাম শাহ ওদের ধন-সম্পদ লুট করে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে ফেলে। ইতিমধ্যে চেঙ্গিস ও তার দল কুশলী

খানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। খাওয়ারিযামদের লুট তরাজের সংবাদে তারা ক্ষোভে কেটে পড়ে এবং খাওয়ারিযামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনদিন উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দুপক্ষে প্রচুর লোক মারা যায়। এরপর যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। খাওয়ারিযাম শাহ নিজ এলাকায় এসে সেটির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেন এবং নিজে তাঁর নিজ শহর খাওয়ারিযামে ফিরে আসেন। অপর দিকে চেঙ্গিস খান এগিয়ে আসে, সে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে বুখারা নগরীতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে চুক্তি ভঙ্গ করে বুখারা দখল করে নেয়, দূর্গে প্রবেশ করে এবং শহরের সকল নাগরিককে হত্যা করে। ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়। নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। বুখারাতে তখন বিশ হাজার যোদ্ধা ছিল। তারা কিছুই করতে পারেনি। এরপর চেঙ্গিস খান সমরকন্দের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। এই হিজরী সনের ১লা মুহাররম সে সমরকন্দ অবরোধ করে। সেখানে ৫০ হাজার সেনা অবস্থান করছিল। তারা প্রতিরোধ সৃষ্টি করল। আরো সত্তর হাজার সাধারণ মানুষ তাদের সাহায্যে বেরিয়ে এল, কিন্তু তাতারগণ এক ঘণ্টার মধ্যে এদের সবাইকে হত্যা করে ফেলল। অবশেষে স্থানীয় ৫০ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ ও সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দিল। ওরা তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওই দিনই হত্যা করে ফেলে। এরপর তারা শহরের সকল অধিবাসীকে হত্যা করে। ধন-সম্পদ লুট করে এবং শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। আগুনে পুড়িয়ে শহরটিকে ছারখার করে দেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। অভিশপ্ত চেঙ্গিস অতঃপর সেখানেই অবস্থান করতে থাকে এবং বিভিন্ন সেনাদলকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করে। সে একদল সৈনিক প্রেরণ করে খোরাসানে। তাতারগণ সেটিকে পশ্চিমী শহর নামে আখ্যায়িত করে। একদল সৈন্য প্রেরণ করে খাওয়ারিযাম শাহের পশ্চাদ্ধাবনে, শেষ দলে ছিল ২০ হাজার সৈন্য। চেঙ্গিস এদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলল, তোমরা ওকে খুঁজে বের করবে। অবশ্যই ওকে পাকড়াও করবে। সে যদি আকাশে ঝুলে থাকে তবু ও তাকে ধরে আনবে। তাতারী সৈন্য খাওয়ারিযাম শাহের খোঁজে বের হল। তারা তাঁর খোঁজ পেয়ে গেল। তবে তাদের আর তাঁর মাঝে জায়হূন নদীর ব্যবধান ছিল। এই নদীর কারণে তিনি নিরাপদ ছিলেন। তাতারীগণ নদী পার হবার জন্যে কোন নৌযান খুঁজে পেল না। তারা কতক ভেলা তৈরী করে নিল, সেগুলোর উপর অস্ত্রশস্ত্র রাখল। এরপর ওদের এক একজন নিজের ঘোড়াকে নদীতে ছুটিয়ে দিয়ে লেজ ধরে থাকত। ঘোড়া সাঁতরিয়ে যেত আর তাকে টেনে নিয়ে যেত। সে অস্ত্র বোঝাই ভেলা নিয়ে যেত। এভাবে তারা সকলে নদী পার হয়ে গেল। খাওয়ারিযাম শাহ তাদের এই কৌশল বুঝতে পারেননি। ইতিমধ্যে তারা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখামাত্রই তিনি তাদের নিকট থেকে পালিয়ে নিশাপুরের দিকে চলে যান। সেখান থেকে অন্যদিকে। তাতারীগণ তাঁর পেছনে ছিলই। একটুও অবকাশ দেয়নি। যিনি যেখানেই অবস্থান করে সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করতে চাইতেন। সেখানেই তাতারীগণ হানা দিত। তিনি পলায়ন করতেন অবশেষে তিনি তাবারিস্তানের একটি নদী পার হয়ে দ্বীপাঞ্চলে একটি দূর্গে আশ্রয় নেন। এবং ওই দূর্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেন যে, সমুদ্র দেয়ার তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জানা যায়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি কোথায় গিয়েছেন তা অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। তাতারগণ তাঁর সকল মালপত্র, সাজ-সর জ্ঞান ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। তারা যা পেয়েছিল তার মধ্যে ছিল এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা, ২০ হাজার ঘোড়া ও খচ্চর, প্রচুর দাসদাসী ও তাঁবু। তাঁর

দশ হাজার ক্রীতদাস ছিল যেগুলো দেখাশোনায় রাজার মত। এর সবগুলোই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ একজন হানাফী ফিক্হবিদ ছিলেন। জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর দখল ছিল। বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়েছিলেন তিনি। সেলজুক বংশের রাজত্বের পর অন্য কোন শাসক এত বড় সাম্রাজ্যের মালিক হয়নি এবং এত বেশী মর্যাদার অধিকারী হয়নি। কারণ তাঁর নেশা ও পেশা ছিল রাজ্য জয় করা। অন্য কোন ভোগ বিলাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। এজন্যে তিনি ওই অঞ্চলের সকল রাজা বাদশার উপর বল প্রয়োগ করে তাদেরকে অপসারণ করে নিজে এককভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে সময়ে খোরাসান, মাওয়ারাননাহার, ইরাক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে তিনি ব্যতীত অন্য কোন শাসক ছিল না। সমগ্র অঞ্চল তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তাদের তত্ত্বাবধানে শাসিত হচ্ছিল।

এরপর তাতারীগণ মাযিনদারান রাজ্যে গমন করে। সেখানকার দূর্গটি ছিল অন্যতম সুরক্ষিত দূর্গ। এজন্যে মুসলমানগণ ৯০ হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত এটি জয় করতে পারেনি। ৯০ হিজরীতে খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের সময় মুসলমানগণ এটি জয় করেছিল। কিন্তু তাতারগণ খুব সহজে এবং অল্পসময়ে তা জয় করে, তারা সেখানে রক্ষিত ধন রত্ন লুণ্ঠন করে, সেখানকার অধিবাসীদের খুন ও বন্দী করে, এবং আগুনে পুড়িয়ে শহরটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এরপর তারা সেখান থেকে রায় প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে তারা সুলতান খাওয়ারিযাম শাহের মাতার নাগাল পায়। তাঁর সাথে প্রচুর ধন-রত্ন ছিল। তারা সেগুলো ছিনিয়ে নেয়। তার মধ্যে ভাল-মন্দ সকল প্রকারের মণিমুক্তা ও হীরা যহরত ছিল। তারা রায় প্রদেশে প্রবেশ করে। সেখানকার জনগণ এ ব্যাপারে ছিল পুরোপুরিই বেখবর ও উদাসীন। ফলে সহজেই তারা ওদেরকে হত্যা ও বন্দী করে। তাতারগণ এরপর হামাদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা সেটি দখল করে নেয়। এরপর যানজান দখল করে এবং জনগণকে হত্যা ও বন্দী করে। এরপর কাযভীন দখল করে। সেখানে তারা প্রায় চল্লিশ হাজার লোককে হত্যা করে। এরপর তারা আযারবায়জানের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। আযারবায়যানের শাসক সম্রাট উথাবক ইব্ন পাহলোয়ান বড় পরিমাণের ধন সম্পদ পাঠিয়ে ওদের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করে। কারণ, সে নিজে ও তখন মদ পান, নেশাখোরী, ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল। তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে মাওকানের দিকে চলে যায়। সেখানে কুর্জ সম্প্রদায়ের দশ হাজার যোদ্ধা তাদের গতিরোধ করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাতারদের মুকাবিলায় তারা অল্পসময় ও টিকতে পারেনি। তারা পরাজিত হয়। এরপর পুনরায় আরো প্রস্তুতি নিয়ে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাতারগণ দ্বিতীয় বার তাদেরকে আরো শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এখানে এসে ইব্ন আছীর বলেন যে, এই তাতার সম্প্রদায় এত জঘন্য অনাচার ও অপরাধ সংঘটিত করেছে যা তাদের পূর্বে ওপরে কখনো শোনা যায়নি। চীন সীমান্ত থেকে তাদের একদল লোক বের হয়ে এক বৎসরপূর্ণ হবার আগে তাদের কতক আর্মেনিয়া রাজ্যসমূহে গমন করে এবং কতক হামাদানের পথে ইরাক অতিক্রম করে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বই পুস্তকে এসব বিবরণ দেখে তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু সত্য তো সত্যই। তারা যদি এগুলোকে অসম্ভব জ্ঞান করতে চায় তাহলে তাদের উচিত হবে আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি এবং আমাদের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ যা লিপিবদ্ধ যুগের প্রায় সকলেই এইসব ঘটনা

সম্পর্কে অবগত আছে। এগুলো এত প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানী মুর্খ নির্বিশেষে সকলেই তা জানে। মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্যে এমন নেতার ব্যবস্থা করে দিন যে তাদেরকে রক্ষা করবে নিরাপত্তা দিবে। তারা তো গুরুতর অপরাধ করেছে শত্রুতার সীমানা পেরিয়ে মহা দুর্যোগের মধ্যে পতিত হয়েছে। মুসলিম শাসনকর্তার গণ্ডি পেরিয়ে এমন শাসনকর্তার খপ্পরে পড়েছে যার চিন্তা শুধু পেঠ ও যৌনাচার। মোটকথা সুলতান খাওয়ারিযাম শাহ্ নিখোঁজ হয়ে গেলেন। ইব্নুল আছীর বলেন, এই বৎসর যখন শেষ হয় তখন তাতারগণ কুর্জ সম্প্রদায়ের দেশে অবস্থান করছিল। কুর্জদের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধ ও বাধা দেখতে পেয়ে তারা অন্য অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের রীতিই ছিল এটা। এরপর তারা তিবরিযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখানকার লোকজন ধন-দৌলতের বিনিময়ে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এরপর তারা মুরাগাহ এর উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। তারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কামান বসায় এবং মুসলিম বন্দীদের যুদ্ধ বর্ণরূপে ব্যবহার করে। সেখানকার শাসনকর্তা ছিল মহিলা। "যে সম্প্রদায় মহিলাকে তাদের দায়িত্বশীল মনোনীত করে সে সম্প্রদায় কখনো সফল হতে পারবে না। কয়েকদিন যুদ্ধ পরিচালনার পর তাতারগণ ওই দেশ জয় করে নেয়। বহু স্থানীয় জনগণকে তারা হত্যা করে যুদ্ধ সম্পদ রূপে বিশাল অংকের ধনরত্ন হস্তগত করে। তাদের রীতি অনুযায়ী বহু মানুষকে খুন এবং বহু মানুষকে বন্দী করে ফেলে। সাধারণ মানুষ তাদেরকে ভীষণ ভয় পেত। এমনও হয়েছে যে, কোনো এক পাড়ায় একজন তাতার প্রবেশ করেছে সেখানে প্রায় একশত জন সক্ষম পুরুষের অবস্থান, তাদের কেউই ওই তাতারের বিরুদ্ধে হাত পর্যন্ত তোলেনি, সে একা এক এক করে সবাইকে খুন করে চলে গিয়েছে। একই ওই পাড়া লুট করে সর্বস্ব নিয়ে গিয়েছে। একবার এক তাতারী মহিলা পুরুষের রূপ ধরে এক বাড়িতে প্রবেশ করে ওই পরিবারের সবাইকে হত্যা করে এবং অন্য কিছু লোককে বন্দী করে নিজ আস্তানার দিকে যাত্রা করে। ইতিমধ্যে জনৈক বন্দী বুঝে ফেলে যে, এতো মহিলা, অতঃপর কৌশলে সে মহিলাটিকে হত্যা করে ফেলে। আল্লাহ্র লা'নত ওই মহিলার প্রতি। এরপর তাতারগণ আরাবিল শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সংবাদ পেয়ে মুসলমানগণ ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে খলীফা জাযিরার শাসনকর্তা আশরাফ এবং মুসেল অধিবাসীদেরকে চিঠি লিখে বললেন যে, আমি তাতারীদের মুকাবিলা করার জন্যে একদল সৈন্য প্রস্তুত করেছি তোমরা এদের সহযোগিতায় এগিয়ে আস। উত্তরে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে আশরাফ বললেন, আমি আমার ভাই কামিলকে সাহায্য করার জন্যে মিশরীয় অঞ্চলে যাচ্ছি কারণ ফ্রাংক সম্প্রদায় সেখানে খুবই উৎপাত করছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে। ইতিমধ্যে তারা দিমিয়াত দখল করে নিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা সমগ্র মিশরীয় অঞ্চল দখলের পাঁয় তারা করছে। তাঁর ভাই মুআয্যাম হাররানের শাসনকর্তাকে তাঁদের ভাই কামিলের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর খলীফা চিঠি লিখেন আরাবিল শাসনকর্তা মুযাফফরুদ্দীনের নিকট তিনি যেন খলীফার প্রস্তুত করা দশ হাজার সৈন্যের এই যোদ্ধা দলকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে সাকুল্যে আট শত অশ্বারোহীও আসেনি। আবার তারা একত্রিত হবার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন। তবে এ সময়ে মহান আল্লাহ তাতারীদের পরিকল্পনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা হামাদানের দিকে যাত্রা করে। সেখানকার অধিবাসিগণ তাদের সাথে সন্ধি

চুক্তি সম্পাদন করে। তাতারগণ সেখানে তাদের প্রতিনিধি রেখে আসে। এরপর জনগণ তাদের ওই প্রতিনিধিদের হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবাদ পেয়ে তাতারগণ হামাদানে ফিরে আসে এবং অবরোধ সৃষ্টি করার পর সেটি জয় করে। বহু অধিবাসীকে তারা হত্যা করে। শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহিলাদের অশ্লীলতা হানি করে। এরপর তাদেরকে হত্যা করে এবং গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে সেগুলোকে ও হত্যা করে। এরপর তারা কুর্জদের জনপদে আসে। তাদের প্রতিরোধের জন্যে কুর্জগণ প্রস্তুত ছিল। উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। কুর্জগণ পরাজিত হয়। এরপর তারা বহু শহর নগর জয় করে, সেখানকার জনগণকে হত্যা ও বন্দী করে। বন্দী করা পুরুষদেরকে যুদ্ধ বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে। যুদ্ধ শেষে যে সকল বন্দী বেঁচে যেত তাদেরকেও হত্যা করে ফেলত। এরপর তারা লান ও কাবজাক রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তাদের সাথে তাতারদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তাতারগণ জয়ী হয়। এরপর তার কাবজাকের প্রধান শহর সুদাকের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, সেখানে প্রচুর পরিমাণে দামী মালপত্র, জামা-কাপড় ও উন্নত দ্রব্য সামগ্রী ছিল। হার্মাদদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জনগণ রুশীয় শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়, ওরা ও খ্রিস্টান ছিল। ফলে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় কাবজাক ও রুশ সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়। সম্মিলিত শক্তি তাতারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাতারগণ তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর তারা বিলকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এখানে ও তারা জয় লাভ করে। এরপর তারা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের নিকট ফিরে যায়। তার প্রতি আল্লাহর লানত। এটি ছিল পশ্চিমমুখী সেনা দলের বিরান। চেঙ্গিস খান তার একটি বাহিনী কিল্যাতে এবং একটি বাহিনী ফারগানাতে প্রেরণ করে। তারা ওই সব রাজ্য জয় করে। সে একটি বাহিনী খোরাসানে প্রেরণ করে। সে একটি বাহিনী খোরাসানে প্রেরণ করে। তারা বালখ অবরোধ করে এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে। তারা অন্যান্য শহর নগরেও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে তারা তালকান পর্যন্ত পৌছে। সেখানকার দূর্গ হয়ে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। সেটি ছিল অন্যতম সুরক্ষিত দূর্গ। তারা ছয় মাস অবরুদ্ধ করে রেখেও হুসটি জয় করতে পারেনি। অবশেষে তারা বিষয়টি নেতা চেঙ্গিস খাঁনকে অবহিত করে। এবার সে নিজে আসে এবং আরো চার মাস অবরোধ করে রাখার পর-সেটি জয় করে। এরপর ওই দূর্গে যারা ছিল সবাইকে এবং শহরের আস-খাস সকল মানুষকে হত্যা করে। এরপর চেঙ্গিস খাঁন ও তার সৈন্যরা মার্ভ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের প্রতিরোধের জন্যে আরব-অনারব মিলিয়ে প্রায় দুলক্ষ মানুষ প্রস্তুত হয়। তাতারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ পরাজিত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। এরপর তারা মার্ভ শহর অবরোধ করে। কৌশলে শাসনকর্তাকে বাগে নিয়ে আসে এরপর বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ করে শাসনকর্তাসহ সকল নাগরিককে হত্যা করে। ধনসম্পদ লুট করে। অকথ্য নির্যাতনে জনগণকে অতীষ্ঠ করে তোলে। একদিনে তারা সাত লক্ষ লোককে হত্যা করে। এরপর তারা নিশাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মার্ভে যা করেছে সেখানেও তারা তা করে। এরপর তারা তূস নগরীতে গমন করে। তারা সেখানে নবহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত করে। হযরত আলী ইব্ন মূসা রিযার (আ) মাযার ও খলীফা হারূন-অর-রশীদের সমাধি ধ্বংস করে। এরপর তারা গযনীর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। শাসনকর্তা জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়া রিযাম শাহ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

সৃষ্টি করেন। কিন্তু তারা তাঁকে পরাস্ত করে। এরপর তারা তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের নিকট ফিরে আসে।

চেঙ্গিস খান তার একটি বাহিনী খাওয়ারিযাম শাহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। তারা ওই শহর অবরোধ করত: সেটি জয় করে সেখানে লুট পাঠ ও খুন খারাবি সংঘটিত করে। সে বাঁধের কারণে জীহূন নদীর পানি শহরে প্রবেশ করতে পারত না তারা সেই বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। ফলে নদীর পানিতে শহর তলিয়ে যায় এবং ঘর দুয়ার পানিতে ডুবে যায়। জনগণ মৃত্যুবরণ করে। এরপর তারা চেঙ্গিস খানের নিকট ফিরে আসে। সে তখন চালকানে তাঁবু স্থাপন করে সেখানে অবস্থা করছিল। ওদের মধ্য থেকে একটি বাহিনীকে সে পুনরায় গজনীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযাম শাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনি এবার তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাদের হাতে বন্দী থাক অনেক মুসলমানকে তিনি মুক্ত করেন। এরপর তিনি সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে চেঙ্গিসকে লিখিত আহবান জানান। চেঙ্গিস যুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জালালুদ্দীনের কতক সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। উভয় পক্ষে তবুও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত জালালুদ্দীন যুদ্ধ ছেড়ে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যান। চেঙ্গিত ও তার সৈন্যরা বিনা বাধায় গযনীতে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে রীতিমত ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে। চেঙ্গিসদের এই সব ধ্বংসযজ্ঞ বা তার অধিকাংশ এই হিজরী সন অর্থাৎ ৬১৭ হিজরী সনে সংঘটিত হয়।

এই হিজরী সনে শাসনকর্তা আশরাফ মূসা ইব্ন আদিল তাঁর ভাই শিহাবুদ্দীন গাযীকে খিলাত, মিয়াফারিকায়ন ও আর্মেনিয়ার শহরগুলোর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন এবং বিনিময়ে রাহা ও সারাজ নিজ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন। কারণ, তিনি ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই কামিলকে সাহায্য করতে গিয়ে এই রাজ্যগুলো ঠিকমত শাসন করতে পারছিলেন না। এই হিজরী সনের মুহাররাম মাসে বাগদাদে এক ঘুর্ণিঝর আঘাত হানে। প্রচণ্ড বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে গগন বিদারী শব্দে বাগদাদ শহর কেঁপে কেঁপে উঠে। একটি বজ্রপাত হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় মিনারের উপর। তাতে সেটি ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। এরপর সেটিকে পুনরায় মেরামত করা হয়, এই হিজরী সনে দামেস্ক জামে মসজিদের পশ্চিমাংশে হাম্বলি মেহরাব স্থাপন করা হয়। কিছু লোক অবশ্য তাদেরকে এ কাজে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সেনাপতি একাংশ তাদেরকে সমর্থন করেছিল। তাদের অন্যতম হলেন আমীর রুকনুদ্দীন আল মুআয্যামী। শায়খ মুওয়াফফিকুদ্দীন ইব্ন মুদামাহ্ সেখানে নামায আদায় করেন। আমি বলি (গ্রন্থকার) এরপর ৭৩০ হিজরীতে এই মিহরাব উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে যিয়ারত ফটকের নিকট পশ্চিমী মেহরাব স্থাপন করা হয়। যেমন হানাফীদের পশ্চিমী মেহরাবের পরিবর্তে যিয়ারত ফটকের পূর্ব দিকে তাদের জন্যে নতুন মেহরাব স্থাপন করা হয়। টাংকেজী শাসন মেলে জামে মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক তকীউদ্দীন ইব্ন মুরজিলের হাতে মসজিদ সংস্কারের সময় এগুলো স্থাপন প্রতিস্থাপন করা হয়।

এই হিজরী সনে সিনজারের শাসনকর্তা তার ভাইকে হত্যা করে। ফলে শাসনকর্তা আল আশরাফ নিজে একাকী ওই রাজ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই হিজরী সনে সেনাপতি ইমাদুদ্দীন ইব্ন মাশতূব শাসনকর্তা আশরাফের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অথচ যুবরাজ ফাইযের হাতে বায়'আত করার অপরাধে শাসনকর্তা শামিল যখন তাকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন

আশরাফই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এই সুত্রে সেনাপতি ইমাদ দীপাঞ্চলে খুবই ফিতনা ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। অবশেষে আল আশরাফ তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সেখানে ধুঁকে ধুঁকে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই হিজরী শাসনকর্তা আল কামিল তাঁর প্রতিপক্ষ ফ্রাংকদের এক প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের দশ হাজার সৈন্যকে তিনি হত্যা করেন। তাদের অস্ত্রশস্ত্র, অশ্বরাজি ও বহু ধনসম্পদ তিনি দখল করে নেন। প্রশংসা মহান আল্লাহ্র।

এই হিজরী সনে শাসনকর্তা আল মুআয্যাম মুফাখিরুদ্দীন ইব্রাহীম আল মুতামিদকে দামেস্কের গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত করে আযীয খলীলকে ওই পদে নিযুক্ত করেন। হাজিগণ যখন মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন মুতামিদ ছিলেন তাদের দলনেতা। তাঁর মাধ্যমে হাজিগণ খুবই উপকৃত হয়। কারণ ইরাকী হাজীদের দলনেতা আকবাশ নাসিরীকে মক্কার বেদুইন দস্যুরা হত্যা করার পর আল মুতামিদ ওই বেদুইন দস্যুদেরকে দস্যু বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন। গভর্নর মুতামিদ খলীফা আল নাসিরের ঘনিষ্ঠতম ও প্রিয়তম সেনাপতি ছিলেন। কারণ মক্কার শাসনকর্তা কাতাদা ইব্ন ইদ্রীসের মৃত্যুর পর পরবর্তী শাসনকর্তা রূপে সেনাপতি হুসায়নের নামের প্রস্তাব নিয়ে এবং সাথে উপহার নিয়ে তিনি খলীফার নিকট এসেছিলেন। শাসনকর্তা কাতাদার মৃত্যু হয় এই হিজরী সনের জুমাদাল ঊলা মাসে। এরপর পরবর্তী শাসনকর্তার পদ নিয়ে কাতাদার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। রাজিই ছিলেন কাতাদার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বললেন আমার বর্তমানে অন্য কেউ শাসন ক্ষমতা পাবেন। এ নিয়ে সেখানে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ ঘটনায় দুঃখজনকভাবে এবং ভুলক্রমে সেনাপতি আকবাশ নিহত হয়। কাতাদা হাসানী ওয়াদী বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সম্মানী লোক ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও হৃদয়বান ও সৎ শাসক ছিলেন। তবে মক্কার বেদুইন দুর্বৃত্ত ও বিশৃংখলা সৃষ্টি কারীদের প্রতি তিনি ছিলেন খড়গ হস্ত। এক পর্যায়ে তাঁর এই চরিত্রে পরিবর্তন ঘটল। তিনি জুলুম অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ শুরু করলেন, ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিকট থেকে অবৈধ ট্যাক্স আদায়ের নিয়ম চালু করলেন এবং একাধিকবার হজ্জ কাফেলায় লুট তরাজ চালালেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তার বিরুদ্ধে তার পুত্রকে শক্তিশালী করে দিলেন। সে একযোগে তার পিতা, চাচা এবং ভাইকে খুন করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও ছাড় দিলেন না। তার রাজত্ব প্রত্যাহত হল এবং সে দেশ থেকে বিতাড়িত হল। কেউ কেউ বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত সে নিজেও নিহত হয়েছে। কাতাদা একজন দীর্ঘ দেহী ও গুরু গম্ভীর শায়খ ছিলেন। কোন খলীফা কিংবা রাজা-বাদশাকে তিনি ভয় করতেন না। তিনি মনে করতেন যে, শাসন কার্য পরিচালনায় তিনি সবার চেয়ে যোগ্যতম ও অগ্রাধিকারী। খলীফা আল নাসির চাইতেন যে, আমীর কাতাদা তাঁর দরবারে উপস্থিত হন তাহলে তিনি তাঁকে সম্মানিত করবেন। কিন্তু আমীর কাতাদা এই প্রস্তাব শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং খলীফার দরবার যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন। তিনি কোনোদিন কারো নিকট প্রতিনিধি রূপে যাননি এবং কোনো খলীফা কিংবা শাসনকর্তাকে কুর্নিশ করেননি। একবার খলীফা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি লিখেছিলেন।

وَلِيْ كَفُّ ضُرْغَامٍ اَذُلُّ بِبَطْشِهَا * وَاَشْرِيْ بِهَا بَيْنَ الْوَرٰى وَاَبِيْعُ

আমার আছে সিংহের হাত। সেটি কেউ ধরে ফেললে আমি অপমান বোধ করি। ওই হাতে আমি জগত মাঝে বেচা-কেনা করি।

تَظَلُّ مُلُوْكُ الْاَرْضِ تَلْثَمُ ظَهْرَهَا * وَفِيْ بَطْنِهَا لِلْمُجْدِبِيْنَ وَبِيْعُ۔

পৃথিবীর রাজা বাদশাহগণ ওই হাতের পিঠ চুম্বন করে। ওই হাতের ভেতরের দিকে তথা তালুতে আছে গরীব দুঃখীদের জন্যে পরম দানশীলতা।

أَأَجْعَلُهَا تَحْتَ الرَّحٰى ثُمَّ اَبْتَغِيْ * خَلَاصَالَهَا اِنِّيْ اِذًا لَرَقِيْعُ۔

আমি কি সেটিকে যাঁতার নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর বের করে আনতে চাইব? তাহলে তো আমার হাত ছিঁড়ে কেটে চৌচির হয়ে যাবে।

وَمَا اَنَا اِلَّا الْمِسْكُ فِيْ كُلِّ بُقْعَةٍ * يَضُوْعُ وَاَمَّا عِنْدَكُمْ فَيَضِيْعُ۔

আমি মৃগনাভ সর্বত্র সেটি সুরভিত করে তোলে, আর আপনাদের সংস্পর্শে গেলে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে, শায়খ কাতাদা ৭০ বৎসর বয়স পেয়েছিলেন। আল্লামা ইব্নুল আসীর উল্লেখ করেছেন যে তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল ৬১৮ হিজরী সনে। মহান আল্লাহ্র ভাল জানেন।

৬১৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সুলতান ফাইয : তিনি হলেন গিয়াছুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন আদিল। সেনাপতি ইমাদুদ্দীন ইব্ন মাশতূব তাঁর জন্যে মিশরীয় অঞ্চলের রাজত্ব গুছিয়ে এনেছিল। সুলতান আল কামিল যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নিতেন তাহলে পুরো মিশরীয় অঞ্চল তাঁর কর্তৃতাধীনে চলে যেত। এরপর তাঁর ভাই আশরাফ মূসা তাঁকে দ্রুত তাঁর অপর দুই ভাইয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কারণ, ফ্রাংকদের মুকাবিলায় তাঁরা সংকটাপন্ন ছিলেন। আল আশরাফ তাঁকে খুব দ্রুত অগ্রসর হবার জন্যে উৎসাহিত করেন। কিন্তু পথিমধ্যে সানজার ও মুসেলের মধ্যবর্তী এক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ সানজারে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ তাঁকে দয়া করুন।

শায়খ সদরুদ্দীন : তিনি হলেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন শায়খুশ শুয়ূখ ইমাদুদ্দীন মাহমূদ ইব্ন হামুওয়াইহ আল জাভিনী। আইয়ূবী শাসকদের নিকট তাঁরা সম্মানিত ও শাসক পরিবার রূপে বিবেচিত হতেন। আলোচনা শায়খ সদরুদ্দীন একজন বড় সাপের ফিক্হবিদ ও সম্মানী লোক ছিলেন। মিশরে শাফিঈ মাদরাসায় তিনি পড়াশোনা করেন। হাসানায়ন সমাধি সংলগ্ন মাদরাসায়ও তিনি অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে তিনি সাঈদুস সুআদা এর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা বাদশাদের নিকট তাঁর খুব সম্মান ছিল। সুলতান আল কামাল ফ্রাংকদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনার পত্র দিয়ে তাকে খলীফার নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। সেখানে কাযীব আল বান-এর নিকট তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর।

হিমা-এর শাসনকর্তা : তিনি হলেন সুলতান মনসূর মুহাম্মদ ইব্ন সুলতান মুযাফফর তকীউদ্দীন উমার ইব্ন শাহানশাহ ইব্ন আইয়ূব। তিনি একজন গুণী জ্ঞানীও সম্মানী শাসক ছিলেন। ১০ খণ্ডে তিনি একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। সেটির নাম দিয়েছিলেন "আল

মিযমার"। তিনি একজন দুঃসাহসী বীর ও চালনায় দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র নাসির কালজি আরসালান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এরপর সুলতান আল কামিল তাকে পদচ্যুতি ও বন্দী করে তার ভাই মুযাফফর ইব্ন মনসূরকে ক্ষমতায় বসায়। বন্দী অবস্থায় নাসির কালীজের মৃত্যু হয়।

আমিদের শাসনকর্তা : ৬১৭ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন আমিদ অঞ্চলের শাসনকর্তা সুলতান সালিহ নাসিরুদ্দীন মাহমূ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কারা আরসালান ইব্ন আরতুক। তিনি একজন সাহসী বীর ও উলামা বান্ধব শাসক ছিলেন। সুলতান আল আশরাফ মূসা ইব্ন আদিলের ভাল বন্ধু ছিলেন তিনি। তিনি বহুবার তাঁর দরবারে এসেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র আল মাসঊদ ক্ষমতা গ্রহণ করে। সে ছিল পাপাচারী ও কৃপণ। সুলতান আল কামিল ধন সম্পদ সহ তাকে পাকড়াও করেন এবং মিশরে বন্দী করে রাখেন। এরপর ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাকে ছেড়ে দেন। এরপর সে তাতারদের সাথে মিলিত হয়। তারা ও তার অবশিষ্ট ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

শায়খ আবদুল্লাহ ইউনানী : তাঁর উপাধি ছিল সিরিয়ার সিংহ। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। বাআলা বাককা অঞ্চলের ইউনীন গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর একটি খানকা ছিল। লোকজন সাক্ষাত লাভের জন্যে সেখানে যেত। তিনি একজন বড় মাপের নেককার লোক ছিলেন। আমল ইবাদত ও সৎকাজে আদেশ মন্দ কাজে বারণে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তাকওয়া ও পরহেযগারীতে তিনি উচ্চ অবস্থানে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি কোনো কিছুই সঞ্চয় করে রাখতেন না। তাঁর কোনো মালপত্র ও জামা কাপড় ছিল না। বরং ধার করা জামা কাপড় পরিধান করতেন। গরম কালে একটি জামা আর শীতকালে তার উপর একটি চামড়ার কোট তার বেশী জামা কাপড় তিনি ব্যবহার করতেন না। তাঁর মাথায় একটি বকরীর চামড়ার টুপি থাকত। তাঁর চুল থাকত টুপির বাহিরে। কোনো যুদ্ধে তিনি অনুপস্থিত থাকতেন না। ৮০ চিতল ওজনের ধনুক থেকে তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন। কোন কোন সময় তিনি লেবাননের পর্বত-পাদদেশে অবস্থান করতেন। শীতকালে গরম পানির জন্যে তিনি পূর্ব দামেস্কের দাওমাহ্ জনপদের উপর পাহাড় থেকে নেমে আসা আসিরিয়া ঝর্ণার নিকট আসতেন। তখন লোকজন তাঁর সাক্ষাত প্রাপ্তির জন্যে সেখানে আসত। মাঝে মাঝে তিনি দামেস্কে এসে কাদিসিয়্যাহ-এর নিকটস্থ সাফাহ কাসিয়ূনে অবস্থান করতেন। তিনি কাশফ ও দিব্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে সিরিয়ার সিংহ বলা হত। কুকের বিচারক কাযী জামালুদ্দীন ইয়াকুবের উদ্ধৃতি দিয়ে শায়খ আবুল মুযাফফর সাবত ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন স্বচক্ষে শায়খ আবদুল্লাহ ইউনীনীকে দেখলেন যে, তিনি শ্বেত পুলের নিকট প্রবাহমান পানি দিয়ে ওযু করছেন। তখন সে পথে এক খ্রীষ্টান যাচ্ছিল খচ্চর বোঝাই শরাব ও মদ নিয়ে। পুলের নিকট তার খচ্চরটি হোচট খেল এবং তার গাঁইটটি নীচে পড়ে গেল। শায়খ আবদুল্লাহ্ তা দেখলেন। তিনি তখন ওযূ শেষ করেছেন। খ্রিষ্টান লোকটি তাঁকে চেনেনি। সে তার বোঝা তুলতে তাঁর সাহায্য কামনা করে। শায়খ তখন আমাকে ডেকে বললেন ওহে ফকীহ। আস খচ্চরের পিঠে বোঝা তুলতে আমাদেরকে সাহায্য কর। বোঝা উঠিয়ে পর খ্রিষ্টান লোকটি চলে গেল। শায়খের কাণ্ড দেখে আমি অবাক হলাম। আমি ওই বাহনের পেছনে চললাম। শহরের যাবার উদ্দেশ্যে

আমি যাত্রা করেছিলাম। খ্রিষ্টানটি তার বাহন নিয়ে পাহাড়ী ঘাঁটিতে পৌঁছল এবং মদ বিক্রেতার নিকট তা তুলে দিল। হায়! সে দেখল যে, এসব সিরকা ও মদ বিক্রেতা বলল, এই যে সিরকা। খ্রিষ্টান বলল, আমি তো জানি আমি কোত্থেকে এসেছি এবং কোথা হতে এগুলো এনেছি। এরপর সে তার বাহন দোকানের সাথে বেঁধে সালেহিয়া অঞ্চলে গমন করে এবং শায়খের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। সে তাঁর সন্ধান পায় এবং তাঁর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে। শায়খ আবদুল্লাহ-এর আরো বহু কারামত ও অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। কেউ তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়াতেন না। তিনি বলতেন, মানুষতো দাঁড়াবে আল্লাহ্র জন্যে। সুলতান আল আমজাদ তাঁর নিকট তাঁর সম্মুখে বসে পড়তেন। শায়খ তাঁকে বলতেন, তুমি তা এটা করেছ, ওটা করেছ। তিনি তাঁকে যা নির্দেশ দেয়ার দিতেন যা থেকে বারণ করার করতেন। আমজাদ শায়খের সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এটা এজন্যে হত যে, শায়খ তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারীতে শত ভাগ সঠিক ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করতেন কিন্তু পরবর্তী দিবসের জন্যে তিনি কছুই জমা করে রাখতেন না। তাঁর ক্ষুধা তীব্র হলে তিনি বাদাম পাতা ছিঁড়ে নিতেন। সেটিকে ঘষা দিয়ে মুখ লাগিয়ে চুষতেন তাতে তিনি ঠাণ্ডা পানি পান করতেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং পরকালে তাঁর জন্যে সম্মানযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করুন। জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো বৎসর তিনি শূন্যে চড়ে হজ্জে যেতেন। এই জাতীয় কারামত অবশ্য আল্লাহ্র অনেক নেক বান্দা ও আউলিয়া-ই-কিরামের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় বাহ্যিক আলিম-উলামাগণের একজন থেকেও তেমন ঘটনা ঘটবার তথ্য আমরা পাইনি। এ জাতীয় কারামত প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথম হাবীব আজমীর থেকে। তিনি ছিলেন হযরত হাসান বসরীর শিষ্য। এরপর বহু ওলী-আউলিয়া ও পুণ্যবান বান্দাদের ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটেছে।

এই হিজরী সনের ১০ জিলহজ্জ জুাবারে আবদুল্লাহ্ ইউনীনী ফজরের নামায আদায় করলেন এবং বা'আলা বাক্কার জামে মসজিদে জুম'আর নামায আদায় করলেন। সেদিন নামাযের পূর্বে তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করেছিলেন সুস্থাবস্থায়। নামায শেষে তিনি মুআয্যিন শায়খ দাউদকে ডেকে বললেন, ভেবে দেখুন আগামীকাল আপনি কেমন থাকবেন। মুআযযিন কিন্তু মৃত ব্যক্তিদেরকে গোসল দিতেন। এরপর শায়খ তাঁর খানকাতে উঠেন রাতে মহান আল্লাহ্র যিকর করেন, তাঁর সাথী সঙ্গীদের কথা আলোচনা করেন এবং যারা তাঁর প্রতি ইহসান ও উপকার করেছে তাদের কথা স্মরণ করে তাদের জন্যে দু'আ করেন। ফজরের ওয়াক্ত হবার পর সাথীদেরকে নিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করেন এবং তারপর হেলান দিয়ে যিকরে রত হন। তাঁর হাতে তাসবীহ মালা ছিল। এই বসাতেই তিনি ইনতিকাল করেন। মারা যাবার পরও তিনি বসা থেকে ঢলে পড়েননি। তার হাত থেকে তাসবীহমালাও ছুটে যায়নি। সুলতান আমজাদের নিকট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পৌছলে তিনি দ্রুত উপস্থিত হন এবং এ অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান। তিনি বলেন, তাঁকে এভাবে রেখে যদি তাঁর উপর আমরা একটি সমাধি নির্মাণ করি তাহলে এটা দেখে মানুষ শিক্ষা নিতে পারবে। তখন কেউ কেউ বললেন যে, এমনটি করাতো সুন্নত নয়। এরপর শায়খকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হল এবং যে গাছের নীচে বসে তিনি মহান আল্লাহ্র যিকর করতেন ওই গাছের নীচে তাঁকে দাফন করা হল। তাঁর

ওফাত হয়েছিল শনিবারে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসরের বেশি। শায়খ মুহাম্মদ ফকীহ ইউনীনী তাঁর অন্যতম ছাত্র ও আশ্রয় প্রাপ্ত ছিলেন। বা'আলা বাক্কা শহরের শায়খগণের তিনি দাদা শায়খ।

আবূ আবদুল্লাহ আল হুসায়ন : তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ আল হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মাজাল্লী মুসেলী। তিনি ইবনুল জুহানী নামে অধিকার পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন গুণবান যুবক ছিলেন। মুসেলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লুলুর সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

نَفْسِىْ فِدَاءُ الَّذِىْ فَكَّرْتُ فِيْهِ وَقَدْ * غَدَوْتُ اَغْرُقُ فِىْ بَحْرٍ مِنَ الْعَجَبِ.

আমার জীবন তাঁর জন্যে উৎসর্গ আমি যাঁর চিন্তায় বিভোর। আমি ভোরে উঠলাম আমি যেন আশ্চর্যের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।

يَبْدُوْ بِلَيْلٍ عَلَى صُبْحٍ عَلَى قَمَرٍ * عَلَى قَضِيْبٍ عَلَى وَهْمٍ عَلَى كُثُبٍ.

সে প্রকাশিত ও দৃশ্যমান হচ্ছে চাঁদের উপর ভোরের আলো এবং তার উপর রাতের অন্ধকার নিয়ে, সে দৃশ্যমান হচ্ছে পার্বত্য উপত্যকায় বৃক্ষের উপর শাখা প্রশাখা নিয়ে।

৬১৮ হিজরী সন (১২২২ খ্রি.)

এই হিজরী সনে তাতারগণ কিলাদাহ হামাদান, আরদাবীল, তাবরীয ও কুনজাহ সহ বহু দেশ ও জনপদে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তারাদখলীকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে, ধন সম্পদ লুট করে এবং বাচ্চাদেরকে বন্দী করে নেয়। ধাপে ধাপে তারা বাগদাদ নগরীর কাছাকাছি এসে পৌঁছে। এতে খলীফা বিচলিত হয়ে পড়েন, বাগদাদের নিরাপত্তা জোরদার করেন এবং সেনাবাহিনীকে কাজে নিয়োজিত করেন। জনসাধারণ ওই দুর্বৃত্তদের আক্রমণ থেকে আশ্রয় কামনা করে নামায-কালাম, ওযীফা-দরূদ ও দুআ মুনাজাতে লিপ্ত হয়। এই হিজরী সনে তারা কুর্জ ও লান সম্প্রদায়কে পদানত করে। এরপর কাবজাকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে। এভাবে তারা রুশীয়দেরকেও পরাজিত করে। তারা যথাসাধ্য ধনরত্ন লুণ্ঠন করে, সক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে।

এই হিজরী সনে সুলতান মুআয্যাম তাঁর ভাই আশরাফের নিকট গমন করেন এবং তাঁকে তাঁদের ভাই আল কামিলের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার অনুরোধ করেন। ইতিপূর্বে আল কামিলের প্রতি তাঁর মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। মুআয্যামের আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তব্যে ওই ক্ষোভ বিদূরিত হয়। এবার দুজনে ফ্রাংকদের আক্রমণ থেকে মিশরীয় অঞ্চল রক্ষার জন্যে আল কামিলকে সাহায্য করার জন্যে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ফ্রাংকগণ দিমিয়াতের প্রবেশ পথ দখল করে নিয়েছিল এবং সেখানে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ৬১৪ হিজরী থেকে তারা সেখানে নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার কাজে নিয়োজিত হয়। মাঝে মাঝে তারা বায়তুল মুকাদ্দাসসহ সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর দখল করা সকল এলাকা তাদেরকে ফেরত দানের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। দিমিয়াতের দখল ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবও তারা দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি এবং সামান্য স্থানও ওদেরকে ছেড়ে দেয়নি। আল্লাহ্র ফায়সালা এক পর্যায়ে

তারা খাদ্য সংকটে পড়ল। তাদের জন্য খাদ্য বোঝাই জাহাজ এল। সমুদ্রের ঢেউ তা ডুবিয়ে দিল। দিমিয়াতের চারিদিকে সমুদ্রের পানি উপচে উঠল। তারা আর চলাফেরা ও জীবন যাত্রার সুযোগ পাচ্ছিল না অন্যদিকে মুসলিমগণ তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখল। তাদের জীবন যাত্রা চরম সংকটে পড়ল। তখন তারা বিনা শর্তে চুক্তি সম্পাদনে রাজী হল, ওদের নেতা এগিয়ে এল সুলতান আল কামিলের নিকট, তাঁর দুই ভাই মুআযযাম ঈসা ও আশরাফ মূসা তাঁর পাশে ছিলেন। তাঁরা দুজনে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। সে দিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। অবশেষে সুলতান আল কামিল যেমন চেয়েছিলেন তেমনভাবে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ফ্রাংক রাজন্যবর্গ ও সকল সৈন্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। মুমিন, কাফির, পূণ্যবান এবং পাপী সকলে মিলে এই চুক্তি সম্পাদন করল। এ প্রসংগে কবি রাজিহ হুল্লী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন :

هَنِيْئًا فَاِنَّ السَّعْدَ رَاحَ نَخَلَّدًا * وَقَدْ اَتجز الرَّحْمٰنُ بِالنَّصْرِ مَوْعِدًا۔

সুস্বাগতম সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয়েছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন।

حَبَانَا اِلٰهُ الْخَلْقِ فَتْحًا بِاَنَّ لَنَا * مُبِيْنًا وَاِنْعَامًا وَعِزًّا مُؤَيَّدًا۔

জগৎ স্রষ্টা আমাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন, পুরস্কার ও ইজ্জত দান করেছেন।

تَهَلَّلَ وَجْهُ الدَّهْرِ بَعْدَ قُطُوْبِهٖ * وَاَصْبَحَ وَجْهُ الشِّرْكِ بِالظُّلْمِ اَسْوَدَا۔

অন্ধকারাচ্ছন্ন হবার পর যুগের চেহারা উজ্জ্বল হল। আর শিরকবাদের চেহারা কালো ও কালিমাময় হয়েছে।

وَلَمَّا طَغَى الْبَحْرُ الْخِضَمَ بِاَهْلِهٖ الطُّغَاةِ * وَاَضْحٰى بِالْمَرَاكِبِ مَزْبَدًا۔

সমুদ্র যখন শত্রু পক্ষকে লক্ষ্য করে ফুঁসে উঠল।

اَقَامَ لِهٰذَا الدِّيْنِ مَنْ سَلُ عَزْمُهٗ * صَقِيْلًا كَمَا سَلَّ الْحُسَامُ مُجَرَّدًا۔

তখন এই দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সেই মহান সত্বা সিদ্ধান্ত নিলেন যাঁর সিদ্ধান্ত অনড় ও অটল।

فَلَمْ ينج اِلَّا كُلُّ شلْوٍ مُجَدَّلٍ * ثَوٰى مِنْهُمْ اَوْ مَنْ تَرَاهُ مُقَيَّدًا۔

তাদের ছিন্ন ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাড়া কিংবা যারা বন্দী হয়েছে তারা ছাড়া কেউই ওই গযব থেকে রক্ষা পায়নি।

وَنَادٰى لِسَانُ الْكَوْنِ فِى الْاَرْضِ رَافِعًا * عَقِيْرَتَهٗ فِى الْخَافِقَيْنِ وَمُنْشِدًا۔

জগৎ জিহ্বা তখন পৃথিবীতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ঘোষণা দিল আর গেয়ে উঠল।

اَعِبَادُ عِيْسٰى اِنَّ عِيْسٰى وَحَزْبُهٗ * وَمُوْسٰى جَمِيْعًا يَخْدِمُوْنَ مُحَمَّدًا۔

ওহে খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ)-এর দাসগণ! ঈসা (আ) এবং তাঁর অনুসারিগণ, মূসা (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর সেবায় রত থাকবে।

আবূ শামা বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, কবিতায় কবি ঈসা বলে মুআয্‌যাম ঈসাকে, মূসা বলে আল আশরাফ মূসাকে এবং মুহাম্মদ বলে আল কামিল মুহাম্মদকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন এটা একটা সুন্দর মিল বটে।

চুক্তি সম্পাদনের এই দিনটি ছিল এই হিজরী সনের ১৯ রজব বুধবার। অবশেষে ফ্রাংকগণ আক্কা ও অন্যান্য স্থানে চলে যায়। মুআয্‌যাম ফিরে যান সিরিয়ায়। আশরাফ এবং কামিল তাঁদের ভাই মুআযযামের সাথে আপোষ রক্ষা করলেন। এই হিজরী সনে সুলতান মুআয্‌যাম দামেস্কের বিচারক পদে কামালুদ্দীন মিশরীকে নিয়োগ দেন। তিনি ইতিপূর্বে দামেস্কের বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রতি জুম'আ বারে জুমার পূর্বে প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর তিনি আল আদিলিয়্যাতে বসতেন। সকল কেন্দ্র থেকে লোকজন তাঁর নিকট উপস্থিত হত। ফলে অল্প সময়ে সকলের কিতাবপত্র তিনি গুছিয়ে দিতে পারতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে কল্যাণময় প্রতিফল দান করুন।

৬১৮ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সাহিত্যিক ইয়াকূত মুসেলী : তিনি হলেন আমিনুদ্দীন। ইব্‌নুল বাওয়াবের পদ্ধতি অনুসরণকারী হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। ইব্‌নুল আছীর বলেন তাঁর যুগে তাঁর সম কেউ ছিল না। একাধিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর প্রশংসায় সকলে একমত ছিল। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। কবি নাজীবুদ্দীন হুসায়ন ইব্‌ন আলী আল ওয়াসেতী তাঁর প্রশংসায় বলেছেন :

جَامِعُ شَارِدِ الْعُلُوْمِ وَلَوْلَا * لَكَانَتْ أُمُّ الْفَضَائِلِ ثَكلى۔

তিনি ছিলেন বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলনস্থল ও একত্রিত কারী। তিনি না হলে গুণ ও মর্যাদার মূল জ্ঞান রাজ্য বিলীন হয়ে যেত।

ذُوْ يُرَاعٍ تَخَافُ إِيْقَتَهُ الأسد * وَتَعْنُوْلَه الْكَتَائِبُ ذُلًّا۔

তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। সিংহ তাঁর হুহুকে ভয় করে। আর সকল সশস্ত্র সৈন্য আনুগত্যে তাঁর প্রতি অবনত মস্তক হয়।

وَاِذَا اَفْتَرَ ثُغْرُهُ عَنْ بِيَاضٍ * فِىْ سَوَادٍ فَالسُّمْرُ وَالْبِيْضُ خَجَلًا۔

তাঁর লাবণ্যময় দুই ঠোঁটের ফাঁকে যখন সাদা দাঁত সমূহ দৃশ্যমান হয় তখন খাকী রং ও শ্বেত রং লজ্জাবোধ করে।

اَنْتَ بَدْرٌ وَالْكَاتِبُ ابْنُ هِلَالٍ * كَاَبِيْهِ لَا فَخْرَ فِيْمَنْ تَوَلَّى۔

আপনি পূর্ণিমার চাঁদ। আর সাহিত্যিক ইব্‌ন হেলাল তার পিতার মতই। সুতরাং তিনি যাকে রেখে গিয়েছেন তার জন্যে গৌরবের কিছু নেই।

اِنْ يَكُنْ اَوْلَى فَاِنَّكَ بِالتَّفْضِيْلِ * اَوْلَى فَقَدْ سَبَقْتَ وَصَلَّى۔

সে যদি রক্ত সম্পর্কে নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় তবে আপনি সম্মান ও মর্যাদায় নৈকট্যপ্রাপ্ত। আপনি এগিয়ে গিয়েছেন আর সে অন্ধকারে ঢুকে গিয়েছে।

জালালুদ্দীন আল হাসান : তিনি ইসমাঈলিয়া নেতা হাসান ইব্‌ন সাব্বাহের বংশধর। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছে তিনি তাঁদের অন্যতম। শরীয়তী সাবধান বাণী ও সতর্কীকরণের উল্লেখ করে তিনি শরীয়তের সীমারেখা অক্ষুণ্ণ রাখা, নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন এবং বিধি বিধান কার্যকরকরণে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

শায়খ সালিহ : ৬১৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন শায়খ সালিহ। তিনি হলেন শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন রাজিহ আল মুকাদ্দেসী আল হাম্বলী, তিনি খুব ভাল ইবাদতকারী এবং পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। আল মুযাফফকারী জামে মসজিদে খুতবার মিম্বরের নীচে বসে তিনি জুমাবারে জনগণকে হাদীস পাঠ করে শোনাতেন। তিনি নিজে বহু হাদীস শিক্ষা করেন, হাদীস শিক্ষার জন্যে তিনি বিভিন্ন স্থান ও দেশ সফর করেন। মাত্র ৫০ রাতে তিনি মাকামাতে হারিরী গ্রন্থটি মুখস্থ করে ফেলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্বভাবগতভাবে খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

খতীব মুওয়াফ্‌ফিকুদ্দীন : তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ্ উমার ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন উমার উব্‌ন কামিল আল মুকাদ্দেসী। তিনি বায়তুল আবার মসজিদের খতীব ছিলেন। খতীব জামালুদ্দীন দাওলাঈ রাজকীয় বার্তা নিয়ে যখন খাওয়ারিযাম শাহের নিকট গমন করেছিলেন তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে খতীব মুওয়াফফিকুদ্দীন দামেস্কের মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মুহাদ্দিছ তাকীয়ুদ্দীন আবূ তাহের : তিনি হলেন তকীয়ুদ্দীন আবূ তাহের ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মুহসিন ইব্‌ন আনমাতী। তিনি হাদীস অধ্যয়নের নিমিত্তে বিভিন্ন দেশে গমন করেন এবং হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি হাফিয-ই-হাদীস ছিলেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল সুন্দর ঝকঝকে। শায়খ তকীয়ুদ্দীন ইব্‌ন সালাহ তাঁর খুবই প্রশংসা করতেন। সুলতান মুহসিন ইব্‌ন সালাহুদ্দীনের কাল্লাসাহ প্রাসাদের পশ্চিমী ঘরে তাঁর বহু কিতাব সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে সেগুলো তাঁর নিকট থেকে নিয়ে শায়খ আবদুস সামাদ ঢকাঈকে দেয়া হয়। এরপর সেগুলো তাঁর শিষ্য শাগরেদদের নিকট বিদ্যমান থাকে। শায়খ তকীয়ুদ্দীন দামেস্কে ইনতিকাল করেন। সূফিয়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দামেস্ক জামে মসজিদে শায়খ মুওয়াফফিকুদ্দীন তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। আন নাসর ফটকে অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযায় ইসামতি করেন শায়খ ফখরুদ্দীন ইব্‌ন আসাকির। আর কবরস্থানে তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন মিশরী। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

আবুল গায়ছ শুআয়ব ইব্‌ন আবূ তাহের ইব্‌ন কালীব : ইব্‌ন মুকবিল শাফিঈ। তিনি একজন বড় মাপের ফিক্‌হবিদ ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না। মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি বহু গুণে গুণান্বিত একজন সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচিত একাধিক পুস্তিকা রয়েছে। তাঁরা কবিতার একাংশ এই :

إِذَا كُنْتُمْ لِلنَّاسِ أَهْلَ سِيَاسَةٍ * فَسُوْسُوْا كِرَامَ النَّاسِ بِالْجُوْدِ وَالْبَذْلِ.

তোমরা যদি জনগণকে শাসন করতে চাও তবে মর্যাদাবান ও সম্মানিত লোকদেরকে অনুদান ও উপহার দিয়ে।

وَسُوسُوا لِئَامَ النَّاسِ بِالذِّلِّ يُصْلِحُوا * عَلَيْهِ فَإِنَّ الذِّلَّ أَصْلَحُ لِلنَّذَلِ۔

আর ছোট লোকদেরকে শাসন করবে গালমন্দ ও অপমান করে, কারণ ছোট লোকদেরকে সংশোধনের কার্যকর উপায় হল লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা।

আবুল ইয্য শরফ ইব্ন আলী : ইব্ন আবূ জাফর ইব্ন কামিল খালিসী শাফিঈ। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন, কিরআত শিক্ষা দানে ছিলেন পারদর্শী। ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপক দখল ছিল। নিযামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন। হাসান ইব্ন আমর হালাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন।

تَمَثَّلْتُمْ لِي وَالدِّيَارُ بَعِيدَةٌ * فَخُيِّلَ لِي أَنَّ الْفُؤَادَ لَكُمْ مَغْنَى۔

তোমাদের বাসস্থান তো আমার নিকট থেকে অনেক দূরে। তবুও তোমাদের ছবি আমার অন্তরে ভেসে উঠে।

وَنَاجَاكُمْ قَلْبِيْ عَلَى الْبُعْدِ بَيْنَنَا * فَأَوْحَشْتُمْ لَفْظًا وَأَنْتُمْ مَعْنًى۔

আমাদের মাঝে বিশাল দুরত্ব থাকা সত্ত্বেও আমার হৃদয় তোমাদের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় মগ্ন থাকে। সুতরাং দৈহিক ও বাহ্যিকভাবে তোমরা দূরে আছ বটে কিন্তু মনের দিক থেকে তোমরা নিকটেই রয়েছে।

আবূ সুলায়মান দাউদ ইব্ন ইব্রাহীম : ইব্ন মিনদার আল জাবালী। নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কদের একজন ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

أَيَا جَامِعًا أَمْسِكْ عِنَانَكَ مُقْصِرًا * فَإِنَّ مَطَايَا الدَّهْرِ تَكْبُوْ وَتَقْصُرُ۔

ওহে একত্রিতকারী! তোমার বাহনের লাগাম অল্প পথে টেনে ধর। কারণ, যুগ-দবাহন হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং সংক্ষিপ্ত হয়।

سَتَقْرَعُ سِنًّا أَوْتَعُضُّ نَدَامَةً * إِذَا خَانَ الزَّمَانُ وَأَقْصَرَ۔

অবিলম্বে তুমি দাঁতে দাঁত কামড়াবে কিংবা লজ্জায় হাত কামড়াবে, যখন যুগ তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তোমার জন্যে ছোট হয়ে যাবে।

وَيَلْقَاكَ رُشْوُ بَعْدَ غَيْكَ وَاعِظٌ * وَلٰكِنَّهُ يَلْقَاكَ وَالْأَمْرُ مُدْبِرٌ۔

তোমার ভ্রান্তির পর উপদেশদাতা রূপে তোমার নিকট হিদায়াত আসবে। কিন্তু তখন কাজের সময় পার হয়ে যাবে।

আবুল মুযাফফর আবদুল ওয়াদূদ : তিনি হলেন আবুল মুযাফফর আবদুল ওয়াদূদ ইব্ন মাহমূদ ইব্ন মুবারক ইব্ন আলী ইব্ন মুবারক ইব্ন হাসান আল ওয়াসিতী। তাঁর জন্ম এবং বসবাস বাগদাদে। তাঁর উপাধি কামালুদ্দীন। তাঁর পিতা আল মাজীদ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নিকট তিনি ফিক্হ ও কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল আযাজ ফটকে পিতার মাদরাসায় তিনি পড়াশোনা করেন। খলীফা আন নাসির তাঁকে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। দীনদারী ও বিশ্বস্ততায় তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। বড় বড় পদে তিনি দায়িত্ব পালন

করেছিলেন। একাধিকবার হজ্জ আদায় করেছেন। তিনি একজন সৎ চরিত্রবান ও বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন :

وَمَا تَرَكْتُ سِتَّ وَّسِتُّوْنَ حَجَّةً * لَنَا حَجَّةٌ اَنْ تَرْكَبَ اللَّهْوَ مَرْكَبًا۔

আমি ৬৬ বার হজ্জ ত্যাগ করেছি আমাদের হজ্জ হল ক্রীড়া কৌতুক ও বাজে কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সেগুলো বর্জন করা, তিনি এও আবৃতি করতেন :

اَلْعِلْمُ يَأْتِيْ كُلَّ ذِيْ خَفَضٍ * وَيَأْبَى عَلَى كُلِّ آبٍ۔

ইলম ও জ্ঞান আসে বিনয়ী ব্যক্তির নিকট সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, অহংকারীর নিকট জ্ঞানের আগমন হয় না।

كَالْمَاءِ يَنْزِلُهُ فِي الْوَهَا * وَلَيْسَ يَصْعَدُ فِي الرَّوَابِيْ۔

পানির মত, পানি নীচের দিকেই নামে। উপরের দিকে উঠে না।

৬১৯ হিজরী সন (১২২৩ খ্রি.)

এই হিজরী সনে সুলতান আদিলের মৃতদেহ যুক্ত সিলুক দূর্গ থেকে বড় আদিলিয়্যাহ সমাধিতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে প্রথমে উমাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সেখান থেকে উক্ত সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। মাদরাসার নির্মাণ কাজ তখনো সমাপ্ত হয়নি। অবশ্য এই বৎসরের মধ্যে তা সমাপ্ত হয়। কাযী জামালুদ্দীন মিশরী পাঠদান উদ্বোধন করেন। সুলতান মুআয্‌যাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ও সভাপতিত্ব করেন। তাঁর বাম পার্শ্বে হানাফী শায়খ সদরুদ্দীন আল হাসিরী অনুষ্ঠানে সুলতানের ইমাম শায়খ তকীয়ুদ্দীন ইব্‌নুন সিলাহ এবং শায়খ সাইফুদ্দীন আমিদী উপস্থিত ছিলেন। আল আমিদী বসেছিলেন পাঠদানকারী কাযী জামালুদ্দীনের পাশে। তাঁর পাশে শামসুদ্দীন ইব্‌ন সিনা আল দৌলাহ, তাঁর পাশে সামরিক ট্রাইনুন্যালের বিচারক নাজম খলীল, হাসিরীর নিম্নের সারিতে শামসুদ্দীন ইব্‌ন শরীরাযী, তাঁর নীচে মুহিউদ্দীন তুর্কী। সেখানে আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ফখরুদ্দীন ইব্‌ন আসাকির ও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই হিজরী সনে সুলতান মুআয্‌যাম দামেস্কের মহা হিসাব রক্ষক সদর কাশহুনীকে জালালুদ্দীন ইব্‌ন খাওয়ারিযাম শাহের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাঁর দুই ভাই আল কামিল ও আল আশরাফের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে। জালালুদ্দীন শাহ ওই প্রস্তাব মেনে নেয়। বার্তাবাহক আল সদর ফিরে আসার পর সুলতান খুশি হয়ে তাঁকে শায়খগণের শায়খ হবার পদটি প্রদান করেন। এই হিজরী সনে ইয়ামানের শাসনকর্তা সম্রাট মাসউদ ইব্‌ন ইকসীস ইব্‌ন কামিল হজ্জ সম্পাদনে গমন করেন। কিন্তু হারাম শরীফের মর্যাদা হানিকার কতক অপকর্ম তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়। তিনি সেখানে নেশা পান করেন এবং যমযম কূপের সর্বোচ্চ গম্বুজ থেকে বন্দুকের গুলিতে মসজিদে হারামের হাম্মামখানা ছিদ্র করে দেন। প্রশাসক ভবনে তিনি যখন ঘুমাতেন তখন তাওয়াফ কারিগণ তরবারির মাথা দিয়ে সাঙ্গ করার স্থানে একতালে শব্দ করত যাতে তাদের পদধ্বনি কিংবা অন্য কোনো শব্দে তাঁর ঘুমের ব্যাখ্যা সৃষ্টি না হয়। এই হল নেশাখোরের

ঘুম। মহান আল্লাহ্ তার চেহারা বিশ্রী করে দিন। অবশ্য এতদসত্ত্বেও সে একজন আত্মবিশ্বাসী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শাসন ছিল। তার দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল। তবে আরাকাহ দিবসে সে তার পিতার পতাকাটি খলীফার পতাকার উপরে তুলতে চেয়েছিল যাতে সেখানে চরম বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। অনেক চেষ্টা তদবীরের পর পাহাড়ে পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব হয়েছিল দিনের শেষ ভাগে।

এই হিজরী সনে ঘিরিয়াতে পঙ্গ পালের দুর্যোগ নেমে এসেছিল। তারা ফল, ফসল ও বৃক্ষরাজি খেয়ে সাবাড় করে ফেলে। এই হিজরী সনে কাবজাক ও কুর্জ সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই হিজরী সনে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুলান বাগদাদের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। মন্ত্রী ভবনে মুআইয়াদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কায়মাক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে রাজকীয় উপহার পরিধান করেন। তাদের উপস্থিতিতে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। কবি ইব্‌ন সাঈ শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

৬১৯ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবদুল কাদির ইব্‌ন দাঊদ : তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ আল ওয়াসেতী শাফেঈ। তাঁর উপাধি ছিল আল মুহিব্‌ব। তিনি একজন অভিজ্ঞ ফিক্‌হবিদ ছিলেন। বহুদিন তিনি নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি একজন গুণী, নেককার ও দীনদার মানুষ ছিলেন। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

اَلْفَرْقَدَانِ كِلَاهُمَا شَهِدَا لَهُ * وَالْبَدْرُ لَيْلَةَ تمه بسهاده۔

দুই শুকতারা তাঁর মর্যাদা ও স্থানের সাক্ষ্য দেয় আর রাতের বেলা চন্দ্র পূর্ণিমার চাঁদ সজাগ থেকে ওই সাক্ষ্য পূর্ণ করে।

دَنِفٌ إِذَا اغْتُبِقَ الظَّلَامُ تَضَرَّمَتْ * نَارُ الْجَوٰى فِي صَدْرِهٖ وَفُؤَادِهٖ۔

তিনি হাড্ডিসার দুর্বল হয়ে পড়েছেন, রাত যখন গভীর হয় তখন বিপরীতির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে উঠে তাঁর বক্ষে ও হৃদয়ে।

فَجَرَتْ مَدَامِعُ جُفْنِهٖ فِيْ خَدِّهٖ * مِثْلَ الْمَسِيْلِ يَسِيْلُ مِنْ اَطْوَارِهٖ۔

অতঃপর প্রেম বিরহে-বিরহ বেদনায় নীরবে তার অশ্রু ঝরতে থাকে গালি বেয়ে। যেমন বন্যার পানি প্রবাহিত হয় চারিদিক প্লাবিত করে।

شَوْقًا اِلٰى مَضْنِيْهِ لَمْ اَرَا هٰكَذَا * مُشْتَاقٍ مَضٰى جِسْمُهٗ بِبِعَادِهٖ۔

সে অশ্রু ঝরাতে থাকে দুচোখ থেকে তার প্রেমিকের মিলন কামনায়। আমি এমন প্রেমিক দেখিনি প্রেমিম্পদের বিরহে যে তার নিজের দেহ ও শরীর ধ্বংস করে দেয়।

لَيْتَ الَّذِيْ اَضْنَاهُ سَحْرُ جُفُوْنِهٖ * قَبْلَ الْمَمَاتِ يَكُوْنُ مِنْ عَوَادِهٖ۔

হায়! যার বিরহ বেদনায় বিনিদ্র রজনী যাপনে তার এই মরণ দশা, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি অন্তত একবার এসে সে তাকে দেখে যেত!

আবূ তালিব ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আলী : আল ইয়াকূভী। শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ। বাগদাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন তিনি। সুদর্শন ও আকর্ষণীয় চেহারা ছিল তাঁর।

সরকারী ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন তিনি। জনৈক সম্মানী ব্যক্তির অভিনন্দনে তিনি রচনা করেন :

لَحَمْلُ تِهَامَ وَجِبَالُ أُحُدٍ * وَمَاءُ الْبَحْرِ يُنْقَلُ بِالزَّبِيلِ۔
وَنَقْلُ الصَّخْرِ فَوْقَ الظَّهْرِ عَرَبًا * لَأَهْوَنُ مِنْ مُجَالَسَةِ الثَّقِيلِ۔

তিহামাহ পর্বত ও উহুদ পাহাড়সমূহ বহন করা, চালুনি দিয়ে সমুদ্রের পানি স্থানান্তর করা, এবং পিঠের উপর পাথর তুলে নেয়া জ্ঞানী-গুণী ও সম্মানী ব্যক্তিদের মজলিসে বসার চাইতে সহজ।

তিনি আরো বলেছেন :

وَإِذَا مَضَى لِلْمَرْءِ مِنْ أَعْوَامِهِ * خَمْسُونَ وَهُوَ إِلَى التُّقَى لَا يَجْنَحُ۔

মানুষের বয়স ৫০ বছর হবার পরও যদি সে তাকওয়া ও পরহেযগারীর দিকে ধাবিত না হয়।

عَكَفَتْ عَلَيْهِ الْمَخْزِيَاتُ فَقَوْلُهَا * حَالِفْتَنَا فَأَقِمْ كَذَا لَا تَبْرَحِ۔

তখন সকল প্রকারের লাঞ্চনা ও বেইজ্জতী তাকে অকটোপাশের মত জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে তুমি তো আমাদের মিত্র, তুমি এভাবেই অবিচল থাক এসব থেকে পৃথক হয়ো না।

وَإِذَا رَأَى الشَّيْطٰنُ غُرَّةَ وَجْهِهِ * حَيَّا وَقَالَ فَدَيْتُ مَنْ لَا يُفْلِحُ۔

শয়তান যখন পাপাচারিতায় তার মুখমণ্ডলের ঔজ্জল্য দেখতে পায় তখন সে বলতে থাকে আমি তো সেই ব্যক্তির জন্যে উৎসর্গিত যার জীবনে আর সাফল্য নেই।

একদিন এক ঘটনা ঘটল যে, কেউ তাঁর নিকট কিছু অর্থকড়ি চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা দিতে সমর্থ হননি। দুঃখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। ঘুমের জন্যে সামান্য আফিম ব্যবহার করেন। সেদিনই তাঁর ইনতিকাল হয়। আল ওয়ারদিয়্যাহ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

কুতুবুদ্দীন আল আদিল : আল ফাইয়ূমে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি কায়রোতে স্থানান্তরিত হন।

শায়খ নাসরুদ্দীন আবুল ফারজ : তিনি ছিলেন মক্কা মুকাররমায় হাম্বলী মাযহাবের ইমাম, ইব্নুল হাসরী নামে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি মক্কা মুকাররমায় বসবাস করেন। এ সময়ে তিনি মক্কা ছেড়ে কোথায় যাননি। এরপর তাঁর মৃত্যু তাঁকে ইয়ামানে টেনে নিয়ে যায়। এই হিজরী সনে ইয়ামানেরই তাঁর মৃত্যু হয়। বহু মাশায়েখ থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন।

এই হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে দামেস্কে ইনতিকাল করেন শিহাব আবদুল করীম ইব্ন নাজম আল-নীলী। তিনি বাহা এবং আন নাসিহ-এর ভাই ছিলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ ফিক্হবিদ এবং বিচারিক বিষয়ে দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মন্ত্রী মসজিদকে শায়খ আলামুদ্দীন সাখাভীর দখল দারিত্ব থেকে মুক্ত করেন।

৬২০ হিজরী সন (১২২৪ খ্রি.)

এই হিজরী সনে সুলতান আল আশরাফ মূসা ইব্ন কামিল তাঁর ভাই মিশর-অধিপতি আল কামিলের নিকট থেকে ফিরে আসেন। তাঁর ভাই মুআয্যাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু তিনি

ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেন যে, কামিল এবং আশরাফ দুজনে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে একমত হয়েছে। ফলে আশরাফ মাত্র একরাত দামেস্কে অবস্থান করে শেষ রাতে সকলের অজ্ঞাতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। তিনি নিজ শাসন অঞ্চলে ফিরে আসেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর ভাই শিহাব গাযী যাকে তিনি খিলাত ও মিয়া কারিকায়নের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁকে সুলতান আল আশরাফের বিরুদ্ধাচরণে প্রস্তুত করে রেখেছে। আল আশরাফ তাকে ওই কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠান। সে নির্দেশ মেনে নেয়নি। ফলে, আল আশরাফ তার মুকাবিলা করার জন্যে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই হিজরী সনে ইয়ামানের শাসনকর্তা সুলতান ইকসীস মাসঊদ ইব্ন কামিল ইয়ামান থেকে মক্কা শরীফে গমন করেন। ইব্ন কাতাদাহ মক্কা ভূমিতে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে তাঁর গতিরোধ করে। ইকসীস যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন এবং মক্কা শরীফ থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ইয়ামানের সাথে মক্কা শরীফের শাসন ক্ষমতাও যোগ করেন। এই হিজরী সনে আরো ভয়াবহ কতক ঘটনাও সংঘটিত হয়। হাসান ইব্ন কাতাদাহ যে তার পিতা চাচা ও ভাইকে হত্যা করেছিল সে মক্কা শরীফ থেকে বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যাযাবর জীবন যাপন করতে লাগল।

৬২০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

মুওয়াফ্‌ফিকুদ্দীন : তিনি হলেন শায়খ ইমাম মুওয়াফফিকুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কুদামাহ ইব্ন মিকদাম ইব্ন নাসর। তাঁর উপাধি ছিল শায়খুল ইসলাম। "আল মুগনী ফিল মাযহাব" গ্রন্থটি তাঁর রচনা। তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ আল মুকাদ্দেসী। তিনি একজন জ্ঞান সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে এমনকি তাঁর দীর্ঘদিন পূর্বে ও তার চেয়ে অধিক বিচক্ষণ কোনো আলিম পাওয়া যায়নি। ৫৪১ হিজরী সনের শাবান মাসে জামাঈল নামকস্থানে তাঁর জন্ম হয়। ৫৫১ হিজরী সনে তিনি স্ব-পরিবার তিনি দামেস্কে এসে পৌছেন। তিনি এখানে কুরআন মজীদ পাঠে দক্ষতা অর্জন এবং গভীর মনোযোগের সাথে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রথমবার তাঁর চাচাত ভাই হাফিয আবদুল গণির সাথে ৫৬১ হিজরী সনে এবং দ্বিতীয়বার ৫৬৭ হিজরী সনে তিনি বাগদাদ আগমন করেছিলেন। ৫৭৩ হিজরী সনে তিনি হজ্জ-ই বায়তুল্লাহ আদায় করেন। বাগদাদে ইমাম আহমদের (র) মাযহাব বিষয়ে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি একাধারে দুনিয়া বিমুখ, পরহেযগার, বিনয়ী, দানশীল, চরিত্রবান, কুরআন তিলাওয়াতকারী, অধিকহারে রোযা পালনকারী, অতিরিক্ত নামায আদায়কারী ও ইবাদতী বান্দা ছিলেন। সরল পথ এবং পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের পদাংকানুসারী ছিলেন তিনি। তিনি ফাতাওয়া দিতেন এবং বিতর্কে অংশ নিতেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। তিনি কাশ্‌ফ বা দিব্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেছিলেন বুদ্ধিমান ও সচেতন 'আলিমগণ যদি আল্লাহ্‌র বন্ধু বা ওলী না হয় তবে আল্লাহ্‌র কোন ওলী বা বন্ধু থাকতে পারে বলে আমি বুঝি না। তিনি নিজে এবং শায়খ ইমাদ হাম্বলী মেহরাবে নামাযের ইমামতি করতেন। শায়খ ইমাদের মৃত্যুর পর তিনি একাই ওই পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে হাফিয আবদুল গণির দৌহিত্র আবূ সুলায়মান ইব্ন হাফিয

আবদুর রহমান নামায আদায় করতেন। মাগরিব এবং ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মেহরাবের কাছাকাছি থেকে নফল আদায় করতেন। ইশা নামায শেষে তিনি তাঁর বাসস্থান দাওলাঈ মহল্লায় চলে যেতেন। সাধ্যমত ফকীর মিসকীন সাথে নিয়ে যেতেন এবং রাতে তাদেরকে নিয়ে খাবার খেতেন। তাঁর মুল বাসভবন ছিল কাসিয়ূনে। কোনো কোনো রাতে তিনি ইশা নামাযের পর পাহাড়ে চলে যেতেন। এক রাতে দেখা গেল যে, এক লোক তাঁর পাগড়ি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাঁর পাগড়ি বালু মিশ্রিত এক টুকরো কাগজ ছিল। শায়খ তখন ছিনতাইকারীকে বললেন, বাপু, কাগজটি তুমি নিয়ে যাও আর পাগড়িটি ফেলে যাও। লোকটি মনে করল যে, কাগজটি নিশ্চয়ই ব্যাংক-চেক ও টিকেট জাতীয় কিছু, ফলে সে কাগজের টুকরোটি নিয়ে যায় এবং পাগড়িটি ফেলে যায়। এই ঘটনা তাঁর তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে। এই বুদ্ধির জোরে তিনি তাঁর পাগড়িটি ফিরে পান। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে। মুখতাসারুল খারকীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১০ খণ্ডে, দুই খণ্ডে সমাপ্ত আশশাফী, আল মুকান্না 'লিল হিফ্য, আর রাওযাহ ফী উসুলিল ফিক্হ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই হিজরী সনের ঈদুল ফিতরের দিবসে তাঁর ইনতিকাল হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। সেদিন ছিল শনিবার। তাঁর জানাযায় বহু লোক শরীক হয়েছিল, তাঁর প্রসিদ্ধ সমাধিতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর সম্পর্কে অনেকে অনেক শুভ স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁরা ছেলে মেয়ে উভয় প্রকার সন্তান ছিল। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই ওদের প্রায় সকলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি শুধু ঈসা ও লাদেন নামে দুটো পুত্র সন্তান রেখে যান। অল্পদিনের মধ্যে তাদের দুজনেরও মৃত্যু হয়। ফলে তাঁরা বংশধারা বন্ধ হয়ে যায়। আবুল মুযাফ্ফর সাবাত ইব্নুল জাওযী বলেছেন শায়খ মুওয়াফ্ফিকের লিখনী থেকে আমি এটুকু উদ্ধৃত করেছি :

لَا تَجْلِسْ بِبَابِ مَنْ * يَأْبَى عَلَيْكَ وُصُوْلَ دَارِهٖ۔

তুমি সে ব্যক্তির গৃহের দরজায় বসো না যে তোমাকে তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

وَتَقُوْلُ حَاجَاتِيْ اِلَيْهِ * يَعُوْقُهَا اِنْ لَمْ اُدَارِهٖ۔

সে ব্যক্তির নিকট তোমার প্রয়োজনের কথা পেশ করো না যে এটি প্রত্যাখ্যান করবে,

وَاتْرُكْهُ وَاقْصِدْ رَبَّهَا * تُقْضٰى وَرَبُّ الدَّارِ كَارِهٌ۔

এমতাবস্থায় তুমি ওই গৃহের মালিককে রেখে দাও বর্জন কর আর তোমার প্রয়োজনের কথা সেই স্বত্বার সমীপে পেশ কর যিনি প্রয়োজন পূরণের মালিক নিশ্চয় তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে অথচ ওই গৃহের মালিক তা অপছন্দ করে।

শায়খ মুওয়াফ্ফিকুদ্দীন আরো একটি কবিতা :

اَبْعُدُ بِيَاضَ الشَّعْرِ اَعْمُرُ مَسْكَنًا * سِوَى الْقَبْرِ اِنِّيْ اِنْ فَعَلْتُ لَاَحْمَقُ۔

আমি যদি আমার চুলের শ্বেত রং বিদুরিত করি আর কবর ছাড়া অন্য কোন গৃহকে সুসজ্জিত ও আবার করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমি আহমক ও বোকা।

يُخْبِرُنِيْ شَيْبِيْ بِاَنِّيْ مَيِّتٌ * وَشِيْكًا فَيَنْعَانِيْ اِلَيَّ وَيَصْدُقُ۔

আমার চুলেও শুভ্রতা আমাকে জানিয়ে দেয় যে, আমি অবিলম্বে মৃত লাশে পরিণত হব। সে আমাকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছে, এই সংবাদ প্রদানে সে সত্যবাদী।

يَخْرِقُ عُمْرِىْ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ * فَهَلْ مُسْتَطَاعٌ وَقْعٌ مَا يَتَخَرَّقُ۔

প্রতিটি দিন এবং রাত আমার আয়ূকে ক্ষমতা বিক্ষত করছে আর ছিঁড়ে কেটে দিচ্ছে আমার আয়ূর ওই ছেঁড়াগুলো জোড়া লাগানোর শক্তি কারো আছে কি?

كَأَنِّيْ بِجِسْمِيْ فَوْقَ نَعْشِيْ مُمَدَّدًا * فَمِنْ سَاكِتٍ أَوْ مَعْوَلٍ يَتَحَرَّقُ۔

আমি যেন আমার দেহ নিয়ে আমার জানাযার খাটের উপর লম্বালম্বি পড়ে আছি। আমার শোকে কেউ নীরবে আর সরবে যন্ত্রণায়-বেদনায় পুড়ছে।

إِذَا سُئِلُوْا عَنِّيْ أَجَابُوْا وَعَوَّلُوْا * وَأَدْمُعُهُمْ تَنْهَلُّ هَذَا الْمُوَفِّقُ۔

যখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে আমার সম্পর্কে তখন তারা আহাজারী ও বেদনায় চীৎকার করে জবাব দিবে ইনি হলে আল মুওয়াফ্ফিক। তখন তাদের অশ্রু ঝরতে থাকবে অবিরত।

وَغُيِّبْتُ فِيْ صَدْعٍ مِنَ الْأَرْضِ ضَيِّقٌ * وَأُوْدِعْتُ لَحْدًا فَوْقَهُ الصَّخْرُ مُطْبَقٌ۔

আমাকে ঢুকিয়ে দেয়া হবে মাটির ফাঁকে সংকীর্ণ গোপন স্থানে, আমাকে রেখে দেয়া হবে কররে যার উপর থরে থরে পাথর চাপা দেয়া হবে।

وَيَحْثُوْا عَلَى التُّرَابِ أَوْثَقُ صَاحِبٍ * وَيُسْلِمُنِيْ لِلْقَبْرِ مَنْ هُوَ مُشْفِقُ۔

মাটির উপরে দাঁড়িয়ে তারা আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে বলবে যে, তিনি আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, আমি আমার প্রতি স্নেহময় যারা তারা আমাকে কবরের জন্যে সোপর্দ করে দিবে।

فَيَا رَبِّ كُنْ لِيْ مُؤْنِسًا وَحْشَتِيْ * فَإِنِّيْ بِمَا أَنْزَلْتَهُ لَمُصَدِّقُ۔

ওহে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার একাকীত্বের সহচর হবেন, আমি তো আপনার নাযিল করা কিতাব সত্য বলে গ্রহণ করেছি।

وَمَا ضَرَّنِيْ أَنِّيْ إِلَى اللهِ صَائِرٌ * وَمَنْ هُوَ أَبَرُّ وَأَوْفَقُ۔

আমার কোনো ক্ষতি নেই আমি যদি মহান আল্লাহ্র প্রতি ন্যস্ত হই। তিনি তো সর্বাধিক অনুগ্রহকারী ও শক্তিদাতা।

ফখরুদ্দীন ইব্ন আসাকির : তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্ন হাসান ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আসাকির আবূ মনসূর দামেস্কী। তাঁর মাতা হলেন আসমা বিনত মুহাম্মদ ইব্ন হান ইব্ন তাছির আল কুদসিয়্যাহ। আসমার পিতা আবুল বারাকাত ইব্ন মাররান নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ৫১৭ হিজরীতে আল কদম মসজিদ সংস্কার করেন। সেখানে তাঁর ও তাঁর কন্যা আসমার কবর অবস্থিত। সেখানে আরো অনেক বড় বড় আলিম-উলামাকে দাফন করা হয়েছে। আসমা হলেন কাযী মহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন যাকীর খালা। শায়খ ফখরুদ্দীন শৈশব থেকেই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর উস্তাদ শায়খ কুতুবুদ্দীন মাসউদ নিশাপুরীর নিকট পড়াশোনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর উস্তাদের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং খারুজিয়্যাতে তাঁর বাসভবনে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে তাঁর তৈরী করা দুটো হল ঘরের একটিতে তিনি বসবাস করতেন। এরপর তিনি আল কুদস আল শরীফে মাদরাসা-ই-সালাহিয়া নাসিরিয়্যাহতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। এরপর সুলতান আদিল তাঁকে সেনাবাহিনীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি

বিষয়ে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তাঁর আশেপাশে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশিষ্ট নাগরিকগণ অবস্থান করতেন। এক পর্যায়ে তিনি রাষ্ট্রীয় পদ পদবী ছেড়ে দেন এবং জামে মসজিদে মিহরাব-আল সাহাবার পাশে একটি ছোট্ট কক্ষে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তিনি নির্জন-ইবাদত, পড়াশোনা-গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন। যে দূর দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীগণ তাঁর সমীপে আগমন করত। তিনি বেশি বেশি যিকর-আযকারে মগ্ন থাকতেন। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আসরের নামাযের পর তিনি আন নসর ভবনের নীচে তাঁর চাচার স্থানে বসতেন জনগণকে হাদীস-পাঠ শোনানোর জন্যে। তিনি সেখানে দালাইলুন নুবুওয়াত ও অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ণ গ্রন্থরাজি পাঠ করতেন। দারুল হাদীস আন নূরিয়ার প্রধান অধ্যাপক হিসেবে সেখানে উপস্থিত হতেন। মানাহাদ-ই-ইব্‌ন উরওয়াতে ও তিনি হাদীসের দরস দিতেন। সুলতান আদিল তাঁর বিচারপতি কাযী ইব্‌ন যাকীকে অপসারণ করার পর শায়খ ফখরুদ্দীনকে তাঁর নিকট আমন্ত্রণ জানান। শায়খ সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর নিজের কাছাকাছি বসান। তখন ভোজের আয়োজন ছিল। এ সময়ে সুলতান তাঁকে দামেস্কের বিচারপতি পদে যোগদানের অনুরোধ করেন। শায়খ বললেন যে, তিনি ইস্তিখারা বা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালমন্দ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়ার পর জবাব দিবেন। এরপর তিনি সুলতানের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানান। সুলতান তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সংবাদ পেয়ে শায়খ বললেন, যে সুলতানের মধ্যে এমন প্রতিহিংসা বিদ্যমান তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ থেকে মহান আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছেন তাই আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। সুলতান আদিলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুআয্‌যাম যখন মদ ও অন্যান্য অশালীন বিষয়ের বৈধতা দিল তখন শায়খ ফখরুদ্দীন তার প্রতিবাদ করেন। সুলতান মুআয্‌যাম তাতে তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। ফলে সামরিক বাহিনীর শিক্ষকতার পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন। এ সময়ে হারুজিয়্যাহ মাদরাসা দারুল হাদীস নূরিয়া মাদরাসা এবং মাশহাদ ইব্‌ন উরওয়ায় অধ্যাপনায় ছাড়া তাঁর অন্য সরকারী কোন দায় দায়িত্ব ছিল না। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ৬২০ হিজরী সনের ১০ রজব বুধবার আসরের পর শায়খ ফখরুদ্দীনের ওফাত হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। উমাইয়া জামে মসজিদে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। বহু লোকের উপস্থিতিতে সেই দিনটি একটি স্মরণীয় দিবসে পরিণত হয়। সূফিয়াহ গোরস্থানে নিয়ে তাঁর শায়খ কুতুবুদ্দীন মাসউদ ইব্‌ন উরওয়াহ-এর নিকটে প্রথম সারিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন উরওয়া আল মুসেলী : ৬২০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন উরওয়া আল মুসেলী। উমাইয়া জামে মসজিদে মাশহাদ-ই-ইব্‌ন উরওয়া তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম ওই আশহাদ ও পাঠশালার উদ্বোধন করেন। ততদিন পর্যন্ত এটি মসজিদের অন্যান্য সম্পদের সাথে আবদ্ধ ছিল। তিনি ওই পাঠশালায় পানি শোধন যন্ত্র স্থাপন করে দেন। সেখানে হাদীস শিক্ষা দানের জন্যে তিনি অতিরিক্ত কিছু অর্থসম্পদ ওয়াক্‌ফ করে দেন। বিপুল সংখ্যক কিতাব ও তিনি সেখানে দান করেন। তিনি মূলত বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে বসবাস করতেন। তবে তিনি সুলতান আল মুআয্‌যামের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ফলে বায়তুল মুকাদ্দাসের দেয়াল ভেঙ্গে দেয়ার পর তিনি দামেস্কে চলে আসেন এবং আমৃত্যু সেখানে বসবাস করেন। ঈদগাহের পশ্চিমদিকে আতাবুক তাগতুগীনের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

শায়খ আবুল হাসান রোযবিহারী : আল ফারাদীস ফটকের পাশে রোযবিহার নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শায়খ আবদুর রহমান আল ইয়ামানী : পূর্বদিকের মিনারে তিনি বসবাস করতেন। তিনি একজন সৎকর্মশীল পূণ্যবান, দুনিয়াবিমুখ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। আল সুফিয়া গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

রইস ইয্যুদ্দীন মুযাফফর ইব্‌ন আসআদ : ইব্‌ন হামযা তামীমী ইব্‌ন কালানুসী। তিনি দামেস্কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন তাঁর দাদা আবূ ইয়ালা হামযা একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন ইব্‌ন আসাকিরের ইতিহাস গ্রন্থের টীকা স্বরূপ। আলোচ্য ইযযুদ্দীন হাদীস গ্রহণ করেছেন হাফিয আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির ও অন্যান্য মুহাদ্দিছের নিকট থেকে। তিনি আল কিন্দীর মজলিসে নিয়মিত বসতেন এবং তাঁর থেকে তিনি ব্যাপকহারে উপকৃত হয়েছেন।

সেনাপতি মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান : তিনি হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন কাতলুমিশ ইব্‌ন তুর্কান শাহ ইব্‌ন মনসূর সমরকন্দী। তিনি সেনাপতি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আযীয আল খলীফাতীর দরবারে নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন তিনি। লেখালেখিতে তাঁর ভাল হাত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ভাল দখল ছিল। আরবি সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি দীর্ঘায়ূ পেয়েছিলেন। রুচিশীল ও গতিময় কবিতা রচনায় ছিলেন তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাঁর কবিতার একাংশ এই :

سَئِمْتُ تكاليف هَذِهِ الْحَيَاةِ * وَكَذَا الصَّبَاحَ بِهَا وَالْمَسَاءَ.

আমি এই জীবনের দুঃখগুলো ভোগ করেছি, তেমনিভাবে সকাল ও সন্ধ্যাগুলোর দুঃখও।

وَقَدْ كُنْتُ كَالطِّفْلِ فِيْ عَقْلِهِ * قَلِيْلِ الصَّوَابِ كَثِيْرِ الْهَوَاءِ.

আমি ছিলাম নিজ বুদ্ধিনির্ভর শিশুর ন্যায়। সঠিক পথে অনগ্রসর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে অগ্রগামী।

أَنَامُ إِذَا كُنْتَ فِيْ مَجْلِسٍ * وَأَسْهَرُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْغِنَاءِ.

শিশুর মত রুচিশীল আসরে গেলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। আর গান বাজনার আসরে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতাম।

وَقَصَّرَ خُطُوِىْ قَيْدُ الْمَشِيْبِ * وَطَالَ عَلَّى مَا عَنَانِىْ عَنَاءً.

বার্ধক্যের বন্দীদশা আমার পদক্ষেপকে সংকুচিত করে দিয়েছে। আর আমার কষ্ট বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

وَغُوْدِرْتَ كَالْفَرْخِ فِيْ عُشِّهِ * وَخَلَّفْتُ حُلْمِىْ وَرَاءَ وَرَاءِ.

আমি রয়ে গেলাম পাখির বাসায় পক্ষী শাবকের ন্যায় আমার স্বপ্নগুলোকে রেখে এলাম পেছনে।

وَمَا جَرَّ ذٰلِكَ غَيْرَ الْبَقَاءِ * فَكَيْفَ بَدَا سُوْءُ فِعْلِ الْبَقَاءِ.

এগুলোতে আমার জন্যে স্থায়ীত্ব ছাড়া অন্য কিছু এনে দেয়নি, কেমন করে মন্দকাজ প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর একটি চমৎকার কবিতা এই :

اِلٰهِيْ يَا كَثِيْرَ الْعَفْوِ عَفْوًا * لِمَا اَسْلَفْتُ فِيْ زَمَنِ الشَّبَابِ۔

ওহে মা'বূদ আমার মাবূদ। প্রচুর ক্ষমাশীল আমি ক্ষমা চাচ্ছি যৌবনে যা অপকর্ম করেছি তার জন্যে।

فَقَدْ سَوَّدْتُ فِي الْاٰثَامِ وَجْهًا * ذَلِيْلًا خَاضِعًا لَكَ فِي التُّرَابِ۔

আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে আমার মুখমণ্ডলকে কালিমা লিপ্ত ও কালো করে ফেলেছি। এখন আত্মসমর্পিত হয়ে বিনয়াবনত হয়ে আপনার দরবারে নিবেদন করছি।

فَبَيِّضْهُ بِحُسْنِ الْعَفْوِ عَنِّيْ * وَسَامِحْنِيْ وَخَفِّفْ مِنْ عَذَابِيْ۔

সুতরাং সুন্দর ক্ষমার মাধ্যমে আপনি আমার মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন আমার আযাব ও শাস্তি হাল্‌কা করে দিন।

তাঁর ইনতিকালের পর নিযামিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাযা শেষে শুনিযিয়্যাহতে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করছিল, আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে তিনি বলেছেন :

تَحَاشَيْتُ اللِّقَاءَ لِسُوْءِ فِعْلِيْ ۔ وَخَوْفًا فِي الْمَعَادِ مِنَ النَّدَامَةِ۔

আমার পাপাচারিতার প্রেক্ষিতে আমি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত কে ভয় পেতাম এবং পরকালে লজ্জিত হবার আশংকায় শংকা গ্রস্থ থাকতাম।

فَلَمَّا اَنْ قَدِمْتُ عَلٰى اِلٰهِيْ * وَحَاقَقَ فِي الْحِسَابِ عَلٰى قَلَامَةٍ۔

আমি যখন আমার মাবূদের নিকট উপস্থিত হলাম এবং তিনি তাঁর কলমের মাধ্যমে হিসাব নেয়ার প্রস্তুতি নিলেন :

وَكَانَ الْعَدْلُ اِنْ اَلْصَلِّيْ جحيما * تعطف بالمكارم ولكرامة

তখন ন্যায় বিচার তো ছিল আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করা কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর দান ও দয়া প্রদর্শন করেছে।

وَنَادَانِيْ لِسَانُ الْعَفْوِ مِنْهُ * اَلَا يَا عَبْدِ يُهَنِّيْكَ السَّلَامَةُ۔

তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার জবান আমাকে ডেকে বলল ওহে আমার বান্দা শান্তি নিরাপত্তা তোমাকে অভিনন্দিত করবে।

আবূ আলী হাসান ইব্‌ন আবুল মাহাসিন : যুহরা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন যুহরা আলাভী হুমায়নী আল হালিমী, তিনি একজন মর্যাদাবান নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। আরবি সাহিত্য মানব-ইতিহাস ও সামগ্রিক ইতিহাস বিষয়ে তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। সিয়ার ও হাদীস শাস্ত্রে ও তাঁর ভাল দখল ছিল। তিনি কুরআন মজীদের হাফিয ছিলেন। তাঁর উন্নত কবিতাবলীর একাংশ এই :

لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَعْشُوْقَ وَهُوَ مِنَ * الْهِجْرِ تَنْبُوْ النَّوَاظِرُ عله۔

আমি দেখেছি প্রেমাস্পদকে দীর্ঘ বিরহ তার দিক থেকে প্রেমিকের দৃষ্টিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আসে।

اَثَرَ الدَّهْرُ فِيْهِ اَثَارَ سُوْءٍ * وَاَدَالَتْ يَدُا الْحَوَادِثِ مِنْهُ۔

যুগ পরিক্রমা তার মধ্যে নেতিবাচক চিহ্ন সৃষ্টি করে এবং তার পক্ষ থেকে নেতিবাচক ঘটনা জন্ম নেয়।

عَادَ مُسْتَذِلًّا وَمُسْتَبْدِلًا * عِزًّا بِذِلٍّ كَاَنْ لَّمْ يَصُنْهُ۔

সর্বাধিক ভালবাসার মানুষ দীর্ঘ বিরহে প্রেমিকের নিকট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিণত হয়, ইজ্জত ও সম্মানের স্থলে লাঞ্ছনার পাত্র হয়, যেন সে কখনো ওকে স্বচ্ছ রাখেনি রক্ষা করেনি।

আবূ আলী ইয়াহ্য়া ইব্ন মুবারক : ইব্ন জালাজুলী। তিনি ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। মনোযোগের সাথে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন সুপুরুষ। রাজধানীতে বসবাস করতেন। তিনি একজন উঁচু মাপের পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মানোত্তীর্ণ কবিতার একাংশ এই :

خَيرُ اِخْوَانِكَ الْمُشَارِكُ فِى الْمَرِ * وَاَيْنَ الشَّرِيْكُ فِى الْمَرَ اَيْنَا۔

লেনদেন ও কাজ কর্মে আপনার উত্তম অংশীদার ভাই হল, হায় নিঃস্বার্থ অংশীদার কোথায়?

اَلَّذِىْ اِنْ شَهِدْتَ سَرَّكَ فِى الْقَوْمِ * وَاِنْ غِبْتَ كَانَ اُذْنًا وَّعَيْنًا۔

উত্তম শরীক ও অংশীদার সে-ই আপনি উপস্থিত থাকলে যে জন আপনাকে আনন্দ দান করে আর আপনি অনুপস্থিত থাকলে সে আপনার কান ও চোখে পরিণত হয় আপনার পক্ষে আপনার ধনসম্পদ ও পরিবারের দেখাশোনা করে।

مِثْلُ الْعَقِيْقِ اِنْ مَسَّهُ النَّارُ * جَلَاهُ الْجَلَاءُ فَازْدَادَ زَيْنًا۔

আকীফ পাথরের মত আগুনের স্পর্শ পেলে সেটি ঔজ্জল্য তীব্রতর হয় সেটির সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

وَاَخُو السُّوْءِ اِنْ يَغِبْ عَنْكَ يَشْنَئْكَ * وَاِنْ يَحْتَضِرْ يَكُنْ ذَاكَ شَيْئًا۔

আর মন্দ শরীক ও মন্দ ভাই সে ব্যক্তি যে তোমার থেকে দূরে থাকলে তোমার দুর্নাম করে বেড়ায়। আর সে তোমার নিকট উপস্থিত থাকলে সে নিজেই তোমার কলংক হয়ে থাকবে।

جَيْبُهُ غَيْرُ نَاصِحٍ ومناه اَنْ * يُصِيْبَ الْخُلِيْلَ اِفْكًا وَمَيْنًا۔

তার অন্তর কল্যাণকামী নয়। সে শুধু এটাই কামনা করে যে, তার বন্ধু মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ুক।

فَاخْشَ مِنْهُ وَلَا تَلْهَفُ عَلَيْهِ * اِنْ غَرِمَا لَهُ كَنَقْدِكَ دَيْنًا۔

তুমি ওই জাতীয় শরীককে ভয় করবে অর্থাৎ তার নিকট থেকে দূরে থাকবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে তুমি তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবে না। এমনিতেই তোমার যা নগদ অর্থ রয়েছে তার সেই পরিমাণ ঋণ রয়েছে।

৬২১ হিজরী সন (১২২৫ খ্রি.)

এই হিজরী সনে চেঙ্গিস খানের একদল সৈন্য রায় প্রদেশে এসে পৌছে। এরা পূর্ববর্তী সৈন্যদলের ভিন্ন একটি দল। তারা রায়ের জনসাধারণকে হত্যা করে। এরপর তারা সভা

অঞ্চলের দিকে গমন করেন। এরপর কুম ও কামানের উদ্দেশ্যে যায়। এই দুটো প্রদেশ ইতিপূর্বে তাদের দ্বারা পদদলিত হয়নি। সেখানে ও তারা পূর্বের ন্যায় খুন-ধর্ষণ ও লুট-তরাজ চালায়। এরপর তারা হামাদানে গমন করে। সেখানে খুন খারাবি ও বন্দী করে। এরপর তারা খায়ারযাম জনগোষ্ঠির পশ্চদ্ধাবনে আযারবাইযান পর্যন্ত পৌছে। তারা ওদেরকে পরাজিত করে এবং ওদের বহু লোককে হত্যা করে। খাওয়ারিযামী জনগোষ্ঠির অবশিষ্টাংশ তাবরিজে পালিয়ে যায়। তাদেরকে ধরতে ওরা সেখানে গিয়ে পৌছে। তারা তাবরীজের শাসক পাহলোয়ানকে লিখিতভাবে জানায় যে, তুমি যদি সমঝোতা চাও তবে খাওয়ারিযামীদেরকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও নতুবা তোমার পরিণতি ও তাদের মত হবে। ফলে পাহলোয়ান বহু খাওয়ারিযামীকে হত্যা করে এবং তাদের কর্তিত মাথা তাতারদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সাথে আদরা অনেক উপহার উপঢৌকন পাঠায়। ইতিহাসের এটি একটি নির্মম অধ্যায়। এই অভিযানে তাতারদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। আর খাওয়ারিযামী ও পাহলোয়ানের সৈন্য সংখ্যা ছিল তাদের বহু বহুগুণ বেশী। কিন্তু মহান আল্লাহ্ এদের অন্তরে লাঞ্ছনা ও ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বহুগুণে বেশি সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তারা বারবার লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিঊন।

এই হিজরী সনে সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযাম শাহ পারস্য নগর সমূহের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। এটি তাঁর ইস্পাহান ও হামাদানের কর্তৃত্বের অতিরিক্ত। তিনি পূর্হে এই দুই প্রদেশের কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। এই হিজরী সনে সুলতান আল আশরাফ তাঁর ভাই শিহাবুদ্দীন গাযী থেকে খিলাফত প্রদেশের শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে নেন। ইতিপূর্বে কিন্তু তিনি তাঁকে যুবরাজ ও পরবর্তী সুলতান রূপে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং আর্মেনিয়া, মায়াকারিকায়ন, জাঙ্গ ও হুর পঠতসহ খিলাত প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে যখন তাঁর অবাধ্য হল এবং তাঁর বিরোধিতায় তার ষড়যন্ত্রের বিবরণ সম্বলিত মুআয্যামের চিঠি তাঁর নিকট পৌছল তখন সুলতানের মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি সৈন্যদল নিয়ে খিলাত পৌছলেন এবং তাতে অবরোধ সৃষ্টি করলেন। গাযী নিজে সেনাছাউনীতে ঢুকে আত্মরক্ষা করে এবং সমগ্র প্রদেশ সুলতানের হাতে সোপর্দ করে। রাতের বেলা গাযী ভুল স্বীকার করে ভাইয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন। কোনো শাস্তি দেননি। অতঃপর শুধু মায়াকারিকায়ন অঞ্চলটি তার শাসনাধীন রেখে অন্যসব প্রদেশে নিয়ে নেন। এদিকে আল আশরাফের বিরোধিতায় আরাবিলের শাসনকর্তা এবং সুলতান মুআয্যাম গাযীকে সহযোগিতা করেছিল। সুলতান আল কামিল এজন্যে ভাই মুআয্যামকে শাসিয়ে দিয়ে বলে যে, আল আশরাফের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং শাসনাধীন অঞ্চলগুলো প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। মুসেলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লুলু আল আশরাফের পক্ষে ছিল। লুলু তার একটি বড় সংখ্যক সৈন্য আল আশরাফের সহযোগিতার জন্যে খিলাত অভিযানে পাঠিয়ে দেয়। এই সুযোগে আরাবিল অধিপতি মুসেলে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং মুসেল অবরোধ করে। কিন্তু খিলাতে আল আশরাফের জিয়, এবং গাযীর আত্মসমর্পণ এবং মুআয্যামের শংকিত হয়ে পড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাওয়ায় আরাবিল-শাসনকর্তার অভিযান ব্যর্থ হয় এবং সে লজ্জিত হয়। ওদিকে দামেস্কে সুলতান মুআয্যাম ও তাঁর কৃত কর্মের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই হিজরী সুলতান আল মুআয্যাম তাঁর পুত্র নাসির দাউদকে প্রেরণ করেন সুলতান আশ আশরাফের বিরোধিতায় আরাবিল শাসনকর্তাকে সহযোগিতা করার জন্যে, তিনি একই উদ্দেশ্য শামসাতিয়্যাহ পন্থী মুলূক নামের এক সূফীকে পাঠান জালালুদ্দীন ইব্ন খাওয়ারিযাম শাহের নিকট। জালালুদ্দীন ইতিমধ্যে আযারবাইযান দখল করে নেন এবং তাঁর সামরিক শক্তি সুদৃঢ় হয়। জালালুদ্দীন তাঁকে সাহায্যও সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই হিজরী সনে সুলতান আল কামিলের পুত্র ইয়ামানের শাসনকর্তা মাসঊদ ইকসীস বিশালাকারের হাদিয়া তোহফা নিয়ে পিতার সাথে সাক্ষাতের জন্যে মিশর আগমন করে। উপহারের মধ্যে ছিল দুইশত সেবাকর্মী, তিনটি বিশাল দেহী হাতি, মূল্যবান কাঠ এবং কস্তুরী মৃগনাভ। তার পিতা এগিয়ে এসে তাকে বরণ করে নেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চাচা মুআয্যাম থেকে সিরিয়া দখল করে নেয়া। এই হিজরী সনে মিশরে দারুল হাদীস আল কামীলিয়্যাহ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। হাফিয আবুল খিতাব ইব্ন দিহয়াকে সেখানকার শায়খুল হাদীস পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বহু জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন শায়খ ছিলেন তাঁর দ্বারা মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দায় করুন।

৬২১ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ : তিনি হলেন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল কাদেসী হাম্বলী। তিনি ছিলেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তারীখ ইব্নুল জাওযী গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারের তিনি পিতা। আল্লামা আহমদ কাদেসী শায়খ আবুল ফারজ ইব্নুল জাওযীর মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। শায়খ ইব্নুল জাওযীর অসাধারণ বক্তব্যে আন্দোলিত হয়ে তিনি বলে উঠতেন হায় আল্লাহ্! এতো রসিক মানুষ, এতো রস কথকতা। একবার শায়খ ইব্নুল জাওযী তাঁর নিকট থেকে দশ দীনার ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু তা শোধ করেননি। এতে দেখা গেল আল কাদেসী দরবারে উপস্থিত হন কিন্তু কোনো কথা বলেন না। তখন শায়খ একদিন কৌতুক করে বললেন, এই যে কাদেসী তিনি আমাদেরকে ঋণও দেন না আর "এটি রস কথকতা" বলে মন্তব্যও করেন না। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে দয়া করুন। একবার আল কাদেসীকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল খলীফা আল মুসতাদী এর বাসভবনে তারাবীহের নামায পড়ানোর জন্যে। সাক্ষাতকারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনার মাযহাব কি? খলীফা নিজে এই কথোপকথন শুনছিলেন। উত্তরে কাদেসী বললেন, আমার মাযহাব হল হাম্বলী। তখন তাঁকে বলা হল যে, হাম্বলী মাযহাব হলে আপনি খলীফার বাসভবনে নামায পড়াবেন না। তখন তিনি বললেন, আমি হাম্বলী-ই, আমি আপনাদেরকে নামায পড়াব না। এক পর্যায়ে খলীফা বললেন তাঁকে রেখে দাও, তিনিই আমাদেরকে নামায পড়াবেন।

আবুল কারাম মুযাফফর ইব্ন মুরাবক : ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল বাগদাদী আল হানাফী। তিনি ইমাম আবূ হানীফার সমাধি ও অন্যান্য স্থানের শায়খ ছিলেন। পশ্চিম বাগদাদের মহা হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব ও তাঁকে দেয়া হয়েছিল। তিনি একজন গুণীজন, দীনদার ও কবি ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সুতরাং তুমি উত্তম ধৈর্য দ্বারা নিজেকে রক্ষা কর এবং অভিজাত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে লুফে নাও, তার বিনিময় ও পুরস্কার যেন তোমার হাত ছাড়া না হয় আর নিরাপদ ও সম্মানী হয়ে বেঁচে থাক, তোমার সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য যেন হয় মার্জিত এবং কঠিন বিষয়সমূহে যেন হয়ে যায় সহজ। দিনসমূহ অতীত হয়ে যাবে, যার পার্থিব সবই সামান্য ও অপসৃয়মান, আর দিনসমূহের মিষ্টতা তিক্ততা সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে। মহাকাল হলো রাতদিনের অন্তর্ধান, আর জীবনকাল হলো তার অবসান, আর বিচক্ষণতা হলো দৃঢ়সংকল্প বস্তুত তোমার সত্তার মাঝেই সুপ্ত রয়েছে সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার স্বচ্ছতা এবং সার নির্যাস। অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। কেননা, অচিরেই একদিন তার ভ্রষ্টতা ও মর্যাদা প্রকাশ পাবে।

মুহাম্মাদ ইবন্ আবুল ফারাজ ইবন্ বারাকা

শায়খ ফখরুদ্দীন আবুর মাআলী আল্মাত্তসিনী, তিনি বাগদাদে আগমন করেন এবং নিযামিয়্যা মাদরাসায় শিক্ষকতার নিযুক্ত হন। কিরাআত অর্থাৎ কুরআন পঠনের বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তার বেশ ভাল অবগতি ছিল। এছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালার উচ্চারনস্থল বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন এবং সনদসহ হাদীস রিওয়াত করেন। আর তার রয়েছে কোমল কবিতা।

আবু বকর ইবন্ হালাবা আল্মাওয়াযিনী আল্বাগদাদী জামিতির মাপজোক এবং দাঁড়িপাল্লা নির্মাণে তিনি ছিলেন অনন্য। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বস্তুত উপকরণ উদ্ভাবন করতেন। যেমন, একবার তিনি একটি দানায় সাতটি ছিদ্র করেন এবং প্রত্যেক ছিদ্রে একটি করে চুল প্রবেশ করান, আর তার সময়ের শাসকের কাছে তিনি সমাদৃত ছিলেন।

আহ্মাদ ইবন্ জা'ফর ইবন্ সাহমাদ

ইবন্ মুহাম্মাদ আবুল আব্বাস আদ্দাবীবী আওয়াগিনী, তিনি গদ্য ও পদ্য সংকলক বর্ষীয়ান গুণী সাহিত্যিক ছিলেন। এছাড়া ইতিহাস ও জীবন চরিত্র বিষয়ে তার ছিল ব্যাপক অবগতি, আর তার সংগ্রহে ছিল বহুমল্যবান গ্রন্থ। কবি আবুল আলা মাআফি এক কাসীদার ব্যাখ্যায় তার তিন খণ্ডের একটি গ্রন্থ রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনুস সায়ী তার রচিত বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন।

৬২২ হিজরী শুরু

এ বছর খাওয়ারিযমীরা যখন তাতারীদের কাছে পরাজিত হয়ে গযনী থেকে সুলতান জালালুদ্দীন ইবন্ খাওয়ারিযম শাহের সাথে যোযিসতান এবং ইরাকের আশেপাশের এলাকায় আগমন কর, তখন তারা সেখানে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তারা যে অঞ্চলের শহরসমূহ অবরোধ করে এবং গ্রামসূহের লুণ্ঠন করে এছাড়া এ বছরই খাওয়ারিযম শাহের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন আযার বাইজান এবং জর্জিয়া অঞ্চলের বেশ খানিকটা ভূখণ্ড দখল করেন। এ সময় তিনি সত্তর হাজার যোদ্ধার জর্জিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং তাদের বিশ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন। ফলে তার কর্তৃত প্রবল হয় এবং মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তিনি তিবনিসী শহর জয় করেন এবং তিরিশ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন।

ঐতিহাসিক আবু গামা জারী করেন যে সুলতান জালালুদ্দীন যুদ্ধে সত্তর হাজার জর্জিয়া যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং তিবরিসী জয়ের সময় হত্যা করেন এক লক্ষ যোদ্ধাকে। আর এ সকল যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া তিনি যখন দাকূক শহর অবরোধ করেন, তখন তার অধিবাসীকে তার উদ্দেশ্যে কটুক্তি কর ফলে তিনি এই শহর দখল করে তার অনেক বাসিন্দাকে হত্যা করেন এবং নগর প্রাচীর ধ্বংস কর দেন। এরপর তিনি বাগদাদে অবস্থানরত খলীফার বিরুদ্ধে অগ্রযাত্রার সংকল্প করেন। কেননা তার দাবী খলীফার চক্রান্তের কারণেই তার পিতা নিহত হন এবং তাতারীরা মুসলমানদের ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব লাভ করে। এই দাবীর সূত্রেই তিনি সুলতান মুআযযমকে পত্র মারফত খলীফার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান জানান এবং তাকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করেন। কিন্তু মুআযযম তা থেকে বিরত থাকেন।

এদিকে খলীফা যখন খাওয়ারিয়ম শাহের পুত্র জালালুদ্দীনে বাগদাদ অভিযানের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ফৌজ নিয়োগ করে বাগদাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। এ সময় তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রজাসাধারনের মাঝে দশ লক্ষ দীনার বণ্টন করেন।

এদিকে সুলতান জালালুদ্দীন জর্জিয়া অভিযানের জন্য সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন, শত্রুর মোকাবিলা পর্যুদস্ত হওয়ার আশঙ্কায় তারা এই মর্মে তার কাছে পত্র প্রেরণ করে, আমাদের সর্বশেষজন ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে উদ্ধার করুন, আর বাগদাদ তো হাত ছাড়া হয়ে যাবে না, তখন তিনি তাদের সাহায্যে অগ্রসর হন এবং তার পরবর্তী ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এবছর অনাবৃষ্টি ও পঙ্গপালের কারণে ইরাকে ও শামে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এর পরই ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়, ফলে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

খলীফা নাসেরের ওফাত এবং তার পুত্র যাহিরের খিলাফত লাভ

এ বছর রমযান মাসের শেষ দিন রবিবার আমীরুল মুমিনীন খলীফা নাসের লি দীনিল্লাহ ওফাতপ্রাপ্ত হন, তার পূর্ণ নাম পরিচয়। (বংশলতিকা) হলো নাসের লি দীনিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ মুসতাযী বি আমরিল্লাহ আবুল মুযাফফর যূসুফ ইবন্ মুকতাফী লি আমরিল্লাহ, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ মুসতায্হির বিল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনুর মুকতাদী বি আমরিল্লাহ, আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইবনুয্যাসীরা মুহাম্মাদ ইবনুল কাইম বি আসরিল্লাহ, আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবন্ কাদির বিল্লাহ, আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ মুওয়াফফাক্ আবু আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ আলমুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ জা'ফর ইবন্ মুর্তসিম বিল্লাহ আবু ইসহাক মুহাম্মাদ ইবন্ হারুন আর রশীদ ইবন্ শাহদী মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল্লাহ আবু জাফর আলমানসুর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব আলহাশিমী আল্আরবাসী।

তিনি ৫৫৩ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন আর ৫৭৫ হিজরীতে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তার অনুকূলে খিলাফতের বায়াত গৃহীত হয়। তাঁর পিতা এ বছর উনসত্তর বছর দুমাস

বিশদিন বয়সে ইনতিকাল করেন, তাঁর খিলাফতকাল ছিল প্রায় সাতচল্লিশ বছর। তার পূর্বে কোন আব্বাসীয় খলীফা এত দীর্ঘ সময় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেননি। তদ্রূপ সার্বিক বিবেচনায়, কোন ফলিফার শাসনকাল মুসতানসির আলউবায়দীর চেয়ে দীর্ঘ হয়নি, তিনি সুদীর্ঘ ষাট বছর মিশর শাসন করেন। আর আমাদের আলোচিত খলীফা নাসেবের বংশ তালিকায় রয়েছেন চৌদ্দজন খলীফা, আর তার বংশধর একজন ভাবী খলীফা, যেমন আমরা দেখে এসেছি। আর অবশিষ্ট আব্বসীয় খলীফাদের সকলেই তাঁর পিতৃব্য এবং পিতৃব্যপুত্র।

দীর্ঘকাল তিনি রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ ছিলেন, তার প্রধান ব্যধি ছিল মূত্র বদ্ধতা, অথচ তাকে পান করানোর জন্য বাগদাদের কয়েক ক্রোশ দূর থেকে স্বচ্ছ সুপেয় পানি আনানো হত। আরএ কারণে একাধিকার তার পুরুষাঙ্গে অস্ত্রপ্রচার করা হয়, কিন্তু এই চিকিৎসা তার কোনো কাজে আসেনি। আর মৃত্যুর পর তাকে গোসল দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওদীর পুত্র মুহয়ুদ্দীন। অতঃপর জানাযার নামায শেষে তাকে দারুল খিলাফতে সমাহিত করা হয়। এরপর এ বছর জিলহজ্জ মাসের দুই তারিখে তাকে রুসাফার কবরস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। আর সেটা ছিল এক স্মরণীয় দিন।

ঐতিহাসিক ইবন্ সায়ী বলেন, আর তার জীবন চরিত্র বিদ্যত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনাবলীতে। আর ইবন্ আছীর তার গ্রন্থ কানিলে বলেন, খলীফা নাসের লি দীনিল্লাহ তিন বছর সম্পূর্ণ চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় ছিলেন, এ সময় তার এক চোখের দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়, তার অন্য চোখে তিনি সামান্য দেখতে পেতেন। আর পরিশেষে তিনি গুরুতর আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে বিশদিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর খিলাফত কালে একাধিক ব্যক্তি ওযীরের দায়িত্ব পালন করেন যাদের আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। ইতোপূর্বে তিনি যে সকল অন্যায় প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি তা রহিত করেননি। প্রজাদের প্রতি তার আচরণ ছিল বিরূপ ও নির্যাতনমূলক। এ কারণে তার খিলাফত কালে ইরাক জনশূন্য হয়ে পড়ে, তার অধিবাসীরা বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে, এ সময় তিনি তাদের অন্যায়ভাবে স্থাপবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। কখনও তা তিনি একই সাথে পরস্পর বিরোধী দুটি কাজ করতেন, যেমন একবার তিনি একই সাথে রমযানে অ-রোযাদরদের আপ্যায়নের জন্য একাধিক আপ্যায়নশালা এবং হাজীদের আপ্যায়নের জন্য সকাধিক আপ্যায়নশালা নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি তা রহিত করেন দেন। এছাড়া তিনি একবার কয়েক প্রকার কর রহিত করার পর পুনরায় তা আরোপ করেন। তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল গুলি নিক্ষেপ, সৌখিন পাখি পোষা, এবং বীরত্বপ্রকাশক পোশাক সংগ্রহ। ইবন্ আছীর বলেন, তার দিকে সম্পৃক্ত করে যে বলে থাকে তিনিই তাতারীদের বাগদাদ আক্রমন প্ররোচিত করেছেন এবং এ ব্যাপারে তদের সাথে পত্রবিনিময় করেছেন, তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা হলো এমন মহাপাপ যার সামনে অন্য যে কোন পাপ কিছু না।

আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : তার সম্পর্কে অনেক অভিন্ন কথা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে একটি হল তিনি তার কাছে আগত প্রতিনিধিদলকে বলতেন : তোমরা অমুক অমুক স্থানে অমুক কাজ করেছ, ফলে অনেকে বরং বলা যায় অধিকাংশ মানুষ এই ধারণা করতে যে, তিনি কাশ্ফ

ও কারামতের অধিকারী, অথবা কোন ভিন্নতার কাছে এই তথ্য নিয়ে আসে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

"যাহের ইবন্ নাসেরের খিলাফতকাল"

মৃত্যুর পূর্বেই খলীফা নাসের লি-দীনিল্লাহ তার এই পত্রি আবু নসর মুহাম্মাদকে ভাবী খলীফা মনোনীত করেন এবং আয্‌যাহির বা 'বিজয়ী' উপাধি প্রদান করেন, এবং তার অনুকূলে মিম্বরে খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তাকে অপসারণ করে তার ভাই আলীকে, তার স্থলবর্তী করেন। তিনি সে তার পিতার জীবদ্দশায় বার বচর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। তখন তিনি একে পুনরায় ভাবী খলীফা নিয়োগ করতে বাধ্য হন। আর তার পিতার ইনতিকালের সময় যখন তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়, তখন তার বয়স বায়ন্ন বছর। তার চেয়ে অধিক বয়সে কোন আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি, ইনি ছিলেন বুদ্ধিমান, ভাবগম্ভীর ধার্মিক, ন্যায়-পরায়ণ এবং সদাচারী। তিনি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকৃত বহু হক প্রকৃত প্রাপকে ফিরিয়ে দেন, অন্যায় করও খাজনাসমূহ রহিত করে যা, তার পিতা প্রবর্তন করেছিল এবং তিনি প্রজাদের মাঝে আদর্শ শাসকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এমনকি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলা হয় যে, তার খিলাফতকাল যদি দীর্ঘায়িত হতো, তাহলে উমর ইবন্ আব্দুল আযীম ব্যতীত অন্য কেউ তার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ শাসক হতে পারত না। কিন্তু তার খিলাফতকাল এক বছর ও পূর্ণ হতে পারেনি। বরং তা ছিল মাত্র নয় মাস। এ সময়ের মধ্যেই তিনি পরিত্যক্ত ভূমিসমূহের করত খাজনা রহিত করে দেন এবং তার পিতার কর বৃদ্ধির প্রতিকার করে য়াকূবা নামক শহরবাসীর সত্তর হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা মওকুফ করে দেন, হতোপূর্বে তার পিতা অন্যায়ভাবে তাদের উপর এই পরিমাণ কর আরোপ করেছিলেন। তার সময়ে দরকারী কোষাগারের বাটখারার ওখন প্রতি একশ দীনারে আধা দীনার কেজি ছিল, আর সরকারি কোষাগারের লোকেরা নিজেরা গ্রহণ করার সময় এই বাটখারা দিয়ে মেপে নিত, আর প্রদান করার সময় শহরের প্রচলিত বাটখারার ওযনে প্রদান করত। একথা জানতে পেরে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীলের প্রতি কুরআনের এই আয়াত লিখে পাঠান :

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ الَّذِيۡنَ إِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ وَإِذَا كَالُوۡهُمۡ أَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ يَوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ-

অর্থ ঃ দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়, তারা কি চিন্তা করে না তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে? যে দিন সকল মানুষ দাঁড়াবে সারা জাহানের রবের সামনে?

এর উত্তরে জনৈক কাতিব [দায়িত্বশীল] লিখে পাঠান। আমীরুল মুমিনীন! আপনার নির্দেশ কার্যকর করার কারণে গত বছরের তুলনায় এ বছর পয়ঁত্রিশ হাজার দীনার কম উসুল হয়েছে। একথা প্রত্যাখ্যান করে তিনি দূত মারফত বলে পাঠান : যদি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দীনারও কম উসূল হয়, তবুও এই অপকর্ম ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

তাঁর খিলাফতকালে তিনি কাযীকে নির্দেশ প্রদান করেন, শরীয়ত সম্মত পন্থায় যদি কারও কোন হক বা প্রাপ্য সাব্যস্ত হয়, তবে কোন পুনঃবিবেচনা ব্যতীত তৎক্ষণাৎ তা তাকে পৌঁছে দিতে হবে। উদ্বৃত অর্থ সম্পদের দেখাশোনা তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি একজন সৎলোক নিয়োগ করন, এবং এ বছর জিলহজ্জ মাসের আট তারিখ বুধবার আল্লামা শায়খ ইমাদুদ্দীন আবূ সালিহ নাসর ইব্‌ন আব্দুর রায্‌যাক ইবন্ শায়খ আব্দুল কাদির জীলীকে তার কাযী ও বিচার নিয়োগ করেন। আর তিনি ছিলেন অতি উত্তম মুসলমান এবং ন্যায় বিচারক। আল্লাহ্ তাদের সকলকে রহম করুন।

খলীফা যাহের যখন তাকে বিচারকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, খলীফা তার নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকার প্রদান করা ব্যতীত তিনি তা গ্রহণ করবেন না। এ সময় তিনি তাকে বলেন, আপনি প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন, এবং আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না।

খলীফা যাহিরের আমলে নগর প্রহরীগণ প্রতিদিন সকালে বিভিন্ন মহল্লার ভালমন্দ সমাবেশ ও আস্থার কথা তুলে ধরত। কিন্তু যাহের যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি এই প্রথা রহিত করার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, মানুষের অবস্থা প্রকাশ করে এবং তাদের গোপনীয়তা উন্মোচন করে আমাদের কী লাভ? তখন তাকে বলা হলো এই খবরদারি রহিত করলে লোকজনের চারিত্রিক অবনতি ঘটবে। তখন তিনি বললেন : সে জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব, যেন তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ সম্পদে কোনো অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে যারা বন্দী ছিল, তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের থেকে অন্যায়ভাবে গৃহীত হকসমূহ তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এছাড়া তিনি কাযী সাহেবের কাছে দশ হাজার দীনার প্রেরণ করেন, যেন তা দ্বারা তিনি অভাবী ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দিতে পারেন। আর এ সময় তিনি আলিম উলামাদের মাঝে নব্বই হাজার দীনার বণ্টন করে দেন। জনৈক ব্যক্তি এ সকল কর্মকাণ্ডের জন্য তার সমালোচনা করলে তিনি বলেন : আমি তো দোকান খুলেছি শেষ বেলায় সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু ভাল কাজ করার সুযোগ দাও, আমি আর কতদিনই বা বেঁচে থাকব? পরবর্তী বছর মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এভাবেই রাজ্য শাসন করতে থাকেন। যার বিবরণ আসন্ন। তার শাসন ভাগে দ্রব্যমূল্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়, অথচ ইতোপূর্বে তা অসহনীয় পৌঁছে ছিল। এমনকি ইবন্ আছীরের ভাষ্য মতে, এ সময় দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী জাযীরা এবং মাওসিল অঞ্চলে মানুষ বিড়াল কুকুরের গোশত ভক্ষণে বাধ্য হয়েছিল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ সময় এ দুরাবস্থার অবসান হয়। আর এই খলীফা যাহির ছিলেন সুন্দর যে কাঠামো ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী, ফর্সা, সদাচারী এবং শক্তিশালী পুরুষ।

আর এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

আবুল হাসান আলী

নুরুদ্দীন ইবন্ সুলতান সালাহুদ্দীন ইবন্ য়ুসুফ ইবন্ আয়্যূব, তিনি ছিলেন তার পিতার ভাবী উত্তরাধকারী, তার মৃত্যুর পর তিনি দুবছর দামিশক শাসন করেন, এরপর তার পিতৃব্য আদিল

তার থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তিনি তার ভাই আযীযের পর মিশরীয় অঞ্চলের কর্তৃত্বলাভের চেষ্টা করেন; কিন্তু তার পিতৃব্য আদিল আবু বকর তার থেকে তা ছিনিয়ে নেন। পরিশেষে তিনি শুধুমাত্র সারসাদ অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেই ক্ষান্ত থাকেন কিন্তু তাও তার থেকে ছিনিয়ে নেন তার পিতৃব্য আদিল। এরপর কালচক্রে তিনি সুনায়সাত শহরের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং সেখানেই এ বছর ইনতিকাল করেন।

তিনি ছিলেন গুণবান ব্যক্তি, কবি ও সুলেখক, মৃত্যুর পর তাকে হালফে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, তিনি খলীফা নাসের লি-দীনিল্লাহর কাছে পত্রযোগে তার পিতৃব্য আবু বকর এবং ভ্রাতা উছমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, উল্লেখ্য যে, খলীফা নাসেরও তার মত শিয়াপন্থী ছিল। তার অভিযোগ ছিল, কাব্য পংক্তিতে :

হে আমার মনিব! আবু বকর এবং তাঁর দোসর উছমান তরবারির জোরে 'আলীর হক ছিনিয়ে নিয়েছে।

অথচ তাকেই তার পিতা তাদের দুজনের পরিবর্তে কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এবং তখনই এই কর্তৃত্ব সুষ্ঠুভাবে অর্পিত হয়। কিন্তু তারা দুজন এর বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তার সাথে কৃত বায়আত প্রত্যাহার করে, অথচ এ ব্যাপারে ভাষ্য ছিল সুস্পষ্ট।

সুতরাং দেখুন এই নামের ভাগ্য কীভাবে তা পরবর্তীদের থেকে এ আচরণের মুখোমুখি হয়েছে, যে আচরণের সম্মুখীন হয়েছে পূর্ববর্তীদের থেকে।

আমীর সায়ফুদ্দীন আলী

ইনি হলেন আমীর আলাউদ্দীন ইবন্ সুলায়মান ইবন্ মানদার, তিনি ছিলেন হালবের শীর্ষস্থানীয় আমীর। তিনি বহু দান সাদকার অধিকারী ছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি একটি শাফেয়ী মাদরাসা, একটি হানাফী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে বহু সরাইখানা সেতু নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক বহু কাজ সম্পন্ন করেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ আলী কুরদী

ইনি ছিলেন দামিশকের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত জাবিয়া নামক মহল্লার প্রধান ফটকের কাছে সার্বক্ষণিক অবস্থানকারী মাজযূব বা অর্ধ উন্মাদ ব্যক্তি। আবূ শামা বলেন, তার ব্যাপারে লোকজনের মতভিন্নতা রয়েছে, কোনো কোনো দামিশকবাসী দাবী করে যে, সে কারামতের অধিকারী বুযুর্গ ব্যক্তি, আবার কেউ কেউ তা অস্বীকার করেন। তারা বলেন : কেউ তাকে নামায পড়তে বা রোযা রাখতে বা কোনো পাদুকা পায়ে দিতে দেখেনি, বরং সে ময়লা আবর্জনা পদদলিত করে সে অবস্থায়ই মসজিদে প্রবেশ করত। আবার কেউ কেউ বলেন, তার কোনো বশীভূত ভিন্ন ছিল, যে তার উপর ভর করে তার ভাষায় কথা বলত।

দিমাশকবাসিনী জনৈক নারী থেকে বর্ণিত আছে, লাযিকিয়্যায় অবস্থানরত আমার মা সম্পর্কে খবর আসল, তার মৃত্যু হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলল, তার মৃত্যু হয়নি। এরপর আমি ঘটনাক্রমে শায়খ আলী কুরদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যখন সে স্থানীয় কবরস্থানের পাশে

বসেছিল। তখন আমি সেখানে থাকলাম, সে তখন মাথা উঁচিয়ে আমাকে বলল : মারা গেছে মারা গেছে, তুমি কী জান? আর ঘটনা সে যেমন বলেছিল তেমনি ছিল।

আবূ শামা আরও বলেন, আমার বন্ধু আবদুল্লাহ আমাকে বলেন, একদিন সকাল বেলায় আমার কাছে কিছুই ছিল না। অতঃপর আমি তাকে অতিক্রম করে গেলাম, সে তখন আমাকে অর্ধ দিরহাম দিয়ে বলল, সামান্য রুটি তরকারির জন্য এটাই যথেষ্ট। তিনি আরও বলেন একদিন এই ব্যক্তি খতীব জামালুদ্দীন দাওলাযীকে অতিক্রম করে গেল, তখন তিনি তাকে বললেন : শায়খ আলী! আমার কাছে আজ কয়েক টুকরো শুকনো রুটি ছিল, আর তার সাথে পানি পান করে নিয়েছি, তাতেই আমার যথেষ্ট হয়েছে। তখন শায়খ আলী কুরদী তাকে বললেন : আপনার মনে কি আর কোনো কিছুর চাহিদা হয়নি? তিনি বললেন : না। তখন সে বলল : হে মুসলমানগণ! যে ব্যক্তি এক টুকরা শুকনো রুটিতে তুষ্ট, সে নিজেকে এই কুঠুরিতে আবদ্ধ রাখবে, তাকে আর আল্লাহর ফরয বিধান হজ্জ করতে হবে না।

ফাখ্‌র ইবন্ তায়মিয়্যা

মুহাম্মাদ ইবন্ আবুল কাসিম ইবন্ মুহাম্মাদ শায়খ ফখরুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ ইবন্ তায়মিয়্যা আল হাররানী, হাররান এলাকার বিশিষ্ট আলিম, খতীব ও ওয়াইয, তিনি ইমাম আহমাদ ইবন্ হাম্বলের মাযহাবের জ্ঞান আহরণ শুরু করেন এবং তাকে বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং হাম্বলী 'আলিমদের মাঝে শীর্ষস্থান দখল করেন। বহু খণ্ডে রচিত তার একটি তথ্যবহুল ও জ্ঞানগর্ভ তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে, এছাড়া তার রয়েছে প্রসিদ্ধ খুৎবা সংকলন। তিনি হলেন আলমুন্তাফা ফিল আহকাম সঙকলক মাগদুদ্দীনের পিতৃব্য, ইবন্ জাওদীর দৌহিত্র আবুল মুযাফফর বলেন, আমি তাকে কোন এক জুমআর দিন নামাযে লোকদেরকে ওয়াস নসীহত করার সময় নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছি :

"হে আমার প্রিয়গণ! আমার অক্ষিগোলক অশ্রুসিক্ত, তোমাদের সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে না। প্রেমাসক্ত হৃদয়ের প্রতি কোমল হতে এবং দগ্ধ-দেহের অসুস্থতার প্রতি সদয় হও। তোমরা আমাকে আর কতদিন অভিসার রজনীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিবে। জীবনকালতো নিঃশেষ হয়ে এল, কিন্তু আজও আমাদের সাক্ষ্য হল না।" আর আরো আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি তার শায়খ আবুর ফারাজ ইবন্ জাওযীর ইনতিকালের পর হজ্জ সম্পন্ন করে বাগদাদে আগমন করেন এবং সেখানে তার শায়খের ওয়াজ নসীহতের স্থানে ওয়াজ নসিহত করেন।

ওযীর ইবন্ শাকার

সফিয়্যুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন্ আলী ইবন্ আব্দুল মালিক ইবন্ শাকার, তিনি মিশর দেশের দুমায়রা নামক স্থানে ৫৪০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর মৃত্যুর পর সমাধিস্থ হন মিশরে অবস্থিত তার মাদরাসার নিকটে। তিনি বাদশা 'আদিলের ওযীরের দায়িত্ব পালন করেন এবং তার দায়িত্ব পালনকালে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেন। তন্মধ্যে একটি হলো জামে দিমাশকের নির্মাণ সংস্কার এছাড়া তিনি দিমাশকের বিখ্যাত ফোয়ারা এবং ফোয়ারা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং জামে মুয্যার ভবন নির্মাণ করেন। অতঃপর ৬১৫ হিজরীতে তিনি তার পদ থেকে অপসারিত হন এবং এ বছর পর্যন্ত অপসারিত অবস্থায় থাকেন এবং এ বছরই তার মৃত্যু

ঘটে। তার জীবন চরিত্র ছিল প্রশংসনীয় অবশ্য কেউ কেউ বলেন : তিনি অত্যাচারী ছিলেন। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সমাধিক জানেন।

আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ মুযাফফর

তিনি ইবন্ ইবরাহীম ইবন্ আলী যনি ইবন্ কাযী নামে পরিচিত এবং যার উপাধি হলো ওয়ারেসে বাগদাদী। তিনি তার শায়খ আবুল ফাররা ইবন্ মাওদী থেকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করেন এবং বহু হাদীস শ্রবণ করেন, দুনিয়া বিমুখতার প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ তার রচিত :

"এই দুনিয়া আনন্দ-নিবাস নয়; সুতরাং তার চক্রান্ত ও ধোঁকাকে ভয় কর। যুবক সেখানে তার দেহ ও অর্থের সামর্থে সুখ স্বাচ্ছন্দের উপকরণ ভোগে বিভোর থাকে। অবশেষে তাকে মৃত্যু সুধা পান করিয়েছে এবং তাকে এরপর স্তন্যপান থেকে রক্ষা করেছে। তখন সে তার কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাকে যা স্পর্শ করে, তকে সে প্রতিহত করতে পারে না।

আর যদি সে বাক্শক্তি পেত তাহলে কবরবাসীরা বলত যুবক যেন যথাসাধ্য নেক আমল করে।"

আবুল হাসান 'আলী ইবনুল হাসান

তিনি প্রথমত রাবী, এরপর বাগদাদী ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ। এছাড়া তিনি আরও বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তার রয়েছে বেশ কিছু চমৎকার কবিতা পংক্তি তন্মধ্যে যুদ্ধ বিষয়ে নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য। "হে আমার নফ্স! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং নাজাত লাভের জন্য চেষ্টা কর, আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিই হলো প্রকৃত বিচক্ষণ।

আমি নিশ্চিত ভাবে জানতে পেরেছি যে, কোন প্রাণির অমরত্ব নেই এবং মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

হে নফস। তুমি তো এমন কিছু ধার নিয়েছো, যা তোমাকে শীঘ্রই ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যা ধার নেয়া হয়, তা তো ফিরিয়ে দিতেই হয়।

তুমি হয়তো বিস্মৃত হয়ে যাও, কিন্তু দুর্যোগ-দুর্বিপাক বিস্মৃত হয় না, তুমি হয়ত বিনোদনরত, কিন্তু মৃত্যুরা সদাপ্রস্তুত। মৃত্যু নিবাসে অমরত্বের প্রত্যাশা করো না এবং এমন ভূখণ্ডে পদার্পণের প্রত্যাশা রেখো না, যেখানে তোমার জন্য গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো। ঐ ব্যক্তির জন্য পৃথিবীর বুকে রাজত্বের কিংবা মহা সৌভাগ্যের কী মূল্য আছে, যার শেষ আশ্রয় হল ভূগর্ভের সমাধি? ঐ ব্যক্তি কীভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণে বিভোর থাকতে পারে, যার প্রতিটি নিঃশ্বাস গণনা করা হচ্ছে!

আল্বীহা –সানজারী

ইনি হলেন শাফেয়ী ফকীহ কবি আবুল সাআদাত আসআদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন্ মূসা। ইবন্ খাল্লিকান বলেন : তিনি ফকীহ ছিলেন, বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ মাসলা-মাসায়েলে তিনি মন্তব্য করেছেন তবে কাব্যচর্চার প্রতি তার প্রবল ঝোঁক ছিল। এ ব্যাপারে তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং কবিতার মাধ্যমে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। কবিতায় তিনি শাসকদের স্তুতি গেয়েছেন এবং তাদের থেকে বখশিশ লাভ করেছেন। আর এই সূত্রে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ

করেছেন। দামেস্কের আত্তুরবা আল আশরাফিয়্যাতে তার একটি কাব্যসংকলন রক্ষিত আছে। তার রচিত অন্যতম কয়েকটি কোমল ও চমৎকার কবিতা পংক্তি হলো :

"তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা হলো যা তার অন্তরে সান্ত্বনা উদিত করে, আর প্রেমের ভুবনে তো তুমি তার অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত।

আর সে যখন তোমার কুটনামি, করে যে, সে তোমার প্রেমে বিগলিত, তখন বুঝবে সে, তা তার ভৎর্সনা। আর তার অবস্থা কি প্রেমাশক্তির সাক্ষ্য বহন করে না, যা তোমাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

তুমি তার রুগ্নতার পরিধেয় নবায়ণ করেছে, তার প্রেমের আবরণ উন্মোচন করেছ এবং মিলনবন্ধন কর্তব করেছে। এটি একটি দীর্ঘ কাসীদা, যাতে তিনি কাযী কামালুদ্দীন শাহবযুবীর প্রশংসা করেছেন। তার অন্য দুটি পংক্তি হলো–"রানা এব হাযিরে আমার সুখময় দিনগুলির জন্য আক্ষেপ! দ্রুতগামী হয়ে যেন তার প্রথমাংশ শেষাংশের উপর হেঁটেই খেয়ে পড়। এ বছর নব্বই বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

উছমান ইবন্ ঈসা

ইবন্ দারবাস ইবন্ কাসর ইবন্ জারহাস ইবন্ আবদুস আলহামদবানী আলমারানী, যিয়াউদ্দীন ইনী কাযী সদরুদ্দীন আব্দুল শালিকের ভাই। এই আব্দুল মালিক হলেন শালাহী সম্রাজ্যের মিশরীয় ভূখণ্ডের শাসক। আর এই যিয়াউদ্দীন হলেন : المهذب إلى كتاب الشهادات গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংকলন, যা প্রায় বিশখণ্ডে সমাপ্ত এছাড়া তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক اَللُّمَعُ এবং 'আল্লামা শারীযির التنبيه গ্রন্থেরও সংকলক। তিনি ছিলেন মাযহাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী কুশলী আলিম। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন্ আহমাদ ইবন্ রুসাবী

প্রথমত তিনি বাওয়ারীযী, অতঃপর বাগদাদী তিনি বহুগণের অধিকারী বর্ষীয়ান 'আলিম, তার থেকে হাদীসের রিওয়ায়াত বিদ্যমান আছে। তার আবৃত্তি করা অন্যতম দুটি কবিতা পঙ্ক্তি হলো :

আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয়ের ক্ষেত্রে অবুহাতকে সংকীর্ণ করেছে যে বিষয়টি, তা হলো আমরা যদি আমাদের ভাগ্য বিধানে তুষ্ট হতাম, তাহলে তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা মানুষের উপাসনা করি অথচ আমাদের দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা সবই আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।

আবুল ফযল আবদুর রহীম ইবন্ নামরুল্লাহ :

আবূ আলী ইব মানসূর আল কায়্যাল আলওয়াসিতী তার পিতৃপুরুষদের অনেকেই বিশিষ্ট কাযী ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন বাগদাদের পরিমাপ ওযন নিরীক্ষক। তার রচিত কয়েকটি কবিতা পঙক্তি হলো :

"ঠিক্ দুনিয়াতে, যার মুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয় না। যা সামান্য আনন্দ দান করে, অতঃপর তার কদর্যতা প্রকাশ করে।

অবগুণ্ঠনের আড়ালে তা তোমাকে সৌন্দর্য সৌকর্য দেখায়, কিন্তু অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে অপ্রকাশ করে কুৎসিত ও কদাকার সুখাবয়ব।"

আবূ আলী আল হাসান ইবন্ আলী

ইবন্ হাসান ইবন্ আলী ইবন্ হাসান ইবন্ আলী ইবন্ আম্মর ইবন্ ফিহ্রি ইবন্ ওয়াক্কাহ আলয়াসীরী। তাকে আম্মার ইবন্ যায়ারের সাথে সম্পৃক্ত করে য়াসারী বলা হয়, তিনি হলেন বাগদাদবাসী অনেক গুণাবলীর অধিকারী বিশিষ্ট শায়খ, তাফসীর ও ফারায়েজ বিষয়ে তার একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া তার রয়েছে একাধিক খুৎবা-পুস্তিকা এবং চমৎকার কবিতা পংক্তিসমূহে। বিচারকদের কাছে তার সাক্ষ্য সমাদৃত ছিল।

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ য়ুসুফ এবন তাব্বাস আলওয়াসিতী আল্বাগদাদী, বিশিষ্ট সুফী। তিনি বাগদাদের আংশিক শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে ছিলেন। তার আবৃত্তিকৃত অন্যতম কবিতা পঙ্ক্তি হলো– আল্লাহ্ কোনো মানুষকে তার আকলবুদ্ধি ও আদব শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কোনো 'দান' প্রদান করেননি।

তরুণের সৌন্দর্য কত উত্তম, যদি সে তা হারায় তবে তা চিরতরে হারায়।

তাম্বীহ-এর ব্যাখ্যাকার ইবন্ য়ুনুস

আবুল ফযল আহমাদ ইবন্ শায়খ কামালুদ্দীন আবুর ফাত্হ মূসা ইবন্ য়ুনুস ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মানআ ইবন্ মানিক ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ সাদি ইবন্ সায়ীদ ইবন্ আসিম ইবন্ আবিদ ইবন্ কব ইবন্ কায়স ইবন্ ইবরাহীম। তার পূর্ব পুরুষদের আদিনিবাস আরবীল শহর, অতঃপর মাওসিন শহর, তিনি হলেন জ্ঞান ও নেতৃত্বের অধিকারী পরিবারের সন্তান। তিনি নিজ পিতার কাছে বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাতে কুশলতা ও বুৎপত্তি লাভ করেন। আর তিনি 'আত্তাম্বীহ নামক গ্রন্থখানির পাঠদান করেন এবং তার ব্যাখ্যা সংকলন করেন। এছাড়া তিনি ইমাম গাযীলীকৃত ইহয়াউ উলুমুদ্দীন গ্রন্থখানি দুপর সংক্ষেপ করেন, একবার ছোট আকারে, আরেকবার তুলনামূলক বড় আকারে। এবং তিনি তা থেকে পাঠ দান করতেন। ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান বলেন : আমার শৈশবে তিনি আমার পিতার মৃত্যুর পর ৬১০ হিজরীতে আরবীল শহরে অবস্থিত সুলতান মুযাফফরের মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শৈশবে আমি যখন তার দরসে উপস্থিত হতাম, তখন তার মত দরস দিতে কাউকে দেখতাম না। অতঃপর ৬১৭ হিজরীতে তার নিজ শহরে গমন করেন এবং এ বছর রবিউল আখির মাসের ২৪ তারিখ সোমবার ৪৭ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

৬২৩ হিজরীর সূচনা

এ বছরই খাওয়ারিযম শাহের পুত্র বাদশা জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমী জর্জিয়াবাসীদের মুখোমুখি হন এবং তাদেরকে ভাষণদানে পর্যদস্ত করেন এবং তিনি তাদের বৃহত্তম দুর্গ তাফসীস জোরপুর্বক দখল করেন এ সময় তিনি সেখানে অবস্থারনত কাফের যোদ্ধা পুরুষনের হত্যা করেন এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দি করেন, কিন্তু সেখানে অবস্থানকারী মুসলমানদের সাথে কোন বিরূপ আচরণ করেননি। এভাবে এখানে তার শাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইতোপূর্বে জর্জিয়ানরা ৫১৫ হিজরীতে মুসলমানদের থেকে তা দখল করে নিয়েছিল এবং সুলতান

জালালুদ্দীন উদ্ধার করার পুর্ব পর্যন্ত তা তাদের দখলেই ছিল। অবশেষে তিনি এটা তাদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। আর তা ছিল এ মহাবিজয়। আর সকল অনুগ্রহ আল্লাহর।

এছাড়া এ বছর তিনি সুলতান আশরাফের প্রতিনিধি থেকে খালাতের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সে অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু তার অধিবাসীদের তীব্র লড়াইয়ের ফলে তিনি তা দখল করতে সক্ষম হননি। অতঃপর কিরমানের প্রতিনিধির অবাধ্যতা ও বিরোধতার কারণে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং খালাতবাসীদের ছেড়ে কিরমানবাসীদের দিকে যাত্রা করেন। এ বছর মালিক আশরাফ তার ভাই মুআযযপের সাথে সন্ধি করেন এবং তার উদ্দেশ্যে দিবাশক অভিমুখে যাত্রা করেন। আর মুআযযাম ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীন আরবীল প্রশাসক, শারদীন প্রশাসক এবং রোম-সম্রাটকে সহযোগিতা করত। আর মালিক আশরাফের সাথে ছিল তার ভাই কামিল এবং মাওসিল প্রশাসক বদরুদ্দীন লুলু। অতঃপর তিনি তার ভাই মুআযযমকে তার পক্ষে টেনে নিয়ে তারদিকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালান। এ ছাড়া এ বছর আন্তাকিয়া এবং আর্মেনিয়াবাসীদের মধ্যে একটি বিরাট যুদ্ধ এবং বেশ কিছু ছোট ছোট যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়। এ বছরই বাদশা জালালুদ্দীন তুর্কমানদের একটি গোষ্ঠীকে কঠিনভাবে শায়েস্তা করেন যারা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করতো।

এছাড়া এ বছর শায়খ জামালুদ্দীন ইবন্ জাওযীর পুত্র মুহয়্যুদ্দীন য়ুসুফ বাগদাদ থেকে মালিক মুতাযযমের কাছে দিমাশকে আগমন করেন, এ সময় তার সাথে ছিল মালিক আদিলের পুত্রদের জন্য খলীফা যাহের জি আমরিল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাজকীয় পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপঢৌকন।

আর তার আনীত পত্রের মূলবিষয় ছিল, তাকে জালালুদ্দীন ইবন্ খাওয়ারিযম শাহের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব থেকে নিষেধ করা। কেননা খলীফার বিরুদ্ধে লড়াই এবং তার থেকে বাগদাদ ছিনিয়ে নেয়ার সংকল্পের কারণে সে খারেজী বিদ্রোহী। তখন মালিক মুআয্যম দরবারে খিলাফতের পত্রের এই আহবানে সাড়া দেন। এরপর কাযী মুহয়্যুদ্দীন ইবন্ মওযী মিশরীয় ভূখণ্ডে অবস্থানরত মালিক কানিলের সাক্ষাতে যাত্রা করেন। আর এটা ছিল শাম ও মিশর দেশে তার প্রথম আগমন। এই সফরে রাম বাদশাদের পক্ষ থেকে তিনি অনেক উপহার উপঢৌকন লাভ করেন। তন্মধ্যে একটি হল দিশাশকে তার পিতার নামে মাদরাসা আলজাওযিয়্যার নির্মাণ। এছাড়া এ বছরই মালিক মুসআয্যমের ফরমান নিয়ে ইবন্ জাওযীর দৌহিত্র শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ কাযসানী শিবলিয়্যা মাদরাসায় পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর প্রথম দিন তার দরসে উপস্থিত হন বিচারক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

খলীফা যাহিরের ওফাত এবং পুত্র মুসতানসিরের খিলাফত

এ বছর রজব মাসের তের তারিখ শুক্রবার পূর্বাহ্নে খলীফা যাহের মৃত্যুবরণ করেন, অর্থাৎ ৬২৩ হিজরী সনে। সাধারণ লোকজন অবশ্য জুমাআর নামাযের পূর্বে তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেনি। ফলে জুমআর খতীবগণ তাকে জীবিত গণ্য করেই মিম্বরসমূহে তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। তার খিলাফত কাল ছিল নয় মাস চৌদ্দ দিন, আর মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল, বায়ান্ন বছর।

খলীফা জাহের ছিলেন বানু আরবাসের সবচে 'বদান্য সদাচারী ও সুদর্শন ব্যক্তি। তার খিলাফতকাল যদি দীর্ঘ হতো, তাহলে তার মাধ্যমে উম্মতের বিরাট সংশোধন ও সংস্কার হতো। কিন্তু আল্লাহ্ চাইলেন তাকে তাঁর নিকট সান্নিধ্য উঠিয়েছে নিতে এবং তাঁর কাছে রক্ষিত তাঁর বিনিময় ও পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করতে। আর ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি তার দায়িত্ব লাভের পররই অন্যায়ভাবে জব্দকৃত সহায়সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন, এবং নির্যাতনমূলক কর ও খাজনাসমূহ রহিত করে দেন এবং প্রজাদের ভূমিকর লাঘব করেন। এছাড়া তিনি অভাবী ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করেন এবং আলিম-উলামা ও দরিদ্রদের এককালীন ভাতা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু লোকদের নিয়োগ দান করেন। প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে তার লিখিত একটি পত্রের ভাষ্য নিম্নরূপ : পরম করুণাময় চিরদয়ালু–আল্লাহর নামে শুরু করছি : জেনে রাখ যে, আমাদের অবকাশ প্রদান অবহেলার কারণে নয় এবং আমাদের উপেক্ষা ও ছাড় অনিচ্ছাকৃতও নয়। বরং আমাদের এই আচরণ তোমাদেরকে যাচাই করে দেখার জন্য যে, আসলে কে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম। আর ইতোপূর্বে তোমাদের জনপদ বিয়ান করা, প্রজাদের উৎখাত করা, শরীয়তের অবমাননা করা, প্রকাশ্য অন্যায়কে গোপন সত্যের অবয়বে প্রকাশ করা, তোমাদের কূটকৌশল ও চক্রান্ত ইত্যাদি যা কিছু অতীত হয়েছে, তার সবই আমরা ক্ষমা করেছি। তদ্রূপ আমরা ক্ষমা করেছি সমূলে বিনাশ ও উৎপাটনকে উসূলকরণ ও ক্ষতিপূরণ আখ্যা দেয়া। আর তোমরা তার সুযোগ লুফে নিয়েছ এক ভয়ঙ্কর সিংহের থাবা থেকে। বিভিন্ন ভাবে তোমরা অভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাক। তার বিশ্বাসও আস্থার পাত্র হওয়ার কারণে তার রায়কে তোমরা খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যাও। এবং তোমাদের অন্যায়কে তার ন্যায়ের সাথে একাকার করে ফেল। তখন তিনি তোমাদের অনুসরণ করেন অথচ তোমরা তার অপব্যতায় লিপ্ত। তিনি তোমাদের সাথে একমত হয়ে যান, অথচ তোমরা তার বিরুদ্ধাচারী। আর এখন আল্লাহ্ তোমাদের ভীতিকে নিরাপত্তার দারিদ্রকে ধনাঢ্যতায় এবং অন্যায়কে ন্যায়ে পরিবর্তন করেন। আর তিনি তোমাদেরকে এমন শাসক দান করেছেন, যিনি পদস্খলন ও অজুহাত গ্রহণ করেন এবং হঠকারি ব্যতীত অন্য কাউকে পাকড়াও করেন না এবং নাছোড় ব্যতীত অন্য কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। তোমরা ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তোমাদের কে ন্যায়রায়ণতার নির্দেশ দেন, এবং তোমাদের জন্য অত্যাচার ও অনাচার অপছন্দ করে তিনি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন। তিনি আল্লাহকে ভয় করেন, তাই তোমাদেরকে তার প্রতি কৌশলের ব্যাপারে ভয় দেখান, তিনি আল্লাহকে প্রত্যাশা করেন তাই তোমাদেরকে তার আনুগত্যে উৎসাহ প্রদান করেন যদি তোমরা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রকৃত খলীফাদের পথ এবং তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর বিশ্বস্তদের পথ অবলম্বন করল, তাহলে তোমরা নিরাপদ ও সফলকাম হবে, এর অন্যথা হলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। ওয়াস্সালাম :

তার মৃত্যুর পর তার গৃহে সিলমোহরকৃত লিখিত তথ্য ও সূত্র পাওয়া যায়, যা তিনি মানুষের দোষ গোপনের উদ্দেশ্যে এবং তাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদাহানির আশঙ্কায় খুলে দেখেননি। তিনি দশজন পুত্রকন্যা সন্তান রেখে ইনতিকাল করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র আবু জাফর মানসুর তার মৃত্যুর পর যার অনুকূলে বায়আতে খিলাফত গৃহীত হয়, আর তাকে

মুস্তান্সির জিন্নাহ উপাধি প্রদান করা হয়। খলীফা যাহির বেন গোসল করার বিশিষ্ট ওয়ায়েয মুহাম্মাদ আল্খয়্যাত, আর তাকে দারুল খিলাফতে সমাহিত করা হয়। পরে সেখান থেকে রুসাফাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

মুসতানসির বিল্লাহ আল্আব্বাসীর খিলাফত

আমীরুল মু'মিনীন আবূ জাফর মানসূর ইবন্ যাহির মুহাম্মাদ ইবন্ নাসির আহমাদ। এ বচর ৬২৩ হিজরীর রজব মাসের তের তারিখ জুমুআর দিন তার পিতার মৃত্যু দিবসে তার খিলাফতের অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। এ সময় সাধারণ প্রজা সকল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সকলেই তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এটা ছিল একটি স্মরণীয় দিন, এ সময় তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর পাঁচ মাস এগার দিন। আর তিনি ছিলেন সুঠামদেহী পুরুষ, তার সম্পর্কে কবি বলেন :

তাঁর ললাটে ও গন্ডদেশে যেন তারকার দ্যুতি, আর মুআযবকে যেন চন্দ্রের জ্যোতি। তাঁর বংশধারায় রয়েছেন পনের জন খলীফা। তাদের মধ্যে পাঁচজন হলেন তাদের পিতৃপুরুষ যারা একের পর এক খিলাপত লাভ করেছেন। আরা তিনিও তাদের থেকে বংশপরম্পরায় খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেছেন। আর তার পূর্বে কোন খলীফা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না। প্রমদের সাথে তিনি তার পিতা খলীফা যাহেরের ন্যায় বদ্যনতা সদাচার ও অনুগ্রহের পথ অবলম্বন করেন। এছাড়া তিনি বিশাল মুস্তান্সিরিয়া মাদরাসা নির্মাণ করেন যার অনুরূপ মাদরাসা তৎকালীন দুনিয়ায় নির্মিত হয়নি, ইনশাআল্লাহ অচিরেই যথাস্থানে তার বর্ণনা আসবে। তার পিতার আমলে যারা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন, তারা তদের অবস্থায় বহাল থাকেন। আর পরবর্তী জুমুআর দিন খলীফা মুস্তান্সির বিল্লাহর নামে মিম্বরে মিম্বরে খুৎবা দেয়া হয় এবং তার নাম উচ্চারণ কালে সোনা রূপার মুদ্রা ছিটিয়ে দেয়া হয়। আর সেটা ছিল এক স্মরণীয় দিন। এ সময় কবিরা খলীফার বিভিন্ন প্রকার প্রশংসাগীতি ও স্তুতি কাব্য রচনা করেন এবং তাদেরকে রাজকীয় পোশাক ও উপহার উপঢৌকন দান করা হয়। এ সময় মাওসিলের শাসনকর্তা ওযীর জিয়াউদ্দীন আবুল ফাত্হ নাসরুল্লাহ ইবন্ আছীর পক্ষ থেকে জনৈক পুত্র শাবান মাসের শুরুতে একটি বিশেষ পত্র নিয়ে খলীফার দরবারে আগমন করেন। যাতে ছিল বিশুদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নতুন খলীফার প্রতি অভিনন্দন এবং পিতৃবিয়োগের সান্ত্বনা বাণী আর খলীফা সুলতাসীর প্রকাশ্যে বাহনে আরোহণ করে জুমআর নামযে হাযির হতেন, এ সময় তার সাথে থাকত মোট তিনজন। একবার তিনি বাহনে আরোহণ করে বের হয়ে বিরাট কোলাহল শুনতে পেলেন। তখন বললেন, এত শোরগোল কিসের? তখন তাকে বলা হল, শাহী ঘোষকরা বাহন থেকে পথচারীদের সতর্ক করে আপনার আগমনবার্তা ঘোষণা করছে। এরপর থেকে বিনয় ও নিম্রতা প্রকাশার্থে তিনি নিয়মিত পায়ে হেঁটে জুম'আর নামাযে উপস্থিত হতেন। এছাড়া তিনি জুম'আর নামাযে ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শ্রবণ করতেন। শাবান মাসের বাইশ তারিখে তিনি প্রজা সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বাহনে আরোহণ করে বের হলেন। অতঃপর রামাযানের প্রথম রাতে তিনি আলিম উলামা ও অভাবীদের সাথে বিপুল পরিমাণ ময়দা, বহুসংখ্যক মেষ এবং বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ বিতরণ করেন। তাদের রোযা পালনে এবং রাত্রি জাগরণে সহযোগিতা হয়। আর এ বছর রমযান মাসের ২৭ তারিখ খলীফা যাহিরের তাবুত বা

বিশেষ সিন্ধুক দারুল খিলাফত থেকে রুসাফার তুরবাতে স্থানান্তরিত করা হয়। আর সেটা ছিল স্মরণীয় দিন। ঈদের দিন খলীফা মুসতান সর মুহিয়্যুদ্দীন ইবন্ জাওযীর হাতে তৎকালীন ফকীহ সূফী এবং মসজিদের ইমামদের জন্য প্রচুর পরিমাণ হাদিয়া প্রেরণ করেন।

এছাড়া ইবন্ জাওযী উল্লেখ করেছেন যে, এ বছর বিরাট ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যা বহু বাড়িঘর ও দুর্গ ধসিয়ে দেয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ সময় তাদের শহর একটি মেষ জবাই করা হলে দেখা যায় যে, তার গোশ্ত মাথা এমনকি পা পর্যন্ত তিক্ত ও বিস্বাদ। খলীফা যাহিরের পর এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

জামাল মিস্‌রী

য়ূনুস ইবন্ বদরান ইবন্ ফায়রুয জামালুদ্দীন আল মিশরী, এ সময়ের প্রধান বিচারপতি। তিনি ইলম চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ইলম অর্জনে মনোনিবেশন করেন। সফলতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি ইমাম শাফেরীর কিতাবুল উম্ম-সংক্ষিপ্ত করেন। ফারায়েয বিষয়ে তার একটি দীর্ঘ গ্রন্থ বিদ্যমান। আত্মহত্যাকারী বিশিষ্ট মুত্তাকী অন্ধ সালিতের পর তিনি আমীনিয়্যা মাদরাসার পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাকে এই দায়িত্ব প্রদান করেন ওযীর সফীয়্যুদ্দীন ইবন্ শাকার। তিনি তার দায়িত্ব পালনে যত্নবান ছিলেন। অতঃপর তিনি দিশামকে বায়তুল মালের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়া তিনি দিমাশক শাসকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাদমা ও খলীফাদের কাছে পত্রপ্রেরণ করেন। এরপর মুআয্যম যাকী ইবন্ থাকাকে অপসারণ করে তাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাকে বড় আদিলিয়া মাদরাসার পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন, যখন তার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। তিনি হলেন সেখানে পাঠদানকারী প্রথম ব্যক্তি, তার এ পাঠদানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। প্রথম তিনি তাফসীরের দরস দিতেন এরপর ফিকহের দরস প্রদান করতেন।

বিচার সংক্রান্ত নথি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তিনি তার নিজস্ব পন্থা অবলম্বন করতেন আর তা হল তিনি প্রতি শুক্রবার এবং মঙ্গলবার প্রত্যুষে এই উদ্দেশ্যে উপবেশন করতেন। এ সময় তার কাছে শহরের সব সাক্ষীরা এসে উপস্থিত হত। আর সে ব্যক্তির কোন নথিতে কিছু সাব্যস্ত করার প্রয়োজন হত, সে সেখানে উপস্থিত হত, তখন তিনি সাক্ষীদেরকে ডেকে পাঠাতেন আর সাক্ষীরা বিচারকের সামনে সাক্ষী প্রদান করত এবং বিষয়টি দ্রুত নিস্পন্ন হত। এছাড়া প্রতি শুক্রবার আসরের নামাযের পরও তিনি নির্ধারিত স্থানে উপবেশন করে বিচারকার্য সমাধা করতেন। সাধারণত মাগরিবের নামায পর্যন্ত তিনি এই বিচারকার্য চালাতেন তবে কখনও কখনও তিনি ইশা পর্যন্ত অবস্থান করতেন। প্রায়শই তিনি ইলমী আলোচনার মশগুল হতেন এবং কুশলী পন্থায় বহুকাজ সমাধা করতেন। তার সম্পর্কে কেউ এ অভিযোগ করতে পারেনি যে, তিনি কারও থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ উৎকোচরূপে।

আবূ পাশা বলেন, তার সম্পর্কে শুধু এইটুকু অভিযোগ করা হয় যে, তিনি জনৈক উত্তরাধিকারীকে বায়তুল মাল থেকে সুবিধা গ্রহনের পথ বাতলে দেন এবং তার পুত্র তাজ মুহাম্মাদকে তার স্থলবর্তী করেন। অথচ সে এর উপযুক্ত ছিল না। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সংযমী এবং সমীহের অধিকারী ছিলেন। আবু শামা আরও বলেন— তিনি দাবী করতেন

যে, তিনি কুরায়শী এবং শায়বী এ কারণে লোকজন তার সমালোচনা করেছে। তারপর বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শামসুদ্দীন আহমাদ ইবন্ খলীফা আল জুওয়ায়নী।

আলবিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, তিনি এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে ওফাত লাভ করেন এবং জামে মসজিদের সন্নিকটে নিজ গৃহের পরিধিতে সমাধিত হন। জনৈক নিন্দুক কবি তার সম্পর্কে বলেন :

জামাল মিশরী তার কর্মে কত খর্বাকৃতি সে তার সমাধি করেছে নিজ গৃহে। জীবিতদের স্বস্তি দিয়েছে তাকে পাথর ছোড়া থেকে, আর মৃতদেরকে তার আগুনের আঁচ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

দামেশকের শাসক মু'তামিদ

দ্বন্দ্বযোদ্ধা ইবরাহীম : যিনি মু'তামিদ নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন দামেশকের গভর্নর সুশাসক, সচ্চরিত্র, সুস্বভাব এবং উৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলীর অধিকারী, তার আদি নিবাস হল মাওসিল শহর। সেখান থেকে তিনি শামদেশে আগমন করেন এবং ফররুখ শাহ ইবন্ শাহানশাহ ইবন্ আয়্যূবের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ফররুখ শাহের ভাই বদর মাওদূদ তাকে নায়েব নিযুক্ত করেন, তিনি দিমাশক শহরের নিয়ন্ত্রক বাহিনীর নির্বাহী, এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন সত্য ও প্রশংসিত হয়। অতঃপর তিনি চল্লিশ বছর দামেশকের নিয়ন্ত্রণবাহিনীর দায়িত্ব পালন করেন। তার এই সময়কালে অনেক বিস্ময়কর ও অভিনব ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি সচরাচর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের দোষত্রুটি প্রকাশ করতেন।

তার সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা নিম্নরূপ : জনৈক তাঁতীর একটি ছোট ছেলে ছিল, ছেলেটির কানে ছিল সোনার দুল। ফলে জনৈক প্রতিবেশী তা লাভের জন্য ছেলেটিকে হত্যা করে এক গোরস্থানে তাকে কবর নিয়ে রাখে। লোকজন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে কিন্তু সে তার অপরাধ অস্বীকার করে। তখন ছেলেটির মা এ ঘটনার অত্যন্ত বেদনাহত হয় এবং স্বামীর কাছে তালাক চায়। স্বামী তার আবেদনে সহানুভূতি প্রকাশ করে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। এরপর সে ঐ ঘাতক ব্যক্তি কাছে গিয়ে এমনভাব প্রকাশ করে, যেন সে তার গুণমুগ্ধ ও তার প্রতি আসক্ত, একথা বলে সে তাকে বিবাহ করতে বলে। তখন লোকটি তাকে বিবাহ করে, কিছুদিন তার কাছে অবস্থানের পর একদিন সে কথা প্রসঙ্গে তার ছেলের কথা উঠায়, যার হত্যার ব্যাপারে লোকেরা তাকে অভিযুক্ত মনে করে। তখন লোকটি বলে : হাঁ, আমি তাকে হত্যা করেছি, তখন স্ত্রীলোকটি তাকে বলে, আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা আমি তার কবর যিয়ারত করব। তখন লোকটি তাকে নিহত ছেলের কবরে নিয়ে যায়। ছেলের কবর দেখে মায়ের চোখ অশ্রুসিক্ত হল। এদিকে স্ত্রীলোকটি পুর্ব গেজেট তার সাথে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে এসেছিল। লোকটির অসতর্কতার সুযোগ সে তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে ঐ একই কবরে তাকে দাফন করে রাখে।

এ সময়ে কবরস্থানের লোকজন গভর্নর মু'তামিদের কাছে আসে এবং স্ত্রী লোকটিকে এ ব্যাপারে জেরা করে সে তখন ঘটনার আদ্যোপান্ত খুলে বলে। তখন মু'তামিদ এই প্রতিশোধ গ্রহন যথার্থ রায় দিয়ে তাকে সসম্মানে মুক্ত করে দেয়। জনৈক ব্যক্তি তার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি যখন বাবুল ফারাজ দিয়ে বের হচ্ছি, তখন দেখি এক ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একটি তবলা নিয়ে চলেছে, তখন আমি নির্দেশ দিলাম। ফলে তাকে ইদ্দ লাগনো হল। অতঃপর লোকজনকে নির্দেশ দেয়ার ফলে তারা তার তবলা ভেঙে ফেলল, তখন দেখা গেল, সেই তবলার ভিতরে একটি বিশেষ পাত্রে মদ লুকানো।

উল্লেখ্য যে, গভর্নর আদিল দানেশকে মদ প্রস্তুত করতে এবং কোথাও থেকে মদ আমদানী করতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ফলে মানুষ নানা প্রকার কৌশল ও চতুরতার আশ্রয় নিয়ে মদের লেনদেন করত উল্লিখিত ঘটনা উদ্ধৃতিকারি বলেন : তখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম : আপনি কীভাবে বুঝতে পারলেন যে, তবলার মাঝে কিছু আছে? তিনি বললেন : আমি দেখতে পেলাম, হাঁটার সময় তার পা কাঁপছে তখন আমার মনে হলো নিশ্চয় তবলার মাঝে সে ভারী কোনো পদার্থ বহন করছে। তার থেকে এ জাতীয় আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

মুআযযম তাকে অপসারণ করেন এবং তাকে প্রায় পাঁচ বছর দুর্গে বন্দি করে রাখেন। কারণ, তিনি মনে মনে তার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। দুর্গে বন্দি করার পর তার নামে ঘোষণা করা হয় সে, তার বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ থাকলে সে যেন তার উত্থাপন করে। কিন্তু কেউ এসে এই অভিযোগও করেননি যে, তিনি তাদের থেকে একটি শস্যদানা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাকে মাদরাসার পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার কবরস্থানের কাছে একটি মসজিদ বিদ্যমান। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মাদরাসা শিবলিয়্যার ওয়াকফকারী

শিবলুদ্দৌলা কাফুর হুসানী, তাকে হুসানী বলা হয় হুসামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ লাজীনের দিকে সম্পৃক্ত করে। তিনি ছয় হিজরীতে শাম দেশে জন্মগ্রহণ করেন। এই হল সেই ব্যক্তি, যিনি তার কর্ত্রী সিত্শামকে শামিয়া বুরানিয়্যার ভবন নির্মাণে উৎসাহ দিয়েছিলেন, এছাড়া তিনি হানাফীদের জন্য শিবলিয়্যা মাদরাসা এবং তার পাশে সুফীদের জন্য খানকা নির্মাণ করেন। আর সেটাই ছিল তার গৃহে নিবাস। এছাড়া তিনি জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন পান্থশালা, পথচারী–ছাউনি নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি এ সময় জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথও নির্মাণ করেন। যার অভাবে লোকজন বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হত। তিনি এ বছর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মাদরাসার পাশেই সমাহিত হন। তিনি কিনদী ও অন্যান্যদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

দিমাশক ও হালবে রওয়াহিয়্যার ওয়াকফকারী

আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ্ যিনি ইবন্ রওয়াহা নামে সুপরিচিত তিনি ছিলেন দিমাশকের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন যেমন দীর্ঘদেহী তেমনি স্থূলকায়, তার কোনো দাড়ি ছিল না। বাবুল ফারাদীদের অভ্যন্তরে তিনি মাদরাসা রওয়াহিয়্যা নির্মাণ করেন এবং শাফেয়ীদের জন্য তা ওয়াকফ করেন। অতঃপর তার তত্ত্বাবধান ও পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ শালাহ শাহারযোরকে এ ছাড়া হালব শহরেও তার নির্মিত অনুরূপ একটি মাদরাসা ছিল। শেষ জীবনে তিনি দামেস্কের মাদরাসায় লোক সাহচর্য এড়িয়ে নির্জনবাস করতে থাকেন। এ সময় তিনি মাদরাসার পুর্বদিকের একটি ঘরে অবস্থান করতেন। এরপর তিনি মৃত্যুর

পর সেখানেই সমাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বরং তাকে সুফীদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুর পর সুফী মুহিয়ুদ্দীন ইবন্ আরাবী, তাকীয়ুদ্দীন খাযআল নাহবী মিশরী এরা দুজন ইবন্ রওয়াহার ব্যাপারে এই সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি শায়খ তাকীয়ুদ্দীনকে এই মাদরাসা থেকে অপসারণ করেছিলেন। তখন এ বিষয়টি থেকে অনেক ঘটনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের দুজনের উদ্দেশ্যে চরিতার্থ হয়নি। তাছাড়া এ বছর খায়আলের মৃত্যু হওয়ার কারণে তাদের কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবু মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবন্ মাওদূদ ইবন্ মাহমূদ

আল বালদাজী আল হানাফী আল মাওগিলী, মাওসিল শহরে তার একটি মাদরাসা ছিল, যা দ্বারা তিনি পরিচিত লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভুত, কালক্রমে তিনি শীর্ষস্থানীয় আলিমদের মাঝে গণ্য হতে থাকেন। তার ধার্মিকতা ছিল মজবুত, তার রচিত বেশ কিছু উৎকৃষ্টমানে সুন্দর কবিতা পঙ্ক্তি রয়েছে এখানে দুটি কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করা হলো।

"সে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার রয়েছে 'এক বিশেষ অবস্থা, যা তাকে শরীয়তের গণ্ডি বহির্ভূত করে দেয়।

তাহলে আর তার সাহচর্য অবলম্বন করো না, কেননা সে তখন কল্যাণশূন্য নাপাক জন্তু।"

এ বছর জুমাদাল উখরা মাসের ছাব্বিশ তারিখ তিনি মাওসিলে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল প্রায় আশি বছর।

য়াকূত য়াকূব ইবন্ আবদুল্লাহ

নাজীবুদ্দীন, শায়খ তাজুদ্দীন কিন্দীর মুতাওয়াল্লী, তাকে য়াকুব ইবন্ 'আবদুল্লাহ বলা হয়। দিমাশকের উত্তরপুর্ব কোণে অবস্থিত গ্রন্থশালার সকল গ্রন্থ তাকে ওয়াকফ করে দেয়া হয়। আর তার সংখ্যা ছিল ৭৬১ খানা। তার মৃত্যুর পর এগুলি তার পুত্রের জন্য এবং তারপর তৎকালীন 'আলিম উলামাদের জন্য ওয়াকফ করা হয় কালক্রমে গ্রন্থগুলি খোয়া যায় আর তার অধিকাংশ বিক্রি করে দেয়া হয়। এই য়াকূত ছিলেন গুণী ব্যক্তি, সুসাহিত্যিক তার কবিতাও বেশ উৎকৃষ্ট মানের। রজব মাসের শুরুতে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন এবং খায়যুরান কবরস্থানে ইমাম আবূ হানীফার কবরের পাশে তাকে সমাহিত হন।

৬২৪ হিজরী সন শুরু

এ বছর তাফসীরবাসীরা তাদের শাসক জালালুদ্দীন অনুপস্থিতির সুযোগে জর্জিয়ানদের আহ্বান জানায় তাদের শহর দখল করে নেয়ার জন্য। ফলে তারা সেখানে এসে পাইকারী তথা গণহারে হত্যাযজ্ঞ চালায়, তাদের তরবারির আঘাত থেকে সাধারণ বিশেষ কেউই নিস্কৃতি পায়নি। এ সময় তারা শহর লুণ্ঠন ও বিরাণ করে জ্বালিয়ে দেয় এবং নারী ও শিশুদের যুদ্ধ বন্দী করে। সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি তাদের নাগাল পাননি।

এছাড়া এ বছর ইসমাইলীরা জালালুদ্দীন ইবন্ খাওয়ারিযান শাহের একজন বিশিষ্ট আমীরকে হত্যা করে। তখন তিনি তাদের ভূখণ্ডের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাদের থেকে এর

প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি তাদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করেন, তাদের শহর বিরাণ করেন, নারী শিশুদের যুদ্ধ বন্দী করেন এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন। আর তারা 'আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করুন–তাতারী আক্রমনের সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করে। এমনকি প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল তাতারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর।

আর এ বছর সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে তাতারীদে বিরাট একটি দলের লড়াই সংঘটিত হয়। এ লড়াইয়ে তিনি তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং বহুসংখ্যাক বন্দী করেন। এ সময় তার কাছে সংবাদ আসে যে, তাদের আরেকটি দল তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে। তখন তিনি সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আর তার সাথে তাতারীদের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ ৬২৫ হিজরীর বর্ণনায় আসবে। এদিকে এ বছরই মালিক আশরাফ ইবন্ আদিলের সৈন্যবাহিনী আযারবাইজানে প্রবেশ করে, তারা সেখানে বহু শহরের কর্তৃত্ব লাভ করে এবং বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ অর্জন করে। এ সময় তারা তাদের সাথে জালালুদ্দীনের স্ত্রী তুগরুল কন্যাকে তাদের সাথে নিয়ে বের হয় এজন্য যে, তার প্রতি তারা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত এরপর তারা তাকে খালাত শহরে অবস্থান করান। তাদের বিস্তারিত অবস্থা আগামী বছরের বর্ণনায় আসবে।

এ ছাড়া এ বছর খ্রিষ্টান সম্রাট আনবূরের দূত সমুদ্র পথে সুলতান মুআযযমের দরবারে আগমন করেন, তিনি এসে ঐ সকল উপকূলীয় ভূখণ্ড তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানান, যা তার পিতৃব্য সুলতান সালাহুদ্দীন দখল করেছিলেন। তখন সুলতান মুআযযম তাদেরকে এর কঠোর জওয়াব দেন। তিনি ঐ দূতকে বলেন, তোমরা সম্রাটকে গিয়ে বল, আমার কাছে তরবারি ছাড়া আর কোনো জওয়াব নেই। আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এছাড়া এ বছর সুলতান আশরাফ তার ভাই শিহাবুদ্দীন গাযীকে বিশাল এক বহরসহ হজ্জে প্রেরণ করেন। সেই বহরে ছিল ছয়শত ভারবাহী উট, এছাড়া তার সাথে ছিল পঞ্চাশটি উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া, যার প্রতিটি ঘোড়ার আরোহী ছিল একজন ক্রীতদাস। তিনি ইরাক অঞ্চলে থেকে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে তার কাছে খলীফার উপহার উপঢৌকন আসতে থাকে এরপর তিনি তার হজ্জের পথে ফিরে আসেন। এছাড়া এ বছর বাগদাদে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাজমুদ্দীন আবুল মাআলী 'আব্দুর রহমান ইবন্ মুকবিল আলওয়াসিতী। এক সময় তাকে তৎকালীন শাসকদের রীতি অনুযায়ী রাজ-পরিষদ প্রদান করা হয়। আর এটা ছিল এক স্মরণীয় দিন। আর এ বছর দজলা ফোরাত মধ্যবর্তী উপদ্বীপ অঞ্চলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি তীব্র আকার ধারণ করে এবং গোশতের আকাল দেখা দেয়, এমন কি ইবন্ আছীরের বর্ণনা মতে, বসন্তকালের কোনো একদিন গোটা মাওসিল শহরে একটি মাত্র ছাগল জবাই করা হয়। তিনি আরও বলেন, এ বছর মার্চ মাসের দশ তারিখ দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে এবং ইরাকের অন্যান্য স্থানে দুবার প্রচুর বরফপাত হয়। ফলে বিপুল পরিমাণ ফল-ফসল ইত্যাদি নষ্ট হয়। আল্‌বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : এটা অভিনব ঘটনা পূর্বে কখনও এমন ঘটেনি। কেননা ইরাকের আবহাওয়া হল– অত্যন্ত উষ্ণ, সেখানে কীভাকে বরফপাত হল, তা বিরাট আশ্চর্যের বিষয়। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

চেঙ্গিস খান

ইনি হলেন তাতারীদের মহামান্য সম্রাট এবং তাদের বর্তমান সম্রাটদের পিতৃপুরুষ, এবং তারা তাঁরই পিতৃপরিচয় বহন করে। তিনিই তাদের জন্য ঐ শাসন ব্যবস্থার ভীত্ রচনা করেন, যা দ্বারা তারা শাসনকার্য পরিচালনা করে, যার অধিকাংশই আল্লাহ্‌র কিতাব ও বিধি-বিধানের পরিপন্থী। এটা ছিল তার মনগড়া শাসন বিধান, আর তারা এ ক্ষেত্রেই তাকে অনুসরণ করেছিল।

তার মায়ের দাবী ছিল, সে তাকে সূর্যালোক থেকে গর্ভধারণ করেছে, এ কারণে তার কোনো পিতৃপরিচয় নেই। আর বাহ্যতই বোঝা যায় যে, তার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, অর্থাৎ সে অবৈধ জারয সন্তান। আল্‌বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আমি বাগদাদে ওযীর আলাউদ্দীন জুয়ায়নীকে তার জীবনী বিষয়ে একটি সংকলন প্রস্তুত করতে দেখেছি, সেখানে তিনি তার জীবনী সংকলনে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি তার রাজনৈতিক বুদ্ধি, মহত্বে, বীরত্ব, রাজ্য ও প্রজা শাসন দক্ষতা এবং সমর কুশলতার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, চেঙ্গিস খান তার প্রথম জীবনে বাদশাহ উযবেক খানের বিশেষ পাত্র ছিল। সে সময় সে ছিল এক সুদর্শন যুবক। প্রথমত তার নাম ছিল তুমরজী। অতঃপর যখন তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তখন সে নিজেকে চেঙ্গিস খান হিসেবে নামকরণ করে। প্রথম জীবনে সে সুলতান উযবেক খানের প্রিয়পাত্র ও নিকট সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা তাকে সহ্য করতে না পেরে উযরেক খানের কাছে তার বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে তাকে তার দরবার থেকে বহিষ্কার করে। তবে তিনি তাকে প্রাণে হত্যা করেননি। কেননা, তার বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অপরাধই প্রমাণ করা যায়নি। চেঙ্গিস যখন উযবেক খানের দরবার থেকে নির্বাসিত হয়, সে সময় উযবেক খান তার দুজন অল্পবয়স্ক গোলামের প্রতি রুষ্ট হন, তখন তারা পালিয়ে চেঙ্গিস খানের আশ্রয় গ্রহণ করে, এ সময়ে চেঙ্গিস খান তাদের দুজনকে সসম্মানে তাদেরকে আশ্রয় ও আতিথ্য দান করে। এ সময় তারাই তাকে জানায় যে, উযবেক খান তাকে হত্যার গোপন ইচ্ছা পোষণ করেন। এরপর চেঙ্গিস খান এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনে তৎপর হয়। তখন তাকে অনুসরণ করে তাতারীদের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী, এ সময় উযবেক খানের বহু অনুসারী তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে আসতে থাকে তখন সে তাদেরকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করতে থাকে, এভাবে তার অনুসারী বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং শক্তি ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অতঃপর সুযোগ বুঝে চেঙ্গিস খান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় উযবেক খানের বিরুদ্ধে এবং এই যুদ্ধে সে তাকে পরাজিত ও হত্যা করে তার রাজ্য দখল করে নেয়। তখন তার নিজের যোদ্ধা বাহিনীর সাথে যুক্ত হয় নিহত উযবেক খানের যোদ্ধাবাহিনী। ফলে তার সমরশক্তি ও কর্তৃত্ব দ্বিগুণ হয় এবং তার বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তুর্কীদের সকল গোত্র তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার অনুসারী হয়ে যায়, এমনকি তার নিয়মিত যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় আট লাখে।

সংখ্যা বিচারে সর্ববৃহৎ গোত্র ছিল তার নিজের গোত্র কায়ান। তারপর তার সবচে কনিষ্ঠ ছিল দুটি বড় গোত্র, তারা হল–আযান এবং কুরকূরান। চেঙ্গিস খান বছরের তিন মাস কাটাত শিকার করে আর অবশিষ্ট সময় ব্যয় করত যুদ্ধ ও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য।

শায়খ জুওয়ায়নি বলেন, চেঙ্গিসখান বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের পরিধি নিয়ে শিকারের জন্য ফোর দিতেন। অতঃপর ধীরে ধীরে সংকুচিত করে আনতেন। ফলে সেখানে অসংখ্য ও নানা প্রকার প্রাণীকুলের সমাবেশ হতো।

এরপর তার মাঝে এবং সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের মাঝে, যিনি খোরাসান, ইরাক, আযারবাইজান ইত্যাদি এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন, যুদ্ধ সংঘটিত হয় ঐ যুদ্ধে চেঙ্গিস খান তাকে পরাজিত, পর্যুদস্ত ও লুণ্ঠন করে। এবং পুত্রদের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে তার [সুলতান আলাউদ্দীনের] শাসনকৃত তাবৎ ভূখণ্ড অধিকার করে নেয়, যেমনটি আমরা ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। চেঙ্গিস খানের রাজত্বের সূচনা ছিল ৫৯৯ হিজরী, আর খাওয়ারিযম শাহের বিরুদ্ধে তার লড়াই ছিল ৬১৬ হিজরীর সময়ে। আর খাওয়ারিযম শাহ ৬১৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। ফলে চেঙ্গিস খান কোনো প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সব দখল করে নেয়। তার মৃত্যু ঘটে ৬২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ তার মরদেহ একটি লৌহ-কফিনে রেখে তাকে লৌহ শেকল দ্বারা বেঁধে স্থানীয় দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর তার 'আলয়াসা' নামক গ্রন্থ দুইখণ্ডে পুরো হস্তাক্ষরে লিখিত হয় এবং তা তাদের সাথে সাথে উটের পিঠে বহন করা হতে থাকে। কোনো কোনো জীবনীকার উল্লেখ করেছেন, যে, চেঙ্গিস খান বারবার পাহাড়ে উঠত এবং নামত। পরিশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেত। এবং এ সময় তার মুখনিঃসৃত কথা লিখে রাখার জন্য তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের নির্দেশ দিত। এ কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে বলা যায়, শয়তান তাকে দিয়ে কথা বলাত। জুওয়ায়নী বলেন, তাদের উপাসকদের কেউ কেউ তখন নির্জনে উপাসনার জন্য তীব্র শীত উপেক্ষা করে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করত, তখন তারা কোনো লোককে বলতে শুনতঃ আমরা চেঙ্গিস খান এবং তা বংশধরদের পৃথিবী শাসনের কর্তৃত্ব দান করেছি। জুওয়ায়নী বলেন, মোগল বংশের বয়োবৃদ্ধরা একথা বিশ্বাস করতেন এবং এতে অবধারিত মনে করতেন।

এই আলোচনার পর ঐতিহাসিক জুওয়ায়নী আলয়াসা গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন : ব্যভিচারীকে হত্যা করা হতো, সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক তদ্রূপ সমকামীকেও হত্যা করা হতো। হত্যা করা হতো তাকে যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে, যে যাদুটোনা করতো, অথবা গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হতো তাকেও হত্যা করা হতো। বিবাদমান দুই ব্যক্তির বিষয়ে কেউ অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে, কিংবা কেউ স্থির পানিতে পেশাব করলে অথবা ডুব দিলে তাকে হত্যা করা হতো। তদ্রূপ অনুমতি ব্যতীত কেউ যদি কোনো বন্দীকে পানাহার করায় অথবা পোশাক পড়ায়, তাকে হত্যা করা হতো। কাউকে পলায়ন করতে দেখেও সে তাকে ফেরাতো না, তাকে হত্যা করা হতো। আর যে কোন বন্দীকে খাওয়াতো অথবা তাকে কোন খাবার ছুঁড়ে দিতো, তাকে হত্যা করা হতো। বরং সে হাত দিয়ে অন্যের হাতে তুলে দিতো। যদি কেউ কাউকে কিছু খাওয়াতে চায়, তবে সে নিজে যেন প্রথমে তা থেকে খায়, যদি সেই ব্যক্তি বন্দী না হয়ে আমীর হয়। সে নিজে যেন বিত্ত তার সাথের লোককে খাওয়ান না, তাকে হত্যা করা হবে। যে কোন প্রাণিকে জবাই করতো, তাকেও সেভাবে জবাই করা হতো। অতঃপর তার পেট ছিড়ে হৃৎপিণ্ড বের করা হতো।

এ সকল বিধি-বিধানের সবগুলিতেই আল্লাহ্‌র নবীদের আনীত শরীয়তের বিরোধিতা বিদ্যমান। আর একথা সুনিশ্চিত যে সে ব্যক্তি শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত সুব্যবস্থা শরীয়তের বিদান থেকে বিমুখ হয়ে অন্য কোনো বিধানের অনুসরণ করে, সে নিশ্চিত কুফরীতে লিপ্ত হয়। সুতরাং যে তথাকথিত বিধান-গ্রন্থ 'আলয়াসার' দ্বারস্থ হয় এবং হয় এবং তাকে ইসলামী শরীয়তের উপর প্রাধান্য দেয়, তার পরিণতি কী হতে পারে? এরূপ ব্যক্তির কাফির হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলমানের ইজ্জত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون.

–"তবে কি তারা জাহেলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী গোষ্ঠীর জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে কে শ্রেষ্ঠ?

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما.

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিপদ-আপদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"

–তাতারীদের অন্যতম শিষ্টাচার হল সুলতান বা সম্রাটের যথাসাধ্য আনুগত্য করা, এবং তার সামনে তাদের সুন্দরী কুমারীদের উপস্থিত করা, যেন তিনি তার নিজের জন্য এবং তার একান্ত সহচরদের জন্য যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারেন। তাদের রীতি হল সুলতানের নাম ধরে সম্বোধন করা। কেউ যদি এমন মানুষের পাশ দিয়ে যায়, যারা যাচ্ছে তবে সেও বিনা অনুমতিতে তাদের সাথে যেতে পারতো, তবে সে যেন আগুনের চুলা কিংবা খাবারের পাত্র ডিঙিয়ে না যায়। পরিধেয় কাপড় যথেষ্ট পরিমাণ ময়লা না হলে তা ধোয়া যাবে না এবং কোনো মৃত ব্যক্তির অর্থ সম্পদের কিছু নেয়া যাবে না।

ঐতিহাসিক আলাউদ্দীন জুওয়ায়নী চেঙ্গিস খানের অনেক বিষয় এবং তার স্বভাবগত বিভিন্ন মহানুভবতা ও উদারতার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সে তার আল্লাহ প্রদত্ত আকল বুদ্ধির সাহায্যে গ্রহণ করেছিল, যদিও সে মুশরিক ছিল এবং আল্লাহ্‌র সাথে গায়রুল্লাহর উপাসনা করত। বিভিন্ন লড়াই ও যুদ্ধে সে যে কত অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে, তার সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তবে এর সূচনা হয়েছিল খাওয়ারিযম শাহের পক্ষ থেকে। বর্ণিত আছে যে, চেঙ্গিস খান একবার তার একদল বাণিজ্য প্রতিনিধিকে বহু বাণিজ্য সম্ভার দিয়ে তার পক্ষ থেকে এবং তার রাজ্য থেকে প্রেরণ করে। তারা যখন ইরান সীমান্তে পৌছে, তখন সেখানে নিযুক্ত খাওয়ারিযম শাহের গভর্নর তাদেরকে হত্যা করে, এই ব্যক্তি হল কুশলাই খানের শ্বশুর, সে বণিকদলের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। তখন চেঙ্গিস খান দূত মারফত খাওয়ারিযম শাহের কাছে এ বিষয়টি জানতে চায় যে, এই ঘটনাটি তার সম্মতিতে ঘটেছে, নাকি তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না। এই হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে দূত মারফত চেঙ্গিস খান বলে পাঠায়। রাজা বাদশাদের রীতি হল ব্যবসায়ী ও বণিকদের হত্যা না করা। কেননা, তাদের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ড সচল থাকে। এছাড়া তারা রাজা বাদশাদের কাছে মূল্যবান উপহার উপঢৌকন বহন করে নিয়ে যায়। আর এই বণিকদল ছিল আপনার ধর্মের অনুসারী, কিন্তু আপনার গভর্নর তাদেরকে হত্যা করেছে। যদি এই হত্যাকাণ্ড আপনার নির্দেশে হয়ে থাকে, তবে আমরা তাদের রক্তপণ চাই, অন্যথায় আপনি আপনার গভর্নর থেকে এর 'কিসাস' ও প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। চেঙ্গিস খানের দূতের মুখে যখন খাওয়াবিয়ন শাহ একথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি এর কোন মৌখিক উত্তর না দিয়ে ঐ দূতের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আর খাওয়ারিযন শাহের এই আচরণ ছিল আত্মঘাতী, বার্ধক্যের কারণে তিনি অনেকটা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। অথচ হাদীসে এসেছে : اتركوا الترك ما تركوكم অর্থাৎ তোমরা তুর্কীদেরকে এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে এড়িয়ে চলে।"

এদিকে চেঙ্গিস খানের কাছে যখন তার দূত হত্যার সংবাদ পৌঁছিল তখন সে খাওয়ারিযান শাহের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করল অতঃপর যুদ্ধ করে দেশ জয় করে নিল। তখন অশ্রুপূর্ব অভিনব এবং বীভৎস সব ঘটনার জন্ম হল।

ঐতিহাসিক জুওয়ায়নি উল্লেখ করেছেন যে, একবার জনৈক কৃষক চেঙ্গিস খানকে তিনটি বাঙ্গি উপহার দিল, আর ঘটনাক্রমে এ সময় তার কাছে খাজাঞ্চীদের কেউ ছিল না, তাই সে তার স্ত্রী খাতুনকে বলল : তোমার কানের দুল জোড়া তাকে দিয়ে দাও। এই দুল জোড়ায় ছিল মূল্যবান দুটি পাথর, তাই সে বলল : আপনি তাকে আগামীকাল আসতে বলুন। তখন সে (চেঙ্গিস খান) বলল : তাহলে সে উদ্বিগ্ন অবস্থায় রাত যাপন করবে, আর হয়ত এরপরে তাকে কিছু দেওয়া হবে না। আর তোমার এই দুল দুটি যেই কিনবে সেই আবার তোমার কাছে তা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। একথা শোনার পর চেঙ্গিস পত্নী তার দুল জোড়া খুলে চাষী-কে দিয়ে দিল। এই মহামূল্যবান দুল জোড়া পেয়ে চাষী আনন্দে আত্মহারা হল এবং তা নিয়ে গিয়ে জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রি করল। এরপর ব্যবসায়ী তা সম্রাটকে ফিরিয়ে দিল এবং সে তখন সে দুটি স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিল। তার বদান্যতা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জুওয়ায়নি আবৃত্তি করেন :

যদি কেউ একথা বলে যে, সমুদ্র এবং বৃষ্টি তার বদান্যতার সদৃশ, তাহলে তো সে এদের অনেক প্রশংসা করল।

অন্যত্র বর্ণিত আছে, একবার চেঙ্গিস খান, বাজার অতিক্রমকালে এক ফল বিক্রেতার কাছে চমৎকার কিছু আঙুর দেখতে পেয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হলেন। তখন তিনি তার প্রহরীকে এক বালিশের বিনিময়ে কিছু আঙুর কিনে আনতে বললেন, তখন প্রহরী সিকি বালিশের আঙুর কিনে আনল। অতঃপর সে তখন আঙুরগুলো তার সামনে রাখল, তখন তার মান ও পরিমাণ তাকে মুগ্ধ করল। তিনি বললেন : এ সবটুকু মাত্র এক পলিশে? তখন সে বলল : এটাতো মাত্র সিকি পলিসে! তার একথা শুনে চেঙ্গিস খান রেগে গিয়ে বললেন : আমার মত লোক কি তার থেকে বারবার কিনবে? তাকে পুর্ণ দশ পলিশ দিয়ে দাও।

একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি সুদৃশ্য কাঁচের পানপাত্র উপহার দিল, পাত্রটি চেঙ্গিস খানের খুব পছন্দ হল, তখন তার নিকট সহচরদের একজন বিষয়টিকে তাচ্ছিল্য করে বলল :

জাঁহাপনা! এটা তুচ্ছ কাঁচের পাত্র, এর কী ই বা মুল্য আছে? একথার উত্তরে চেঙ্গিস খান বললেন : সে কি দূর দেশ থেকে অক্ষত অবস্থায় আমাদের কাছে তা বহন করে নিয়ে আসেনি? তাকে দুশ পলিশ (মুদ্রা) দিয়ে দাও। তার সম্পর্কে আরও বর্ণিত আছে, একবার তাকে বলা হলঃ এই স্থানে বিশাল ধনভাণ্ডার লুকানো রয়েছে, যদি আপনি তা উন্মুক্ত করেন, তাহলে বিপুল ধনরত্ন পাবেন। তখন তিনি বললেন : আমাদের কাছে যা আছে তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এটাকে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দাও, তারা তা দ্বারা উপকৃত হোক। কেননা, তারা এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে বেশি হকদার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তার রাজ্যে এক শুকি সম্পর্কে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে সে বলে আমি একটি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, তবে আমি তা আকান [চেঙ্গিস খান] ব্যতীত অন্য কাউকে বলব না, আমীর উমারাগণ তাকে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু সে তাদের কাউকে তা জানাল না। তখন তারা খাকানের কাছে তা উল্লেখ করল, অতঃপর ডাক বিভাগের বাহনে তাকে উপস্থিত করা হল। সে যখন খাকানের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তিনি তাকে গুপ্তধনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে বলল : আপনাকে সামনা সামনি দেখার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছি। তখন খাকান তার এই কথা পরিবর্তনে রুষ্ট হয়ে বললেন : তাহলে তো তোমার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হয়েছে, অতঃপর তিনি তাকে নিরাপদে ছেড়ে দিলেন, তবে তাকে কিছু প্রদান করলেন না। একবার এক ব্যক্তি তাকে একটি আনার উপহার দিল। তখন তিনি তা ভেঙে তার দানাগুলি উপস্থিত লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন এবং তার দানার সমসংখ্যক পলিশ বা (মুদ্রা) তাকে প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সে আবৃত্তি করলো :

"একারণেই তার দরবারে দান প্রার্থীদের অমন ভিড়, যেমন ভিড় করে থাকে আনার দানাসমূহ আনারে।"

বর্ণিত আছে, একবার জনৈক কাফির তার কাছে এসে বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, খাকান বলছেন : তোমরা মুসলমানদের হত্যা কর। একথা শুনে তিনি বললেন : এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং তিনি সে লোকটিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

অন্য এক ঘটনায় তাদের বিধানগ্রন্থ অনুযায়ী তিনি একবার তিন ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। এমন সময় দেখা গেল, একজন স্ত্রীলোক মাতম করে কাঁদছে। তখন তিনি বললেন, কী ব্যাপার? তাকে হাযির কর, হাযির হয়ে স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল, এ আমার পুত্র, এ আমার ভাই, এ আমার স্বামী। তার কথা শুনে চেঙ্গিস খান বললেন : তিনজনের সে কোন একজনকে বেছে নাও, আমি তাকে মুক্ত করে দিব। তখন সে বলল : আমি স্বামী হারালে স্বামী পাব, সন্তান হারালে সন্তান পাব কিন্তু ভাইয়ের কোন বিকল্প নেই। তার একথায় তিনি চমৎকৃত হলেন এবং বন্দী তিনজনকেই মুক্ত করে দিলেন।

এছাড়া তিনি কুস্তিগির এবং কুশলী চতুর লোকদের পছন্দ করতেন, তার দরবারে এদের একটি দল ছিল। একবার খোরাসানের এক কুস্তিগির সম্পর্কে তাকে বলা হল, তখন তিনি তাকে হাযির করলেন। অতঃপর সে কুস্তিতে উপস্থিত সকলকে পরাজিত করল। ফলে তিনি রাজ দরবারে সম্মানিত করলেন এবং জনৈক সুন্দরী রাজকন্যা দান করলেন। অতঃপর বেশ কিছুদিন

পর ঐ রাজকন্যার সাথে খাকানের সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন কুস্তিগিরকে কেমন দেখলে? তখন সে বলল : সে তো আমার কাছেই আসেনি। তখন তিনি অবাক হয়ে লোকটিকে তার সামনে হাযির করতে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল : হে খাকান। আমি তো আপনার কাছে চতুরতা ও কৌশল দ্বারা সম্মান লাভ করেছি, কিন্তু আমি যদি তার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে যাই, তাহলে আপনার কাছে আমার মর্যাদাহানি ঘটবে, তখন তিনি বললেন : তোমার কোনো অসুবিধা নেই। এরপর সে তারই মত কুস্তিগির তার এক চাচাত ভাইকে উপস্থিত করল। তখন তারা দুজন কুস্তি লড়তে চাইলে সুলতান বললেন : তোমরা পরস্পর নিকটাত্মীয় তোমাদের মাঝে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা শোভনীয় নয়। অতঃপর তিনি তাকে আকর্ষণীয় পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

বর্ণিত আছে, যখন চেঙ্গিস খানের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, তখন তিনি তার পুত্রদেরকে সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকার উপদেশ দিলেন, এবং তাদের দ্রব্য একাধিক উদাহরণ তুলে ধরলেন। এ সময় তিনি তার সামনে অনেকগুলি তীর আনালেন, অতঃপর তাদের একজনকে একটি তীর দিলেন এবং সে তা ভেঙে ফেলল, এরপর এক আঁটি নিলেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে তা ভাংতে বললেন, কিন্তু তারা তা ভাংতে পারল না। তখন তিনি বললেন : এটাকে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মলিত থাকার উদাহরণ। আর সেটা হল তোমাদের অনৈক্য ও বিভেদের উদাহরণ।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, চেঙ্গিস খানের বহুসংখ্যক পুত্র কন্যা ছিল। এদের মধ্যে চারজন ছিল তার পুত্রদের মাঝে বিশিষ্ট এরা হলো : যূসা, হারীওয়াল, বাতূবীরাকা এবং তারকাজার এদের প্রত্যেকের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কাজ ছিল। এরপর ঐতিহাসিক জুওয়ানী হালাকুখানের সময় পর্যন্ত তার বংশধদের সাম্রাজ্যের ব্যাপারে কথা বলেছেন। সে তার নামের ব্যাপারে বলত যায়শাহ যারাহ হালাকূ। এছাড়া জুওয়ানী তার সময়কালের যে সকল অদ্ভুত ও অভিনব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন, যেমন আমরা ঘটনাবলীর বর্ণনায় তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

সুলতান মুআযযম

'ঈসা ইবন্' আদিল আবু বকর ইবন্ আয়্যুব যিনি ছিলেন সাম ও দিমাশকের শাসক। তিনি এ বছর জিলকদ মাসের শেষ অংশে ইনতিকাল করেন। আর তিনি দিমাশকের পূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন তার পিতার মৃত্যুর বছর অর্থাৎ ৬১৫ হিজরীতে তিনি ছিলেন জ্ঞান ও গুণের অধিকারী, নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তি। তিনি তৎকালীন বিশিষ্ট 'আলিম হুসায়রীর কাছে ফিক্‌হে হানাফী এবং তাজ কিন্‌দীর কাছে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। আল্লামা যাসাখশারীর নাহব শাস্ত্রের গ্রন্থ আল্‌সুফাসসাল তার কণ্ঠস্থ ছিল। আর যে তা সম্পূর্ণ মুখস্থ করতে পারত, তিনি তাকে তিরিশ দীনার পুরস্কার দিতেন। একবার তিনি নির্দেশ প্রদান করেন তার জন্য আল্লামা জাওয়াহীরার সিহাহ, ইবন্ দুয়ায়দের জামহারা, আযহারীর তাহযীব এবং অন্যান্য গ্রন্থ একত্র করে আরবি ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সংকলন করতে। এছাড়া তিনি মুসনাদে আহমাদ নতুন বিন্যাসে সংকলন করারও নির্দেশ দেন।

আলিম উলামাদের প্রতি তার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সব সময় তিনি কল্যাণের অনুগামী থাকার চেষ্টা করতেন এবং বলতেন : আমি হলাম ইমাম তাহাভীর আকীদার অনুসারী। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করেন যে, তাকে যেন অবশ্যই সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়, তার জন্য যেন বদলী কবর খনন করা হয়, তাকে যেন মরুপ্রান্তরে দাফন করা হয় এবং তার কবরের উপর যেন কোনো চিহ্ন নির্মাণ করা না হয়।

দিনয়াত যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলতেন, আমি তাকে আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত রাখতে চাই, এবং আশা করি আল্লাহ আমাকে তার কারণে রহম করবেন– অর্থাৎ তিনি এই যুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করেন–। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

তিনি একাধারে বীরত্ব, জ্ঞান, কর্মকুশলতা, ও জ্ঞানীদের প্রতি ভালবাসার অধিকারী ছিলেন। প্রতি শুক্রবার তিনি তার পিতার সমাধিতে আসতেন এবং সামান্য সময় সেখানে অবস্থান করতেন, যখন মুআয্যিনগণ তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন, তখন তিনি সেখান থেকে তার পিতৃব্য সালাহুদ্দীনের সমাধিতে গমন করতেন। অতঃপর তিনি জুম'আর নামায আদায় করতেন। তিনি সাধারণভাবে চলাচল করতেন, কখনও কখনও একাকী বাহনে আরোহণ করতেন। অতঃপর তার কোন অনুচর গিয়ে তার বাহনের পিছে পিছে তাকে অনুসরণ করতেন। তার ব্যাপারে তার এক সঙ্গী মুহিববুদ্দীন ইবনে আবূস সাউদ বাগদাদী আবৃত্তি করেছেন : সকল সদগুণ যদি পৃথিবীতে জীর্ণ হয়ে যায়, তবুও তোমার প্রতি আমার আসক্তি জীর্ণ হতো না। তোমাকে হারানোর পর থেকে যখনই আমি কোন বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি, তখনই তুমি আমার অন্তরে উদিত হয়েছ।

তারপর তার পুত্র নাসের দাউদ ইবন্ মুআযযম দিমাশকের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং আমীর উমারাগণ তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

আবুল সাআলী আসআদ ইবন্ যাইইয়ার

ইনি হলেন মূসা ইবন্ মানসুর ইবন্ 'আব্দুল আযীয ইবন্ ওয়াহব তিনি শাফেয়ী ফকীহ এবং বোখারার অধিবাসী, বিশিষ্ট গুণী সাহিত্যিক ছিলেন। তার রয়েছে চমৎকার গদ্য ও পদ্য সংকলন। তিনি নব্বই বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। হাসা শহরে শাসনকর্তা তাকে ওযীর নিয়োগ করেন। তার রয়েছে চমৎকার কবিতা। ইবনুস সায়ী সেখান থেকে উৎকৃষ্ট কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হলো যা তার অন্তরে সান্ত্বনা উদ্রেব করে, আর প্রণয় ভুবনে তো তুমিই তার অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। কোন কোটনা যখন তার নামে তোমার কাছে কোটনামী করে, তখন তোমার প্রেমাষ্পদকে প্রশ্ন কর, কেননা তা হল তার ব্যাধি। আর গুরুতর ব্যাধির কি কোনো সাক্ষ্য নেই, যা তোমাকে তাকে কোন প্রশ্ন করা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে?

তুমি তো তোমার অসুস্থতার পরিধেয়কে নবায়ণ করেছো, তার প্রণয়াবরণ উন্মোচন করেছো এবং মিলন বন্ধন ছিন্ন করেছো। ঐ বন্দীর ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত, যার রীতি হলো মুক্ত ব্যক্তির জন্য নিজের জান মাল কুরবান করা।

অন্যত্র তিনি বলেন : ভর্ৎসনাকারীরা প্রেমাস্পদের ব্যাপারে তোমাকে অনেক ভর্ৎসনা করেছে আর সান্ত্বনাকাল হাশরের দিনতো বহুদূরে।

হৃদয়সমূহে তোমার অবস্থান সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থেকেছে, যদি তারা আমার মত প্রেমাস্পদ হতো, তাহলে ভর্ৎসনা হ্রাস করতো।

প্রেমের শিষ্টতা ও হিম্মতায় ধৈর্য ধর, কেননা প্রেমাক্ত যেমন ভর্ৎসনা করা হয়, তেমনি নিরুপায়ও ভাবা হয়।"

আবুল কাসিম 'আব্দুর রহমান ইবন্ মুহাম্মাদ

ইনি হলো ইবন্ আহমাদ ইবন্ হামদান আত্তিবরী যিনি 'সাহিন' নামে পরিচিত তিনি নিযামিয়া মাদরাসার অন্যতম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এক সময় তিনি ছাকাফিয়্যা মাদরাসায় পাঠদান করেন। তিনি মাযহাব, ফারায়েয ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আত্তাম্রীহের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলন করেন। ইবনুস সাযী তা উল্লেখ করেছেন।

আবুন নাজ্ম মুহাম্মাদ ইবন্ কাসিম ইবন্ হিকাতুল্লাহ তিকরীতা

ইনি হলেন শাফেয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি আবুল কাসিম ইবন্ ফাযলানের নিকট ফিক্হ শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিযামিয়্যাতে অধ্যয়ন করেন এবং অন্যত্র পাঠদান করেন। তিনি দৈনিক বিশটি দরস প্রদান করতেন। রাত দিনে এই দরস প্রদান এবং তিলাওয়াতে কুরআন ব্যতীত তার কোন ব্যস্ততা ছিল না। তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী কুশলী ইমাম, বিভিন্ন মাযহাব ও তার বিরোধ বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। 'তিন তালাকের' বিতর্কিত মাসআলাতে তিনি 'এক তালাকের ফাতওয়া দিতেন। ফলে মদীনার কাযী আবুল কাসিম 'আবদুল্লাহ ইবন্ হুসায়ন দামগানী তার প্রতি রুষ্ট হন। কিন্তু তিনি তার মতে অবিচল থাকেন। অতঃপর তাকে তিকরীতে প্রেরণ করা হয়, ফলে তিনি সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর তাকে বাগদাদে ডেকে পাঠান হয়। তারপর তিনি পুনরায় দরস প্রদানের কাজে মশগুল হন এবং প্রধান বিচারপতি নাসর ইবন্ আব্দুর রাযযাক নিযামিয়্যা তাকে মুয়ীদে দরস নিয়োগ করেন এবং তিনি তার পূর্বের সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার দরস প্রদান ও ফাতওয়া প্রদানের কাজে যুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার এই ব্যস্ততা অব্যাহত ছিল। আল্লাহ তাকে রহম করুন। ইবনে সাযী এটা উল্লেখ করেছেন।

৬২৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর সুলতান জালালুদ্দীন এবং তাতারীদের মাঝে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়। তারা একাধিকার তাকে পর্যুদস্ত করেন। তবে পরিশেষে তিনি তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করেন এবং তাদের অগণিত যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এই তাতারীরা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং চেঙ্গিস খানের অবাধ্য। তাদের সম্পর্কে চেঙ্গিস খান সুলতান জালালুদ্দীনকে লিখে পাঠান যে, এরা আমাদের দলভুক্ত নয় আমরা তাদেরকে বিতাড়িত করেছি। তবে আপনি আমাদের এমন যোদ্ধাদের সাক্ষাৎ অচিরেই পাবেন, যাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সামর্থ আপনার নেই।

এছাড়া এ বছর সিসিলী দ্বীপের দিক থেকে খ্রিস্টান যোদ্ধাদের একটি বিরাট দলের আগমন ঘটে, তারা এসে 'আক্কা' এবং 'সূর শহরে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ময়দা শহর আক্রমণ করে তা

মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। এ সময় তাদের শক্তি ও দাপট প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া এ সময় সাইপ্রাস দ্বীপের শাসক আলক্রুর এসে 'আক্কা' শহরে অবতরণ করে তখন মুসলমানরা তার অকল্যাণ শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আর আল্লাহই হলেন সাহায্যের ক্ষেত্র।

এ বছর সুলতান মিশরাধিপতি সুলতান মুহাম্মাদ ইবন্ 'আদিল বায়তুল মুকাদ্দাসে যাত্রা করেন এবং সেখানে প্রবেশ করার পর নাবলুসের দিকে অগ্রসর হন। তখন নাসের দাউদ ইবন্ মুআয্যাম তার পিতৃব্য কামিল থেকে শঙ্কা অনুভব করেন। তখন তিনি তার অপর পিতৃব্য আশরাফের কাছে প্রেরণ করেন। আর তিনি তখন তার ভাই কানিলের কাছে পত্র প্রেরণ করে তাকে সদয় আচরণ করতে এবং তার ভাতুষ্পুত্রকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। তখন সুলতান কামিল এর উত্তরে লিখে পাঠান, আমি তো এখানে এসেছি খ্রিস্টানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষা করতে যারা তা মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

নিজের ভ্রাতা কিংবা ভাতুষ্পুত্রকে অবরোধ করা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আপনি শামে আগমন করার পর আপনিই তাকে রক্ষা করবেন এবং আমি আমার মিশরীয় ভূখণ্ডে ফিরে যাচ্ছি। তখন সুলতান আশরাফ এবং দিমাশকের অধিবাসীরা আশঙ্কা করলেন যে, সুলতান কামিল যদি ফিরে যান, তাহলে বায়তুল মুকাদ্দাস দখলের প্রতি খ্রিস্টানরা আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। ফলে সুলতান আশরাফ ভৎক্ষণাৎ তার ভাই কামিলের কাছে গিয়ে তাকে ফিরে যেতে নিরুৎসাহিত করলেন। এ সময় তারা দু'ভাই খ্রিস্টানদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষা করার জন্য সেখানে একত্রে অবস্থান করেন। আল্লাহ্ তাদের উভয় বাক্যে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এ সময় সুলতান কামিলের সাথে আরও একাধিক সুলতান যোগ দেন, যেমন তার ভাই সুলতান আশরাফ, সুলতান শিহাবগাযী ইবন্ 'আদিল, সালিহ ইসমাইল ইবন্ 'আদিল এবং হিমেসের শাসনকর্তা আসাদুদ্দীন শেরকে ইবন্ নাসিরুদ্দীন ও অন্যান্যগণ। তারা সকলে নাসের দাউদকে দিমাশকের শাসন কর্তৃত্ব থেকে অপসারণ করে আশরাফ মূসাকে তার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণের ব্যাপারে একমত হন। এছাড়া এ বছরই সদর তিকরীকে দিমাশকের নির্বাহী নিয়ন্ত্রক এবং মাশায়েখ প্রধানের পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং দুটি পদে অন্য দুজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। আবু শামা বলেন, এ বছর রজব মাসের শুরুতে বিশিষ্ট বুযুর্গ ও ফকীহ শায়খ আবুল হাসান আলী ইবন্ মারাকেশী, যিনি মাদরাসা মালিকিয়াতে অবস্থান করতেন, মৃত্যু বরণ করেন এবং খলীল ইবন্ যুওয়ায়জান এর ওয়াকফকৃত করবস্থানে সমাহিত হন। তিনি হলেন এই কবরস্থানে সমাহিত সর্বপ্রথম ব্যক্তি।

৬২৬ হিজরীর সূচনা

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন আয়্যুব বংশীয় শাসনকগণ পরস্পর বিরোধ বিবাদে লিপ্ত এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত। এ সময় তারা কুদ্স শরীফে অবস্থানরত মিশরাধিপতি কামিল [illegible]দের কাছে সমবেত হয়েছিল। এ সময় এ অঞ্চলে অবস্থানরত খ্রিস্টান যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পায় প্রধানত দুটি কারণে এক সমুদ্র পথে আগত খ্রিস্টান যোদ্ধারা তাদের সাথে যোগ দিয়ে

তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানোর কারণে। দুই : সুলতান মুআযফমের মৃত্যু ও তার পরবর্তীতে অন্যান্য সুলতানের মাঝের মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে। ফলে তারা মুসলমানদের কাছে দাবী জানায়, তাদেরকে ঐ ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেয়ার জন্য, যা সুলতান নাসের সালাহুদ্দীন তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তাদের মাঝে এবং মুসলিম সুলতানদের মাঝে এই মর্মে সন্ধি হয় যে, তারা তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দিস ফিরিয়ে দিবেন এবং অবশিষ্ট ভূখণ্ড থাকবে তাদের দখলে। এরপর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তারা বায়তুল মুকাদ্দিসের কর্তৃত্বে গ্রহণ করে। আর ইতোপূর্বে সুলতান মুআযম এর প্রাচীরসমূহ ভেঙে ফেলে এ ঘটনা মুসলমানদের মনে বিরাট আঘাত হানে, তাদেরকে গুরুতর দুর্বলতা এবং মহাশঙ্কায় নিপতিত করে। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এরপর মালিক কামিলের আবির্ভাব ঘটে। তিনি এসে দিমাশক অবরোধ করেন এবং অধিবাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে ছিনতাই ও লুণ্ঠনের উপদ্রব দেখা দেয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

এদিকে সেনাবাহিনী দিমাশকের চারপাশে অবস্থান বহাল রাখে। এমনকি সেখানে থেকে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন মালিক নাসের দাউদ ইবন্ মুআযযামকে সেখানে থেকে এই শর্তে বের করেন যে, তিনি কারাক, মাওবাক এবং নাবলুস শহরে একটি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। আর আমীর ইয্যুদ্দীন হচ্ছেন সরখাদের শাসনকর্তা। অতঃপর সুলতান আশরাফ এবং তার ভ্রাতা সুলতান কামিল রাজ্য বিনিময় করেন। আশরাফ দিমাশকের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন আর তার ভ্রাতাকে হারবান, রাহা, রক্কা, রাসুল আয়ন এবং সারুজ শহরের শাসনভার অর্পণ করেন।

এরপর সুলতান কামিল অগ্রসর হয়ে হামা শহর অবরোধ করেন। এই শহরের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান মানসুর ইবন্ তাকীয়ুদ্দীন উমর, যিনি ইতোমধ্যে ইনতিকাল করেছিলেন এবং তার শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করে গিয়েছিলেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুযাফফর মুহাম্মাদ যিনি ছিলেন সুলতান কানিসের জামাতা। কিন্তু মুযাফফর মুহাম্মাদের ভ্রাতা সালাহুদ্দিন কালাজ আরসালান তা জবরদখল করেন। এ কারণে সুলতান কামিল তার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করেন এবং তাকে শহর দুর্গ ত্যাগ বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি এই শহরের কর্তৃত্ব সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা এবং তার জামাতা মুযাফফর মুহাম্মাদের কাছে অর্পণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে প্রস্থান করে ঐ সকল ভূখণ্ডের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি তার ভ্রাতা সুলতান আশরাফ থেকে দিমাশকের বিনিময়ে লাভ করেছিলেন। দিমাশকবাসীরা সুলতান নাসের দাউদের শাসনামলে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান চর্চায় মশগুল হয়ে উঠে। সুলতান নাসের তা সহ্য করতেন। ফলে কেউ কেউ তার সম্পর্কে প্রশ্রয়ের অভিযোগ উত্থাপন করেন। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। কিন্তু সুলতান আশরাফ শহরে শহরে ঘোষণা প্রস্তাব করেন যে, লোকজন যেন আর এই সকল অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান চর্চায় মশগুল না হয়ে তাফসীর হাদীস এবং ফিকহ চর্চায় মনোনিবেশ করে। এ সময় সায়ফুদ্দীন আবেদী তাযীযিয়্যা মাদারাসায় শিক্ষক ছিলেন। সুলতান আশরাফ তাকে অপসারণ করেন এবং ৬৩১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ গৃহে সার্বক্ষণিক অবস্থান গ্রহণ করেন।

এ বছরই সুলতান নাসের প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন ইবন্ খাওলীর সাথে মুহয়ুদ্দীন য়াহইয়া ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ যাকীকেও সংযুক্ত করেন। কিছুদিন অন্যত্র বিচারকার্য পরিচালনা করার পর ইবন্ খাওলীর অংশীদাররূপে নিজগৃহে তিনি বিচারকার্য সমাধা করতে থাকেন। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

সুলতান মাসউদ ইকসীয় কামিল

এই ব্যক্তি হলেন য়ামানের শাসনকর্তা। এছাড়া তিনি উনিশ বছর মক্কা শাসন করেন। তিনি সেখান থেকে যায়দিয়্যাদের নির্বাসিত করেন এবং তার সময়ে সকল নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং হাজীগণ বিশেষ নিরাপত্তা লাভ করেন। কিন্তু তিনি নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করতেন। এছাড়া তার মাঝে অন্যায় ও অনাচারের প্রবণতা ছিল। তিনি মক্কায় ওফাত লাভ করেন এবং বাবুল মুআল্লায় সমাহিত হন।

ছুতোর মুহাম্মাদ সাবতী

কেউ কেউ তাকে বিশিষ্ট বুযুর্গ গণ্য করতেন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন, তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে দারুয যাকাতের পশ্চিম প্রান্তে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং আল্‌জাবালে সমাহিত হন। তার জানাযায় বহুলোকের সমাগম ঘটে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবুল হাসান 'আলী ইবন্ সালিম

কবি ইবন্ যায়বাক ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মুকাল্লিদ এবাদী। তিনি একাধিকার বাগদাদ আগমন করেন এবং খলীফা মুস্‌তায্‌হির ও অন্যান্যদের প্রশংসা করেন। তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী ও কবি; তিনি প্রেমকাব্য অধিক চর্চা করতেন।

আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ইবন্ সাবির আল্‌হাররানী

তিনি প্রথমত হাররানী, অতঃপর বাগদাদী মুনজামবিকী। তার শাস্ত্রে তিনি ছিলেন কুশলী, তার কবিতাগুলি সূক্ষ্ম ও সুন্দর অর্থপূর্ণ। ইবন্ সায়ী তার বেশ কিছু কবিতা পংক্তি উল্লেখ করেছেন। তার উল্লিখিত সর্বোত্তম কাব্য গ্রন্থটি হল নিম্নের কাব্য খণ্ডটি। যাতে রয়েছে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য বিরাট সান্ত্বনা :

"অমরত্ব প্রত্যাশার কি কোন স্থায়ীত্ব আছে?
আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুই তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো।
মাটি থেকে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে,
দীর্ঘজীবন লাভ করলেও তার শেষ গন্তব্য মাটিই।
সকল মানুষের শেষ ঠিকানা সেখানে,
যেখানে আশ্রয় নিয়েছে তার পিতৃ পুরুষেরা
কোথায় আদম, কোথায় হাওয়া,
তারা কেউই তো অমরত্ব বা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি।
কোথায় হাবীল কোথায় কাবীল

কোথায় তাদের হিংসা-দ্বেষ,
কোথায় নূহ, কোথায় তার কিশ্‌তীর আরোহীগণ
সকলেই আজ সুদূর অতীত
মহাকাল তাকে শিশুর ন্যায় মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছে,
তার দীর্ঘায়ু কোনো কাজে আসেনি
কোথায় আদ, কোথায় তাদের বাগবাগিচা
কোথায় সালিহ কোথায় ছামুদ,
কোথায় বায়তুল্লাহর নির্মাতা ইবরাহীম
যা আজ সম্মানিত তীর্থ গৃহ,
কোথায় য়ুসুফের হিংসুক ভাইয়েরা
কোথায় তাদের ষড়যন্ত্র হিংসুক, হিংসা সবাই অতীত।
কোথায় বাদশা নবী সুলায়মান, কোথায় পিতা দাউদ
একজনের অনুগত ছিল জিন্ন ইনসান,
আর অন্যজনের জন্য লোহাকে করে দেয়া হয়েছিল নরম,
কোথায় ইমরান পুত্র মূসা, তার নয় নিদর্শন ও জলরাশি চিরে স্থলভাগ প্রকাশ পাওয়ার পর
কোথায় মারয়াম তনয় মাসীহ রূহুল্লাহ য়াহূদীরা যাকে হত্যা করার উপক্রম করেছিল।
আর অতীত হয়েছেন শ্রেষ্ঠনবী আহমাদ, যিনি সতেরো জনের দিশারী
এবং তাঁর পবিত্র বংশধরগণ, মাবূদ তাদের প্রতি রহম করুন।
তারা করা অল্প সময়ে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, আর বায়ুর প্রবাহ স্তিমিত হয়ে যায়।

পৃথিবীর যে আগুন পাথরকে প্রজ্বলিত করে, তাও এক সময় স্তিমিত হয়ে যায় এবং প্রবাহমান পানিও আবদ্ধ হয়ে যায়।

তদ্রূপ এমন একদিন আসন্ন যে দিন ভূপৃষ্ঠ নিঃস্তেজ হয়ে পড়বে এবং তাতে ভূকম্পন দেখা দিবে। এগুলি সৃষ্টির মৌলিক উপাদান আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু।

অচিরেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন আমরা হয়ে থাকি, পৃথিবীর বুকে জনক-জাত কেউই থাকবে না। কালের আবর্ত থেকে পথভ্রান্ত দুর্ভাগা এবং মুখয়প্রান্ত সৌভাগ্যবান কেউই রেহাই পাবে না। মৃত্যুদূত যখন তরবারি কোষমুক্ত করে, তখন দাস-মনিব সকলেই অসহায়।

আবুল ফাত্‌হ নাসর ইবন্ আলী বাগদাদী

ইনি হলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন ফকীহ। তার উপাধি ছিল ছা'লার। তিনি মাযহাব ও মাযহাবী বিরোধ বিবাদ চর্চায় সময় ব্যয় করতেন। তার রচিত দুটি কবিতা পঙক্তি হলো :

"আমার দেহ আমার সাথে, আর আত্মা তোমাদের কাছে, তাই বলতে হয় দেহ নিবাসে, আর আত্মা প্রবাসে।

সুতরাং আমার ব্যাপারে সকলে বিস্মিত হোক যে, আমার রয়েছে আত্মাহীন দেহ এবং রয়েছে বিদেশী আত্মা।"

আবুল ফযল জিবরাইল ইবন্ মানসূর

ইনি হলেন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবন্ জিবরীল ইবন্ হাসান ইবন্ গালিব ইবন্ য়াহইয়া ইবন্ মূসা ইবন্ য়াহইয়া ইবন্ হাসান ইবন্ গালিব ইবন্ হাসান ইবন্ আমর ইবন্ হাসান ইবন্ নু'মান ইবন্ মুনযির; যিনি ইবন্ যাতীনা বাগদাদী নামে পরিচিত। তিনি সরকারী দপ্তরের লিখক ছিলেন, বাগদাদে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ভাল মুসলমানে পরিণত হন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী এবং তার ওয়াজ-নসীহতে ছিল মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী, তার অন্যতম উপদেশাবলী হলো :

"তোমার সর্বোত্তম সময় হলো ঐ সময়, যা আল্লাহ্র জন্য, শুধু আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এবং গায়রুল্লাহর চিন্তা-ফিক্র এবং গায়রুল্লাহ প্রত্যাশা থেকে পবিত্র। যতক্ষণ তুমি বাদশার দরবারে থাকবে, ততক্ষণ কোন কাল দ্বারা প্রতারিত হবে না। তোমার হাত নিবৃত্ত রাগ, দৃষ্টি সংযত রাখ, রোজা অধিক রাখ, ঘুম হ্রাস কর, তাহলে তুমি নিরাপত্তা লাভ করবে, তুমি তোমার রবের শোকর আদায় কর, তাহলে তোমার বিষয় প্রশংসিত হবে।"

তিনি অন্যত্র বলেন : সফরের পূর্বেই মুসাফিরের পাথেয় প্রস্তুত করতে হবে। সুতরাং পাথেয় প্রস্তুত কর, তাহলে গন্তব্যে পৌছতে পারবে।" তিনি আরও বলেন : আর কতদিন তুমি উদাসীনতায় ঘুরপাক খাবে, যেন তুমি অবকাশের পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে। ক্রীড়া বিনোদনের বয়স তো অতিক্রান্ত হয়েছে, বার্ধক্যের কালও অতিবাহিত হয়েছে, অথচ তুমি আজও তোমার রবের থেকে তাঁর সন্তুষ্টির আস্থা অর্জন করতে পারনি। বিষয়টি তোমাকে উপনীত করেছে অসহযোগিতা ও অলসতা প্রকাশের বয়সে, অথচ তুমি কার্যকর কিছুই অর্জন করতে পারনি।

তিনি আরো বলেন : তোমার আত্মা বিনীত অথচ তোমার চক্ষু অশ্রুশূন্য, তোমার হৃদয় বিনম্র, অথচ তোমার নফস (মন) লোভী; তুমি নিজের প্রতি অবিচার কর, অথচ তুমিই আবার বেদনা প্রকাশ কর, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি প্রকাশ কর, অথচ অন্তরে আসক্তি পোষণ কর। তোমার যা প্রাপ্য নয় তা দাবী কর, এবং তোমার কাছে যা প্রাপ্য, তা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাক। আপন রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা কর, অথচ সামান্য পশু অনান্য প্রদানে বাধা প্রদান কর। নিজের কুপ্রবৃত্তি সমালোচনা কর অথচ তা ক্রীড়া বিনোদন থেকে নিবৃত্ত হয় না। তুমি গাফেলদেরকে সতর্ক ও জাগ্রত কর, তার নিজে উদাসীনতায় বিভোর হয়ে থাক। নিজের কল্যাণ দ্বারা অন্যকে কল্যাণসমৃদ্ধ কর কিন্তু তোমার নিঃস্ব নফসের (মনের) কোনো কল্যাণ সাধনা কর না, সত্যের চারপাশে ঘুরতে থাক কিন্তু তুমি অসত্যে আসক্ত, সংকীর্ণ পথে হোঁচট খাও, মুক্তির পথ মসৃণ, আর তুমি পাপের কাজে ঝাঁপিয়ে পড় এবং অপরাধীদের জন্য সুপারিশ কর, অল্পে তুষ্টি প্রকাশ কর, অথচ অধিকেও তৃপ্ত হওনা ক্ষণস্থায়ী নিবাসকে আবাদ কর, আর চিরস্থায়ী নিবাসকে বিরান ও বরবাদ কর। সফরের মনজিলে এমনভাবে স্থায়ী আবাস গড়ে তোল, যেন তুমি আর তোমার রবের কাছে ফিরবে না। তোমার ধারণা ও বিশ্বাস যে, তোমাকে কেউ লক্ষ্য করছে না অথচ তোমার আমলসমূহ পর্যবেক্ষকের সামনে উত্থাপিত হবে। তুমি অবলীলায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হও আর সগীরা গুনাহ থেকে সাদধানতা অবলম্বন কর। ক্ষমার প্রত্যাশা কর, অথচ

গুনাহ বর্জন কর না। ভয়াবহাবস্থাসমূহ তোমাকে বেষ্টন করে আছে, অথচ তুমি ক্রীড়া বিনোদনে মত্ত। তুমি মূর্খদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা কর, অথচ নিজেই মূর্খতার নিমজ্জিত হয়ে পড়। এখন তোমার সময় হয়েছে কঠোর ভর্ৎসনা পরিহার করার এবং নীচতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করার। গোপনীয়তা অবলম্বনকারীরা রওয়ানা হয়ে গেছে, আর তুমি পিছিয়ে পড়েছে, সুতরাং তুমি কী প্রত্যাশা কর?

ইবন্ সায়ী তার বেশ কয়েকটি কবিতা পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"তোমার সমুদ্বয় যদি আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীতে জাগ্রত থাকে তবে তা তোমার জন্যে নিদ্রা থেকে উত্তম।

তোমার বিগত দিন তার আপদসমূহ নিয়ে অতীত হয়েছে, সুতরাং আজ তুমি যা যত ছাড়া হয়েছে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নাও।

যেই রব তোমাকে গোমরাহীর পর হিদায়েতের পথ দেখিয়েছেন, তিনিই তোমার বন্দেগীর উপযুক্ত।

সুতরাং তুমি তাঁর বন্দেগী কর, তাহলে তুমি নিস্কৃতি পাবে এবং দুনিয়াবিমুখতা দ্বারা তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্তি অব্যাহত রাখ। তুমি যদি হারাম থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তার বিনিময়ে তুমি 'পবিত্র হালাল' লাভ করবে।

সুতরাং অল্পে তুষ্ট হয়ে যাও, তাহলে মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে।

৬২৭ হিজরীর সূচনা

এ বছর সুলতান আশরাফ মুসা ইবন্ আদিল এবং সুলতান জালালুদ্দীন ইবন্ খাওয়ারিযম শাহের মাঝে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর এর কারণ ছিল যে, ইতোপূর্বে সুলতান জালালুদ্দীন খালাত শহর জবর দখল করেন এবং তার অধিবাসীদের বিতাড়িত করে তাকে বিরান শহরে পরিণত করেন। এ সময় তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

এবং তিনি সুলতান আশরাফের কাছে দূত প্রেরণ করে তাকে আমন্ত্রণ জানান তার কাছে আসার জন্য। তখন সুলতান আশরাফ দিমাশক ফৌজের এক বিরাট দল নিয়ে আগমন করেন এবং তাদের সাথে দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের ফৌজ এবং খালাত ফৌজের অবশিষ্টাংশ মিলিত হয়। এভাবে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজারে। তাদের সাথে ছিল পরিপূর্ণ যুদ্ধ সরঞ্জাম, ভয়ঙ্কর অশ্বারোহী দল। তাদের সাথে জালালুদ্দীনের সাক্ষাৎ হয় আযারবাইজানে তার সাথে ছিল বিশ হাজার যোদ্ধা; কিন্তু সুলতান আশরাফের ফৌজের সামনে তারা এক ঘণ্টাও দাঁড়াতে পারেনি। ফলে জালালুদ্দীন পিছু হটতে এবং পরাজয় বরণে বাধ্য হন এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা তার পশ্চাদ্ধাপন করে। এমনকি তারা পরাজিত বাহিনীকে খোদ শহর পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। এরপর সুলতান আশরাফ খালাত শহরে ফিরে আসেন এবং দেখতে পান যে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তখন তিনি তার সংস্কার করেন এবং তাকে আবাদ করেন, অতঃপর তিনি জালালুদ্দীনের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন এবং তার রাজধানীতে ফিরে আসেন। এছাড়া এ

বছর সুলতান আশরাফ দীর্ঘ অবরোধ আরোপের পর সুলতান বাহরাম শাহ থেকে বালাবাক কেল্লার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তার ভাই সালিহ ইসমাঈলকে দিশাগকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। অতঃপর সুলতান আশরাফ যখন জানতে পারেন যে, জালালুদ্দীন খাওয়ায়েমী খালাত শহর জবর ধখল করেছেন এবং সেখানে পাইকারী হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়েছেন, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি জালালুদ্দীনের মুখোমুখি হন এবং তাদের সাপে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয় এ লড়াইয়ের আশরাফ তাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং খাওয়ারিযমীদের বহু যোদ্ধা নিহত হয়। খাওয়ারিযমীদের বিরুদ্ধে সুলতান আশরাফের এই বিজয় উপলক্ষে শহর শহরে আনন্দউৎসব উদযাপিত হয়। কেননা, এই খাওয়ারিযমীরা কোন শহর বা ভূখণ্ড জয় করলেই সেখানে পাইকারী হত্যা ও লুণ্ঠন চালাত, তাই আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন। এই যুদ্ধের পূর্বে সুলতান আশরাফ স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেন যে, তিনি তাকে বলছেন, হে মুসা! তুমি তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

খাওয়ারিযমীদের পর্যুদস্ত করার পর তিনি খালাতে ফিরে আসেন এবং তার সংস্কার ও মেরামত সম্পন্ন করে সেখানে স্বাভাবিক অবস্তা ফিরিয়ে আনেন। এ বছর এবং এর পূর্বের বছর শামবাসীদের কেউ হজ্জ পালন করতে পারেনি। এমনকি তার পূর্বের বছরও। অর্থাৎ ক্রমাগত তিন বছর যাবৎ শামবাসীদের কেউ হজ্জ করতে যেতে পারেনি। এছাড়া এ বছর খ্রিস্টানরা সূরকা দ্বীপ দখল করে নেয় এবং সেখানে বহু মানুষকে হত্যা করে এবং বহুসংখ্যক বন্দি করে। এদের যখন তারা উপকূলীয় ভূখণ্ডে নিয়ে আসে, তখন মুসলমানরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তখন তারা তাদের প্রতি খ্রিস্টানদের আচরণের একতা তাদেরকে অবহিত করে। এ ছাড়া এবছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

যায়নুল উমানা শায়খ সালিহ

আবুল বারাকাত ইবন্ হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ হাসান ইবন্ হিবতুল্লাহ ইবন্ যায়নুল উমানা ইবন্ আসাফির দিমাশকী শাফেয়ী। তিনি তার দুই পিতৃব্য হাফিস আবুল কাসিম ও সাইন এবং অন্যান্যদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। এককভাবে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বেশ দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তার বয়স হয়েছিল প্রায় তিরাশি বছর। শেষ বয়সে তিনি চলৎশক্তি হীন হয়ে পড়েন, ফলে তাকে হাদীস শোনানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় জামে দিমাশকে এবং দারুল হাদীস নুরিয়াম বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। তার দ্বারা মানুষ বহুকাল উপকৃত হয়েছে। তার ইনতিকালের পর জানাযায় ব্যাপক লোক সমাগম ঘটে। আর তাকে সমাহিত করা হয় তার ভাই শায়খ ফখরুদ্দীন ইবন্ আসাফিকের সমাধির কাছে 'মাকারিবে সুফিয়াতে' বা সূফীদের কবরস্থানে আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ বায়রম মারদীনী

তিনি ছিলেন নির্জনবাসী বুযুর্গ, তিনি সাধারণত জামে দিমাশকের পশ্চিমকোণে অবস্থান করতেন, যার উপর নাম গাযালিয়্যা এ ছাড়া এর আরও কয়েকটি নামও রয়েছে। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ জামা বলেন, তার জানাযার দিনটি ছিল স্মরণীয় দিন। আর তাকে কাসিয়ুন

পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং নিজ অনুগ্রহ ও মহানুভবতা দ্বারা তাকে ক্ষমা করুন।

৬২৮ হিজরী সূচনা

এ বছরের যখন সূচনা হয়, তখন সুলতান আশরাফ মূসা ইবন্ 'আদিল কাযীরায় অবস্থান করেন ঐ সকল বিষয়ের সংস্কার ও মেরামতে ব্যস্ত থাকেন, যা জালালুদ্দীন খাওয়ারিযমীর জবর দখলের কারণে সেখানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ ছাড়া এ বছর তাতারীরা জাযীরা এবং দিয়ারে বকর আক্রমণ করে সেখানে ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন চালায়, যা ছিল তাদের স্বভাবরীতি, আল্লাহ্ তাদেরকে অপদস্থ করুন। এ বছরই জামে দিমাশকের মাশ্হাদে আবূ বকরে একজন ইমাম নিয়োগ করা হয় এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়। এছাড়া এ বছর রজব মাসে শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ সালাহ মাহারসূরী শাফেয়ী মাদরাসা জাওয়ানিয়াতে পাঠ দান করেন এবং শায়খ নাসের ইবন্ হাম্বলী কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সালিহিয়া মাদরাসায় পাঠ দান করেন, যা প্রতিষ্ঠা করেন "খাতূন রাবিয়া' খাতূন বিনত আয়ুব।" যিনি হলেন সিত্ শাসের বোন।

এছাড়া এ বছর সুলতান আশরাফ শায়খ আলী হারীরীকে 'আয্তা' কেল্লায় আটকে রাখেন। আর অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে এ বছর মিশর শাম, হালব এবং জায়ীরায় দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তায়ালার এই বাণী স্মরণ হয় :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব, তুমি শুভসংবাদ লও ধৈর্য-শীলদের যারা বিপদগ্রস্ত হলে বলে 'আমরা তো আল্লাহ্রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।" ঐতিহাসিক ইবন্ আছীর তার গ্রন্থে দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার মূল কথা হলো, তাতারীদের একটি দল আরেকবার যাওয়ারা উল্লাহর অঞ্চল থেকে বের হয়ে মুসলমানদের ভূখণ্ড আক্রমণ করে। আর এ বছর তাদের আগমনের কারণ হলো ইসমাইলী সম্প্রদায়ের লোকজন পত্রযোগে তাদেরকে সুলতান জালালুদ্দীনের দুর্বলতার কথা জানিয়ে দেয়, এবং তাদেরকে প্রবর্তিত করে যে, তিনি তার প্রতিবেশী সকল শাসকদের সাথে শত্রুতা করছেন এমনকি খলীফার নাতিও বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন। এছাড়া ইতোমধ্যে সুলতান আশরাফ ইবন্ আদিল তাকে দু'দুবার পর্যুদস্ত করেছেন।

এছাড়া এ সময় সুলতান জালালুদ্দীন থেকে এমন কিছু কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়, যা তার বুদ্ধি স্বল্পতা প্রমাণ করে। যেমন তার এক খোঁজা দসের মৃত্যু ঘটে, যে ছিল তার অতিপ্রিয় পাত্র। ফলে সে তার মৃত্যুলোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তিনি উমারায়দেকে নির্দেশ প্রদান করেন তার জানাযা নিয়ে হাঁটতে তখন তারা এভাবে কয়েক ক্রোশ হাঁটতে থাকেন। আর শহরবাসীকে

নির্দেশ দেন তার মৃত্যু শোক প্রকাশের জন্য দলে দলে বের হতে। এসময় কয়েক ব্যক্তি একটু গড়িমসি করায় তিনি তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হন, এমনকি জনৈক আমীরের সুপারিশে তাদের প্রাণ রক্ষা পায়। এছাড়া তিনি তার এই দাসকে দাফন না করে তার লাশ বিশেষ গ্রহণে তার সাথে সাথে বহন করতে থাকেন। তার যখনই তার সামনে কোনো খাবার উপস্থিত করা হতো, তখনই তিনি বলতেন : এটা তার কাছে নিয়ে যাও। একবার তার একথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠে : মহামান্য সুলতান! কালাজ তো মারা গেছে। একথা শুনে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি লোকটিকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তার নির্দেশে লোকটিকে হত্যা করা হয়। এরপর থেকে তারা তাকে বলত যে, সে এখন আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে– অর্থাৎ সে সুস্থ মৃত নয়– আর একথা শুনে সুলতান তার বুদ্ধি ও ধার্মিকতার অভাবে প্রশান্তি লাভ করতেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন। অতঃপর যখন তাতরীদের আগমন ঘটল, তখন তার ঘোর কেটে গেল, তখন তিনি তার মৃত গোলামকে দাফন করে ভীত শঙ্কিত হতে পলায়ন করলেন। আর যখনই তিনি কোন ভূখণ্ড ছেড়ে পলায়ন করেন তাতারীরা সেখানে গিয়ে হাযির হয় এবং সেখানে ধ্বংসলীলা চালাল। এভাবে তারা একের পর এক ভূখণ্ড দখল করে নেয়, এমনকি তারা জাযীরা অর্থাৎ দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উপনীত হয় এবং তা অতিক্রম করে সারজার মারদীন এবং আশার অঞ্চলে পৌঁছে যায়। আর এ সকল শহর ও জনপদের সর্বত্রই তারা ব্যাপকভাবে হত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংযজ্ঞ চালায় এভাবে সুলতান জালালুদ্দীনের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান হয় এবং তার অনুগত যোদ্ধারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে। ফলে তার রাজ্যে নিরাপত্তার পরিবর্তে ভীতি, সম্মান ও মর্যাদার পরিবর্তে অসম্মান ও অপদস্থতা এবং ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ বিরোধ দেখা দিল। পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি প্রকৃত সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এদিকে সুলতান জালালুদ্দীনের আর কোনো হদিস পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গেলেন কীভাবে গেলেন ফলে গোটা খাওয়ারিযম সাম্রাজ্যে তাতারীদের এক বছর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদেরকে বাধা দেওয়া বা প্রতিহত করার মত কেউ ছিল না। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের অন্তরে ভীরুতা ও দুর্বলতার পরীক্ষা করেন। তাতারীদের সংখ্যা ছিল, বেশুমার তারা যখন কোনো মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্যত হতো, তখন সে বলে উঠতঃ আল্লাহর দোহাই! আমাকে হত্যা করো না। আর তাতারী তাদের এই মিনতি প্রার্থনাকে উপহাস করত এবং অশ্বরোহণ করে ক্রীড়া বিনোদন মত থাকত। পরিশেষে বলতেই হয় এটা ছিল তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য এক মহাবিপদ ও বিপর্যয়, সুতরাং বলতেই হয় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ বছর লোকজন শাম থেকে হজ্জে গমন করেন। এ বছর যারা হজ্জ পালন করেন তাদের অন্যতম হলেন : শায়খ তাকীয়ুদ্দীন আবু উমর ইবন্ সালাহ। অতঃপর এ বছরের পর যুদ্ধ বিগ্রহের আধিক্য এবং তাতারী ও খ্রিস্টানদের আক্রমণের ভয়ে লোকজন হজ্জে করতে পারেনি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এছাড়া এ বছরই বাগদাদের 'অনারবী বাজারে' অবস্থিত মাদরাসার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, যা ইকবাল শাররারীর নমের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি সেখানে দারসে উপস্থিত হন। আর এটা ছিল এক স্মরণীয় দিন। এদিন বাগদাদের সকল মাদরাসা শিক্ষক এবং মুফতী একত্র হয় এই উপলক্ষে সেখানে উৎকৃষ্টমানের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয় এবং

তা বিভিন্ন মাদরাসা ও সরাইখানায় বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় এ সময় পাঁচশ ফকীহকে নিয়োগ করা হয় যাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন শিক্ষক ও ফকীহদের রাজকীয় পোশাক পরিচ্ছদ দান করা হয়। এছাড়া এ বছর আশরাফ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ কাযী ফাযেল মিশরাধিপতি সুলতান কামিল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে খলীফা মুতানসির বিল্লাহর দরবারে আগমন করেন, এবং রাজ সম্মানে সম্মানিত হন। তদ্রূপ ইরবিলের শাসনকর্তা সুলতান মুযাফ্ফর আবূ সায়ীদ কাওকারী ইবন্ যুয়নুদ্দীন, প্রথমবারের মত বাগদাদে আগমন করেন। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাকে খলীফার পক্ষ থেকে স্বাগত অভিনন্দন জানানো হয় এবং দুইবার মৌখিক ভাবে তার সাথে সালাম বিনিময় করেন। আর এটা তার জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় ছিল। বিভিন্ন এলাকার সুলতান ও গভর্নরগণ তার এ মর্যাদায় ঈর্ষাবোধ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তারা বাগদাদ দমনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কিন্তু ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের পক্ষে আর তা সম্ভব হয়নি। এরপর আবুল আব্বাস আহমাদ সম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

য়াহইয়া ইবন্ মুতী ইবন্ আবদুন্ নূর

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট নাহবশাস্ত্রবিদ আল্‌ফিয়া ও নাহব বিষয়ক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা, তার উপাধি ছিল যায়নুদ্দীন। তিনি ও অন্যান্যদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন; এরপর মিশরে গমন করেন; এ বছর জিলহজ্জ মাসের শুরুতে কায়রোতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শরীক হন, তাদের অন্যতম হলেন শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা, তিনি এ বছরই মিস্বরে গমন করেন। বর্ণিত আছে যে, সুলতান কামিলও তার জানাযায় শরীক হন। আর তাকে সমাহিত করা হয় কায়রোর কারাফা নামক কবরস্থানে, মুয়ানীর কবরের সন্নিকটে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

চিকিৎসক দাখওয়ার

ইনি হলো মাযহাবুদ্দীন 'আব্দুর রহীম ইবন্ আলী ইবন্ হামিদ, যিনি দাসওয়ার নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন দামেশদের অন্যতম চিকিৎসক চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি তার বাড়ি ওয়াক্ফ করে দেন। তিনি এ বছর সফর মাসে ইনতিকাল করেন এবং কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়। তার সমাধির উপর স্তম্ভ বিশিষ্ট গম্বুজ বিদ্যমান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একাধিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৬৩ হিজরীতে আর মৃত্যুবরণ করেন ৬৩ বছর বয়সে। ঐতিহাসিক ইবন্ আছীর বলেন, এছাড়া এ বছর আরো মৃত্যুবরণ করেন :

কাযী আবূ গানিশ ইবন্ আদীম

ইনি ছিলেন বিশিষ্ট বুযুর্গ, আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি, তিনি ছিলেন আলেম বা আমল বা ইলম অনুযায়ী আমলকারীর ব্যক্তি। যদি কেউ একথা বলে যে, তার সময়ে তার চেয়ে বড় আবিদ কেউ ছিল না। তাহলে তার কথা মিথ্যা হবে না। আল্লাহ্ তার প্রতি রাজি হোন এবং তাকে রাজি খুশি করুন। কেননা, তিনি আমাদের অন্যতম শায়খ, আমরা তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছি এবং

তার দর্শন ও বচন দ্বারা উপকৃত হয়েছি। ইবন্ আছীর বলেন : এ বছরই রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখ ইনতিকাল করেন আমাদের বন্ধুবর :

আবুল কাসিম আব্দুল মাজীদ ইবন্ আজামী হালবী

তিনি এবং তার পরিবার পরিজন হালবে সুন্নতের বিশেস পাবন্দ ছিলেন। তিনি ছিলেন বিরাট নৈতিকতা সুন্দর স্বভাব, বিপুল সহনশীলতা এবং বহুমুখী নেতৃত্বের অধিকারী। তিনি মানুষকে আপ্যায়ণ করতে পছন্দ করতেন। অতিথিই ছিল তার প্রিয় ব্যক্তি তিনি অতিথির হাত চুম্বন করেন এবং তাদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করতেন। তাদেরকে আরাম পৌছাতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে তিনি সদা তৎপর থাকতেন। আল্লাহ তাকে ভরপুর রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করুন। আল্‌বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : হাফিয ইযযুদ্দীন আবুল হাসান 'আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আছীর কৃত ইতিহাস গ্রন্থ আল শমিলে পাওয়া এটাই হলো সর্বশেষ তথ্য, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ 'আব্দুল কারীম

ইবন্ আবুস সাআদাত ইবন্ কারীম আল্‌মাওসিলী, বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ, তিনি ফিক্‌হগ্রন্থ কুদরীর একটি বিরাট অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া তিনি বদরুদ্দীন লু'লু-এর কাতিবের কাজ করেন, অতঃপর তা থেকে ইস্তফা দেন। তিনি ছিলেন কবি এবং গুণী ব্যক্তি, তার কয়েকটি কবিতার পঙক্তি হলো :

"তাকে ছেড়ে দাও, প্রেমাসক্তি যেমনটি চায়, সে তেমনটি হয়ে যাক। আর সে যদিও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আমি তা করব না। আর তোমরা তাকে যথা সম্ভব কোমল কথা বল–

তাহলে হয়তোবা তার কঠিন হৃদয় আমার প্রতি কোমল হবে। আমার প্রেমাসক্কির কথা তার কাছে পৌছে দাও।

আর আমার কথা তাকে বারবার বল, কেননা কথায় কথা আসে। আমার প্রানের শপথ! তারা চোখের দৃষ্টিসীমা থেকে বিভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরে, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। যেদিন তারা মহান করেছে সেদিন তারা প্রেমিকদের উপর কোষবদ্ধ তরবারি কোষমুক্ত করেছে।

মুজিদ বাহানসী

তিনি হলেন সুলতান আশরাফের ওযীর, যাকে সুলতান এক সময় অপসারিত করেন এবং তার ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি সমাহিত হন কাসীয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত করবস্থানে, যা তার দ্বারা নির্মিত হয়। তিনি তার সকল গ্রন্থ ওয়াকফ করে দেন এবং তার ব্যয় নির্বাহের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে রহম করুন।

জামালুদ্দৌলা

ইনি হলেন খলিল ইবন্ যুওয়ায়জানা যিনি হাজ্জাদের প্রসাদ প্রধান ছিলেন। এই ব্যক্তি ছিলেন বিচক্ষণ এবং মহানুভবর তাঁর দান দাক্ষিণ্য ছিল বিপুল। তাকে মসজিদে কালুসের নিকট দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

সুলতান আমজাদ

ইনি হলেন মাদরাসা আমজাদিয়ার জন্য সম্পত্তি ওয়াকফকারী। এছাড়া এ বছর মৃত্যুবরণ করেন :

বাহ্রাম শাহ্ ইবন্ ফাররুখ শাহ্ ইবন্ শাহান শাহ

ইবন্ আয়্যুব ছিলেন বালাবাক শহরের অধিকর্তা। সুলতান আশরাফ মুসা ইবন্ 'আদিল দিবাশকে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তার শাসন কর্তৃত্ব বহাল ছিল, তিনি বালবাক শহরের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন ৬২৬ হিজরীতে, আর তার থেকে এর শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয় ৬২৭ হিজরীতে। সুলতান আশরাফ দামেশকে তার পিতৃগৃহে তার বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এরপর এ বছর শাওয়াল মাসে সুলতান আশরাফের জনৈক তুর্কী ক্রীতদাস রাত্রিকালে তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। আর ইবন্ আয়্যুব ইতোপূর্বে তার এক সঙ্গীর ব্যাপারে এই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে বন্দি করেন। এরই প্রতিশোধ স্বরূপ এই ব্যক্তি কোনো এক রাতে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করে। অবশ্য ঐ তুর্কী ক্রীতদাসকেও হত্যা করা হয়। তাকে তার পিতার পাশে সমাহিত করা হয়। তিনি ছিলেন গুণী কবি, তার রচিত কবিতা সংকলন রয়েছে। ইবন্ সায়ী তার একটি চমৎকার ও অভিনব কাব্যখণ্ড উদ্ধৃত করেছেন। তার তাবাকাতে সাফেয়ীয়্যাতে তার জীবন চরিত্র বিদ্যমান তবে আবূ শামা পরিশিষ্টে তার উল্লেখ করেননি, এটা তার পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক বিষয়। জনৈক যুবকদের বৃক্ষ শাখা কাটতে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ সে তিনটি কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করেন, ইবন্ সায়ীতা উল্লেখ করেছেন :

"কে আমাকে ঐ কৃশকায় যুবকের বিরুদ্ধে সহায়তা করবে, যাকে আমি চমৎকার বৃক্ষশালা কর্তন ও ভর্ৎসনা করার কারণে সে বলল : তার স্বভাবসমূহ যেন উদ্যান ও প্রস্রবনের মাঝে সিক্ত ভাঁজ পড়া কোমল দড়ি–

বৃক্ষশাখা আমার স্বভাবের কোমলতা হরণ করেছে, তাই আমি চুরির অপরাধে তাকে কর্তন করেছি।"

তার আরও কয়েকটি কবিতা পঙক্তি হলো :

"প্রিয়জনের প্রতি ব্যাকুলতা ও তাদের স্মরণ আমাকে বিনিদ্র করে রাকে অথচ তাদের বাড়িঘর ও বিনোদনশালা সবই নির্জন হয়ে পড়েছে। সফরকারী প্রিয়জনের বহুদূরে চলে গেছে, আর আমার হৃদয়মনও তাদের সওয়াবিরা হাওদার সাথে বহুদূরে চলে গেছে।"

এমন ব্যাকুলতা, যা দূরত্বের মর্জি মাফিক এবং কোন আগ্রহ দূরত্বের পর সৃষ্টি হয়।

আর তাদের বিচ্ছেদের পর এসে দীর্ঘরাত্রি কোথায় আমার সেই আনন্দঘন [মিলনের] রাত্রিসমূহ। আমার চোখের পাতায় অনিদ্রা ভর করেছে, ফলে আমার কাছে দিন রাত বরাবর হয়ে গেছে। তাদের প্রস্থানের পর আমার অনিদ্রা অধিক হয়েছে।

সুতরাং কে আছে, সে আমাদের জন্য ঘুমের চোখ ধার করে আনবে? আর ধার দেয়া হয়, এমন চোখ কি তুমি দেখেছে?

আমার রাতের কোন উজ্জ্বল প্রভাত নেই, আর না আমার এই প্রেমাশক্তিকে স্খলন বলা যায়।

উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা যখন প্রত্যুষকালে অগ্রসরমান কাফেলাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন কত কণ্টক বলে : প্রিয়জন প্রস্থান করেছে, আর তুমি সুস্থ সকল নিজ গৃহে অবস্থানরত, এটাতো তোমার জন্য কল্যলজনক।

ক্ষতিগ্রস্ততায় আর কত অগ্রসর হবে এই জীবন, আর আমি তাতে কত উদাসীন এবং কত বিস্মৃতিপ্রবণ। আমিতো আমার জীবনকালের সবটুকু বরবাদ করেছি ক্রীড়া কৌতুকে হে জীবন! তোমার পর কি আর কোন জীবন আছে?

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করে : আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কেমন আচরণ করছেন? তখন তিনি আবৃত্তি করেন :

"আমি আমার দ্বীনের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম, আমার থেকে সেই শঙ্কা দূর হয়ে গেছে।

আমার মন সকল বিপদাপদের আশঙ্কা থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিত হয়েছে।"

আল্লাহ তাকে রহম করুন।

জালালুদ্দীন তুকুশ

আবার কারও মতে ইনি হলেন মাহমূদ ইবন্ আলাউদ্দীন খাওয়ারিযম শাহ ইবন্ তুকুশ আল্খাওয়ারিযমী। এরা হলো তাহির ইবন্ হুসায়নের বংশধর। আর তুকুশ হলেন তাদের পিতৃপুরুষ, যিনি সালজূকী সম্প্রদায়ের অবসান ঘটান। তাতারীরা তার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত এবং স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করে ফলে কোনো এক দ্বীপে তার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তারা এই জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তার সৈন্যবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আর জালালুদ্দীন সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় মায়্যাফারকীন[১] অঞ্চলের এক কৃষকের সাথে তার সাক্ষাত হয়, সে তখন তার মূল্যবান বেশভূষা, অলঙ্কার এবং তার ঘোড়ার মূল্যবান সজ্জায় অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করে : কে তুমি? তিনি তখন বলেন : আমি হলাম খাওয়ারিযমের বাদশা। আর ইতোপূর্বে এই কৃষকের একটাই খাওয়ারিযমীদের হাতে নিহত হয়েছিল। এ কথা শুনে এই কৃষক তাকে সম্মানীয় অতিথিরূপে গ্রহণ করে। অতঃপর যখন জালালুদ্দীন ঘুমিয়ে পড়েন। তখন সে তাকে তার কুঠার দিয়ে হত্যা করে, এবং তার মূল্যবান পরিধেয় ও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেয়। এদিকে শায়্যাফারিকীন শহরের প্রশাসক শিহাবুদ্দীন গাযী ইবন্ আদিলের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছে, তখন তিনি ঐ কৃষককে ডেকে পাঠান এবং তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া মূল্যবান রত্ন এবং তার অশ্ব নিজেই গ্রহণ করেন। সুলতান আশরাফ তার সম্পর্কে বলতেন : তিনি জালালুদ্দীন হলেন আমাদের ও তাতারীদের মাঝে বাধার প্রাচীর, যেমন আমাদের ও য়াজুজ মাজুজের পাপে রয়েছে জুল কারনায়নের প্রাচীর।

৬২৯ হিজরীর সূচনা

এ বছর দামেশকে কাযীদ্বয় শামস খুবী এবং শামসুদ্দীন ইবন্ সানীয়্যুদ্দৌলাকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। আর প্রধান বিচারপতি বা কাযী-উল-কুযাতের পদে নিয়োগ করা হয়

১. তুরস্কের একটি প্রাচীন শহর, যার বর্তমান নাম সেলভান।

ইমামুদ্দীন ইবন্ খয়রাতকানীকে এরপর তাকে ৬৩১ হিজরীতে অপসরণ করা হয় এবং কাযী শামসুদ্দীনকে তার পদে পুনর্বহাল করা হয়। এছাড়া এ বছর শাওয়াল মাসের সতেরো তারিখ খলীফা মুনতাসির তার ওযীর মুআয়্যাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল করীমকে পদচ্যুত করেন এবং এ সময় তাকে, তার ভাই হাসানকে এবং তার পুত্র ফখরুদ্দীন আহমাদ ইবন্ মুহম্মদ এবং তার শিষ্যদের গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। আর তার স্থলে খলীফা ওযীর নিয়োগ করেন শামসুদ্দীন আবুর আযহার আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদকে এবং তাকে মূল্যবান রাজ পরিধেয় প্রদান করেন এবং সাধারণ লোকজন এই ঘটনায় আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়।

এছাড়া এবছর তাতারীদের একটি দল মিহিরপুর শহরে উপনীত হয়, তখন খলীফা আরবিল প্রণামকে মুযাফর উদ্দীন কাওকাবী ইবন্ যায়নুদ্দীনকে তাদের মোকাবিলায় জন্য উৎসাহিত করেন এবং তার পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করেন, তখন তারা সম্মিলিতভাবে তাতারীদের মোকাবিলায় অগ্রসর হয়। এ সময় তাতারীরা তাদের আগমনে ভীত হয়ে পলায়ন করে এবং ছয়মাস পর্যন্ত তাদের অপেক্ষায় সেখানে অবস্থান করে। অতঃপর মুযাফ্ফর উদ্দীন অসুস্থ হয়ে তার নিজ শহরে আরবীলে ফিরে আসেন এবং তাতারীগণ পুনরায় সেখানে ফিরে আসে। এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

হাফিয মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল গণী

ইবন্ আবু বকর বাগদাদী আবূ বকর ইবন্ নুক্তা বিশিষ্ট হাফিযে হাদীস, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিদ ও রাবীদের জীবন চরিত বিষয়ে তার সংকলিত আত্তাক্য়ীদ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। তার পিতা ছিলেন নিঃস্ব ফকীহ তিনি বাগদাদের এক মসজিদে জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তার সামান্য আয় উপার্জনেও তিনি নিজেদের তুলনায় শীর্ষদের অগ্রাধিকার দিতেন। আর তার এই পত্রে হাদীস শাস্ত্রের অনুশীলন, হাদীস শ্রবণ এবং হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দূরদূরান্তে ভ্রমণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেন : এমনকি তাতে সতীর্থ ও সমবয়সীদের ছাড়িয়ে যান। হাফিয মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল গণী জন্ম গ্রহণ করেন ৫৭৯ হিজরীতে, আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এ বছর সফর মাসের ২২ তারিখ শুক্রবার আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন।

জামাল আবদুল্লাহ ইবন্ হাফিয আব্দুল গনী

তিনি ছিলেন লাজুক স্বভাব, মহানুভব ও গুণবান ব্যক্তি। তিনি বহু সংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর রাজা বাদশা ও দুনিয়াদারদের সংস্পর্শে আসেন এবং তার সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন শায়খ ইসমাইল ইবন্ আদিলের কাছে। আর তিনি তার কাফনের ব্যবস্থা করেন এবং তাকে কাসীয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়।

আবূ আলী হুসায়ন ইবন্ আবূ বকর আল মোবারক

ইবন্ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ য়াইদা ইবন্ মুসলিম যুবায়দী বাগদাদী। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হানাফী বুযুর্গ এবং বহু গুণ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অধিকারী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইলমুল ফারায়েয বা সম্পত্তি বণ্টনবিদ্যা এবং কাব্য ছন্দবিদ্যা। তার রচিত বেশ কিছু চমৎকার

ছড়াগুচ্ছ রয়েছে। ইবন্ সায়ী প্রতিটি ছড়াগুলোকে দুটি করে পঙক্তি চয়ন করেছেন এবং সেগুলি তার 'তারীখে' অর্থাৎ ইতিহাস গ্রন্থে সংকলিত করেছেন।

আবুল ফাত্হ মাসউদ ইবন্ ইসমাইল

ইবন্ আলী ইবন্ মূসা সালমাসী, ইনি ছিলেন ফকীহ সাহিত্যিক ও কবি, তার সংকলিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি মাকামাসমূহ এবং নাহু শাস্ত্রের আল্ জুমালের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, তার বেশ কিছু চমৎকার বক্তৃতা এবং কবিতা রয়েছে। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওয়াহাব

ইবন্ আবদুল্লাহ আল আনসারী ফখরুদ্দীন ইবন্ শায়বাজী দিমাশকী, তিনি ছিলেন দিমাশকের বিশিষ্ট পরিমাপ নিয়ন্ত্রক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৪৯ হিজরীতে। তিনি আয়্যুব তনয়া খাতুন সিত্নামের দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে করতেন এবং তার হাতেই ন্যস্ত ছিল তার যাবতীয় ওয়াকফকৃত সহায় সম্পত্তির দায়দায়িত্ব। সাবত বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান এবং বিনয়ী। তার পুত্র শারাফুদ্দীন সামান্য কিছুদিন নামের দাউদের ওযীরের দায়িত্ব পালন করেন। আর শায়খ ফখরুদ্দীন কোররানীর ঈদের দিন ইনতিকাল করেন এবং তাকে সগীরের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন।

হুসাম ইবন্ গাযী

ইনি হলেন ইবন্ য়ূনুস ইমাদুদ্দীন আবুর মানাকির আল মাহাল্লী আল মিশরী আদ-দামেশকী। তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী, নেককার শাফেয়ী ফকীহ এবং সুবক্তা, তার রয়েছে বেশ কিছু চমৎকার কবিতা, ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন, চরিতাভিধানে তার একটি সুন্দর জীবন চরিত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন শায়খ হুসান এ বছর রবিউল আখের মাসের দশ তারিখ ইনতিকাল করেন এবং সুফীদের কবরস্থানে সমাহিত হন। সাবত বলেন : তিনি আমিনিয়্যা মাদরাসায় অবস্থান করতেন। তিনি কারও দেয়া কোনো কিছু খেতেন না, এমনকি সুলতানেরও না। বরং তিনি যখন কোন দস্তরখানে শরীক হতেন, তখন তার পকেটে রক্ষিত শুকনো খাবার থেকে খেতেন তার কাছে সবসময় হাজার দীনার থাকত। তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : কোন এক রাতে সুলতান আদিল আমাকে একটি মূল্যবান চাদর প্রদান করেন। অতঃপর আমি যখন তা পরিধান করে বের হলাম, এসময় আমার সামনে চলমান হুসান আমকে কাযী মনে করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এরপর আমি যখন বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলাম, তখন আমি ঐ মূল্যবান চাদর খুলে তা ভাজ করে নিয়ে নিলাম এবং হাঁটার গতি কমিয়ে দিলাম। এমন সময় পিছন থেকে ফিরে তিনি তার কাছাকাছি কাউকে দেখতে না পেয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন : কাযী সাহেব কোথায়? তখন আমি একদিকে ইঙ্গিত করে বললাম, তিনি তার বাড়িতে গিয়েছেন। আমার কথা শুনে তিনি যখন সেদিকে অগ্রসর হলেন, আমি তখন দ্রুত মাদরাসা আসীনিয়্যার দিকে সড়ে পড়লাম এবং তার থেকে নিস্তার পেলাম।

ইবন্ সায়ী বলেন : তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৬০ হিজরীতে। মৃত্যুকালে তিনি বিপুল সহায় সম্পত্তি রেখে যান, যার উত্তরাধিকার লাভ করে তার নিকটাত্মীয়রা। দীনদার নেককার ও মুত্তাকী

হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইতিহাস ও যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইবন্ সায়ী বেশ কিছু কাব্যখণ্ড উদ্ধৃত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– "আমাকে বলা হলো, তোমার প্রিয়ার গণ্ডদেশের তিলকশূন্যতা দৃষ্টিকটু আমি বললাম : এটা তো দোষের কিছু নয়।

গণ্ডদেশের লালিমা তিলককে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আর সেই ধুয়া থেকেই তার চিবুকের উদ্ভব। তার অন্য দুটি কবিতা পঙ্ক্তি হলো : "তোমাদের প্রতি আমার আগ্রহ, আমার প্রতি তোমাদের আগ্রহ থেকে ভিন্নতর, তবে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, আমি তোমাদের হৃদয় থেকে অদৃশ্য, কিন্তু তোমরা আমার হৃদয়ে বিদ্যমান।"

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী

ইনি হলেন ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ জারূদ আল্মারানী, বিশিষ্ট শাফেয়ী ফকীহ ও গুণবান ব্যক্তি। তিনি আরবীলের কাযী নিযুক্ত হন। তবে বুদ্ধিমত্তা ও চৌকসতার সাথে সাথে তার মাপে নির্লজ্জতাও ছিল। তিনি ছিলেন কাসের সৌন্দর্য। তার রয়েছে উন্নত মর্ম সমৃদ্ধ বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা পঙক্তি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

বার্ধক্যের আগমন ঘটেছে, আর যৌবন বিদায় নিয়েছে..."

তোমার পাপ অনেক, সুতরাং পণ্যের পথে ফিরে আস। কেননা, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এক ইলাহের আনুগত্য কর, কোনরূপ অবহেলা করো না। আর বড়ো বড়ো আশা আকাঙ্ক্ষা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

আবু ছানা মাহমূদ ইবন্ রালী

ইনি হলেন ইবন্ আলী ইবন্ য়াইয়া তাই রক্কী, আরদীল শহর অবস্থান করি, সেখানে তিনি সুলতান মুযাফফর উদ্দীনের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট শায়খ এবং গুণবান সাহিত্যিক তার কয়েকটি কবিতা পঙক্তি রয়েছে। যার একটি হলো :

তার সবটুকুই সৌন্দর্য মণ্ডিত সুতরাং এমনও আছে, যে তাকে দর্শন করবে, অথচ তার উন্মাদনা বৃদ্ধি পাবে না?

নাহ্বী ইবন্ মুতী য়াইয়া

ঐতিহাসিক আবূ শামা তার জীবনী উল্লেখ করেছেন বিগত বছরের আলোচনার যার এটাই সত্যিকার কেননা, তিনি মিশরে তার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। আর ইবন্ সায়ী তার উল্লেখ করেছেন এই বছরের আলোচনায় তিনি বলেন : ইবন্ মুতি মিশরের শাসনকর্তা কামিল মুহাম্মাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সপ্ত কিরাআতের বর্ণনায় তার ছন্দ গাঁথা রয়েছে। এছাড়া তিনি আল্জাম্হারা গ্রন্থেরও কাব্যরূপ সংকলন করেছিলেন এবং আল্লামা জাওহারীর স্বীয় গ্রন্থকে কাব্যরূপ দেয়ার সংকল্প করেছিলেন।

৬৩০ হিজরীর সূচনা

এ বছর বাগদাদের খতীব এবং আব্বসীদের নিরীক্ষকও পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন মাজদুদ্দীন আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন্ মানসূরী এবং তাকে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

তিনি ছিলেন গুণবান ব্যক্তি তিনি নিঃস্ব দরিদ্র ও সুফীদের সাহচর্য অবলম্বন করতেন। বেশ কিছুকাল তিনি যুদ্ধেও দুনিয়াবিমুখতার পন্থা অবলম্বন করেন। অতঃপর যখন তাকে এই দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দেন এবং পার্থিব মুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি তুর্কী গোলামদের সেবা গ্রহণ করেন এবং বিলাসী পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তার এই সবস্থা দেখে তবেই জনৈক শিষ্য দীর্ঘ এক কবিতার তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার পরিবর্তিত অবস্থার জন্য কঠোর সমালোচনা করেন। ঐতিহাসিক ইবন্ সায়ী তার ইতিহাস সংকলনে তা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া এ বছর কাযী মুহ্‌য়ুদ্দীন য়ুসুফ ইবন্ শায়খ জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ দূদলের সাথে খলীফার পক্ষ থেকে মিশরাধিপতি সুলতান কামিলের কাছে আগমন করেন। এ সময় তার সাথে বিশাল একদল ছিল, যাতে তাকে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণের কথা লিখিত ছিল। এছাড়া তাতে ছিল ওযীর নাসরুদ্দীন আহমাদ ইবন্ নাকিদের রচিত চমৎকার সব নির্দেশাবলী ইবন্ নায়ী তাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এদিকে সুলতান কামিল ডায়ীরা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত আসাদ শহরের উপকণ্ঠে তাঁবু গড়েন এবং দীর্ঘ অবরোধ আরোপের পর তা জয় করেন এবং আসাদ শহরের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন, এছাড়া এ বছর হজ্জ ফেরত হাজীদের জন্য বাগদাদে একটি মেসোনখানা উদ্বোধন করা হয়, এবং সেখানে তাদের জন্য হাতখরচ, পোশাক আশাক ও অন্যান্য উপহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এ বছর খলীফা সুলতান সিবের ফৌজ আমীর সায়ফুদ্দীন আবুল ফাসায়েল ইকবাল মুসতানগিরীর নেতৃত্বে আরবীল শহর ও তার শাসন কর্তৃত্বাধীন উপঅঞ্চল সমূহের দিকে যাত্রা করে। খলীফার এই ফৌজ যখন আরবীল শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে, তখন শহরবাসী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখন তারা তাদের অবরোধ আরোপ করে এবং পরিশেষে এই বছর শাওয়াল মাসের সতের তারিখ এই শহর জবর দখল করে নেয়। আরবীল শহর বিজয়ের সংবাদ যখন বাগদাদে পৌঁছে, তখন সেখানে ঢাক ঢোল পিটিয়ে উৎসব পালন করা হয়। অতঃপর উল্লিখিত বিজেতা ইকবালের অনুকূলে তার শাসন কর্তৃত্ব অর্পণের ফরমান লেখা হয় এবং তিনি সেখানে বিভিন্ন পদ নির্ধারণ করেন এবং উত্তমরূপে তার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় কবিগণ এই বিজয়ের প্রশংসা গাঁথা রচনা করেন এবং বিজেতা ইকবালের স্তুতি গান। এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট দুটি কবিতা পঙক্তি হলো :

"হে শাওয়ালের সপ্তদশ ফিস? যা আদিও অন্তে সৌভাগ্য লাভ করেছে সেদিন তুমি আরবীল জয়ে অভিনন্দিত হয়েছে ও অভিনন্দিত হয়েছে তাতে, কেননা সেদিন ওযীরের অভিষেক হয়েছে।"

অর্থাৎ ওযীর নাসীরুদ্দীন ইবন্ আল্‌কাসীর কথা বলা হয়েছে। কেননা তিডিনও এর পূর্বের বছর একই দিনে ওযীর রূপে নিয়োগ লাভ করেন। আর এ বছর রমযান মাসে দামিশকে দারুল হাদীস আশরাফিয়্যার ভবন নির্মাণ শুরু হয় ইতোপূর্বে এ স্থানে আমীর কায়মাসের বাসগৃহ ছিল এবং সেখানে ছিল বড়ো বড়ো হাম্মামখানা। এসব কিছু ভেঙে সেখানে এই দারুল হাদীস নির্মাণ করা হয়। ঐতিহাসিক সাবত এই বছরের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, শাবানের পনের তারিখ রাতে দামিশক দুর্গের পার্শ্ববর্তী দারুল হাদীস আশরাফিয়্যার উদ্বোধন করা হয়, এবং সেখানে হাদীসের দারস প্রদান করেন শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ সালাহ। এছাড়া সুলতান

আশরাফ-এর অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করেন এবং সেখানে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাদুকা মোবারক স্থাপন করেন। সাবৃত বলেন : এ বছর সুলতান আশরাফ শায়খ যুবায়দীর কাছে বুখারী শরীফ শ্রবণ করেন। আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : একইভাবে সাধারণ শ্রোতারাও শায়খ বুয়ায়দীর কাছে দারুল হাদীসে এবং সালেহিয়াতে হাদীস শ্রবণ করেন। সাবৃত বলেন : এই বছরেই সুলতান কামিল আমাদ শহর এবং কায়দা দুর্গ জয় করেন। এ সময় তিনি এখানকার শাসনকর্তার কাছে পাঁচশ স্বাধীন রমণীকে রক্ষিতারূপে পান। এ কারণে সুলতান আশরাফ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এ ছাড়া এ বছর মারদীন অঞ্চলের শাসক এবং রোমকবাহিনী দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড মাষীরা আক্রমণ করে এবং তারা মুসলমানদের সাথে তাতারীদের চেয়ে অধিক পৈশাচিক আচরণ করে।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ হলেন : আবুল কাসিম 'আলী ইবন্ শায়খ আবুল ফারাজ ইবন্ নাওয়ী।

তিনি ছিলেন কোমলস্বভাব এবং বুদ্ধিমান শায়খ। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন এবং কিছুকাল ওয়াজ নসীহতের পেশা অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি এই পেশা ত্যাগ করেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য, হাস্যরসমূলক কাহিনী এবং কবিতা পঙ্ক্তি তার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৫১ হিজরীতে। এ বছর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার বয়স ছিল উনআশি (৭৯) বছর।

ওযীর সফীয়ুদ্দীন হবেন শাকার

ঐতিহাসিক সাবত এ বছরে তারও ওফাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার ইলম প্রিয়তা ও আহলে বায়াতের প্রতি ভালবাসার প্রশংসা করেছেন। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, তার আলবাসাইর নামক একটি গ্রন্থ সংকলন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, একবার সুলতান আদিল তার প্রতি রুষ্ট হন। এরপর সুলতান কামিল তাকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাকে সম্মানে তার ওযীর পদে ফিরিয়ে আনেন। তিনি মিশরে অবস্থিত তার প্রসিদ্ধ মাদরাসায় ইনতিকাল করেন। বর্নিত আছে যে, তার আদি নিবাস ছিল মিশরের দানীর নামক গ্রাম।

সুলতান নাসের উদ্দীন মাহমূদ

ইনি হলেন ইবন্ ইয্যুদ্দীন মাসউদ ইবন্ নুরুদ্দীন আসালান শাহ ইবন্ কুতুবদ্দীন মাওদূদ ইবন্ ইমাদুদ্দীন ইবন্ যান্কী ইবন্ সাকাসনাকার যিনি হলেন সাউসিলের শাসনকর্তা। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬১৩ হিজরীতে। বদরুদ্দীন লুলু প্রথমে তাকে ছায়া কাঠামো হিসাবে দাঁড় করায়। অতঃপর যখন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়, তখন সে তার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে, ফলে তার নারীসঙ্গ লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির আশাও তিরোহিত হয়ে যায়। এছাড়া তার খাদ্য পানীয়ের ব্যাপারেও কঠোরতা আরোপ করা হয়। অতঃপর যখন তার মাতামহ আরবীলের শাসনকর্তা মুযাফফর উদ্দীন কাওয়াররীর মৃত্যু ঘটে, তখন তিনি তেরো দিন পানাহার বর্জন করে উপবাস থাকেন এবং পরিশেষে ক্ষুধা-পিপাসা এবং মনোকষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আল্লাহ তাকে রহম করুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন এবং মাওসিলের সর্বশেষ সুলতান বা রাজবংশীয় ব্যক্তি।

কাযী শরাফুদ্দীন ইসমাইল ইবন্ ইবরাহীম

ইনি ছিলেন হানাফী শায়খ। ফারায়েয ও অন্যান্য বিষয়ে তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। আর তার আরেকটি পরিচয় হলো, তিনি কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ শীরাযীর খালাত ভাই। আর তাদের উভয়ে ইবনে যাকী এবং ইবন্ হারাসতানীর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি দরস প্রদান করতেন তরখানিয়্যা মাদরাসায় এবং সেখানেই বাস করতেন। একবার সুলতান মুআযম যখন খেজুর ও আনার খেতে প্রস্তুত তৈরী হালাল ঘোষণা করে ফাতওয়া প্রদানের জন্য তার কাছে দূত প্রেরণ করেন তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন এবং বলেন : এ ব্যাপারে আমি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন্ হাসানের মাযহাবীপন্থী। আর ইমাম আবূ হানিফা থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত ব্যতিক্রম, আর এ প্রসঙ্গে ইবন্ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। এবং হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত 'আছার' ও সহীহ নয়। –তার এই মত ও মন্তব্য শুনে সুলতান মুআযম তার প্রতি রুষ্ট হন এবং তাকে দারস প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তার স্থলে তার শাগরিদ যায়ন ইবন্ আত্তালকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এরপর মৃত্যুপর্যন্ত শায়খ নিজগৃহে অবস্থান করেন।

সুলতান আবূ সায়ীদ কাওকাবরী

ইনি হলেন ইবন্ যায়নুদ্দীন আলী ইবন্ তাবুকতাকীন। যিনি ছিলেন বিশিষ্ট দানবীর ও মহানুভব সুলতান এবং বহু কুকীর্তির অধিকারী। কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে বিদ্যমান জামে মুযাফফারী তাঁরই নির্মিত তিনি জাযীরা প্রস্রবন থেকে সেখানে পানি আনানোর ব্যবস্থা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান মুআযযম তাকে একথা বলে নিবৃত্ত করেন যে, কখনও এই পানি দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে অবস্থিত কবরস্থানসমূহ প্লাবিত হতে পারে। তিনি রবিউল আওয়াল মাসে নবী জন্মোৎসব পালন করতেন বিরাট আড়ম্বরসহ। আর ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন অকুতোভয় বীর, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান আলেমে দ্বীন। আল্লাহ তায়ালা তাকে রহম করুন।

শায়খ আবুল খাত্তাব ইবন্ দিহ্য়া তার জন্য নবী জন্মোৎসব বিষয়ে 'আত্তানবীর' নামক একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। এতে তিনি খুশি হয়ে তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। সালাবী সম্রাজ্যের সময়ে দীর্ঘকাল তিনি শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন, তার শাসনামলে তিনি একবার আক্কা শহর অবরোধ করেন। আর এ বছর পর্যন্ত তিনি প্রশংসনীয় তাকে প্রজা শাসন করেন। সাবি্ত বলেন : কোনো এক মীলাদ উপলক্ষে সুলতান মুযাফফরের দস্তরখানে শরীফ এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন। আমাদের সেই দস্তরখানে ছিল পাঁচ হাজার বকরীর ভুনা মাথা, দশ হাজার ভুনা মুরগি, তিরিশ হাজার বাটি মিষ্টান্ন এবং এক লক্ষ টক দইয়ের পাত্র। সাবি্ত এ প্রসঙ্গে আরও বলেন : এ জাতীয় মীলাদ উপলক্ষে তার কাছে বিশিষ্ট আলিম উলামা এবং সুফীগণ সমবেত হতেন এবং তিনি তাদেরকে মূল্যবান পরিধেয় ও হাসিয়া তৌহফা দ্বারা সম্মানিত করতেন। এছাড়া তিনি সুফীদের জন্য যোহর থেকে পরবর্তী দিন ফজর পর্যন্ত গান শোনার ব্যবস্থা করতেন এবং নিজে তাদের সাথে গানের সূরের তালে তালে নাচতেন। সকলের জন্য উন্মুক্ত তার একটি অতিথিশালা ছিল। তার দান সদকা ছিল বিভিন্নমুখী। এছাড়া তিনি প্রতি

বছর খ্রিস্টানদের কবল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম বন্দী মুক্ত করতেন। এমনকি বর্ণিত আছে যে, তিনি তাদের কবল থেকে সর্বমোট ষাট হাজার বন্দীকে মুক্ত করেন।

তার স্ত্রী আয়ুব তনয়া রাবিয়া খাতুন বলেন, যাকে তার ভাই সালাহুদ্দীন তার সাথে বিবাদ দিয়েছিল যখন তিনি তার সাথে আক্কায় অবস্থান করছিলেন, একবার আমি তাকে পাঁচ দিরহামের কম মূল্যের পোশাক পড়ার কারণে ভর্ৎসনা করলাম তখন তিনি বললেন, পাঁচ দিরহাম মূল্যের পোশাক পরিধান করে অবশিষ্ট অর্থ দান করা আমার কাছে মূল্যবান পোশাক পরে, দরিদ্রদের ক্ষুধার্ত রাখার চেয়ে উত্তম। তিনি প্রতি বছর মীলাদ অনুষ্ঠান বাবদ তিন লক্ষ দীনার, মেহমানদারী বাবদ এক লক্ষ দীনার এবং হারামায়ন শরীফায়ন এবং হিমযের পথে হজ যাত্রীদের পানি সরবরাহের জন্য তিরিশ হাজার দীনার ব্যয় করতেন। আর এমনই ছিল তার গোপন দানের অতিরিক্ত, আল্লাহ তাকে রহম করুন। তিনি আরবীল দূর্গে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মক্কায় সমাহিত হওয়ার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা না হওয়ায় তাকে হযরত আলী (রা)-এর পাশে দাফন করা হয়।

সুলতান 'আযীয ইবন্ উছ্মান ইবন্ আদিল

এই ব্যক্তি হলেন সুলতান মুআয্যমের সহোদর ভাই তিনি ছিলেন বানিয়াস শহরের শাসনকর্তা এবং ঐ এলাকার দূর্গসমূহের অধিকর্তা। এছাড়া তিনি ছিলেন মাদরাসা মুআয্যামিয়্যার নির্মাতা তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, মিতবাক এবং তার ভাই মুআযযমের অনুগত। তার পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি এ বছর রমযান মাসের দশ তারিখ সোমবার ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ ইবন্ নাসরুদ্দীন ইবন্ নাসর

ইনি ছিলেন ইবন্ হুসায়ন ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ গালিব আনসারী, তিনি কবি আনীনের পুত্র নাশে পরিচিত। সায়ী বলেন, তার পিতৃপুরুষদের আদিনিবাস কুফায় তবে তিনি দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রতিপলিত হন। সেখান থেকে বের হয়ে তিনি কয়েক বছর যাবৎ সফর করতে থাকেন। যিনি পূর্ব পশ্চিমের বহু দেশ ও ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করেন। তিনি দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড, রোমক ভূখণ্ড, ইরাক, খোরাসান, মাওয়ারা উল্লাহর, ভারতবর্ষ, রায়ান, হিজায এবং বাগদাদ সফর করেন। এ সকল দেশের শাসক ও অধিবাসীদের স্তুতিগাঁথা রচনা করে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন চৌকস বুদ্ধিমান, প্রসিদ্ধ শক্তিমান কবি, সু-স্বভাবের অধিকারী এবং সদাচারী। সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষে তিনি নিজ শহর দামেশকে ফিরে আসেন এবং ইবনুস সায়ীর মতে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন এবং এ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

তবে ঐতিহাসিক সাবত্ ও অন্যান্যরা তার মৃত্যুসন উল্লেখ করেছেন ৬৩৩ হিজরীতে। এছাড়া কারও কারও মতে তার মৃত্যুসন ৬৩১ হিজরী, আর আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন।

তবে প্রসিদ্ধ মত হল তার পিতৃপুরুষদের আদিনিবাস হাওরান অঞ্চলের ফায়াস শহর। দামেস্ক তার অবস্থান ছিল জামে দামেস্কের সন্নিকটে। তিনি নিন্দুক কবি, নিন্দাকাব্য রচনায় তার

বেশ পারদর্শিতা ছিল। এ বিষয়ে তিনি مقراض الأعراض সম্ভ্রম নাশক নামক গ্রন্থ সংকলন করেন, যাতে প্রায় পাঁচশ কবিতা পঙ্‌ক্তি ছিল। খুব কম সংখ্যক দামেস্কবাসীই তার নিন্দা ও কটু ভাষণ থেকে অব্যাহতি পায়। এমন কি সুলতান সালাহুদ্দীন এবং তার ভাই সুলতান আদিলও নয়। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, দামেস্কবাসীর কম সংখ্যাই তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পেরেছে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। সুলতান সালাহুদ্দীন তাকে ভারতে নির্বাসিত করেন। তখন সে ভারতীয় রাজ-রাজাদের প্রশংসা কাব্য রচনা করে বিপুল অর্থ সম্পদ উপার্জন করে। এছাড়া তিনি ইয়ামানে গমন করেন। বর্ণিত আছে যে তিনি তাদের জনৈক বাদশার ওযীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সুলতান আদিলের শাসনামলে দামিশকে ফিরে আসেন। এরপর সুলতান মুআযযম যখন শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হন, তখন তিনি তাকে তার ওযীর নিয়োগ করেন, কিন্তু সে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে নিজের পক্ষ থেকে ইস্তফা প্রার্থনা করে, ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি দামেশবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখে পাঠান : কোন অপরাধে তোমরা তোমাদের আস্থার পাত্রকে দূরে সড়িয়ে দিয়েছো, সে তো কোনো পাপ করেনি কিংবা কারও কোনকিছু আত্মসাৎ করেনি। সত্যভাষী প্রত্যেককে যদি তোমাদের মাঝে নির্বাসিত হতে হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের দেশ থেকে মুআয্যিন নির্বাচিত কর। সুলতান সালাহুদ্দীনের নিন্দায় তার রচিত পঙক্তিসমূহ হলো–

"আমাদের সুলতান হলেন খোঁড়া, তার কাতিব হলেন আধা-কানা আর তার ওযীর হলেন কুঁজো।

আর খতীব দাওলায়ী হলেন এমন ইতিকাফকার যে, সামান্য ডিমের খোসার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার তার সহচর ইবন্ বাকা ওয়াজ নসীহত দ্বারা লোকদেরকে প্রতারিত করে, আর আব্দুল লতীফ হলেন হিসাবকারী।

কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তির স্বভাব হিংসা; আর সেনাপতির রয়েছে অদ্ভুত ব্যাধি। এছাড়া সুলতান আদিল সায়ফুদ্দীনের ব্যাপারে তার কবিতা পঙক্তিদ্বয় হলো : আমাদের প্রত্যাশার ক্ষেত্র, সুলতান হলেন বিপুল অর্থ সম্পদের অধিকারী তবে বেশ হিসেবী।

যেমনটি বলা হয়, তিনি তরবারিই তবে সে তরবারি ভোতা এবং জীবনোপকরণকে বিচ্ছিন্নকারী।"

একবার তিনি খোরাসানে ইমাম ফাখর রাযীর মজলিশে উপস্থিত হন, ইমাম রাযী তখন মিম্বরে বসে ওয়ায নসীহত করছেন, এমন সময় এক ধাওয়াকারীর তাড়া খেয়ে একটি কবুতর এসে ইমাম রাযীর গায়ে এমনভাবে পতিত হয়, যেন সে তার আশ্রয় চাচ্ছে। তখন ইবন্ আনীর আবৃত্তি করে : "এ যুগের সুলায়মানের কাছে একটি কবুতর এসে আশ্রয় নিল, আর গোশত লোভী শিকারীর দুচোখে তার মৃত্যু দ্যুতি ছড়াচ্ছে। ক্ষুধার ভারে যে নুয়ে পড়েছে।

এই অবুঝ কবুতরকে সে জানাল একথা যে, তোমাদের এই স্থান হল অভয়াশ্রম এবং আপনি হলেন ভীতশঙ্কিতদের নিরাপদ ঠাঁই।"

শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরাওয়ারদীর

তিনি হলেন 'আত্তয়াবিফুল সাওয়ারিফ গ্রন্থের প্রণেতা। তার পূর্ণ নাম উমর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ হামওয়ায়াই, আর তার মূল নাম হল

আবদুল্লাহ বাকরী আল্‌বাগদাদী, শিহাবুদ্দীন আবূ হাফস সাহরাওয়ারর্দী, বাগদাদের সূফী-শায়খ তিনি ছিলেন তার যুগের বিশিষ্ট বুযুর্গ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি একাধিকবার খলীফা ও সুলতানদের মাঝে দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তার উপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। একবার তিনি বিরাট সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান নিয়ে হজ্জ পালন করেন। তার মাঝে প্রবল মানবিকতা ও আর্ত-সেবার প্রবণতা ছিল, ছিল সৎকাজে নির্দেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার মানসিকতা। সাধারণ পোশাকেই তিনি লোক সম্বন্ধে উপস্থিত হতেন এবং লোকজনকে ওয়াজ নসীহত করতেন। এরপর তিনি তার নির্ধারিত মজলিশে উপস্থিত হয়ে এই কবিতা পঙক্তিটি বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন :

সহচরদের মাঝে কোন প্রেমাসক্ত ব্যক্তিই যার সাথে তুমি ভাব বিনিময় করতে পার; তবে শুধু ঐ প্রেমিক কাফেলার যার প্রেমাষ্পদ রয়েছে। একথা শুনে শায়খ চিৎকার দিয়ে মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং ভুল স্বীকারের জন্য যুবকটর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি তার সন্ধান পেলেন না। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন তার কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃতির সময় যুবকটি তা পা দিয়ে মাটি খুঁটিয়ে গর্ত তৈরি করেছে এবং তাতে বেশ রক্তও জমে আছে। ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান তার অনেকগুলি পদ্য ও কবিতা উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন যে তিনি এ বছর ৯৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

ইবন্ আছীর

তিনি হলেন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম, আল্লামা ইয্‌যুদ্দীন আবুর হাসান 'আলী ইবন্ আব্দুর কারমি ইবন্ আব্দুল ওয়াহিদ শায়বানী আলজায্‌রী আলমাওয়সিলী যিনি ইবন্ আছীর নামে পরিচিত। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহাবা নামের গ্রন্থ 'উসদুল রাগ এবং ঐতিহাসকি 'আল কামিলের সংকলক। তার রচিত এই ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি উল্লিখিত ঘটনাসমূহের বিবেচনায় অত্যন্ত চমৎকার এতে তিনি সূচনা থেকে ৬২৮ হিজরী পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। মাওসিলের শাসনকর্তাদের একান্ত ব্যক্তি হিসাবে তিনি বাগদাদে আসা যাওয়া করতেন, এবং তিনি তাদের একজনের ওযীরের দায়িত্বও পালন করেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ বছর শাবান মাসে ইনতিকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানে শেষ জীবনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র রূপে অবস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর (৭৫) বছর। আর তার ভাই আবুস সাআদাত মোবারক হলেন জামেউল উসূল ও অন্যান্য গ্রন্থের সংকলক। আর তাদের উভয়ের ভ্রাতা হলেন ওযীর যিয়াউদ্দীন আবুর ফাত্‌হ নাসরুল্লাহ, যিনি ছিলেন বায়তুল মাকাদিস এর বিজেতা দামেস্কের শাসনকর্তা সুলতান আফযল আলী ইবন্ নাসেরের ওযীর। আর মাযীরা ইবন্ উমর সম্পর্কে বলা হয়, তা আব্দুল আযীর ইবন্ উমর নামক এক ব্যক্তির দিকে সম্পকৃত্, যিনি বারকায়ীদের অধিবাসী। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তা উমরের দুইপুত্রের সাথে সম্পৃক্ত, আর এরা হলো আওস ও কামিল, যারা দুজন ছিল উমর ইবন্ আওসের পুত্র।

ইবন্ মুস্‌তাওফী আল্‌আরবালী

মোবারক ইবন্ আহমাদ ইবন্ মোবারক ইবন্ মাওহূব ইবন্ গানীমা ইবন্ গালিব আল্লামা শারাফুদ্দীন আবুল বারাকাত আললাখমী আল আরবালী। তিনি বহুশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন যেমন

হাদীস, আমাউর রিজাল, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি। তিনি বহুগুণের অধিকারী এবং বহুগুণের সংকলক। আল্লামা কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ খাল্লিকান তার 'ওফায়াত' গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার বিশদ জীবনী উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

৬৩১ হিজরীর সূচনা

এ বছরই বাগদাদের মাদরাসা সুলতান সিরিয়্যার নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এবং পূর্বে আর এরূপ মাদরাসা নির্মিত হয়নি। এখানে চার মাযহাবের প্রত্যেক মাযহাবের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক মাযহাবের বাষট্টি জন ফকীহ চারজন মুরীদ এবং একজন মুদাররিস নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া আরও নিয়োগ করা হয়– একজন শায়খুল হাদীস, দুজন ক্বারী, দশজন সার্বক্ষণিক শ্রোতা, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নকারী দশজন শিক্ষার্থী। এছাড়া সেখানে ছিল য়াতীমদের জন্য একটি মকতব এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত দস্তরখান, যা সব সময় রুটি, গোশত ও মিষ্টান্নে পূর্ণ থাকত। এছাড়া থাকত সকলের জন্য হাত খরচ গ্রহণের ব্যবস্থা। এ বছর রজব মাসের পাঁচ তারিখে সেখানে দরসের উদ্বোধন করা হয়। আর এই উদ্বোধনী দরসে স্বয়ং খলীফা মুসতানসির এবং সকল আমীর উমারা, ওযীর, কাযী, সুফী এবং কবি উপস্থিত হন এবং তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকেননি। এ উপলক্ষে বিশাল ভোজের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত মেহমানগণ আহার গ্রহণ করেন এবং বাগদাদের বিশেষ সাধারণ সকলের গৃহে প্রস্তুতকৃত খাবার পৌঁছে দেয়া হয়। এ উপলক্ষে সকল শিক্ষক, ফকীহ, মুয়ীদ এবং উপস্থিতদের মাঝে মূল্যবান পোশাক বিতরণ করা হয়। আর এটা ছিল একটি স্মরণীয় দিন। এ উপলক্ষে দরবারে খিলাফতের কবিগণ চমৎকার ও অভিনব সব প্রশংসা কাব রচনা করেন। ঐতিহাসিক ইবনুস সায়ী তার তারিখে বা ইতিহাস গ্রওন্থে সবিস্তারে ও বিশদভাবে তা উল্লেখ করেছেন। এই মাদরাসায় শাফেয়ী মাযহাবের দরস প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয় ইমাম মুহ্য়ূদ্দীন আবু আবদুল্লাহ ইবন্ ফায্লানকে, হানাফী মাযহাবের জন্য আল্লামা রশীদুদ্দীন আবূ হাফস উমর ইবন্ মুহাম্মাদ আলফার গানীকে, হাম্বলী মাযহাবের জন্য ইমাম মুহয়ুদ্দীন য়ুমুক ইবন্ শায়খ আবুর ফারাজ ইবন্ জাওয়ী, অবশ্য তিনি পত্রবাহক দূতরূপে জনৈক সুলতানের সাক্ষাতে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার স্থলবর্তীরূপে তার পুত্র আব্দুর রহমান এসময় দরস প্রদান করেন। আর এ সময় মালেকী মাযহাবের দরস প্রদান করে নেককার আরিম শায়খ আবুল হাসান আলমাদাবিবী আল বালিকী। অবশ্য তিনি মূলত অন্যকোন শায়খ নির্ধারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নায়েবরূপে এই দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া এই মাদরাসার জন্য বিপুল সংখ্যক উন্নতমানের এবং অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তক ওয়াক্ফ্ করা হয়, যেমনটি আর ইতোপূর্বে শোনা যায়নি। এই মাদরাসার নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মুআয়্যামুদ্দীন আবূ তালিব মুহাম্মাদ ইবন্ আলকাযী, যিনি পরবর্তীকালে ওযীর নিযুক্ত হন। আর এ সময় তিনি দারুল খিলাফতের উসতাদ ছিলেন।

মাদরাসা সুলতান সিরিয়্যার উদ্বোধন দিবসে তাকে এবং ওযীর নাসীরুদ্দীনকে মূল্যবান শাহী পোশাক প্রদান করা হয়। অতঃপর এ বছর জিলকদ মাসের চৌদ্দ তারিখ শাফেয়ী মাযহাবের মুদাররিসরা শিক্ষকের স্থলে নিয়োগ দেয়া হয় প্রধান বিচারপতি আবুল মাআলী আবদুর রহমান ইবন্ মুকবিলকে তিনি একই সাথে উভয় দায়িত্ব পালন করতেন। আর এটা করা হয় শায়খ

মুহয়্যুদ্দীন ইবন্ ফাযলানের ওফাতের পর। আর শায়খ মুহয়্যুদ্দীন কিছুদিন কাযীর দায়িত্ব পালন করেন এবং নিযামিয়্যা ও অন্যান্য মাদরাসার পাঠদান করেন। অতঃপর তিনি অপসারিত হন পরে তিনি খলীফার প্রসন্নতা লাভ করেন। এরপর তিনি শেষ বয়সে মাদরাসা সুলতান সিরিয়্যাতে দারস প্রদান করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার পর এই দায়িত্ব গ্রহণ করন ইবন্ মুকবিল। আল্লাহ তাকে রহম করুন। এছাড়া এ বছর সুলতান আশরাফ বাবুস সগীরের বাহিরের দিকে মসজিদে আররাহ আবাদ করেন এবং তার কাছে খ্রিষ্টান রাজা আনবৃরূর দূত আগমন করে।

সুলতানের জন্য যে সকল উপহার উপঢৌকন এই দূত নিয়ে আসেন, তার মধ্যে একটি শ্বেত ভল্লুক এবং সাদা তুরও ছিল। ঐ ভাল্লুক সম্পর্কে বলা হয় যে, সে সমুদ্রে নেমে মাছ শিকার করে খায়, এছাড়া এ বছর কায়সারিয়্যার ভবন নির্মিত হয় এবং অলঙ্কার ব্যবসায়ীদের সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে পূর্বের লু'লু বাজারটি শূন্য হয়ে পড়ে। তদ্রূপ এ বছর যিয়াদাহ নামক বাজারর দোকানসমূহ নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়।

আল্‌বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : আমাদের সময়ে এই নতুন অলঙ্কার : ব্যবসা কেন্দ্রের পূর্ব প্রান্ত নতুনভাবে নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে মুদ্রা ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ-ব্যবসায়ীরা বসতি গড়ে তোলে। আর এই দুটি ব্যবসাকেই জামে মানুয়ের জন্য ওয়াফফকৃত ছিল। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

আবুল হাসান 'আলী ইবন্ আবূ আলী

ইনি হলেন ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ সালিম ছালাবী, শায়খ সায়ফুদ্দীন আসেদী, অতপর হাসাবী, অতঃপর দামেকী। তিনি হলেন আল্ মুসান্নাফাত ফীল আসলায়, আবকারুল আফফার, দাকাইকুল হাকাইক এবং আহ্‌কামুল আহকাম ফী উমূলিল ফিক্‌হ ইত্যাদি গ্রন্থের সংকলক। প্রথম জীবনে তিনি হাম্বলী ছিলেন, অতঃপর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হন এবং পরে উমূলী, যুক্তিবিদ এবং পিতার্কিকে পরিণত হন। তিনি ছিলেন সদাচারী, সরলমনা, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে অধিক ক্রন্দনকারি। অবশ্য তার ব্যাপারে অনেক্যে কিছু কিছু আপত্তিকর অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, যার সত্য মিথ্যা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। তবে এ ব্যাপারে আমাদের এ ধারণাই প্রবল যে, এ সবের অধিকাংশের কোন সত্যতা নেই। আয়্যুবী সুলতানগণ যেমন সুলতান মুআযয্‌ম এবং সুলতান কামিল তাকে তেমন ভালবাসেন না, তবে শ্রদ্ধা করতেন। মুআযয্‌ম তাকে আযিবিদ্যা মাদারসার পাঠদানের দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর যখন সুলতান আশরাফ শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন, তখন তিনি তাকে অপসারণ করেন। এ সময় তার পক্ষ থেকে মাদরাসাসমূহে এই ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, কেউ যেন তাফসীর হাদীস এবং ফিকহ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের চর্চা না করে : যে ব্যক্তি অন্য কোনো শাস্ত্র (দর্শন, ইলমুল কালাম ইত্যাদি) চর্চা করবে, তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।

এ বছর সফর মাসে ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত শায়খ সায়ফুদ্দীন নিজগৃহে অবস্থান করেন এবং মৃত্যুর পর কাসীয়ুন পাদদেশে অবস্থিত কবর স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান উল্লেখ করেছেন যে, শায়ক সায়ফুদ্দীন বাগদাদে শায়খ আবুল ফাত্হ নাসর এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করেন এবং ইবন্ ফাযলান ও অন্যান্যদের থেকে ইলম হাসিল করেন। এ সময় তিনি 'আল্লামা শরীফকৃত, তরীকায়ে খেলাফ এবং আসআদ মাযহাবীকৃত যাওয়াহিদ তরীকা মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি শামদেশে গমন করেন এবং যুক্তিবিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি মিশরে স্থানান্তরিত হন, ছোট কুরাফায় অবস্থিত শাফেয়ী মাদরাসার মুয়ীদের দায়িত্ব পালন করেন এবং জামে যাফেরীতে দরস প্রদান শুরু করেন, এ সময় তার গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তখন কিছু সংখ্যক লোক তর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাকে বিভিন্ন বাতিল মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে তার নামে পত্র লেখে। এ সময় তার তাদেরই একজনকে তাদের সাথে এমত হতে বলে, সে তখন এই কবিতা পঙক্তি লিখে পাঠায় :

"তারা তার স্তরে উপনীত হতে না পেরে তাকে হিংসা করেছে এবং তার শত্রুতা প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে।"

অতঃপর শায়খ সায়ফুদ্দীন হামা শহরে স্থানান্তরিত হন, অতঃপর সেখান থেকে দামেশকে গমন করেন এবং আযীযিয়্যা মাদরাসায় পাঠদান করেন। অতঃপর তিনি দায়িত্ব থেকে অপসারিত হন এবং এ বছরে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে পর্যন্ত নিজ গৃহে অবস্থান করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আশি বছর। আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন।

আমীর রোকনুদ্দীন ফালাকী

সুলতান আদিলের ভাই ফালাকুদ্দীনের গোলাম। তাকে ফালাকী বলার কারণ তিনি মাদরাসা ফালাকিয়ার ওয়াক্ফকারী, যেমন বিগত হয়েছে এই ব্যক্তি ছিলেন উত্তম আমীরদের অন্যতম। প্রতি রাতের শেষ প্রহরে তিনি তার খাদেমকে নিয়ে জামে মসজিদে চলে যেতেন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতেন। তিনি ছিলেন বাকসংযমী এবং অধিক দান সদকাকারী। কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে তিনি মাদরাসা রুনিয়্যা নির্মাণ করেন এবং তার অনুকূলে অনেক সহায় সম্পত্তি ওয়াকফ করেন এবং তার কাছে একটি কবরস্থান নির্মাণ করেন। মৃত্যুর পর তাকে তার গ্রাম থেকে এখানে বহন করে আনা হয়। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ ইমাম রাযীউদ্দীন

আবূ সুলায়মান ইবন্ মুযাফফর ইবন্ গানিস আলজাবালী আশশাফেয়ী বাগদাদের অন্যতম ফকীহ ও মুফতী এবং দীর্ঘকাল শিক্ষার্থীদের পাঠদানকারী। মাযহাব বিষয়ে তার প্রায় পনের খণ্ডের একটি গ্রন্থ রয়েছে, সেখানে তিনি অভিনব কারণসমূহ এবং আশ্চর্যজনক শর্তসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ছিলেন কোমল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি এ বছর রবিউল আওয়াল মাসের তিন তারিখ বুধবার ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

শায়খ আবদুল্লাহ আরমানী

ইনি হলেন ঐ সকল আবিদ যাহিদের অন্যতম, যারা দেশে দেশে পরিভ্রমন করেছেন এবং পাহাড় পর্বত এবং মরুভূমি, সমভূমিতে বসবাস করেছেন, এবং যারা সমকালীন শীর্ষস্থানীয়

নেককার ও বুযুর্গদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং যারা বিভিন্ন প্রকার কাশফ ও কারামতের অধিকারী ছিলেন। শৈশবকালেই তিনি কুরআন হিফ্য সম্পন্ন করেন এবং হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাব কুদরী মুখস্থ করেন। অতঃপর আধ্যাত্মিক সাধনার আত্মনিয়োগ করেন। আর জীবনের শেষ সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত দামেস্কে অবস্থান করেন এবং কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত হন। তার সম্পর্কে অনেক চমৎকার শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণিত আছে।

এরূপ একটি ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন : একবার আমি ভ্রমণ উপলক্ষে এক শহর অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তখন আমার সেখানে প্রবেশ করতে চাইল। তখন মনে মনে শপথ করলাম, আমি এখান থেকে কোন খাবার গ্রহণ করব না। এরপর আমি সেখানে প্রবেশ করে জনৈক ধোয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন সে আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাল তখন আমি আতঙ্কিত হয়ে শহর থেকে পালিয়ে আসলাম তখন ঐ ব্যক্তি তার সাথে কিছু খাবার নিয়ে আমাকে অনুসরণ করে এসে বলল : এখন খেয়ে নাও, এখন তো তুমি শহরের বাইরে আছ। (অর্থাৎ তাতে তোমার শপথ বজায় থাকবে।) আমি তখন তার কারামতে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম : আধ্যাত্মিকতার এই উন্নত অবস্থানে থেকেও আপনি ধোপার কাজ করছেন? তখন তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন : তুমি কখনও মাথা উঁচু করবে না অর্থাৎ অহঙ্কার করবে না এবং নিজের কোনো নেক আমরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত বান্দা হয়ে থাকবে। তিনি যদি তোমাকে শৌচাগার পরিষ্কার করার দায়িত্বও প্রদান করেন, তবুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন : আমাকে যদি বলা হয় তুমি মৃত, আমি বলব : মাথা পেতে নিলাম।" এ নির্দেশ এবং আমি মৃত্যুদূতকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাব।

তিনি আরও বলেন, একবার আমি আমার ভ্রমণকালে মঠবাসী এক যাজকের সাক্ষাত পেলাম। সে আমাকে বলল : হে মুসলিম ব্যক্তি! তোমাদের কাছে আল্লাহকে পাওয়ার নিকটতম পথ কোনটি? আমি বললাম : নফসের বা মনের কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করা। একথা শুনে সে তার মঠে ফিরে গেল। এরপর হজ্জের সদয় আমি যখন মক্কায় হাযির হলাম, তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, কাবা গৃহের সামনে ইসলাম কবুল করছে, আমি তাকে বললাম, : কে তুমি? তখন সে বলল : আমি সেই যাজক, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম : এখানে তুমি কোন সূত্রে পৌঁছিলে? সে বলল : আপনার কথার সূত্র ধরে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে বলল : আমি নিজের নফসের কাছে ইসলাম পেশ করলাম, কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। তখন আমার বিশ্বাস হলো যে, তা সত্য। ফলে আমি তার বিরোধিতা করে ইসলাম কবুল করে নিলাম। সুতবাং আমি সফলতা লাভ করব।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন : একবার আমি লুবনান পাহাড় অঞ্চলে অবস্থান কালে খ্রিষ্টানদের একটি নৈশ দল আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে শক্তভাবে বেঁধে রাখলো এবং তাদের কাছে আমি কঠিন অবস্থায় শিকার হলাম। দিনের বেলয় তারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এভাবে আমি যখন হাত পা বাঁধা অবস্থায়, এমন সময় মুসলমানদের একটি দল তাদের দিকে আসতে লাগল, তখন আমি কৌশলে তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সতর্ক করলাম। ফলে তারা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেল। অতঃপর যখন তারা চলে গেল, তখন এই খ্রিষ্টানরা এসে আমাকে বলল : কীভাবে তুমি এটা

করতে পারলে? অথচ তাদের হাতে তোমার মুক্তি হতে পারত। তখন আমি বললাম, তোমরা আমাকে আহার দান করেছো, সুতরাং তোমাদের সাহচর্যের চাহিদা হল, তোমাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ না করা, আমার কথা শুনে তারা আমাকে কিছু অর্থ সম্পদ দিতে চাইল কিন্তু আমি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পর তারা আমাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে দিল।

ঐতিহাসিক শাবৃত বলেন : একবার আমি যথেষ্ট পরিমাণ সামুদ্রিক মাছ ভক্ষণের পর বায়তুল মাকদাসে তার সাথে সাক্ষাত করলাম। তার কাছে যখন বলললাম, তখন আমার ভীষণ পানির পিপাসা লাগল। এ সময় তার পাশে একটি জগে ঠাণ্ডা পানি রাখা ছিল, কিন্তু আমি তা থেকে পানি পান করতে লজ্জা বোধ করলাম তখন তিনি রাগত চেহারা নিয়ে জগের দিকে হাত বাড়ালেন এবং তা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : আর কতক্ষণ এভাবে পিপাসায় কষ্ট সহ্য করবে? তখন আমি গান করলাম। বর্ণিত আছে যে, শায়খ আবদুল্লাহ তখন বায়তুল মাকদাস ত্যাগ করে চলে যান, তখন সুলতান সালাহুদ্দীন নির্মিত দেয়াল নতুন ছিল, যা কিছুদিন পর সুলতান মুসাযযস ধ্বংস করেন। তিনি তার শিষ্যদের সাথে যখন দাঁড়িয়ে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন এই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, শীঘ্রই এই দেয়ালে অনেক বেলচার আনাত পড়বে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো : মুসলমানদের বেলচা নাকি খ্রিষ্টানদের তিনি বললেন : মুসলমানদের আর তার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

সাবিত বলেন : তার অনেক ভাল ভাল কারামত কাশফের কথা বর্ণিত আছে। তার সম্পর্কে বলা হয়, তার বংশ মূলত আর্মেনীয় আর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন শায়খ আবদুল্লাহ য়ুনীনীর হাতে। আবার কারও মতে, তিনি রোমক বংশোদ্ভুত তিনি যখন শায়খ আবদুল্লাহ য়ূনীনীর কাছে আগমন করেন, তখন তার মাথায় খ্রিষ্টান যাজকদের টুপি ছিল। তাকে দেখে শায়খ আবদুল্লাহ ইসলামের দাওয়াত দেয়া মাত্র তিনি ইসলাম কবুল করেন তার মা ছিলেন খলীফাপত্নীর ধাত্রী মাতা।

৬৩২ হিজরীর সূচনা

এ বছর সুলতান আশরাফ ইবন্ আদিলের নির্দেশে যানজারী খানা নামক রঙ্গশালা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের অনাচার ও পাপাচার সংঘটিত হত। অতঃপর তিনি সেই স্থানেই জামে তাওবা নামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর এই আমল কবুল করেননি। এছাড়া এ বছরই কাযী বাহাউদ্দীন য়ুসূফ ইবন্ রাফে ইবন্ তামীম ইবন্ শাদ্দাদ হালবী ইনতিকাল করেন। যিনি ছিলেন হালবের শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস ও যুদ্ধবিগ্রহের অতীত কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে তার বিশেষ জানাশোনা ছিল। তিনি বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন এবং তা বর্ণনা করেন। আর এ বছর ইনতিকাল রেন শায়খ শিহাবুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবন্ মুতাহ্হার ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আসরুন হালাবী। তিনি ছিলেন আবিদ, যাহিদ এবং বিশিষ্ট ফকীহ। তার প্রায় বিশজনের মতবাঁদী ছিল। ফলে অত্যদিক সহবাসে লিপ্ত হওয়ার কারণে তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন এবং কাসীয়ুনে সমাহিত হন তার আরেকটি পরিচয় হলো তিনি কুতুবুদ্দীন ও তাজুদ্দীনের পিতা। আরও ইনতিকাল করেন শায়খ ইমাম সাইফুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল্দালী আশ্শাফেয়ী। তিনি ছিলেন বাগদাদের নিযামিয়া

মাদরাসার বিশিষ্ট ফকীহ, মুফতী ও দরস প্রদানকারী। শায়খ আবু ইসহাকের 'তানবীহ' গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে তার তিনি এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। এবং ইনতিকাল করেন শায়খ ইমাম খতীব আবূ মুহাম্মাদ হামদ ইবন্ হাসীদ ইবন্ মাহমূদ ইবন্ হাসীদ ইবন্ আবুল হাসান ইবন্ আবুল ফারাজ ইবন্ মিফতাহ আততামীমী দীনীওয়ারী। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ এবং দীশওয়ার শহরের খতীব ও মুফতী। তিনি বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসার ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, অতঃপর তার শহর দীনাওয়ারে ফিরে আসেন। তিনি একাধিথক গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন্ সায়ী তার থেকে নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্ক্তি-এর উদ্ধৃত করেছেন : "আমার প্রেমাকাঁক্ষা একক ঝাণ্ডার দণ্ড থেকে তার সূত্রে আমাকে প্রেমকাহিনীসমূহ শুনিয়েছে।

আর প্রভাত সমীরণের প্রবাহ আমাকে শুনিয়েছে প্রিয়ার সেই নিবাসের কথা, কাটাগাছের ঝোপের কথা, এবং সুদৃশ্য টিলাসমূহের কথা। যে আমার প্রেম ও যাতনা অবিভাগ্য আমি কবরে শায়িত হওয়া পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন হবে না।

এছাড়া ঐতিহাসিক আবু শামা 'আওয়াবিফুল মাআরিফ গ্রন্থের প্রণেতা শায়খ শিহাব সাহরাওয়াদীর ওফাত এ বছরে সংঘটিত হয়েছে বলে 'যায়ল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার জন্মকাল হল ৫৩৯ হিজরী, এবং তার বয়স নব্বই বছর অতিক্রম করেছিল। তবে ঐতিহাসিক সাবৃত ৬৩০ হিজরীতে তার ওফাতের কথা উল্লেখ করেছেন, যে বিগত হয়েছে।

হালবের প্রধান কাযী

ইনি হলেন আবুল মাহাসিন যুয়ুম ইবন্ রাফে ইবন্ তামীম ইবন্ উত্‌বা ইবন্ মুহাম্মাদ আল্ আসাদী আল মাওসিলী আশ শাফেয়ী। তিনি ছিলেন ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞানের অধিকারী, ক্বারী, গুণবান এবং সুলতানও শাসকদের কাছে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি হালক শহরের বাসিন্দা ছিলেন এবং সেখানে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ বেশ কিছু কবিতা পঙক্তি রয়েছে। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

ইবন্ ফারিয

তিনি আধ্যাত্মিকতা ও সুফীবাদ বিষয়ে 'তা বর্ণ নির্ভর কাসীদা বা কবিতার সংকলক। তার পূর্ণ নাম আবু হাফস উমর ইবন্ আবুল হাসান 'আলী ইবন্ মুরশিদ ইবন্ আলী। তার পিতৃপুরুষদের নিবাস হল শাম দেশের হাসা শহর, আর জন্ম, বসবাস এবং মৃত্যু হল মিশরে। তার পিতা নারী পুরুষের মীরাছ বণ্টনের হিসাব লিখতেন। উল্লিখিত তাসাউস সংক্রান্ত কাসীদার কারণে আমাদের একাধিক মাশায়েখ তার সমালোচনা করেছেন। আমাদের শায়খ আবু আবদুল্লাহ যাহাবী তার মীযানের ইবন্ ফারিযের কথা উল্লেখ করেছেন। তিন এ বছর প্রায় সত্তর বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

৬৩৩ হিজরীর সূচনা

এ বছরই সুলতান কামিল এবং তার ভাই সুলতান আশরাফ ফোরাত নদী পুনঃখনন করান এবং রোমক বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ার পর তাদের সাম্রাজ্য সংস্কারে মনোনিবেশ করেন।

এছাড়া এ বছর সুলতান কামিল রাহা দুর্গ বিরান করেন এবং দানসীরে প্রচণ্ড শক্তি নিয়োগ করেন। আর এ বছর এই মর্মে সাওসিলের প্রশাসক বদরুদ্দীনের পত্র আসে যে, রোমকবাহিনী ৫০ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তখন উভয় সুলতান দ্রুত দামিশকে ফিরে আসেন। আর রোমকবাহিনী তাদের সাম্রাজ্যের দিকে ফিরে পূর্বের ন্যায় অবরোধ আরোপ করে। এদিকে সে বছর তাতারীরা দেশে ফিরে আসে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন কবি ইবন্ আনীন। ৬৩০ হিজরীর আলোচনায় তার জীবনী বিগত হয়েছে।

কবি হাজেরী

ইনি ছিলেন পরিপূর্ণ কবি এবং প্রসিদ্ধ দীওয়ান সংকলন তার পূর্ণ নাম ইসা ইবন্ সানজার ইবন্ বাহরাম ইবন্ জীবরাঈল ইবন্ খুমার তাকীন ইবন্ তাশতাকীন আরবীলী। ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান তার জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং তার বহু কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে :

"হে ঐ ব্যক্তি যাকে প্রত্যাশা নিকটবর্তী করেছে, আল্লাহ জানেন আপনার বিচ্ছেদ আমার প্রাণের অবশিষ্টাংশই শুধু বাকী রেখেছে। আপনি আপনার পত্র প্রেরণ করুন এবং তাতে সান্ত্বনাবাণী লিখে দিন, হতে পারে ব্যাকুলতায় তা পৌছার পূর্বেই আমার মৃত্যু ঘটবে।" তিলক সম্পর্কে তার দুটি কবিতা পঙক্তি হল :

"আর এমন অনেক ছিপেছিপে ছাড়নের অধিকারী রয়েছে যার কৃষ্ণকেশ ও শুভ্রললাটের আলো-অন্ধকারে অন্যরা অবস্থান করে। তার গণ্ডদেশের কৃষ্ণতিলককে অপছন্দ করার কিছু নেই, কেননা, প্রত্যেক সুন্দর চেহারায়.কাল তিলক রয়েছে।

ইবন্ দিহ্‌য়া

ইনি হাফেজ আবুল খাত্তাব উমর ইবন্ হাসান ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ফারাজ ইবন্ খালাফ ইবন্ কাওমাস ইবন্ মুযলাল ইবন্ বেলাল ইবন্ বদর ইবন্ আহমাদ ইবন্ দিহ্‌য়া ইবন্ খলীফা কালবী তিনি মিশরীয় অঞ্চলের শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি হলেন ঐ অঞ্চলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শায়খুল হাদীস।

ঐতিহাসিক সাবত বলেন : মুসলমানদের নিন্দা ও দোষচর্চার ব্যাপারে ইবন্ ফিহ্‌য়া ছিল ইবন্ আনীনের মত। সে কথাকে অতিরঞ্জিত করতো ফলে লোকজন তার থেকে রিওয়ায়াত বর্জন করে এবং তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে। তবে সুলতান কামিল তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি তার এই অবস্থার কথা জানতে পারেন তখন তাকে অপমানজনকভাবে দারুল হাদীসের দায়িত্ব থেকে অপসারিত করেন তিনি। এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে কায়রোতে ইনতিকাল করেন এবং কারাফা কবরস্থানে সমাহিত হন।

শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ সামা বলেন : তার ব্যাপারে শায়খ শাহাবীর বেশ কিছু চমৎকার কবিতা পঙক্তি রয়েছে। ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান তার বংশ সূত্র উল্লেখের পর বলেন যেমন পূর্বে গত হয়েছে। ইবন্ চিহরার হাতের লেখা থেকে তিনি তার এই বংশ সূত্র উদ্ধৃত করেছেন

এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার আম্মা হলেন আমতুর রহমান বিনত্ আবূ আবদুল্লাহ ইবন্ বাস্সাম মূসা ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ হুসায়ন ইবন্ জা'ফর ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আলী ইবন্ মূসা ইবন্ জা'ফর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ হুসায়ন ইবন্ আলী ইবন্ আবু তালিব। এ কারণে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখতেন: তিনি দুই নসরের বা বংশধারার অধিকারী ইবন্ দিহ্য়া ইবন্ হাসান ওয়াল হুসায়ন। ইবন্ খাল্লিকান বলেন : তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আলিম, প্রসিদ্ধ গুণী এবং হাদীস শাস্ত্র এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী। এছাড়া তিনি আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ এবং আরবদের কাব্য ও ইতিহাস সম্পর্কেও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত তিনি মরক্কোতে দারস প্রদানের কাজে ব্যস্ত হন। অতঃপর সেখান থেকে শামে এবং শাম থেকে ইরাকে গমন করেন। আর ৬০৪ হিজরীতে তিনি আরাবীলে গিয়ে যখন পৌছেন, তখন দেখতে পান তার শাসক সুলতান মুসাযযম মুযাফফরুদ্দীন ইবন্ যায়নুদ্দীন মীলাদ শরীফ না নবী জন্মোৎসব পালনে বেশ যত্নবান। ফলে তিনি তার জন্য কিতাবুত্তানবীর নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং নিজে তাকে তা পড়ে শোনান। ইবন্ দিহয়ার গ্রন্থ পাঠ শুনে সুলতান তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করেন।

ইবন্ খালদূন বলেন, সুলতান মুআযযমের উপস্থিতিতে আমরা ছয়টি মজলিশে তা শ্রবণ করেছি ৬২৬ হিজরীতে। আল্-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আমি এই কিতাবের সন্ধান পেয়েছি এবং তা থেকে বেশ কিছু চমৎকার ও উপকারী বিষয় লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি।

ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান বলেন : ইবন্ দিহ্য়া জন্মগ্রহণ করেন ৫৪৪ হিজরীতে। তবে কারও কারও মতে ৫৪৬ কিংবা ৫৪৯ হিজরীতে। আর এ বছর তিনি ইনতিকাল করেন। আর তারপর তার ভাই আবূ আমর উছমান মিশরের কামেলিয়া দারুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন এবং তার এক বছর পর ইনতিকাল করেন।

আল্-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : লোকজন তার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছে। কেউ কেউ তাকে মাগরিব নামাযের কসর সংক্রান্ত জাল হাদীসের তৈরীর ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছে। এই হাদীসের রাজীগণ কেমন তা জানার জন্য আমি তার সনদ সম্পর্কে অবগত হতে চাইতাম। আর ইবন্ মুনযির ও অন্যান্যরা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের নামায কসর না হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত। আর আল্লাহ তা'আলা তার নিজ অনুগ্রহ ও মহানুভবতা দ্বারা আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করুন।

৬৩৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরই তাতারীগণ মিনজানীকের সাহায্যে আরাবীল শহর অবরোধ করে এবং নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে তা জবর দখল করে নেয়। এ সময় তারা যোদ্ধাদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করে। তবে তারা নগর দুর্গ দখল করতে পারেনি, খলীফার প্রতিনিধি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় নীতিকাল এসে পড়ে এবং তারা আরাবীল ত্যাগ করে নিজ দেশে ফিরে যায়। বর্ণিত আছে যে খলীফা তাতারীদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন, ফলে তারা

পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। এছাড়া এ বছর কায়ফা দুর্গের অধিকর্তা সুলতান সারিহ আয়ুব ইবন্ কাসিল সুলতান জালালুদ্দীনের অবশিষ্ট যোদ্ধাদের কাজে লাগান ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। এবং এ বছর ফুরাত নদী পার হওয়ার সময় সুলতান আশরাফ মূসা ইবন্ 'আদিল তার ভাই কামিল থেকে রাক্কা শহরের শাসন কর্তৃত্ব দাবী করেন, যাতে করে তা তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটায় এবং তার পশুপালের জন্য তৃণঘাস সরবরাহ করতে পারে। তখন সুলতান কামিল বলেন : বানু উমায়্যার রাজধানী দামেশক তার কর্তৃত্বাধীন হওয়ার কি তার জন্য যথেষ্ট নয়? অতঃপর সুলতান আশরাফ আমীর ফালকুদ্দীন ইবন্ মাসীবীকে সুলতান কামিলের কাছে পাঠান। তখন তিনি তাকে এর কঠোর জওয়াব দেন। তিনি তাকে উদ্দেশ্যে করে বলেন : সে আর সাম্রাজ্য দিয়ে কী করবে? ন্যায়কদের সাহচর্য এবং তাদের পেশা শিক্ষা করাই তার জন্য যথেষ্ট। একথা শুনে সুলতান আশরাফ রাগান্বিত হন এবং তাদের দুজনের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার পর সুলতান আশরাফ হাসা, হালব, পূর্বদেশে দুত প্রেরণ করেন এবং ঐ সকল ভূখণ্ডের শাসকদের সাথে তার ভাই কামিলের বিরুদ্ধে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সুলতান আশরাফ আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তার ভাইয়ের শাসন কর্তৃত্ব খর্ব করে ফেরাতে পারত। কেননা, বদান্যতা ও বীরত্বের কারণে এ সকল ভূখণ্ডের শাসনকর্তারা তার প্রতি বেশ আকৃষ্ট ছিলেন এবং কৃপণতা ও অনুদাতার কারণে তার ভাই সুলতান কামিল থেকে বিমুখ ছিলেন। কিন্তু তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন। এ ছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

সুলতান আযীয জাহির

ইনি হালকের শাসনাকর্তা, কুদুস বিজেতা মুহাম্মাদ ইবন্ সুলতান আলমালিক আয্যাহির গিয়াসুদ্দীন গাযী ইবন্ আলমালিক আননাসের সালাহুদ্দীন। তিনি, তার পিতা এবং তার পুত্র নাসের সুলতান নাসেরের রাজত্বকাল থেকে হালবের শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী সুলতান আযীযের মাতা ছিলেন খাতুন বিনতে সুলতান আদিল আবু বকন ইবন্ আয়্যুর। তিনি ছিলেন সুদর্শন মহানুভব এবং সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তার রাষ্ট্রের পরিকল্পবিদ ছিলেন তাওয়াশী শিহাবুদ্দীন তিনি ছিলেন অন্যতম আমীর। তারপর তার রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র নাসের সাল্লাহুদ্দীন যুমুক। আর আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক জানেন।

রোম সুলতান

তিনি সুলতান কায়কোবাদ আলাউদ্দীন, রোম দেশের শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল ও শ্রেষ্ঠতম সুলতানদের অন্যতম। সুলতান আদিল তার কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেন এবং তার গর্ভে সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। এক সময় তিনি মাযীরা ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং সুলতান কামিল মুহাম্মাদের হাত থেকে তার অধিকাংশ রাজত্ব দখল করে নেন। এছাড়া তিনি সুলতান আশরাফ মূসার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে খাওয়ারীযমদের পর্যুদস্ত করেন। আল্লাহ্ তাদের দুজনকে রহম করুন।

শায়খ নাসেহ হাম্বলী

এ বছর মুহাররমের তিন তারিখ শায়খ নাসেহুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন্ নাজম ইবন্ আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন্ শায়খ আবুল ফারাজ আশ্‌শীরাযী ওফাত লাভ করেন। আর এরা সাহাবী হযরত সাদ ইবন্ উবাদার বংশধারায় সম্পৃক্ত। শায়খ নাসেহ জন্মগ্রহণ করেন ৫৫৪ হিজরীতে। তিনি কুরআন হিফয্ করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন। মাঝে মাঝে তিনি ওয়ায নসহিত করতেন। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি হাফেয শায়খ আব্দুল গনীর জীবদ্দশায় ওয়ায নসীহত করেছেন। তিনি হলেন মাদরাসা সালেহিয়্যার প্রথম মুদাররিস, তার রচিত একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ইবন্ মুনা বাগদাদীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গুণবান ও নেককার ব্যক্তি। তিনি সালেহিয়্যাতে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

কামাল ইবন্ মুহাজির

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। প্রচুর দান সদকাকারী এবং মানুষের প্রতি সদাচারী। তিনি এ বছর জুমাদাল উলা মাসে হঠাৎ দামেশকে ইনতিকাল করেন। অতঃপর কাসীয়ুনে সমাহিত হন। তখন সুলতান আশরাফ তার সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, যার পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ দীনার এ গুলির মধ্যে ছিল একশ দীনার, একটি তাসবীহ, যার প্রতিটি দানা ছিল কবুতরের ডিম আকৃতির মুক্তাদানার মত।

শায়খ হাফিয আবু আমর উছ্মান ইবন্ ফিহ্য়া

যিনি ছিলেন হাফেল আবূল খাত্তাব ইবন্ ফিহ্য়ার ভাই দারুল হাদীস কামিলিয়্যা থেকে যখন তার ভাই অপসারিত হন, তখন তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং অবশেষে এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। হাদীস শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

কাযী আব্দুর রহমান তিকরীতী

তিনি ছিলেন কারাক শহরের বিচারক এবং মাদরাসা যবদীনার শিক্ষক। তার মাদরাসার ওয়াক্ফ যখন বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন তিনি প্রথম কুদসে গমন করেন, অতঃপর দামেশকে সেখানে তিনি কাযীদের স্থলবর্তী রূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন গুণবান, চরিত্রবান এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

৬৩৫ হিজরীর সূচনা

এ বছরই সুলতান আশরাফ এবং তার ভাই সুলতান কামিল ইনতিকাল করেন। দারুল হাদীস আশরাফিয়া এবং জামে তাওবা ও জামে জাররাহ এর প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আশরাফ মূসা ইবন্ আদলি মৃত্যুবরণ করেন। এ বছর মুহাররম মাসের চার তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন মানসূরিয়া দুর্গে এবং প্রথমে সেখানেই সমাহিত হন। অবশেষে কালাসার উত্তরে তার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সমাধি নির্মিত হলে, তাকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়, জুমাদাল উলা মাসে। আর তার ব্যধির সূচনা হয় বিগত বছর রজব মাসে এবং একই সাথে তিনি বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যধির শিকার হন। এমনকি চিকিৎসক তার মাথায় অস্ত্রোপাচার করতে বাধ্য হন। এ বছর শেষের

দিকে তার ব্যাধি আশঙ্কাজনক স্তরে পৌঁছে যায় এবং একই সাথে তিনি গুরুতর পেটের পীড়ার শিকার হন। ফলে তিনি একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এ সময় তিনি দুইশত গোলাম বাঁদী আযাদ করেন, সৌভাগ্য নিবাস নামে পরিচিত ফারুখ শাহের বাসগৃহ এবং নায়রাকে অবস্থিত তার ফলবাগান তিনি ওয়াক্‌ফ করেন এবং বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ দান করেন। এছাড়া তিনি এ সময় তার কাফনের কাপড় আনিয়ে নেন, যা তিনি নেককার মাশায়েখ ও নিঃস্ব দরিদ্রদের পরিধেয় থেকে প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহানুভব সাহসী এবং 'আলিম উলামাদের প্রতি বদান্য; বিশেষত, হাদীস চর্চায় নিয়োজিতদের প্রতি। তাদের জন্য তিনি সাফহে একটি দারুল হাদীস এবং মদীনা মাফেয়্যিাতে একটি দারুল হাদীস নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পাদুকা স্থাপন করেন। আর ব্যবসায়ী নিযাস ইবন্ আবুল হাদীস থেকে এই পাদুকা লাভের জন্য তিনি সবসময় তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। কিন্তু নিযাস এ ব্যাপারে কৃপণ ছিলেন। ফলে সুলতান আশরাফ তার থেকে এই পাদুকার একটি টুকরা নেয়ার সংকল্প করেন। অতঃপর সেই সংকল্প ত্যাগ করেন এই আশঙ্কায় যে, তাহলে হয়তো ইবন্ আবু হাদীস সম্পূর্ণটাই নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইবন্ আবুল হাদীদের মৃত্যু নির্ধারণ করেন দামিশকে ফল তখন তিনি ঐ পাদুকার ব্যাপারে সুলতান আশরাফের অনুকূলে ওসিয়ত করেন। আর আশরাফ তা দারুল হাদীসে স্থাপন করেন। এছাড়া সেখানে তিনি বহুমূল্যবান গ্রন্থ আমদানি করেন। এবং আকাবিয়্যাতে 'জামে তাওবা' নির্মাণ করেন, যেখানে পূর্বে যানজারীর রঙ্গশালা ছিল। এ সময় তিনি আরও একাধিক মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি জনপ্রথা করেন ৫৭৬ হিজরীতে এবং আমীর ফখরুদ্দীন 'উসমান যান্‌জীর তত্ত্বাধানে কুদ্‌স শরীফের লালিত পালিত হন। তার পিতা তাকে স্নেহ করতেন, তেমনি তার ভাই মুআযযমও। অতঃপর তার পিতা তাকে জাযীদার একাধিক শহরের প্রশাসক নিয়োগ করেন। এসব শহরের অন্যতম হলো রাহা হাররান ইত্যাদি। অতঃপর তিনি যখন কালাত শহরের কর্তৃত্ব লাভ করেন, তখন তার রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান এবং সুন্দরতম জীবন চরিত্রের অধিকারী। শরাব পানের অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও নিজ স্ত্রীকে বাঁদী ব্যতিত অন্য কোনো নারীর প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল ন। আর এটা ছিল আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

ঐতিহাসিক সাব্‌ত বলেন : একদিন আমি খালাতে আমার কক্ষে অবস্থান করছিলাম, এমন সময় খাদিম এসে বলল, দরজায় একজন স্ত্রীলোক আপনার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থী। এমন সময় স্ত্রীলোকটি ভিতরে প্রবেশ করল। এমন সুশ্রী স্ত্রীলোক আমি কখনও দেখিনি। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, সে হলো আমার পূর্বে যিনি সালাতের সুলতান ছিলেন তার কন্যা। অভিযোগ উথাপন করল যে, আমার দ্বাররক্ষী তার একটি জায়গীর জবর দখল করেছে এবং তার বসবাসের জন্য একটি বাড়ির প্রয়োজন। আর বর্তমানে সে সূচিকর্মের পেশা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছে। একথা শুনে আমি তার জায়গীর ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ পদান করলাম এবং তাকে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি প্রদান করলাম। আর আমি, সে প্রবেশ করার সময় তার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাকে আমার সামনে বসার স্থান দিয়েছিলাম এবং সে যখন তার চেহারা অনাবৃত করেছিল, তখন আমি তার চেহারা আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তার সাথে ছিল

এক বৃদ্ধা। তার প্রয়োজন শেষ হলে আমি তাকে বললাম : এবার আল্লাহ্‌র নামে উঠুন। তখন বৃদ্ধা বলল : মহামান্য সুলতান! আজ রাতে সে আপনার খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করতে এসেছে। তখন আমি বললাম : আল্লাহ্‌র পানাহ! এটা হতে পারে না। এ সময় আসি মনে মনে নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করলাম যে, সেও এমন অবস্থার শিকার হতে পারে কোন একদিন। অতঃপর স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে আর্মেনীয় ভাষায় বলতে লাগল : আল্লাহ্ আপনাকে রক্ষা করুন, যেভাবে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আর এ সময় আমি তাকে বললাম : যে কোনো প্রয়োজন হলেই আমার দ্বারস্থ হতে পার, আমি তোমার প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকব। অতঃপর সে আমার জন্য দু'আ করে চলে গেল। তখন আমার মন বললো : হালালের পাশে তো হারাম থেকে বেঁচে থাকার অবকাশ রয়েছে। তুমি তাকে বিবাহ করে নাও তখন আমি বললাম : না! আল্লাহ্‌র কসম! এটা কখনও হতে পারে না। কোথায় লজ্জা-শরম, কোথায় মহানুভবতা ও নৈতিকতা? তিনি আরও বলেন : আমার জনৈক ক্রীতদাস তার এক পুত্র রেখে মারা গেল, তার মত সুশ্রী ও সুঠাম তরুণ সদাচরন দেখা যায় না। পিতৃহীন এই তরুণকে স্নেহবশত আমার নিকট সান্নিধ্যে রাখতাম। যারা বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারত না, তারা আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করত। সচরাচর ঘটনাক্রমে এই তরুণ অন্যায়ভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন নিহতের অভিভাকগণ তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনল। তখন আমি তাদেরকে বললাম ; বিষয়টি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত কর। তখন তারা তা সাব্যস্ত করল। তখন আমি তাদেরকে দিয়াত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলাম, এমনকি বুকের পরিবর্তে দশটি দিয়াত প্রদান করতে চাইলাম। কিন্তু তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর তারা আমার চলার পথে দাঁড়িয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করে বলল : আমরা তো তার হত্যা করার বিষয়টি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি। তখন আমি নিরুপায় হয়ে বললাম : তোমরা তাকে নিয়ে যাও। তখন তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাদের নিহত ব্যক্তির কাসাস রূপে তাকে হত্যা করল। তারা যদি তার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে আমার রাজত্বও দাবী করতো, তাহলে আমি তাদেরকে তাই প্রদান করতাম। কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা বোধ করলাম। নিজের কর্তৃত্ব ও প্রভাব দ্বারা আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিধান কার্যকর হবার পথে প্রতিবন্ধক হতে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন।

আর তিনি যখন ৬২৬ হিজরীতে রামশাক শহর অধিকার করেন। তখন তার ঘোষক সেখানে ঘোষণা দেয় যে, কোন ফকীহ যেন তাপসীর হাদীস এবং ফিকহ ব্যতীত অন্য কোনো শাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ না করে যদি কোনো ব্যক্তি যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি চর্চায় লিপ্ত হয়, তবে তাকে সে শহর থেকে নির্বাসিত করা হবে। আর তার আমলে এই শহর ছিল সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, ন্যায়, ইনসাফ ও দান সদকার প্রাচুর্যের প্রতীক। এই শহরের দুর্গ সারা রমযান মাসব্যাপী রাত্রিক্রমে উন্মুক্তদ্বার থাকত, অথচ সেখানে বিরাজমান করত এক সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আর তার অধিকাংশ মজলিশ হত্যা মাসজিদে আবূ দায়দা-তে যা তিনি পূর্ণনির্মাণ ও সুসজ্জিত করেন। তিনি ছিলেন কল্যাণ চিহ্ন ও সৌভাগ্যের অধিকারী কখনও তার কোনো ঝাণ্ডা ভাঙেনি। তিনি শায়ক যুবায়দীকে বাগদাদ থেকে ডেকে পাঠান এবং নিজে লোকজন সাথে নিয়ে তার কাছে বোখারী শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থ শ্রবণ করেন। আর হাদীস শাস্ত্র ও হাদীস শাস্ত্র চর্চাকারিদের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। তার মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল, তিনি সবুজ পোশাক

পরিহিত অবস্থায় বুযুর্গের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কীভাবে সম্ভব হবে? আপনি তো শরাব পানে আসক্ত ছিলেন। যে শরীর দিয়ে আমি তা করতাম, তাতো তোমাদের কাছে, আর যে আত্মা দিয়ে এদেরকে ভালবাসতাম, তা আজ এদের সাথে। আল্লাহ তাকে রহম করুন, তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা, আল্লাহ্র রাসূল ইরশাদ করেছেন : "মানুষের অবস্থা হবে তার প্রিয়জনের সাথে তিনি তার পরবর্তী শাসকরূপে তার ভাই ইসমাইলের অনুকূলে অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অতঃপর যখন তার ভাই ইনতিকাল করেন, তখন তিনি রাজকীয় শানের সাথে আরোহণ করে বের হন এবং লোকজন তার সম্মুখভাগে পদযাত্রা করে অগ্রসর হয়। আর পাশাপাশি আরোহী রূপে সাহচর্য প্রদান করেন হিমসের শাসনকর্তা এবং ইযযুদ্দীন আয়বাক আল্‌মুআয্‌যমী। এছাড়া তিনি একদল দামেশকবাসীদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, যাদের সম্পর্কে বলা হত যে, তারা সুলতান কামিলের অনুসারী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আলিম তাআসীফ এবং ইবন্ মিযহারের পুত্রগণ। তিনি এদেরকে বুসরা শহরে আটকে রাখেন এবং হারীরীকে আর কখনও দামেশকে প্রবেশ না করার শর্তে 'আযার্য' দুর্গ থেকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর সুলতান কামিল মিশর থেকে আগমন করেন এবং তার সাথে যোগ দেন কারাক, তাবলীস এবং কুদসের শাসনকর্তা সুলতান নাসের দাউদ। এরপর তারা একযোগে কঠোরভাবে দামেশক অবরোধ করেন। এদিকে সুলতান সালিহ ইসমাইল তাকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন, অবরোধের পর সুলতান কামিল দামেশকের বিখ্যাত বারাদা প্রশ্রবণের পানিকে 'ছাওরার' দিকে প্রবাহিত করে (যাতে অবরোধের উদ্দেশ্যে পূর্ণ হয়)। এছাড়া এ সময় অনেক কিছু জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। ফলে দামেশস্কবাসীদের অনেকে নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং অনেকে অগ্নিদগ্ধ হন এবং বহু দুর্ঘটনা ঘটে। অতঃপর এ বছর জামাদিউল উলা মাসের শেষদিকে সুলতান সালিহ ইসমাইল দানেশদের শাসন কর্তৃত্ব তার ভাই সুলতান কামিলের হাতে অর্পণ করেন এই শর্তে যে, তিনি নিজে বালাবাক এবং বুসরা শহরদ্বয়ের শাসনকর্তৃত্ব ভোগ করবেন। এ সময় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। আর তাদের দুভাইয়ের মাঝে সন্ধি সম্পন্ন হয় কাযী মুহয়ুদ্দীন য়ুয়ুফ ইবন্ শায়খ আবুর ফারাজ ইবন্ জাওযীর মধ্যস্থতায়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন দামেশকে অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি খলীফার দূতরূপে দামেশকে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এরপর সুলতান কামিল যখন দামেশকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ফারাক ইবন্ মাসীরীকে দুর্গের জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেন, যেখানে সুলতান আশরাফ তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন।

এছাড়া এ বছর জুমাদাল আখিরা মাসের ছয় তারিখ সোমবার সুলতান কামিল জামে দামেশকের ইমামদের[১] প্রতি নির্দেশ জারী করেন যে পেশ ইমাম ব্যতীত তাদের কেউ মাগরিবের নামাযে ইমামতি না করে। কেননা, তারা একই সময়ে একাধিক জামা'আত করার কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। এটা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন আমাদের সময়ে এখন তারাবীর নামাযে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সকলে এক ইমামের ইকতেদা করে নামায পড়ছে। তিনি মিম্বরের নিকট অগ্রগর্তী মেহরাবে দাঁড়িয়ে পড়িয়ে থাকেন।

---

১. অর্থাৎ সে সময় প্রত্যেক মাযহাবের ইমাম– নিজ নিজ মাযহাবের অনুসারীদের নিয়ে পৃথক পৃথক জামা'আত করতেন। সুলতান কামিল এ প্রথা রহিত করে দেন।

সুলতান কামিলের মৃত্যু

মুহাম্মাদ ইবন্ আদিল (রহ.), যিনি সুলতান কামিল নামে সুপরিচিত। তিনি সুস্থ সবল ভাবে মাত্র দুই মাস শাসন পরিচালনা করেন। এরপরই বহু রোগব্যাধির শিকার হয়ে পড়েন। তন্মধ্যে রয়েছে, কাশি, উদারময়, সর্দি এবং পায়ের সমস্যা। ঘটনাক্রমে তিনি মৃত্যুরণ করেন দারুল কাসাবার এক ছোট্ট ঘরে। এটাই হল সেই ঘর, যে ঘরে তার পিতৃব্য সুলতান নাসের সালাহদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। অতিরিক্ত সমীহের পাত্র হওয়ার কারণে মৃত্যুর সময় তার কাছে কেউ ছিল না। ফলে মৃত্যুর বেশ পরে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৭৬ হিজরীতে। মাওদূদের পর তিনিই ছিলেন সুলতান আদিলের জ্যেষ্ঠপুত্র। জ্ঞান বুদ্ধির পরিপক্কতার কারণে সুলতান আদিল তাকেই তার স্থলাবর্তীরূপে অসিয়ত করে যান। তার বোধ উপলব্ধি ছিল বেশ উন্নত, তিনি আলিম উলামাদের ভালবাসতেন এবং তাদেরকে দুর্বোধ্য সব প্রশ্ন করতেন। সহীহ মুসলিম প্রসঙ্গে তার উৎকৃষ্ট আলোচনা রয়েছে। তিনি ছিলেন মেধাবী, সমীহের পাত্র, শক্তিমত্তার অধিকারী–এবং ন্যায়পরায়ণ। প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন বিরাট মর্যাদা এবং বীরত্বের অধিকারী। তিনি তিরিশ বছর মিশর শাসন করেন। তার শাসনামলে পথ-ঘাট ছিল নিরাপদ এবং প্রজারাও ছিল ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের অনুগামী। কেউ কারও প্রতি জুলুম বা অন্যায় করতে সাহস পেত না। আসাদ অঞ্চলের জনৈক কৃষকের ঘর ছিনিয়ে নেয়ার কারণে তিনি একদল সৈন্যকে ফাঁসি প্রদান করেন। একবার এক সাধারণ প্রজা জনৈক সৈনিকের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করলো যে, সে তাকে ছয় মাস বিনা মজুরীতে কাজে খাটিয়েছে। একথা শুনে তিনি ঐ সৈনিককে থেকে তার পোশাক ঐ প্রজাকে পড়ালেন এবং প্রজার পোশাক তাকে পড়ালেন। অতঃপর ঐ সৈনিককে নির্দেশ দিলেন, ছয় মাস তার মজুর খাটতে। এ ঘটনা থেকে অন্যরা বিরাট শিক্ষা পেল।

তার অন্যতম একটি সুকীর্তি হল তিনি খ্রিষ্টানদের দখল থেকে মুক্ত করে দিনরাত শহরের সীমান্ত এলাকা মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে আনেন। চার বছর ক্রমাগত চেষ্টা ও তৎপরতার পর তিনি তাদের কবল থেকে এই সীমান্ত পুনরুদ্ধার করেন। আর এই পুনরুদ্ধারের দিনটি ছিল এক স্মরণীয় দিন। যেমন আমরা ইতোপূর্বে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। তিনি এ বছর রজব মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ইনতিকাল করেন। প্রথমত তাকে দূর্গে দাফন করা হয়। অতঃপর জামে দিশামকে সংলগ্ন সমাধি নির্মাণ সম্পন্ন হলে তাকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। তার ভ্রাতা সুলতান আশরাফ যখন ছিময়াত অবরোধ করেন, তখন তিনি জাযীরা থেকে তার ভাইকে উদ্বুদ্ধ করে নিম্নোক্ত কবিতা পঙ্ক্তিগুলি রচনা করেন :

হে আমার সাহায্যকারী! সত্যিই যদি তুমি আমার সাহায্যকারী হয়ে থাক, তাহলে আর কালবিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় রওয়ানা হয়ে যাও। একের পর এক বাড়িঘর অতিক্রম করে যাও এবং সুলতান আশরাফ ব্যতীত অন্য কারও দরবারের আপ্যায়নপ্রার্থী হয়ো না।

তুমি দীর্ঘজীবী হও! তার হস্তচুম্বন করে আমার পক্ষ থেকে তাকে কোমলতার সাথে বলে দাও :

তোমার ভ্রাতা যদি অচিরেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তুমি তাকে উৎকৃষ্ট তরবারির ও বর্শার ধারালো প্রান্তের মাঝে পাবে। সুলতান কামিল তার পালক পুত্র আদিলের অনুকূলে মিশর ও

দামেশক অঞ্চলের এবং অপর পুত্র সালাহ আয়্যুবের অনুকূলে জাযীরা অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে যান। তার মৃত্যুর পর আমীর উমারাগণ তার এই ফরমান কার্যকর করেন। তবে দামেশক শহরের শাসন কর্তৃত্ব কার হাতে অর্পিত হবে এ ব্যাপারে আমীর উমারাগণ মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে প্রার্থী ছিলেন সুলতান নাসের দাউদ, মুআযযম এবং সুলতান মুযাফফরুদ্দীন যূনুস ইবন্ মাওদূদ ইবন্ সুলতান আদিল। আর ইমাদুদ্দীন ইবন্ শায়খের মত ছিল সুলতান মুযাফফরুদ্দীন যূনুসের পক্ষে, আর অন্যদের মত ছিল নাসেরের পক্ষে, তিনি অবস্থান করছিলেন দারে উসামা নামক নিবাসে। এ সময় সুলতান মুযাফফরুদ্দীনের শাসন কর্তৃত্ব সুসংহত হয় এবং সুলতান নাসের বরাবর এই মর্মে পত্র আসে যে, তুমি শহর ত্যাগ কর। অতঃপর তিনি দারে উসামা থেকে তার বাহনে আরোহন করে বের এবং সর্বসাধারণ দুর্গ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে, তার শাসন কর্তৃত্ব লাভের ব্যাপারে তাদের কোন সংশয় ছিল না। এ সময় তিনি প্রথমে কেল্লার দিকে অগ্রসর হন, এরপর কিছুদূর গিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোড়া মুখ ঘুরিয়ে দেন। তখন লোকজন তার উদ্দেশ্যে বুঝতে পেরে চিৎকার করে তাকে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু তিনি আরও অগ্রসর হয়ে কাবূন নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। তখন কোন কোন আমীর তাকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু তিনি আজালূন পর্যন্ত পৌছে যান এবং সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ হন। অন্যদিকে সুলতান জাওওয়াদ শাসন কর্তৃত্ব লাভের পর রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে অশ্বারোহন করেন এবং আমীর উমারাদের মূল্যবান উপহার উপঢৌকন প্রদান করেন। ঐতিহাসিক সাবৃত বলেন : এ উপলক্ষে তিনি নগদ ষাট লক্ষ দীনার এবং পাঁচ হাজার মূল্যবান পরিধেয় বিতরণ করেন। তার শাসনামলে তিনি কর-খাজনাসমূহ রহিত করেন এবং মদ্যপান ও অন্যান্য অনৈতিক বিনোদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এভাবে দামেশকে তার শাসন কর্তৃত্ব সুসংহত হয়, এবং তাকে কেন্দ্র করে সিরীয় এবং মিশরীয় আমীর উমারাগণ একজোট হন। এদিকে সুলতান নাসের দাউদ আজালূন থেকে গাযা এবং উপকূলীয় ভূখণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তার শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তখন সুলতান জাওয়াদ মুযাফফরুদ্দীন শিরীয় ও মিশরীয় বাহিনী নিয়ে অনুসরণ করেন এবং আশরাফীয়দের বলেন : তোমরা তার সাথে সন্ধি চুক্তি কর এবং তাকে আদর আপ্যায়ণ কর। অতঃপর সুলতান নাসেরের কাছে যখন তাদের পত্র পৌছল, তখন তিনি তাদের সাথে সন্ধির ব্যাপারে আশান্বিত হলেন। ফলে সাতশ অশ্বরোহী নিয়ে তিনি নাবলসে ফিরে গেলেন। তারপর যখন সুলতান জাওয়াদ সুলতান নাসেরের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন নাসের ভয়ে পলায়ণ করলেন। তখন পাওয়াদ বাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সামগ্রী অধিকার করে প্রাচুর্যের অধিকারী হল, আর সে তার ফলশ্রুতিতে কঠিন অভাবে পতিত হন। এরপর সুলতান নাসের কারাক শহরে ফিরে আসেন আর সুলতান জাওয়াদ বিজয়ীদের দাশেকে ফিরে যান।

এছাড়া এ বছর খাওয়ারেযমীয়া সুলতান নাজমুদ্দীন আয়্যুব ইবন্ কামিল, যিনি কায়বা শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং তাকে বন্দি করার সংকল্প করে। তখন তিনি তাদের থেকে পলায়ণ করেন, আর তারা তাদের ধন সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়।

এ সময় তিনি সুলতান সানজারের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন মাওসিলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লু'লু তার দিকে অগ্রসর হন তার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের জন্য এবং তাকে খাঁচায় বন্দি করে খলীফার সামনে উপস্থিত করার জন্য। আর ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তার দাম্ভিকতা ও দাপটের কারণে তার সংশ্রব অপছন্দ করতো। ফলে সে ধরাপড়ার উপক্রম হল। সে তখন নিরুপায় হয়ে খাওয়ারেযমীদের কাছে পত্র প্রেরণ করলো। এবং অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন তারা বদরুদ্দীন লু'লু থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফৌজ পাঠালো। এদিকে লু'লু যখন তাদের আভাস পেলেন, তখন তিনি সিটকে পড়লেন। আর তখন তারা তার সব ধন সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিল। এতে তারা বেশুমার দ্রব্যসামগ্রীর মালিক হল। এদিকে সুলতান জারবাদ ব্যর্থ হয়ে তার নিজ শহর মাওসিলে ফিরে আসল, আর সুলতান সালিহ আয়্যুব তার কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকলেন। আর এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

মুহাম্মাদ ইবন্ যায়দ

খতীব ইবন্ য়াসীন জামালুদ্দীন দাওলায়ী। আর তাকে দাওলায়ী বলা হয় মাওসিলের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করে, যা আমরা তার চাচা আব্দুল মালিক ইবন্ য়াসীনের জীবনীতে উল্লেখ করেছি। তিনি গাযলিয়্যা মাদরাসার মুদাররিস ও খতীব ছিলেন। কোনো এক সময় সুলতান মুআয তাকে ফাতওয়া প্রদান থেকে বিরত রাখেন। একথা জেনে সাবৃত তাকে তিরস্কার করেন। তখন তিনি অযুহাত পেশ করে বলেন, তার শহরের শীর্ষস্থানীয় আলিমরাই তাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবন্ যায়দের ফাতওয়াতে ভুলের আধিক্যের কারণে?। তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অতি যত্নশীল ছিলেন। বিপুল আর্থিক সামর্থের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হজ্জ পালন করেননি। তিনি জায়জনে একটি মাদরাসা ওয়াকফ করেন। তার মৃত্যুর পর তাকে তার জায়জনস্থ মাদরাসায় সমাহিত করা হয়। এরপর তার এক অযোগ্য ভাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, কিন্তু সে তাতে টিকতে পারেনি। পরে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন কামাল ইবন্ উমর ইবন্ আহমাদ ইবন্ হিরাতুল্লাহ ইবন্ তালহা নাসীরী। আর গাযালিয়্যা মাদরাসায় পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শায়খ আব্দুল আযীয ইবন্ আব্দুস সালাম।

মুহাম্মাদ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ জামীল

শায়খ আবু নাসর ইবন্ শারীযী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৪৯ হিজরীতে। তিনি হাফিস ইবন্ তাসাফির ও অন্যান্যদের কাছে অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি ফিক্হ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, ফাতওয়া প্রদান করেন এবং শামিয়্যা বাররানিয়া মাদরাসায় পাঠদান করেন। তিনি তৎকালীন শাসকের প্রতিনিধিরূপে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। এক কথায় তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, আলিম ও সদগুণের অধিকারী, মেধাবী, সদাচারী, কবি ও ঐতিহাসিক উন্নতি স্বভাব এবং সুকীর্তিসমূহের অধিকারী। তিনি এ বছর জুমাদাল উখরা মাসের তিন তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইনতিকাল করেন এবং কাসীয়ুনে সমাহিত হন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

কাযী শামসুদ্দীন য়াইয়া ইবন্ কারাকাত

ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ হাসান দামেশকী। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, গুণবান, ন্যায়পরায়ণ পবিত্র স্বভাবের অধিকারী 'আলিম। সুলতান আশরাফ বলতেন : তার মত আর কোন ব্যক্তি দামেশকের কাযীর পদ অলকৃত করেনি। এছাড়া তিনি তার পবিত্র শহরের শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। আর দামেশকে কাযীদের স্থলাবর্তীরূপে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেন। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এ বছর জিলকদ মাসের ছয় তারিখ শনিবার। জামে দামেশকে তার জানাযা পড়া হয় এবং কাসীয়ূনে তাকে সমাহিত করা হয়। তার মৃত্যুতে লোকজন অনেক আফসোস করে। আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারপর মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুল হাওবী

যিনি হলেন কাযী যায়নুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আল্ওয়ান আল আসাদী। তিনি ওসতাদ হালাবীর পুত্ররূপে পরিচিতি লাভ করেন। যিনি বাহাউদ্দীন ইবন্ শাদ্দাতের পর হালবের কাযী ছিলেন। তিনি ছিলেন গুণবান 'আলিম, উত্তম আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার পিতা ছিলেন সে সময়ের অন্যতম বড় বুযুর্গ ও নেককার ব্যক্তি। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ সালিহ মুআম্মার

ইনি হলেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন্ মাসউদ ইবন্ বাহরুয আল্ বাগদাদী আবুল ওয়াক্ত তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি জানাজানি হয় ৬১৫ হিজরীতে। তখন তার থেকে হাদীস শ্রবণের জন্য লোকজন তার উপর উপচে পড়ে। আল্লামা যুবায়দী ও অন্যান্যরা তার থেকে দুনিয়া বিষয়ক হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বছর শাবান মাসের ২৯ তারিখ শনিবার রাত্রে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

বিশিষ্ট আমীর সীমান্তরক্ষী মুজাহিদ সলিমুদ্দীন

ইনি ছিলেন ইবন্ আবদুল্লাহ সুলতান শারকীসের ক্রীতদাস তারপর পর তার পুত্রের সাথে তানীন ও তার অধীনস্থ দুর্গসমূহের নায়েব বা প্রশাসক। তিনি ছিলেন অধিক দান সদকাকারী, তাকে তার ওসতাদের পাশে সমাহিত করা হয়। তার ওসতাদের মৃত্যুর পর তিনিই তার জন্য সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তম স্বভাব, স্বল্পভাষী। এছাড়া তিনি বহু বছর বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্ তাকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি করুণা করুন।

৬৩৬ হিজরীর শুরু

এ বছরই সুলতান জাওয়াদ, সুফী ইবন্ মরযূকের বিরুদ্ধে ফরমান জারী করেন এবং তাকে চার লক্ষ দীনার জরিমানা করেন এবং তাকে হিমসের দুর্গে বন্দি করে রাখেন, ফলে তিন বছর পর্যন্ত তিনি সূর্যের আলো দেখতে পাননি। অবশ্য ইবন্ মারযূক ইতোপূর্বে সুলতান জওয়াদের প্রতি অনেক সদাচার করেছিলেন। এ সময় সুলতান জাওয়াদ নাসেহ নামক তার স্ত্রীর এক

সেবককে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। সে তখন দামেশকবাসীদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের থেকে প্রায় ছয় লক্ষ দীনার উসুল করে এবং আমীর ইমাদুদ্দীন ইবন্ শায়খকে আটক করে, যিনি তার দামেশকের শাসন কর্তৃত্ব লাভের কারণ ছিল। এ সময়ে তিনি দামেস্কের শাসন কর্তৃত্বের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং বলেন : রাজত্ব দিয়ে আমি কি করব? শিকারী বাজ পাখি এবং শিকারী কুকুরই আমার কাছে তার চেয়ে প্রিয়। অতঃপর তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন এবং সুলতান সালিহ নাজমুদ্দীন আয়্যুব ইবন্ কাশিমের সাথে পত্র বিনিময় করেন। অতঃপর তারা দুজন শাসন কর্তৃত্ব বিনিময় করেন। এভাবে সুলতান সালিহ দামেশকের কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং এ বছর জুমাদাল উলা মাসের শুরুতে সেখানে প্রবেশ করেন। এ সময় সুলতান জাওয়াদ তার সম্মুখে গাশিয়াতে অবস্থান করছিলেন। আর তিনি তার কৃত আচরণে অনুতপ্ত হন এবং তার প্রতিকার করতে আগ্রহী হন। কিন্তু তার সে সুযোগ ঘটেনি। তিনি যখন দামেস্ক থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন তার সামনেই তাকে অভিশাপ দিচ্ছিল তাদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য, কিন্তু তিনি সে দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করেননি, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ জিম্মায় রেখে তিনি চলে যান।

এদিকে সুলতান সালিহ আয়্যুব যখন মিশরের শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন হন, তখন তিনি খাদিম নাসহকে বন্দি করেন। ফলে অত্যন্ত অসহায় ও নিকৃষ্ট অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে এবং সে তার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি লাভ করে। আর আল্লাহতো তার বান্দাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করেন না।

রমযান মাসে আর এ বছর সুলতান সারিহ আয়্যুব দামেশকে থেকে বিপরীত ভূখণ্ডের দিকে রওয়ানা হন তার বালক ভাই সুলতান আদিল থেকে সেখানকার শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার জন্য। পথে তিনি নাবলুস শহরে যাত্রা বিরতি করেন এবং তা জবর দখল করে তাকে সুলতান নাসের দাউদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেন। এবং এ সময় তিনি গালাবাকের শাসনকর্তা তার পিতৃব্য সুলতান সালিহ ইসমাইলের কাছে দূত পাঠান এই মর্মে যে, তিনি যেন তার কাছে আগমন করেন এবং মিশর অভিযানে তাকে সাহচর্য প্রদান করেন, আর তিনি দামেশকে তার কাছে এসেছিলেন তার হাতে বায়আত গ্রণের জন্য কিন্তু তিনি সারিহ আয়্যুবের আহ্বানে 'করি-করছি করতে থাকেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকেন এবং দামেশকরের আমীর উমারাদের সাথে আঁতাত করতে থাকেন তাদের শাসন কর্তৃত্ব লাভের জন্য। এদিকে সুলতান সালিহ আয়্যাকের ভীত্রিদ ব্যক্তিত্বের কারণে কেউ তাকে এ বিষয়ে অবহিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। এভাবেই এ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। সুলতান সালিহ আয়্যুব নাবলূসে অবস্থান করে তার পিতৃব্যকে আহ্বান করতে থাকেন, আর তিনি টালবাহানা করতে থাকেন। এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

জামালুদ্দীন আল্ হুসায়রী আল্ হানাফী

ইনি হলেন আল্লামা মাহমূদ ইবন্ আহমাদ, দামেশকের হানাফী মাযহাবের শায়খ এবং নূরিয়া মাদরাসার শিক্ষক, তাঁর আদি নিবাস বুখারার অন্তর্গত হুসায়র নামক জনপদ বা গ্রাম। তিনি বুখারাতে ফিকহ শিক্ষা করেন এবং বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি দামেশকে গমন করেন এবং তখন সেখানে হানাফীদের শীর্ষ শায়খে পরিণত হন, বিশেষত সুলতান মুআযযমের

শাসনামলে। সুলতান তার কাছে জামে কাযীর অধ্যয়ন করতেন, তার রচিত এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থও বিদ্যমান। সুলতান মুআযযম তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহ করতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রুপাতকারী এবং অধিক দান সদকাকারী, বুদ্ধিমান ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তিনি এ বছর সফর মাসের আট তারিখ রবিবার মৃত্যুবরণ করেন এবং সুফীদের কবরস্থানে সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাকে তার অনুগ্রহ ও করুণা সিক্ত করুন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। মাদরাসা নুরিয়াতে তার প্রথম দরস সম্পন্ন হয় ৬১১ হিজরীতে। তিনি এই দায়িত্বপ্রাপ্ত হন শাসক দাউদের পর যিনি স্থলাবর্তী ছিলেন শায়খ বুরহান মাসউদের আর এ মাদরাসার প্রথম শিক্ষক হলেন : আমীর ইসাদুদ্দীনের উপর ইবন্ সদরুদ্দীন 'আলী ইবন্ হামাওয়ায়াই ইনি ছিলেন সুলতান জাওয়াদের দামেশকের শাসন কর্তৃত্ব লাভের করণ। অতঃপর তিনি মিশর গমন করেন। এ সময় মিশরের সুলতান আদিল ইবন্ কাসিল ইবন্ আদিল তাকে ভর্ৎসনা করেন। তখন তিনি বলেন : এখন আমি দামেশকে ফিরে যাব এবং সুলতান মাওয়াদকে এই শর্তে আপনার অভিমুখে অগ্রসর হতে বলল যে, দামেশকের পরিবর্তে সে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে। যদি সে তা না করে তবে আমি তাকে সেখান থেকে অপসারণ করব এবং আমি নিজেই সেখানে আপনার নায়েব বা স্থলবর্তী হয়ে যাব। তখন তার ভাই শায়খ ফখরুদ্দীন ইবন্ শায়খ তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। এদিকে তিনি দামেশকে ফিরে আসলে সুলতান জাওয়াদ তাকে দারুল মাসারাতে অবস্থিত দুর্গে তার অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কৌশলে তাকে হত্যার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেন। তখন সেই ঘাতক তাকে সাহায্যপ্রার্থীর বেশে এসে হত্যা করে। এরপর জাওয়াদ তার অর্থ সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি দখল করে নেন। তার জানাযায় বহুলোকের সমাগম হয়, এবং তাকে কাসীয়ূনে দাফন করা হয়।

ওযীর জামালুদ্দীন আলী ইবন্ হাদীদ

তিনি সুলতান আশরাফের ওযীরের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কিছুদিনের জন্য সুলতান সালিহ আয়্যুবও তাকে ওযীর নিয়োগ করেন। এরপরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার পিতৃপুরুষদের আদি নিবাস ছিল রক্কা শহর। তার ছিল সামান্য কিছু সহায় সম্পত্তি, যা দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। অতঃপর দামেশকে সুলতান আশরাফের ওযীর হয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। কেউ তাকে তার নিন্দা সমালোচনা করেছেন, তিনি এ বছর জুমাদাল আখিরা মাসে জাওয়ালীতে ইনতিকাল করেন এবং সুফীদের কবরস্থানে তিনি সমাধিস্থ হন।

জা'ফর ইবন্ আলী

ইবন্ আবুল বারাকাত ইবন্ জা'ফর ইবন্ যাহইয়া আল্হামদানী মাসের দাউদের সাহচর্যে তিনি দামেশকে আগমন করেন এবং দামেশকের অধিবাসীরা তার কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং সুফীদের কবরস্থানে সমাহিত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল নব্বই বছর। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

হাফিয যাকীয়ুদ্দীন

ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ য়ুসুফ ইবন্ মুহাম্মাদ আল্ বারযালী আল্আশবীলী। হাদীস শাস্ত্র চর্চায় তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। ফলে তিনি এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি

অর্জন করেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রভূত জ্ঞান দান করেন। ইবন্ উরওয়ার সমাধিসংলগ্ন দরসের হালকায় তিনি শায়খুল হাদীস ছিলেন। অতঃপর তিনি হালবে সফর করেন। তিনি এ বছর রমযান মাসের ১৪ তারিখে হামা শহরে ইনতিকাল করেন। তিনি হলেন আমাদের শায়খ হাফিয আলামুদ্দীন ইবন্ কাসিম ইবন্ মুহাম্মাদ আলবারযালীর পিতামহ, দামেশকের ঐতিহাসিক যিনি অপর ইতিহাসবেত্তা শিহাবুদ্দীন আবূ শামার ইতিহাস সংকলনে পরিশিষ্ট যোগ করেছেন। আর আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি নিজেও তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে পরিশিষ্ট যোগ করেছি।

৬৩৭ হিজরী সনের সূচনা

এ বছর যখন সূচিত হয়, তখন দামেশকের শাসক নাজমুদ্দীন সালিহ আয়্যুব ইবন্ কামিল নাবলূসের কাছে তাঁবুতে অবস্থান করে তার পিতৃব্য সালিহ ইসমাইলকে মিশরীয় ভূখণ্ডে যাত্রার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন তার শাসনকর্তা আদিল ইবন্ কামিল থেকে তার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার কারণে। এদিকে সালিহ ইসমাইল তার পুত্র এবং ইবন্ য়াগনূরকে সালিহ আয়্যুবের সাহচর্যে প্রেরণ করেন। তারা দুজন সেখানে আমীর উমারাদের নগদ অর্থ প্রদান করে এবং তাদের থেকে সালিহ আয়্যুবের বিরোধিতা এবং সালিহ ইসমাইলের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন বিষয়টি সম্পন্ন হল এবং সালিহ ইসমাঈল তার উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করলেন। তখন তিনি সুলতান সালিহ আয়্যুবের কাছে দূত পাঠালেন তার পুত্রকে তার কাছে পাঠিয়ে নেয়ার জন্য, যেন সে বা'লাবাকে পিতার স্থলবর্তী হতে পারে এবং তিনি তার সাহচর্যে উপস্থিত হতে পারেন। তখন সালিহ আয়্যুব সংঘটিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো কিছু অনুভব করতে পারেনি। ফলে তিনি সালিহ ইসমাইলের পুত্রকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। আর এসব কিছুই সংঘটিত হয়েছিল সালিহ ইসমাইলের ওযীর আবুল হাসান গাযানের পরিকল্পনা মাফিক, যিনি ছিলেন বা'লাবাক শহরের আমীনিয়া মাদরাসার ওয়াকফকারী।

অতঃপর এ বছর সফর মাসের সাতাশ তারিখ মঙ্গলবার সুলতান সারিহ ইসমাইল, হিমসের শাসনকর্তা আসাদুদ্দীন শেরকেকে সাথে নিয়ে দামেশকে অভিমুখে অগ্রসর হন। বাবুল ফারাদীস নামক নগর দ্বার দিয়ে তারা অতর্কিতে সেখানে প্রবেশ করেন। অতঃপর সালিহ ইসসাইল তার নিজ গৃহে অবস্থান করেন, আর হিমসের শাসক তার নিজ গৃহে। এ সময় নাজমুদ্দীন ইবন্ সালামার আগমন ঘটে। সে এসে সালিহ ইসমাইলকে অভিনন্দন জানিয়ে তার সামনে আনন্দ-নৃত্য প্রদর্শন করে বলতে থাকে : আপনার গৃহেই আমি এসেছি। পরদিন সকালে তারা শহরের দুর্গ অবরোধ করে তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল মুগীছ উমর ইবন্ সালিহ নাজমুদ্দীন বাবুল ফারাজের দিক থেকে তারা দুর্গপ্রাচীর ছিদ্র করে এবং সেস্থান দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে তা জবরদখল করে নেয় এবং মুগীছকে সেখানের একটি প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখে।

আবূ শামা বলেন : এ সময় এখানকার দারুল হাদীস এবং দুর্গ চতুষ্পার্শের বাড়ি ঘর ও দোকানপাট ভস্মীভূত হয়। আর সুলতান সালিহ আয়্যুবের কাছে যখন এই ঘটনার সংবাদ পৌছে, তখন তার অনুসারী ও সহচর আমীর উমারা সালিহ ইসমাইলের পক্ষ থেকে স্ত্রী সন্তানদের ক্ষতির আশঙ্কায় তাকে ত্যাগ করে। তখন সারিহ আয়ুবের সাথে যাকে শুধু তার

ক্রীতদাসগণ এবং তার পুত্র সলীলের দাসমাতা। ফলে কৃষক শ্রেণির সাধারণ প্রজারা তার ধন সম্পদ ও সহায় সম্পত্তির ব্যাপারে লোভী হয়ে উঠে। এরপর কারাফের শাসনকর্তা সুলতান নাসের দাউদ তাকে বন্দি করার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তখন সেই ব্যক্তি তাকে নাবলুস শহর থেকে একটি খচ্চরের আরোহীরূপে অপদস্থ অবস্থায় পাকড়াও করে অতঃপর তাকে সাত মাস তার কাছে আটকে রাখে। এ সময় সুলতান আদিল মিশর থেকে মুলত নাসেরের কাছে দূত প্রেরণ করেন এবং এক লক্ষ দীনারের বিনিময়ে তার ভাইকে মুক্ত করে দেয়ার আবেদন করেন। কিন্তু নাসের দাউদ তার সেই আবেদনে সাড়া দেননি।

এ সময় দামেশক, মিশর ও অন্যান্য অঞ্চলের শাসকগণ নাসের দাউদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া সুলতান আদিল মিশরীয় ভূখণ্ড থেকে নাসের দাউদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বালবীস অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু তার ফৌজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং আমীর উমারাগণ তার আনুগত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর তারা সুলতান আদিলকে বন্দি করে ফেলেন এবং তাকে আটকে রেখে সুলতান সালিহ আয়্যুবকে দূত পাঠিয়ে তাদের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু সুলতান নাসের দাউদ তাকে প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন এবং তার প্রতি শর্তারোপ করেন, যেন তিনি তার অনুকূলে দামেশক, হিম্স্, হালব, জাযীরা, দিয়ারে বক্র, ও মিশর সাম্রাজ্যের অর্ধেক এবং রাজ ভাণ্ডারসমূহে বিদ্যমান ধনসম্পদ ও মণি-মাণিক্যের অর্ধেক গ্রহণ করেন। সালিহ আয়্যুব বলেন : আমি তখন নিরুপায় হয়ে তা জেনে নিলাম। আর তার শর্ত পূরণ করা পৃথিবীর তীব্র শাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও সম্ভব নয়। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম, তখন আমি তাকে আমাদের সাথে নিয়ে নিলাম। কেননা, আমার আশঙ্কা ছিল এই পদক্ষেটি মিশরীয়দের কোনো চক্রান্তও হতে পারে। আর তাকে আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সালিহ আয়্যুব উল্লেখ করেছেন যে, নাসের দাউদ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং বিষয়াদিতে বিভ্রান্তির শিকার হতেন এবং সঠিক রায়ও মতের বিরোধিতা করতেন।

অতঃপর যখন সালিহ মিশরীয়দের কাছে পৌঁছে যান, তখন তারা তাকে নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করে এবং তিনি নিরাপদ, বিজয়ী, ও উৎফুল্ল অবস্থায় মিশরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি সুলতান নাসের দাউদের খিদমতে বিশ হাজার দীনার প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এদিকে মিশরে তার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়। আর সুলতান জাওয়াদ তিনি সিনজারে দুঃশাসনের পরিচয় দেন। তিনি সেখানকার অধিবাসীদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং তাদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন চালান। তখন তারা পত্রযোগে মাওসিলের শাসনকর্তা বদরুদ্দীন লুলুকে সিনজারে আহ্বান জানায়। এ সময় সুলতান জাওয়াদ শিকারে বের হওয়ার বদরুদ্দীন অতিসহজেই সিনহার দখল করে নেন এবং জাওয়াদ গানা-তে চলে যায়। অতঃপর সে তা খলীফার কাছে বিক্রি করে দেয়। আর এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে কাযী রাফী আব্দুল আযীয ইবন্ আব্দুল ওয়াহিদ জালী মাদরাসা শামীয়া বুররানিয়্যাতে পাঠদান করেন। এছাড়া এ বছর রবিউল আখির মাসের তিন তারিখ বুধবার শায়খ ইযযুদ্দীন আব্দুল আযীয ইবন্ আব্দুল ওয়াহিদ জালী মাদরাসা শামীয়া বুররানিয়্যাতে পাঠদান করেন। এছাড়া এ বছর রবিউল আখির মাসের তিন তারিখ বুধবার শায়খ ইযযুদ্দীন 'আব্দুল' আযীয ইবন্ আব্দুল সালাম ইবন্ আবুল

কাসিম সুলামী জামে দিমাশকের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সুলতান সালিহ ইসমাইল দামেশক ও অন্যান্য শহরে রোম সম্রাটের অনুকূলে খুৎবা প্রদান করেন। কেননা তিনি সুলতান সালিহ আয়ুবের বিরুদ্ধে তার সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। ঐতিহাসিক আবূ সামা বলেন : এ বছর জুন মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, যার প্রভাবে বহু বাড়িঘর ও স্থাপনা বিধ্বস্ত হয়, আর আমি তখন মুযযায় অবস্থান করছিলাম। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

হিমসের শাসনকর্তা

ইনি হলেন সুলতান আসাদুদ্দীন শেরকোহ ইবন্ শাদী। তার পিতার মৃত্যুর পর সুলতান নাসের সালাহুদ্দীন ৫৮১ হিজরীতে তাকে হিশমের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এরপর তিনি ৫৭ বছর এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শাসক হিসাবে ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তি। আর শাসন কর্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডকে তিনি মদ, নিবর্তনমূলক কর খাজনা এবং সকল প্রকার গর্হিত কর্ম থেকে পবিত্র করেন এবং সর্বত্র নিরাপত্তা ও ন্যায় ইনসাফ কায়েম করেন। যে কোন খ্রিষ্টান অথবা আরব তার শাসনাধীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে তিনি তাকে গুরুতরভাবে অপদস্থ করতেন। আয়্যুব বংশীয় সুলতানগণ তাকে এড়িয়ে চলতেন। কেননা, তিনি মনে করতেন যে, তাদের চেয়ে মিশর শাসনের তিনি বেশী হকদার। কেননা, তার পিতামহই মিশর জয় করেন এবং তাদের পাশে তিনিই প্রথম সুলতান হন। তিনি হিমশে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

কাযী শামসুদ্দীন আহাদ ইবন্ খলীল

ইনি হলেন ইব সাআদা ইবন্ জা'ফর হূবী, দামেশকের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তিনি বহুসংখ্যক মৌলিক ও শাখা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি এ বছর শাবান মাসের সাত তারিখ শনিবার যোহর মাদরাসা আদিনিয়্যাতে ইনতিকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি ছিলেন সদাচারী ও উত্তম স্বভাবের অধিকারী। তিনি প্রায়ই বলতেন : আমি তো পদসমূহকে তার উপযুক্ত হকদারদের কাছে পৌছে দিতে পারি না। তার রচিত একাধিক বিদ্যমান এর মধ্যে একটি হলো কবিতার ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ। তার সম্পর্কে আবূ শামা আবৃত্তি করেছেন :

আহমাদ ইবন্ খলীল, আল্লাহ্ তাকে সুপথ দেখিয়েছেন, যখন তিনি খলীল ইবন্ আহমাদকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন।

একজন হলেন ছন্দ-বিদ্যার উদ্ভাক, আর অন্যজন হলেন তা থেকে রহস্য প্রকাশকারী। তিনি কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন রফীউদ্দীন আব্দুল আযীয ইবন্ 'আব্দুল ওয়াহিদ ইবন্ ইসমাইল ইবন্ আব্দুল হাদী আল্ হাম্বলীর পর একই সময়ে তিনি মাদরাসা আদিলিয়্যাতে পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে তিনি বালাবাক শহরের কাযী ছিলেন। অতঃপর তাকে দামেশকে আনেন আমীনুদ্দীন, যিনি প্রথমে সান্নেসীয় ছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সুলতান সালিহ ইসমাঈলের ওযীর নিযুক্ত হন। এরপর তিনি এবং এই কাযী অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য একমত হয়।

আবূ শামা বলেন : তার থেকে মন আচরণ, নির্যাতন, পাপাচার এবং মানুষের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আল্ বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : অপর এক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কখনও কখনও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জুমআর দিন মাশহাদে কামালীতে উপস্থিত হতেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে তার মনোষ্কামনার বিপরীত আচরণ করেছিলেন। তাকে তিনি ঐ ব্যক্তির হাতে ধ্বংস করান, যে ছিল তার সৌভাগ্যের কারণ, শীঘ্রই যার বিশদ বিবরণ আসছে–ইন্‌শাআল্লাহ্।

৬৩৮ হিজরী সনের সূচনা

এ বছরই দামেশকের নামক সুলতান সালিহ ইসমাইল সায়ীফ আববূন দুর্গ সয়দার খ্রিষ্টান শাসকের হাতে তুলে দেন। এ কারণে নগর খতীব শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবন্ আব্দুস সালাম এবং মালকী মাযহাবের শায়খ আবূ আমর ইবন্ হাযির তার কঠোর সমালোচনা করেন। তখন তিনি বেশ কিছুকাল তাদের দুজনকে আটকে রাখেন। অতঃপর সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে গৃহবন্দি করে রাখেন। আর নগর-খতীব এবং মাদরাসা গাযালিয়্যার মুদাররিসরূপে নিয়োগ করেন ইমাদুদ্দীন দাউদ ইবন্ উমর ইবন্ যূসুফ আল মাকাপিসীকে। কিছুদিন পর শায়খ ইযযুদ্দীন এবং শায়খ আবূ আমর উভয়ে দামেশক ছেড়ে চলে যান। শায়খ আবূ আমর গমন করেন কারাকে সুলতান নাসের দাউদের কাছে, আর শায়খ ইয়যুদ্দীন মিশর দেশে গমন করেন। সেখানে মিশরের শাসক সুলতান আয়্যুব তাকে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে রবণ করে নেন এবং তাকে কায়রোর খতীব এবং মিশরের প্রধান কাযী নিয়োগ করেন। এ সময় কায়রোবাসী তার কাছে ইলম শেখায় নিয়োজিত হয়। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ দাকীকুল ঈদ। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

এছাড়া এ বছর তাতারী সম্রাট চেঙ্গিস পুত্র তোলাইর দূত মুসলিম সুলতান ও শাসকদের কাছে গমন করে। দূত মারফত তিনি তাদের সকলকে তার আনুগত্যের আহ্বান জানান এবং নিজেদের নগরপ্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তার প্রেরিত শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ : ঈশ্বরের প্রতিনিধি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অধিপতি খান কান-এর পক্ষ থেকে। এই পত্রখানি ছিল ইসপাহানের অধিবাসী কোমল-স্বভাবের জনৈক ব্যক্তির সাথে। সে প্রথম আগমন কর সুলতান শিহাবুদ্দীন গাযী ইবন্ আদিলের কাছে ম্যায়্যাফারিকীন শহরে। এ সময় সে তাতারীদের সাম্রাজ্য অনেক বিস্ময়কর ও অভিনব সব ঘটনার কথা বর্ণনা করে। যেমন তাদের সীমান্ত এদেশে এমন সব মানব সন্তান রয়েছে, যাদের চক্ষু তাদের কাঁধে এবং মুখ হল বুকে, এরা মাছ খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং কোনো মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। তার বর্ণনা মাফিক তাদের কাছে এ জাতীয় বীজের দানা রয়েছে, যা ছাগল ভেড়া উৎপন্ন করে, এই শাবকগুলি দুই তিন মাস বাঁচে আর এরা প্রজনন ক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে না। আরেকটি বিস্ময়ণের ঘটনা হলো মাযানদারান শহরের পাশে একটি বিশাল হ্রদ আছে, প্রতি তিরিশ বছর অন্তর সেখানে মিনার সদৃশ একটি বিশাল কাষ্ঠ খণ্ড ভেসে উঠে, সারাদিন দৃশ্যমান থাকার পর সূর্যাস্তের সাথে তা সেই হ্রদে তা অদৃশ্য হয়ে যায়, পরবর্তী তিরিশ বছরের জন্য একবার এক সুলতান শিকলের সাহায্য বেঁধে তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেইসব লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। অতঃপর তা যখন পুনরায় দৃশ্যমান হয়, তখন সেই লৌহ শৃঙ্খলের অংশবিশেষ তাতে তখনও বিদ্যমান ছিল। আবূ

শাখা বলেন : এ বছর অনাবৃষ্টির কারণে বহু ফল ফসল ধ্বংস হয়। আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

মুহীয়ূদ্দীন ইবন্ আরাবী

ইনি হলেন আল্‌ফুসূস ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা, মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আরাবী আবূ আবদুল্লাহ অঙ্গ আন্দালুসী। তিনি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেন এবং মক্কা মুকাররমায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থান কালেই তিনি প্রায় বিশ খণ্ডে তার ফুতূহাত আল্ মাক্কিয়্যা-নামক গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থে দুর্বোধ্য, ভালো মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য অগ্রহণযোগ্য সকল বিষয় বিদ্যমান। এছাড়া তার রয়েছে ফুসূসুল হুকম নামক গ্রন্থ। আর এই গ্রন্থে এমন সব বিষয় রয়েছে, তা সুস্পষ্ট কুফুরী। এছাড়া তার রচিত আরেক গ্রন্থ হল কিতাবুল আবাদিলা। তদ্রূপ তার চমৎকার একটি কাব্য সংকলন এবং আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দীর্ঘকাল দামেশকে অবস্থান করেন।

ঐতিহাসিক আবু শামা বলেন : তার গ্রন্থ ও সংকলন সংখ্যা অনেক, তিনি ছিলেন স্বভাব ও সহজাত লেখক। তাসাউফের বিষয়ে তার দীর্ঘ আলোচনা এবং চমৎকার কবিতা সংকলন বিদ্যমান। বহু মানুষের উপস্থিতিতে সুন্দর ভাবে তার জানাযা সম্পন্ন হয় এবং তাকে কাসীয়ুনে কাযী মুহীয়ূদ্দীন যাকীর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এ বছর রবিউল আখের মাসের ২২ তারিখ।

ইবন্ সাব্ত তিনি দাবী করতেন তার ইসমে আযম' জানা আছে। এছাড়া তিনি আরও বলতেন : তিনি কীমিয়াশাস্ত্র' জানেন, বস্তুত তিনি তাসাউফ শাস্ত্রে গুণ ও পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন। আর এ বিষয়ে তার বহু সংখ্যক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

কাযী নাজমুদ্দীন আবুল আববাস

ইনি হলেন আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ খালফ ইবন্ রাজহ আল মাফদিসী, আলহাম্বলী আশশাফেয়ী তিনি ইবনুল হাম্বলী নামে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, গুণী এবং ইলমুলখিলাফে পারদর্শী ব্যক্তি। হুমায়দীকৃত আলজামউ বায়নাস সহীহায়ন গ্রন্থখানি তার কণ্ঠস্থ ছিল। এছাড়া তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও সদাচারী ছিলেন। ইলম অর্জনের জন্য তিনি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর দামেশকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি দামেশকের একাধিক প্রসিদ্ধ মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করার পূর্ব পর্যন্ত একদল কাযীর স্থলাবর্তীরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এ বছর শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শুক্রবার মৃত্যুবরণ করেন এবং কাসীয়ুনে তাকে সমাহিত করা হয়।

য়াকূত ইবন্ আবদুল্লাহ আমীনুদ্দীন আররুমী

তিনি আতাকিক পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। মাওসিলের শাসক লু'লু'-এর দূতের সাথে তিনি বাগদাদে আগমন করেন। ইবন্ সায়ী বলেন : আমি যখন তার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, তখন তিনি শিষ্টাচার সম্পন্ন গুণী যুবক। তার হস্তাক্ষর ছিল দৃষ্টিনন্দন ও অতি উন্নত মানের। তিনি ছিলেন সুকবি, তার থেকে কবিতা বর্ণিত আছে। তিনি এ বছর জুমাদাল উখরা মাসে বন্দি অবস্থায় ওফাত পান।

৬৩৯ হিজরীর সূচনা

এ বছরই সুলতান জাওয়াদ সুলতান সারিহ আইয়্যুবের সাহচর্য লাভের অভিপ্রায়ে মিশর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি যখন রামালে পৌঁছেন, তখন তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সুলতান সারিহ আইয়্যুব সন্ধিহান হয়ে পড়েন, এবং তাকে বন্দি করার জন্য কামালুদ্দীন ইবন্ শায়ককে পাঠান। তখন সুলতান জাওয়াদ ফিরে এসে সুলতান নাসের দাউদের আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর এ সময় তিনি কুদ্স শরীফে অবস্থান করেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি তার পক্ষ থেকে ফৌজ প্রেরণ করেন, যারা ইবন্ শায়খের সম্মুখীন হয় এবং তাকে পর্যদস্ত ও বন্দি করে। তখন সুলতান নাসের দাউদ তাকে ভর্ৎসনার পর মুক্ত করে দেন। এরপর সুলতান মাওয়াদ সুলতান নাসেরের সাহচর্য অবস্থান করতে থাকেন, কিন্তু হঠাৎ তিনিও জাওয়াদের অভিপ্রায়ের শঙ্কিত হয়ে তাকে আটক করেন এবং তাকে প্রহরাধীন অবস্থায় বাগদাদে প্রেরণ করেন। এরপর আরবের এক শাখা গোত্র তাকে জোরপূর্বক মুক্ত করে দেয় এবং তিনি দামেশকের শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি খ্রিষ্টানদের কাছে গমন করেন। অবশেষে পুনরায় তিনি দামেশকে ফিরে আসেন। তখন সুলতান সারিহ আইয়্যুব তাকে ৬৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আয্তায় বন্দি করে রাখেন, যার বিবরণ অচিরেই আসছে।

এছাড়া এ বছর সুলতান সালিহ আয়্যুব মিশরে মাদরাসা নির্মাণ শুরু করেন এবং বায়তুল মাসের বিপুল অর্থ ব্যয়ে একটি কেল্লা ও নির্মাণ করেন। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের সহায় সম্পত্তি দখল করেন, ত্রিশের অধিক মসজিদ বিরাণ করেন এবং এক হাজার খেজুর গাছ কেটে ফেলেন। অতঃপর তুর্কীরা ৬৫১ হিজরীতে এই ভূখণ্ড বিরান করে। এ বছরই সুলতান মানসূর বিন ইবরাহীম ইবন্ মালিক মুজাহিদ হালবীদের নিয়ে অভিযানে বের হন এবং হারবান ভূখণ্ডে খাওয়ারেযমীদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হন। এ লড়াইয়ে তারা শত্রুদেরকে বিপর্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন করে বিজয়ী বেশে স্বদেশে ফিরে আসেন। এ সময় মায়্যা ফারিকীনের শাসনকর্তা সুলতান শিহাবুদ্দীন খাওয়ারিযমীদের সাথে সন্ধি করে এবং তার অনুসারী করার জন্য তাদেরকে তার রাজ্যে আশ্রয় দেন। ঐতিহাসিক আবু শামা বলেন : এ বছরই শায়খ ইয্যুদ্দীন মিশরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। আর মিশরের শাসনকর্তা তাকে সসম্মানে বরণ করেন এবং কাযী শারাফুদ্দীন মুরাক্কা-এর ওফাতের পর তাকে কায়রোর খতীব এবং সমগ্র মিশরের প্রধান কাযী নিয়োগ করেন। পরে তিনি নিজেই দুবার এ পদ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং নিজগৃহে নির্জন বাস শুরু করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবূ শামা আরও বলেন : এ বছরই রজব মাসের সাত তারিখ অন্ধ নাহবী শামস ইবন্ খাববায এবং শাবান মাসের পনের তারিখে কামাল ইবন্ যূনুস ইনতিকাল করেন। তাদের শাস্ত্রে তারা ছিলেন দেশের পুরোধা ব্যক্তি। এরপর আল বিদয়ার গ্রন্থকার শামস ইবন্ খাববায সম্পর্কে লিখেছেন :

শামস ইবন্ খাববায

তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইবন্ হুসায়ন ইবন্ আহমাদ ইবন্ মাআলী ইবন্ শানসূর ইবন্ আলী, অন্ধ নাহবী, মাওমিলের অধিবাসী, তিনি খাববায নামে পরিচিত। প্রথমত

তিনি আরবি ভাষা চর্চায়, এবং নাহু শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ মুফাসসাল, ইযাহ ও তাকমিলাহ কণ্ঠস্থ করার কাজে নিয়োজিত হন। এছাড়া তিনি ছন্দবিদ্যা এবং ঘৃণিত শাস্ত্রও শিক্ষা করেন। আর আরবি ভাষার গ্রন্থ আল্মুজ্মাল ও অন্যান্য গ্রন্থ তার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী এবং হাস্যরস ও কৌতুক প্রিয় আমুদে ব্যক্তি। তার রচিত বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা পঙক্তি বিদ্যমান আছে। তিনি এ বছর রজব মাসে ইনতিকাল করেন আর এ সময় তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

কামাল ইবন্ য়ূনুস

তিনি হলেন মূসা ইবন্ য়ূনুস ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মানাআ ইবন্ মালিক ও উকায়লী, আবুল ফাত্হ আলমাওসিলী মাওসিলে তিনিই ছিলেন শাফেয়ীদের শায়খ এবং সেখানকার একাধিক মাদরাসার শিক্ষক। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ও শাখা বিষয়সমূহ, অধিবিদ্যা, যুক্তি শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা তার কাছে আগমন করতো। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৮ বছর। তার বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কবিতা পঙক্তি উল্লেখযোগ্য যা তিনি মাওসিলের শাসক বদর ইবন্ লু'লুর প্রশংসায় রচনা করেন : পৃথিবীর সাম্রাজ্য যদি তার কর্তৃত্বাধিকারী দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে থাকে তাহলে এই পার্থিব সাম্রাজ্য তোমাদের দ্বারা মর্যাদা লাভ করে থাকে। আপনি দীর্ঘজীবী হোন, আপনার নির্দেশ অগ্রহিতে চেষ্টা মূল্যায়িত এবং ফয়সালা ন্যায়সঙ্গত।"

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৫১ হিজরীতে। আর মৃত্যুবরণ করেন এ বছর শাবান মাসের ১৫ তারিখে। আল্লাহ তাকে রহম করুন। আবূ শামা বলেন : এ বছরই দামেশকে ইনতিকাল করেন।

আব্দুল ওয়াহিদ সূফী

এই ব্যক্তি সত্তর বছর যাবৎ গির্জার যাজক ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সাময়াসাতিয়্যা খানকায় কয়েকদিন অবস্থানের পর অতিবৃদ্ধ অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে সুফীদের গোরস্থানে দাফন করা হয়। তার জানাযায় বহু মানুষের সমাগম হয়। আল্ বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : আমি তার জানাযা ও দাফনের শরীক হই আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবুল ফযল আহমাদ ইবন্ আস্ফান দিয়ার

ইনি হলেন– ইবন্ মুওয়াফফাক্ ইবন্ আবু আলী আল্ বূসাগানজী, বিশিষ্ট ওয়াজে এবং উরজুআনিয়্যা সরাইখানার শায়খ, ইবন্ সায়ী, বলেন : তিনি ছিলেন সুদর্শন, সদাচারী, স্নেহবৎসল এবং বিনয়ী ব্যক্তি। তদুপরি বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন সুভাষী, রাগ্মী ও মিষ্টভাষী। তার রচিত সুন্দর কবিতা সংকলন রয়েছে। অতঃপর ইবন্ সায়ী তার রচিত একটি সুন্দর কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যা দ্বারা তিনি খলীফা সুলতান্সিরের প্রশংসা গাঁথা রচনা করেন।

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ য়াহইয়া

ইবন্ মুযাফফর ইবন্ আলাম ইবন্ নায়ীম, যিনি ইবন্ হাসার সুলানী নামে সুপরিচিত, বহুগুণের অধিকারী 'আলিম শায়খ, প্রথম জীবনে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এর

পর তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হন। তিনি বাগদাদে শাফেয়ী মাযহাবের একাধিক মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে তিনি বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেন। আর তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ ও উসূলী। তিনি ফিকহের বিরোধপূর্ণ মাসায়েল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি তার শহরে আগমন করেন এবং সেখানে বিরাট সুনাম অর্জন করেন। অতঃপর ইবন্ ফাযলার তাকে দারুল হারীমে প্রশাসক নিয়োগ করেন। এরপর তিনি এক সময় নিযামিয়্যা মাদরাসায় পাঠদান করেন এবং রাজ সম্মাননা লাভ করেন। এ সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার দরসে উপস্থিত হতেন। আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। আর মৃত্যুর পর তাকে বাবে হারবে সমাহিত করা হয়।

বাগদাদের প্রধান বিচারপতি

তিনি ছিলেন আবুল মা'আলী 'আব্দুর রহমান ইবন্ মুকবিল ইবন্ আলী ওয়াসিতী আন শাফেয়ী। তিনি বাগদাদে ইলম চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ইলম অর্জন করেন এবং একটি মাদরাসায় সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর খলীফা যাহির ইবন্ নাসিরের আমলে প্রধান বিচারপতি ইমাদুদ্দীন আবূ সালিহ নামরুদ্দীন ইবন্ আবদুর রাযিক ইবন্ আবদুল কাদির তাকে স্থলবতী নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি মাদরাসা মুস্তানসিরিয়্যার প্রথম শিক্ষক মুহীয়্যুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ফাযলানের মৃত্যুর পর সেখানে পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর এসব দায়িত্ব থেকে তিনি অপসারিত হন এবং এ বছরই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু বিনয়ী এবং বহুগুণের অধিকারী। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন।

৬৪০ হিজরী শুরু

এ বছরই খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র মুসতাসিম বিল্লাহ খিলাফত লাভ করেন। খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন এ বছর জুমাদাল আজিরা মাসের দশ তারিখ শুক্রবার। এ সময় তার বয়স ছিল একান্ন বছর চার মাস সাত দিন। তার মৃত্যুর কথা গোপন রাখা হয়, এমনকি সেদিন জুমুআর মিম্বরে তার জন্য দু'আও করা হয়। তার খিলাফতকাল ছিল ষোল বছর দশ মাস সাতাশ দিন। প্রথমত তাকে দারুল খিলাফত সমাহিত করা হয়, অতঃপর রুসাফাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

আর তিনি ছিলেন সুদর্শন, প্রজাবৎসল, উত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী, দানশীল এবং নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রজাদের সাথে সদাচারী, বর্ণিত আছে যে, পিতামহ খলীফা নাসির দারুল খিলাফতের অভ্যন্তরে একটি গর্তে স্বর্ণ জমা করতেন, মাঝে মাঝে তিনি এর পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে বলতেন : বলতো দেখি, এই গর্ত পূর্ণ করা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব কিনা? আর তার পৌত্র মুস্তান্সির ও অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্যে করে বলতেন : আপনি বলুন তো, এ সব ব্যয় করা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব কিনা? পরবর্তীকালে তিনি এই অর্থ সরাইখানা, মুসাফিরখানা এবং সড়ক পুল ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করেন। তার খিলাফতকালে তিনি বাগদাদের প্রতিটি মহল্লায় দরিদ্রদের আহারের জন্য একটি করে সরাইখানা চালু করেন, বিশেষ করে রমজান মাসে। এছাড়া তিনি বয়স্ক বাদীদের খরিদ করে আযাদ করে দিতেন এবং তাদের বিবাহের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। প্রতিদিন তার পক্ষ থেকে হাজার হাজার

স্বর্ণমুদ্রা দান করা হত, যা বাগদদের বিভিন্ন মহল্লার অভাবী, বিধবা, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হত। আল্লাহ্ তার এই আসল কবুল করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি বাগদাদে চার মাযহাবের জন্য মাদরাসা মুসতানসিরিয়্যা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে একটি হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র, একটি চিকিৎসাকেন্দ্র এবং একটি হাম্মামখানা স্থাপন করেন। এবং সেখানে অবস্থানকারিদের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি এই মাদরাসার অনুকূলে বিশাল ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করেন, এমন কি বলা হয় যে, এই বিশাল ভূখণ্ডের উৎপন্ন শস্যাদির তৃণখড়ের মূল্যই মাদরাসা ও মাদরাসার সাথে সম্পৃক্তদের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর তিনি সেখানে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ওয়াক্ফ করেন। এক কথায় এই মাদরাসাটি বাগদাদের জন্য এবং গোটা মুসলিম সম্রাজ্যের জন্য সৌন্দর্যতিলক ছিল।

এই বছরের শুরুতে আলী আলহাদী ও হাসান আসকারির সাথে সম্পৃক্ত সামিরাস্থ সমাধিসৌধ ভস্মীভূত হয়। এর নির্মাতা ছিলেন আর সালান বাসাসিরী। ৪৫০ হিজরীর দিকে তিনি যখন ঐ অঞ্চলের কর্তৃত্বাধিকারী ছিলেন, তখন তিনি তা নির্মাণ করেন। আর ভস্মীভূত হওয়ার পর খলীফা মুসতাসির তা পুনঃনির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। রাফেযীগণ এই সমাধিসৌধের অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে দীর্ঘ অজুহাত পেশ করেছে এবং এ প্রসঙ্গে বহু অর্থহীন কবিতা পঙক্তি রচনা করেছে এবং বহু তথ্য উদ্ধৃত করেছে। তাদের দাবী মতে এটাই সেই সমাধি, যেখান থেকে প্রতীক্ষিত ব্যক্তির 'আবির্ভাব' ঘটবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্তবতা নেই। আর বর্তমানে এর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। তা নির্মাণ না করাই অধিক সঙ্গত ছিল। আর তাদের সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তি হলেন শহীদের কারবালা হযরত হুসায়ন ইবন্ আলী ইবন্ আবূ তালিবের বংশধর হাসান ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবন্ আলী রিয়া ইবন্র মুসা কাযিম ইবন্ জাফির সাদিক ইবন্ 'আলী ইবন্ মুহাম্মাদ বাকির ইবন্ আলী যায়নুল আবেদীন ইবন্ হুসাইন (রা)। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হোন এবং তাদের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে অপদস্থ করুন। খলীফা মুস্তানসির ছিলেন মহানুভব, সহনশীল স্বভাব নেতা এবং মানুষের প্রিয়পাত্র। উপরন্তু তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সদাচারী ব্যক্তি। তার মুখাবয়তে আহলে বায়তের জ্যোতির আভা ছিল। আল্লাহ্ তার প্রতি প্রসন্ন হোক এবং তাকে প্রসন্ন করুন।

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রমযান মাসে সূর্যাস্তের পূর্বক্ষেত্রে অশ্বারোহন করে বাগদাদের কোনো এক পথ অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধলোক একটি পূর্ণ পাত্রে খাবার নিয়ে এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাকে বললেন : হে বৃদ্ধ! আপনি কেন নিজ মহল্লা থেকে খাবার সংগ্রহ করেন না? নাকি আপনি বেশি অভাবী, ফলে, দূর মহল্লা থেকে খাবার সংগ্রহ করেন? তখন বৃদ্ধ লোকটি বললেন : জনাব! আল্লাহ্র কসম করে বলছি! ঘটনা এমন নয়। আসল ব্যাপার হলো, আমি অতি বৃদ্ধ মানুষ। কালের আবর্তনে আজ আমি অভাবী। তবে আমি খাদ্য সংগ্রহের সময় আমার মহল্লাবাসীর সাথে ভিড়াভিড়ি করতে অপছন্দ করি। কেননা, আমাকে এ অবস্থায় দেখলে আমার বিদ্বেষীরা উৎফুল্ল হবে। তাই আমি অন্য মহল্লায় গিয়ে খাবার সংগ্রহ করি এবং লোকজন যখন মাগরিবের নামাযে মশগুল হয়, সেই সময় খাবার নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করি, ফলে আমাকে তেমন কেউ দেখতে পায় না। লোকটির

এই অবস্থায় কথা শুনে খলীফার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো এবং তিনি তাকে এক হাজার দীনার প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এই এক হাজার দীনার লাভ করে উক্ত বৃদ্ধ ভীষণ আনন্দিত হবেন এমনকি বলা হয়, আনন্দের আতিশয্যে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এরপর তিনি মাত্র বিশ দিন জীবিত ছিলেন। পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর আগে দীনারগুলি খলীফার কাছে রেখে যান, কেননা তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। সেখান থেকে তিনি একটি মাত্র দীনার ব্যয় করেছিলেন। এ ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে খলীফা বলেন : একবার আমরা যা দান করেছি, তা আর ফিরিয়ে নেব না, এই অর্থ তার মহল্লার দরিদ্রের মাঝে দান কর। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মৃত্যুকালে তিনি তিনজন পুত্রসন্তান রেখে যান, যাদের দুজন হলেন সহোদর, তারা বলেন আমীরুল মুমিনীন মুস্তাসিম বিল্লাহ, যিনি তার পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আবু আহমাদ আবদুল্লাহ এবং আমীর আবুল কাসিম আব্দুল আযীয। আর তাদের একজন ছিলেন যিনি ছিলেন অন্য মায়ের গর্ভজাত। তার মৃত্যুতে লোকজন বহু শোকগাঁথা রচনা করেন। যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইবন্ সায়ী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি কাউকে ওযীর নিয়োগ করেননি, বরং তিনি আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ওযীরের স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। অতঃপর এই পদে আসেন নাসরুদ্দীন আবুল আযহার আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ, যিনি দারুল খিলাফতের উস্তাদ ছিলেন। আর সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জানেন।

মুস্তাসিম বিল্লাহ্র খিলাফত

তিনি ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন এবং বাগদাদের সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফা। তিনিই হলেন তাতারীদের হাতে নিহত শহীদ খলীফা। চেঙ্গিস খানের পৌত্র এবং তোলাইখানের পুত্র হালাকু খার নির্দেশে তাতারীরা ৬৫৬ হিজরীতে তাকে হত্যা করে। অচিরেই ইনশা আল্লাহ্ যার বিবরণ আসছে। আর তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন মুসতাসিম বিল্লাহ আবূ আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন্ আমীরুল মু'মিনীন মুস্তানসির বিল্লাহ আবূ জা'ফর মানসূর ইবন্ আমীরুল মু'মিনীন যাহির বিল্লাহ আবূ মুহাম্মাদ নাসর মুহাম্মাদ ইবন্ আমীরুল মু'মিনীন নাসির লি-দীনিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ আমীরুল মু'মিনীন মুস্তাসিম বিল্লাহ আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবন্ আমীরুল মু'মিনীন মুস্তান্জিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফফর যূসুফ ইবন্ আমীরুল মু'মিনীন মুক্তাফী লি-আমরিল্লাহ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আমীরুল মুমিনীন মুস্তাযহির বিল্লাহ 'আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ খলীফা মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ। আর হযরত আব্বাস পর্যন্ত তার বংশ লতিকা তার পিতামহ নাসের এর জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। আর এখানে আমরা তাদের নাম উল্লেখ করলাম, তাদের প্রত্যেকেই খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন– একের পর এক। খলীফা মুস্তাসিমের পূর্বে আর কারও ভাগ্যে এমনটি ঘটেনি। অর্থাৎ তার বংশ তালিকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে আটজন খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেছেন। আর তিনি হলেন সেই ধারার নবম ব্যক্তি। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

৬৪০ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসের দশ তারিখ শুক্রবার সকালে যখন তার পিতা ইন্তিকাল করেন, তখন তাকে নামাযের পর ডেকে পাঠানো হয় এবং তার হাত খিলাফতের

বায়আত গৃহীত হয় এবং তাকে মু'সতাসিম উপাধি প্রদান করা হয়। এ সময় তার বয়স ছিল তিরিশ বছর কয়েক মাস। যৌবনে তিনি কুরআনের হিফয ও তাজবীদ কুশলতার সাথে সম্পন্ন করেন এবং তার সময়ের অন্যতম শীর্ষ শাফেয়ী 'আলিম শায়খ শামসুদ্দীন যুবাল মুযাফফর আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ নায়্যারের কাছে আরবী ভাষা, সুন্দর হস্তান্তর এবং অন্যান্য শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। অতঃপর পরবর্তীকালে তিনি যখন খলীফা হন, তখন তাকে সম্মান ও সদাচার দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

খলীফা মুস্তাসিম ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী এবং অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারি। তার মাঝে বিনম্রতা একাগ্রতাও আল্লাহ্ মুখিতা প্রকাশ পেত। তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তাফসীর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার বদান্যতা ছিল প্রসিদ্ধ এবং তিনি যথাসাধ্য ততাব পিতা খলীফা মুস্তানসিরের অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। এবং আল্লাহর ফযলে তার খিলাফত কালে সকল বিষয় সঠিক ও দৃঢ়ভাব পরিচালিত হয়। আর মুসতাসিমের অনুকূলে এই বায়আত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বায়াফুদ্দীন আবুল ফাযায়েল ইক্বাল মুসতানসিরী। প্রথমত তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন তার পিতৃপুত্রগণ এবং বানু আব্বাসের অন্যান্য স্বজন ও নিকট আত্মীয়গণ। অতঃপর বানূ আব্বাসের অন্যান্য স্বজন ও নিকট আত্মীয়গণ। অতঃপর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আমীর উমরা, ওযীর, কাযী, আলিম ও ফকীহগণ। অতঃপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীগণ, এরপর অন্যান্যগণ। আর এই দিনটি ছিল স্মরণীয় দিন এবং এটা ছিল সৌভাগ্যময় সিদ্ধান্ত এবং প্রশংসিত সমাবেশ। এরপর অন্যান্য শহর নগর, জনপদও এলাকা থেকে বায়আত গ্রহণের খবর আসতে থাকে। এরপর তার নামে সকল দেশে সকল অঞ্চলে তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। আর দূরবর্তী নিকটবর্তী এবং পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র মিম্বরে মিম্বরে তার নাম খুৎবা প্রদান করা হল, যেমন ইতোপূর্বে তার পিতা ও পিতামহদের নামে করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের সকলকে রহম করুন।

এছাড়া এ বছর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে খলীফা মুস্তান্সিরের খিলাফতকালের মেষ সময়ে ইরাকে তীব্র মহামারি দেখা দেয় এবং চিনি ও বিভিন্ন প্রকার ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এ অবস্থায় খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহ্ অসুস্থদের জন্য বিপুল পরিমাণ চিনির অনুদান প্রদান করেন। আল্লাহ্ তার এই দান কবুল করুন। এ বছর শাবান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবন্ মুহীয়ুদ্দীন য়ুসুফ ইবন্ শায়খ আবুল ফারাজ ইবন্ জাওদীকে বাবুল বাদরিয়্যাতে ওয়ায নসীহত করার অনুমতি প্রদান করেন। এ সময় আবুল ফারাজ ছিলেন চৌকস গুণবান যুবক। খলীফার অনুমতি লাভের পর তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এতে তার কুশলতা, যোগ্যতাও পারদর্শিতার পরিচয় দেন এবং খলীফা মুসতাসিমের প্রশংসায় দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। ইবন্ সায়ী যা সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া এ বছর হালবীদের মাঝে এবং খাওয়ারিযমীদের মাঝে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় খাওয়ারিযমীদের সাথে ছিলেন মায়্যাফারিকীনের শাসক শিহাবুদ্দীন গাযী। হালবীরা তাদেরকে গুরুতর ও ন্যাক্কারজনকভাবে পর্যদস্ত ও বিপর্যস্ত করে এবং তাদের বিপুল ধনসম্পত্তি হস্তগত করে। এছাড়া নাসীবায়ন শহরে আরেকবার ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। আর কয়েক বছরের মাঝে এটা ছিল সতেরোতম বার লুণ্ঠিত হওয়ার ঘটনা। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না

ইলায়হি রাজিউন। এরপর গাযী মায়্যাফারিকীনে ফিরে আসেন আর খাওরিযমীরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বারাকাত খানের নেতৃত্বে ফাসাদ বিশৃঙ্খলা করতে থাকে। এদিকে খালাত শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণের ব্যাপারে শিহাব গাযীর কাছে শাহী ফরমান আসে। তখন তিনি তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাতে বিদ্যমান শস্য ও রসদপত্র হস্তগত করেন। এছাড়া এ বছর মিশরের শাসনকর্তা সালিহ আয়্যুব শামদেশে প্রবেশের সংকল্প করেন। তখন তাকে বলা হয়, ফৌজ বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞ অবস্থায় রয়েছে। তখন তিনি সে-অভিমুখে ফৌজ বিন্যস্ত করে প্রেরণ করেন, আর তিনি নিজে মিশরে অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনায় মশগুল থাকেন। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন আমীরুল মু'মিনীন মুস্‌তানসির বিল্লাহ, যেমন উল্লিখিত হয়েছে এবং মহীয়সী নারী :

খাতুন বিত্ত ইয্‌যুদ্দীন মাসউদ

ইবন্ মাওদূদ যানকী ইবন্ আকাসনাকার আতাবিকিয়্যা। ইনি হরেন সালিহিয়্যায় অবস্থিত মাদরাসা আতবিকিয়্যার ওয়াকফ্‌কারিনী। ইনি ছিলেন সুলতান আশরাফের সহধর্মিনী। যে রাত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে রাত্রেই তিনি তার মাদরাসা ওয়াকফ করেন। তিনি আল জাবালে সমাহিত হন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : তিনি সেখানে অর্থাৎ আলদা বালে? সমাহিত হন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং তার দান কবুল করুন।

৬৪১ হিজরীর সূচনা

এ বছর মিশরে শাসক সুলতান সালিহ আয়্যুব এবং তার পিতৃব্য দামিশকের শাসক সালিহ ইসমাইলের মাঝে একাধিকবার দূত বিনিময় হয়। এ সময় দূতদের আলোচ্য বিষয় ছিল যে, সুলতান সালিহ ইসমাইল দামিশকের দুর্গে বন্দি সালিহ আয়্যুকের পুত্র মুগীছ উমরকে তার কাছে ফিরিয়ে দিবেন এবং দামিশকের কর্তৃত্ব সালিহ ইসমাইলের অনুকূলে সুস্থিত হবে। অতঃপর এই প্রস্তাবের উপর উভয়ের সন্ধি হয় এবং দামিশকে সালিহ আয়্যূবের নামে খুৎবা দেয়া হয়। তখন সালিহ ইসমাইলের ওযীর আমীনুদ্দৌলা আবুল হাসান গাযাল মুসলমানী এই সন্ধির মন্দ পরিণতির আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে সুলতানকে বলেন : আপনি এ বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিবেন না, তাহলে আপনার শাসনকর্তৃত্ব লোপ পাবে। দেশ শাসনের জন্য এটা আপনার জন্য সুলায়মানী আঙটি তখন তিনি ওযীরের এই পরামর্শে কৃতসন্ধি বাতিল করেন এবং সালিহ আয়ুবের বালক পুত্রকে দুর্গে ফেরত পাঠান এবং সালিহ আয়ুবের অনুকূলে খুৎবা প্রদান বন্ধ করে দেন ফলে উভয় শাসকের মাঝে বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এমনকি সুলতান সালিহ আয়্যুব দামিশক অবরোধের জন্য খাওয়ারিযমীদের ডেকে পাঠান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

আর খাওয়ারিযমীরা এ বছর রোমক ভূখণ্ড সংলগ্ন রাজ্য জয় করেন এবং তার শাসক ইবন্ আলাউদ্দীনের হাত থেকে তার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। আর এই ইবন্ আলাউদ্দীন ছিল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শিকারী কুকুর ও হিংস্র প্রাণি নিয়ে খেলাফত এবং তার নিরীহ মানুষের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করত। ঘটনাক্রমে একদিন তাকে একটি হিংস্র পশু কাপড় দেয়, ফলে এর বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে। তখন তারা তার রাজ্যের উপর নিজেদের পূর্ণ

কর্তৃত্ব আরোপ করে। এছাড়া এ বছর কাযী রাফী আল্ জালীর সাহায্যকারী ও অনুসারীদের ঘেরাও করা হয় এবং তাদের কাউকে কাউকে লাঠি দ্বারা প্রহারও করা হয় এবং তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর কাযী রাফীকে বাবুল ফারাদীলের অভ্যন্তরে মাদরাসা মুকাদ্দসিয়্যাতে অভ্যন্তরীণ রাখা হয়। অতঃপর রাতের আঁধারে সেখান থেকে জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়, এরপর আর তার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ঐতিহাসিক আবূ শামা উল্লেখ করেছেন যে, তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে থাকে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তাকে উঁচুস্থান থেকে ফেলে হত্যা করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন : তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। আর এসবই সংঘটিত হয় এ বছর জিলহজ্জ মাসে। আর এ বছর জিলহজ্জ মাসের পঁচিশ তারিখ শুক্রবার জামে দিমাসকে মুহ্য়ুদ্দীন ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ য়াইয়া জুরায়শীর দামেশকের কাযীরূপে নিয়োগ লাভের ফরমান পাঠ করে শোনানো হয়। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা এমনই বলেছেন। আর ঐতিহাসিক সাবত্ বলেন : তিনি পরবর্তী বছর অপসারিত হন। আর তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলতান সালিহের কাছে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, তিনি তার ধনভাণ্ডারে প্রজাদের থেকে দশ লক্ষ দীনার আদায় করে জমা করেছেন, কিন্তু সুলতান সালিহ তা অস্বীকার করে পত্র প্রেরণ করেন যে, সেখানে সংগৃহীত হয়েছে দশ লক্ষ দিরহাম তখন কাযী তাকে লিখে জানান যে, তাহলে আমি বিষয়টি নিয়ে ওযীরের সাথে বিবাদ করব। এদিকে সুলতান সালিহ তার ওযীরের বিরোধিতা করতেন না, আর ওযীর তখন সুলতান সালিহকে পরামর্শ দিলে তিনি তাকে অপসারণ করেন, যাতে প্রজাদের নিন্দা-সমালোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরপর ঘটনা ঘটার তা সংঘটিত হয়।

আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা সমূহের দায়িত্ব অর্পিত হয় শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ সালাহ এর দায়িত্বে। অতঃপর তিনি মাদরাসা আদিলিয়্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন শায়খ কামাল তাফসীসীকে মাদরাসা আয্রাবিয়্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন শায়খ মুয্য়ুদ্দীন ইবন্ যাকীকে, যিনি তার পর কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মাদরাসা আমীনিয়্যার দায়িত্ব প্রদান করেন শায়খ ইবন্ আব্দুল কাফীকে, এরং মাদরাসা শামিয়্যা আলবুরানিয়্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন শায়খ তাকী হামাবীকে। এছাড়া তার নির্দেশে কাযী রাফীকে নিরুদ্দেশ করে দেয়া হয় এবং তার সাক্ষীদের ন্যায়পরায়নতা রহিত করে দেয়া হয়।

ঐতিহাসিক সাবত বলেন : আমীন তাকে জনৈক খ্রিষ্টানের এক খচ্চরে সমুদ্র উপকূলবর্তী লুবনান পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে বালাবাক শহর থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রেরণ করেন, যেন তারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন যে, সে তার সহায় সম্পত্তি আমীনুদ্দৌলার কাছে বিক্রি করেছেন। আর তারা দুজন উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাকে বিশেষ ধরনের পরিধেয় দেখেছেন এবং সে তাদের দুজনের কাছে খাবার চেয়েছে কেননা ইতোপূর্বে তিন দিন সে অনাহারে ছিল। তখন তারা তাকে তাদের পাথেয় থেকে খাবার দেন এবং তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে বিদায় নেন। অতঃপর দাউদ নাসরানী তার কাছে এসে বলেন : চল, তোমাকে বালাবাক শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন সে বুঝতে পারে যে, মৃত্যু নিশ্চিত। তখন সে

বলে : ঠিক আছে, আমাকে দুরাকাআত নামায পড়তে দাও। এরপর দাউদ তাকে উঠতে বললে, সে উঠে নামায দাঁড়িয়ে যায় এদিকে যে যখন নামায দীর্ঘ করে, তখন দাউদ নাসরীনী তাকে লাথি দিয়ে পাহাড়ের চূঁড়া থেকে নীচে ফেলে দেয়, ফলে নীচে পড়ে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, তার শরীরের পরিধেয় পাহাড়ের উদ্ভিন্ন অংশে আটকে গিয়ে সে ঝুলে ছিল। কিন্তু ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করে দাউদ তাকে পাহাড়ের নীচে নিক্ষেপ করে।

ঐতিহাসিক সাবত্ বলেন : এই ব্যক্তি ছিল নাস্তিক, ভ্রান্ত ও ধর্ম বিশ্বাসের অধিকারী এবং শরীয়তের বিধি বিধানের প্রতি বিদ্রূপকারী। সে প্রকাশ্যে মাতাল অবস্থায় ঘুরে বেড়াত, এমনকি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে জুমুআয় নামাযে উপস্থিত হতো। তা বাড়ী ছিল পানশালা, 'লা হাওলা ওয়া লা কুতওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। তিনি অর্থাৎ (সাবত) আরও বলেন : মুওয়াফফাক আলওয়াসিতী তর এক তত্ত্বাবধায়ককে পাকড়াও করেন যে মানুষের ছয় লক্ষ দিরহাম আত্মসাৎ করে। এ সময় তাকে বিরাট শাস্তি প্রদান করে আত্মসাৎকৃত অর্থ তার থেকে ফেরত নেয়া হয়। বেদম প্রহারে তার দুপায়ের নলা ভেঙে দেয়া হয় এবং তীব্র প্রহারেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর তাকে য়াহূদী খ্রিষ্টানদের সমাধিস্থলে ফেলে দেয়া হয় এবং সে শিয়াল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন :–

শায়খ শামসুদ্দীন আবুল ফুতূহ

ইনি হলেন আস্আদ ইবন্ মুন্জী আত্তানূখী আল্ মাআররী আল্ হাম্বলী প্রথমে তিনি হাররান শহরের কাযী ছিলেন। অতঃপর দামেশকে আগমন করেন এবং মিসমারিয়্যা মাদরাসায় পাঠদান করেন। এরপর তিনি মুআয্যামিয়্যা রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দায়িত্ব পালন করেন। আর ইবন্ সাবির, কাযী শাহারসূরী এবং ইবন্ আবু আসরীন থেকে তিনি রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার ওফাত সংঘটিত হয় এ বছর রবিউল আওয়াল মাসের সাত তারিখে। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

শায়খ হাফিয সালিহ

ইনি হলেন তাকীয়ুদ্দীন আবূ ইসহাক ইবরাহী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আযহার। হাদীস শাস্ত্রে তার বিশেষ জ্ঞান ও অবগতি ছিল। আল্লামা আবূ শামা তার প্রশংসা করেছেন এবং জামে দামেশকে তার জানাযা পড়েছেন। আর তাকে কাসীয়ুন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

মাদরাসা কারুসিয়্যার ওয়াকফকারি

ইনি হলেন মুহাম্মাদ ইবন্ কারুস, জামালুদ্দনি, দমেশকের হিসাব রক্ষক। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। তিনি এ বছর শাওয়াল মাসে দামেশকে ওফাত গ্রহণ করেন এবং তার ঐ বাসগৃহে সমাহিত হন, যাকে তিনি মাদরাসা বানিয়েছিলেন। তার একটি দারুল হাদীসও ছিল। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন।

দানবীর সুলতান য়ূনুস ইবন্ শামদূদ

দানবীর সুলতান ইবন্ আদিল আবূ বকর ইবন্ আয়্যুব। তার পিতা ছিলেন সুলতান আদিলের জ্যেষ্ঠপুত্র। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়ে তিনি তার পিতৃব্য কামিল

মুহাম্মাদ ইবন্ আদিলের পর দামেশকের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি ছিলেন ভাল মনের অধিকারী এবং নেককার লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনকারী কিন্তু তার দরবারে এমন লোকদের কর্তৃত্ব ছিল, যারা মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তা তার দিকে সম্পৃক্ত করতো। ফলে সাধারণ মানুষ তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং তাকে বাধ্য করে সুলতান সালিহ আয়্যুব ইবন্ কামিলের হাতে দামেশকের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে কী সাজার শহর ও কায়ফা দুর্গের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে। পরবর্তীকালে তিনি এ দুটির কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেননি ফলে উভয়টি তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। পরিশেষে ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সুলতান সালিহ ইসমাইল তাকে 'আয্তা' দুর্গে বন্দি করেন এবং এ বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শাওয়াল মাসে তাকে কাসীয়ূনের পাদদেশে অবস্থিত সুলতান নুআযযমের কবরস্থলে স্থানান্তরিত করা হয়। আর ইবন্ রাগমূর তার কাছে বন্দী ছিল। অতঃপর সুলতান সালিহ ইসমাইল তাকে দামেশকের দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। এরপর যখন সুলতান সালিহ আয়ব তা দখল করেন, তখন তিনি তাকে মিশরীয় ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করেন এবং তাকে সুলতান সালিহ ইসমাইলের ওযীরে আমীর গাযালের সাথে ফাঁসি দেন। তাদেকে এই ফাঁসি দেয়া হয় কায়রোর দুর্গ চূড়ায় সুলতান সারিহ আয়্যুবের সাথে তাদের কৃত আচরণের ফলশ্রুতিরূপে। আর ইবন্ য়াগমূর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, এমনকি দামেশকের শাসন কর্তৃত্ব সুলতান সালিহ ইসমাইলের অনুকূলে নিয়ে যায়। আর আমীনুদ্দৌলা সুলতান সালিহ তার পুত্র উমরকে পিতার হাতে সমর্পণ করতে বাধা প্রদান করেন। ফলে তিনি তাদের দুজন থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাকে নিরুপায় গণ্য করা যেতে পারে।

মাসউদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ মাসউদ

ইনি হলেন ইবন্ মাযাহ্ আলমুহাবিবী, বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ, তবে তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রেও তার পর্যাপ্ত অবগতি ছিল। তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকাল তাতারী দূতের সাহচর্যে হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদে আগমন করেন। তখন দুবছর তাকে আটকে রাখা হয়, এরপর মুক্তি দেয়া হয়। তখন তিনি হজ্জ পালন করেন। পরে ফিরে আসেন বাগদাদে এবং এ বছর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবুল হাসান আলী ইবন্ য়াইয়া ইবন্ হাসান

ইবন্ হুসায়ন ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ নাসর ইবন্ হামদুন্ ইবন্ ছাবিত আল আসাদী আল্ ওয়াসিতী আল্ বাগদাদী, ইনি হলেন শিয়া ও কবি ও লেখক এবং শিয়াদের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি বেশ কিছু কাল দামেশকে অবস্থান করেন এবং বহু আমীর উমারা ও রাজা বাদশার প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিশরের শাসক সুলতান কামিল ও অন্যান্যগণ। অতঃপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং শিয়াদের মাযহাব অনুসরণ করেন। আর তিনি ছিলেন মেদাবী ও বহুগুণের অধিকারী সুকবি, সুলেখক তবে পরিতাপের বিষয় হল, তিনি ছিলেন সত্যবিচ্যুত। ইবনুস সায়ী তার একটি উৎকৃষ্ট কবিতাখণ্ড উদ্ধৃত করেছেন, যা তার জ্ঞানের গভীরতা ও বুদ্ধির প্রখরতার অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন।

৬৪২ হিজরীর সূচনা

এ বছরই খলীফা মুস্‌তাসিম, মুআয়্যাদ্দুদীন আবু তালিব মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ আল কামীকে ওযীর নিয়োগ করেন। আর এই ব্যক্তি নিজের জন্য এবং সমগ্র বাগদাদবাসীর জন্য অপয়া ছিল। ওযীর থাকাকালে সে খলীফা মুসতাসিমকে রক্ষায় কোন ভূমিকা পালন করেনি। কেননা, সে যেমন খলীফার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল না, তেমনি ছিল না গ্রহণযোগ্য পথ ও পন্থায় অনুসারী। উপরন্তু সে হালাকু খান ও তার সেনাবাহিনীকে বাগদাদ ধ্বংসের সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিল। আল্লাহ্ তাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন। ইবন্ আল্ কাযী ওযীরের পদ লাভের পূর্বে দারুল খিলাফতের উস্তাদ ছিলেন। অতঃপর যখন কামরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ নাকিদ মৃত্যুবরণ করেন তখন তার স্থলে ইবন্ আল্ কামীকে ওযীর নিয়োগ করা হয়। আর ইবন্ আল্ কাসীর স্থলে দারূর খিলাফতের উস্তাদ হিসাবে নিয়োগ করা হয় শায়খ মুহীয়ুদ্দীন য়ুসুক ইবন্ আবুল ফারাজ ইবন্ জাওয়ীকে, এই ব্যক্তি ছিলেন অতি উত্তম মানুষ। ইনিই হলেন দামেশকের মাদরাসা জাওযিয়্যার ওয়াকফকারি। আল্লাহ্ তার ওয়াকফ কবুল করুন। এ বছরই শায়খ শামসুদ্দীন আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ন্যায়্যারকে বাগদাদের প্রধান শায়খ নিয়োগ করা হয় এবং তাকে রাজ পরিধেয় প্রদান করে সম্মানে ভূষিত করা হয়। এছাড়া খলীফা আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন্ মুতাহ্হারকে স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন এবং তাকে রাজ পরিধেয় প্রদান করে সম্মানে ভূষিত করেন। আর এ বছরই খাওয়ারিযমীদের বিরুদ্ধে বিরাট লড়াই সংঘটিত হয়, যাদেরকে মিশরের শাসক সুলতান সালিহ আয়্যুব, দামেশকের শাসক সুলতান সালিহ ইসমাইল আবুল হাসানের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের জন্য আগমনের আমন্ত্রণ জানান। তারা এসে গাযায় অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় সুলতান সারিহ আয়্যুব তাদের কাছে রাজ পরিধেয়, নগদ অর্থ, সাধারণ পরিধেয় এবং সেনাদল প্রেরণ করেন। এদিকে সুলতান সালিহ ইসমাইল, কারকের নামক সুলতান নাসের দাউদ, এবং হিমেসের শাসক সুলতান মানসূর খ্রিষ্টানদের সাথে একজোট হন এবং খাওয়াবিয়সমীদের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু খাওয়ারিযমীরা তাদেরকে লজ্জাজনকভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে। খ্রিষ্টানরা পরাজিত হওয়ায় তাদের ক্রুশসমূহ ও যুদ্ধের ঝাণ্ডাসমূহ ভূলুণ্ঠিত হয। ইতোপূর্বে যেখানে তাদের মাঝে মদিরা পাত্রের ছড়াছড়ি ছিল, সেখানে তারা তার পরিবর্তে মৃত্যুসুধা পান করতে থাকে মৃত্যু পেয়ালা থেকে। একদিনে খ্রিষ্টানদের তিরিশ হাজারের বেশী যোদ্ধা নিহত হয় এবং তাদের একদল শাসক, যাজক ও পাদ্রী বন্দি হন। এবং তাদের সাথে বন্দি হন অনেক মুসলিম আমীর উমারা আর বন্দীদেরকে সুলতান সালিহ আয়্যুবের কাছে মিশরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর সেদিনই ছিল একটি স্মরণীয় দিন এবং বিষয়টি ছিল প্রশংসনীয়। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। বর্ণনাকারী বলেন : জনৈক মুসলিম আমীর বলেন : যখন আমরা খ্রিষ্টানদের একুশের নীচে দাঁড়ালাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমাদের পরাজয় অনিবার্য। এদিকে এই লড়াইয়ে খাওয়ারিযমীরা খ্রিষ্টানদের থেকে এবং তাদের সহযোদ্ধাদের থেকে বিপুল পরিমাণ গণীমত লাভ করে। এ সময় সুলতান সালিহ আয়্যুব দামেশক অবরোধের জন্য ফৌজ প্রেরণ করেন। তখন সুলতান সারিহ ইসমাইল তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেন। এবং তার আশেপাশের বহু ভূখণ্ড বিরান ভূমিতে পরিণত করেন এবং একটি নদীর বাঁধও ভেঙে দেন, ফলে সেখানে এক বিশাল কৃত্রিম

হ্রদের সৃষ্টি হয় এবং সেই ভূখণ্ডের লোক বসতি নিমজ্জিত হয়। এর ফলে বহু মানুষ দারিদ্র ও অভাবের শিকার হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

সুলতান মুগীছ উমর ইবন্ সালিহ্ আয়্যুব

সুলতান সালিহ্ ইসমাইল তাকে তার পিতা সালিহ্ আয়্যুবের অনুপস্থিতিতে গ্রেফতার করে দামেশকের দুর্গচূড়ায় বন্দি করে রাখেন। তার পিতা তাকে মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাকে সফল হননি। এ ব্যাপারে তার বিরোধিতা করেন বালাবাকের আমীনিয়্যা মাদরাসার ওয়াফককারি আমীনুদ্দৌলা দয়াল আলমুসলমানী, এরপর এই যুবক এই দুর্গে ৬৩৮ হিজরী থেকে এ বছর অর্থাৎ ৬৪২ হিজরীর বরিউল আখির মাসের ১২ তারিখ শুক্রবার পর্যন্ত বন্দী থাকেন। তিনি তার বন্দিশালায় দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাকে হত্যা করা হয়। আর প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ ভাল যানেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম রাজ সন্তানদের অন্যতম, যেমন সুদর্শন তেমনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তাকে জামে দামেশকের উত্তর দিকে তার পিতামহের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। এ ঘটনার কারণে তার পিতা সালিহ্ আয়্যুবের আক্রোশ দামেশক শাসকের প্রতি তীব্রতর হয়। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

তাজুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ ইবন্ উমর ইবন্ হামাওয়াহির

তিনি ছিলেন বিশিস্ট গুণী লেখক ও ঐতিহাসিক। তাঁর আটখণ্ডে সংকলিত একটি গ্রন্থ রয়েছে, তাতে উল্লিখিত হয়েছে একাধিক মূলনীতি। এছাড়া তার সংকলিত অন্যতম গ্রন্থ হলো 'আস্সিয়ারা আলমুলুবিয়্যা। তিনি এই গ্রন্থ সংকলন করেন সুলতান কামিল মুহাম্মাদের জন্য। এছাড়া তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। তিনি আশি বছর বয়সে উপনীত হন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন : তার বয়স আশি বছর পূর্ণ হয়নি। ৫৯৩ হিজরীতে তিনি 'মাগরিব'[১] দেশে গমন করেন এবং মাররাকিশে সেখানকার শাসক সুলতান য়াকূব ইবন্ য়ূমুক ইবন্ আব্দুল মুমিনের সাথে অন্তরঙ্গহন এবং সেখানে ৬০০ হিজরী সন পর্যন্ত অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মিশরে গমন করেন এবং সেখানে ভাই সদরুদ্দীন ইবন্ হামওয়াহির পর প্রধান শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

ওযীর নাসরুদ্দীন আবুল আয্হার

ইনি হলো আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ আলী আলবাগদাদী প্রথমে খলীফা মুসতানসিরের ওযীর, অতঃপর তার পুত্র মুসতাসিনের ওযীর। তিনি ছিলেন বণিক পুত্র। সেই স্তর থেকে তিনি নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে এই দুই খলীফার ওযীর পদে উন্নীত হন। তিনি ছিলেন বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী গুণবান হাফেযে কুরআন এবং অধিক তিলাওয়াত কারি। তিনি লালিত পালিত হন বিপুল যশ ও বিলাসিতার মাঝে। শেষ বয়সে তিনি চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও তিনি সকলের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তার রচিত বেশ

১. উত্তর আফ্রিকার বর্তমান লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলেজেরিয়া এবং শাররাকেশের সম্মিলিত নাম।

কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা পঙক্তি রয়েছে। ইবনুস সায়ী তার উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করেছেন। এ বছর পঞ্চশোর্ধ বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

প্রধান নকীব প্রধান খতীব

খলীফাদের নির্বাহী আবূ তালিব হুসায়ন ইবন্ আহমাদ ইবন্ আলী ইবন্ আহমাদ ইবন্ মায়ীন ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ মুহ্তাদীবিল্লাহ আলতাববাসী। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং মুসলমানদের অন্যতম ইমাম ও খতীব। তিনি সবসময় সততা ও যথার্থতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কখনও তিনি খুৎবার দাযিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হননি এবং কখনও অসুস্থও হননি। অবশেষে এ বছর কোনো এক মাসের ২৮ তারিখ শনিবার রাতে কোনো প্রয়োজনে ঘুম থেকে উঠে তিনি পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এ সময় তার মুখ দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটে এবং তার বাকশক্তি রহিত হয়ে পড়ে। এরপর তার মৃত্যু ঘটে। তার জানাযায় বিপুল জন সমাবেশ ঘটে। আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে ক্ষমা করুন।

৬৪৩ হিজরীর শুরু

এটা হলো খাওয়ারিযমীদের বছর। এ বছর মিশরের শাসক সুলতান সালিহ আয়্যুব ইবন্ কামিল খাওয়ারিযমীদের তাদের সুলতান বরকত খানসহ সুয়ীনুদ্দীন ইবনুশ শায়খের সাথে অভিযানে প্রেরণ করেন। তখন তারা সালিহ আয়্যুবের পিতৃব্য শাসিত দামেশককে অবরোধ করে। এদিকে সুলতান সালিহ ইসমাইল তার শহর রক্ষার জন্য অনেক কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেন, অনেক বসতি বিরান করেন। এছাড়া তিনি নগরীর বিভিন্ন প্রবেশ মুখে মিনজানীক বা প্রস্তর নিক্ষেপক কামান স্থাপন করেন। এরপর উভয় ফৌজ পরস্পর মুখোমুখি হয়। তখন সুলতান সালিহ ইসমাইল তার প্রতিপক্ষের সেনাপতি মুয়ীনুদ্দীন ইবন্ শায়খের কাছে একটি জায়নামায একটি লাঠি, একটি পানির পাত্র পাঠিয়ে দূত মারফত এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনার জন্য শাসক যোদ্ধারে অবরোধ করার চেয়ে এগুলি নিয়ে মশগুল থাকা অধিক শোভনীয়। তখন এর জবাবে মুয়ীনুদ্দীন বাঁশি ও বিভিন্ন রঙয়ের রেশমী বস্ত্র পাঠিয়ে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, আপনার পাঠানো জায়নামায তা আমার উপযুক্ত কিন্তু আপনি এগুলির বেশী উপযুক্ত। পরদিন সকালে দামেশক অবরোধ তীব্রতর হল এবং সুলতান সালিহ ইসমাইল লোক পাঠিয়ে তা পিতা আদিলের বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন এই অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরাট এলাকা ভস্মীভূত হয়। এ সময় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে, পথ-ঘাট অনিরাপদ হয়ে পড়ে এবং দামেশকে অনেক বীভৎস ঘটনা ঘটে। আর এই অবরোধ এ বছর জুাদান উলা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এ সময় আমীনুদ্দৌলা ইবন্ শায়খের কাছে তার কিছু পরিধেয় বস্ত্র চেয়ে দূত পাঠান। তখন তিনি তার জুব্বা, পাগড়ী ও রুমাল তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর আমীনুদ্দৌলা এগুলি পরিধান করে মুয়ুদ্দীনের সাক্ষাতে বের হন। ইশার নামাযের পর তিনি দীর্ঘক্ষণ তার সাথে সাক্ষাত করেন। অতঃপর তিনি ফিরে আসেন এবং আরেকবার তার সাথে সাক্ষাত করেন। এসময় তাদের মাঝে এই সমঝোতা হয় যে, সুলতান সারিহ ইসমাইল বালাবাকে চলে যাবেন এবং দামেশকের শাসন কর্তৃত্ব সুলতান সালিহ আয়্যুবের হাতে তুলে দিবেন। লোকজন এতে

উৎফুল্ল হয় এবং পরদিন সকালে সুলতান সালিহ ইসমাইল বালাবাকের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। এদিকে মুয়ীনুদ্দীন ইবন্ শায়খ দামেশকে প্রবেশ করে দারে উসমাতে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কাউকে নিয়োগ করেন, কাউকে অপসারণ করেন, কাউকে সংযুক্ত করেন, আবার কাউকে বিচ্ছিন্ন করেন। এ সময় তিনি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব অর্পণ করেন সদরুদ্দীন ইবন্ সানিয়ুদ্দৌলাকে, আর কাযী মুহীয়ুদ্দীন ইবন্ যাকীকে তার পদ থেকে অপসারণ করেন। এছাড়া তিনি ইবন্ যাকী এবং ফারয্সানজারীর স্থলবর্তী ইবন্ সানিয়্যাদ্দৌলা তাফসিরীকে তার নাইব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। আর মুয়ীনুদ্দীন ইবন্ শায়খ সুলতান সালিহ ইসমাইলের ওযীর আমীনদ্দৌলা গযাল ইবন্ মুসলমানীকে প্রহরাধীন অবস্থায় মিশরীয় ভূখণ্ডে প্রেরণ করেন।

এদিকে খাওয়ারিযমীরা বই সন্ধির সময়ে উপস্থিত ছিল না। তারা যখন এই সন্ধির কথা জানতে পারল, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দারিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হন এবং তা লুণ্ঠণ করেন। এরপর তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হল এবং সুলতান সারিহ ইসমাইলের সাথে পত্র যোগাযোগ করল এবং সালিহ আয়্যুবের বিরুদ্ধে তার সাথে মৈত্রী চুক্তি করল। তখন সালিহ ইসমাইল তাতে খুশী হন এবং তার পক্ষে থেকে কৃত সন্ধিচুক্তি লজ্ঘন করেন। এদিকে খাওয়ারিযমীরা ফিরে এসে দামেশকে অবরোধ করে আর বালাবাক থেকে সালিহ ইসমাইল এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। তখন দামেশকবাসীরা কোণঠাসা অবস্থায় পতিত হয়। ফলে আমদানী রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়ে দ্রব্যমূল্য ভীষণ বৃদ্ধি পায়। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রি আটা, গম, গোশত সবকিছুর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল। ফলে সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের শিকার হয়ে বিড়াল, কুকুর, কাকড়া ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হন। ফলে মানুষের মাঝে মহামারী দেখা দেয় এবং রাস্তাঘাট এবং যত্রতত্র মৃতের সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, তাদের কে ঠিকমত দাফন কাফন করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল বাধ্য হয়ে লোকজন মৃতদেহসমূহ পরিত্যক্ত কূপ ইত্যাদিতে নিক্ষেপ করতে থাকে এমনকি গোটা শহর দুর্গন্ধ ও দূষণে ভরে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এই সময়েই ইনতিকাল করেন শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ সালাহ, যিনি দারুল হাদীস ও অন্যান্য মাদরাসার শায়খ ছিলেন। অনেক কষ্টে তার জানাযা ও দাফন কাফন সম্পন্ন করা হয়। তাকে সুফীদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

ঐতিহাসিক ইবন্ সাবত্ বলেন : এ সকল দুর্যোগ দুর্ভোগ সত্ত্বেও মদ্যপান ও অনাচার পাপচার প্রকাশ্য ছিল এবং কর-খাজনা সবই বহাল ছিল। শায়খ শিহাবুদ্দীন উল্লেখ করেছেন যে, এ বছর ভীষণভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। ফলে পথেঘাটে অনাহারে দরিদ্রদের মৃত্যু ঘটে। কখনও তারা এক লোকমা খাবারের জন্য, আবার কখনও আরও তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য তারা মানুষের দ্বারস্থ হত। শায়খ শিহাবুদ্দীন বলেন : এসবই আমার নিজ চোখে দেখা। এ প্রসঙ্গে সবকিছুর মূল্য তালিকাও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বছর শেষে ইদুল আহযার পর এ অবস্থা দূর হয়ে যায়। আর প্রশংস আল্লাহর।

এদিকে সুলতান সালিহ আয়ুবের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছল যে, খাওয়ারিযমীরা তার পিতৃব্য ইসমাইলের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তখন তিনি হিমসের

শাসনকর্তা মনসূর ইবরাহীম ইবন্ আসদুদ্দীন শেরকোহ-এর সাথে পত্র যোগাযোগ করেন এবং তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং দামেশকের নাইব বা প্রতিনিধি মুয়ীনুদ্দীন হুসায়ন ইবন্ শায়খের পক্ষ শক্তিশালী হয়। কিন্তু তিনি এ বছর রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন, যেমন অচিরেই আসছে। আর এদিকে হিমসের শাসক মানসূর যখন সুলতান সালিহ ইসমাঈলের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব থেকে বিমুখ হলেন, তখন তিনি খাওয়ারিযমীদের কবল থেকে দাশিঙ্ক রক্ষার জন্য হালবী, তুর্কমান ও বেদুঈন আরবদের থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ শুরু করলেন। এ খবর যখন খাওয়ারিযমীদের কাছে পৌঁছিল, তখন তারা ভীত ও শঙ্কিত হল। তারা বললো, দামিস্কেতে স্বস্থানেই থাকছে, আমাদের উচিত হবে, শহরে গিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। তখন তারা হিম্‌স শহরের হ্রদ অভিমুখে অগ্রসর হল। এদিকে সুলতান নাসেব দাউদ খাওয়ারিযমীদের সাথে সালিহ ইসমাঈলের কাছে তীর ফৌজ প্রেরণ করলেন। অন্যদিকে দামিস্কের ফৌজ এসে হিমস শাসকের বাহিনীর সাথে মিলিত হল। আর তারা খাওয়ারিযসীদের মুখোমুখি হয় হিমস-হ্রদের কাছে। আর এটা ছিল এক স্মরণীয় দিন। এ যুদ্ধে অধিকাংশ খাওয়ারিযমী যোদ্ধা নিহত হয়, নিহত হয় তাদের সেনাপতি বারাকাত খান। এ সময় তার কর্তিত্ব মস্তক বর্শায় গেঁথে নিয়ে আসা হয়। ফলে খাওয়ারিযমীরা পর্যুদস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এরপর হিমসের শাসনকর্তা মানসূর বা'লাবাকে গমন করেন এবং সালিহ আয়্যুব তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তিনি দামিস্কে আগমন করে সুলতান সাহিল আয়্যুবের খিদমতের উদ্দেশ্যে শামা উদ্যানে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তিনি এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী বছর মৃত্যুবরণ করেন এবং হিমসে স্থানান্তরিত হন। আর তার পিতার পর তার রাজত্বকাল ছিল দশ বছর। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সুলতান আশরাফ তা শাসন করেন মাত্র দুবছর। অতঃপর তার থেকে এর শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়, যার বিবরণ শীঘ্রই আসবে। এছাড়া সুলতান সালিহ আয়্যুব বা'লাবাক ও বসরার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ফলে সুলতান সালিহ ইসমাঈলের হাতে এমন কোনো শহরের শাসন কর্তৃত্ব থাকল না, য়েখানে তিনি আশ্রয় নিছেন। এমনকি আশ্রয় নেয়ার মত তার কোনো স্বজন-সন্তান এবং সহায়-সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলো না। বরং তার যাবতীয় ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তার পোষ্য পরিজনকে প্রহরাধীন অবস্থায় মিশরে প্রেরণ করা হলো।

এ সময় তিনি হালবের শাসক সুলতান নাসির ইবন্ আযীয ইবন্ যাহিরের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন হালবের শাসক তাকে অত্যন্ত সমাদর ও সম্মানের সাথে আশ্রয় প্রদান করেন। এ সময় আতাবিক লু'লু হাল্‌বী তার উস্তাদ পুত্র নাসিরকে, আর সে ছিল অল্পবয়সী যুবক, বলেন: দেখ, যুলুমের পরিণতি কেমন হয়। আর এসময় খাওয়ারিয্‌মীরা কারক অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে কারকের শাসক নাসির দাউদ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি তাদের সাথে সদাচরণ করেন, তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাদেরকে সালতে অবস্থান করান, আর তারা এর সাথে নাবলূস শহরও অধিকার করে নেয়। তখন সুলতান সালিহ আয়্যুব ফখরুদ্দীন ইবনুশ শায়খের সাথে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। আর সেনাবাহিনী সালত্ আক্রমণ করে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে এবং তাদেরকে ঐ সকল ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করে। এরা সুলতান নাসিরকে কারোকে অবরোধ করে এবং তাকে ভীষণভাবে অপমানিত করে। এদিকে নেককার শাসক নাজমূদ্দীন আয়্যুব মিশরীয় ভূখণ্ড থেকে আগমন করেন এবং বিরাট শান শওকতসহ দামিস্কে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি দামিস্কবাসীর প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ

করেন এবং সেখানকার অভাবি ও দরিদ্রদের মাঝে দান সদকা করেন। এখান থেকে তিনি বা'লাবাকে বসরায় এবং সারখাদে গমন করেন। অতঃপর সারখাদের শাসক ইয্যুদ্দীন আয়বেক থেকে তার শাসন কর্তৃত্ব নিজে গ্রহণ করেন এবং তাকে এর বিনিময়ে অন্য একটি শহরের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। পরে তিনি বিজয়ী বেশে মিশরে ফিরে আসেন। আর এ সবই সংঘটিত হয় পরবর্তী বছর।

এছাড়া এ বছর খলীফার বাহিনী এবং তাতারীদের মাঝে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এযুদ্ধে মুসলিমবাহিনী তাদেরকে গুরুতরভাবে পর্যুদস্ত করে এবং তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, এ সময় মুসলিমবাহিনী পরাজিত তাতারীদের আর ধাওয়া করে পিছু নেয়নি, তাদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষার্থে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাণী অনুযায়ী আমল করার জন্য; তা হলো: "তোমরা তুর্কীদের অর্থাৎ তাতারীদের এড়িয়ে চল, যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে এড়িয়ে চলে।" আর এবছরই খোযিস্তান অঞ্চলে পাহাড়ের ফাঁটলে অদ্ভূত স্থাপনা দৃষ্টিগোচর হয়। কেউ কেউ বলেন, তা ভিন্নদের হাতে নির্মিত। ঐতিহাসিক ইবনুসায়ী তার সংকলিত ইতিহাস গ্রন্থে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেনঃ-

শায়খ তাকীয়ুদ্দীন আবু সালাহ

ইনি হলেন উছমান ইবন্ 'আব্দুর রহমান ইবন্ উছমান, শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং শামদেশের মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিছ। প্রথমত তিনি শাহারযূরী, অতঃপর ফোকী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডে এবং সেখানকার মাওসিল, হালব ও অন্যান্য শহরে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তার পিতা ছিলেন হালবের মাদ্রাসা আসাদিয়ার শিক্ষক। আর এই মাদ্রাসার ওয়াক্‌ফকারি বা প্রতিষ্ঠাতা হলেন, আসাদুদ্দীন শেরকোহ ইবন্ শাযী। তিনি যখন শাম দেশে আগমন করেন, তখন তিনি বিরাট গুণী এক ব্যক্তি। তিনি বেশকিছু দিন কুদসে অবস্থান করেন এবং মাদ্রাসা সালাহিয়াতে দরস প্রদান করেন। অতঃপর সেখান থেকে দামিস্কে স্থানান্তরিত হন এবং মাদ্রাসা রওয়াহিয়া, অতঃপর দারুল হাদীস আশ্‌রাফিয়ায় দারস প্রদান করেন। আর তিনিই হলেন সেখানে দায়িত্ব পালনকারি প্রথম শায়খুল হাদীস। আর তিনিই তার ওয়াকফের কিতাব সংকলন করেন, এরপর তিনি পাঠ দান করেন–মাদ্রাসা শামিয়্যা জুওয়ানিয়্যায়। আর তিনি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। এছাড়া আলওয়াসীত ও অন্যান্য গ্রন্থে তার উৎকৃষ্ট টীকা সংকলন বিদ্যমান। আর তিনি ছিলেন ধার্মিক, দুনিয়াবিমুখ, আল্লাহ্‌ভীরু এবং ইবাদত গুযার ব্যক্তি, সালফে সালেহীনের তরিকার অনুসারী যেমনটি অধিকাংশ পরবর্তীকালীন মুহাদ্দিসদের তরীকা ছিল আর এটা ছিল বহু বিদ্যা ও শাস্ত্রে পূর্ণ পারদর্শিতার সালে। এই উত্তম তরীকায় অবিচল থাকা অবস্থাতেই দারুল হাদীস আশরাফিয়্যাতে ৬৪৩ হিজরীর রবিউল আখির সালের ২৫ তারিখ বুধবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। জামে দামিস্কে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং লোকজন তার জানাযার সাথে বাবুল ফারাজের অভ্যন্তর পর্যন্ত দাফন করে। কিন্তু খাওয়ারিযমীদের অবরোধের কারণে তাদের পক্ষে এর চেয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়নি। আর গোরস্থানে তাকে দাফন করার জন্য মাত্র দশজন ছিল। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি দ্বারা তাকে সিক্ত করুন। তার শায়খ কাজী শামসুদ্দীন ইবন্ খাল্লিকান তার প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক সাবৃত বলেন, শায়খ তাকীয়ূদ্দীন

আমাকে তার রচিত এই কবিতা পঙ্‌ক্তি দুটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছেঃ-"চারটি 'ওয়াত' এর ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা, তারা হল মৃত্যুদূত। আর এরা হলো-ওসিয়ত, ওয়াদীআত, ওয়াকালাত এবং ওয়াক্‌ফের ওয়াত্ত।[১] ইবন্ খাল্লিকান তার থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমার কাছে এই বাক্যগুলি ইলহাম করা হয়েছে।

যতক্ষণ সম্ভব অভাবে ধৈর্য ধারণ করে যাচ্‌নাকে প্রতিহত করবে কেননা, প্রতিদিনের নতুন রিযিক রয়েছে। পীড়াপীড়ি করে চাওয়া সৌন্দর্যহানি ঘটায়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আর্তের অতি নিকটে। কখনও বা অভাব অনটন আল্লাহ্‌র কার্যপদ্ধতির অংশ হয়ে থাকে, আর পাণ্ডিত্য হয়ে থাকে কয়েক স্তরে, সুতরাং পরিপক্ক হওয়ার আগে কোনো ফল সংগ্রহে তড়িঘড়ি কর না, কেননা তুমি যথাসময়ে তা লাভ করবে। নিজের প্রয়োজন পূরণে তাড়াহুড়া কর না, তাহলে অস্বস্তি বোধ করবে এবং তোমাকে হতাশা গ্রাস করবে।

ঐতিহাসিক হাফিয ইবন্ নাজ্জার

ইনি হলেন- বিশিষ্ট হাফিয মুহাম্মাদ ইবন্ মাহমূদ ইবন্ হাসান ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ মুহাসিন ইবন্ নাজ্জার আবূ আবদুল্লাহ বাগদাদী। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমে বহু ভূখণ্ডে সফর করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৭৩ হিজরীতে। তিনি যখন ইতিহাস সংকলন শুরু করেন, তখন তার বয়স পনেরো বছর। তিনি বহু শায়খের কাছে ইলম অর্জন করেন, এমন কি যাদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন তাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, যার মধ্যে চারশজন হলেন স্ত্রীলোক। ইলম হাসিলের জন্য তিনি আটাশ বছর প্রবাস যাপন করেন। এরপর তিনি যখন বাগদাদে আগমন করেন, তখন তার সংকলিত একাধিক গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ القَمَرُ المُنِيرُ فِي المُسْنَدِ الكَبِيرِ এ গ্রন্থে তিনি প্রত্যেক সাহাবা বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন। এছাড়া রয়েছেঃ

المختلف والمؤتلف، كَنْزُ احأيام فِي معرف السنن والأحكام

كتاب احألقاب، المتفق والمفترق، السابق واللاحق

الكافي في أسماء الرجال، نَهْجُ احإصابة في معرفه الصحابة

–এছাড়াও আরও অন্যান্য গ্রন্থ, যার অধিকাংশই সম্পূর্ণ হয়নি, আর বাগদাদের ইতিহাস বিষয়ে ষোল খণ্ডের كتاب القيل তারই রচিত। তদ্রূপ غُرَرُ الفوائد، أخبا ومَكَّةَ والمدينة وبيت ال المقدس এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থ, যার কথা ইবন্ সায়ী তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন সেগুলিও তারই সংকলিত।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ইবন্ নাজ্জার যখন বাগদাদে ফিরে আসেন, তখন তাতে মাদ্রাসার অবস্থানের প্রস্তাব দেয়া হয়। তখন তিনি তাতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, আমার কাছে যা আছে তাতেই আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর তিনি একটি বাদী খরিদ করে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দেন এবং বেশ কিছুকাল নিজের গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। অতঃপর যখন মাদ্রাসা মুস্‌তান সিরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অন্যান্য

(১) অর্থাৎ ওয়াও বর্ণ দ্বারা সূচিত এই চারটি বিষয়ে শরীয়তে গুরুতর বিধান সম্পন্ন।

মুহাদ্দিসদের সঙ্গে তিনিও সেখানে হাদীসের দরস প্রদান শুরু করেন। এরপর তিনি দুমাস অসুস্থ থাকেন, তখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে ইবন্ সায়ীকে ওসীয়ত করেন। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবছর শা'বান মাসের পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার। এসময় তার বয়স ছিল পচাঁত্তর বছর তার জানাযা পড়া হয় মাদ্রাসা নিযামিয়্যাতে এবং তার জানাযায় বহু মানুষ শরীক হয়। তার জানাযার সময় ঘোষণা করা হয়: ইনি হলেন হাদীসে রাসূলের হাফিয, যিনি তার মধ্যে মিথ্যা দূরীভূত করতেন। তার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না, আর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছিল বিশ দীনার এবং তার পড়ণের কাপড়। এ সবই দান করার জন্য তিনি ওসিয়ত করেন। এছাড়া তিনি মাদ্রাসা নিযামিয়্যাতে বিপুল পরিমান কিতাব ওয়াক্ফকরে যান, যার অর্থমূল্য ছিল এক হাজার দীনার। খলীফা মুসতাসিম তা অনুমোদন করেন। তার মৃত্যুর পর অনেকেই অনেক শোকগাঁথা রচনা করেন। ইবন্ সায়ী তার জীবনীর শেষাংশে তা উল্লেখ করেছেন।

হাফিয যিয়া মাকদিসী

ইনি হলেন ইবন্ হাফিয মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওয়াহিদ। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক হাদীস সংকলন করেন। এছাড়া তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংকলণ করেন। তন্মধ্যে একটি হলো: كِتَابُ الْأَحْكَامِ 'কিতাবুল আহ্কাম'। তবে সেটা সম্পূর্ণ করেননি এবং 'কিতাবুল মুখ্তারা'-এ গ্রন্থে হাদীস বিষয়ে মূল্যবান তথ্যাদি বিদ্যমান আছে। সম্পূর্ণ হলে এটি মুসতাদরাক হারেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতো। এছাড়া তার রয়েছে 'ফাযায়েলে আমাল' নামক গ্রন্থ এবং আরও বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, যা হাদীসের সনদ ও মতন বা বর্ণনাসূত্র ও ভাষ্য সম্পর্কে তার স্মরণশক্তি, অবগতি ও ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। আর ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরের আবিদ যাহিদও মুত্তাকী। তিনি মাদ্রাসা যিয়াইয়্যার কুতুবখানার জন্য বিপুল সংখ্যক কিতাব ওয়াক্ফ করেন। এই কিতাব গুলি তিনি ওয়াকফ করেন তার সতীর্থ ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের জন্য। এরপর থেকে সেখানে আরও অনেক কিছু ওয়াকফ করা হয়।

শায়খ আলামুদ্দীন আবুল হাসান সাখাবী

ইনি হলেন আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুস সমাদ ইবন্ 'আব্দুল আহাদ ইবন্ 'আব্দুল গালিব আলহাস্যানী আলমিশরী অতপর দামিস্কে, তিনি দামিস্কের শীর্ষ ক্বারী ও হাফিয ছিলেন। তার কাছে হাজার হাজার শিষ্য কুরআন খতম করে। আর তিনি ইমাম শার্বেবীর কাছে ক্বিরাআত শিক্ষা করেন এবং তার কাসীদা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া তার সংকলিত মুফাস্সালের একটি শরাহও বিদ্যমান, এছাড়া তার রয়েছে একাধিক তাফসীর, বহু সংকলন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় বহু স্তুতি কাব্য। জামে দামিস্কে তার স্বতন্ত্র দারসের হালকা ছিল। এছাড়া তিনি শীর্ষ কারীর পদ গ্রহণ করেন উম্মে সালিহতে[১]। তিনি সেখানেই বসবাস করতেন। এ বছর জুমাদাল আখিরাহ মাসের বার তারিখ শনিবার তিনি তার নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন :

---

(১) স্থান বিশেষের নাম।

'তারা বলল: আগামীকাল আমরা হিমা-নিবাসে আসব, আর যাত্রীদল তাদের অবস্থানস্থলে যাত্রাবিরতি করবে।

তাদের অনুগত ছিল যারা, তারা তাদের সাক্ষাতে আনন্দিত হল। আমি বললাম, আমার তো অপরাধ আছে, সুতরাং আসার কী উপায়? কোন মুখে আমি তাদের মুখোমুখি হব?

তারা বলল, ক্ষমা করা তো তাদের শান। বিশেষত তাদের প্রত্যাশীকে।

রাবীআ' খাতুন বিনত আয়্যূব

ইনি হলেন সুলতান সালাহূদ্দীনের ভগ্নি। প্রথমে তার ভাই তাকে আমীর সা'দুদ্দীন মাসউদ ইবন্ মুয়ীনুদ্দীনের সাথে বিবাহ দেন এবং তিনি নিজে সা'দুদ্দীনের বোন ইস্মাতুদ্দীন খাতূনকে বিবাহ করেন, যিনি ছিলেন সূলতান নূরুদ্দীনের স্ত্রী। যিনি মাদ্রাসা খাতুনিয়্যা জুআনিয়্যা এবং খানকাহ্ বুররানিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকফকারিনী।

অতঃপর যখন আমীর সা'দুদ্দীন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি (আলাহুদ্দীন) তাকে আরবীল শাসক সুলতান মুযাফফরুদ্দীনের সাথে বিবাহদেন। এরপর তার দ্বিতীয় স্বামীর সাহচর্যে চল্লিশ বছর অবস্থান করেন। অবশেষে সুলতান মুযাফফরের ইন্তিকালের পর তিনি দামিস্কে আগমন করেন এবং সেখানে দারুল আকীকীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অবশেষে এ বছর তার মৃত্যুঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশির বেশী। তাকে কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তার সাহচর্যে ছিলেন নেককার আলিসা আসাতুল্লতীফ বিন্ত নাসিহ হাম্বলী ইনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারিণী সুলেখিকা। তার বেশ কয়েকটি মূল্যবান সংকলন বিদ্যমান। তিনিই তাকে (রাবীয়া খাতুনকে) হাম্বলীদের জন্য কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত মাদ্রাসা ওয়াকফ্ করার কল্যাণ নির্দেশনা দেন। এছাড়াও আসাতুল্ লতীফ হাম্বলীদের জন্য আরেকটি মাদ্রাসা ওয়াকফ করেন, যা রিবাতে নাসেবীর পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। অতঃপর যখন রাবীয়া খাতুন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আসাতুল্ লতীফের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং বেশ কিছুদিন তাকে আটক রাখা হয়। অতঃপর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। তখন হিমসের শাসক সুলতান আশরাফ তাকে বিবাহ করেন এবং তিনি তার সাথে রাহবা এবং তাল্রাশেদে সফর করেন। অতঃপর ৬৫৩ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দামিস্কে তার মালিকানাধীন অনেক ধন-সম্পদ ও মূল্যবান রত্নাদি পাওয়া যায়, যার অর্থমূল্য ছিল ছয় লক্ষ দিরহাম। আর এটা ছিল তার মালিকানাধীন ভূসম্পত্তি ও ওয়াকফকৃত সহায়সম্পত্তির উদ্বৃত্ত, আল্লাহ্ তাকে রহমন করুন।

মুয়ীনুদ্দীন হাসান ইবন্ শায়খুশ্ শুয়ূখ

ইনি ছিলেন সালিহ নাজ্মুদ্দীন আয়্যুবের ওযীর। তিনি তাকে দামিস্কে প্রেরণ করেন। তখন মুয়ীনুদ্দীন খাওয়ারিয্মীদের সাথে প্রথমবার দামিস্ক অবরোধ করেন, এমনকি তাকে সুলতান সালিহ ইসমাঈলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন এবং সেখানে সুলতান সালিহ আয়্যুবের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রূপে অবস্থান করেন। এরপর খাওয়ারিয্মীরা সুলতান সালিহ ইসমাঈলের সাথে হাত মিলিয়ে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তাকে দামিস্কে অবরুদ্ধ করে। আর এবছর রমজান মাসের শেষ দশকে ৫৬০ বছর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে। দামিস্কে তার শাসন কর্তৃত্বের

স্থায়িত্ব ছিল সারে চার মাস। জামে দামিস্কে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং তার ভাই ঈমাদুদ্দীনের পাশে তাকে কাসীয়ূনে সমাহিত করা হয়। এছাড়া এবছরই হানাফীদের ওয়াক্‌ফকৃত মাদ্রাসা কালীজিয়ার ওয়াক্‌ফকারি ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন আমীর ছিলেন।

সায়ফুদ্দীন ইবন্ কালাম

তাকে তার উল্লিখিত মাদ্রাসার কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। আর এবছর আরও ইন্তিকাল করেন। শারাফুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ ইবন্ শায়খ আবূ আসর, এবং আহমাদ ইবন্ 'ঈসা ইবন্ ইমাম মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবন্ কুদাসা। এছাড়া এ বছর কালাসার ইমাম শায়খ তাজুদ্দীন আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবন্ আবূ জা'ফর ইন্তিকাল করেন, যিনি ছিলেন তার সময়ের বড় আলিম ও বুযুর্গ শায়খুল হাদীস। আল্লাহ্‌তাকে রহম করুন। এ সময় আরও ইন্তিকাল করেন বিশিষ্ট দুই মুহাদ্দিস ও হাফিযে হাদীস শায়খ শারাফুদ্দীন আহমাদ ইবন্ জাওহাবী এবং তাজুদ্দীন আব্দুল জলীল আবহারী।

৬৪৪ হিজরীর শুরু

এ বছরই খলীফা মানসূর হিমস-হ্রদের নিকট খাওয়াবিয্‌সীদের পর্যুদস্ত করেন এবং দামিস্ক, বা'লাবাক এবং বুসরা শহরের উপর সুলতান সালিহ আয়্যুবের প্রশাসকদের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়। এরপর এবছর জুমাদাল আখিরা মাসে ফাখ্‌রুদ্দীন ইবন্ শায়খ সালত্ শহরে খাওয়ারিয্‌মীদের পুণরায় পর্যুদস্ত করেন, যা তাদের অবশিষ্টদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অতঃপর সুলতান নাসির কারক অবরোধ করেন এবং তারপর দামিস্কে ফিরে আসেন। আর সুলতান সালিহ আয়্যুব এবছর জিলক্বদ মালে দামিস্কে আগমন করেন এবং তার অধিকারীদের সাথে সদাচার করেন এবং উল্লিখিত শহরগুলোর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইয্‌যুদ্দীন আইবেক এর হাত থেকে সারখাদ এর কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এর বিনিময়ে অন্যকোন শহর প্রদান করেন এবং নাসির দাউদ ইবন্ মুআয্‌যন থেকে সাল্‌ত শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আর সাবিয়্যা দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন সায়ীদ ইবন্ 'আযীয ইবন্ 'আদিল থেকে। এ সময় তার মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বিরাট আকার ধারণ করে। ফিরতি পথে তিনি বায়তুল মাকদাস যিয়ারত করেন এবং তার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর তার প্রাচীরসমূহ পুণনির্মাণের নির্দেশ দেন, যেমনটি ছিল নাসেরিয়ীয় শাসনামলে। এ সময় তিনি উক্ত ভূখণ্ডের খারাজ বা কর এবং বায়তুল মাকদাসের ভূমিকা ইত্যাদি থেকে যা আয় হতো, তা এ কাজে ব্যয় করার জন্য নির্দেশ দেন, আর এতে ব্যয় সংকুলান না হলে অবশিষ্ট অর্থের যোগান তিনি নিজের পক্ষ থেকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ বছরই খ্রিষ্টান ধর্মগুরু পোপের পক্ষ থেকে দূতগণ আগমন করেন। তারা এই সংবাদ বহন করে আনেন যে, তিনি (পাপ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিথিলতার কারণে খ্রিষ্টান সম্রাট আবদূরের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করেছেন। এরপর পোপ তাকে হত্যার জন্য তার পক্ষ থেকে একদল লোক পাঠান। এদিকে সম্রাট আবদূর একথা জানতে পেরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এরা (ঘাতকদল) যখন সেখানে পৌছে, তখন তিনি তার এক ক্রীতদাসকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখেন, তখন তারা তাকে সম্রাট মনে করে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। এরপর সম্রাট আবদূর এদের সকলকে বন্দি করে জবাই করে তাদের চামড়া ছিলে তাতে তৃণখড় ভরে তার প্রাসাদের প্রবেশ পথে

শূলবিদ্ধ করে রাখেন। এদিকে এ সংবাদ যখন পোপের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন, এভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাদের নিজেদের মাঝে বিভক্তি বিরোধ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া এ বছরই রবিউল আখির মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার মক্কায় প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়, যা কাবা ঘরের গিলাফ উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর তা অনেক পুরাতন হয়ে পড়েছিল। কেননা, তা পূর্ববর্তী চল্লিশ বছরে আর পরিবর্তন করা হয়নি। কারণ এই বছরগুলিতে কোন খলীফা হজ্ব করেননি। আর এই ঝড় যখন থামে, তখন কাবা গৃহে আচ্ছাদনহীন, তার কৃষ্ণতার প্রতীক অদৃশ্য। বস্তুত এটা ছিল 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনের আলামত এবং এরপর তাতারীদের পক্ষ থেকে যে ধ্বংসলীলা ঘটবে, তার সতর্ক সংকেত। এ সময় ইয়ামানের শাসক উমর ইবন্ সাত্তল হারামে মক্কীর শায়খ আফীফ ইবন্ সানাআর কাছে কাবাগৃহে গিলাফ পড়ানোর অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন তিনি বলেন, এটা তে শুধু খলীফার অর্থেই হতে পারে। অথচ সে সময় খলীফার কাছে কোনো- গচ্ছিত অর্থ ছিল না, ফলে তখন তিনি তিনশ দীনার কর্জ নিয়ে গিলাফের কাপড় খরীদ করেন এবং তাকে কালো রঙে রঞ্জিত করান এবং তার সাথে পূর্ববর্তী গিলাফের প্রাচীন কারুকার্য সংযুক্ত করে দেয়া হয় এবং এই গিলাফ দ্বারা কা'বা গৃহ আবৃত করা হয়। আর এসময় একুশদিন কাবা গৃহে অনাবৃত ছিল। এছাড়া ঐ কুতুবখানার উদ্বোধন করা হয়, যাকে ওযীর মুআয়্যাদ্দুদীন মুহাম্মাদ ইবন্ আম্মোদ আল্‌কামী দারুল ওয়ারাতে প্রতিষ্ঠা করেন। এই কুতুবখানার সৌন্দর্য ছিল অনুপম। তাতে বহু মূল্যবান ও উপকারী গ্রন্থ ছিল, এমনকি কবিগণ পর্যন্ত কবিতায় তার প্রশংসা করেছেন। আর এ বছর জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহ তার দুই পুত্র আবুল 'আব্বাস আহমাদ এবং আবুল ফাযাইল আব্দুর রহমানের খাৎনা করান। এ উপলক্ষে এমন ভোজ ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়, যার মত আনন্দ-উৎসবের কথা বহুকাল শোনা যায়নি। আর এটাই ছিল বাগদাদ ও বাগদাদবাসীদের তৎকালীন সর্বশেষ আনন্দোৎসব। এছাড়া এ বছরই কারাকের শাসক নাসের দাউদ, আমীর ঈমাদুদ্দীন দাউদ ইবন্ মাত্তসিক ইবন্ হাসকূর-এর বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করেন। আর ইনি ছিলেন সজ্জন বদান্য আমীর। নাসির দাউদ তাকে তার কাছে কারকে বন্দি করে রাখেন এবং তার সকল ধন-সম্পত্তি দখল করে নেন। তখন ফাখ্‌রুদ্দীন ইবন্ শায়খ তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে নাসির তাকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু তিনি আহত অবস্থায় ক্ষত নিয়ে বের হন এবং তার অস্ত্রপ্রচার করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে জাফরের এবং হূতার শহীদদের কবরের নিকট দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

এ বছর খাওয়ারিয্‌মের বাদশা কবলা বারাকাত খান মৃত্যুবরণ করেন, যখন তার অনুসারীরা হিমস-হ্রদের নিকট পর্যুদস্ত হয়, যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর এ বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

বাদশা মানসূর

ইনি হলেন- হিমসের শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ মুজাহিদ আসদুদ্দীন শেরকোহ। আর তিনি হিমসের কর্তৃত্বে লাভ করেন সুলতান সালিহ আয়্যুবের যতে বা'লাবাক শহরের কর্তৃত্ব অর্পণ করে হিমসে স্থানান্তরিত হওয়ার পর। প্রথমে তিনি সামা-উদ্যানে অবতরণ করেন। এরপর

অসুস্থ হলে তাকে নায়রবে অবস্থিত সুলতান আশরাফের উদ্যান দাহশাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর এ বছরই মৃত্যুবরণ করেন। সাইন মুহাম্মাদ ইবন্ হাসসান ইবন্ রার্ফে আলসামিরী। তিনি বহু মুসনাদ হাদীস শ্রবণ করেন। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন 'কসরে হাজ্জাজে'। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। এ বছর আরও ইন্তিকাল করেন।

ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন্ মাহমূদ ইবন্ 'আব্দুল মুন্‌ইম

ইনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং বহুগুণ ও শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী। ঐতিহাসিক আবূ শামা তার প্রশংসা করে বলেন, অনেক আগে থেকে আমি তার সাহচর্য লাভ করেছি। তার মৃত্যুরপর হাম্বলীদের মাপে দামিস্কে তার স্তরের কেউ ছিলেন না। তার জানাযা পড়া হয় জামে দামিস্কে, আর তাকে দাফন করা হয় কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

যিয়া 'আব্দুর রহমান আলগিমারী

ইনি ছিলেন মালেকী মায়হাবপন্থী, শায়খ আবূ আসর ইবন্ হাবিব যখন ৬৩৮ হিজরীতে দামিস্কে থেকে চলে যান, তখন তিনি তার দায়িত্বসমূহ পালন করেন। এসময় তিনি তার দারসের হালকায় বসেন এবং জামে দামিস্কের মালেকী কোণে বা প্রান্তে দারস প্রদান করেন। আর এ বছর হালবে ফকীহ তাজুদ্দীন ইসমাঈল ইবন্ জামীল ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন গুণী-ধর্মভীরু এবং উদার চিত্তের মানুষ। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

৬৪৫ হিজরীর সূচনা

এ বছরই সুলতান নাজমুদ্দীন আয়্যুব ইবন্ কামিল শাম থেকে মিশরীয় ভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের বলে তিনি বায়তুল মাকদাস যিয়ারত করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য বণ্টন করেন। এ সময় তিনি বায়তুল মাকদাসের দেয়াল বা প্রাচীরসমূহে পুনঃনির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন, যেমনটি ছিল তার পিতার পিতৃব্য কুদুসবিজেতা সুলতান নাসিরের আমলে। এদিকে মুসলিমবাহিনী খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে। অতঃপর তারা সফর মাসের দশ তারিখে তাবারিয়্যা জয় করে এবং জুমাদাল আখিরাহ মাসের শেষ দিকে আস্‌কালান জয় করে। বারো রজব মাসে খতীব ইমাদুদ্দীন দাউদ ইবন্ খতীবকে জামে উমাবীর খতীবের পদ থেকে এবং মাদ্রাসা দাযালিয়্যার শিক্ষকের পদ থেকেও অপসারণ করা হয়। আর তার দায়িত্ব প্রদান করা হয় ইমাদুদ্দীন ইবন্ 'আব্দুল কারীম ইবন্ হারাসতানী কে, যিনি ছিলেন ইবন্ সালাহ-এর পর দারুল হাদীসের শায়খ। এছাড়া এ বছর সুলতান সালিহ আয়্যুব বিশিষ্ট দামিশকবাসীদের তলব করে পাঠান যাদের বিরুদ্ধে সুলতান সালিহ ইসমাঈলের সাথে সহযোগিতার অভিযোগ ছিল। এদের অন্যতম ছিলেন কাজী মুহীয়ূদ্দীন ইবন্ যাকী, বানূ সারগারী, কাতিব ইবন্ ঈসাদ, সালিহ ইসমাঈলের গোলাম হালীমী এবং বসরার প্রশাসক শিহাব গাজী। কিন্তু এরা যখন মিশরে পৌছেন, তখন তাদেরকে কোনো শাস্তি বা অপদস্থতার মুখোমুখি হতে হয়নি। বরং সুলতান সালিহ আয়্যুব তাদের কয়েকজনকে রাজ পরিধেয় প্রদান করেন এবং সকলকে স্ব-সম্মানে মুক্ত করে দেন। এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম ছিলেন:

হুসায়ন ইবন্ হুসায়ন ইবন্ আলী

ইনি হলেন ইবন্ হামযা আল্ আলভী আল্ হুসায়নী, আবূ 'আব্দুল্লাহ আফ্সাসী কুতুবুদ্দীন, তার আদি নিবাস ছিল ফূফা। তিনি বাগদাদে অবস্থান গ্রহণ করেন। এসময় তিনি সরকারী নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন, এরপর তাকে কুফায় বন্দি করা হয়। তিনি ছিলেন সুকবি, সাহিত্যিক এবং গুণী ব্যক্তি ইবন্ সায়ী তার অনেকগুলি কবিতা পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

শালূবীন নাহ্বী

ইনি হলেন উমর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আব্দুল্লাহ সায়দী, আবূ আলী আন্দালুসী, যার পরিচিতি শালূবীন নাপে, আর আন্দালুসীয় ভাষার এর অর্থ হলো–লাল ফর্সা। ইবন্ খাল্লিকান বলেন, তিনি হলেন নাহু শাস্ত্রের সর্বশেষ ইমাম বা শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। তিনি তার কবিতা এবং অনেকগুলি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, كِتَابُ شَرْحُ الْجُزُوْلِيَّةِ এবং التَّوْطِيَّةُ। ইবন্ খালদূন এ বছরে তার ওফাতের কথা উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশির অধিক। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন।

শায়খ আলী হারীরী

তার আদি নিবাস যারাহ এর পূর্বে অবস্থিত 'বাসর' গ্রামে। তিনি বেশকিছু কাল দামিস্কে অবস্থান করে রেশম প্রস্তুতের পেশায় নিয়োজিত থাকেন। এরপর তা ছেড়ে শায়খ 'আলী মুগারবিলের অন্য কাজের প্রশিক্ষেণ গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য একটি খান্কা নির্মাণ করে নেন। এ সময় তার থেকে এমন কিছু কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়, যা একাধিক ফকীহ আপত্তিকর বলে মন্তব্য করেন। এদের অন্যতম হলেন শায়খ ইয্যুদ্দীন 'আব্দুস সালাম, শায়খ তাকীয়ূদ্দীন ইবন্ সালাহ এবং মালেকী মাযহাবের শায়খ আবু 'আমর ইবন্ হাজিব ও অন্যান্যগণ। অতঃপর যখন আশরাফিয়্যা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সুলতান সালিহ ইসমাঈল তাকে মুক্ত করে দেন এবং তার উপর শর্তারোপ করেন যেন সে দামিস্কে অবস্থান না করে। তখন তিনি তার নিজ শহরে 'বাসারে' দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং এ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা তার 'যায়ল' গ্রন্থে বলেন: আর রমজান মাসে শায়খ 'আলী যিনি হারীরী নামে সুপরিচিত ছিলেন, তিনি ইন্তিকাল করেন। আর এ সময় তিনি নিজ গ্রাম 'বাসারে' তার খানকায় অবস্থানরত ছিলেন। এছাড়া তিনি দামিস্কে প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন। তার অনুসারী ছিল একদল দরিদ্র মানুষ এবং তাদের পরিচিতি ছিল শরীয়ত পরিপন্থী হারীরীর শিষ্যদান। তাদের অভ্যন্তর ছিল তাদের বাইরের চেয়ে কদর্য। তবে যারা তওবা করেছে, তাদের কথা ভিন্ন আর শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি বিদ্রুপ এবং ফাসেক ও নাফরনামদের নিদর্শন প্রকাশ করে শরীয়তে অবহেলা ও শিথিলতার অনেক বিষয় ছিল এই হারীরীর কাছে। তার কারণে দামিস্কের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যুবক সন্তান বখাটে হয়ে যায় এবং তারা হারীরীর শিষ্যদের বেশ ধারণ করে। আর তারা যে সকল বিশেষ কারণে তার অনুসরণ করে। তার অন্যতম হলো, সে ছিল বেহায়া ও নির্লজ্জ। আর তার জল সাগরে সার্বক্ষণিক নাচ-গান ও বিনোদনের সাথে ছিল উঠতি বয়সের সু-দর্শন বালক ও কিশোরগণ। সে কোনো অন্যায় কাজে

বাধা প্রদান করতো না এবং নামায তরক করতো। এভাবে সে বহু মানুষকে গুমরাহ করে এবং বিপুলসংখ্যক অনুসারীকে নষ্ট করে। আলিমদের অনেকেই একাধিকবার তার হত্যা বৈধ বলে ফাতওয়া দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে তার থেকে স্বস্তি দেন। এটা হুবহু আবূ শাসার বর্ণনা।

আমীর ইয্যুদ্দীন আইবেক

দারুল মুআযযনের উসতাদ। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট জ্ঞানী, দানবীর এবং মর্যাদার অধিকারী। সুলতান মুআয্যম তাকে সারখাদের নাইব বা প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ সময় তার থেকে যথেষ্ট উদ্যম, যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়। তিনি জুওয়ানিয়্যা এবং বুররানিয়্যা নামক দুটি শস্যখামার বা জায়গীর ওয়াকফ করেন। আর সুলতান সালিহ আয়্যূব যখন তার থেকে সারখাদের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন, তখন তিনি তাকে তার বিনিময়ে তাকে অন্য একটি ভূখণ্ডের শাসনককৃর্ত্ব দান করেন এবং এসময় দামিস্কে অবস্থান করেন। এসময় তার বিরুদ্ধে কুটনামী করা হয় যে, তিনি সালিহ আয়্যূবের সাথে পত্র বিনিময় করেন। তখন তাকে অবরুদ্ধ করা হয় এবং তার ধন-সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বলেন, আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে-এরপর আর কোন কথা বলার পূর্বেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাকে মিশরের বাবুন নাসরে সমাহিত করা হয়। অতঃপর তার লাশ অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। ঐতিহাসিক সাবত্ এটাকে ৬৪৭ হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ্ ভাল জানেন।

শিহাব গাজী ইবন্ আদিল

ইনি হলেন মায়্যা ফারাকীন, খালাত ও অন্যান্য শহরের প্রশাসক, ইনি ছিলেন বানূ আয়্যূবের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তার রচিত দুটি কবিতা পঙ্ক্তি হলো: "কালের ক্রিময় হলো তুমি দুনিয়ার মাটিতে বসে আছ, অথচ তুমি চলমান। তোমার এই গতি হলো ঐ নৌযানের গতি, যাতে আরোহীরা বসে আছে, আর তার পালগুলি বাতাসের বেগে ধাবমান।"

৬৪৬ হিজরীর শুরু

এ বছরই সুলতান সালিহ নাজমুদ্দীন মিশরীয় ভূখণ্ড থেকে দামিস্কে আগমন করেন এবং প্রস্তরনিক্ষেপক যন্ত্র মিন্জানীকসহ হিম্সে ফৌজ প্রেরণ করেন। কেননা, এ সময় হিমসের শাসক সুলতান আশরাফ ইবন্ মূসা ইবন্ মানসূর ইবন্ আসদুদ্দীন হালবের শাসক নাগের য়ূসুফ ইবন্ আযীজের অনুকূলে তার কর্তৃত্ব অর্পণ করে তার বিনিময়ে তাল্বাশির-এর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে হাল্বীগণ যখন দামিস্কবাসীদের আক্রমণের কথা জানতে পারে তখন তারাও তাদের থেকে হিমস শহর রক্ষার জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। এ সময় বাগদাদস্থ মাদ্রাসা নিযামিয়্যার শিক্ষক শায়খ নায্মুদ্দীন বাদ্যাই উদ্যোগী হয়ে উভয় বাহিনীর মাঝে সন্ধি স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং উভয় দলকে নিজ নিজ শহরে ফিরিয়ে দেন। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। এছাড়া এবছর এক সুদর্শন তুর্কী কিশোরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। তার অপরাধ ছিল, সে তার মনিবকে তার সাথে কুকর্মে বাধা দিয়েছিল। তাকে শূলবিদ্ধ করে

নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অকালে এই ছোট্ট বালকের করুণ মৃত্যুতে সকলেই আফসোস করে। এমনকি তারা তার শোকে শোকগাথাও রচনা করে। শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা তার 'যায়ল' গ্রন্থে একটি সুদীর্ঘ শোকগাঁথা রচনা করেছেন। এছাড়া এবছর দামিস্কের একটি প্রাচীন পুল ধ্বসে পড়ার কারণে বহু বাড়িঘর ও দোকান-পাট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় দিনের বেলা, আর এবছর রজব মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার রাতে জামে দামিস্কের পূর্ব দিকের মিনারায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। এ সময় সেখানে রক্ষিত অনেক আমানতের সামগ্রী ভস্মীভূত হয়। তবে আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে মসজিদের কোন ক্ষতি হয়নি।

এর কিছুদিন পর সুলতান যখন দামিস্কে আগমন করেন, তখন তিনি তা পুনঃনির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ৭৪০ হিজরীতে তা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে ধ্বসে পড়ে এবং তারপর একে পূর্বের চেয়ে আরও সুন্দরভাবে পুনঃনির্মাণ করা হয়। জামে দামিস্কের এই পূর্বপ্রান্তীয় শুভ্র মিনার তখন কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের স্মরকরূপে নির্মিত হয়। আর এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ অচিরেই আসছে-ইনাশাআল্লাহ্। অতঃপর সুলতান সালিহ আয়্যূব গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মিশরীয় ভূখণ্ডে ফিরে আসেন। তার এই অবস্থায় তাকে তার ভাই আদিল আবূ বকর ইবন্ কামিল, যিনি তার পিতার মৃত্যুরপর নিশরীর ভূখণ্ডের শাসনকর্তা হন, তাকে হত্যা করার নির্দেশ দান থেকে বিরত রাখে। আর মিশর দখলের সময় তিনি তাকে বন্দি করেন। অতঃপর এ বছর শাওয়াল মাসে তিনি তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। তবে ভাইকে হত্যার পর তিনিও পরবর্তী বছর শা'বান মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাও অতি শোচনীয় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়। পবিত্র ঐ সত্তা কর্তৃত্ব যার অধীন! এছাড়া এবছর ইন্তিকাল করেন মিশরীয় অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি ফায্লুদ্দীন খোনজী। ইনি হলেন বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ যুক্তি বিশারদ, তবে তা সত্ত্বেও তিনি তার বিচার ও রায়ে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন, একাধিক ব্যক্তি তার প্রশংসা করেছেন।

'আলী ইবন্ য়াহ্ইয়া জামালুদ্দীন আবুল হাসান

ইনি ছিলেন দক্ষ কবি, সাহিত্যিক এবং বহুগুণের অধিকারী যুবক। আত্মশুদ্ধি, আকল-বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তির নিন্দা বিষয়ে তিনি একটি সুসংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ গ্রন্থ সংকলন করেন এবং তাকে نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ বা "চিন্তাভাবনার ফসল" নাম প্রদান করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন মূল্যবান বাণী সংকলিত করেছেন। যেমন– সুলতান হলেন অনুসৃত নেতা এবং অনুমোদিত চরিত্র সে যদি অন্যায় করে, তাহলে তার অন্যায়ের কারণে অবিচার করে আর সে যদি ন্যায় বিচার করে, তাহলে তার অধীনস্থ কেউ অবিচার করে না। আর আল্লাহ্ যাকে তার যমীনে কর্তৃত্ব দান করেন– এবং তার সৃষ্টি বা মাখলূকও বান্দাদের কর্তৃত্ব অর্পণের ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করেন এবং যার শক্তি ও কর্তৃত্বকে বিস্তৃত করেন, তিনি তার মান-মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। সুতরাং তার কর্তব্য হলো আমানত আদায় করা, ধার্মিকতাকে খাঁটি করা, নিজের গোপন অবস্থাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করা, জীবন চরিত্রকে পরিমার্জিত করা, ন্যায়পরায়ণতাকে অভ্যাসে পরিণত করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সাওয়াবকে উৎকৃষ্ট লক্ষ্য বানানো। কেননা, যুলুম ও অত্যাচার পদস্খলন

ঘটায় আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহকে দূরে সরিয়ে দেয়, দারিদ্রকে টেনে আনে এবং জাতিবর্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।"

তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকের বিরোধিতা শাস্তিকে অপরিহার্য করে। কোনো কোনো কৌশল বিরাট দল থেকেও উপকারী। যার ক্রোধ স্থূলকায় তার ব্যক্তিত্ব শীর্ণকায়, প্রতারক অপসারণ যোগ্য। প্রাজ্ঞজনের হৃদয় চোখের পলক থেকে রহস্য উপলব্ধি করে। বন্ধুত্ব স্থাপনকালে তুমি বন্ধু থেকে যতটুকু লাভ করতে, কর্তৃত্বকালে তার দশভাগের একভাগে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। বিনয় হলো মর্যাদা অর্জনের ফাঁদ, অজ্ঞতাহীন সুধারণা কতইনা উত্তম। আর দূরদর্শিতাহীন কুধারণা কতইনা কুৎসিত।

তার এ সকল উক্তির মাঝে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন্ উমরের একখাদিম বা গোলাম অপরাধ করে। তখন ইবন্ 'উপর তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে সে বলল; হে আমার মনিব! আপনার কি এমন কোন পাপ নেই, যার কারণে আপনি আল্লাহ্ থেকে ভয় করেন? তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। তখন সে বলল, ঐ সত্তার দোহাই দিয়ে বলছি, যিনি আপনাকে অবকাশ দিয়েছেন, আমাকেও আপনি অবকাশ দিন, অতঃপর সে দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে তিনি যখন তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন সে পূর্বের ন্যায় বলল। ফলে, তিনি এবারও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এরপর সে যখন তৃতীয়বার অপরাধ করল, তখন তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করলেন। এবার কিন্তু সে আর কোন অজুহাত পেশ করলো না, তখন ইবন্ উমর তাকে বললেন, কী ব্যাপার। এবার কেন প্রথম দুইবারের মত বললেনা? সে তখন বলল, হে আমার মনিব। আমার ক্রমাগত অপরাধ সত্ত্বেও আপনার সহনশীলতা থেকে লজ্জাবোধের কারণে। গোলামের একথা শুনে ইবন্ উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার রব থেকে লজ্জাবোধের আমি অধিক উপযুক্ত। যাও, তুমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ। খলীফার প্রশংসায় তার দুটি কবিতা পঙ্‌ক্তি হলো:

"হে ঐ ব্যক্তি! শেখমালা যখন বারি বর্ষণে কৃপণতা করে, তখন তার হস্তদ্বয় মানবকূলের উপর স্বর্ণ বর্ষণ করে। হাতিমকে কৃপণ আখ্যাদান করি। আপনি তো কিসরাকে জালিম সাব্যস্ত করেছেন, ফলে আশা আকাঙ্ক্ষাসমূহ আপনার প্রতি নতশিরে ধাবিত হয়েছে।" এছাড়া ইবনুস্ সায়ী তার অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ আবূ আমর ইবন্ হাজিব মালেকী

ইনি হলেন উসমান ইবন্ 'উমর ইবন্ আবূ বকর ইবন্ ইউনুস রুওয়ায়নী মিশরী 'আল্লামা আবূ 'আমর মালেকী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় 'আলিম। তার পিতা ছিলেন আমীর ইয্‌যুদ্দীন মাওসিক সালাহীর সহচর। তিনি ইলম চর্চায় তাকে নিয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার কিরাআতে পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং নাহু শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। এছাড়া তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তার যুগের শীর্ষস্থানীয় ফকীহতে পরিণত হন।

শুধু তাই নয়, আরও একাধিক শাস্ত্রে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো-মূলনীতি আরবি ভাষা, শব্দ রূপান্তর, ছন্দবিদ্যা, তাফসীর ইত্যাদি। ৬১৭ হিজরীতে তিনি দামিস্কে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি জামে দামিস্কে মালেকী মাযহাবের

অনুসারীদের দরস প্রদান করতে থাকেন। আর ৬৩৮ হিজরীতে শায়খ ইয্যুদ্দীন আব্দুস সালামের সাথে দামিস্কেতাগের পূর্ব পর্যন্ত তার এই দরস প্রদান অব্যাহত থাকে। এরপর তারা দুজনে মিশরে গমন করেন। অবশেষে এ বছর শায়খ আবূ সামর আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে সমাধিস্থ হন। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ইমাম। তাছাড়া তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিনয়ী, চরিত্রবান, লজ্জাশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং ইলম ও আলিম উলামাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। এছাড়া তিনি কিরাআত ও আরবি ভাষায় বিশেষ পারর্দশী ছিলেন। ইলম ও আমলে তিনি ছিলেন অন্যতম এক স্তম্ভ। প্রচলিত সকল শাস্ত্র ও জ্ঞানে পারদশী এবং ইমাম মালিক (রহ) মাযহাবের কুশলী বিশেষজ্ঞ। ইবন্ খাল্লিকান তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছে যে, একবার ইবন্ হাজিব যখন মিশরে বিচার-বিভাগে নায়েব ছিলেন, তখন তিনি একটি লক্ষ্য আদায়ের জন্য তার কাছে আসেন এবং তাকে শর্তের সালে শর্তযুক্তির মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। যেমন কেউ বলল: যদি তুমি খাও, যদি তুমি পান কর, তাহলে তুমি তালাক প্রাপ্ত। এক্ষেত্রে যদি সে প্রথমে পান করে, তাহলে কেন তালাক পতিত হবে? ইবন্ খাল্লিকান বলেন: তখন তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ও প্রশান্তভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেন।

আল্-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন: ফিকহ বিষয়ে তার মুখ্তাসার বা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ অন্যতম সুন্দর মুখতাসার। সেখানে তিনি ফকীহ ইবন্ শাশের মূল্যবান তথ্যসমূহ সংকলিত করেছেন। আর উসূলে ফিকহ সংক্রান্ত তার সংকলিত মুখ্তাসারে তিনি ফকীহ সায়ফুদ্দীন আমেদীর আল্-আহকাম গ্রন্থের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা অনুগ্রহ বশত আমাকে তা মুখস্থ করার তাওফীক দিয়েছেন এবং সেখানে উল্লিখিত হাদীস প্রসঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, সে সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি খাতা আমি সংগ্রহ করেছি। তিনি মুফাসসাল, আল্-আমালী এবং নাহবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুফাদ্দিমার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলন করেছেন। নাহবের এই মুফাদ্দিমায় তিনি আল্লামা যামাখশারীর মুফাসসালকে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং বিশদরূপে ব্যাখ্যাও করেছেন। এছাড়া, তার সংকলিত আরেকটি গ্রন্থ হল তাসরীফ ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এছাড়া ছন্দ বিষয়েও তার গ্রন্থ রয়েছে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

৬৪৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরই সুলতান সালিহ আয়্যুব ইন্তিকাল করেন এবং তার পুত্র তূরাব শাহ নিহত হন এবং সুলতান মুইয কর্তৃক ইয্যুদ্দীন আইবেক তুর্কমানীকে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। আর এ বছর মুহাররম মাসের চার তারিখ সোমবার সুলতান সালিহ বিশেষ বাহনে দামিস্ক থেকে মিশর দেশে গমন করেন। ঐতিহাসিক ইবন্ সাবত বলেন: এসময় দামিস্কে এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, আমাদের কাছে যাদের কোন হক প্রাপ্য আছে, তারা যেন হাযির হয়। তখন স্থানীয় কেল্লায় বহু মানুষ সমবেত হয়। তখন তিনি তাদেরকে তাদের অর্থসম্পদ ফিরিয়ে দেন। আর এবছর সফর মাসের দশ তারিখে দামিস্কের প্রশাসক আমীর জামালুদ্দীন ইবন্ য়াদাসূর সুলতান সালিহ আয়্যুবের পক্ষ থেকে সেখানে প্রবেশ করেন এবং দামিস্কের এক সুপরিচিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এরপর এ বছর জুমাদাল আখিরাহ মাসে দামিস্ক প্রশাসক বাবুল বাবীদ নামক স্থানে

নবনির্মিত দোকানপাট উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেনঃ ইতিপূর্বে সুলতান আদিল এগুলি উচ্ছেদ করেছিলেন। অতঃপর আবার তা নির্মিত হয়েছিল। এরপর ইবন্ য়াগ্মূর পুণরায় তা উচ্ছেদ করেন। আশা করা যায় এতে তিনিও আবার এগুলির পুনঃনির্মাণ করবেন। আর এ বছরই সুলতান নাসের দাউদ কারক থেকে হালব অভিমুখে অগ্রসর হন। তখন সুলতান সালিহ আয়্যুব দামিস্কে তার নিযুক্ত প্রশাসক জামালুদ্দীন ইবন্ য়াগমূরকে নির্দেশ প্রদান করেন দামিস্কে সুলতান নাসিরের সাথে সম্পৃক্ত দারে উসামা এবং কানূনে অবস্থিত তার বাগান ধ্বংসের জন্য। এই নির্দেশে বাগানের গাছপালা উপড়ে ফেলা এবং প্রাসাদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কথা উল্লিখিত ছিল। আর সুলতান সালিহ আয়্যুব আমজাদ হাসান ইবন্ নাসির থেকে কারকের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এসময় তিনি সুলতান মুআযম পারিবারের সকলকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেন এবং কারকের যাবতীয় ধনসম্পদও সহায় সম্পত্তি দখল করেন। এসবের মধ্যে ছিল নগদ দশ লক্ষ দীনার আর সুলতান সালিহ আমজাদ হাসানকে উৎকৃষ্ট জায়গীর প্রদান করেন। এছাড়া এ বছর বাগদাদে ভয়াবহ বন্য দেখা দেয়, যা বহু প্রসিদ্ধ বাড়িঘর ও মহল্লা প্লাবিত ও বিনষ্ট করে। এমনকি বাগদাদের এ কারণে মাত্র তিনটি মসজিদ ব্যতিত বাগদাদের অধিকাংশ মসজিদে জুমা অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি এসময় একাধিক আব্বাসীয় খলীফার কবর রাস্সাফা থেকে স্থানান্তরিত করা হয়, যাতে সেগুলি বন্যার তোড়ে ভেসে না যায়। এদের মধ্যে ছিলেন-মুক্তাসিদ ইবন্ আমীর আবূ আহ্মাদ নূতাওয়াক্কিল আর তিনি সমাধিস্থ হন ৩৫০ পরবর্তী হিজরী সনে। তদ্রুপ তার পুত্র মুক্তাফী ইবন্ মুকতাদির বিল্লাহ্র কবরও স্থানান্তরিত করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সকলকে রহম করুন। এছাড়া এ বছর খ্রিষ্টানরা দিনরাত শহর আক্রমণ করে। তখন সেখানকার ফৌজ এবং সাধারণ অধিবাসী সকলেই পলায়ন করে এবং খ্রিষ্টান বাহিনী সীমান্ত দখল করে নেয়। এ সময় তারা বহুসংখ্যক সাধারণ মুসলমানকে হত্যা করে। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবছর রবিউল আওয়াল মাসে। তখন সুলতান তার গোটা ফৌজ নিয়ে শত্রু অভিমুখে সেনা ছাউনি স্থাপন করেন এবং যে সকল সৈন্য খ্রিষ্টানদের ভয়ে পলায়ন করেছিল তাদের বেশকয়েকজনকে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় সামান্য ধৈর্য ধারণ না করে তাদেরকে আতঙ্কিত না করার জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। এদিকে ক্রমশ সুলতানের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর এ বছর শা'বান মাসের পনের তারিখে মানসূরাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তাঁর বাদী উম্মে খলীল তার মৃত্যুর কথা গোপন করে এ কথা প্রচার করে যে, তিনি মুমূর্ষু এবং তার সাথে সাক্ষাতের অবস্থায় নেই। এবং সে বিশিষ্ট আমীরদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে। তখন তারা তার পুত্র তূরানশাহের কাছে দূত প্রেরণ করেন, যিনি তখন কায়ফা দূর্গে অবস্থানরত ছিলেন। তারা তাকে দ্রুত তাদের কাছে আগমণ করার আবেদন জানান। আর তারা এ আবেদন জানান ফখরুদ্দীন ইবন্ শায়খ-এর মত বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য আমীরদের ইঙ্গিতে। এরপর যখন তূরানশাহ তাদের কাছে আগমণ করেন, তখন তারা তাকে তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে সকলে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। এরপর পরই তূরানশাহ রদিকীয় ফৌগে শরীক হন এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন। এ সময় তার নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী তিরিশ হাজার খ্রিষ্টানকে হত্যা করে। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আর এ ঘটনা সংঘটিত

হয় বছরের শুরুতে। অতঃপর রাজত্ব লাভের দুমাস পরেই তারা তাকে হত্যা করে। হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাকে প্রথমে আঘাত করে ইয়য়ুদ্দীন আইবেক তুর্কমানী নামক জনৈক আমীর। সে প্রথমে তার হাতে আঘাত করলে তূরানশাহের কয়েকটি আঙুল কাটা পড়ে। তখন সে একটি কাঠের তৈরি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তাকে সেখানে অবরুদ্ধ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। সে তখন খলীফার দূতের আশ্রয় প্রার্থনা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার সে আবেদন গৃহীত না হওয়ায় সে নীল নদের দিকে পলায়ণ করে সেখানে গোপনে থাকে। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসামাত্র তাকে জঘন্যভাবে হত্যা করে তার মরদেহ পদদলিত করা হয় এবং কোনমতে দাফন করা হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তরবারি দিয়ে তার কাঁধে আঘাত করে তা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আর সে সময় সাহায্য প্রার্থনা করে সে কোনো সাহায্য লাভ করতে পারেনি। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল ব্যক্তিবর্গ নিহত হন, তাদের অন্যতম হলেন :

ফখরুদ্দীন য়ূসুফ ইবন্ শায়খ হামাওয়ায়হি

তিনি ছিলেন গুণবান, ধর্মন্নান, ভাব গম্ভীর, সমীহের উদ্রেককারী এবং রাজশাসনের উপযুক্ত ব্যক্তি। আমীর উমারার তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, সুলতান সালিহের পর যদি তিনি তার হাতে বায়আত গ্রহণের আহবান জানাতেন, তাহলে সে ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করত না। কিন্তু আফূব পুত্রদের স্বার্থ সংরক্ষণের কারণে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। এ বছর জ্বিলকদমাসে তূরানশাহের মিশর আগমণের পূর্বে খ্রিষ্টানদের একটি দল তাকে হত্যা করে। তাকে শহীদ করার পর তারা তার সকল অর্থ-সম্পদ এমন কি তার অশ্বসমূহও লুণ্ঠন করে। এ সময় তারা বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে এবং তার প্রতি নানা প্রকার অসম্মানজনক আচরণ করে। ইতোপূর্বে তিনি কি বিরাট শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তার মূল্যবান দুটি কবিতা পঙক্তি হলো : "যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন মনের চাহিদার বিরোধিতা করেছি। তারপর যখন কালের আবর্তন আমাকে বার্ধক্য আক্রান্ত করেছে, তখন আমি বিপরীতভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছি। হায়, যদি আমি বৃদ্ধ হয়ে জন্ম নিতাম, তারপর শৈশবে ফিরে যেতাম।

৬৪৮ হিজরী শুরু

এ বছর মুহাররম মাসের তিন তারীক বুধবার মুআয়ুযম তূরানশাহ দিময়াত সীমান্তে খ্রিষ্টানদের পর্যুদস্ত করেন। এ সময় তিনি তাদের তিরিশ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন। কারও কারও মতে এক লক্ষ। এছাড়া তারা বিপুল পরিমাণ মালে গণীমতও লাভ করেন, আর প্রশংসা আল্লাহ্র অতঃপর তিনি যে সকল আমীর উমারাদের বন্দি করেন, তাদের একদলকে হত্যা করেন। তার হাতে বন্দিদের মধ্যে ছিল আফরানসীসের সম্রাট ও তার ভাই। এ সময় আফরানসীসের সম্রাটের শিরস্ত্রাণ দামিশকে প্রেরণ করা হয়, তখন দামিশকের প্রশাসক কোন এক উৎসবের দিন তা পরিধান করেন। এটা ছিল কাঠবিড়ালী জাতীয় প্রাণির নাম দিয়ে তৈরি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক কবি কবিতা রচনা করেন। আর দরিদ্র মুসলমানরা মারয়াম গির্জায় প্রবেশ করে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় আনন্দ উৎসব পালন

করে। অন্যদিকে দিময়াত দখলের পর বালাবাক শহরের খ্রিষ্টানরা আনন্দ প্রকাশ করে। এরপর যখন তাদের এই বিপর্যয় ঘটে, তখন তারা তাদের মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত করে। তখন শহরের শাসকের নির্দেশে য়াহূদীরা তাদেরকে অপমানিত করে। অতঃপর মুহাররম মাস শেষ হতে না হতেই আমীরগণ তাদের উসতাদ তূরানশাহকে হত্যা করে এবং তাকে নীল নদের পাশে সমাহিত করে। আল্লাহ্‌তালা তাকে রহম করুন।

মুইয ইয়যুদ্দীন অহিবেক তুর্কমানী

সুলতান সালিহ আয়ূব ইবন্ কামিল ইবন্ "আদিল আবূ বকর ইবন্ নাজমুদ্দীন আয়ূবের পুত্রে গিয়াচুদ্দীন তূরান শাহ যখন স্থানীয় আমীর উমারাদের হাতে নিহত হন, তখন ইয়যুদ্দীন তুর্কমানী শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। আর পূর্বে যেমন উল্লিখিত হয়েছে তূরান শাহ তার পিতার মৃত্যুর পর মাত্র দু'মাস শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন। আর যখন তিনি নিহত হওয়ার পর যখন তার শাসন কর্তৃত্বের অবসান ঘটে, তখন তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করতে থাকে যে, কোনো অসুবিধা নেই, কোন অসুবিধা নেই। এ সময় তারা নিজেদের মধ্য থেকে আমীর ইয়যুদ্দীন আইবেক তুর্কমানীকে ডেকে পাঠায় এবং তার হাতে বায়আত করে তাকে "আলমালিক আলমুআয়" উপাধি দিয়ে তার হাতে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে। অতঃপর এ সকল আমীর উমারা কায়রো রওয়ানা হয়ে যায়। অতঃপর পাঁচ দিন পর তারা প্রণূ আয়ুবের দশ বছর বয়সের এক বালককে শাসক নির্বাচন করে। তিনি হলেন সুলমান আশরাফ মুযাফ্‌ফরুদ্দীন মূসা ইবন্ নাসির য়ূসুফ ইবন্ মাসঊদ ইকসীস ইবন্ কামিল। আর মুআযকে তার সহকারী নির্ধারণ করা হয়। ফলে তাদের দুজনের নামেই মুদ্রা ও খুৎবার প্রচলন ঘটানো হয়। আর তারা শাসদেশের আমীর উমারাদের পত্রযোগে বিষয়টি অবহিত করে। কিন্তু সেখানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং তা তাদের শাসন কর্তৃত্বের বাহিরে চলে যায় এবং তাদের সাম্রাজ্য শুধু মিশরীয় ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর এ সবই সংঘটিত হয় সুলতান সালিহ আয়ূবের বাদী খাতুন উম্মে খলীলের নির্দেশে যে পরবর্তীকালে সুলতান মুআযকে বিবাহ করে। আর জুমা'আর খুৎসা এবং মুদ্রা তার নামে প্রচলিত ছিল। মিশর এবং তার অধীনস্থ প্রদশেসমূহে জুমা'আর দিনগুলিতে মিম্বরে মিম্বরে তার জন্য দু'আ করা হতো, তদ্রুপ প্রচলিত মুদ্রায় আর উম্মে খলীল নামের ছাপ দেয়া থাকতো। তদ্রূপ বিভিন্ন সরকারি ফরমান ও বিজ্ঞপ্তিতে তার হস্তাক্ষর ও দস্তখতের প্রতীক চিহ্নিত থাকতো। আর এসবই সংঘটিত হয় সুলতান মুআয-এর কর্তৃত্ব গ্রহণের পূর্বে তিন-মাস পর্যন্ত। এরপর তার যে দুঃখজনক পরিণতি হয়। তার কথা আমরা অচিরেই উল্লেখ করব।

নাসির ইবন্ আযীয ইবন্ যাহির

সুলতান সালিহ আয়ূবের তূরান শাহ যখন মিশরে আমীর উমারাদের হাতে নিহত হন, তখন হালবীগণ যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে দামিশক অভিমুখে অগ্রসর হয়। এ সময় তাদের সাথে ছিলেন য়ূযুফ ইবন্ 'আযীয মুহাম্মদ ইবন্ যাহির গাযী ইবন্ নামের য়ূসুফ, এবং তাদের কাছে অবস্থানরত বানূ আফূবের সদস্যগণ। এদের অন্যতম ছিলেন সালিহ ইসমাঈল ইবন্ আদিল, যিনি ছিলেন বয়স, মর্যাদা ও নেতৃত্বগুণ বিচারে অন্যান্যদের সকলের চেয়ে শাসন কর্তৃত্ব লাভের সর্বাধিক হকদার। এছাড়া তাদের মাঝে আরও ছিলেন নাসির দাউদ ইবন্ মুআযযশ ইবন্ আদিল এবং

হিমসের শাসক আশরাফ মূসা ইবন্ মানসূর ইবরাহীম ইবন্ আসাদুদ্দীন শেরকোহ ও অন্যান্যগণ। এরা সকলে সম্মিলিতভাবে দামিশক অবরোধ করেন এবং দ্রুততার কর্তৃত্ব লাভ করেন। এ সময় ইবন্ য়াগমূরের গৃহে লুণ্ঠিত হয় এবং তাকে দুর্গে বন্দি করা হয়। আর হালবীরা দামিশকের পাশ্ববর্তী বালাবাক, বুলরা, সালত এবং সারখাদ দখল করে নেয়, কিন্তু সুলতান মুগীছ উমর ইবন্ আদিল ইবন্ কামিলের শাসনাধীন কারক ও শাওবাক শহরদ্বর তাদের করায়তে আসেনি। আর সুলতান উমর এই শহর দুটির শাসন কর্তৃত্ব তখন গ্রহণ করেন, যখন ফিৎনাকালে তূরান শাহ নিহত হন, এদিকে মিশরীয়গণ তাকে আহ্বান করে তাদের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য, কিন্তু তিনি তার দুই পিতৃব্যপুত্রের পরিণতির কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েন, ফলে আর সেখানে যাননি। এদিকে দামিশক ও তার আশেপাশে যখন হলবীদের শাসন কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়, তখন সুলতান নাসির কেল্লায় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানকার অধিকারীদের মনোরঞ্জন করেন। এরপর তারা মিশরীয় ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য গাযা অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন মিশরীয় বাহিনী তাদের মোকাবিলার অগ্রসর হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে প্রথম দিকে মিশরীয়রা পর্যুদস্ত হয়। অতঃপর হালবী ও শামীদের বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তারা পরাজিত হয় এবং তাদের জনসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি বন্দি হয়। এ সময় ফৌজ থেকে সালিহ ইসমাঈল নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ঐতিহাসিক আবূ শামা এ স্থানে নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করেছেন : "ইসমাঈল আমাদের ধনসম্পদ বরবাদ করেছেন, অনর্থক আমাদের শহর এরপর সে দামিশকে থেকে উধাও হয়েছে, এটা হল ঐ ব্যক্তির প্রতিফল, যে মামুনষকে অভাবী করেছেন।"

সুলতান সালিহ ইসমাঈল

সুলতান সালিহ (রহ.) ছিলেন একজন প্রজ্ঞাত বিচক্ষণ শাসক, যিনি বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির শিকার হন। সুলতান আশরাফ তারপর সালিহের অনুকূলে দামিশকের শাসন কর্তৃত্বের ওসিয়ত করেন। তখন তিনি চার মাস এই শাসন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেন। অতঃপর তার ভাই সুলতান কামিল তার থেকে দামিশকের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি প্রতারণামূলক কৌশলের মাধ্যমে সালিহ আয়ূবের হাত থেকে তা অধিকার করে নেন, এবং পরবর্তী চার বছরের অধিক সময় এ কর্তৃত্ব বহাল রাখেন। অতঃপর খাওয়ারিযমীদের বছর ৬৪৩ হিজরীতে সালিহ আয়ূব তার থেকে দামিশকের শাসন কর্তৃত্ব পুণরুদ্ধার করেন। আর তার হাতে তার দু'শহরে বালাবাক এবং বসরার কর্তৃত্ব স্থির থাকে। এরপর এ দুটি শহরের শাসন কর্তৃত্ব তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। তখন আর তার কোন আশ্রয়স্থল থাকলো না। ফলে তখন তিনি হালবের শাসক নাসির য়ূসুফের নিরাপত্তা আশ্রয় গ্রহন করেন। অতঃপর যখন এ বছরে পূর্বোল্লিখিত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়, তখন তিনি মিশরীয় ভূখণ্ডে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এরপর আর তার পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। তিনি দানেশকে কবরস্থান, মাদরাসা, দারুল-হাদীস ও দারুল কিরাআতের ওয়াকফকারী। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। এছাড়া এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

তূরান শাহ ইবন্ সালিহ আয়ূব

ইনি হলেন ইবন্ কামিল ইবন্ আদিল। পিতার জীবদ্দশায় তিনি প্রথমে কায়রো দুর্গের প্রধান ছিলেন। তার পিতা তাকে নিজ শাসনামলে তার কাছে আসার জন্য বলতেন, কিন্তু তিনি তাতে সাড়া দিতেন না। এরপর যখন তার পিতার মৃত্যু হয়–যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, তখন তার সহচর আমীর উমারগণ তাকে ডেকে পাঠান। এ সময় তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। তখন তারা তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে, আর কিছুদিন পর তারা তাকে হত্যা করে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় মুহাররমের সাতাশ তারিখ সোমবার, কেউ কেউ বলেন, তিনি শাসনকার্য পরিচালনার উপযুক্ত ছিলেন না। পুত্র তূরান শাহ নিহত হওয়ার পর পিতা সালিহ আয়ূবকে স্বপ্নে দেখা গেল তিনি আবৃত্তি করছেন : "তারা তাকে জঘন্যভাবে হত্যা করেছে, ফলে জগতের জন্য নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়েছে। না তার ব্যাপারে তার পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে তারা কোনো অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। অচিরেই তুমি তাদেরকে দেখতে পারেব।

এরপর আমরা যেমন উল্লেখ করেছি মিশরীয় ও সিরীয়দের মাঝে লড়াই সংঘটিত হয়। আর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সকল বিশিষ্ট আমীর উমারা নিরুদ্দেশ হন তাদের অন্যতম হলেন : হালবীদের রাজ পরিকল্পনাবিদ শামসলু'লু। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র এক নেক বান্দা সৎকাজের নির্দেশদাতা এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধকারী, এছাড়া এ বছরই ইনতিকাল করেন।

খাতূন আরগুয়ানিয়া

তিনি হাফেযিয়্যা নামে পরিচিত। আর তার এই পরিচিতির কারণ তিনি জ'বার দুর্গের প্রধান হাফিয-এর সেবা ও প্রতিপালন করতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি ও নিপূণ পরিচালনাগুণের অধিকারিণী ও বিজ্ঞালী নারী। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এক সময় তিনি মুগীছ উমর ইবন্ সালিহ আয়ূবের রাধুনী ছিলেন। পরবর্তীকালে সুলতান সালিহ ইসমাঈল তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এ সময় তিনি তার থেকে চার সিন্দুক ধন-সম্পদ দখল করেন। তার উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহের অন্যতম হল তিনি তার দামিশকের বাড়ি তার সেবক পরিচালকদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন এবং শায়খ তাজুদ্দীন কিন্দীর খাদিম নাজির য়াকূতের বাগান খরিদ করে সেখানে মসজিদ ও কবরস্থান নির্মাণ করেন এবং এগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য একাধিক ওয়াকফ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আমীনুদ্দৌল্লা আবুল হাসান গযাল

এই ব্যক্তি হলো সুলতান সালিহ ইসমাঈলের ওযীর। সে নিজের জন্য এবং নিজের শাসন কর্তৃত্বের জন্য যেমন অপরা ছিল–তেমনি নিজের থেকে এবং তার সুলতান থেকে আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ সম্পৃক্ত হওয়ার কারণও ছিল। আর এটাই হল মন্দ ওযীরের দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিক সাবত মন্তব্য করেছেন যে, সে ছিল ধনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী, বরং বলা যায়, তার ধর্ম বলে কিছু ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ মুসলমানদের তার থেকে স্বস্তি দান করলেন। এ বছর সুলতান সালিহ ইসমাঈল মিশরীয় ভূখণ্ডে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর সে নিহত হয়। এ সময় একাধিক আমীর উমারা তাকে এবং ইবন্ য়াগমূরকে পাকড়াও করে ফাঁসি দেয় এবং মিশরে

দুর্গের সামনে দু'জনকে মুখোমুখি শূলবিদ্ধ করে। আর এই আমীনুদ্দৌলা গযালের যে ধন-সম্পদ, উপঢৌকন, মূল্যবান, রত্নাদি এবং দ্রব্যসামগ্রি পাওয়া যায় তার অর্থ মূল্য ছিল তিরিশ লক্ষ দীনার, এছাড়া তার কাছে পাওয়া যায় দশ হাজার মূল্যবান হস্তলিপিও সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

৬৪৯ হিজরীর সূচনা

এ বছরই হালবের শাসক সুলতান নাসির দামিশকে ফিরে আসেন এবং মিশরীয় বাহিনী উপকূলীয় ভূখণ্ড দখল করে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তখন সুলতান নাসির তাদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন এবং তারা মিশরীয়দেরকে মিশরীয় ভূখণ্ডে বিতারিড়ত করে। এছাড়া এ বছর সুলতান সালিহ আয়্যুবের স্ত্রী উম্মে খলীল তার প্রয়াত স্বামীর ক্রীতদাস ইয়যুদ্দীন আইবেক তুর্কমানীকে বিবাহ করে। আর এ বছরই সুলতান সালিহ আয়্যুবের কবর স্থানান্তরিত করে তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পরিধিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় তুর্কীরা শোক প্রকাশক পোশাক পরিধান করে এবং উম্মে খলীল তার প্রয়াত স্বামীর পক্ষে থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান সদ্‌কা করেন। আর এ বছরই তুর্কীরা দিময়াত শহর বিরান করে তাদের পোষ পরিজন মিশরে স্থানান্তরিত করে। এসময় তারা খ্রিষ্টান প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কায় জাযীরাও খালি করে দেয়। এছাড়া এ বছরই 'নাজজুল বালাগা' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন সম্পন্ন হয়। আল্লামা আব্দুল হামীদ ইবন্ দাঊদ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ আবুল হাদীদ বিশ খণ্ডে এই ব্যাখ্যা গ্রন্থ সম্পন্ন করেন। আর এই ব্যক্তি ছিলেন মুআয়্যাদুদ্দীন ইবন্ আল্‌কামীর কাতিব। তিনি তাকে নগদ একশ দীনার মূল্যবান পরিধেয় এবং উন্নতজাতের ঘোড়া দান করেন। আর কাতিব আব্দুল হামিদ তখন তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন, কেননা তিনি ছিলেন শিয়া এবং মু'তাযিলী।

এ বছর রমাযান মাসে শায়খ সিরাজুদ্দীন উমর ইবন্ রারাকা যিনি বাগদাদে অবস্থিত নিযামিয়্যা মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। তাকে বাগদাদের প্রধান-কাযীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং মূল্যবান পরিধেয় দ্বারা সম্মানিত করা হয়। আর শা'বান মাসে তাজুদ্দীন 'আব্দুল কারীম ইবন্ শায়খ মুহ্‌য়ূদ্দীন য়ূসুফ ইবন্ শায়খ আবুল ফারাজ ইবন্ হাওযীকে বাগদাদের নির্বাহী তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়। তাকে এ নিয়োগ দেয়া হয় তার ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবন্ শায়খের পর যিনি স্বেচ্ছায় এ পদ ত্যাগ করেন। এ সময় তাকে মূল্যবান পরিধেয় প্রদান করা হয় এবং তার সেবা ও পরিচর্যার জন্য একাধিক খাদিম নিয়োগ করা হয়। এ বছর 'ঈদুল ফিত্‌রের নামায অনুষ্ঠিত হয় আসরের পর। আর এটা ছিল এক অভিনব ঘটনা। এছাড়া এ বছর য়ামান শাসক সালাহদ্দীন ইবন্ য়ূসুফ ইবন্ উমর ইবন্ রাসূলের পক্ষে থেকে খলীফার কাছে এই মর্মে একখানি পত্র পৌঁছে যে, য়ামানের এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে খিলাফত দাবি করে। অতঃপর তিনি তার বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করে। তখন তারা তাকে পর্যুদস্ত করে এবং তার অনুসারীদের অনেক তো হত্যা করে তাদের থেকে সানআ শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এ সময় সেই নবুওয়াতের দাবিদার তার মুষ্টিনের অনুসারীদের নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। অতঃপর খলীফা য়ামান শাসকের কর্তব্য সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য মূল্যবান পরিধেয় ইত্যাদি প্রেরণ করেন। এছাড়া এ বছর যে সকল ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

বাহাউদ্দীন আলী ইবন্ হিংতুল্লাহ ইবন্ সালামা এই ব্যক্তি হলেন কায়রোর বিশিষ্ট খতীব। শৈশবে তিনি ইরাকে সফর করেন এবং সেখানে এবং অন্যত্র ইচেছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী এবং শাফেয়ী শাযহাব সম্পর্কে নিপুণ অবগতির অধিকারী। উপরন্ত ধার্মিকতা, সদাচার, উদারতা এবং দানশীলতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; তার সাক্ষাতে গিয়ে কেউ আপ্যায়নবিহীন থাকতে পারতো না। তিনি 'আল্লামা সালাফী ও অন্যান্যদের থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং অন্যদেরকেও তার বর্ণনা থেকে বহু হাদীস শোনান। তিনি এ বছর জিলহজ মাসে ওফাত লাভ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল নব্বই বছর। তাকে কারাফাতে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাকে রুহম করেন। এছাড়া এ বছর আরও যারা ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

কাযী আবুল ফযল আব্দুর রহমান ইবন্ আব্দুস সালাম ইবন্ ইসমাঈল ইবন্ 'আব্দুর রহমান ইবন্ ইবরাহীম লামতানী হানাফীতাদের পরিবারে 'আলিম-উলামা ও কাযীর অধিক্য ছিল। তিনি মোদরাগা আবূ হানাফী-তে অধ্যয়ন করেন এবং প্রথমে প্রধান কাযী ইবন্ ফাযলান শাফেয়ীর স্থলবর্তীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি তার পরবর্তী প্রধান কাযী আবূ সালিহ নাসর ইবন্ 'আব্দুর রাযযাক হাম্বলীর স্থলাভিশিক্ত হন এবং তারপর প্রধান বিচারপতি 'আব্দুর রহমান ইবন্ মুকলিবল ওয়াগিতীর স্থলবর্তী নিয়োজিত হন। এরপর ৬৩৩ হিজরীতে তার মৃত্যুর পর কাযী 'আব্দুর রহমান লাম'আনী বাগদাদের বিচার কর্তৃত্ব এককভাবে লাভ করেন এবং 'শ্রেষ্ঠতম বিচারক' উপাধি ধারণ করেন এবং ৬৩৫ হিজরীতে মাদরাসা মুসতান সিরিয়্যাতে হানাফী মাযহাপের অনুসারীদের জন্য দরস প্রধান শুরু করেন। তার বিচারের রায় চূড়ান্তকরণ এবং রদকরণে তিনি ছিলেন সর্বজন মান্য। তিনি বাগদাদে শায়খ সিরাজুদ্দীন নাহারকালীর পর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাদের দু'জনকে রহমন করুন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করুন।

৬৫০ হিজরীর সূচনা

এ বছরই তাতারী বাহিনী জাযীরা, সারূজ, রা'সূল-আয়ন এবং তার সংলগ্ন শহরসমূহে পৌছে যায়। এখানে তারা হত্যা, লুণ্ঠন চালায় এবং বহুসংখ্যক নারী শিশুদের বন্দি করে এবং বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এছাড়া তারা এ সময় পথ চলা অবস্থায় হারবান ও রা'সূল আয়নের মধ্যবর্তী সানজার আক্রমণ করে নগদ ছয় লক্ষ দীনার এবং ছয়শ বস্তা চিনি ছিনিয়ে নেয়। আর এ বছর প্রায় দশ হাজার জাযীরাবাদী নিহত হয়। এবং প্রায় তার সমসংখ্যক নারী ও শিশু বন্দি হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

ঐতিহাসিক সাবৃত বলেন : এ বছর লোকজন বাগদাদ থেকে হজ্জে গমন করেন। অথচ বিগত দশ বছর যাবৎ খলীফা মুস্তানসিধের সময় থেকে তারা হজ্জে গমন করেনি। এছাড়া এ বছর হালব শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, যার কারণে ছয়শ বাড়ি-ঘর ভস্মীভূত হয়। কেউ কেউ বলেন : খ্রিষ্টানরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। এছাড়া এ বছর প্রধান কাযী

'উমর ইবন্ 'আলী নাহরকারী মাদরাসা তাজিয়্যার কর্তৃত্ব একদল সাধারণ মানুষের কবল থেকে উদ্ধার করেন। আর এটি ছির মাদরাসা নিযামিয়্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উৎকৃষ্টমানের মাদরাসা। এই মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সালজূকী সম্প্রাজ্যের ওযীর তাজুল মূলক নামক জনৈক ব্যক্তি। আর এই মাদরাসায় সর্বপ্রথম পাঠদান করেন শায়খ আবূ বকর শাশী। আর এ বছরই ইনতিকাল করেন-শায়খ।

জামালুদ্দীন ইবন্ মাতরূহ

এই ব্যক্তি ছিলেন একাধিকগুণের অধিকারী, বুদ্ধিমান নেতা এবং বিশিষ্ট পাগড়ীধারী শায়খ। এরপর এক সময় সুলতান সালিহ আয়্যুব তাকে দামিশানের নহিব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আর তখন তিনি সৈনিকের বেশ ধারণ করেন। ঐতিহাসিক সাবৃত বলেন : সে সৈনিক পেশার উপযুক্ত ছিল না। কারকের শাসনকর্তা সুলতান নাসির দাউদ যখন ক্রুশেডারদের কবল থেকে বায়তুল মাকদিস উদ্ধার করেন। তখন তিনি তার প্রশংসায় নিম্মোক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহ আবৃত্তি করেন : "মাসজিদুল আকসার একটি রীতি রয়েছে, যা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যখনই তা কুফরের নিবাসে পরিণত হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তার জন্য একজন না একজন সাহায্যকারী প্রেরণ করেছেন। এক নাসের প্রথমে তাকে পবিত্র করেছেন, আর আরেকজন নাসির শেষে তাকে পবিত্র করেছেন।"

আর সুলতান সালিহ আয়্যুব যখন তাকে নাইব বা প্রতিনিধির থেকে অপসারণ করেন, তখন তিনি অনেকটা অপ্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। নিঃস্ব দরিদ্রদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সদাচারী ও বদান্য ছিলেন। আর তিনি মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। আর এ বছরই ইনতিকাল করেন :

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ আল্‌মাকদিসী

তিনি ছিলেন সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী, বিশিষ্ট কাতিব, অতি শিষ্টাচারী, তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এ ছাড়া তিনি সুলমান সালিহ ইসমাঈল এবং সুলতান নাসির দাউদের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি একাধারে ধার্মিক ও বহুগুণের অধিকারী ও কবি ছিলেন। তার এক কাসীদায় তিনি সুলতান সালিহ ইসমাঈল উপদেশ দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ তার ওযীর, কাযী এবং সভাসদ থেকে যে আচরণের সম্মুখীন হয়েছে, তার বিবরণ দিয়েছেন। আর এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

'আব্দুল'আযীয ইবন্ 'আলী

ইনি হলেন ইবন্ আব্দুল জাব্বার মাগরিবী। তার পিতা বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি ইলম তলবের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং হাদীস বিষয়ে কার্যক্রম অনুসারে একাধিক খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব বর্ণনা করেছেন।

শায়খ আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ গানিম ইবন্ কারীম ইসপাহানের অধিবাসী, বাগদাদে আগমণ করেন। তিনি ছিলেন গুরুর যুবক। এ সময় তিনি শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ারদীর শিষত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উত্তম তরীকাপন্থী, তাফসীর শাস্ত্রের তার পারদর্শিতা ছিল। এ

ছাড়া সূফিদের তরীকায় তার একটি তাফসীর ছিল। তার অন্যতম উপদেশাবলীসমূহে হলো : তাঁর বড়ত্বের পরিধিতে গোটা বিশ্বজগত হলো কণাসদৃশ, আর তাঁর প্রজ্ঞা গ্রন্থের একটি কণা হলো জগতসদৃশ। তার আদিসত্তার সৌন্দর্য যখন প্রকাশ পায়, তখন মূল হয় শাখা, আর শাখা মূলে পরিণত হয়।

যখন রাতের আবরণসমূহে ঝুলন্ত, তারকারাজির প্রদীপসমূহ প্রজ্বলিত; প্রহরীদের দৃষ্টি ব্যাকুল প্রেমিকদের থেকে, মিলন-দ্বার থেকে প্রহরীরা অপসারিত। কি এই ঘটনা? যখন প্রিয়জন মিলন-দ্বার উন্মুক্ত করে রয়েছে? কি এই বিরতিকাল, যখন মাওলা তার প্রহরার আবরণ ভেদ করেছেন। 'আকীক উপত্যকায় আমার অবস্থান অবাধ্যতা বিবেচিত হবে যদি আমি–আর আমি যদি সেই বাসিন্দার প্রতি ব্যাকুলতায় মৃত্যুবরণ কা করি, তাহলে আমি আমার দাবিতে তাশ্নয়ী নই। হেলায়লার বসতভিটা! প্রেমাসক্তরা সবাই প্রেমের ক্ষেত্রে বরাবর নয়, যেমন সকল পানীয়ই রাহীক বা অত্যুৎকৃষ্ট নয়। আর প্রেমাশক্তির দাবিদার এত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, প্রেমাশক্তিতে বন্দি ও প্রেমাশক্তি মুক্ত উভয়ে বরাবর হয়ে পড়েছে।

হে নিরাপদ নির্ভয়গণ! তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে আকাশে আরোহণ করতে পারে? হে নিজেদের নামের পরিধিতে আবদ্ধগণ তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে যার বোধ ও উপলব্ধি এমন যে সে তা দ্বারা বন্য পশু এবং পক্ষীকুলের ইশারা ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারে। তোমাদের মাঝে কি প্রিয়দর্শনে মূসার ন্যায় ব্যাকুলতা কারও আছে? যার অবস্থা প্রার্থনা বলে দেয় যে, আমাকে তোমার দর্শনদানে ধন্য কর, কেননা প্রতীক্ষা অনেক দীর্ঘায়িত হয়েছে।

লোকজন ইসতিখার নামায আদায়ের পর যখন বৃষ্টি বর্ষিত হল, তখন তিনি বললেন : ব্যাকুল মন যখন আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আরোহণ করল, তখন চক্ষুপ্রশ্রবণ প্রবাহিত হল এবং মেঘরূপী স্তন্যদায়িনী বদান্য হল, মাটিরূপী দগ্ধ পোষ 'করুণাদুগ্ধ' শুকে নিল, মেঘের ওলান থেকে অঝোর ধারায় পানি বর্ষিত হল। ফলে নির্জীব ভূপৃষ্ঠ সজীব হল এবং মাটির চক্ষুশীতল হল, উদ্যানসমূহ সবুজ গালিচা দ্বারা সজ্জিত হল; ফলে অনুপম সৌন্দর্য প্রকাশ পেল এবং জগতের অনু পরমানুসমূহ তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সরব হল।

আবুল ফাত্হ নাসরুল্লাহ ইবন্ হিবাতুল্লাহ

ইনি হলেন ইবন্ আব্দুল বাকী ইবন্ জিবাতুল্রাহ ইবন্ হুসায়ন ইবন্ যাহইয়া ইবন্ সাকিআ আলগিফারী আলকিনানী আল্মিশরী-এর দামেশকি। তিনি সুলতান মুআযযম এবং তার পুত্র নাসির দাউদের একান্ত সহচর ছিলেন। তিনি ৬৩৩ হিজরীতে সুলতান নাসির দাউদের সাথে বাগদাদ অভিমুখে সফর করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক এবং চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। তার অন্যতম কয়েকটি কবিতা পঙ্ক্তি হলো : "হে আমার মান্যবরেরা; তখন তোমরা আমার দর্শনে অস্বীকৃতি জানালে এবং আমাদে নৈকট্যের পরিবর্তে দূরত্ব দান করলে। এবং জাগ্রত অবস্থায় মিলনের অনুমতি প্রদান করলে না এবং কোমলতার কারণে আমার হৃদয় তোমাদের ব্যাপারে ধৈর্যহারা হল; তখন আমি অলীক কল্পনা শিকারের জন্য আমার চোখের পাতাকে ফাঁদ বানালাম, ফলে ঘুম ও ক্লান্তির সাহায্যে জীবনের সুখ ভোগ লাভ করলাম।

৬৫১ হিজরী শুরু

এ বছরই খলীফার দূত শায়খ নাজমুদ্দীন বাদরাঈ মিশরের শাসক এবং শামের শাসকের মাঝে মধ্যস্থতা করেন এবং উভয় বাহিনীর মাঝে সন্ধি স্থাপন করেন। আর এ সময় তাদের মাঝে বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে এবং তীব্র যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। মিশরীয় বাহিনী এ অবস্থায় খ্রিষ্টানদের সাথে হাত মেলায় এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা যদি তাদেরকে শামীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে, তাহলে তার বিনিময়ে তারা বায়তুল মাকাদাসের কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পণ করবে। এ ছাড়া এ সময় আরও বহু যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। এমতাবস্থায় মিশরীয় ভূখণ্ডে শাসক পরিবারের একদল মানুষ বিবাদমান এই দুই পক্ষের মাঝে সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হন। এদের মধ্যে ছিলেন সুলতান সালিহ ইসমাঈলের পুত্রগণ, সুলতান আশরাফের কন্যা এবং হিমাস : শালব ও অন্যান্যদের পুত্রগণ। আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। ঐতিহাসিক সায়ী এ বছরের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন : একবার বাগদাদে এক ব্যক্তি পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় তার মাথায় বহনকৃত বস্তু ভেঙ্গে যায়। তখন সে কাঁদতে শুরু করলে লোকজন তার দারিদ্র ও দুর্দশা দেখে সহানুভূতি বোধ করে এবং এক ব্যক্তি তাকে একটি দীনার প্রদান করে। দীনারটি হাতে নিয়ে সে দীর্ঘক্ষণ তা নিরীক্ষণ করে, এর পর বলে উঠে : আল্লাহ্র কসম! এই দীনার তো আমার পরিচিত। অমুক বছর আরও কিছু দীনারের সাথে এটা আমার হাত ছাড়া হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে ভৎসনা করে বলল : তোমার কথার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি? সে তখন বলল : এই দীনারটির ওজন হল এত। আর ঐ ব্যক্তির সাথে তেইশ দীনার ছিল, তখন তারা দীনারটিকে ওজন করে তার কথা মতই পেল। তখন লোকটি তাকে তেইশ দীনার বের করে দিল, আর এগুলি সে ঐ ব্যক্তি যেমন বলেছিল, তার থেকে পড়ে যাওয়ার পর কুড়িয়ে পেয়েছিল। তখন লোকজন এ ঘটনায় অবাক হল, ইবন্ সায়ী আরও বলেন : এর কাজই আরেকটি ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। সেটি ছিল : এক ব্যক্তি যমযমের পানি দিয়ে গোসল করার জন্য পোষাক ছাড়ল এবং একই সাথে পঞ্চাশ মিছকাল ওজনের একটা বাজুবন্ধ খুলে তার সাথে রাখল। অতঃপর সে গোসল শেষ করে তার কাপড় পড়ে চলে গেল এবং ভুল ক্রমে তার বাজুবন্ধ সেখানে রেখে বাগদাদ চলে গেল। এরপর কয়েক বছর অতিবাহিত হল এবং ঐ বাজুবন্ধ ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করলো। এ সময় তার কাছে সামান্য কিছু পুঁজি অবশিষ্ট ছিল্ সে তখন ঐ পুঁজি দ্বারা কাঁচ ও কাঁচের বোতলের কেনাবেচা শুরু করল। সে যখন এগুলি মাথায় নিয়ে ফেরি করছিল, তখন পা পিচলে তার মাথায় বহন করা সব কাঁচ-পাত্র ভেঙ্গে গেল। তখন সে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, আর লোকজন তার জন্য দুঃখবোধ করতে লাগল। সে তখন তার কথার মাঝে একথাও বলল : হে উপস্থিত লোক সকল? আল্লাহ্র কসম! দু'বছর পূর্বে আমার থেকে পঞ্চাশ মিছকাল ওজনের একটি বাজুবন্ধ হারিয়ে গেছে। তখন আমি তার জন্য কোনো দুঃখবোধ করিনি, যেমন আজকে এই কাঁচের বোতলগুলির জন্য করছি। আর তার কারণ, এটাই আমার মূলধনের সবটুকু। তখন উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলো : আল্লাহ্র কসম! আনি তো ঐ বাজুবন্ধের সাক্ষাত পেয়েছি। একথা বলে সে বাজু থেকে বাজুবন্ধটি খুলে তাকে দিল। উপস্থিত সকলে এ ঘটনায় অবাক ও বিস্মিত হল। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

৬৫২ হিজরী শুরু

ঐতিহাসিক সাবৃত ইবনুল জাওযী তার গ্রন্থ 'কালেরদর্পণ' এ বলেন : এ বছর মক্কা থেকে এই মর্মে সংবাদ আসে যে য়ামানের 'আদম' অঞ্চলের এক পর্বতে বিশেষ ধরনের আগুন দৃষ্টিগোচর হয়েছে। রাত্রিকালে মনে হয় এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ পাশ্ববর্তী সমুদ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, আর দিবসে তা থেকে কুণ্ডলী পাকানো বিশাল ধোঁয়ার স্তম্বের উদ্‌গিরণ ঘটে। এ অবস্থা দর্শনে লোকজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে যে, এটাই হল সেই আগুন, শেষ যামানায় যা প্রকাশ পাওয়ার কথা নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন। তখন তারা তাওবা করে এবং সকল প্রকার অন্যায় অনাচার ত্যাগ করে বিভিন্ন প্রকার দান সদ্‌কা ও কল্যাণ কাজে ব্রতী হয়। এ ছাড়া এ বছর ফারিস আকতাঈর আগমন ঘটে। এই ব্যক্তি এসে মুসলমানদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের অনেককে বন্দি করে। তার সাথে ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী বাহরিয়্যাদের একটি দল। আর এরা ইতোপূর্বে অনাচার, ঔদ্ধত্য এবং দাপট প্রদর্শন করেছিল। এ সময় তারা সুলতান মুঈম আইবেক তুর্কমানী কিংবা তার পত্নীকেও কোনো পরওয়া করতো না। তখন সুলতান মুঈম আকতাঈকে তার ব্যাপারে তারস্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন এবং তার স্ত্রী তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি কৌশলে এ বছর তাকে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় মিশরে মানসূরা দুর্গে। আর তার ফলে মুসলমানগণ তার অনিষ্ট থেকে স্বস্তি লাভ করে। এ বছর শায়খ ইয্‌যুদ্দীন ইবন্ 'আব্দুস সালাম সুলতান সালিহ আয়্যূদের মাদরাসায় দরস প্রদান করেন। আর এ বছরই রোম সম্রাটের কন্যা দামিশকে শাসক সুলতান নাসির ইবন্ 'আব্দুল 'আযীয জাহিব ইবন্ নাসিরের নববধূরূপে বিরাট জাঁকজমক ও উৎসবের সাথে দামিশকে আগমণ করেন। এ সময় তার কারণে দামিশক শহর আনন্দোৎসবে মুখরিত হয়ে উঠে। এ ছাড়া এ বছর যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

আব্দুল হামীদ ইবন্ 'ঈসা

ইনি হলেন শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ খসরুশাহী, বিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ কালাম-শাস্ত্রবিদ এবং ইমাম ফখর রাযীর কাছে যারা উসূল ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন, তাদের অন্যতম, এর পর তিনি শামে গমন করে। সুলতান নাসির দাঊদ ইবন্ মুসায়যমের সার্বক্ষণিক সহচরে পরিণত হন এবং তার কাছে আদৃত সমাদৃত হন।

ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : তিনি ছিলেন গুণী বিনয়ী এবং সমীহের পাত্র এবং উত্তম বাহ্যিক অবস্থার অধিকারী। সাবত্ বলেন : তিনি ছিলেন বিনয়ী, বিচক্ষন এবং কল্যাণবাহী ব্যক্তি। তার সম্পর্কে কেউ একথা বলতে পারেনি যে, তিনি কাউকে কষ্ট দিয়েছেন। যদি তিনি কারও উপকার করতে পারতেন, তাহলে তা করতেন, অন্যথায় নীরব থাকতেন। তিনি দামিশকে ইনতিকাল করেন এবং কাসীয়ূনে সুলতান মুআয়যমের সমাধিস্থলের নিকট সমাধিস্থ হন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ মাজদুদ্দীন ইবন্ তায়মিয়্যা

ইনি হলেন 'আল আহ্‌কাল' গ্রন্থ প্রণেতা, আব্দুস সালাম ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আবুল কাসিম খাযির ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ 'আলী ইবন্ তায়মিয়্যা আল্‌হাররানী আল্ হাম্বলী। শায়খ তাকীয়ূদ্দীন

ইবন্ তায়মিয়্যার পিতামহ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৯০ হিজরীর দিকে। শৈশবেই তিনি আপন পিতৃত্ব খতীব ফাখরুদ্দীন-এর নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং হাদীস ফিক্হ ও অন্যান্য-শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি দারস ও ফাতওয়া প্রদান করেন এবং ইলম অন্বেষীরা তার দ্বারা অনেক উপকৃত হন। তিনি হারবানে ঈদুল ফিতরের দিন ইনতিকাল করেন।

শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ তাল্হা

ইনি আল্লামা দাওয়াঈর পর দামিশকের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর অপসারিত হয়ে 'জাযীরাতে' গমন করেন এবং সাবীবায়ন-এর কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর হালতে গ্রহণ করেন এবং এ বছর সেখানে ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : তিনি ছিলেন গুণী 'আলিম, তাকে ওযীরের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়, কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। আর এটা ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ তাওফীক। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

সায়িদ ইবন্ 'আল্লান

ইনি হলেন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি, যারা দামিশকে ইবন্ আসাকির থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

নাসির ফারাজ ইবন্ 'আব্দুল্লাহ হাব্শী : তিনি ছিলেন বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণকারী ও নেককার হাফিযে হাদীস। তিনি নিয়মিত মৃত্যু পর্যন্ত হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি দামিশকের 'নূরিয়্যা' নামক দারুল হাদীসে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

নাস্‌রাহ ইবন্ সালাহুদ্দীন য়ূযূফ ইবন্ আয়্যূব

এ বছর ইনি এবং বেশ কয়েকজন ব্যক্তি হালবে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাদেরকে রহম করুন।

৬৫৩ হিজরীর সূচনা

ঐতিহাসিক সাবত্ বলেন এ বছরই সুলতান নাসির দাঊদ আনবার থেকে দামিশকে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং ইরাক থেকে হজ্জ পালন করেন এবং ইরাকিদের মাঝে এবং মক্কাবাসীদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করেন। অতঃপর তাদের সাথে হাল্লায় ফিরে আসেন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : আর এ বছর সোমবার রাতে সফর মাসের আট তারিখে হালতে শায়খ যিয়াউদ্দীন সকার ইবন্ য়াইয়া ইবন্ সালিম ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন গুণবান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তার দুটি কঠিতা পঙ্‌ক্তি হলো : "যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার এমন অবস্থা রয়েছে, যা তাকে শরীয়তের পরিধি থেকে বের করে নেয়, তাহলে তুমি তার সহচর হয়ো না, কেননা তাতে শুধু ক্ষতিই-ক্ষতি আর এই ব্যক্তি হলেন মাদরাসা কাওমিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াককারি।

আবুল ইয্ ইসমাইল ইবন্ হামিদ

ইনি হলেন ইবন্ আব্দুর রহমান আল্ আনসারী আলকাক্তগী। হাদীস শাস্ত্রচর্চাকারীদের জন্য তিনি তার নিজ বাড়ি ওয়াক্ফ করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। তিনি 'জামালুল ইসলাম' বা

'ইসলামের সৌন্দর্য' নামক হালকায়ে দারলের মুদাররিস ছিলেন এবং এই পরিচয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন চতুর ও বাকপটু ব্যক্তি। তার একটি অভিযান সংকলন রয়েছে, যেখানে তিনি তার শায়খদের থেকে বহু মূল্যবান বিষয় উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : তার নিজহাতে লেখা এই সংকলন আমি অধ্যয়ন করেছি। এতে আমি বর্ণনাকারীদের নাম ও অন্যান্য বিষয়ে একাধিক ভুলত্রুটি দেখতে পেরেছি। যেমন তিনি সা'দ ইবন্ উবাদা ইবন্ দুলামের পরিবর্তে সা'দ ইবন্ উবাদা ইবন্ সামিতের কথা উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ কোথাও কোথাও নামের ক্ষেত্রে বর্ণবিভ্রাটও ঘটেছে, অর্থাৎ একবর্ণের স্থলে অন্যবর্ণ লেখা হয়েছে। আবূ শামা হলেন : আমি তার নিজের হাতের লেখায় এসব পেয়েছি। তিনি এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের সতেরো তারিখ সোমবার ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। এছাড়া শরীফ মুরতালা হালবে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকেও রহম করুন।

৬৫৪ হিজরী শুরু

এ বছরই হিজায তুমি থেকে ঐ আগুন প্রকাশ পায়, যা বসরায় অবস্থিত উটপালের গ্রীবাসমূহ আলোকিত করে, যেমন বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। 'আল্লামা হাফিয শিহাবুদ্দীন আবূ শামা মাবদ্দিসী তার গ্রন্থ যায়ল বা পরিশিষ্ট ও তার ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বহুসংখ্যক প্রামান্য পত্র থেকে, যা একের পর এক দামেশকে প্রেরিত হয়েছিল। তাতে এই আগুনের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লিখিত ছিল, যা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয়েছিল এবং কিভাবে তা প্রকাশ পেয়েছিল। সীরাতে নববীর নবুওয়তের প্রমাণ অধ্যায়ে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। আর সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্র। ঐতিহাসিক আবূ শামার বিবরণের সার-সংক্ষেপ হলো : মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে দামিশকে এই মর্মে একাধিক পত্র আসলো যে, এ স্থর জুমাদাল আখিরা মাসের পাঁচ তারিখে তাদের শহরে এক আগুন প্রকাশ পেয়েছে আর রজব মাসের পাঁচ তারিখে যখন পত্র লেখা হয়, তখনও এই আগুন যথারীতি বহাল ছিল। আর আমদারে কাছে এ সম্পকিত পত্রাবলী পৌঁছে শা'বান মাসের দশ তারিখে। অতঃপর তিনি এর বর্ণনা দিয়ে বলেন : "পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, ৬৫৪ হিজরীর শা'বান মাসের শুরুতে আল্লাহ্র রাসূলের শহর মদিনা থেকে দামিশকে একাধিক পত্র আসে। এ সকল পত্রে এমন একটি গুরুতর বিষয়ের বিবরণ ছিল, যাতে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সত্যায়ন বিদ্যমান। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংখটিত হবে না, যতদিন হিজাব–ভূমিতে এমন এক আগুন প্রকাশ পাবে না যা বুসরা শহরে অবস্থিত উটপালের গ্রীবাসমূহ আলোকিত করবে।"

আবূ শামা বলেন : ঐ আগুনকারীদের একজন থেকে আমার আস্থাভাজন এক বর্ণনাকারী আমাকে অবহিত করেছেন যে, তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি তায়মা শহরে ঐ আগুনের আলোতে পত্র লিখেছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেন : সেই রাতগুলিতে আমরা যার যার গৃহে ছিলাম। আর আমাদের প্রত্যেকের গৃহে বাতি ছিল আর সেই আগুনের আকৃতি অনুযায়ী তেমন কোনো তাপও উত্তাল ছিল না। এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নিদর্শন।"

আল্লামা আবূ শামা বলেন : আগত পত্রাবলী থেকে ঐ আগুনের যে আরুব ও প্রকৃতি আমি উদ্ধার করেছি, তার বিবরণ নিম্নরূপ : ৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের তিন তারিখে বুধবার রাতে মদীনা শরীফে প্রথমে গুরু গম্ভীর আওয়াজ শোনা যায়। এরপর সেখানে ভয়াবহ ভূকম্পন শুরু হয়, যার কারণে ভূপৃষ্ঠ আন্দোলিত হয় এবং বাড়ি-ঘর ইত্যাদি কিছুক্ষণ পরপর প্রকম্পিত হতে থাকে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে উল্লিখিত মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবার পর্যন্ত। অতঃপর মদীনার হাররা বা পাথুরে ভূমিতে বনূ কুরায়যার বসতির নিকটে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ পায়। আমরা মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে এমনভাবে তা দেখতে পাচ্ছিলাম, যেন তা আমাদের অতি কাছে। এই আগুন ছিল সম্ভবত এটা ছির বড় আকারের অগ্নুৎপাতের ঘটনা।

বিরাট উঁচু শিখা বিশিষ্ট। এ সময়ে একাধিক উপত্যকা থেকে লাভা বাহির হয়ে শাশা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের একটি দল প্রকৃত বিষয় অবগত হবার জন্য উঁচুতে আরোহণ করলাম। তখন আমরা দেখতে পেলাম, পাহাড় থেয়ে লাভার স্রোত নেমে আসছে। আর ইতোমধ্যে লাভাবাহিত হাররা বা পাথুরে ভূমি ইরাকীদের হজ্জের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। আর এই লাভার স্রোত হাররা পর্যন্ত যায়। এ সময় আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম হয়ত তা আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে। এরপর তা পূর্বদিকে প্রবাহিত হতে লাগলো। এবং বড় বড় পাথর গ্রাস করে ফেলেন। এটা যেন আল্লাহ্ তা'আলার إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ "তা নিক্ষেপ করবে বিরাট স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য, যেন তা "পীতবর্ণ উটের দল" এই বর্ণনার নমুনা। আর এই লাভা স্রোতও অনেকখানি ভূমিকে গ্রাস করে। আর আমি এই পত্র লিখছি ৬৫৪ হিজরীর রজব মাসের পাঁচ তারিখ, যখন আগুনের তীব্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাতের বেলায় মদীনা থেকেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।আর এই আগুনের উৎস হলো বনু কুরায়ার নিকটবর্তী এক বিশাল পাহাড়। এটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আল্লাহ্ শেষ পরিণতি কল্যাণময় করুন। আমার পক্ষে এই আগুনের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : "অন্য এক পত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এই অগ্নুৎপাত দেখা দেয় ৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসের প্রথম শুক্রবার। এ সময় মদীনার পূর্বদিকে বিরাট অগ্নুৎপাত ঘটে। যেখান থেকে মদীনার দূরত্ব অর্ধ দিবসের পথ। এটা অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট লাভার স্রোত উহুদ পাহাড় পর্যন্ত এসে পৌঁছে। অতঃপর থেমে যাওয়ার পর পুনরায় শুরু হয়, আর আমরা জানি না, এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? এই অগ্নুৎপাত যখন শুরু হয়, তখন মদীনাবাসী তাদের নবীর রওযায় প্রবেশ করে তাওবা ইস্তিগফার করতে থাকে। আর এটা হলো নবুওয়াতের অন্যতম প্রমাণ।"

তিনি আরও বলেন : "অন্য আরেকটি পত্রে এসেছে যখন ৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসের প্রথম সোমবার উপস্থিত হয়, তখন মদীনায় গুরু গম্ভীর আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। এ অবস্থায় দুদিন অতিবাহিত হয়। অতঃপর এ মাসের তৃতীয় দিন বুধবার রাত থেকে শুরু হয় প্রচণ্ড ভূমিকম্প। উল্লিখিত মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবার অগ্নুৎপাত শুরু হয়। এ সময় হাররা ভূখণ্ডে

বিশালাবৃত্তির অগ্নিশিখা দৃশ্যমান হয়। আর এটা মদীনা থেকেই চোখে দেখা যাচ্ছিল। আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম সেই সকল বিশাল বিশাল অগ্নিশিখা, যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূর সালাতে বর্ণনা করেছেন। আর এই অগ্নুৎপাত নিঃসৃত লাভার বিস্তৃতি ছিল যেমন প্রশস্ত তেমন গভীর। এর দৈর্ঘ্য ছির চার ফারসাখ, প্রস্থ চার মাইল আর গভীরতা ছিল তিন গজের মত। এই লাভা জলন্ত অবস্থায় ছিল তপ্ত ও লাল বর্ণের, আর জমাটবদ্ধ ও শীতল হওয়ার পর তা কাল বর্ণের শক্ত পাথরে পরিণত হয়। এই অগ্নুৎপাতের ফলে লোকজন ব্যাপকভাবে নাফরমানী ত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন করে এবং মদীনার প্রশাসক তার অধিবাসীদের প্রতি অনেক অন্যায় আচরণ থেকে নিবৃত্ত হন।" শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বলেন : মদীনার তৎকালীন কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ সিনান ইবন্ 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন্ নুমায়ন হুসায়নী তার জনৈক শিষ্যের বা বন্ধুর কাছে যে পত্র লেখেন তার ভাষ্য নিম্নরূপ : এ বছর জুমাদাল আখিরা মাসের তিন তারিখ বুধবার রাতের দুই তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হয়, তখন মদীনার তীব্র ভূমিকম্প দেখা দেয়, যা থেকে আমরা সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আর এ ঘটনার পর প্রতিদিন রাত দিনে দশবার ভূমিকম্প হতে থাকে। আল্লাহ্র কসম" একবার এই ভূমিকম্প যখন শুরু হয় আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুজরার রাশে, এ সময় মসজিদের মিম্বর কেঁপে উঠে; আর আমরাও বেশ ঘাবড়ে যাই। আর আমরা মিম্বরের লোহার শব্দ শুনতে পেলাম এবং মসজিদে নববীর ঝাড় বা প্রতিগুলি দুলে উঠতে দেখলাম। আর এই ভূমিকম্প শুক্রবার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত চলে। আর এই ভূমিকম্প চলাকালীন সময় ন্যায় গুরু গম্ভীর আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ হতে থাকে। অতঃপর শুক্রবার হাররার পথে অবস্থিত আজীলায়ন পাহাড়ের চূড়ায় বিশাল আকারে অগ্নুৎপাতের সূচনা হয়। শনিবার রাত অতিক্রান্ত হতে না হতেই আমরা ভয়াবহ আতঙ্কের শিকার হই। এরপর আমি মদীনার শাসকের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়ে বললাম : আমাদেরকে তো আল্লাহ্র আযাব ঘিরে ধরেছে। আপনি আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসুন। তখন তিনি তার সকল গোলাম বাদী আযাদ করে দিলেন এবং একদল লোককে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন। তিনি যখন এরূপ প্রভাবিত হলেন তখন আমি তাকে বললাম : তখন তিনি আমাদের সাথে আসলেন এবং শনিবার রাত আমরা সকলে মসজিদে নববীতে কাটালাম। নারী শিশু কেউই তা থেকে বাদ পড়লো না, সকলেই এসে রওযা শরীফের কাছে সমবেত হলো। এরপর ঐ আগ্নেয়গিরি লাভা উদগিরণ শুরু করলো। এই লাভা আজালায়ন উপত্যকায় প্রবাহিত হয়ে পথ বন্ধ করে দিল। এরপর প্রবাহিত হয়ে সেই লাভা স্রোত শাখা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছল। এই লাভা স্রোতে পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর এই উপত্যকায় আর পানি প্রবাহিত হয়নি। আল্লাহর কসম! হে বন্ধু! আমাদের আজকের সন্ধ্যা অত্যন্ত বিষন্ন, আর মদীনাবাসী সকলে তাওবা করে আল্লাহ্মুখী হলো সেখান থেকে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র এবং বিনোদন উপকরণ অদৃশ্য হলো। পরিশেষে এই লাভা স্রোত হাজীদের মক্কাগমনের পথের একাংশ বন্ধ করে দিল এবং আমাদের মদীনা উপত্যকায় সেই লাভা স্রোতের কিছু অংশ পৌঁছলো। তখন আমরা শঙ্কিত লোম এই আশঙ্কায় যে, হয়তোবা তা আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে। তখন লোকজন সমবেত হয়ে রওযা শরীফে প্রবেশ করলো এবং জুমু'আর রাতে আল্লাহ্র দরপরে তাওবা করলো। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী এই জলন্ত লাভা স্রোত আল্লাহ্র কুদরতে নিভে গেল। তার আকৃতি ছিল উট আকৃতির

পাথরের মত। তার ছিল ভয়াবহ শব্দ, যার কারণে আমাদের পানাহার ও নিদ্রা হারাম হয়ে গিয়েছিল। তার বিশালতা ও ভয়াবহতা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া য়ানবূ-এর বাসিন্দারাও তা প্রত্যক্ষ করলো এবং তাদের কাযী ইবন্ সা'দকে ডেকে পাঠাল। তিনি এসে সেদিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু বিশালত্বের কারণে আর তা বর্ণনা করতে পারলেন না। আর এই পত্র লিখিত হয়েছে রজব মাসের পাঁচ তারিখ, যখন ঐ অগ্নুৎপাত অব্যাহত রয়েছে এবং লোকজন তা থেকে ভীত সন্ত্রস্ত। আর চন্দ্র সূর্যও যেন কেমন নিস্প্রভভাবে উদিত হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই।"

ঐতিহাসিক আবু শামা বলেন : দামিশকে অবস্থান করেও আমরা চন্দ্র-সূর্যের আলোর এই নিষ্প্রভতা বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা বিষয়টির রহস্যভেদ না করতে পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে আমরা এই অগ্নুৎপাতের বিষয়ে অবহিত হলাম।

আল্-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : ঐতিহাসিক আবূ শালা এই অগ্নুৎপাত সম্বলিত পত্রসমূহ আসার পূর্বেই এই আগুনের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। এ বছরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেন, এ বছর জুমাদাল আখিরা মাসের ষোল তারিখ সোমবার রাতে রাতের প্রথমাংশে চন্দ্র গ্রহণ দেখা দেয়। এ সময় চন্দ্র তীব্র লালাভ বর্ণ ধারণ করে। এরপর তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। তদ্রূপ পরদিন সকলে সূর্য গ্রহণ দেখা দেয়। উদয়কালে এবং অস্তকালে সূর্য মাত্রাতিরিক্ত লালাভ বর্ণ ধারণ করে এবং পরবর্তী কয়েক দিন তা বিবর্ণ ও বিস্প্রভ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। অতঃপর তিনি বলেন : এ দ্বারা ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত সূর্যগ্রহণ ও ঈদ একত্র হওয়ার সম্ভাব্য ঘটনার যথাযর্থতা না ব্যস্ত হয়। যাতে অনেকে অসম্ভব মনে করে থাকে। অতঃপর আবূ শা'মা মন্তব্য করেন : মদীনায় অবস্থানরত বানূ ফাশানীর জনৈক ব্যক্তির পত্রের ভাজ হল : এ বছর জুমাদান আখিরাহ মাসে আমাদের কাছে ইরাক থেকে একদল লোক আগমণ করে এবং তারা বাগদাদ সম্পর্কে অবহিত করে যে, সেখানে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে এবং শহরের উঁচু উঁচু স্থানসমূহও নিমজ্জিত হয়েছে। এমনকি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দারুল খিলাফতের অভ্যন্তরেও পানি অনুপ্রবেশ করেছে। আর বন্যা কবলিত হয়ে ওযীয়ের বাসভবন এবং আরও তিনশ আশিটি বাসভবন ধসে পড়েছে। এমনকি খলীফার খাযানাও ধসে পড়েছে এবং রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগারে রক্ষিত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট হয়েছে। বন্যা কবলিত হয়ে বাগদাদবাসী ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে এবং বাগদাদের বিভিন্ন সড়কে ও অলিতে গলিতে নৌকাসমূহ চলাচল করতে শুরু করেছে। একথা বর্ণনার পর তিনি বলেন : আর এদিকে আমাদের এখানে এক ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। জুমাদাল আখিরা মাসের তিন তারিখ বুধবার রাতে। লোকজন বজ্রধ্বনির ন্যায় গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনতে পায়। এক অশ্রুত পূর্ব আওয়াজে লোকজন শঙ্কিত হয়ে তাদের শয্যা ত্যাগ করে এবং উচ্চস্বরে তাওবা ইসতিগ্ফার পড়তে পড়তে মসজিদে নববীতে আশ্রয় নেয় এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। আর সকাল পর্যন্ত একাধিকবার এই ভূমিকম্পের কাঁপুনি অনুভূত হয় এভাবে চলতে থাকে বুধবার সারাদিন এবং বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাত পর্যন্ত। অবশেষে শুক্রবার সকালে প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হতে থাকে। এমনকি মসজিদে নববীর মিনারসমূহ দুলতে থাকে এবং ছাদ থেকে কড়মড় আওয়াজ হতে থাকে। এ সময় লোকজন তাদের পাপের কথা ভেবে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আর শুক্রবার দুপুরের আগে এই

ভূমিকম্প থেমে যায়। কিন্তু এরপর কুরায় যা গোত্রের বসতির পশ্চাতে হাররা তে মদীনা থেকে আধ বেলার দূরত্বে বিপুল পরিমান জ্বলন্ত লাভা নির্গমন শুরু হয়। তখন লোকজন ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরপর সেই আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বিশাল পরিমাণ ধোঁয়া বের হতে থাকে এবং তা আকাশে উঠে সাদা মেঘের আকার ধারণ করে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজ করে। অতঃপর আগুনের লেলিহান শিখা আবার বিশাল উচ্চতা নিয়ে প্রকাশ পায় এবং তা ভয়াবহরূপ ধারণ করে। এ সময় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে মসজিদে নববীতে এবং রওযা শরীফে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা খালি মাথায় নিজেদের পাপ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতি মিনতি করে কান্নাকাটি করতে থাকে এবং নবীর দোহাই দিয়ে পরিত্রাণ চেয়ে থাকে। মদীনা ও তার আশাপাশ থেকে লোকজন সব মসজিদে নববীতে এসে জড়ো হয় এবং নারী ও শিশুরাও বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে এবং সকলে আঁটি দিলে আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করতে থাকে। এ সময় আগুনের লাভা গোটা আকাশ ছেড়ে ফেলে এবং চন্দ্রকিরণের ন্যায় মৃদু আলোর সৃষ্টি হয় আর লোকজন সকলেই তাদের ধ্বংস নিশ্চিত মনে করে। সকলে এরাত যাপন করে যিকর তিলাওয়াত এবং দুআ ও নামাযে এবং অনুনয় বিনয় করে বিগলিত তাওবা ইস্‌তিগফারে। দীর্ঘ এই আগুনের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। তবে ধীরে ধীরে তার বিস্তার ও অগ্নিশিখা হ্রাস পায়। এ সময় শহরের প্রধান ফকীহ ও কাযী আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে হিতোপদেশ দেয়। তখন তিনি প্রজাদের সকল কর-খাজনা মওকূফ করে দেন এবং তার সকল ক্রীতদাস দাসীকে আযাদ করে দেন এছাড়া জোরপূর্বক আমাদের এবং অন্যান্যদের না কিছু তার দখলে ছিল, তিনি তার সবই আমাদেরকে ফিরিয়ে দেন। আর এদিকে ঐ অগ্নুৎপাত অব্যাহত থাকে। এই আগ্নেয়গিরির ফলে সৃষ্ট অগ্নিশিখার উচ্চতা ছিল পাহাড় সমতুল্য এবং এর ব্যপ্তি ছিল একটি শহরের সমান। এই আগ্নেগিরির জ্বালামুখ থেকে পাথর কঙ্কর উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং তাতে পতিত হতে থাকে। এ সময় বজ্রধনির ন্যায় আওয়াজের সাথে পর্বততুল্য অগ্নিশিখা প্রকাশ হতে থাকে। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লাভা উদগিরণ শুরু হয় এবং লাভার-স্রোত আজালায়ন উপত্যকায় পৌছেল এমনকি তা হাররাতুল আরীয এর নিকটবর্তী হওয়ার উপক্রম হয়। এরপর এই আগ্নেয়গিরি কয়েকদিনের জন্য শান্ত হয়। এরপর আবার তাতে অগ্নুৎপাত শুরু হয় এবং তা পাথর ইত্যারি উৎক্ষেপন করতে থাকে। এমনকি তা পাথরের দুটি পাহাড়গম স্তূপ তৈরি করে ফেলল। এরপর তা আবারও অগ্নুৎপাত শুরু করে, আর প্রতিদিন ভোর রাত থেকে পূর্বাহ্নকাল পর্যন্ত তার শব্দ শোনা যেতে থাকে। এছাড়া আরও আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটা হলো অবস্থার অংশবিশেষের বর্ণনা। এখনও অবস্থা এমন, যেন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের অবস্থা বিরাজমান। আর তিনি যখন এই পত্র লেখেন, তখন এই অগ্নুৎপাতের বয়স এক মাস পূর্ণ হয়েছে এবং তার উৎস স্থান এখনও অভিন্ন রয়েছে।

এঘটনার বর্ণনা সম্বলিত কয়েকটি কবিতা পঙ্‌ক্তি হলো : "হে ঐ সত্তা! যিনি আমাদর অপরাধ মার্জনা করে। আমাদের বিপদ দূর করেন। হে আমাদের রব! আমাদের এক মহাবিপদ ঘিরে ধরেছে। আর আমরা আপনার কাছে এমন বিপদাপদের অভিযোগ করছি, যা বহন করার সাধ্য আমাদের নেই, যদিও আমরা তারই উপযুক্ত। এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প, যার কারণে বিশাল সব নিরেট পাথর প্রকম্পিত হতে থাকে।"

এই বিপর্যয় সাতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে সূর্যলোক নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অগ্নিসমুদ্রে লেন টিলা-নৌযান চলমান, যার নোঙর ডাঙায় প্রেথিত। তার উপরে যেন পর্বতসমূহ ভাসমান।"তা বিশাল বিশাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, যেন তা প্রচণ্ড বর্ষণশীল মেঘ। তার কারণে পাষাণের হৃৎপিণ্ডসমূহ হয়ে যায়, যখন তা ভয়ে শ্বাস ত্যাগ করে।

তার কারণেই আকাশে ধুঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে এমনকি তার কারণে সূর্য কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। আলবিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : এই আগুন সম্পর্কিত হাদীস বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যুহরী (র) সাঈদ এবন নুসায়্যিব (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন হিযায ভূমি থেকে এমন এক আগুনের দৃষ্টি হবে, যা বসরায় অবস্থিত উটপালের গর্দানসমূহ আলোকিত করে ফেলবে।" (এই শব্দমালা বুখারীর) আর আমরা যেমন উল্লেখ করলাম, এ ঘটনা এ বছর অর্থাৎ ৬৫৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়। আর দামিশকের প্রশাসক প্রধান কাযী সদরুদ্দীন 'আলী ইবতুল আবুল কাসিম তামীলী হানাফী একদিন। মুযাকারায় বা আলোচনায় আমাকে এটি অবহিত করেন। এ সময় এ ঘটনার কথা উল্লিখিত হয় এবং এ বছরের এই আগুনের বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বললেন : জনৈক আরব বেদুইনকে আমি আমার পিতাকে বুসরায় ঐ সকল রাতে বলতে শুনেছি যে, তারা ইজায ভূমিতে সৃষ্ট এই আগুনের আলোতে উটপালের গর্দানসমূহ দেখতে পান।

আল্-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬৪২ হিজরীতে। তার পিতা বুসরার হানাফী মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। তদ্রুপ তার পিতামহও এই মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি দামিশকে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানকার একধিক মাদরাসার শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি হানাফীদের প্রধান কাযী নিযুক্ত হন। বিচার কাজে রায় প্রদানে তিনি প্রশংসার পাত্র ছিলেন। হিজাযে যখন এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন তার বয়স ছিল বার বছর। আর তার বয়সী বালক শ্রবণকৃত খবর সংরক্ষণ করতে সক্ষম। আর তিনি এ খবর প্রদান করেন যে, বেদুইন আরব ঐ রাতগুরি সম্পর্কে আর পিতাকে অবহিত করেছে। এই হিজাযী আগুন এবং বাগদাদ শহর নিয়জিত হওয়া প্রসঙ্গে জনৈক কবি এই পঙ্ক্তিদ্বয় আবৃত্তি করেছেন : "পবিত্র ঐ সত্তা! সৃষ্টিকুলের মাঝে যার ইরাদা পরিমিতরূপে কার্যকর। তিনি যেমন বাগদাদকে পানি দ্বারা নিমজ্জিত করেছেন, তেমনিভাবে হিজায ভূমিকে আগুনে ভূস্মিভূত করেছেন।"

ঐতিহাসিক ইবনুস শাযী বলেন : এ বছর অর্থাৎ ৬৫৪ হিজরীর রজব মাসের ১৮ তারিখ শুক্রবার আমি ওযীরের সামনে বসা ছিলাম। তখন কীমায আলাভী হাসানী নামক জনৈক দূত মারফত তার কাছে মদীনা থেকে একটি পত্র আসে। অতঃপর দূত তাকে সেইপত্র প্রদান করলে তিনি তা পাঠ করেন। এই পনেরো ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ : জু'মাদাল অখিরা মাসের দু'তারিখ মঙ্গলবার মদীনায় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, এমনকি রওযায়ে নববীতে লোহার পরস্পর ঘষা খাওয়ার শব্দ শোনা গেছে এবং শিকলসমূহ প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। এছাড়া এ সময় মদীনার চার ফারসাখ দূরত্বে অগ্নুৎপাত সংঘটিত হয়েছে। এই অগ্নুৎপাতের ফলে বিশাল আকারে লাভা উদগীরণ ঘটেছে এবং তা পরের দিন অব্যাহত থেকেছে। অতঃপর পত্রবাহক দূত বলেন : আমি যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হই, তখনও এই অগ্নুৎপাত বন্ধ হয়নি, বরং তা

সক্রিয় ছিল। তখন ওযীর তাকে প্রশ্ন করেন : এই আগ্নেয়গিরি কোন দিকে লাভা উদগিরতা করছে? সে বলল : পূর্বদিকে। আমরা তা অতিক্রম করে এসেছি, অতিক্রমকালে আমরা তাতে খেজুরশাখা নিক্ষেপ করেছি, তবে তা জ্বলেনি। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম, তা পাথরকে জ্বালিয়ে গলিয়ে ফেলে। এ সময় ঐ ব্যক্তি জ্বলন্ত পাথরের একটা খণ্ড বের করে দেখাল তখন আমরা দেখলাম, তা বর্ণে ও ওজনে পাথুরে কয়লা সদৃশ্য। ইবনুস সায়ী বলেন : মদীনার কাযী লিখিত এই পত্রে একথাও ছিল যে, যখন ভূমিকম্প দেখা দেয়, তখন তারা সকলে হারামে নববীতে আশ্রয় নেয় এবং খোলা মাথায় আল্লাহ্র কাছে তাওবা-ইসতিগ্ফারে মগ্ন হয়। এ সময় মদীনার গভর্নর তার সকল দাসদাসী আযাদ করে দেয় এবং অন্যায়ভাবে গৃহীত সকল হক ও দায় থেকে মুক্ত হয়। এভাবে তারা তাওবা ইস্তিগফার অব্যাহত রাখলে অবশেষে ভূমিকম্প থেমে যায়। তবে অগ্নুৎপাত বন্ধ হলো না। আর এই দূত যখন আমাদের কাছে আগমন করে তখন এই ভূমিকম্পও অগ্নুৎপাতের বয়স পনেরো দিন এবং এখনও তা অব্যাহত আছে।

ইবনুস সায়ী বলেন : আমি মসজিদে নববীর শায়খ মাহমূদ ইবন্ য়ূসুফ ইবন্ আমআনীর নিজ হাতে লেখা পত্র পাঠ করেছি। এই পত্রে তিনি বলেন : হিজায ভূমিতে সৃষ্ট এই আগুন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার বিরাট নিদর্শন এবং এবং সঠিক ইঙ্গিত । সুতরাং সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে মৃত্যুর পূর্বে সুযোগ লুকে নেয় এবং আল্লাহ্র সাথে তার সম্পর্ক সংশোধন করে তার বিষয় গুছিয়ে নেয়। আর এই অগ্নুৎপাত ঘটে তৃণ বৃক্ষ শূণ্য প্রস্তরময় ভূমিতে যার গলিত প্রস্তরময় লাভা প্রবাহিত হয়ে সবকিছুকে গ্রাস করে। এবং পরে এই লাভা জমাটবদ্ধ হয়ে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুসলমানদের জন্য শিক্ষার বিষয় এবং সকল জগৎবাসীর জন্য অনুগ্রহরূপে নির্ধারণ করুন। ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : এ বছর রমযান মাসের শুরুতে জু'মুআর রাতে মদীনার মসজিদ জ্বলে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয় মসজিদের উত্তর পশ্চিম প্রাপ্ত থেকে। জনৈক ব্যক্তি সেখানে আগুন সাথে নিয়ে প্রবেশ করে, তখন দরজায় আগুন, লেগে সেখান থেকে আগুন দ্রুত ছাদে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মসজিদের ছাদের সবটুকুই জ্বলে যায় এবং ছাদের কয়েকটি স্তম্ভ খসে পড়ে এবং তার সীসা গলে পড়ে। এসবই সংঘটিত হয় মানুষ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে। এমনকি হুজরায়ে নববীর ছাদ পর্যন্ত জ্বলে যায়। আর ছাদ থেকে কিছু কিছু অংশ খসে পড়ে এবং তার ছাদ পুনরায় নির্মিত হওয়া পর্যন্ত সবকিছু এ অবস্থায়ই থাকে। পরদিন সকালে লোকজন স্বতন্ত্র স্থানে নামায আদায় করে। এই অগ্নিকাণ্ড যেন পরবর্তী বছরের ঘটনার আগাম সতর্কীকরণ ছিল। এটা শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামার ভাষ্য। আবূ শামা এ বছরে এবং তার পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে কবিতা পঙ্ক্তি রচনা করেন, তিনি বলেন : "৫৫৪ হিজরীর পর হিজায ভূমির আগুন প্রবাহিত হলো–তারই সাথে মসজিদে নববীর একাংশ পুড়ে গেল এবং দারুস সালাম 'অতঃপর তার পরের বছরেই শুরুতেই তাতারীরা বাগদাদ দখল করলো' আর তা ছির এমন বছর, যখন বাগদাদবাসীরা কোনো সাহায্য প্রাপ্ত হয়নি অথচ তাদের বিরুদ্ধে কুফুরীর অনেক সহযোগী ছিল, হায় ইসলাম এবং সেখান থেকে ইসরামী সম্রাজ্য বিলুপ্ত হলো, মুস্তা'সিন অসহায় হলো, সুতরাং হিজায ও মিশরের জন্য মমতা এবং শামের জন্য নিরাপত্তার কামনা। হে রব! আপনি নিরাপদ রাখুন, রক্ষা করুন, অব্যাহতি দিন অন্যান্য শহরকে, হে মহিমান্বিত, হে অনুগ্রহশীল!"

বাগদাদ শহরের অপর নাম

এর এ বছরই মাদরাসা নাসিরিয়্যার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। আর সেখানে তার ওয়াক্‌ফকারী প্রতিষ্ঠাতা সালাহুদ্দীন য়ূসুফ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ গিয়াসুদ্দীন গাযী ইবন্ নাসির সালাহুদ্দীন য়ূসুফ ইবন্ আয়্যুব ইবন্ শাদী সেখানে দারসে উপস্থিত হন। আর সেখানে দরস প্রদান করেন শহরের কাযী সদরুদ্দীন ইবন্ সানাউদ্দৌলা। তার এই দরসে দামিশকে আমীর উমারা, আলিম উলামা ও অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। আর এ বছরই কাসয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে 'নানিরী সরাইখানা' নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলো :

শায়খ ইমাদুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবন্ হাসান ইবন্ নাহ্হাস

লোক সাহচর্য বর্জন করে তিনি ইবাদত, তিলাওয়াত, যুহদ এবং ক্রমানয় রোযা পালনে মনোনিবেশ করেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলো উত্তম ব্যক্তি। মৃত্যুর পর তাকে তার মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে দাফন করা হয়, যা তার নামে প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক সাবত্ তার প্রশংসা করেছেন এবং আমাদের উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী তার মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেছেন ।

য়ূসুফ ইবন্ আমীর হুসামুদ্দীন

ইনি হলেন কাযওগলী ইবন্ 'আবদুল্লাহ ওযীর আওনুদ্দীন ইবন্ য়াইইয়া ইবন্ হুরায়রা হাম্বলী (রা)।

শায়খ শামসুদ্দীন

আবুল মুযাফফর হানাফী বাগদাদী, অতঃপর দামিশকী ইবন্ জাওযীর পৌত্র। তাঁর মাতা হলেন শায়খ জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আল্‌জওযীর কন্যা। তিনি ছিলেন সুদর্শন সুকণ্ঠের অধিকারী এবং উত্তম ওয়াজ নসীহতকারী একাধারে বহুগুণের অধিকারী এবং বহুগ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ খণ্ডের 'কালের দর্পণ' নামক গ্রন্থ। এগ্রন্থে তিনি তার পিতামহ সংকলিত 'আল্‌মুনতাযাম' এর কাব্যরূপ উপস্থাপন করেছেন এবং তার কলেবর বৃদ্ধি করে তাকে তার সময়কাল পর্যন্ত প্রবলম্বিত করে। আর তার এই গ্রন্থখানি ইতিহাসের অতি চমৎকার একটি গ্রন্থ। তিনি দামিশকে আগমন করেন ৬০০ হিজরীর দিকে এবং সেখানে তিনি আয়ূব বংশীয় শাসকদের কাছে সমাদৃত হন। তাঁরা তাকে অগ্রবর্তী করেন এবং তার প্রতি সদাচরণ করেন। প্রতি শনিবার সকালে তার ওয়াজ নসীহতের মজলিস অনুষ্ঠিত হতো। আর তা অনুষ্ঠিত হতো 'আলী ইবন্ হুসায়ন নায়নুল 'আবেদীনের কবর সংলগ্ন স্থানে, সেখানে আজকাল বক্তাগণ ওয়াজ নসীহত করে থাকেন। শ্রোতাদের অনেকে জামে দামিশকে শনিবার রাত যাপন করতো, এমনকি তারা গ্রীষ্মকালে তাদের বাগান উদ্যান পরিচর্যা বিধান রেখে আসত। তার ওয়াজ নসীহত শ্রবণ শেষ করে এরপর তারা তাদের উদ্যান পরিচর্যায় যেত এবং সেখানে গিয়েও তারা তার মূল্যবান উপদেশসমূহ পরস্পর আলোচনা করতো। এছাড়া বিশেষ একটি গম্বুজের নিচে তার কাছে শায়খ তাজুদ্দীন কিনদী এবং অন্যান্য মাশায়েখ সমবেত হতেন এবং তার মূল্যবান কথায় চমৎকৃত হতেন। এ ছাড়া তিনি দারুল মুআয্‌যনের উপতাদ আমীর ইযযুদ্দীন অটিবেক মুআযযমী নির্মিত মাদরাসায় দারস প্রদান করেন। আর এই ব্যক্তি হলেন আরেকটি মাদরাসার

প্রতিষ্ঠাতা ওয়াক্‌ফকারী, যার পূর্ব পরিচিতি ছিল 'ইবন্ মুনকিযের' বাড়িরূপে। এ ছাড়া আল্লামা সাব্‌তও মাদরাসা শিবলিয়্যাতে পাঠ দান করেন। তদ্রূপ মাদরাসা বদরিয়্যাও তার দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। আর এটাই ছিল তার আবাসস্থল এবং এ বছর জিলহজ্জ মাসের একুশ তারিখ মঙ্গলবার রাতে, তিনি এখানেই ইনতিকাল করেন। আর শহরের প্রশাসক নাসির ইবন্ আযীন এবং তৎপরবর্তী সকলেই তার জানাযায় উপস্থিত হন। 'আল্লামা শিহাবুদ্দীন আবূ-শামা আর জ্ঞান, গুণ, নেতৃত্ব, হিতোপদেশ, সুকণ্ঠ, চেহারার সজীবতা, বিনয়, ও দুনিয়া বিমুখতার প্রশংসা করেছেন। তবে তিনি তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি যে রাত্রে মৃত্যুবরণ করেন, আমি সে রাতে অসুস্থ ছিলাম ঘুম থেকে জাগার পূর্বে স্বপ্নে আমি তাকে মৃত দেখলাম, তখন আমি তাকে দুরাবস্থায় দেখতে পেলাম, আর আমি ব্যতিত অন্য একজনও তাকে দুরাবস্থায় দেখতে পেল। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে আমরা তার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি তার জানাযায় উপস্থিত হতে পারিনি। তার জানাযায় প্রচুর লোক সমাগম ঘটে। সেখানে সুলতান এবং প্রজাসাধারণ সকলেই উপস্থিত হন। তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। আর তিনি ছিলেন জ্ঞানী গুণী চৌকস বুদ্ধিমান নির্জনতা শ্রেয় ব্যক্তি। ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের গর্হিত কর্মের তিনি সমালোচনা করতেন। তার পোশাক ধেয় ছিল সাধারণ। অধ্যয়ন, গ্রন্থ-সংকলন এবং অন্যান্য কর্মে তিনি ছিলেন নিয়মানুবর্তি এবং অধ্যাবসায়ী। তদ্রূপ জ্ঞানী ও গুণীদের প্রতি সুবিচার এবং মূর্খদের পরিহারকারী। শাসক প্রশাসক এবং পদস্থ ব্যক্তিরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর তিনি শাসকবর্গের কাছে এবং সাধারণ মানুষদের কাছে বিশেষ মান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার ওয়াজ নসীহতের মজলিস ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আল্লাহ তাকে রহম করুন। হালবের শাসনকর্তা সুলতান নাসিরের আমলে একবার তাকে আশুরার দিন লোকদেরকে হযরত হুমায়ন (রা)-এর শাহাদতের কিছু ঘটনা উল্লেখ করতে বলা হয়। তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে দীর্ঘক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকেন। অতঃপর চেহারার উপর রুমাল রেখে তিনি অনেক কাঁদলেন, অতঃপর কেঁদে কেঁদে আবৃত্তি করলেন : "সর্বনাশ ঐ ব্যক্তির, যার সুপারিশকারীগণই হল তার প্রতিপক্ষ, যখন পুনরুত্থানকালে সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে।

সন্দেহ নেই মা ফাতিমা (রা) যখন কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবেন, তখন তার পরিধেয় জামা হুসায়নের রক্তের স্থিত থাকবে। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় সালেহিয়্যার পথে বাহনে আরোহণ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

চিকিৎসাকেন্দ্র সালিহিয়্যার ওয়াক্‌ফাকারী

বিশিষ্ট আমীর সায়ফুদ্দীন আবুল হাসান য়ূসুফ ইবন্ আবুল ফাওয়ারিস ইবন্ মূসাক কায়মারী কুরদী। তিনি ছিলেন কায়মারিয়্যার সবচে বড় আমীর। লোকজন তাকে বাদশার ন্যায় শ্রদ্ধা সম্মান করতো। তাঁর অন্যতম সুকীর্তি হলো কাসিয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। এই চিকিৎসাকেন্দ্রেই তিনি ওফাত লাভ করেন এবং সমাহিত হন। তিনি ছিলেন বিপুল পরিমাণ অর্থবিত্তের অধিকারী। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

মুজীরুদ্দীন য়া'কূব

ইনি হলেন সুলতান 'আদিল আবূ বকর ইবন্ আয়্যূবের পুত্র। তাকে আদিলিয়্যা কবরস্থানে তার পিতার পাশেই সমাহিত করা হয়।

আমীর মুযাফফরুদ্দীন ইবরাহীম

সরখাদ প্রশাসক ইযযুদ্দীন আইবেকের পুত্র যিনি ছিলেন দারুল মু'আয্যলের উস্তাদ এবং মাদরাসা বুরানিয়্যা এবং জু'আনিয়্যার ওয়াক্ফাকারী প্রতিষ্ঠাতা। তাকে তার পিতার কাছে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

শায়খ শামসুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন্ নূহ

ইনি হলেন শাফেয়ী শাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ এবং তাঁর শায়খ তাকীয়ুদ্দীন ইবন্ সালাহ-এর পর রওয়াহিয়্যা মাদরাসার শিক্ষক। তাকেও সূফিয়্যাতে সমাহিত করা হয়। তার জানাযায় প্রচুর লোকসমাগমণ ঘটে।

ঐতিহাসিক আবূ শামা বলেন : এই বছর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পায় এবং বহুসংখ্যক মানুষ এভাবে মৃত্যুবরণ করে। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন : যাকীয়ূদ্দীন আবুল গোরিয়্যা, বদরুদ্দীন ইবন্ শানী, যিনি ছিলেন অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, কাযী মামালুদ্দীন হারাসতানীর দৌহিত্রে ইযযুদ্দীন আব্দুল 'আদীয ইবন্ আবূ তালিব ইবন্ আব্দুল গাফফার ছা'লাযী এবন আবুল হুসায়ন। আল্লাহ্ তাদেরকে রহম করুন এবং তাদের সকলকে ক্ষমা করুন।

৬৫৫ হিজরীর সূচনা

এ বছরই মিশরের মহান সুলতান ইযযুদ্দীন আইবেক নিজগৃহে স্বাভাবিক স্তরে মৃত্যুবরণ করেন, যিনি তার উস্তাদ নাজিমুদ্দীন আয়্যূবের কয়েক মাস পর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এছাড়া এ বছর তূরণ শাহ মুসায্যম ইবন্ সীলহ শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। অতঃপর তার স্থলবর্তী রূপে শাজারাতুদ্দুর উম্মে খলীল তিন মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তাকে এবং তার সাথে সুলতান আশরাফ মূসা ইবন্ নাসির য়ূসুফ ইবন্ আকসীস ইবন্ কামিলকে একসাথে কিছুকালের জন্য শাসন কর্তত্ব অর্পণ করা হয়। এরপর তিনি একত্র শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন। আর সুলতান নাসির যখন মিশর দেশ দখল করতে যান তখন তিনি নাসিরকে পর্যুদস্ত করেন। এ ছাড়া তিনি ৬৪২ হিজরীতে বীর অশ্বারোহী ইকতাইকে হত্যা করেন। এরপর তিনি সুলতান আশরাফের আনুগত্য বর্জন করে এক শাসক কর্তৃত্বের অধিকারী হন। পরে যিনি উম্মে খলীলকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন মহানুভব, শাহসী লজ্জাশীল এবং ধার্মিক ব্যক্তি। আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের তেইশ তারিখ মঙ্গলবার। তিনি হলেন মিশরে অবস্থিত মাদরাসা মুয়িয্যিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকফকারী। তিনি যখন নিহত হন, তখন তার দাসদাসীগণ তার স্ত্রী উম্মে খলীলকে তার হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত করে। আর এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি না কি মাওসিলের শাসক বদরুদ্দীন লু'লুর কন্যাকে বিবাহ করার সংকল্প করেন। তখন উম্মে খলীল ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাঁদীদের নির্দেশ প্রদান করেন তাকে শক্তভাবে ধরে রাখার জন্য; আর তিনি তাকে তার খড়ম দ্বারা পেটাতে থাকেন। এমনকি আঘাতের তীব্রতায় একসময় তার মৃত্যু ঘটে। এদিকে ইয্যুদ্দীন আইবেকের গোলামরা যখন তাদের মনিবের এই মৃত্যুর কথা জানতে পারে, তখন তারা তাদের দলনেতা সায়ফুদ্দীন

কুতুবের সাহচর্যে আগমণ করে এবং উম্মে খলীলকে হত্যা করে এবং তাকে বেপর্দা অবস্থায় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে চলে যায়। অথচ জীবদ্দশায় তিনি কঠোর পদস্ত বিরাট মর্যাদার অধিকারীনী ছিলেন। এমনকি তার নামে খুৎবাও প্রদান করা হয়েছে এবং টাকশালের মুদ্রাতেও তার সিলমোহর অঙ্কিত ছিল। কিন্তু এরপর আর তার কোন কিছুর অস্তিত্ব রইলো না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ্র বর্ণনা : "বল! হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমরই হাতে। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–এ ঘটনার পর তুর্কীরা তাদের উসতাদ ইয়যুদ্দীন আইবেকের মৃত্যুর পর তার প্রধান গোলাম সায়ফুদ্দীন কুতুবের ইঙ্গিতে তার পুত্র নূরুদ্দীনকে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে তাকে "আলমালিক আল্‌মানসূর" "সাহায্য প্রাপ্ত শাসক" উপাধি প্রদান করে, এ সময় মিম্বরসমূহে তার নামে খুৎবা প্রদান করা হয় এবং টাকশালের মুদ্রায় তার নাম খোদিত করা হয় এবং তার ইরাদা ও ইচ্ছানুযায়ী সকল বিষয়াদি পরিচালিত হতে থাকে।

এছাড়া এ বছর বাগদাদে রাফেযীদের মাঝে এবং আহলে সুন্নতের মাঝে বিরাট ফিত্না ও গোলযোগ সংঘটিত হয়। এ সময় কারাখ শহর লুণ্ঠিত হয়। বিশেষত রাফেযীদের বাড়ি-ঘর এমন কি ওযীর ইবনুল আল্‌কামীর নিকটাত্মীয়দের বাড়ি-ঘরও লুণ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে তাতারীদের সাথে যোগসাজেসের পিছনে এটা ছিল বড় একটি কারণ। এ ছাড়া এ বছরই হায়দারী গরীবরা সাথে প্রবেশ করে। তাদের প্রতীক ছির বিশেষ ধরনের পোশাক, ছোট দাড়ি এবং বড় গোঁফ। অথচ এটা সুন্নতের পরিপন্থী। তারা এরূপ করে তাদের গুরুর অনুসরণে। তাদের গুরু হায়দারকে যখন নাস্তিকরা বন্দি করে, তখন তারা তার দাঁড়ি ছেটে দেয় এবং গোঁফ রেখে দেয়। এরপর তারাও তার অনুকরণে এরূপ করে। অথচ তিনি তো ছিলেন নিরূপায় এবং ছাওয়াবের অধিকারী, আর আল্লাহ্র রাসূলতো এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। মাদরাসা আওনিয়ার কাছে দামিশকের উপকণ্ঠে তাদের জন্য একটি খানকা নির্মাণ করা হয়। জিলহজ্জ মাসের আঠার তারিখে বুধবার মাদসারা বাদ্‌রহিয়্যার ওয়াক্‌ফকারী, নিযানিয়্যা মাদরাসার শিক্ষক শায়খ নাজমুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ বাদরাঈ বাগদাদীর উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং গুরুতর অবস্থাসমূহের প্রতিবারে খলীফার দূতরূপে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও প্রশাসকদের দরবারে গমন করবেন। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন গুণী নেতৃস্থানীয়, ভাবগম্ভীর এবং বিনয়ী। আমীর উসামার বাস গৃহের স্থানে দামিসকে তিনি একটি সুন্দর মাদরাসা গড়ে তোলেন। সেখানে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি অবিবাহিত এবং অন্য কোনো মাদরাসায় ফকীহ না হওয়ার শর্ত আরোপ করেন। এশর্ত দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছির ইলম তলকে যেন ফকীহর পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু এ কারণে অনেকের অনেক ক্ষতি হয়। আমাদের শায়খ শানে শাফেয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট শীর্ষ আলিম আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ শায়খ তাজুদ্দীন ফাযারী ছিলেন এই মাদরাসার শিক্ষক এবং শিক্ষকপুত্র।

উল্লিখিত আছে যে মাদরাসার প্রথম পাঠ প্রদানের দিন যখন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকফকারী এবং সুলতান নাসির উদ্দিন উপস্থিত হন, তখন ওয়াকফের বিভিন্ন শর্ত পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে ছিল : সেখানে কোনো স্ত্রীলোক প্রবেশ করবে না। তখন সুলতান বলেন : এবং কোন শিশুও না। একথা শুনে ওয়াকফকারী বলে উঠেন : মহামান্য সুলতান! আম্‌াদের রব তো দুই লাঠি দ্বারা আঘাত করেন না। তিনি যখন এই ঘটনা উল্লেখ করলেন, তখন মৃদু হাসলেন। তিনি ছিলেন এই মাদরাসার প্রথম শিক্ষক। অতঃপর ছিলেন তার পুত্র কামালুদ্দীন আর তার তত্ত্বাধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় ওয়াজিহুদ্দীন ইবন্ সুওয়ায়দের উপর অতঃপর এখনও পর্যন্ত তা তার বংশধরদের মাঝে বিদ্যমান আছে কখনও কখনও তার দেখাশোনার বা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ ছাইগ। অতঃপর তার থেকে সে দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়। শায়খ বাদরাঈ এই মাদরাসার জন্য একাধিক স্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করেন এবং তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থের ভাণ্ডার দান করেন। এ বছর বাগদাদে ফিরে আসেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রধান কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি সতেরো দিন অবস্থান করেন। অতঃপর এ বছর জিলহজ্জ মাসের শুরুতে তিনি ইনতিকাল করেন। আর তাকে দাফন করা হয় মোইনযিয়্যা নামক করবস্থানে। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। শায়খ বাদরাঈর মৃত্যুর কয়েকদিন পর এবছর জিলহজ্জ মাসে তাতারীরা বাগদাদ আক্রমণ করে। তারা এই আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের সম্রাট হালাকু খানের অগ্রবর্তী বাহিনীরূপে। আর হালাকু খান হল চেঙ্গিসপুত্র তোলাই খানের পুত্র। আর তারা বাগদাদ জয় করে এবং সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পরবর্তী বছরের শুরুতে যার বিশদ বিবরণ সামনে আসছে। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন : দামিশকের মাদরাসা বাদরাইয়্যার ওয়াকফ্কারী, যার বিষয়ই পূর্বে গত হয়েছে।

শায়খ তাকীয়ুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন্ আবূল ফাহম

এই ব্যক্তি এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে দামিশকে ইনতিকাল করেন এবং সেখানে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন নেককার আলিম এবং হাদীসের শ্রবণ লিখন ও পাঠদানের মশগুল ব্যক্তি। তিনি প্রায় একশ বছর জীবিত ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত হাদীসের সাথে তাঁর এই ত্রিমুখী সম্পর্ক বহাল ছিল। তার নিজ হাতে লেখা অধিকাংশ গ্রন্থ ও সংকলন তিনি ওয়াকফ করে যান। কালাসার ফাযিলিয়্যা সংগ্রহ শালায় একবার স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখে তিনি বলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো ভাল লোক নই। উত্তরে তিনি বলেন : অবশ্যই তুমি ভাল লোক। আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং সসম্মানের রাখুন।

শায়খ শারাফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ আবুল ফযল আলমাসাসী

তিনি ছিলেন গুণবান শায়খ নিপুণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অধিকারী এবং বহুবার হজ্জ পালনকারী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার সংগ্রহে ছির বহু মূল্যবান গ্রন্থ। অধিকাংশ সময় তিনি হিজাযে অবস্থান করতেন। আর সেখানেই তিনি অবস্থান গ্রহণ করতেন, সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আর তিনি তাদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি যা'কা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আমীর সায়ফুদ্দীন

ইনি হলো আলী ইবন্ উমর ইবন্ কযাল। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কবি তার একটি প্রসিদ্ধ দীওয়ান বা কাব্য সংকলন রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আবৃত্তি করে "আমাকে কবরের সংকীর্ণতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর আমার আশঙ্কা ছিল যে, আমার পাপসমূহ আমাকে হোঁচট খাওয়াবে।

কিন্তু আমি এমন এক দয়াময় ও করুণাময়ের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যিনি আমাকে দান করেছেন বহু উপকরণ, নিরাপত্তা ও মুখ স্বাচ্ছন্দ্যের। আর মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র ক্ষমা সম্পর্কে যে সুধারণা পোষণ করবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ক্ষমা অধিক কার্যকর।"

বাশারা ইবন্ 'আব্দুল্লাহ্

ইনি হলেন শিবলুদৌলা আলমু'আয্যমীর মাওলা কাতিব বাদরুদ্দীন। তার আদি নিবাস হলো আর্মেনিয়া। তিনি কিন্‌দী ও অন্যাদের থেকে শ্রবণ করেন। তার হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তার মনিব তাকে তার ওয়াকফ সম্পত্তিসমূহ দেখা শোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তার বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই দায়িত্ব পালন করেন। আজও তাদের এ দায়িত্ব বহাল আছে। এ বছর রমযান মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ইনতিকাল করেন।

কাযী তাজুদ্দীন

প্রধান কাযী জামালুদ্দীন মিশরীর পুত্র আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ। তিনি তার পিতার স্থলবর্তী হন এবং মাদরাসা মানিয়্যাতে পাঠ দান করেন। তার রচিত অন্যতম দুটি কবিতা পঙ্‌ক্তি হলো :

"আমি চুম্বন দ্বারা তার ওষ্ঠস্পর্শ করে অমৃত সুধায় চুমুক দিয়েছিলাম। তখন সে দূরে সরে গিয়ে বলে উঠলো : তুমি ফিক্‌হের ইমাম, আর আমার মুখের লালা হলো শরাব, আর শরাব তো তোমার কাছে অস্পৃশ্য।

সুলতান নাসির

ইনি হলেন দাউদ ইবন্ মুআযযম ইবন্ 'আদিল তিনি তার পিতার মৃত্যুর পর দামিশকের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। অতঃপর তার হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। তার পিতৃব্য সুলতান আশরাফ তার থেকে দামিশকের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন এবং তিনি তখন শুধু কারক ও নাবলূসের শাসন কর্তারূপে বহাল থাকেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন অবস্থার শিকার হন এবং কালের আবর্তনে তার শাসন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এছাড়া খলীফা সুলতান মিরের কাছে তিনি যে এক লক্ষ দীনারের আমানত গচ্ছিত রাখেন। তা তিনি অস্বীকার করেন এবং তাকে আর তা ফিরিয়ে দেননি। তিনি যেমন ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, তেমনি সুকবি এবং বহুগুণের অধিকারী। আর তিনি ইমাম ফাখর রাযীর শিষ্য শামস্ খাসরুশাহীর কাছে 'ইলমে কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু কথা বর্ণিত আছে, যা তার মন্দ আকীদার ইঙ্গিত বহন করে। আর এ বিষয়েয় আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ৬৩২ হিজরীতে মাদরাসা সুলতান সিরিয়্যাতে উদ্বোধনী দরসে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কবিরা খলীফা মুস্‌তান্‌সিরের প্রশংসায় বহু কবিতা আবৃত্তি করে। জনৈক কবি তার কাসীদায় বলেন : আপনি যদি "সাকীফার দিন উপস্থিত থাকতেন, তাহলে আপনিই হতেন অগ্রবর্তী এবং "বড় নেতা"।

একথা শুনে সুলতান নাসির সেই কবিকে বললেন, চুপ কর "তুমি তো ভুল বলেছ।" সেদিন তো খলীফার প্রপিতামহ "আব্বাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর সেদিন তো আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ অগ্রবর্তী ও বড় নেতা ছিলেন না।[১] একথা শুনে খলিফা বললেন : তুমি সত্য বলেছ। এটা তার নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যা কিছু তার সর্বোত্তম বিষয়। তার কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং অবশেষে নাসির ইবন্ আযীল তার বিরুদ্ধে তার পিতৃব্য মাজদুদ্দীন য়া'কূবের অনুকূলে 'বয়ায়যা' নামক বসতির কর্তৃত্বের ফরমান জারী করেন আর তিনি এ বছর এখানেই ইনতিকাল করেন। তার জানাযায় বহু মানুষের সমাগম ঘটে। জানাযার নামায শেষে তাকে কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয়।

সুলতান মু'ইয্

ইয়মুদ্দীন আইবেক তুর্কমানী, প্রথম তুর্কী সুলতান, এই ব্যক্তি চিলেন সুলতান সালিহ নাজমুদ্দীন আয়ূব ইবন্ কামিলের আযাদকৃত দাসদের প্রধান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ চরিত্রবান এবং মহানুভব। তিনি সাত বছরের মত রাজ্য শাসন করেন। অতঃপর তার স্ত্রী উম্মে খলীল তাকে হত্যা করে। তারপর শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন তার পুত্র নূরুদ্দীন আলী এবং তিনি মানসূর উপাধি প্রাপ্ত হন। তার রাজ্যের প্রকৃত পরিকল্পনাবিদ ছিলেন তার পিতার দাস সায়ফুদ্দীন কুতুব। অতঃপর তিনি তাকে অপসারণ করে এক বছরের মত সময় একক কর্তৃত্বে শাসন পরিচালনা করেন এবং 'মুযাফফর' উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তার আয়নে জালূত নামক স্থানে তাতারীদের পরাজয় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। আর আমরা পূর্বে এ সবের বিশদ বর্ণনা দিয়েছি।

শাজারাতুদ্দুর বিনত 'আবদুল্লাহ

উম্মে খলীল তুর্কী। তিনি ছিলেন সুলতান নাজমুদ্দীন আয়্যূবের অন্যতম প্রিয়পাত্রী। নাজমুদ্দীনের ঔরসে তাব গর্ভপাত পুত্র খলীল ছিল অত্যন্ত সুদর্শন। কিন্তু সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। উম্মে খলীল সর্বক্ষণ তার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। তার প্রতি তীব্র ভালবাসার কারণে প্রবাসে সর্বাবস্থায় তিনি তার সাহচর্য অবলম্বন করতেন। তার স্বামীর পুত্র তূরান শাহের মৃত্যুর পর তিনি মিশরীয় ভূখণ্ডের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। এ সময় বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয় এবং টাকশাল থেকে তার নাম খোদিত মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। এরপর সুলতান মুয়িয শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর মিশর দেশের কর্তৃত্ব লাভের কয়েক বছর পর তিনি তাকে বিবাহ করেন। অতঃপর উম্মে খলীল যখন জানতে পারে যে, তার স্বামী মাসিলের শাসক বদরুদ্দীন লু'লুর কন্যাকে বিবাহ করতে চায়, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং কৌশলে তাকে হত্যা করে। যেমন পূর্বে গত হয়েছে। অতঃপর তার স্বামীর গোলামরা তাকে হত্যা করে ময়লার স্তূপে নিক্ষেপ করে। তিনদিন সেখানে নিক্ষিপ্ত থাকার পর তাকে সায়্যিদা নাফীসার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

উম্মে খলীল ছিল শাওমনের অধিকারিনী। সে যখন জানতে পারল, যে তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, তখন সে তার কাছে বিদ্যমান অনেক মূল্যবান মনি-মানিক্য নষ্ট করে ফেলে। এগুলি সে হামান দিস্তার সাহায্যে চূর্নবিচূর্ণ করে ফেলে। আর উম্মে খলীলের শাসন ব্যবস্থার ওযীর ছিল বাহাউদ্দীন 'আলী ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ সুলায়মান।

---

[১] নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর যে দিন সাহাবায়ে কিরাম সমবেত হয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) যে খলিফা মনোনীত করেন।

শায়খ হিবাতুল্লাহ ইবন্ সা'দ শারাফুদ্দীন আল্‌ফায়যী

তার ফাযযী উপাধির কারণ, তিনি ইতোপূর্বে সুলতান ফাযয সাবিকুদ্দীন ইবরাহীম ইবন্ সুলতান 'আদিলের খিদমতে ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অতি উদার প্রকৃতির বদান্য ও দানশীল ব্যক্তি। সুলতান মুইয্ তাকে ওযীর নিয়োগ করেন। তিনি তার কাছে অতি সমাদৃত ছিলেন। তার সাথে পরামর্শ ব্যতিত তিনি কোন কিছুই করতেন না। তার পূর্বে ওযীর ছিলেন তাজুদ্দীন। আর তার পূর্বে ছিলেন কাযী বদরুদ্দীন সান্‌জারী। অতঃপর এসব কিছুর পর এই শায়খ আস্‌আদ মুসলমানী এই দায়িত্ব লাভ করেন। আর এই ফাইযীর সাথে দাস মুইয্-এর পত্রালাপ ছিল। অতঃপর যখন সুলতান মুইয নিহত হন, এখন ওযীর আসআদকে অপদস্থতার শিকার হতে হয়। এ সময় আমীর শায়ফুদ্দীন কুতুয এক লক্ষ দীনারের বিনিময়ে তার খত্ নিয়ে নেন। কবি বাহাউদ্দীন এবন যুহায়র ইবন্ 'আলী তার নিন্দায় আবৃত্তি করেন : আল্লাহ্ সাঈদকে তার পিতৃপুরুষদের অভিশপ্ত করুন তার অধস্তনদেরকে একজন একজন করে।

এসব কিছুর পর তিনি নিহত হন এবং কারাফাতে সমাহিত হন। কাযী নাসিরুদ্দীন ইবন্ মুনীর তার শোকে কবিতা রচনা করেন। এ ছাড়া তার প্রশংসায়ও তিনি একাধিক চমৎকার কবিতা রচনা করেন।

ইরাকী কবি ইবন্ আবুল হাদীস

আব্দুল হামীদ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হুমায়ন আবূ হামিদ ইবন্ আবুল হাদীস ইয্‌যুদ্দীন আল্‌মাদায়েনী, তিনি ছিলেন কট্টর শিয়া কবি ও লেখক। তার সংকলিত 'নাহ্‌জুল বালগো' গ্রন্থের ব্যাখ্যা। বিশ খণ্ডে রচিত। তিনি ৫৮৬ হিজরীতে মাদায়েনে জন্মগ্রহন করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে বাগদাদ গমন করেন, পরে দীওয়ানে খিলাফতের একজন কবি ও লেখকরূপে সমাদৃত ছিলেন। কেননা তাদের উভয়ের মাঝে শিয়া হওয়া কাব্য সাহিত্যচর্চা এবং মহৎগুণের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ মিল, নৈকট্য ও সাদৃশ্য ছিল। ঐতিহাসিক ইবনুস সায়ী তার অনেক প্রশংসাকাব্য এবং অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানে ও গুণে তিনি তার ভাই আবুল সা'আলী মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবন্ হিবাতুল্লাহর তুলনায় অধিক জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ছিলেন। অবশ্য তার ভাইও বেশ গুণী ও কুশলী ব্যক্তি ছিলেন। আর তারা উভয়ে এ বছর ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাদের দুজনকে রহম করুন।

৬৫৬ হিজরীর সূচনা

এ বছরই তাতারীর বাগদাদ দখল করে এবং তার অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করে–এমন কি তারা খলীফাকেও হত্যা করে এবং বাগদাদ থেকে আব্বাসীয় শাসন কর্তৃত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এ বছর যখন সূচিত হয়, তখন তাতারী বাহিনী হালাকু খানের নেতৃত্বে বাগদাদের উপকণ্ঠে অবস্থানরত। এ সময় তাতারীয়া বাগদাদবাসীর বিরুদ্ধে মাওসিলের শাসকের সার্বিক সহযোগিতা লাভ করে। তার পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ রসদ ও উপহার উপঢৌকন তাদের কাছে পৌছে, এ সবই করা হয় তাতারীদের থেকে আত্মরক্ষার্থে তাদেরকে তোষামোদ করে। এ সময় বাগদাদ শহরের চারদিকে প্রতিরক্ষা বুৎহ রচনা করা হয় এবং শহরের চতুর্দিকে মিনজানীক বা প্রস্তর

নিক্ষেপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়। কিন্তু আল্লাহর বিধানে তাকদীরে কোন পরিবর্তন নেই। যেমন বর্ণিত আছে "ভাগ্যের মোকাবিলায় সতর্কতা ও সাবধানতা কোন কাজে আসে না।" এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বলেছেন : إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ "আর আল্লাহ্র নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে, তা বিলম্বিত হয় না।"

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ۔

অর্থ : আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ অশুভ ইচ্ছা করলে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতিত তাদের কোন অভিভাবক নেই।"

এরপর তাতারীরা দারুল খিলাফত চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং চারদিকে তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে, এমন সময় হঠাৎ এক তরুণী বাঁদী তীর বিদ্ধ হয়। এ সময় সে খলীফার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল। আলফা নামের এই বাদীটি ছির খলীফার প্রিয়পাত্রী। খলীফার সামনে নাচতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ জানালার কোনো ফাঁক দিয়ে একটি তীর আঘাত করে তাকে হত্যা করে। এ ঘটনায় খলীফা ভীষণ ঘাবড়ে যান এবং যারপর নাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি বাদীকে আঢ়াতকারী তীরটি তার সামনে উপস্থিত করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে : "আল্লাহ্ যখন তার ফয়সালা কার্যকর করতে চান, তখন তিনি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিলোপ করেন।" তখন খলীফা দারুল খিলাফতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দেন এবং সেখাতে দরজা জানালায় আরও অধিক সংখ্যক পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

হালাকুখান তার সকল যোদ্ধা নিয়ে এ বছর মুহাররম মাসের বারো তারিখে বাগদাদ আক্রমণ করেন। তার যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষের মত। আর খলীফার প্রতি তার চরম আক্রোশ ছিল। কেননা, ইতোপূর্বে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা এই আক্রোশের জন্ম দিয়েছিল। যেমন হালাকু যখন প্রথমবার হামাদান থেকে ইরাক অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন খলীফার ওযীর মুআয়্যাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ আলকামী খলীফাকে পরামর্শ দেন যে, হালাকু খানের সঙ্গে মুল্যবান কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করতে, তাহলে হয়তো তিনি সৌজন্য রক্ষার খাতিরে সহসা বাগদাদ আক্রমণ করবেন না। কিন্তু খলীফার একাধিক একান্ত সহচর তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে বলে : তাতারীরা উৎকোচগ্রহণ করে ওযীর এই প্রস্তাব করেছেন, এসময় তারা খলীফাকে সামান্য কিছু পাঠানোর পরামর্শ দেয়, ফলে খলীফা সামান্য কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তখন হালাকু খান তাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন এবং এ ব্যাপারে খলীফার প্রধান দুই পরামর্শক দওয়ায়দারা এবং সুলায়মান শাহকে তার দরবারে ডেকে পাঠান। কিন্তু খলীফা তাদেরকে পাঠাননি।

এরপর হালাকু খাঁ তার বিরাট সংখ্যক অত্যাচারী ও পাপাচারী যোদ্ধা নিয়ে বাগদাদ অবরোধ করে। এ সময় তারা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে বাগদাদ ঘিরে ফেলে। অথচ বাগদাদ রক্ষাকারী মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যাছিল সামান্য সংখ্যক মাত্র দশ হাজার অশ্বারোহী। এরা ছিল মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্ট সদস্য। এছাড়া অন্য সকলকে তাদের জায়গীর ও অন্যান্য সুবধিা থেকে

বঞ্চিত করা হয় এমনকি তাদের অনেককে বাজারে এবং বিভিন্ন মসজিদের বাইরে দানপ্রার্থনা করতে দেখা যায়। কবিরা তাদের দুরাবস্থার বিবরণ দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন এবং তাদের জন্য এবং সৈন্যদের জন্য শোকবেদনা প্রকাশ করেছেন, আর এ সবই ঘটেছিল ওযীর ইবন্ আল কামীর পরামর্শে। আর তার এই ভূমিকার জন্য দায়ী ছিল পুর্ববর্তী বছর, যখন তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও রাফেযীদের সাথে এক বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় কারখ শহর লুণ্ঠিত হয় এবং রাফেযীদের মহল্লা লুণ্ঠিত হয়। এমনকি ওযীর ইবন্ আল কামীর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘরও লুণ্ঠিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে তার আক্রোশ বৃদ্ধি পায় এবং এরই রেশ ধরে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম চক্রান্তে লিপ্ত হয়। বাগদাদ শহরের গোড়াপত্তনের পর থেকে এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা কখনও শোনা যায়নি। আর এর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সে সর্বপ্রথম তার পরিবার পরিজন ও সহচর অনুচরদের নিয়ে হালাকু খাঁর সাথে আঁতাত করে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করুন। অতঃপর সে ফিরে ক্রমে খলীফাকে পরামর্শ দেয় তার সাথে সাক্ষাত করে ইরাকের অর্ধেক খারাপের বিনিময়ে তার সাথে সন্ধি করতে, তখন বাধ্য হয়ে খলীফা সাতশজন বিশিষ্ট অশ্বারোহী ব্যক্তি হালাকু খাঁর সালে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হন। এদের মধ্যে ছিল কাযী, ফকীহ, সুফী, নেতৃতস্থানীয় আলিম ওলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর এরা যখন সম্রাট হালাকু খাঁব অবস্থান স্থলের নিকটবর্তী হয় তখন মাত্র সতেরো জন ব্যতীত সকলের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। তখন খলীফা এদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। আর অবশিষ্টদের তাদের বাহন থেকে নামিয়ে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে সকলকে হত করা হয়। এরপর খলীফাকে হালাকু খাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে হালাকু খাঁ তাকে অনেক কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলা হয় যে, এসময় খলীফা হালাকু খাঁর প্রতাপ প্রতিপত্তি এবং নিজের অপমানজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার দেখা এলোমেলো করে ফেলেন। এরপর খলীফা খাজা নাসীরুদ্দিন তুগী এবং ওযীর ইবন্ আলকামী ও অন্যান্যদের সাথে ফিরে আসেন। পরে তিনি প্রহরাধীন অবস্থায় দারুল খিলাফত থেকে বিপুল পরিমান স্বর্ণ অলংকারাদি, মণিমাণিক্য এবং মুল্যবান দ্রব্যসামগ্রি হালাকু খাঁর কাছে পেশ করেন। কিন্তু রাফেযীদের ঐ গোষ্ঠী এবং অন্যান্য বিশ্বাঘাতক মুসলমান হালাকু খাঁকে খলীফার সাথে সন্ধি না করার পরামর্শ প্রদান করে। ওযীর আলকাদী তাকে একথা বোঝায় যে, অর্ধেক কর খাজনার ভিত্তিতে সন্ধি হলে এটা এক দুই বছরের বেশী স্থায়ী হবে না এবং তারপর সবকিছু পুর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এভাবে তারা তাকে খলীফাকে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়। আর যখন খলীফা সম্রাট হালাকুর কাছে ফিরে আসে, তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। বলা হয় যে, খলীফাকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিল ওযীর ইবন্ আলকামী এবং নাসীরুদ্দীন তুসী। আর এই নাসীরুদ্দীন পূর্ব থেকেই হালাকু খাঁর কাছে ছিল। হালাকু যখন ইসমাইলীদের হাত থেকে 'তালামৃত' দুর্গ জয় করেন, তখন তিনি তাকে তার সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেন। আর এই নাসীর সুলতান শামসুস্ সুমুসের এবং তারপূর্বে আলাউদ্দীন ইবন্ জালালুদ্দীনের ওযীর ছিলেন, আর তাদেরকে সম্পকৃত করা হতে নিযার ইবন্ মুস্তানসির উবায়দীর সাথে, আর সম্রাট হালাকু খাঁ নাসীরকে গ্রহণ করেছিলেন তার উপদেষ্টা ওযীর রুপে। অতঃপর হালাকু খাঁ যখন বাগদাদ আগমন করে এবং খলীফাকে হত্যা করার ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করে, তখন এই ওযীর নাসীরুদ্দিন তার কাছে

বিষয়টিকে সহজভাবে তুলে ধরে এবং খলীফাকে তারা একটি চটের বস্তায় ভরে নির্মমভাবে লাথি দিতে দিতে হত্যা করে, যেন কোনো রক্তপাত না ঘটে। আবার কেউ কেউ হলেন, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। আর সঠিক বিষয় আল্লাহই ভাল জানেন। এভাবে তারা খলীফাকে হত্যার এবং তার সাথে যে সকল আলিম-উলামা, কাযী, আমীর ও নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাদের সকলকে হত্যার পাপের অংশীদার হয়েছিল। এ সময় তাতারীবাহিনী বাগদাদে পাইকারীভাবে গণহত্যা চালায়। নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কেউই তাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

এ সময় বহু মানুষ কুপ ও গবাদিপশুর খোঁয়াড় ইত্যাদি স্থানে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। কোথাও কোথাও এমন হয় যে, লোকজন বিরান বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, এরপর তাতারীরা সেই দরজা ভেঙে জ্বালিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে। তারা যখন বাঁচার উদ্দেশ্যে ছাদে আশ্রয় নেয়, তখন তাতারীরা সেই ছাদেই পৈশাচিক ভাবে তাদেরকে হত্যা করে। এমনকি নিহতদের প্রবাহিত রক্ত ছাদ থেকে গড়িয়ে অলিতে গলিতে প্রবাহিত হয়। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তদ্রুপ একই ঘটনা ঘটে মসজিদ ও মুসাফির খানা সমুহে। যিল্লী রাহুদীও খ্রিষ্টান ব্যতীত কেউ তাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। তবে যারা তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল অথবা ওযীর ইবন্ আলকামীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা অবশ্য নিস্তার লাভ করেছিল। আর নিস্তার লাভ করেছিল একদল ব্যবসায়ী, যারা বিপুল ধনসম্পদের বিনিময়ে নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তা খরীদ করে নিয়েছিল।

এভাবে জনাকীর্ণ শহর বাগদাদ পরিণত হয়েছিল বিরাট মৃত্যুপুরীতে। আর এর বাসিন্দারা ছিল এ ভাষণ ভীতি, ক্ষুধা অনাহার ও অপদস্থতার শিকার, এই তাতারীরা আক্রমণের পূর্বে ওযীর ইবন্ আলকানী মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধার সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা করতেন। খলীফা মুসতানসিরের শাসনকালে মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধা সংখ্যা ছিল প্রায় একলক্ষ, এদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট আমীর উমারাগণ। কিন্তু এই ওযীর তার নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সংখ্যা হ্রাস করতে করতে দশ হাজারে নামিয়ে আনেন। এরপর তিনি তাতারীদের সাথে পত্র-বিনিময় করেন এবং তাদেরকে বাগদাদে দখলে প্ররোচিত করেন। তাদের কাছে মুসলিম বাহিনীর দুর্বল দিকগুলি তুলে ধরেন এবং বিষযটিতে তাদের জন্য অতি সহজ কাজ রুপে পেশ করেন। আর তিনি এসব করেন সহীহ সুন্নাতকে অপসারণ করে তদস্থলে রাফেযী বিদআতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তদ্রুপ ফাতেমীদের একজন খলীফারুপে নির্ধারণ করে আলিম উলামাদের কর্তৃত্ব বিনাশ করতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কর্তৃত্বে প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি তার চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিন এবং বিরাট মর্যাদা লাভের পর তাকে হীন অপদস্থ করেন। খলীফাদের উযীর থাকার পরে তাকে তাতারীদের চাটুকার পরিণত করেন এবং বাগদাদে সংঘটিত গণহত্যার পাপের প্রধান ভাগীদারে পরিণত হন, আর চুড়ান্ত ফয়সালা হলো আসমান যমীনের রব সুমহান আল্লাহর।

বাগদাদে সংঘটিত এই ঘটনা বায়তুল মাকদিসে বাণূ ইসরাঈলের ব্যাপারে সংঘটিত ঘটনার কাছাকাছি বিবেচনা করা যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔

অর্থাৎ "আর আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম যে, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি কর এবং তোমরা অতিশয় অহঙ্কার স্ফীত হত। আর এ দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে যারা যুদ্ধে অতি শক্তিশালী তারা ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু তছনছ করে ফেলেছিল। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়ে থাকে।" কেননা, সে সময় বনী ইসরাইলের অনেক নেককার মানুষ নিহত হয়েছিল এবং অনেক নবীদের সন্তান বন্দি হয়েছিলেন। আবিদ যাহিদ, যাজক সাধক এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম দ্বারা আবাদ থাকার পর তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল।

হালাকু খাঁর বাগদাদ আক্রমণের ঘটনার নিহত মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল, সে সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে, কেউ বলেন : এই সংখ্যা ছিল আট লক্ষ, আবার কারও মতে : আঠার লক্ষ, আবার কারও মতে বিশ লক্ষ। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তাতারীরা বাগদাদে প্রবেশ করে মুহাররম মাসের শেষ দিকে। এরপর থেকে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তারা তাদের হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রাখে, আর খলীফা মুনতাসিম বিল্লাহ নিজে সফর মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার, এক সময় তাঁর বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর চার মাস, আর তার খিলাফতকাল ছিল পনেরো বছর আট মাস কয়েকদিন। আর সাথে তার জেষ্ঠপুত্র পঁচিশ বছর বয়সী আবুল আব্বাস আমাদও নিহত হন। অতঃপর হত্যা করা হয় তার মধ্যম পুত্র তেইশ বছর বয়সী আবুল ফযল আব্দুর রমোনকে।

আর যদি করা হয় তার কনিষ্ঠপুত্র মুবারক এবং তার তিন বোন ফাতিমা, খাদীজা, এবং মারইয়ামকে, এছাড়া দারুল খিলাফত থেকে আরও প্রায় এক হাজার কুমারীকে যুদ্ধ বন্দিনী করা হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নায় লাহি রাজিউন।

এছাড়া এ সময় দারুল খিলাফতের উসতাদ শায়খ মুহয়ুদ্দীন য়ুয়ুথ ইবন্ শায়খ আবুল ফারাজ ইবন্ জাওযী নিতে হন, কেননা, তিনি ছিলেন ওযীর আলকামীর শত্রু। তার সাথে তার নিজপুত্র আবুল্লাহ আব্দুর বলেন এবং 'আবদর করীম নিহত হন। আরও নিহত হন একের পর এক রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদের অন্যতম হলেন মুজাতিদুদ্দীন আইবেক, শিহাবদ্দীন সুলায়মান শাহ একদল বিশিষ্ট আলিম ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। দারুল খিলাফত থেকে বানূ আব্বাসের একেকজনের নাম ধরে ডাকা হতো, তখন সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীসন্তানদের নিয়ে বের হতো, অতঃপর তাকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তাকে বকরীর ন্যায় জবাই করা হতো। এছাড়া আরও নিহত হন খলীফার উপদেষ্টা সদরুদ্দীন আলী ইবন্ নায়্যার এবং ব্যাপাকভাবে ইমাম, খতীব ও হাফিযগণ নিহত হন। ফলে বাগদাদের মসজিদসমূহে মাসের পর মাস বিরান হয়ে থাকে এবং জামায়াত, জুমুআ সব স্থগিত হয়ে যায়। আসলে ইবন্ আলকামী চেয়েছিল বাগদাদের সকল মসজিদ, মাদরাসা ও খান্‌কাসমূহ পরিত্যক্ত করে রাফেযীদের জন্য বিরাট একটি মাদরাসা বানিয়ে তাদের নিজস্ব ধর্মাদর্শের প্রচার প্রসার ঘটাতে। কিন্তু আল্লাহ তাকে

তাতে সফলতা দেননি। বরং তিনি তার থেকে তাঁর অণুগ্রহের দান অপসারণ করেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পরেই তার জীবনাবশান ঘটে, এবং তার জনেদের তার অনুসারী করে আর আল্লাহ ভাল জানেন, তারা জাহান্নামের অতল তলদেশে একত্র হয়েছে।

আল্লাহ্ নির্ধারিত ফয়সালা যখন অতীত হলো এবং চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো, তখন বাগদাদ শহর এক বিরান ভুখণ্ডে পরিণত হলো। নিহত মানুষের স্তুপে পথঘাট ভরে গেল। এ সময় বৃষ্টি হয়ে লাশসমুহ বিকৃত হয়ে গেল এবং শহরের বাতাস ও পানি দূষিত হয়ে গুরুতর মহামারী দেখা দিল। এমন কি এই বায়ু দূষন শাম দেশ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এভাবে বায়ু ও পানি দুষণের কারণে বহুসংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটে, ফলে একই সাথে ক্ষুধা অনাহার, মহামারী ও মৃত্যুর বিভীষিকা দেখা দেয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এরপর যখন বাগদাদ শহরের নিরাপত্তা ফিরে আসে তখন বিভিন্ন গোপন স্থানে আত্মগোপনকারী লোকজন বের হয়ে আসতে থাকে; যেন তাদেরকে কবর থেকে পুনর্জীবিত করা হয়। কারও সাথে কারও পরিচয় নেই। পিতা পুত্রকে চিনে না এবং ভাই ভাইকেও চিনে না। এ সময় ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়, ফলে এদের পরিণতিও হয় অভিন্ন এবং শেষ আশ্রয়ও হয় ভুগর্ভে। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

হালাকু খাঁ এ বছর জুমদাল উলা মাসে তার রাজধানীর উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। এ সময় তিনি বাগদাদের শাসন কর্তৃত্ব অর্পন করেন আমীর আলী বাহাদুরের হাতে এবং ওযীর ইবন্ আলকামীর হাতে, কিন্তু আল্লাহ তাকে সে কর্তৃত্ব ভোগ করার সুযোগ দেননি। বরং তিনি তাকে জুমাদাল আখিরা মাসে তেষট্টি বছর বয়সে পাকড়াও করেন। সাহিত্যসৃষ্টি এবং রচনা কুশলতায় তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। কিন্তু আকীদা বিচারে তিনি ছিলেন কট্টর শিয়া এবং পিশাচে রাফেযী। আর চরম হতাশায় ক্ষোভ ও অনুশোচনার শিকার হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। আর তার পর ওযীরের দায়িত্ব লাভ করে তার পুত্র তুযযুদ্দীন ইবন্ ফযল মুহাম্মাদ কিন্তু তাকেও আল্লাহ এই বছরই তার পিতার অনুগামী করেন। আর প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহর।

ঐতিহাসিক আবু শাসা এবং আমাদের শায়খ আবু আব্দুল্লাহ যাহাবী এবং কুতুবুদ্দীন য়ুনানী উল্লেখ করেছেন যে এ বছর শামদেশের মানুষ ব্যাপক মহামারীর শিকার হয়, তার এর কারণ উল্লেখ করেছেন বায়ু দূষন এবং পরিবেশ দুষণ। আর এই দুষণের উৎপত্তি স্থল ছিল বাগদাদ। পথে ঘাটে পড়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের পচন ও বিকৃতি। এমনকি এই দুষণ শামদেশ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছিল। আর আল্লাহ্ অধিক জানেন।

এছাড়া এ বছরই মিশরীয়গণ কারকের শাসনকর্তা উসর ইবন্ আদিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় তার কয়েখানায় একদল বিশিষ্ট আমীর উমারা বন্দি ছিলেন। তাদের অন্যতম হলেন-রুকনুদ্দীন জীবারস আল্‌বুন্দুকদারী। এই যুদ্ধে মিশরীয়রা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে এবং একদল নেতৃস্থানীয় আমীর উলামাকে বন্দি করা হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। এরপর কারকবাহিনী অতিমন্দ অবস্থায় কারকে ফিরে আসে, এবং নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও কুকর্মেলিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ্ দামেশকের শাসন নাসেরকে সুবুদ্ধি দান করেন, ফলে তিনি তাদের নিবৃত্ত করার জন্য বাটনী প্রেরণ করেন।

কিন্তু শত্রুবাহিনী তাদেরকে পরাস্ত করে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। তখন সুলতান নাসের নিজে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু শত্রুবাহিনী তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। তারা তার অবস্থানরত তাঁবুর খুঁটির রশি কেটে ফেলে। এবার এটা হয়েছিল রুকনুদ্দীন এর ইঙ্গিতে। এছাড়া এ বছর আরও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়, যার বিশদ বিবরণ অনেক দীর্ঘ। আল্লাহর প্রশংসা সব আল্লাহরই। এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলো :

খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ

ইরাকে অবশেষে আব্বাসীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন আবু আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন্ মুসতানসির বিল্লাহ আবু জাফর মানসুর ইবন্ জাহির ইবন্ নাস্‌রিল্লাহ আবু নসর মুহাম্মাদ ইবন্ নাসির লি-দীনিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ মুসতাফি বি-আসারউল্লাহ আবু মুহাম্মাদ হাসন ইবন্ মুসতানজিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফফর য়ুয়ুফ ইবন্ মুকতাদী বিল্লাহ আবুল কাসিম আবুদুল্লাহ ইবন্ যাখীরা আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন্ কাইম বিন আমারল্লাহ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ আমীর ইসহাক ইবন্ মুকতাদির বিল্লাহ আবুল ফযল জাফর ইবন্ মু'তাগিদ বিল্লাহ আবুল আববাস আহমাদ ইবন্ আমীর মুওয়াফফাক আবু আহমাাদ ইবন্ আমীর মুওয়াফফাব আবু আহমাদ তালহা ইবন্ মুতাওয়াক্কিন আল্লাল্লাহ আবুল ফযল জাফির ইবন্ মু'তাসিম বিল্লাহ আবু ইসহাক মুহাম্মাদ ইবরাহীম আবু মুহাম্মাদ হারুন ইবন্ মাহদী আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ মানসুর ইবন্ জাফির 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আলী ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব ইবন্ হামিম আল-হাশিমী আল-আব্বাসী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬০৯ হিজরী সনে। আর ৬৪০ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের ২০ তারিখে তার অনুকুলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। আর তিনি নিহত হন ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসের চৌদ্দ তারিখে। এই হিসাবে মৃত্যকালে তার বয়স ছিল সাত চল্লিশ (৪৭) বছর আল্লাহ তাকে রহম করুন খলীফা মুসতাসিম ছিলেন সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকার, তাঁর আকীদা ছিল খাঁটি ও নির্ভেজাল। লেনদেন দান-সদকার আধিক্য এবং আলিম উলামা ও আবিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার পিতার অনুসারী, হাফিযে হাদীস ইবন্ নাজহার খোরাসানের একদল শায়খ থেকে তার অনুকলে হাদীসের 'ইজাযত' গ্রহণ করেন। এদের অন্যতম হলেন-মুতায়াদ তুসী, আবু রুহ আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ হারাভী, আবু বকর কাসিম ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ সফফার এবং অন্যান্যগণ। আর তার থেকে একদল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন-প্রবীন শায়খ সদরুদ্দীন আবুল হাসান, আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ নায়ার। আর তিনি নিজে 'ইজাযত' প্রদান করেন ইমাম মুহীয়ুদ্দীন ইবন্ জাওযীকে এবং শায়খ নাজমুদ্দীন বাদরাইকে এবং তারা দুজন এই 'ইজাযতের' ভিত্তিতে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আর তিনি ছিলেন সুন্নী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাপন্থী সালফে সালেহীনের অনুসারী, যেমনটি ছিলেন তার পিতা এবং পিতামাহ্, তবে তার মাঝে কোমলতা, অসতকর্তা এবং সম্পদ সঞ্চয়ের মোহ ছিল। তার এই ধনশক্তির প্রমাণ হল নাসির দাউদ ইবন্ মুআয়যাম তার কাছে যে এক লক্ষ দীনার পরিমাণ অর্থসম্পদ আমানত রেখেছিলেন, তিনি তা নিজের জন্য প্রথা করে খিয়ানত

করেন। আর খলীফার মত ব্যক্তির এরূপ আচরণ নিঃসন্দেহে কদর্য। বরং তার থেকে অনেক নিম্নস্তরের কোন ব্যক্তির জন্যও এটা কদর্য। বরং অনেক অমুসলিমও এমন রয়েছে যে, তারা বিপুল পরিমাণ ধসম্পদের আমানত আদায় করে থাকে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন :

আর কিতাবীদের মাঝে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও তা ফেরত দিবে।

এ বছর চৌদ্দ তারিখ বুধবার অসহায় ও মাযলুম অবস্থায় তাতারীরা তাকে হত্যা করে। এ সময় তার বয়স ছিল ছেচল্লিশ বছর চার মাস। আর তাঁর খিলাফতকাল ছিল পনেরো বছর আট মাস কয়েকদিন, আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং তার আশ্রয়স্থলকে সম্মানিত করুন। তার পর তার দুই পুত্রকে হত্যা করা হয় এবং তার ঔরসজাত তিন কন্যার সাথে তৃতীয় পুত্রকে বন্দি করা হয়। তার মৃত্যুর পর খিলাফতের পদ খালি হয়ে যায় এবং তার স্থান পূরণ করার মত কেউ বাকী থাকেনি। তিনি ছিলেন এ সকল আব্বাসীর খলীফার সর্বশেষ ব্যক্তি যারা মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করেছেন, এবং যাদের থেকে প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা যায় এবং শাস্তির ভয় করা হয়। যাদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন মুসতাসিম। আর সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন–সাফফাহ্ সাফফাহের অনুকলে বায়আত গৃহীত হয় এবং তার শাসনকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বানু উমায়ার শাসন কর্তৃত্বের অবদানের পর ১৩২ হিজরীতে। আর সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফা মুসতাসিমের খিলাফতকালের অবসান ঘটে এ বছর। সেই হিসাবে আব্বাসীয় খিলাফতকালের সর্বমোট সময় হলো পাঁচশত চব্বিশ বছর। শুধুমাত্র আব্বাসীয়দের আমলে ইরাক থেকে ৪৫০ হিজরীর পর এক বছর কয়েক মাসের জন্য তাদের শাসনকর্তৃত্বের অবসান ঘটে, অতঃপর তা পুর্ববস্থায় ফিরে আসে।

এই প্রসঙ্গে আমীর খলীফা কাইম-বি-আমরিল্লাহর খিলাফতকালের আলোচনায় বিশদ বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করেছি। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় খলীফাদের শাসন কর্তৃত্ব বানু উমায়ার শাসন কর্তৃত্বের ন্যায় সুসংহিত ছিল না। এবার নেই 'মাগরিব' অঞ্চল তাদের শাসনকর্তৃত্বের বাইরে চলে যায়। আব্বাসীয় শাসনামলের শুরুর দিকে 'আব্দুর রহমান ইবন্ মুআবিয়া ইবন্ হিমাম ইবন্ আব্দুল মালিকের জনৈক অধঃস্থন তার শাসন কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তার বহু যুগ পর সেখানে অন্যান্য শাসকদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর আব্বাসীয় বংশের সমসাময়িক ছিল মিশর ও আল-মাগরিবের কতকাংশে বিদ্যমান শাসকশ্রেণি, যারা নিজেদেরকে ফাতেমী দাবী করতো, তদ্রুপ তারা কখনও কখনও শামদেশ, দীর্ঘকাল, হারামায়ন শরীফায়ন শাসন করেছে, তদ্রুপ খোরাসান এবং মওয়ারাউল্লাহর এর শাসন কর্তৃতও অন্যদের হাতে চলে যায় এং এদের পর এক শাসক তা শাসন করেন। এমনকি তাদের খলীফার কর্তৃত্বে থাকে শুধু বাগদাদ এবং ইরাকের কতকাংশ। আর এই পতনের মূল কারণ ছিল আব্বাসীয়দের খিলাফতের দুর্বলতা, প্রবৃত্তি পরায়ণতা এবং ধনসম্পদের আসক্তি ও মোহমত্ততা ফাতেমীদের শাসন কর্তৃত্ব প্রায় তিনশ বছর অব্যাহতছিল, তাদের সর্বশেষ শাসক ছিলেন সুলতান আবিদ, যিনি ৫৬০ হিজরীতে সালাহী নাসেরী সাম্রাজ্যে মৃত্যুবরণ করেন। ফাতেমীদের শাসক সংখ্যা ছিল চৌদ্দজন। তাদের শাসনকালের সুচনা ছিল ১৯৭ হিজীরি সন থেকে সুলতান আবিদের ওফাত পর্যন্ত, অর্থাৎ ৫৬০-এর পরবর্তীকালে পর্যন্ত, আশ্চর্যের বিষয় হলো–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরবর্তীতে খিলাফতে

নবুয়াতের সময়কাল ছিল তিরিশ বছর যেমন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যেই আবু বকর (রা), উমর (রা) উসমান (রা) অতঃপর আলী (রা)-এর পর তাঁর পুত্র হাসান ইবন্ আলীর (রা)-এর ছয় মাসের শাসনামল গণ্য করলে তিরিশ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। যেমনটি আমরা দালাইলুর নুবুওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। এরপর থেকে রাজতন্ত্রের সুচনা হয়। সে হিসাবে ইসলামের প্রথম সম্রাট ছিলেন মুআবিয়া ইবন্ আবু সুফিয়ান সাখর ইবন্ হারব ইবন্ উমায়া, অতঃপর তাঁর পুত্র য়াযীদ, অতঃপর তার পুত্র মুআবিয়া ইবন্ য়াযীদ ইবন্ মুআবিয়া। আর সাহাবী মুআবিয়া (রা) দ্বারা সুচিত গোষ্ঠীর আবসান ঘটে তার গোত্র মুআবিয়ার মাধ্যমে।

অতঃপর এই শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন মারয়ান ইবন্ হাকাম ইবন্ আবুল আস ইবন্ উমায়া ইবন্ আবদ শামস ইবন্ আবদ মানাফ ইবন্ কুসাই, অতঃপর তার পুত্র আব্দুল মালিক অতপর ওয়ালীদ ইবন্ আবুদল মালিক, অতঃপর তার ভাই সুলায়মান, অতঃপর তার পিতৃব্যপুত্র উমর উবন আব্দুল আযীয, অতঃপর য়াযীদ ইবন্ আব্দুল মালিক, অতঃপর হিমাম ইবন্ আব্দুল মারিক, অতঃপর ওয়ালীদ ইবন্ য়াযীদ অতঃপর য়াযীদ ইবন্ ওয়ালীদ, অতঃপর তার ভাই ইবরাহীম ইবন্ ওয়ালীদ, অতঃপর মারওয়ান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মারওয়ান, যার উপাধি ছিল হিসার। আর সে ছিল তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি, সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রথম জনের নাম ছিল মারওয়ান এবং শেষজনেরও নাম মারওয়ান, অতঃপর এক সময় সর্বপ্রথমজন থেকে সর্বশেষজন সকলেই অতীত হয়ে গেল, আর আব্বসীয় বংশের প্রথম খলীফা ছিলেন আবদুল্লাহ সাফফাহ, আর সর্বশেষ হলেন আবদুল্লাহ আলমুসতাসিম। তদ্রুপ ফাতেমীদের প্রথম খলীফা হলেন আবুদল্লাহ আযিদ আর শেষজন হলেন আবুদল্লাহ আযিদ, এটা অত্যন্ত অভিনব ছিল। অনেকেই হয়তো এর প্রতি লক্ষ্য করেনি। ছন্দভাবে জনৈক কবি সকল খলীফার নাম উল্লেখ করেছেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যার আরশ হলো সুবিশাল, যিনি পরাক্রমশালী, এককসত্তা, যার পাকড়াও কঠিন নেই সংশয়। যিনি দিনের এবং কালের পরিবর্তনের রুপকার-এবং যিনি কুল মাখলুককে পুনরুত্থানে সমবেতকারি। অতঃপর সালাত সালাম সর্বদা নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফার প্রতি–এবং তার সজন পরিজন এবং সহচরগণের প্রতি যারা নেতৃস্তায়ী অনুসরণীয় পরকথা, আমি ছন্দগীতি রচনা করেছি সুক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত করে-তাতে আমি পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের কথা উল্লেখ করেছি। এবং উল্লেখ করেছি তাদের পরবর্তীদের কথা দৃষ্টান্ত ও উপদেশ রূপে–বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি জেনে রাখুক কীভাবে ঘটনাসমুহ প্রবাহিত হয়েছে। প্রত্যেক সাম্রাজ্যতে ক্ষমতার অধিকারী ধ্বংস বিনাশের শিকার। আর রাত দিনের আবর্তনের মাঝে প্রত্যেক উপদেশ গ্রহণকারির জন্য উপদেশ রয়েছে। আর মহাপরাক্রমশালী বাদশা তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা সাম্রাজ্য দান করেন। প্রত্যেক সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য এবং প্রত্যেক রাজত্বের শেষ পরিণতি অবধারিত। স্রষ্টার সাম্রাজ্য ব্যতীত কোনো সাম্যাজ্যই স্থায়ী নয় তিনি পবিত্র পরাক্রমশালী সম্রাট।

তিনি হলেন মর্যাদা ও স্থায়িত্বের একক অধিকারী। তিনি ব্যতীত সবই ধ্বংশীল। সর্বপ্রথম যার অনুকুলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়, তিনি হলেন ইবন্ আবু কুহাফা অর্থাৎ পথের দিশারী অগ্রদুত সিদ্দীক (রা)-তাঁর পরবর্তীজন হলেন উমর ফারুক (রা) তিনি একের পর এক দেশ জয় করেন। আর তার তরবারি কাফেরদের মুলোৎপাটন করে। এবং তিনি ইনসাফ কায়েম

করেন। যা অনুমোদন করেছেন আসমান যমীনের পরাক্রমশালী। এরপর সকলে বেছে নেয় যিন্নুরাইনকে তারপর দৌহিত্র দ্বয়ের জনককে অতঃপর হাসানের সাথে একাধিক বাহিনীর আগমন ঘটে–যাদের মাধ্যমে লোকেরা ফিতনাসমূহকে উসকে দেওয়ার উপক্রম করে। অতঃপর আল্লাহ তার হাতে সন্ধি স্থাপন করান, যেমনটি আমাদের নবীজী তার দিকে সম্পকৃত করেছিলেন। আর তিনি মুআবিয়ার কর্তৃত্বে সকলকে একত্র করেছিলেন। এবং এই কাহিনী প্রত্যেক বর্ণনাকারি বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি তার ইচ্ছামাফিক রাজ্য বিস্তার করেন। আর তারপর এই কর্তৃত্বে স্থলবর্তী হয়েছে তারই পুত্র য়াযীদ। অতঃপর তার পুত্র আর সে ছিল পুণ্যবান ও সুপথপ্রাপ্ত অর্থাৎ 'আবু লায়লা (মুসাবিয়া ইবন্ য়াযীদ) আর তিনি ছিলেন নির্মোহ। আর ইবন্ যুবায়র হিজাযে কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টারত ছিলেন। আর আল্লাহর হুকুমে তারা শাম দেশে মারওযানের হাতে বায়আত করেছিল। তবে তার রাজত্বকাল এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। মৃত্যুপণ তাকে বিদ্ধ করে। এরপর আব্দুল মালিকের কর্তৃত্ব ধ্বংস হয় এবং তার সৌভাগ্য তারকা প্রোজ্জ্বল হয় সেই তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো, সেই তরবারির আঘাতে ধরাসায়ী হলো। মুসআব ইরাকে নিহত হলেন, আর হাজ্জাজ তার সেনাপতিকে হিজাযে প্রেরণ করলো। প্রতিশোধের তরবারি দিয়ে তখন ইবন্ যুবায়র 'হারামে' আশ্রয় নিলেন। হত্যার পর তাতে শুলব্ধি করে সে সীমালঙ্ঘন করলো, তাঁর ব্যাপারে সে তার রক্ত থেকে কোনো ভয়বোধ করলো না। তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যখন নির্বিকার হল, তখন তার আয়ু ফুরিয়ে গেল। তারপর আসলেন ওয়ালীদ এবং তারপর সুবোধ যুবক সুলায়মান, এরপর উমরের ইনসাফ বিস্তৃত হলো, তিনি তার রবের নির্দেশ অনুসরণ করেন। তার উপাধি ছিল আশাজ্জ, অর্থাৎ সালাত, সাওম ও তাকওয়ার অধিকারী। তিনি ইনসাফও ইহসান নিয়ে এলেন এবং যালিম ও উদ্ধতদের নিবৃত্ত করলেন সুন্নাতে রাসুল এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে। অতঃপর ইসলামকে তার বিচ্ছেদের তিক্ততা আস্বাদন করালেন-আর তারপর মুসলমানরা তার কোনো দৃষ্টান্ত দেখেনি। অতঃপর য়াযীদ, তারপর হিশাম, আব তারপর হলেন ওয়ালীদ....অতঃপর য়াযীদ, যাকে বলা হতো 'নাবিকস', তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর খলীফা ইব্রাহীমের সময় দীর্ঘ হয়নি, তার সকল বিষয় ছিল রুগ্ন। সে তার সাম্রাজ্যেকে মারওয়াসের দিকে সম্পৃক্ত করলো,ফলে তার পরিণতি যা হওয়া তাই হল। তার সাথেই হাকাম পরিবারের কর্তৃত্বের অবসান ঘটালো এবং তাদের থেকে আল্লাহ বিভিন্ন দানও অনুগ্রহ অপসারিত করলেন। এরপর বানু 'আব্বাসের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, যা আজও আমাদের মাঝে দৃঢ়মূল ও সুসংহত।

অনারব ভুখণ্ড থেকে বায়আত উদ্ভূত হলো, যা সকল জাতির প্রতি আরোপিত হল। যেই তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, সেই নিকৃষ্টভাবে ধরাশায়ী হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি। যখন কাইম মুসতাসিমের দায়িত্ব গ্রহণের আলোচনা করেছি, তাদের প্রথম জনের পরিচয় সাফফাহ, তারপর হলেন যুল্‌জানাহ মানসুর, অতঃপর আসলেন মাহদী এবং তাকে অনুসরণ করলেন মুসা আলহাদী। তারপর আসলেন হারুন আরশীদ এবং এরপর খলীফা আল-আমীন, যিনি আসলেন মামুনকে হত্যার পর আর তারপর আসলেন শক্তিশালী মুতাসিম। মু'তাসিমের পর খলীফা হলেন ওয়াছিক, অতঃপর তার ভাই দায়িত্ববান কাফর আর আরশাধিপতি আদি সত্তার জন্য মুওয়াককিলের

ব্যাপারে নিয়ত খাঁটি করা হলো, ফলে তিনি বিদ্‌আতকে নির্মুল করলেন, এবং সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে সে সময়ে কোনো বিদআত থাকলো না, আর মুতাযিলীদের অপছন্দ করা হলো। তার প্রতি আল্লাহর করুণার ধারাবর্তিত হোক– যতদিন আসমানে তারকারাজির উদয়াস্ত বহাল থাকে। আর তারপর শাসন কর্তৃত্বলাভ করলেন মু'তাসিম,–তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন এবং তারপর শাসন করলেন মুকতাসিদ। আর তিনি যখন শহীদ হলেন, তখন খলীফা হলেন মু'নতাসির, তারপর আসলেন খলীফা মুসতায়ীন, যেমন উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর আসলেন মু'তাব এবং সম্মানিত খলীফা মুহতাদী। আর আসমানী ফয়সালা অনুযায়ী আসবেন মুকতাফী, আর তারপর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করলেন মুকতাদির। এবং 'কাহির' প্রতাপ দ্বারা তারা সাম্রাজ্য সুসংহত করলেন। আর তারপর আসলেন মুফাখিরের ভাই খলীফা রাযী। আর মুস্‌তাকযীর পর হলেন মুত্তাকী, অতঃপর আসলেন খলীফা মুতী। আর তারপর আসলেন তাই , অতঃপর খলীফা কাদির এবং তারপর শোকর গুযার ও নির্মোহ ব্যক্তি কাইম [বিল্লা] আর মুকতাদী এবং তারপর মুসতায়হির অতঃপর মর্যাদাবান মুসতারশিদ তারপর খলীফা রাশিদ এবং অতঃপর হলেন মুকতাফী, আর তিনি যখন মারা গেলেন তখন তারা সাহায্য চাইল য়ুযুফ মুসতাযীর যিনি ছিলেন তার কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণ এবং বক্তব্যে সত্যনিষ্ঠ। আর প্রবল ও সাহসী বীর নাসের- যার অবস্থানকাল প্রজাদের মাঝে দীর্ঘ হল। আর তাকে অনুসরণ করলেন মহান 'যাহির' যার ইনসাফ সুবিদিত। তার শাসন ছিল কয়েকমাস এরপরই তিনি মৃত্যুরূপে পতিত হলেন। আর তার নির্দেশনামা ছিল মুনতাসিরের খিলাফতের অনূকুলে, যিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, পুণ্যবান এবং মহানুভব। তিনি প্রজাশাসন করেন সতেরো বছর কয়েকমাস তার পুণ্যের প্রত্রয় দ্বারা। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন চল্লিশ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে। আর সকলে বায়াত করলেন খলীফা মুনতাসিমের হাতে। আমাদের রব তাঁর প্রতি রহম করুন। অতঃপর তিনি দিক-দিগন্তে দূত প্রেরণ করেন, যারা বায়াত ও ঐক্যের ফয়সালা সম্পন্ন করেন।

এবং তারা তার আলোচনা দ্বারা মিম্বরসমূহকে সম্মানিত করেছেন এবং যারা তার বদান্যতায় কীর্তিসমূহের প্রসার ঘটিয়েছেন।

আর দিক-দিগন্তে তার উত্তম জীবন চরিত্রের কথা এবং প্রজাদের মাঝে তার ন্যায় পরায়ণতার কথা ছড়িয়ে পড়ে।

শায়খ ইমামুদ্দীন ইবন্ আদীর (রহ) বলেন : অতঃপর আমি কয়েকটি কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি করলামঃ

"অতঃপর আল্লাহ্ তাকে প্রবল পরাক্রান্ত চেঙ্গিস খানের অনুসারীদের দ্বারা পরীক্ষা করলো।

চেঙ্গিস পৌত্র হালাকু খান তার মোকাবলা করল, আর তার কবল থেকে তার কোন নিস্কৃতি হলোনা। তাতারীরা তার বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল এবং তাকেও তার পরিবার জনকে হত্যা করলো এবং বাগদাদসহ এবং গোটা দেশকে ধ্বংস করলো এবং আবাল বৃদ্ধবর্ণিতা সকলকে হত্যা করলো। ধনসম্পদের সাথে তারা হারেমবাগীনীদেরও হরণ করলো, তারা কোন পরাক্রমশালীর পাকড়াওকে ভয় করলো না। তাঁর অবকাশ দান সহশীলতা এবং ন্যায়পরায়ণতা এবং ফয়সালা, তাদের-কে প্রতারিত করলো। তার মৃত্যুর পর খলীফার পদ শুন্য হয়ে গেল,

এবং এমন বিপদের কথা আর কখনও শোনা যায়নি। তারপর সুলতান যাহির মুসতানসিরকে খলীফা মনোনীত করা হয়।

তারপর তারপুত্র খলীফা মুসতাকাফী, আর এই বুদ্ধিমানের অংশবিশেষই যথেষ্ট। এরপর এমন একদল শাসকের আর্বিভাব হলো, যাদের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং কোনো পুঁজিও ছিল না। অতঃপর আমাদের সময়ে মু'তাসিদ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কালের পরিধিতে তার দৃষ্টান্ত বিরল। উত্তম স্বভাবে আকীদা বিশ্বাসে এবং দৈহিক ও চারিত্রিক অবয়বে, আর কীভাবেই তা হবে না, তিনি তো উত্তম ব্যক্তির। ভাল গুণের কল্যাণে তার দেশ ও দশের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শাসনও ন্যায় বিচারে বিভিন্ন ভূখণ্ডরে পূর্ণ করেছেন। এরা হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পিতৃব্য পুত্র। নির্দ্বিধায় বলা যায় সর্বোত্তম সৃষ্টি। মহিমান্বিত সত্তা তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যতদিন দিনরাত অব্যাহত থাকে।

পরিচ্ছেদ

ফাতেমীরা সংখ্যায় কম তবে তাদের সময়কালকে প্রলম্বিত করা হয়েছিল। ফলে তারা দু'শ ষাট বছরের অধিক সময় শাসন করেছে, অথচ তা ছিল যেন এক বছর অর্থাৎ মহাকালের বিবেচনায়, তাদের সংখ্যা হলো চৌদ্দজন মাহদী, কাইম...অর্থাৎ কায়রো-নির্মাতা মুইয়, অতঃপর হলেন আযীয এবং যাহির মুসতানসরি, যিনি বিজয়ী, নির্দেশদাতা এবং মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষাকারি।

আর যাহির ফাইতম, অতঃপর আযিদ হলেন তাদের সর্বশেষজন, আর একথা সর্বস্বীকৃত। তারা য়াহূদী জাত, অভিজাত নয়, শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ এরই ফতোওয়া দিয়েছেন। যারা উম্মতের সাথে আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী।

পরিচ্ছেদ

এমনই হলেন বানু উমায়্যার খলীফারগণ, তাদের সংখ্যা রাফেযীদের সংখ্যা বরাবর। তবে তাদের শাসনকাল ছিল একশ বছরেরও কম। আর তাদের প্রত্যকে ছিল নাসেরী, ব্যতিক্রম শুধু আল্লাহভীরু উমর। মু'আবিয়া অতঃপর তার পুত্র য়াযীদ এবং মু'আবিয়ার পুন 'সাদীদ'। মারওয়ান, অতঃপর তার পুত্র আব্দুল মালিক, যে ইবন্ যাবায়বকে তিরোধ করে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়, অতঃপর সাম্রাজ্যের একছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হয়, তা মানব-বসতির বিশাল অংশ জুরে এবং সন্দেহাতীতভাবে। অতঃপর তার পুত্র জামে দামেশদের নির্মাতা, ওয়ালীদ, আর এরূপ জামে মসজিদ আর দেখা যায় না। অতঃপর হলেন–দানবীর সুলায়মান ও উমর, অতঃপর য়াযীদ ও হিশাম ও 'বিশ্বাসঘাতক'–অর্থাৎ পাপাসক্ত ওয়ালীদ ইবন্ য়াযীদ অতঃপর য়াযীদ ইবন্ ওয়ালীদ। তার উপাধি ছিল 'অসম্পূর্ণ', অথচ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ, অতঃপর হলেন বুদ্ধিমান ইবরাহীম। অতঃপর মারওয়ান 'হিমার জা'দী হলো তাদের সর্বশেষ, আমর থেকে এই তথ্য গ্রহণ কর। আর আল্লাহর প্রশংসা পূর্ণতার জন্য তদ্রূপ আমরা তাঁর প্রশংসা করব অনুগ্রহ প্রদানের জন্য। অতঃপর নবী মুহাম্মাদ মুসতাফার প্রতি পূর্ণ সংখ্যক দরুদ এবং তার স্বজন-পরিজন ও সাহাবাদের প্রতি সদা সর্বদা এই কবিতা পঙক্তিগুলি হলো তাদের কীর্তিসমূহের পরিশিষ্ট।

আর খলীফার সাথে আরও যারা নিহত হন, তাদের অন্যতম হলেন দামেসকে অবস্থিত মাদরাসা জাওযিয়ার ওয়াকফকারি, দারুল খিলাফতের উসতাদ মুহীয়ুদ্দীন য়ুযুফ ইবন্ শায়খ জালামুদ্দীন আবুল ফরাজ ইবন্ জাওযী। তার পুর্ণ নাম পরিচয় হলো-'আব্দুর রহমান ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ উবায়দুল্লাহ ইবন্ হাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ জা'ফর ইবন্ 'আবুদল্লাহ ইবন্ কানিম ইবন্ নাযির ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ সিদ্দিক আল-কুরাইশী আততায়জী আল্‌বাকরী আল্‌বাগনাদী আলহাম্বলী, যিনি ইব বাওযীরূপে পরিচিত, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৮০ হিজরীর জিলকদ মাসে এবং সুষ্ঠভাবে ছেড়ে উঠেন। তার পিতা যখন ইনতিকাল করেন, তখন তিনি সেই উপলক্ষে বেশ মুল্যবান ও চমৎকার ওয়াজ করেন। এরপর থেকে তিনি বড়ো বড়ো পদ অলংকৃত করতে থাকেন। উৎকৃষ্ট ওয়াজ নসীহত এবং চমৎকার কাব্যচর্চার সাথে সাথে তিনি বাগদাদের নির্বাহী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। অতঃপর তাকে ৬৩২ হিজরীতে মাদরাসা নুসতান সিরিয়াতে হাম্বলী মাযহারের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও তার একাধিক দরস প্রদানের দায়িত্ব ছিল। তিনি দারুল খিলাফতের উসতাদের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বানু আফুব ও অন্যান্য শাসকদের বিশেষ দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আর তার স্থলবর্তীরূপে তার পুত্র 'আব্দুর রহমান ওয়াজ নসীহত ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর নির্বাহী তত্ত্বাবধায়কের পদবী তার তিন পুত্র 'আবদুর রহমান' আব্দুল্লাহ ও 'আব্দুল করীমের মাঝে স্থানান্তরিত হতে থাকে আর এ বছর তারা সকলেই তার সাথে নিহত হন। 'আল্লাহ্ তাদের সকলকে রহম করুন। শায়খ মুহীয়ুদ্দীনের হাম্বলী মাযহাবের একটি গ্রন্থ রয়েছে, ঐতিহাসিক ইবন্ সায়ী বেশকিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা তিনি বিভিন্ন উৎসব ও মৌসুম উপলক্ষে খলীফাকে অভিনন্দিত করেছেন। এই কবিতা পঙ্‌ক্তিসমূহ তার ভাষার বিশুদ্ধতা ও বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণ। তিনি হলেন দামেশকে অবস্থিত মাদরাসা জাওযিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকফকারি। আর এটি হলো সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন। আল্লাহ্ তার থেকে কবুল করুন।

সরসরী (রহঃ)

ইনি হলেন য়াহইয়া ইবন্ য়ুযুফ ইবন্ য়াহইয়া ইবন্ মানযূর ইবন্ মু'আম্মার 'আব্দুস সালাম', যিনি বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্রে পারদর্শী এবং শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন এবং জামালুদ্দীন আবু যাকারিয়া সরসরী নামে সমধিক পরিচিত।

তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং বাগদাদ শহরের অধিবাসী। তার অধিকাংশ কবিতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রশংসার রচিত। এ বিষয়ে তার কাব্যগ্রন্থটি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তার সম্পর্কে বলা হয় যে ভাষাবীদ আল্লামা জাওহারীর 'আসসিহা' অভিধানখানি তার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি শায়খ আব্দুল কাদিরের শিষ্য শায়খ আলী ইবন্ ইদরীসের সাহচার্য লাভ করেন। তার মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর, তিনি কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। তিনি আল্লামা মুওয়াফফকুদ্দীন ইবন্ কুদামা সংকলিত 'আনকাফী গ্রন্থের বাক্যরূপ দান করেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে তার প্রশংসা কাব্য রচনা করেন। বলা হয় যে, তার সংখ্যা প্রায় বিশখণ্ড। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত কারো প্রশংসা করেননি। তাতারীরা

যখন বাদগাদে প্রবেশ করেন, তখন তাকে হালাকু পুত্র কারমুনের সাক্ষাতে আহবান করা হয়। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। তাতারীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি তার গৃহে বেশকিছু পাথর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এরপর তাতারীরা যখন তার গৃহে প্রবেশ করে তখন তিনি ঐ সকল পাথর নিক্ষেপ করে তাদের বেশ করে কজনকে ঘায়েল করেন। এরপর যখন তারা তার কাছে পৌঁছে যায়, তখন তিনি তাদের একজনকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেন। এরপর তারা তাকে হত্যা করে। আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করুন। এ সময় তার বয়স ছিল ৬৮ বছর। কুতুবদ্দীন য়ুনীনী তার কাব্য সংকলন থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি চমৎকার দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন।

বাহা যুহায়র

তিনি হলেন যুহায়র ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ য়াইয়া ইবন্ হুসায়ন ইবন্ জা'ফর মুহাল্লাবী মিশরী। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কাওমে লালিত পালিত হন এবং কায়রোতে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন নিপুন হস্তাক্ষরের অধিকারী বিশিষ্ট কবি, তার একটি প্রসিদ্ধ কাব্য সংকলন রয়েছে। তিনি সুলতান সালিহ আয়ুবের সাহচর্যে গমন করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন মহানুভব এবং জনদরদী ব্যক্তি।

ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান তার প্রশংসা করে বলেন : তিনি আমাকে তার কাব্য সংকলন রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন। আর কুতুব য়ুনানী তার জীবনী বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয যাবীয়ূদ্দীন মুনযিরী

ইনি হলেন আবুদ্‌ল তাযীম ইবন্ 'আব্দুল কারী ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ইবন্ সালাম ইবন্ সা'দ ইবন্ সায়ীদ। তার পরিচিতি আল্লামা মুহাম্মাদ আবু যাকীয়ুদ্দীন আল্‌মুনযিরী আলশাফেরী আলমিশরী হিসেবে। তার পিতৃপুরুষদের আদি নিবাস শামদেশে। আর তিনি জন্মগ্রহণ করেন মিশরে। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল শায়খুল হাদীসরূপে নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘকাল দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা তার কাছে আসতে থাকে, কারও কারও মতে তিনি ৫৮১ হিজরীতে শামদেশে ইনতিকাল করেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ সফর করেন, এবং এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি তিনি সমকালীনদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এছাড়া তিনি গ্রন্থ সংকলন করেন এবং হাদীসের তাখরীজ করেন। এবং সহীহ মুসলিম এবং সুনানে আবূ দাউদ সংক্ষেপণের কাজ করেন। আরবী ভাষা, ফিক্‌হ এবং ইতিহাস তার অসাধারণ দখল ছিল। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য যাহিদ ব্যক্তি। তিনি এ বছর জিলকদ মাসের চার তারিখ শনিবার মিশরে অবস্থিত দারুল-হাদীস কামিলিয়াতে ইনতিকাল করেন এবং কারাফাতে সমাহিত হন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

আবূ বকর মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল আযীয

ইনি হলেন ইবন্ আব্দুর রহীম ইবন্ রুসতুম আশআরী, প্রসিদ্ধ নির্লজ্জ কবি। কাযী সদরুদ্দীন ইবন্ সানাউদ্দৌলা তাকে সাক্ষাতের মাঝে বসান। অতঃপর শহরের শাসক সুলতান নাসের তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে তার অন্তরঙ্গ সহচর করে নেন। এ সময় তিনি তাকে

সৈনিকদের ন্যায় দান ও বখশীশ প্রদান করেন। এরপর তিনি এই নির্লজ্জ কাব্যচর্চা ত্যাগ করে অন্যকাজে মশগুল হন। ইতেপূর্বে তিনি তরলভী ও নির্লজ্জতা বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বইও রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি অনেক অশালীন বিষয় উল্লেখ করেন। তার অন্যতম দুটি কবিতা পঙক্তি- জীবনের আনন্দ পাঁচটি।' এই তত্ত্ব আমি সংগ্রহ করেছি এমন এক নির্লজ্জ ব্যক্তি থেকে যে,নিলর্জ্জ থেকে ফকীহ ও আচীরে পরিণত হয়েছে।

পাঁচটি জিনিস হলো– শরাব, শরাব পানের সাথী, প্রিয়বন্ধু, সুন্দরী নারী এবং এগুলির প্রতি আসক্তিতে যে ভর্ৎসনা করে তাকে গালমন্দ করা।

ওযীর ইবন্ আল্কামী

ইনি হলেন মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ আবু তালিব, ওযীর মুআয়্যদুদ্দীন আবূ তালিব ইবন্ আলকামী, খলীফা মুসতানিলের ওযীর। খলীফা মুসতাগিরের সদয় দারুল খিলাফতের উসতাদ স্বরূপ তিনি দীর্ঘকাল তার সেবা করেন। অতঃপর মুসতাগিনের এই ওযীর তার নিজের জন্য, খলীফার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য বিরাট বিপদ ও অকল্যাণ বয়ে আনে। যদিও সে সাহিত্য ও রচনায় বেশ পারদর্শী ছিল। সে ছিল খবীছ রাফেযী, ইসলাম ও মুসলমানদের বিদ্বেষী, খলীফা মূসতা'সিনের আমলে সে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়, তা আর অন্য কোনো ওযীরের ভাগ্যে জোটেনি। এরপর সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হালাকু খাঁ ও তার অনুসারী কাফিরদের সাথে হাত মেলায় এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে জঘন্যতম গাদ্দীর পরিচয় দিয়ে আলোচনা গত হয়েছে। এরপর ঐ তাতারীদের সে মহাপচদস্থতা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়, তার থেকে আল্লাহর হিফাযতের আবরণ সরে যায় এবং সে পার্থিব জীবনেই জঘন্যতম অপদস্থতার স্বাদ আস্বাদন করে, আর আখিরাতের আযাবতো আরও কঠিন এবং অধিক স্থায়ী, একবার জনৈক স্ত্রীলোক তাতারীদের প্রহরধীন অবস্থায় এক বাহনের আরোহীরূপে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলো : হে ইবন্ আল্কামী ! বানূ আব্বাস কি তোমার সাথে এরূপ অপদস্থকের আচরণ করতো? তখন তার কথা তার অন্তরে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সে নিজগৃহে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ক্ষোভে-অপমানে ও অপদস্থায় মুষড়ে পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার এই মৃত্যু ঘটে এ বছর জুমাদান আখিরা মাসে, যখন তার বয়স ৬৩ বছর। তাকে রাফেযীদের কবরস্থানের দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে তাতারীদের থেকে এবং মুসলমানদের থেকে অবর্ণনীয় অপমান অপদস্থর সম্মুখীন হয়। তারপর ওযীরের দায়িত্ব লাভ করে তার 'খবীছ' পুত্র। কিন্তু আল্লাহ জনৈক কবি তার নিন্দায় আবৃত্তি করেন :

"হে ইসলামের অনুসারীগণ! মু'তাসিমের দুর্দশায় তোমরা বিলাপ কর, তার দুর্দশার কারণ ছিল ওযীরের প্রতারণা, তার পূর্বের ওযীর ছিল ইবন ফোরাত আর তার পরের ওযীর হলো ইবন্ আলকামী।"

মুহাম্মাদ ইবন্ 'আব্দুস সামাদ ইবন্' আবদুল্লাহ ইবন্ হায়দারা

ইনি হলেন ফাতহুদ্দীন আবূ 'আবুদল্লাহ ইবন্ আদল, দামেশদের নিবার্হী তত্ত্বাবধায়ক, তিনি ছিলেন সমাদৃত এবং তরীকাতপন্থী লোক। পিতামহ হলেন 'আদল নাজীবুদ্দিন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন্ হারাদারা। আর তিনি হলেন ৫৯০ হিজরীতে যাবদানীতে অবস্থিত মাদরাসার

প্রতিষ্ঠাতা ওয়াকফকারি। সেখানে তিনি বহুসংখ্যাক হাদীস শ্রবণ করেন এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফ সংক্ষেপ করেন। এছাড়া তিনি আলমুফহিম নামক মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। এতে বেশকিছু মূল্যবান ও উপকারী বিষয়বস্তু সংযোজিতা হয়েছে। আল্লাহ তাকে রক্ষা করুণ

আলকামাল ইসহাক ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'উছমান

তিনি হলেন শীর্ষস্থানীয় শাফেয়ী আলিম। শায়খ নুহেয়ুদ্দীন নববী ও অন্যান্যগণ তার থেকে ইলম শিক্ষা করেন। তিনি মাদরাসা রাওয়াহিয়াতে শিক্ষকতা করতেন। এ বছর জিলকদ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল ইমাদ দাউদ 'উমর ইবন্ য়াইয়া ইবন্' উমর ইবন্ কামিল

ইনি হলেন আবুল মা'আলী এবং আবূ সুলায়মান যুবায়দী আল্‌মাকদিসী, অতঃপর দামেশকী এবং বিশিষ্ট খতীব। শায়খ ইবন্ আব্দুস সালামের পর তিনি জামে উমাবীতে ছয় বছর খতীবের দায়িত্ব পালন করেন, এছাড়া তিনি মাদরাসা গাযালিয়াতে দারস প্রদান করেন। অতঃপর নিজ শহরের ফিরে আসেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ হুমায়ন

ইনি হলেন ছদরুদ্দীন আবুল হাসান ইবন্ নায়ার। বাগদাদের একজন শীর্ষ শায়খ। প্রথম দিকে তিনি খলীফা মুসতা'সিমের গৃহশিক্ষক ছিলেন। অতঃপর যখন মুসতাসিম খিলাফত লাভ করেন। তখন তিনি তাকে বিরাট সম্মান ও মর্যাদার উন্নীত করেন এবং তার হাতে অনেক বিষয়ের কর্তৃত্ব অর্পিত হয়। এরপর তিনি তাতারীদের হাতে নির্মর্মভাবে শাহাদাত বরণ করেন।

শায়খ আলী

ইনি হলেন বিশিষ্ট আবিদ ও রুটি প্রস্তুতকারক। বাগদাদে তার অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তার একটি খানকাও ছিল যেখানে দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটতো। তাতারীরা তাকে হত্যা করে আবর্জনার কূপে নিক্ষেপ করে। তার মৃতদেহ তিনদিন এভাবে পড়ে থাকে, এমন কি তার মৃতদেহ থেকে কুকুর গোশত খেয়ে ফেলে। বলা হয় তিনি জীবিত অবস্থায় এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবন্ ইসমাইল ইবন্ আহমাদ ইবন্ আবুল ফারাজ আবূ আবদুল্লাহ

ইনি হলেন বিশিষ্ট খতীব, তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি নব্বই বছর জীবিত ছিলেন। আর জন্মগ্রহণ করেন ৫৩ হিজরীতে। দামেশকের লোকজন তার থেকে বহুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি এ বছর নিজ শহর বারাদাতে ফিরে আসেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

মাওসিল প্রশাসক বদর লু'লু

তিনি দয়াদ্র সুলতান' উপাধিপ্রাপ্ত তিনি এ বছর শাবান মাসে একশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পঞ্চাশ বছরের মত মাওসিল শাসন করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমত্তা ধূর্ততা ও কৌশলের অধিকারী। তিনি তার উসতাদের পুত্রদের বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন কৌশল প্রয়োগের

মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করেন, এবং মাওসিল থেকে আতাবিকিয়াদের শাসন কর্তৃত্ব দূর করেন। মহাধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার পর হালাকু খাঁ যখন বাগদাদ ত্যাগ করে, তখন এই ব্যক্তি বিভিন্ন উপহার উপঢৌকন নিয়ে তার পদ নেবার জন্য তার সাথে সাক্ষাত করে। তখন হালাকু তাকে সসম্মানে গ্রহণ করে এবং সে তার সাক্ষাত থেকে ফিরে মাওসিলে কয়েকদিন অবস্থান করে, অতঃপর মৃত্যুবরন করলে তাকে মাদরাসা বাদ রিয়াতে দাফন করা হয়। তার উত্তম জীবন চরিত্রের কারণে লোকজন তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শায়খ ইয়যুদ্দীন তার পৃষ্ঠপোষকতার 'আলকামিল ফিত্ তারীখ' পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নামক গ্রন্থ সংকলণ করেন। তখন বদর তাকে বিরাট বখসিশ প্রদান করেন। কোনো কোনো কবিকে তিনি হাজার দীনার পর্যন্ত প্রদান করেন। তারপর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র সালিহ ইসমাঈল। এই বদরদ্দীন লু'লু মূলত একজন আর্মেনীয় ক্রীতদাস ছিল। তাকে জনৈক দর্জি খরিদ করে। অতঃপর সেখান থেকে সে সুলতান নূরুদ্দীন আরসালান শাহ ইবন্ ইয্যুদ্দীন মাসউদ ইবন্ মাউদুদ ইবন্ যানকী ইবন্ আকাসনাকার আতাবিকী যিনি মাওসিলেন তৎকালীন শাসক ছিলেন, তার হাতে আসে। বদর দেখতে সুদর্শন ছিলেন, ফলে তিনি সুলতানের প্রিয় নামে পরিণত হন এবং নিজ যোগ্যতা বলে পদোন্নতি লাভ করতে থাকেন। এমনকি কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। অতঃপর তিনি তার উস্তাদের পুত্রদের একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করতে থাকেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ থাকে না। তখন তিনি একছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসেন। প্রতি বছর তিনি হযরত আলী (রা)-এর মাযারে হাজার দীনার ওজনের স্বর্ণনির্মিত ঝাড়বাতি পাঠাতেন। নব্বই বছর বয়সেও সুঠাম দেহ কাঠামো এবং মুখমণ্ডলের কারণে তাকে পূর্ণ যুবক বললে ভুল হতো। সাধারণ মানুষ তাকে স্বর্ণ-শাখা বলে অভিহিত করতো। তিনি ছিলেন উঁচু মনোবলের অধিকারী, দূরদর্শী, ধূর্ত এবং কুটকৌশলী। হযরত 'আলী (রা)-এর মাযারে তার স্বর্ণপ্রদীপ প্রেরণ তার বুদ্ধি স্বল্পতা ও শিয়া-প্রবণতার প্রমাণ বহন করে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক অবহিত।

সুলতান নাসের দাউদ মুআয্যম

শায়খ কুতুবুদ্দীন য়ুনানী তার "তায়য়ীল আলাল মিরআতে" গ্রন্থে বছরের আলোচনার তার জীবনী আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি অতি বিশদ আলোচনা করেছেন, এবং তার সকল ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। আমরা ঘটনাসমূহের বর্ণনায় তার জীবনী উল্লেখ করেছি এবং এ ঘটনাও উল্লেখ করেছি যে, তিনি ৪৭ হিজরীতে খলীফা মুস্তা'সিমের কাছে এক লক্ষ দীনার সম-মূল্যের অর্থসম্পদ আমানত রাখেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তা অস্বীকার করে বসেন। তখন তিনি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মানুষের সুপারিশের মাধ্যমে তা ফিরে পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই কোন কাজে আসেনি। আর ইতেপূর্বে এ আলোচনা গত হয়েছে, জনৈক কবিকে তিনি খলীফার প্রশংসায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার বিষয় শোধরে দেন এবং নিদ্বির্ধায় সঠিক সত্য প্রকাশ করে। তখন খলীফা তাঁর এই সৎ সাহসে এবং নির্ভীক সততার তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন। এবং ঐ কবি ওয়াজীহ ফাযারীকে মিশরে নির্বাসনে পাঠান সুলতান নাসের দাউদ বুওয়ায়া নামক জনপদে মৃত্যুবরণ করেন, তার জানাযার দামেশকের প্রশাসক নিজে উপস্থিত হন।

৬৫৭ হিজরীর সূচনা

এ বছর যখন শুরু হয় তখন মুসলমানদের কোন খলীফা ছিল না। আর এ সময় দামেশকও হালকের শাসনকর্তা ছিলেন। সুলতান নাসের' সালাহুদ্দীন য়ুযুক ইবন্ আযীয মুহাম্মাদ ইবন্ আবু যাহির গাযী ইবন্ নাসির সালাহুদ্দীন।

তারা নূরুদ্দীন আলী ইবন্ মইয আইবেক তুর্কমানীকে শাসনকর্তৃত্ব অর্পন করে তাকে মানসূর বা 'সাহায্যপ্রাপ্ত 'বিজয়ী' উপাধি প্রদান করে। এদিকে সম্রাট হালাকু দামেশক শাসক সুলতান নাসেরের তলব করে দূত পাঠান। তখন নাসের তার পুত্রকে বিপুল পরিমাণ উপহার উপঢৌকনসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু হালাকু খাঁ এটাকে কোনো গুরুত্ব দিলেন না, বরং তিনি নিজে হাযির না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন এবং তার পুত্রকে বন্দি করে বলেন : আমি নিজেই তার দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এ সংবাদে সুলতান নাসির ঘাবড়ে যান এবং তার স্ত্রী ও স্বজন পরিজনদের কারকে পাঠিয়ে দেন। এ সময় দামেশকবাসী ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বিশেষত যখন তাদের কাছে এই সংবাদপৌছে যে, তাতারীবাহিনী ফোরাত নদী অতিক্রম করেছে। অথবা তাদের অনেকে মিশর অভিমুখে অগ্রস হয়। তখন শীতকাল থাকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অনেকে মৃত্যুবরণ করে এবং অনেকে সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

এদিকে হালাকু খাঁ তার ফৌজ ও সেনাবাহিনী নিয়ে শাম অভিমুখে অগ্রসর হয়। এ সময় মায়াফারিকীন শহর দেড় বছর পর্যন্ত তার কাছে দুর্ভেদ্য হয়ে থাকে। তখন তিনি সেখানে তার পুত্র আশমূতকে প্রেরণ করেন এবং সে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা জয় করে এবং তার শাসক কালিন ইবন্ শিহাব দাযী ইবন্ আদিলকে বন্দি করে তার পিতা হালাকু খাঁর কাছে প্রেরণ করে। এ সময় হালাকু খাঁ হালব অবরোধ করে রেখেছিল। এমতাবস্থায়, তিনি সুলতান কামিলকে তার সামনে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং সুলতান আশরাফের জনৈক ক্রীতদাসকে হালবের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। হত্যার পর সুলতান কামিলের কর্তিত মস্তক দেশে দেশে প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং সবশেষে তার কর্তিত মস্তক দামেশকে পাঠানো হয় সেখানে নির্ধারিত স্থানে জনসমক্ষে কয়েকদিন রাখার পর নির্ধারিত স্থানে সমাহিত করা হয়। ঐতিহাসিক আবূ শাসা এ বিষয়ে একটি শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তাতে তিনি তার গুণ, সংগ্রাম এবং হযরত হুসায়ন (রা) এর সাথে তার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাকে মাযলূম অবস্থায় হত্যা করা হয় এবং তার কর্তিত মস্তক হযরত হুসায়নের কর্তিত মস্তকের পাশে দাফন করা হয়।

এ বছরই খাজা নাসীরুদ্দীন তূলী মারাগা শহর নির্মাণ করেন এবং বাগদাদের অনেক ওয়াকফকৃত কিতাবাদী সেখানে স্থানান্তরিত করেন। এছাড়া তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাও অনুশীলনের জন্য একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি নির্ধারিত সম্মানীর বিনিময়ে দার্শনিক নিয়োগ করেন। প্রত্যেকের জন্য দৈনিক তিন দিরহাম, তদ্রুপ একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করে চিকিৎসকের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। এছাড়া তিনি একটি ফিকহী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে একজন ফকীহে দৈনিক ভাতা নির্ধারণ করেন দুই দিরহাম। আর তার প্রতিষ্ঠিত দারুল হাদীস বা হাদীস চর্চাকেন্দ্র একজন মুহাদ্দিসের

দৈনিক ভাতা ছিল অর্ধ দিরহাম। আর এ বছরই দামেশক শাসক নাসের ইবন্ 'আযীযেব পক্ষ থেকে তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিশরীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করে কাযী ওযীর কামালুদ্দীন উমর ইবন্ আবু জাবাদা, যিনি ইবন্ আদীম নামে সুপরিচিত মিশর দেশে আগমন করেন। তিনি এ সংবাদও নিয়ে আসেন সে তাদের শামদেশে আগমনকাল ঘনিয়ে এসেছে এবং তারা ইতোমধ্যেই দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়েছে। এছাড়া হালাকু পুত্র আশসূত ফোরাত নদী অতিক্রম করে হালকের উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছে। এ সকল অবস্থা বিবেচনা করে তখন তারা মানসূর ইবন্ মুইয তুকমানীর উপস্থিতিতে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে যেখানে উপস্থিত ছিলেন মিশরের কাযী বদরুদ্দীন সানজারী, শায়খ ইয়যুদ্দীন আব্দুস সালাম প্রমুখগণ, এ সময় তার ফৌজের সহযোগিতার জন্য জনসাধারণ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার ভিত্তি ছিল শায়খ ইবন্ আবুদস সালামের বক্তব্য, আর তার বক্তব্যের সারকথা ছিল যে, যখন বায়তুল মালে কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না, তখন তোমরা নারীদের গহনাও অলঙ্কারাদি ব্যয় করে ফেলত। তোমরা এবং সাধারণ প্রজাগণ একই ধরনের পোশাক পরিধান করে। আর ব্যতিক্রম থাকতে পারে শুধু যুদ্ধাস্ত্রের বিষয়ে। আর অবস্থা তখন এই স্তরে উপনীত হয় যে, সৈনিকের জন্য তার আরোহনের অশ্ব ব্যতীত অন্য কোনো বাহন নেই, তাহলে শাসকের জন্য বৈধ হবে শত্রু বিতাড়নের জন্য সাধারণ মানুষ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। কেননা, দেশ যখন শত্রু কবলিত হয়, তখন নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা সকলের জন্য ওয়াজিব হয়ে যা।

মুযাফফর কাত্য-এর শাসনকর্তৃত্ব :

এ সময় আমীর সায়ফুদ্দীন কাত্য তার উসতাদ পুত্র নূরুদ্দীন আলী যিনি আলমানসুর' বা সাহায্যপ্রাপ্ত তাকে গ্রেফতার করেন। আর তিনি এটা করেন মানসূরের পিতার আযাদকৃত অধিকাংশ আমীর উমরাদের অনুপস্থিতিতে আর অন্যদিকে অনেকে এ সময় শিকারে ছিলেন। নূরুদ্দীনকে গ্রেফতার করার পর সায়ফুদ্দীন তাকে তার মাতা দুইপুত্র ও ভাইদের সাথে আশ্‌কাবী অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং নিজে 'বিজয়ী সুলতান' নামধারণ করে শাসন কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করেন। আর এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থকে মুসলমানদের জন্য রহমত স্বরুফ। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে তাতারীদের পর্যুদস্ত করেন। যেমন তার বিবরণ অচিরেই আসছে, আর শাসন কর্তৃত্ব জবরদখলের ব্যাপারে ফকীহগণ, কাযীগণ এবং ইবন্ আদীমের কাছে তার এই ওযরের কথা যে, শাসককে অবশ্যই পরাক্রমশালী হতে হব, যিনি মুসলমানদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। আর এতো হল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যে রাষ্ট্র পরিচালনার কিছুই বুঝে না। এছাড়া এ বছরই দামেশক প্রশাসক সুলতান নাসের 'ওয়াতা' অভিমুখে অগ্রসর হন। আর তিনি বিপুল সংখ্যক নিয়মিত যোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু তিন যখন তাতারীদের মোকাবেলায় এই বাহিনীর দুর্বলতার কথা জানতে পারেন, তখন এই সম্মিলিতবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, এবং না তিনি, আর না তারা কেউই সামনে অগ্রসর হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আর এ বছরই ইনতিকাল করেন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেঃ

সদরুদ্দীন আসআদ ইবন্ মুনজাত ইবন্ বারাকাতদ ইবন্ মুআম্মাল

ইনি হলেন আত্তানূখী, আল মাগরিবী, অতঃপর দামেশকী এবং হাম্বলী তিনি বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী এবং মহানুভব ও পদান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের কন্যারে মাদরাসা সদরিয়ার ওয়াকফকারি প্রতিষ্ঠাতা। তার কবর জামে উমাবীর একপ্রান্তে। বেশ কিছুকাল তিনি জামের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এ সময় তিনি বেশ কিছু জিনিস নতুনভাবে করেন। আগে তিনি দাস ব্যবসায়ী এবং স্বর্ণকারদের স্থান পরিবর্তন করেন এবং বেশকিছু দোকান পুনঃনির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই মসজিদের অনুকূলে দান করেন। তিনি প্রচুর দান সদকা করতেন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণ রৌপ্যে পরিবর্তন করার বিদ্যা জানতেন। তবে আমার মতে এটা সঠিক তথ্য নয়। আর আল্লাহ সর্বাধিক জানেন,

শায়খ য়ূসুফ আকমীনী

তিনি আকমীনী নামে পরিচিত লাভ করেন; কেননা, তিনি সুলতান নূরুদ্দীন হাম্মামখানার 'কামীন'বা জ্বালানী কাঠ সংরক্ষণের স্থানে রাত্রিযাপন করতেন। তিনি মাটি হেঁচড়ানো লম্বা কাপড় পরিধান করতেন। পরিধেয় কাপড়ে পেশাব করতেন এবং মাথা উন্মুক্ত রাখতেন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তার কাশফের বিভিন্ন আস্থা রয়েছে। অনেক সাধারণ মানুষ তাকে নেককার ওলী বলে গণ্য করে থাকে। আর এর কারণ নেককার ও ওলী হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত প্রয়োজন যে সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা তারা জানে না যে, কাশফের অবস্থা যেমন নেককার ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায়, তেমনি তা অনেক সময় ফানিক ফাজির ব্যক্তি থেকেও প্রকাশ পায়। মু'মিন থেকে যেমন প্রকাশ পায়। তেমনি কাফির থেকেও প্রকাশ পায়, যেমন যাজক সন্ন্যাসীগণ, দাজ্জাল, ইবন্ দূয়াদ ও অন্যান্যরা, কেননা জিনরা কান পেতে বিক্ষিপ্ত কিছু শুনে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। আর ঐ ব্যক্তি কীভাবে নেককার হতে পারে যে বিকৃত মস্তিষ্ক হয় অথবা নাপাক কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকে? সুতরাং কাশফের অধিকারী ব্যক্তিকে কিতাব সুন্নাহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। এই মানদণ্ডের উত্তীর্ণ হবে, অর্থাৎ যার অবস্থা কিতাব সুন্নাহর বর্ণনার অনুকূল হয়ে সে নেককার লোক, তার কাশফের অবস্থা থাকুক বা না থাকুক। আরযার অবস্থা কিতাব সুন্নাহর অনুকুল নয়, সে নেককার লোক হতে পারে না। তার কাশফের অবস্থা হোক বা না হোক।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন : তোমরা যদি কাউকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখ, কিংবা বাতাসে উড়তে দেখ, তবুও কিতাব সুন্নাহর মাপকাঠিতে যাচাই না করে তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। মৃত্যুর পর এই ব্যক্তিকে কাসীয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কবরস্থানে দাফন করা হয়", তার ভক্তদের অনেক-কে তার কবরকে কারুকার্যখচিত করে, পালকের নকশা খোদাই ইত্যাদি করে সেটাকে সামান্য পরিণত করার চেষ্টা করে। আর এসবই বিদআত, এই ব্যক্তি এ বছর শাবান মাসের ছয় তারিখে ইনতিকাল করে। বলা হয় যে, হৈ ব্যক্তির জীবদ্দশায় শায়খ ইবরাহীম ইবন্ সায়ীদ মায়আনা তার শহরে প্রবেশ করার সাহস পেতেন না। অতঃপর তার মৃত্যু দিবসে তিনি সেখানে প্রবেশ করেন। এ সময় সাধারণ লোকজন তার সাথে ছিল। তারা যখন তার সাথে দামেশকে প্রবেশ করে, তখন তারা চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে যে, আমরা শহরে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়েছি। আসলে এরা ছিল যেকোন

হাঁকডাককারীর অনুসারী। তাদের কাছে ইলমের কোনো আলো ছিল না, তখন জায়আনাকে বলা হয়েছে আজকের পূর্বে এশোহরে প্রবেশ করা থেকে কিসে আপনাকে বাধা দেয়? তখন সে বলে : যযখনই আমি শহরের কোনো প্রবেশ দ্বারে আসতাম তখনই হিংস্র পশুকে প্রহরারত অবস্থায় দেখতে পেতাম। ফলে আমি তাতে প্রবেশ করতে অক্ষম ছিলাম, তার বসবাস ছিল, শাগুর অঞ্চলে। কিন্তু এটা হলো মিথ্যা, শঠতা ও ভেল্কিছাড়া কিছু নয়। জায়আনাকে তার পাশে পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয়, আর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন।

মুহাদ্দিস শামস ইবন্ আলী ইবন্ শাব্বী

তিনি ছদর বাকরীর স্থলাবর্তী ছিলেন। নিজে নিজে তিনি অনেক অধ্যয়ন করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করান। এছাড়া তিনি নিজ হাতে অনেক কিছু লিখেন।

শাতেবিয়্যার ব্যাখ্যাকার আবূআবদুল্লাহ্ ফাসী

তিনি তার উপাধি বা উপনাম দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বলা হয় যে তার নাম হল কাসিম, তিনি হালবে ইনতিকাল করেন। তিনি আরবি ভাষা, কিরআত শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। শাতেবিয়্যার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা সংকলন করেন। শায়খ আবূ শালা এর প্রশংসা করেছেন।

সাননাজম আখূ বদর মুফাযযল

তিনি কালশাতে ফাদিলিয়্যাদের শায়খ ছিলেন। সালাকী শায়খ বদরুদ্দীন যাহইয়া ইবন্ ইয়যুদ্দীন আবদুয় সালামের পক্ষ থেকে তার ইজাযত ছিল। তাকে বাসেগীরে দাফন করা হয়। তার জানাযায় প্রচুর লোক সমাগম হয়, আল্লাহ তাকে রহম করুন।

সা'দুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ শায়খ মুহীরুদ্দীন ইবন্ আরবী

ঐতিহাসিক আবু শামা তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার সাহিত্য ও কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। তবে সে এই প্রশংসার উপযুক্ত হবে, যদি সে তার পিতার অনুগামী না হয়ে থাকে। আবূ শাসা এ বছরে নাসির দাউদের ওফাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

সায়ফুদ্দিন ইবন্

ইনি ছিলেন পুলিশ বাহিনীর নির্বাহী কর্মকর্তা। ঐতিহাসিক আবূ শামা উল্লেখ করেছেন যে, তার মৃত্যুর পর একটি সাপ এলে তার উরুদ্বয়ে দংশন করতে থাকে। কেউ কেউ বলেন, এই সাপটি তার কাফনের সাথে পেচিয়ে যায় এবং কেউ তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। আবূ শামা বলেন : বলা হয় যে, সে ছিল খবীছ রাফেযী এবং মদাসক্ত। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

নাজীব ইবন্ শুআয়শিআ দামেশ কী

ইনি ছিলেন–দামেশকের একজন মান্যগণ ব্যক্তি। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তার বাড়িটি তিনি দারুল হাদীসরূপে ওয়াকফ করে দেন। এই গৃহেই আমাদের শায়খ হাফিয মুয়দী দারুল হাদীস আশরাফিয়্যতে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে বাস করতেন। আবূ শামা বলেন : ইবন্ শুআয়শিআ অর্থাৎ নজীব আবুল ফাতহ নাসরুল্লাহ ইবন্ আবূ তালিব শায়বানী মিথ্যাচার ও শিথিল ধার্মিকতা ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধ ছিল। সে ছিল মিথ্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত সাক্ষীদের

একজন। তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। আহমাদ ইবন্ য়াইয়া, যার উপাধি ছিল ছদর ইবন্ সানীয়ুদ্দৌলা, তিনি একজন দামিশকের কাযী থাকাকালীন তাকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিত করেছিলেন। জনৈক কবি তার ব্যাপারে বলেন : হতভাগা শুআয়শিআ বলেছে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ধিক! তোমাদের থেকে যা প্রকাশ গেল, তাতে আর কী বাকী থাকে? কিয়ামতের ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে, নাকী দাজ্জাল বের হয়েছে? না কী সুপথ প্রাপ্ত মানুষের আকাল পড়েছে? আশ্চর্য হতে হয় এমন এক শিথিল আকীদার অধিকারী এবং জাহিল সম্পর্কে, যাকে তার সাক্ষীর আসনে বসার অনুমতি দিয়েছে। ঐতিহাসিক আবূ শালা বলেন : ৬৫৭ হিজরীতে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, যে ছিল নাস্তিক, দর্শন এবং এ জাতীয় শাস্ত্রচর্চাকারি এবং মুসলমানদের মাদরাসাসমূহে বসবাসকারি, সে তার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা একদল মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করেছিল। তার পিতা দাবী করতো যে সে হল রায় শহরের খতীব, একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা রাযীর শিষ্য।

৬৫৮ হিজরীর সূচনা

এ বছর সূচিত হয় বৃহস্পতিবার খলীফা শূন্য অবস্থায় এ সময় বসরা কূফা খোরাসান ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় শহরের শাসনকর্তৃত্ব ছিল তাতারী সম্রাট হালাকু খাঁর হাতে, আর মিশরীয় অঞ্চলের শাসক ছিলেন সুলতান সায়ফুদ্দীন কতল, যিনি মুলত সুলতান মুইস আইবেক তুর্কমানীয় দাস। আর দামেশক ও হলব ছিল সুলতান নাসের ইবন্ আযীয ইবন্ যাইরের শাসনাধীন এবং কারক ও শাওবাক ছিল সুলতান মুগীছ ইবন্ 'আদিল ইবন্ কামিল মুহাম্মাদ ইবন্ আদিল আবূ বকর আয়ুবের কর্তৃতাধীন, এই সুলতান মুগীছ দামেশক প্রশাসকে সুলতান নাসেরের সঙ্গে মিশরীয়দের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তাদের সাথে ছিলেন আমীর রুকুনুদ্দীন ত্রীবারস বন্দুকধারী। তারা সকলে মিশরীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং তাদের থেকে মিশরের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়ার সংকলন করেন। লোকজন যখন এই যুদ্ধাবস্থায় ছিল, তখন একের পর এক নিশ্চিত খবর আসতে থাকে যে, তাতারীরা শাস আক্রমণ করবে। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাতারবাহিনী হালাকু খাঁর নেতৃত্বে ফোরাত নদী পার হয়ে এ বছর সফর মাসের দ্বিতীয় দিনে হালবে পৌঁছে যায় প্রথমে তারা সাত দিন হালব শহর অবরোধ করে রাখে, অতঃপর শহরবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তা জয় করে। অতঃপর তারা হালববাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। এ সময় তারা ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে এবং নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী করে। হালববাসীদের অবস্থাও বাগদাদ বাসীদের অনুরূপ হয়। তাতারীরা লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে শহর তছনছ করে ফেলে এবং শহরের সম্মানীদের অপদস্থ করে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এ সময় হলব শহরের দূর্গ একমাস তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বজায় রাখে। অতঃপর তারা জানমালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দূর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। তার তাতারীরা নগর প্রাচীর এবং দুর্গ প্রাচীর সব ধ্বংস করে ফেলে এবং হলব শহরের অবস্থা দাঁড়ায় চর্মরোগে ক্ষতবিক্ষত গাধার মত। এ শহরের শাসক ছিলেন সুলতান তুরান শাহ। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, কিন্তু তার ফৌজ তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে। আর আল্লাহর

ফয়সালা তো পূর্ব নির্ধারিত। এ সময় হালাকু খাঁ হালববাসীদের কাছে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে আমরা মূলত এসেছি দামেশক সুলতান নাসেরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এ লড়াইয়ে যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে দেশ চলবে আমাদের হুকুমে, আর যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে তোমাদের করণীয় তোমরা স্থির করবে। কিন্তু তার কৌশলে না ঘাবড়ে তারা তাকে উত্তর দিল, আমাদের সঙ্গে তোমরা জন্য তরবারি ছাড়া আর কিছু নেই। তখন হালাকু খাঁ তাদের দুর্বলতা এবং প্রদুত্তরের দৃঢ়তায় বিস্মিত হলেন। এরপর তিনি স্বসৈন্যে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। আর যা হবার ছিল তাই হল। হালবয়ের পর হিমা প্রশাসক তার কোষাগারের চাবিসমূহ হালাকু খাঁর কাছে দেয়। এ সময় হালাকু খাঁ অনারব এক ব্যক্তিকে হালবের স্থলাবর্তী শাসকরূপে নিয়োগ করেন, যিনি নিজেকে খালিদ ইবন্ ওয়ালিদের অধঃস্থন পুরুষ বলে দাবী করতেন। হালাকুবাহিনী হালবের ন্যায় এই হিমা শহরের নগর প্রাচীর ধ্বংস করে।

তাতারীদের দামেশক দখলের বিবরণ

হালাকু খাঁ হালব আবরোধ করা অবস্থায় তার জনৈক বড় সেনাপতির অধীনে দামেশকে ফৌজ প্রেরণ করেন। তারা সফর মাসের শেষ দিকে দামেশকে উপনীত হয় এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তা দখল করে নেয়। বরং শহরের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদেরকে স্বাগত জানায়। দামেশক দখলের সময় হালাকু খাঁ শহরতালীর জন্য নিরাপত্তাপত্র লিখে পাঠান এবং তা উন্মুক্ত ময়দানে পাঠ করে শহরবাসীকে শোনানো হয়। ফলে মানুষ কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করে। এদিকে দামেশক শহরের দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য, দুর্গচূড়ায় প্রস্তর নিক্ষেপ যন্ত্র স্থাপিত ছিল এবং অবস্থা ছিল সংকটপুর্ণ। দুর্গ আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাতারীবাহিনী চাকাযুক্ত প্রস্তর নিক্ষেপযন্ত্র সংগ্রহ করে, যা ঘোড়ার সাহায্যে টেনে নেয়া হতো, তারা এই বিশেষ প্রস্তর নিক্ষেপকযন্ত্র কেল্লার পশ্চিম প্রান্তে স্থাপন করে এবং দুর্গের দেয়ালে ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে দুর্গের উপরের অংশের বিরাট ক্ষতি সাধন করে এবং গোটা দুর্গ ধ্বংস করার উপক্রম হয় ফলে নিরুপায় হয়ে দুর্গ প্রধান সে দিন শেষ বেলায় তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সন্ধির জন্য নেমে আসেন। তখন তাতারীরা এই দুর্গ জয় করে এবং দুর্গ চূড়াসমূহ ভূপতিত করে। আর এটা সংঘটিত হয় এ বছর জুমাদাল উলা মাসের মাঝামাঝি সময়ে, দুর্গজয়ের পর তারা দুর্গপ্রধান বদরুদ্দীন ইবন্ কুরাযাকে এবং তার নির্বাহী জামালুদ্দীন ইবন্ সায়রাফীকে আল-হালবীকে হত্যা করে। এরপর তারা শহর ও শহর দুর্গের কর্তৃত্ব অর্পণ করে আবালসায়ান নামক তাদের এক আমীরের হাতে। আর এই নরাধম খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো, ফলে স্থানীয় পাদ্রী ও যাজকগণ তার সাথে সাক্ষাত করলে তাদেরকে খুব সম্মান করে। এমনকি সে তাদের গির্জাসমূহ পরিদর্শনও করে। ফলে তার কারণে দামেশকবাসী খ্রিষ্টানরা বেশ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। এরপর তাদের একটি দল বিভিন্ন প্রকার উপহার উপঢৌকন নিয়ে হালাকু খাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। এরপর তারা তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ফরমান নিয়ে ফিরে আসে। এসময় তারা প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করে এবং নিজেদের সাথে সর্বসমক্ষে ক্রুশসঙ্গে করে নিয়ে আসে। এ সময় তারা তাদের শ্লোগান দিয়ে উচ্চস্বরে বলছিল ঃ-

'সহীহ দীন মসীহ এরদীন' বিজয় লাভকরেছে। এছাড়া এ সময় তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কুৎসা গাইছিল এবং তাদের সাথে বহনকৃত মদের পাত্র থেকে মসজিদসমূহের দরজায় মদের ছিটা দিচ্ছিল, এমনকি তারা পথচারী লোকজনের চোখে মুখেও মদের ছেটা দিচ্ছিল। এমনকি তারা অলিতে গলিতে এবং বাজারে যে সকল লোকজন ছিল, তাদের সকলকে ক্রুশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছিল। এ সময় তারা 'দারাবুল হাজার' বা 'প্রস্তর দ্বার' দিয়ে দামেশককে প্রবেশ করে এবং শায়খ আবুল বায়ানের মুসাফিরখানার সামনে সেখানে মদ ছিটিয়ে দেয়। তদ্রুপ সেখানে অবস্থিত ছোট বড়; মসজিদের দরজাতেও মদ ছিটিয়ে দেয়। এ সময় তাদের পাদ্রী বাজারে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রশংসা করে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা করে, ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অতঃপর তারা মারয়াম গির্জায় প্রবেশ করে এবং তা তাদের ভিড়ে জনাকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে এটাই তা বিরান হওয়ার কারণে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক কুতুবদ্দীন তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ সময় দামেশকবাসী খ্রিষ্টানরা মারয়াম গির্জায় গির্জা ঘণ্টা বাজায়।

তিনি বলেন যে, তারা জামে দামেশককেও মদ নিয়ে প্রবেশ করেছিল। আর তাদের নিয়ত ছিল যদি সেখানে তাতারীদের অবস্থান দীর্ঘ মেয়াদী হয়, তবে তারা অনেক মসজিদ ইত্যাদি বিরান ও ধ্বংস করবে, শহরে তখন এই অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন মুসলমান কাযী, ফকীহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে কেল্লায় প্রবেশ করে কেল্লাপ্রধানের নিকট এ ব্যাপারে সম্মিলিত অভিযোগ দায়ের করলেন। তখন তাদেরকে অপমানিত করে বিতাড়িত করা হলো এবং খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের বক্তব্য গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হলো। ইন্নলিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলায়হি ওয়া রাজিউন। এ সবই সংঘটিত হয় এ বছরের প্রথম দিকে, যখন সামদেশের শাসক হলেন সুলতান নাসের ইবন্ আযীয। এ সমসয় তার সাথে তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা ছিল, যাদের মাঝে ছিলেন অনেক আমীর উমারা ও শাহজাদাগণ। এদের অন্যতম হলেন আমীর বাবারস বন্দুকধারী। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ঐক্য ছিল না। এমনকি উমারাদের একটি দল সুলতান নাসেরে বায়আত প্রত্যাহার করে তাকে বন্দি করার এবং তার সহোদর সুলতান যাহিরের হাতে রায়আতের দৃঢ়সংকল্প করেন। তাদের এই মনোভাব জানতে পেরে সুলতান নাসের কেল্লায় পলায়ন করেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় আমীর রুকুনুদ্দীন ধারারস তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে গাদার দিকে চলে যান। তখন সুলতান মুযাফফর কুতুব তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানান এবং তাকে কালয়ূপ অঞ্চলের জায়গীর প্রদান করেন। এ সময় তিনি তাকে ওযীর নিবাসে অবস্থান করেন এবং তার কাছে তিনি বিরাট মর্যাদা লাভ করেন। অবশ্য পরবর্তীতে তার হাতেই তিনি নিহত হন।

আয়ন জালূতের যুদ্ধ

এসব ঘটনাই সংঘটিত হয় এ বছর রমযান মাসের শেষ দশ দিনে। তিনদিন অতিবাহিত হতে না হতেই 'আয়রে জালূত' নামক স্থানে তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ আসে। আর বিজয় এসেছিল এভাবে। মিশর প্রশাসক সুলতান মুযাফফর কুতবের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছিল যে, তাতারীরা শাম দখলের পর সেখানে সর্বাত্মক লুণ্ঠনযজ্ঞ চালিয়ে গাযায় উপনীত হয়েছে এবং তারা মিশর দখলের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এদিকে দামেশক

প্রশাসক সুলতান নাসের এ সময় মিশর গমনের সংকল্প কারে। হায় যদি তিনি তা করতেন। আর সাহচর্যে ছিলেন হিমা-প্রশাসকে সুলতান মানসূর এবং বেশ কয়েকজন আমীর উমারা ও শাহজাদা, এ সময় সুলতান মুযাফফর কতক হিমা প্রশাসককে সম্মানিত করেন এবং তাকে তার শহরের শাসক কর্তৃত্ব অর্পণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। এদিকে সুলতান নাসের মিশরে প্রবেশ না করে বানূ ইসরাঈলের আবাস ভূমিতে ফিরে যান। আর সঙ্গে যারা ছিল,তাদের অধিকাংশ মিশরে প্রবেশ করেন। তিনিও যদি মিশরে প্রবেশ করতেন। তাহলে তার পরিণাম তুলনামূলক ভাল হতো। কিন্তু মিশরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে তাদের থেকে ভীতিবোধের কারণে তিনি 'কারক' অভিমুখে গমন করেন এবং সেখানে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। হায় যদি তিনি তাতে অব্যহৃত থাকতেন। কিন্তু তিনি প্রাণভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখান থেকে মরুভূমির অভ্যন্তরে অগ্রসর হন এবং জনৈক বেদুঈন গোত্রপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তাতারীরা তাকে ধাওয়া করে এবং তার আশ্রয়দাতা গোষ্ঠীর পশুপাল ধ্বংস করে বাড়িঘর বিরান ও জনশূণ্য করে। সেখানে তারা নির্বিচারে শিশু ও বয়স্কদের হত্যা করো এ সময় তারা ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বেদুঈন আবরদেরকে আক্রমণ করে তাদের অনেককে হত্যা করে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধ বন্দি করে। কিন্তু এরপর বেদুঈন আরবরা তাদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ বছর শাবান মাসের মাঝামাঝি সময় তারা তাতারীবাহিনীর অশ্ব পালকে আক্রমণ করে সেগুলি সব হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। তখন তাতারীরা তাদের কিছু ধাওয়া করে, কিন্তু তারা তাদের কোন চিহ্নই খুঁজে পায়নি এবং তাদের একটি ঘোড়াও উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে তাতারীরা সুলতান নাসেরকে পাকড়াও করার জন্য পিছে লেগে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাকে যীজী জলাশয়ের কাছে গ্রেফতার করে এরপর তাকে তার পুত্র আযীয ও তার সহোদরসহ সকলকে সম্রাট হালাকু খাঁর কাছে প্রেরণ করে। এরপর তাকে এবং তার পুত্রদেরকে পরবর্তী বছর হত্যা করা হয়, যেমন আমরা উল্লেখ করব।

মোটকথা সুলতান মুযাফফরের কাছে তখন সুরক্ষিত শামে তাতারীদের আক্রমন ও গণ হত্যাও লূণ্ঠনের কথা এবং তাদের মিশরে প্রবেশের সংকল্পের কথা পৌছল। তখন তিনি তাদের পূর্বে নিজেই অগ্রসর হলেন এবং আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এরপর তিনি তার ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে শাম সীমান্তে উপনীত হলেন। এ সময় মুঘল বাহিনী[১] কাতাব গানারীনের নেতৃত্বে সন্ধি হয়। সেনাপতি এই যুদ্ধের পূর্বে হিমসের শাসক সুলতান আশরাফের সাথে এবং ইবন্ যাকীর সাথে পরামর্শ করে, তখন তারা তাকে মুযাফফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হালাকু খাঁর কাছে সাহায্যের আবেদনের পরামর্শ দিল। কিন্তু সে চাইল দ্রুত মুযাফফরের মোকাবিলা করতে। ফলে উভয় বাহিনী পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়। তাতারী ও মুসলিম বাহিনীর এই ঐতিহাসিক লড়াই সংঘটিত হয়, এ বছর রমযান মাসের পঁচিশ তারিখ শুক্রবার আয়ন জালুত নামক স্থানে, উভয় বাহিনী তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। সবচেয়ে আল্লাহ্র অনুগ্রহে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনী তাতায়ীদেরকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করে। এ সময় তারা তাতারী সেনাপতি ও তার বেশ

১। মুঘল দ্বারা এখানে তাতারী উদ্দেশ্যে।

কয়েকজন নিকটাত্মীয়কে হত্যা করে। বলা হয় যে, আমীর জামালুদ্দীন আকুশ শামসী তাতারী সেনাপতিকে হত্যা করে। এ সময় মুসলিমবাহিনী পরাস্ত তাতারী যোদ্ধাদের অনুসরণ করে পাইকারীভাবে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে। এ যুদ্ধে প্রশাসক সুলতান মানসূর সুলতান মুযাফফরের হয়ে তীব্র লড়াই করেন। তদ্রুপ আমীর ফারিসুদ্দীন আকতাই যিনি ছিলেন সেনাপতি, এ সময় তাতারীবাহিনীর যোদ্ধাদের থেকে সুলতান ইবন্ আযীয ইবন্ আদিলকে বন্দি করা হয়। তখন সুলতান মুযাফফর তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আর হিমসের শাসক সুলতান আশরাফও নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। কেননা, তিনি তাতারীদের সহযোগী ছিলেন এবং হালাকু খাঁ তাকে গোটা শামের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। সুলতান আশরাফের এই আবেদন গৃহীত হয়, সুলতান মুযাফফর তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং হিমসের শাসন কর্তৃত্ব তাকে ফিরিয়ে দেন। তদ্রুপ তিনি হালাহ শহরের প্রদান কর্তৃত্ব সুলতান মানসূরকে ফিরিয়ে দেন এবং তার সাথে তাকে মাআররা ও অন্যান্য কয়েকটি জনপদের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। এছাড়া তিনি আলীর শারাফুদ্দীন ঈসা ইবন্ মাহনা ইবন্ মানিতা-এর অনুকূলে সালামিয়া শহরের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন।

এদিকে আমীর ধীবারাস বন্দুকদারী এবং একদল সাহসী মুসলিমযোদ্ধা তাতারীদের ধাওয়া করে তাদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে করতে হালত পৌছে যান। আর দামেশক যে সকল তাতারী ছিল। তারা রমযানের সাতাশ তারিখ শনিবার সেখান থেকে পলায়ন করে। তখন মুসলমানগণ দামেশকে থেকে ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে এবং তাদের হাত থেকে বন্দীদের উদ্ধার করতে থাকে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং খ্রিস্টান, য়াহুদী এবং মুনাফিকদের লাঞ্ছিত করেন, তাদের অপছন্দ সত্ত্বেও আল্লাহ্র দ্বীন বিজয় লাভ করে। ক্রুশ বের করা হয়েছিল। তারা সেই গির্জার লুণ্ঠন করে তা জ্বালিয়ে দেয় এবং তার চারপাশে অগ্নিসংযোগ করে ফলে খ্রিষ্টানদের অনেক বাড়িঘর জ্বলে যায়, আল্লাহ তাদের ইহকাল ও পরকালের নিবাসকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করুন। কেউ নেই য়াহুদীদের গির্জা জ্বালিয়ে দেয়। আর মুসলমানদের একটি দল য়াহূদীদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন তাদেরকে বলা হয় : তারা অবশ্য খ্রিষ্টানদের মত কোন ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়নি। এছাড়া সাধারণ লোকজন জামে দামেশকের তাতারী মোসাহের রাফেযী এক শায়খকে হত্যা করে। তদ্রুপ তারা মুনাফিক মুসলমানদের একটি দলকেও হত্যা করে। এভাবে যালিমদের মূলোৎপাটন করা হয়। যার প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর। আর হালাকু খাঁ ইতোমধ্যেই শাম, জাযীরা, মাওসিল, মাবদীন, আকরাদ ইত্যাদি অঞ্চলের কাযী ও বিচারক নিয়োগ করেন কাযী কামালুদ্দীন উমর ইবন্ বিদার তাফলীসীকে। তিনি এর পূর্বে পনেরো বছর দামেশকে কাযী ছদরুদ্দীন আহমাদ ইবন্ য়াইয়া ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ সানীয়াদ্দৌলার নহিব বা সহকারীরূপে কাজ করেন। হালাকু খার নির্দেশনামা যখন রবিউল আউয়াল মাসের ছাব্বিশ তারিখে এসে পৌছলো, তখন জনসমক্ষে ময়দানে তা পাঠ করে শোনানো হয়। এবং নতুন কাযী দামেশকে একছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। অতঃপর অপসারিত দুই কাযী সদরুদ্দীন ইবন্ সানীয়ূদ্দৌলা এবং মুহীয়ূদ্দীন ইবন্ যাকী হালকে হালাকু খাঁর দরবারে হাযির হয়। এ সময় ইবন্ যাকী ইবন্ সানীয়ূৎদ্দৌলাকে না জানিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। দামেশকের কাযীর দায়িত্ব লাভ করে ফিরে আসেন।

অতঃপর ইবন্ সানীয়ূৎদ্দৌলা বালাবাক শহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর ইবন্ যাকী আগমন করেন। বিচারকরূপে নিয়োগ লাভের ফরমান নিয়ে এর স্বর্ণখচিত রাজ পরিধেয় প্রাপ্ত হয়। এরপর তিনি এই পোশাক পরিধান করে আবালসিনানের দরবারে উপবেশন করেন। এ সময় তাদের উভয়ের মাঝে অনাবৃতমুখে, আবালসিনানের স্ত্রী উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় ইবন্ যাকীর নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হয়। যখন হালাকু খাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তখন উপস্থিত লোকদের মাঝে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ছিটিয়ে দেয়া হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। আল্লাহ এদের সকলকে লাঞ্ছিত করুন।

ঐতিহাসিক আবূ শামা উল্লেখ করেছেন যে,ইবন্ যাকী তার এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বহু মাদরাসার কর্তৃত্ব লাভ করে, কেননা সে এই বছর পুর্ণ হওয়ার পূর্বেই অপসারিত হয়, আর এই সময়ের মধ্যেই সে মাদরাসা আয়রাবিয়া, মাদরাসা সুলতানিয়া, মাদরাসা ফালাকিয়া, মাদরাসা রুকনিয়া, মাদরাসা কায়মারিয়া এবং মাদরাসা আযীযিয়্যার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এছাড়া সে তার পুত্রের জন্য মাদরাসা আমীরিয়্যার শিক্ষকতা ও দামেশকের প্রধান শায়খের পদ সংরক্ষিত করে এবং তার জনৈক শিষ্য ইমাদ মিশরীয় জন্য মাদরাসা উম্মে সালিহ এবং অন্য এক শিষ্যের জন্য মাদরাসা শামিয়্যা বুররানিয়্যার শিক্ষকের পদ সংরক্ষণ করে। আর সে তার বৈপিত্রিয় ভাই শিহাবুদ্দীন ইসমাঈল ইবন্ আসতাদ ইবন্ হুবায়শকে নায়েবে কাযী নিয়োগ করেন এবং তাকে মাদসারা রাওয়াহিয়া এবং মাদরাসা শামিয়্যা বুররানিয়্যার নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

পরবর্তীকালে দামেশক ও অন্যান্য শহরের কর্তৃত্ব যখন মুসলমানদের হাতে ফিরে আসে। তখন সে কাযীর পদ লাভের জন্য এবং উল্লিখিত মাদরাসা সমূহের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বরং তাকে অপসারণ করে কাযী নাজমুদ্দীন আবূ বকর ইবন্ সদরুদ্দীন ইবন্ সানীয়্যুদ্দৌলাকে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর্ জামে দামেশকে জিলকদ মাসের একুশ তারিখে শুক্রবার জুমাআর নামাজের পর তার কাযীর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা পাঠ করে শোনানো হয়।

সুলতান মুযাফফর কুতুয আয়নে জালূতে তাতারী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার পর তাদেরকে ধাওয়া করেন। অতঃপর বিরাট শান শওকতের সাথে দামেশকে প্রবেশ করেন। লোকজন এ বিজয়ে অত্যন্ত খুশি হয় এবং তার জন্য অনেক দু'আ করে। এ সময় তিনি হিমসের শাসক সুলতান আশরাফকে তার শাসন কর্তৃত্বে বহাল রাখেন এবং হামা প্রশাসক মানসূরকেও বহাল রাখেন। আর হালাকু খাঁ থেকে হালবের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। এভাবে সত্যতার বিজয়ের পথে ফিরলো এবং সুলতান সত্যের পথ ও পদস্থকে সুগম করলেন। আর্ ইতোপূর্বে তিনি আমীর রুকুনুদ্দীন ধীরাসকে দূত পাঠিয়ে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি তাতারীদের হালব থেকে বিতাড়িত করতে পারেন। তাহলে তাকে হালবের শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে। অতঃপর তিনি যখন তাতারীদের হালব থেকে বিতাড়িরত করেন এবং হালবে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সুলতান মুযাফফর তার পরিবর্তে মাওসিল শাসকের পুত্র আলীউদ্দীনকে হালবের প্রশাসক নিয়োগ করেন। আর এ কারণে তারে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সুলতান মুযাফফরকে যখন শামদেশে তার শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। তখন

তিনি মিশর প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করেন। এ সময় তিনি দামেশকের শাসনকর্তৃত্ব তার স্থলাবর্তী করেন আমীর আলামুদ্দীন সানজার হালবীকে এবং আমীর মুজীরুদ্দীন ইবন্ হুমায়ন ইবন্ আকাশ তামারুকে। এছাড়া তিনি দামেশকের কাযীর পদ থেকে বিন যাকীকে অপসারণ করে ইবন্ সানিয়্যুদ্দৌলোকে তার স্থলাবর্তী করেন। অতঃপর তিনি যখন মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন মুসলিম ফৌজসমূহ তার সেবায় নিয়োজিত, আর তীব্র সমীহ বোধের কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার প্রতি বক্রদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করছিল।

সুলতান যাহির কায়বারাস বন্দুকদারী

এই ব্যক্তিকে বলা হয় সিংহপুরুষ। তার শাসন কর্তৃত্ব লাভের পূর্বকথা হল সুলতান মুযাফফর কুতুব যখন মিশরে ফিরে আসার পথে গাযালা ও সালেহিয়্যার মধ্যবর্তীস্থানে উপনীত হন, তখন একদল আমীর তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন নেককার, জামআতের পাবন্দ। এছাড়া তিনি সব ধরনের মন্দকর্ম এড়িয়ে চলতেন এবং সাধারণত রাজাবাদশারা যে সকল জীবনোপকরণে আসক্ত হয়, তিনি তা থেকে মুক্ত ছিলেন। তার শাসনকালের মেয়াদ ছিল তার উসতাদপুত্র মানসুর আলী ইবন্ মুইয তুর্কমানীর অপসারণ কাল থেকে তার নিহত হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ এ বছর জিলকদ মাসের শেস পর্যন্ত প্রায় এক বছর। আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সুলতান কুতুবের হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন আমীর রুকনুদ্দীন বায়বারাস, একদল আমীর উমারার সাথে তিনি তাকে হত্যা ব্যাপারে একমত হন। মিশর গমনের পথে তিনি যখন উল্লিখিত স্থানে পৌছেন, তখন তিনি ধনুক বের করে শিকারের উদ্দেশ্যে একটি খরগোশের পিছু নেয়। তখন ঐ আমীর উমারা সকলেই সেই খরগোশকে ধাওয়া করলেন। এ সময়ে রুকনুদ্দীন বায়বারস সুলতান কুতুবের কাছে কোনো এক ব্যাপারে সুপারিশ করলে তিনি তার সুপারিশ বকুল করেন। এরপর সে তার হাতে চুমু খাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তার হাত ধরলো। এমন সময় ঐ সকল আমীর উমারা তাকে একযোগে তরবারি দ্বারা আঘাত করলো। এ সময় তারা তাকে তার ঘোড়া থেকে ফেলে দিল এবং তীরবিদ্ধ করে হত্যা করলো। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। এরপর তারা কোষমুক্ত তরবারি হাতে তাদের তাঁবুতে ফিরে আসলো এবং সেখানে উপস্থিত লোকদের এ ব্যাপারে অবহিত করলো। তখন একজন বললো : কে তাকে হত্যা করেছে? উত্তরে বলা হলো : রুকনুদ্দীন বায়বারস। তখন সকলে তাকে প্রশ্ন করলো : তুমিই তাকে হত্যা করেছে? সে বললো : হ্যাঁ! তারা বললো : তাহলে তুমিই আমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত। কেউ কেউ বলেন : সুলতান কুতুব যখন নিহত হলেন, তখন আমীর উমারাগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, কাকে তারা শাসনকর্তৃত্ব অর্পন করবেন। কেননা, তাদের প্রত্যেকেই এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন। অবশেষে তারা বায়বায়াসের হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। বায়বারাস শীর্ষস্থানীয় উমারাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। কিন্তু অন্যরা চাইল তাকে যাচাই করতে। এ সময় তারা তাকে "আলমালিকুয্ যাহির" উপাধি দিল এবং সিংহাসনে আরোহন করলে। সুলতান বায়বায়াসের অভিষেক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রথার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় এবং জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন করা হয। আর এটা ছিল একটি স্মরণীয়

দিন। দায়িত্ব গ্রহণের পর সুলতান বায়বারসা আল্লাহ্র উমর ভরসা করেন এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি যখন মিশরে প্রবেশ করেন। তখন ফৌজ তার অনুগত। এরপর তিনি আলজাবাল দুর্গে প্রবেশ করে তার শাসন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। বিচার করেন, বায় প্রদান করেন, অপসারণ করেন, নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন বীর ও মহানুভব শাসক। মুসলমানদের এই কঠিন দুর্দিনে তার মত একজন শাসকেরই প্রয়োজন ছিল। ফলে আল্লাহ তাকে এ সময়ের জন্য নির্ধারণ করেন। প্রথমদিকে তিনি নিজেকে 'আলুমালিকুল কাহির'[১] উপাধি প্রদান করেন। তখন তার উযীর তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেন : এই উপাধি গ্রহণকারি সফল হতে পারে না। কাহির ইবন্ মু'আবিদ এই উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়নি, এমনকি তারপর আন্ত প্রত্যাহার করে তার চক্ষু উপড়ে ফেলা হয়। তদ্রুপ মাওসিলের প্রশাসক এই উপাধি গ্রহণ করেন, এরপর বিষপ্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়, ওযীরের এই বক্তব্য শোনার পর তিনি 'আলমালিক আয়যাইর' উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিশিষ্ট ও শীর্ষস্থানীয় আমীর উমারাদের যাদের মনে শাসন কর্তৃত্ব লাভের অভিলাষ আছে, তাদেরকে গ্রেফতার করে তার শাসন কর্তৃতের পথ সুগম করেন। এদিকে হালাকু খাঁর কাছে যখন আয়নে জালুতে মুসলিমবাহিনীর হাতে তার বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছলো, তখন সে মুসলমানদের হাত থেকে শাম উদ্ধারের জন্য তার নিকট থেকে বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু তার সে অভিষাল পূর্ণ হয়নি। ফলে তার প্রেরিত বাহিনী ব্যর্থ ও বিফল হয়ে ফিরে আসে।

আর তাতারীদের এই ব্যর্থতার মূলে ছিলেন, অদম্য অপ্রতিহত সিংহপুরুষ 'আলমালিক আযযাহির'। তিনি দামেশকে আগমন করে সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রত্যেক সীমান্ত চৌকিতে এবং দুর্গ অঞ্চলসমূহে সশস্ত্র সেনাদল প্রেরণ করেন। ফলে তাতারীরা তার নিকর্টবতী হতে সফল হয়নি। এ সময় তারা দেখতে পেল যে, সবকিছুতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, শত্রুর মোকাবিলার জন্য মুসলিমবাহিনী সদাপ্রস্তুত এবং শামদেশ ও শামবাসীদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ নেমে এসেছে। তখন তাদের শয়তান দোসররা পিছু হটল। আল্লাহ্র সব প্রশংসা যাঁর অনুগ্রহে সকল উত্তম কর্ম পূর্ণ হয়। এদিকে ইতোপূর্বে সুলতান কুতুব দামেশকের প্রশাসক যিনি ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। অতঃপর যখন তার কাছে সুলতান মুযাফফরের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি কেল্লায় প্রবেশ করে নিজের জন্য দু'আ করলেন এবং আলমালিক আল মুজাহিদ নামধারণ করলেন। অতঃপর যখন মালিক বাহিরের বায়আতের দিন উপস্থিত হল, সেদিন জিলহজ্জের ছয় তারিখ শুক্রবার তার নামে খুৎবা প্রদান করা হলো। খতীব প্রথমে মালিক মুজাহিদের জন্য দু'আ করে, অতঃপর মালিক বাহিরের জন্য, এবং তাদের উভয়ের নাম মুদ্রিত করে মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর এই 'মুজাহিদ' সকলের মধ্য থেকে উত্থিত হন যেমনটি অচিরেই আসছে।

এ বছর আরও কয়েকটি আশ্চর্যজনক বিষয় সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো এ বছরের শুরুতে শামদেশ ছিল সুলতান নাসের ইবন্ আযীযের কর্তৃত্বধীন। অতঃপর সফর মাসের মাঝামাঝি সময়ে এর কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত হয় তাতারী সম্রাট হালাকু খাঁর কাছে। অতঃপর রমযানের শেষে এই কর্তৃত্ব লাভ করেন সুলতান মুযাফফর কুতুয। তারপর এই কর্তৃত্ব গিয়ে

১। অর্থাৎ প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা।

পৌঁছে সুলতান যাহির বায়বারস-এর হাতে। আর দামেশকে তার শাসন কর্তৃত্বেরে শরীক ছিলেন সুলতান মুজাহিদ সানজার, তদ্রুপ বছরের শুরুতে যাদের কাযীর দায়িত্ব লাভ করেন ইবন্ সানীয়ূদ্দৌলা, অতঃপর এই দায়িত্ব অর্জন করেন কামাল 'উমর তাফলসী-অর্থাৎ হালাকু খাঁর পক্ষ থেকে, অতঃপর এই দায়িত্ব লাভ করেন ইবনুয্যাকী, তারপর নাজমুদ্দীন ইবন্ সানীয়ূদ্দৌলা। এছাড়া দীর্ঘকাল থেকে জামে দামেশকের খতীব ছিলেন ইমাদুদ্দীন ইবন্ হারাসতানী। কিন্তু এ বছর শাওয়াল মাসে তিনি অপসারিত হন এবং দায়িত্ব লাভ করেন ইমাদ আসআরদী। আর ইনি ছিলেন রক্ষণশীল এবং উৎকৃষ্টমানের ক্বারী। এরপর জিলকদ মাসের শুরুতে ইমাদ হারাসতানীকে তার পদে পুর্নবহাল করা হয়। মহিমান্বিত এ সত্তা যার হাতে সকল কর্তৃত্ব তিনি যা ইচ্ছা তা করেন।

আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন : কাযী উল কুযাত সদরুদ্দীন আবুল আবকাস ইবন্ সানীয়্যুদ্দৌলা আহমাদ ইবন্ য়াইয়া ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ হুমায়ন ইবন্ য়াইয়া ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী য়াইয়া ইবন্ সাদকা ইবন্ খায়্যাত–কাযীউল কুযাত সদরুদ্দীন আবুল 'আব্বাস ইবন্ সানীয়্যাদ্দৌলা আত্তাগলিবী আদদামেশকী আশ্শাফেয়ী আর উল্লিখিত এই সানীয়ূদ্দৌলা ইবন্ য়াহইয়া পাঁচশ হিজরীর দিকে দামেশকের জনৈক শাসকের কাযী ছিলেন, তার অধস্তনদের জন্য তার বেশ কিছু ওয়াকফকৃত সহায় সম্পত্তি ছিল। আর কবি ইবন্ খায়্যাত হলেন কাব্য–সংকলক, যার পূর্ণ নাম আবূ আবদুল্লাহ আমোদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আলী ইবন্ সাদাকা আত্তাগলিবী, যিনি ছিলে সানিয়ূদ্দৌলা পিতৃব্য, সানিয়ূদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করেন ৫৫৯ হিজরীতে এবং যিনি শায়খ খুশুঈ, ইবন্ তবারযাদ, কিনদী এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তিনি একাধিক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং হাদীসের দারস প্রদান করেন। এছাড়া তিনি ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্বও পালন করেন। মাযহাব সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তার জীবন চরিত ছিল প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু শায়খ আবূ শামা তার সমালোচনা করেছেন। আর আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা ভাল জানেন।

তিনি এককভাবে ৬৪৩ হিজরীতে কাযীর দায়িত্ব লাভ করেন এবং এক বছর কাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব বহাল থাকেন, এরপর কামাল তাফলীসীকে দায়িত্ব প্রদান করে যখন তাকে অপসারিত করা হয়, তখন তিনি এবং কাযী ইবন্ যাকী হালাকু খাঁর কাছে গমন করেন। এ সময় হালাকু খাঁ হালব দখল করেন। তখন হালাকু খাঁ ইবন্ যাকীকে কাযীর দায়িত্ব প্রদান করেন। আর ইবন্ সানিয়ূদ্দৌলা বালাবাক শহর নির্বাচন করে অসুস্থ অবস্থায় সেখানে আগমন করেন এবং কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। তাকে শায়খ আব্দুল্লাহ য়ূনানীর কবরের কাছে দাফন করা হয়।

সুলতান নাসের তার প্রশংসা করতেন, যেমনভাবে সুলতান আশরাফ তার পিতা শামসুদ্দীনের প্রশংসা করতেন। সুলতান বাহিরের শাসনকর্তৃত্ব যখন সুসংহত হলো, তখন তিনি তার পুত্র নাজমুদ্দীন ইবন্ সানিয়্যদ্দৌলাকে কাযী নিয়োগ করেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি খোবানি ফলের মৌসুমে দরস স্থগিত ঘোষণা করেন কেননা তার নিজের খোবানির বাগান ছিল। তাই এ সময় খোবানি সংগ্রহ ছেড়ে মাদরাসার অবস্থান তার জন্য দুষ্কর ছিল। ফলে লোকজন ঐ

মৌসুমে তার অনুসরণ করতে, আর মানুষের নফসতো সবসময় আরাম প্রিয়। বিশেষত বাগানের মালিকগণ ফলের মৌসুমে এই অবস্থার শিকার হতেন। এদের মধ্যে কাযীরা ছিলেন অন্যতম। এই বছরই তিনি ইনতেকাল করেন :

মারদীন প্রশাসক আলমালিক আসসায়ীদ

ইনি হলেন নাজমুদ্দীন ইবন্ আয়ল গাযী ইবন্ মানসূর আরতাক ইবন্ আর সালান ইবন্ আয়র গাজী ইবন্ সানী ইবন্ তামারতাম ইবন্ আয়লগাযী ইবন্ আরীশী। তিনি ছিলেন সাহসী ব্যক্তি এবং একদিনের জন্য শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। সুলতান সালাহুদ্দীনের পুত্র তুরান শাহ তার দূর্গে আক্রমণ করেন, যিনি দামেশক শাসক আলমালিক আযযাহির ইবন্ আযীয ইবন্ যাহির ইবন্ নাসের এর পক্ষ থেকে হালবের প্রশাসক ছিলেন। তিনি তাতারীদের আক্রমণের মুখে হালবকে একমাস সুরক্ষিত রাখেন। অতঃপর তীব্র অবরোধের মুখে সন্ধির ভিত্তিতে তার কৃর্তত্ব তাদের কাছে অর্পণ করেন। তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন এবং তার বাড়ীর পাশে তাকে দাফন করা হয়। এছাড়া এ বছর যে সকল ব্যক্তিবর্গ নিহত হন তাদের অন্যতম হচ্ছেন।

আলমালিক আসসায়ীদ হাসান ইবন্ 'আব্দুল' আযীয

ইনি হলেন 'আদিল আবূ বকর ইবন্ আইয়্যুব। তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সাবীবা এবং বানয়াসের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। অতঃপর তার থেকে উভয় শহরের শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আল মুনীরা দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। এরপর যখন তাতারীদের আগমন ঘটে, তখন তিনি তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তারা তাকে তার শাসনাধীন ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেয়। এরপর যখন আয়নে জালূতের' যুদ্ধে সংঘটিত হয়, তখন তাকে বন্দি অবস্থায় মুযাফফর কুতুবের সামনে আনা হয় এবং তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। কেননা, তিনি তাতারীদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন।

আব্দুর রহমান ইবন্ আব্দুর রহীম

ইনি হলেন ইবন্ হাসান ইব আব্দুর রহমান তাহির ইবন্ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন ইবন্ আলী ইবন্ আবূ তালিব, শারাফুদ্দীন ইবুন আজামী আলহালবী আশশাফেয়ী। তিনি হালবের নেতৃস্থানীয় ও ইলমী পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি মাদরাসা যাহিরিয়াতে অধ্যয়ন করেন এবং নিজেও হালবে একটি মাদসারা ওয়াকফ করেন এবং সেখানে সমাহিত হহন। তাতারীরা যখন হালবে প্রবেশ করে, তখন সফর মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তারা তাকে পেয়ে নির্যাতন করে, শীতকালে তার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকে, ফলে তিনি খিচুনিগ্রস্ত হয়ে মারা যান। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

আলমালিক আলমুযাফফর কুতুয ইবন্ 'আব্দুল্লাহ

ইনি হলেন সায়ফুদ্দীন তুর্কী, সুলতান মুইয তুর্কমানীর বিশিষ্টতম আযাদকৃত গোলাম এবং সুলতান সালিহ আয়্যূব ইবন্ কামিলের অন্যতম আযাদকৃত গোলাম। সায়ফুদ্দীন কুতুবের উসতাদ যখন নিহত হলেন, তখন তিনি তার পুত্র নূরুদ্দীন মানসুর আলীকে পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু এরপর যখন তাতারীর আক্রমণের কথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তার উসতাদ পুত্রের বয়সের স্বল্পতার কারণে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে

পারে। ফলে তিনি তাকে অপসারণ করে নিজেই এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর ৬৫৭ হিজরীতে জিলকদ মাসে তার অনুকূলে বায়আত হয়। এরপর তিনি তাতরীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আল্লাহ্ তাআলা তার দ্বারা ইসলামকে সাহায্য করেন, যেমন আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তিনি ছিলেন সাহসী বীর, বদান্য এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রজা সাধারণ তাকে ভালবাসত এবং তার জন্য অনেক দু'আ করতো।

তার সম্পর্কে এ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিন 'আয়নে জালূতে' শত্রুর আক্রমণে তার অশ্ব নিহত হয়। আর তখন তার আশে পাশে এমন কেউই ছিল না, যে তাকে অশ্ব সরবরাহ করবে, ফলে তিনি মাটিতে নেমে তার স্থানে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে যুদ্ধ চলছে, আর তিনি ছিলেন মুসলিম ফৌজের কেন্দ্রস্থলে, এমন সময় জনৈক আমীর তার অবস্থা দেখে তার ঘোড়া থেকে নেমে সুলতান কুতুবকে তাতে আরোহনের অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন : তোমরা রণকৌশলতার উপকার থেকে আমি মুসলমানদের বঞ্চিত করতে পারি না, একদা বলে তিনি তার অবস্থানেই থাকলেন, অবশেষে সংশ্লিষ্ট লোকজন তার জন্য অশ্ব নিয়ে আসার পর তিনি তাতে আরোহণ করেন। এ সময় জনৈক আমীর তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন : কেন আপনি অমুকের বাহনে আরোহণ করলেন না? শত্রু বাহিনীর কোনো যোদ্ধা যদি আপনাকে এ অবস্থায় দেখতে পেত তা হলে সে অবশ্যই আপনাকে হত্যা করত এবং আপনার কারণে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তখন তিনি এর উত্তরে বলেন : আমি তো জান্নাতের কাছাকাছি অবস্থান করছিলাম আর ইসলামের তো এখন অভিভাবক রয়েছেন। তিনিই তাকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট। দেখ অমুক, অমুক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন, এভাবে তিনি তাদের পরিবর্তে ইসলাম রক্ষার জন্য আরও অনেককে নির্ধারণ করেছেন, আর ইসলামকেও তিনি রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন। তিনি যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমীর উমারা সাথে নিয়ে মিশর থেকে যাত্রা করেন, তখন তার পক্ষে ছিল হামা প্রশাসক মানসূর এবং একদল শাহজাদা। এ সময় তিনি হামা প্রশাসকের কাছে এই মর্মে দূত প্রেরণ করেন যে, এই কয়েকদিন আমাকে দস্তরখানা বিছানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিও, আর প্রত্যেক যোদ্ধার সাথে যেন খাওয়ার জন্য একটু করে গোশত থাকে, আর আমরা যত দ্রুত সম্ভব শত্রুকে আক্রমণ করতে চাই। আর তিনি এ বছর রমযান মাসের শেষ দশকে শুক্রবার তাতারীদের মুখোমুখি হন। আর এটা ছিল বিরাট এক শুভ লক্ষণ। কেননা, বদর যুদ্ধও রমযান মাসে শুক্রবার সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন। তিনি যখন শাওয়াল মাসে দামেশকে আগমন করেন। তখন সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করেন। এছাড়া তিনি হালব থেকে তাতারীদের বিতাড়নের জন্য তাদের পিছনে বায়বারাস কে প্রেরণ করেন এবং তাকে হালবের প্রশাসক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে প্রজাদের স্বার্থ বিবেচনা করে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেননি। ফলে তাদের দুজনের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে। এরপর তিনি মিশরে ফেরার পথে বায়বারাসের সাথে আতাঁতকারী আত্রীয় উমারাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি কুরাবা ও সালেহিয়্যার মধ্যবর্তী স্থানে নিহত হন এবং সুপরিচিত স্থানে সমাহিত হন, তার কবর নিয়মিত

যিয়ারত করা হত। অতঃপর যখন সুলতান যাহিরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি লোকজন পাঠিয়ে তার কবরের চিহ্ন মুছে ফেলেন। ফলে তার কবর হারিয়ে যায়। তিনি নিহত হন এ বছর জিলকদ মাসের ষোল তারিখ শনিবার। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

শায়খ কুতুবুদ্দীন যূনানী 'আয্যায়ল আলাল মিরআ' গ্রন্থে শায়খ আলাউদ্দিন ইবন্ দানিমের পূর্ণে তাজুদ্দীন আহমাদ ইবন্ আছীর, যিনি দামেশক শাসক নাসিরের সময়ে ব্যক্তিগত পত্রলিখক ছিলেন। তার থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা যখন সুলতান নাসেরের সাহচর্য বোতাবারযা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম, তখন ডাক বিভাগের মারফত খবর আসে যে, সুলতান কুতুব মিশরের শাসন কৃর্তত্ব লাভ করেছেন। আমি সুলতান নাসেরকে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনালাম। তখন তিনি বললেন : অমুক অমুকের কাছে গিয়ে তাদেরকে এই সংবাদ অবহিত কর। আর আমি যখন তার কাছ থেকে বের হলাম, তখন জনৈক সৈনিকের সাথে আমার সাক্ষাত হল। সে আমাকে প্রশ্ন করলো : আপনারা কি মিশর থেকে এ খবর পেয়েছেন যে, কুতুব শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেছেন? এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, এ বিষয়ে আমার কোন অবগতি নেই, তুমি কীভাবে তা জানতে পারলে? সে বললো : আল্লাহ্র কসম? অচিরেই তার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে তাতারীদের পর্যুদস্ত করবে। আমি তাতে বললাম : কীভাবে তুমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছ? সে খবর বলল : তার শৈশবে আমি তার পরিচর্যা করতাম, তার মাথায় প্রচুর উকুন ছিল, আমি তার উকুন মারতাম, আর তাকে নিন্দা ভৎর্সনা করতাম। একদিন সে আমাকে বলল : হতভাগ্য, আমকে আর ভৎর্সনা করো না। বল, তুমি আমার কাছে কী চাবে? একদিন তো আমি মিশরের শাসন কৃর্তত্ব লাভ করবো। তার কথা শুনে আমি তাকে বললাম, তুমি কি উম্মাদ? তখন সে বলল : আমি তো রাসূল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তিনি সাম্রাজ্যে বলছেন : তুমি মিশর দেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং তাতারীদের পরাজিত করবে, আর আল্লাহর রাসূলের কথাতো নিশ্চিত সত্য। তখন আমি তাকে বললাম : আমি তোমার পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর নেতৃত্ব চাই, তখন সে বলল : হ্যাঁ! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করে রাখ। তোমার আকাঙক্ষা পূর্ণ হবে-ইবন্ আছীর বলেন : সে যখন আমাকে একথা বলল, তখন আমি তাকে বললাম : তুমি ঠিকই বলেছ মিশরীয়রা পত্র প্রেরণ করেছে যে, তিনি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। সে তখন বলল : আল্লাহর কসম! অবশ্যই তিনি তাতারীদের পর্যুদস্ত করছেন। আর এমনই ঘটেছিল। আর সুলতান নাসের যখন মিশরীয় ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানে প্রবেশ করতে চাইলেন, কিন্তু তারপর তিনি তখন ফিরে গেলেন এবং অধিকাংশ শামী ফৌজ সেখানে প্রবেশ করল, তখন এই ঘটনা বর্ণনাকারী আমির সেই ফৌজে শামিল ছিলেন এবং সুলতান মুযাফফর কুতুব তাকে পঞ্চাশ জন অশ্বরোহীর প্রধান নিয়োগ করে তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেন। আর এই পঞ্চাশ অশ্বারোহীর প্রধান হলেন আমীর জামালুদ্দীন তুর্কমানী।

ইবন্ আছীর বলেন পরবর্তীকালে মিশরে আমার সালে তার সাক্ষাত হয়, তখন তিনি পঞ্চাশ জন অশ্বরোহীর প্রধান, এ সময় তিনি আমাকে মুযাফফর কুতুব সম্পর্কে যে ভবিষ্যিদ্বাণী করেছিলেন। তা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আমার তা মনে পড়ে। এ ঘটনার পরপরই তাতারীদের

সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এ যুদ্ধে তিনি তাদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাতারীবাহিনী দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তিনি তার সহযোদ্ধা ও সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তোমরা তাদেরকে আক্রমণ করবে না, যতক্ষণ না সূর্য হেলে পড়ে, ছায়া তির্যক হয়, বায়ু প্রবাহিত হয় এবং খতীবগণ ও মুসল্লীগণ নামাযে আমাদের জন্য দুআ করে। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

এ বছরই শামদেশে হালাকু খাঁর প্রশাসক কাতুব গানাবীন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার নামের শেষাংশ 'নাবীন' অর্থ– দশ স্থানের প্রধান। এই খবীছ পিশাচ সেনাপতি তার সম্রাট হালাকুর পক্ষে পারস্য দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে শাম পর্যন্ত ভূখণ্ড জয় করে, আর সে হালাকু খাঁর পিতামহ চেঙ্গিস খাঁরও সাহচর্য লাভ করেছিল। এই সেনাপতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভিনব সব কৌশল অবলম্বন করতেন, যা ইতোপূর্বে তার কেউ প্রয়োগ করেনি। সে যখন কোনো শহর জয় করত, তখন সে এই বিজিত শহরের যোদ্ধাদের পাশ্ববর্তী শহর জয়ের কাজে নিয়োগ করত। প্রথমে সে ঐ শহরবাসীদের কাছে দাবী করতো, এদেরকে তাদের কাছে আশ্রয় দিতে। যদি তারা তাতে সাড়া দিত, তাহলে তাদেরকে খাদ্য পানীয়ের সংকটে ফেলার তার যে প্রচেষ্টা, তা সফল হত, এবং তার অবরোধকাল হ্রাসপেতি। আর যদি তারা তাদেরকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করতে, তাহলে সে ঐ বন্দী যোদ্ধাদের সাহায্যে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। এতে যদি বিজয় অর্জিত হতো, তাহলে তো ভাল অন্যথায় সে এদের দ্বারা তাদেরকে দুর্বল করে ফেলতে পারত। এভাবে সে ঐ বন্দি যোদ্ধাদের নিঃশেষ করে ফেলতো।

এভাবে যদি বিজয় অর্জিত হতো, তাহলে এতেই তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো, অন্যথায় সে নিজস্ব যোদ্ধাদের নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। আর এই লড়াইয়ে জয় লাভ করার তার জন্য খুব সহজ ছিল। কেননা, সে তাদেরকে ইতোমধ্যেই ক্লান্ত ও দুর্বল করে ফেলেছিল। আর দুর্গতদের জন্য তার কৌশল ছিল নিম্নরূপ : সে দুর্গকারীদের কাছে এই মর্মে দূত প্রেরণ করতো যে, নিশ্চয় তোমাদের পানীয়জল হ্রাস পেয়েছে। আমাদের আশঙ্কা যে, যেকোন মুহূর্তে আমরা তোমাদেরকে এবং তোমাদের যোদ্ধাদের সবাইকে আক্রমণ তো করবো এবং তোমাদের স্ত্রীসন্তানদেরকে বন্দি করব, সুতরাং পানি শেষ হওয়ার পর তোমরা কীভাবে বেঁচে থাকবে? সুতরাং সন্ধির ভিত্তিতে তোমরা দুর্গদ্বার খুলে দাও, তোমাদেরকে আমরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাকড়াও করার পূর্বে। তখন দুর্গবাসীরা উত্তর দিত : আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে আমাদের আর কোনো পানির প্রয়োজন নেই। এ কথার উত্তরে সে বলে পাঠাত : তোমাদের কথা আমি বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমি লোক পাঠিয়ে সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হব। যদি সত্যিই তোমাদের কাছে পর্যাপ্ত পানি থাকে, তাহলে আমি তোমাদের অবরোধ উঠিয়ে ফিরে যাব, তখন তারা নিরূপায় হয়ে বলত : আপনি আপনার লোক পাঠিয়ে দিন। তখন সে তার বাহিনী থেকে নির্বাচিত করে তখন লোক পাঠাত, যাদের সাথে থাকত বিষপূর্ণ ফাঁপা বর্শাদণ্ড, এরা যখন দূর্গে প্রবেশ করতো, তখন সেই বিষপূর্ণ বর্শাদণ্ড পানিতে ডুবিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করতো, যেন তারা পানির প্রকৃত পরিমাণ সঠিকভাবে অনুমানের চেষ্টা করছে, এভাবে ঐ বিষ পানিতে মিশে যেত এবং দুর্গবাসীদের অজ্ঞাতসারে তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিত। ঐ খবীছের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। শেষ বয়সে সে আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সে ছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রতি

আকৃষ্ট। কিন্তু তার পক্ষে চেঙ্গিস খানের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। শায়খ কুত্বয়ূনানী বলেন : এই ব্যক্তি যখন বালাবাক শহরের দুর্গ অবরোধ করে, তখন আমি তাকে দেখেছি। সে ছিল দীর্ঘ শশ্রুধারী সুর্দশন ও সমীহ উদ্রেককারী শক্তিমান ব্যক্তি। শায়খ কুতুব বলেন : ঐ কেল্লার অবস্থান যাচাই করার জন্য সে জামে দামেশককে প্রবেশ করে তার মিনারে আরোহন করে। অতঃপর পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে বের হয়ে একটি বিরান দোকানে প্রবেশ করে। এরপর সে অনেকটা জনসমক্ষেই সেখানে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুর্ণ করে। প্রয়োজন শেষে তেমনভাবে শৌচকর্ম ছাড়াই সে উঠে পড়ে।

শায়খ কুতুব বলেন : তার কাছে যখন সুলতান মুযাফফরের সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পৌছে তখন সে তার করণীয় বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। অতঃপর তার আত্মসম্মানবোধ তাকে মুযাফফরের মোকাবিলায় উদ্ধুদ্ধ করে এবং সে ধারণা করে যে, এতো পূর্বের যুদ্ধসমূহের ন্যায় এ যুদ্ধেও সে-ই বিজয়ী হবে, প্রথমে সে মুসলিমবাহিনীর বামদিকে আক্রমণ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অবিচল রাখেন। ফলে তারা তাতারীদের উপর এমন তীব্র আক্রমণ করেন যে, তাতরীবাহিনী আর সে ধাক্কা সামাল দিতে পারেনি, ফলে তারা এ যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের সেনাপতি কুতুবনাগীন নিহত হয়, আর তার পুত্র বন্দী হয়।

আর তার এই পুত্র ছিল সুদর্শন যুবক। বন্দী অবস্থায় তাকে সুলতান মুযাফফর কুতুবের সামনে উপস্থিত করা হয়। এ সময় তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার বাবা কি পলায়ন করেছিল? সে বলল : সে পলায়ন করার মত যোদ্ধা নয়। এরপর অনুসন্ধান করে তাকে নিহতদের মাঝে পাওয়া যায়। এ সময় তার পুত্র তাকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। আর সুলতান মুযাফফর যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শোকর আদায় করে বলেণ : আজ আমি মনের সুখে ঘুমাতে পারব। আর এ ব্যক্তি ছিল তাতারীদের সৌভাগ্য তারকা, তার মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সৌভাগ্য তারকা অস্তমিত হয়, আর বস্তু ও এমনিক ঘটেছিল, সে নিতে হওয়ার পর আর কখনও তাতারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রবল হতে পারেনি। আর সে নিহত হয় এ বছর রমযান মাসের পঁচিশ তারিখ ও শুক্রবার। তাকে হত্যা করেছিল সেনাপতি আকূশ মামসী। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

ফকীহ শায়খ মুহাম্মাদ আল্য়ূনীনী :

ইনি হলেন আল হাম্বলী, আল বালাবাক্কী, আল হাফিয, তিনি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ 'ঈসা ইবন্ আবুর রিজাল ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ হুসায়ন ইবন্ ইসহাক ইবন্ জাফির সাদিক। শায়খ কুতুবুদীন য়ূনীনী তার বড় ভাই হুসায়ন আলীর হস্তলিখিত এই বংশতালিকা এভাবেই উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি অর্থাৎ তার ভাই তাকে অবহিত করেছেন যে, আমরা ইমাম জা'ফর সাদিকের অধস্তন। তিনি বলেন : আর তিনি তাকে একথা বলেছেন যে, তার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন তিনি যেন সদকা গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান থাকেন।

আবূ 'আবুদল্লাহ ইবন্ আবুল হুসায়ন আল য়ূনীনী আল-হাম্বলী তাকীয়ূদ্দীন, যিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ এবং বিশিষ্ট ইবাদত গুযার বুযুর্গ ও হাফিযে হাদীস। তিনি ৬৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং খুশূয়ী, ইমাম হাম্বল, শায়খ কিনদী এবং হাফিয 'আবদুল গনী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তার শায়খ আবদুল গণী তার প্রশংসা করতেন। এছাড়া তিনি ফিক্হ শিক্ষা গ্রহণ করেন শায়খ মুওয়াফফাকের কাছে এবং শায়খ আবদুল্লাহ য়ূনীনীর সাবর্ক্ষনিক সাহচর্য অবলম্বন করে তার থেকে উপকৃত হন।

আর শায়খ আব্দুল্লাহ তার প্রশংসা করতেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতেন, এমনকি ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তিনি তাকে অনুসরণ করতেন। তিনি তার শায়খের নিকট শায়খ 'আবদুল্লাহ বাতাইহী' থেকে বিশেষ ধরনের ছিন্ন পরিধেয় গ্রহণ করেন। আর ইলমুল হাদীসে বা হাদীস শাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বুখারী মুসলিমের সকল হাদীস এবং মুলনাদে আমাদের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক হাদীস কণ্ঠস্থ করেন। এছাড়া তিনি আরবি ভাষাও বেশ ভালভাবে জানতেন। তিনি তা শিক্ষা করেন তাজকিনদী থেকে। আর লোকজন তার কাছ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতো এবং উৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ গ্রহণ করতো। রাজা বাদশাদের কাছে তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি শায়খ যুবায়দী থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণ করা অবস্থায় সুলতান আশরাফের কাছে দুর্গে অযু করলেন। তিনি যখন অযু শেষ করলেন, তখন সুলতান আশরাফ তার মুল্যবান কাপড় তার সম্মানার্থে বিছিয়ে দিলেন, যেন তিনি তা মাড়িয়ে যেতে পারেন। এ সময় একবার সুলতান কামিল তার ভাই সুলতান আশরাফের কাছে দামেশকে যান। তখন তিনি তাকে দুর্গে আপ্যায়ন করেন। এবং আবু সুলতান আশরাফ নিজে দারুস সাআদায় গিয়ে সুলতান কামিলের কাছে শায়খ মুহাম্মাদ ফকীহের গুণাবলী উল্লেখ করতে লাগলেন। তখন সুলতান কামিল বললেন : আমি তাকে দেখতে চাই, তখন তিনি বা'লাবাকে তার কাছে দূত পাঠালেন এবং তাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তখন তিনি দারুস সাআদাতে পৌছল। সুলতান কামিল তার কাছে আসেন এবং তারা দুজনে 'ইলমী কোনো বিষয় আলোচনা করেন। তখন ভারী কিছু দ্বারা হত্যার মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা হয়, এবং ঐ বাঁদীর আলোচনা হয়, যাকে এক য়াহুদী দুই পাথরের সাথে মাথা চুর্ণ করে হত্যা করেছিল। এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। তখন কামিল বলল : সেতো এই হত্যার কথা স্বীকার করেনি। এ সময় শায়খ ফকীহ বললেন : মুসলিম শরীফে আছে–"তখন সে স্বীকার করলো, তখন কামিল বললঃ" আমি তো মুসলিম শরীফ সংক্ষিপ্ত করেছি, কিন্তু সেখানে এমন কোন কথা পাইনি তখন সুলতান কামিল লোক পাঠিয়ে তার সংক্ষেপিত পাঁচ খণ্ড মুসলিম শরীফ আনালেন। এরপর কামিল, আশরাফ, শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবন্ মূসার এবং শায়খ ফকীহ প্রত্যেকে একটি করে কিতাব নিলেন। এরপর শায়খ ফকীহ কিতাব খোলা মাত্রই তা পেয়ে গেলেন। তখন সুলতান কামিল তার এই কাশফ ও কারামতে অবাক হলেন, এবং তাকে তার সাথে মিশরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সুলতান আশরাফ তাকে তখনই বালাবাকে পাঠিয়ে দেন এবং সুলতান কামিলকে বলেন : তিনি বালাবাকে অবস্থানের উপর অন্য কোনোকিছুকে যেন প্রাধান্য না দেন। এরপর সুলতান কামিল তার খিদমতে অনেক

স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। তারপুত্র কুতুবদ্দীন হলেন : আমার পিতা বাদশাদের হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং বলতেন : বায়তুল মালে আমার প্রাপ্য অংশ এর চেয়ে বেশি হবে। আর তিনি আমীর উমারা ও ওযীরদের থেকে শুধু খাদ্যবস্তু হাদীয়া রূপে গ্রহণ করতেন, এরপর তিনি আবার তা থেকে তাদের কাছে পাঠাতেন এবং তারা বরকত গ্রহণের জন্য এবং আরোগ্য লাভের জন্য তা গ্রহণ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, এক সময় তিনি বিপুল অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয় একবার তাকে বলা হলো : সুলতান আশরাফ তার জন্য একটি পত্র লিখে তা মুহীযুদ্দীন ইবন্ মওযীকে দিয়েছেন, তাতে খলীফার স্বাক্ষর নেয়ার জন্য, অতঃপর তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে সুলতান আশরাফ তাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে, তখন তিনি পত্রটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন : এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তার পুত্র বলেন : আমার পিতা কারও যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতেন না এবং তিনি দাবী করতেন যে, তিনি আলী ইবন্ আবূ তালিব (রা) অর্থাৎ ইমাম জা'ফর সাদিক ইবন্ মুহাম্মাদ বাকির ইবন্ আলী ইবন্ হুমায়নের অধস্তন। তিনি আরও বলেন, ইতোপূর্বে তিনি নিঃস্ব দরিদ্র ছিলেন, শায়খ আব্দুল্লাহর একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি তার স্ত্রীকে বলতেন, মেয়েটিকে শায়খ মুহাম্মাদের সালে বিবাহ দাও, তখন তার স্ত্রী বলতেন : সে তো নিঃস্ব, আর আমি চাই আমার কন্যা যেন সুখী হয়, তখন শায়খ আবুদল্লাহ বলতেন : আমি যেন খেতে পাচ্ছি তাদের দুজনকে বরকতপূর্ণ প্রাচুর্যময় রিযিকে সমৃদ্ধ এক গৃহে বসবাসরত এবং রাজাবাদশারা তার সাক্ষাতে আগমন করছে। তখন তার স্ত্রী তাকে তার সাথে বিবাহ দিলেন, আর এই কন্যাই ছিলেন তার প্রথমা স্ত্রী, আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

বাদশারা সকলেই তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন এবং তারা শহরে আগমন করতেন। এদের অন্যতম ছিল বানু আদিল ও অন্যান্যরা । তদ্রূপ শীর্ষস্থানীয় ফকীহরাও তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন এবং তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, আসল ধার্মিকতা এবং আমানতদারীর কারণে তার মতামত বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনা করতেন। এদের অন্যতম হলেন, শায়খ ইবন্ সালাহ, ইবন্ আব্দুস সালাম, ইবন্ হাজির, হুসাবী, শাসসুদ্দীন ইবন্ সানীয়ূদ্দৌলা এবং ইবন্ প্রমুখগণ, তার অনেক কাশফ ও কারামতের কথা উল্লিখিত আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি বারো বছর যাবৎ 'কুতুব' আর আল্লাহ ভাল জানেন।

শায়খ ফকীহ বলেন এরপর আমি হারবান সফরের ইরাদা করলাম। আমার কাছে এই তথ্য পৌঁছেছিল যে, সেখানে এক ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি ইলমুল ফারায়েয খুব ভাল জানেন। যেদিন সকালে আমি সফর করবো, তার আগের রাতে আমার কাছে শায়খ আব্দুল্লাহ য়ুনীনীর পত্র এসে পৌঁছল। তিনি আমাকে তার সাথে কুদম শরীফে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে তলব করেছেন। কিন্তু বিষয়টি আমার তেমন মনঃপুত হলো না। এমন সময় আমি যখন কুরআন শরীফ খুললাম, তখন এই আয়াত বের হলো : "তাদের অনুসরণ কর, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা সুপথ প্রাপ্ত।" তখন আমি তার সাহচর্যে কুদসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লাম। এরপর সেই হারবানী আলিমকে আমি কুদসে উপস্থিত পেলাম। তখন আমি সেখানেই তার থেকে ইলমুল ফারায়েয হাসিল করলাম, এমনকি আমার মনে হল, আমি যেন এই বিদ্যায়

তার চেয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছি। শায়খ আবূ শালা বলেন : এই ফকীহ ছিলেন বিশালদেহী মানুষ, আমীর উমারা ও অন্যান্যদের কাছে তার বিশেষ গ্রহনযোগ্যতা ছিল। তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ য়ূনীনীর মত অতি সাধারণ একটি পশমী জুব্বা পরিধান করতেন। আবূ শামা বলেন : তিনি মি'রাজ প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরপর আমি আওয়াযেহ নামক গ্রন্থে তার দাবী রদ করেছি। তার পুত্র কুতুবুদ্দীন উল্লেখ করেছেন যে তিনি এ বছর রমযান মাসে উনিশ তারিখে আটাশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

মুহাম্মাদ ইবন্ খলীল ইবন্ 'আবুদল ওয়াহহাব ইবন্ বদরু

ইনি হলেন ভোজনরসিক পশুচিকিৎসক আবূ আব্দুল্লাহ তার পূর্বপুরুষদের নিবাস বানূ হিলালের পার্বত্য নিবাস। আর তিনি জন্মগ্রহণ করেন কাসরে হাজ্জাজে'। তার অবস্থান ছিল আশশাগুরে।' ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন নেককার ও দীনদার। আর তিনি দরিদ্র, অভাবী এবং বন্দিদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাহায্য করতেন। তার একটি বিশেষ অবস্থান ছিল যে, তিনি কারও থেকে কোনকিছু বিনিময় ব্যতীত খেতেন না। শহরবাশী তাকে তাদের উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাবার খাওয়ানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তো। কিন্তু তিনি উপযুক্ত বিনিময় ব্যতীত কোনোকিছু খেতে রাজি হলেন না। আর তিনি যতই এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, মানুষ ততই তার প্রতি আকৃষ্ট হতো এবং তার কাছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ত ইত্যাদি নিয়ে আসত। তখন তিনি বেশ ভাল বিনিময়সহ তা ফিরিয়ে দিতেন। আর এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। তার উপর রহম করুন এবং নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় তার প্রতি প্রসন্ন হোন।

৬৫৯ হিজরীর শুরু

এ বছর সূচিত হয় ডিসেম্বর মাসের কয়েকদিন বিগত হওয়ার পর সে কাবার দ্বারা। এ সময় মুসলমানদের কোনো খলীফা ছিল না, মক্কার প্রশাসক ছিলেন আবূ নুমাই ইবন আবূ সাইদ ইবন্ আলী ইবন্ কাতাদা আল্হাসানী আর তার পিতৃব্য ইদরীস ইবন্ আলী তার শাসন কর্তৃত্বের অংশীদার ছিলেন। আর মদীনার প্রশাসক ছিলেন আমীর ইয়াযুদ্দীন জামমায ইবন্ শায়খিহী আলহুসাইনী আর ও মাসের শাসক ছিলেন সুলতান যাহির বায়বারাস আলবন্দুকদারী আর দামেশক বা'লাবাক, সবীবা এবং বানয়াস শহরের শাসন কর্তৃত্বের শরীক ছিলেন, 'আলমালিক মুজাহিদ।' এছাড়া হালবের শাসনকর্তৃত্বে তার শরীক ছিলেন আমীর হুসামুদ্দীন লাশীন জুকুনদারী আযীযী। এদিকে কারাক ও শাওবাক শহর ছিল সুলতান ফাতহুদ্দান উমর উবন আদিল ইবন্ সায়ফুদ্দীন আবুবকর আলকামিল মুহাম্মাদ ইবন্ আদিল আলকাবীর সায়ফুদ্দীন আবূ বকর ইবন্ আয়্যুবের কর্তৃত্বধীন। আর জাহয়ূন ও বায়রিয়া দুর্গ ছিল আমীর মুযাফফরুদ্দীন উছমান ইবন্ নাসেররুদ্দীনের কর্তৃত্বে। এছাড়া হামা প্রশাসক ছিলেন সুলতান মানসূর ইবন্ তাকীয়ূদ্দীন মাহমূদ, আর হিমসের শাসনকর্তা ছিলেন, আশরাফ ইবন্ মানসূর ইবরাহীম ইবন্ আসাদুদ্দীন নাসের, মাওসিলের প্রশাসক ছিলেন সুলতান সালিহ ইবন্ বদর লু'লু এবং তার ভাই মালিক আলমুজাহিদ ফলে আযীরা ইবন্ উমরের প্রশাসক, তদ্রুপ মারদীনের প্রশাসক ছিলেন সুলতান, নাজমুদ্দীন আয়লগাযী ইবন্ আরতাক, রোম প্রশাসক ছিলেন রুকনুদ্দীন কলাজ আরসালান সালজুকী, আর মাসন কর্তৃত্বের অংশীদার ছিলেন তার ভাই কায়কাওয়াস এই ভূখণ্ড

তারা অর্ধেক অর্ধেক শাসন করতেন। এছাড়া প্রাচ্যের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সবই ছিল হালাকুবাহিনী তাতারীদের করায়ত্তে। আর ইয়ামানে ছিল একাধিক শাসক, তদ্রুপ উত্তর আফ্রিকার প্রত্যেক ভূখণ্ডে ছিল স্বতন্ত্রশাসক।

এ বছর তাতারীরা যখন হালব আক্রমণ করে, তখন হালব প্রশাসক হুযামুদ্দীন আযীযী, হামা প্রশাসক আল্‌মানসূর, হিমসের প্রশাসক সুলতান আশরাফ একত্রে তাদের মোকাবিলা করেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিমসের উত্তরে খালিদ ইবন্ ওয়ালিদ (রা)-এর কবরের পাশে। এ সময় তাতারীদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার, আর মুসলমান যোদ্ধার সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দশ'। কিন্তু আল্লাহ্ তাতারীদের পরাজিত করেন এবং মুসলিমবাহিনী তাদের অধিকাংশ যোদ্ধাকে হত্যা করে। এরপর বাকীরা হালবের দিকে ফিরে যায় এবং চারমাস পর্যন্ত হালব অবরোধ করে রাখে। এ সময় তারা খাদ্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় অনেক আগন্তুককে হত্যা করে ইন্নালিল্লাহি ইন্না ইলায়হি রাজিউন। আর যে মুসলিমবাহিনী হিমস অঞ্চলে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেছিল, তারা আর হালকে ফিরেনি বরং তারা মিশরের দিকে অগ্রসর হয়, এ সময় আল্‌মালিক আয্‌যাইর তাদেরকে আড়ম্বরপুর্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। এদিকে হালব শহর অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে যায় এই দুঃসময়ে তার কোনো ত্রানকর্তা পাওয়া যায়নি। তবে আল্লাহ্ তাআলা শহরকে রক্ষা করেন।

সফর মাসের সাত তারিখ সোমবার সুলতান যাহির রাজকীয় আড়ম্বরের সাথে অশ্বারোহনের বের হন, এ সময় আমীর উমারা ও সৈনিকরা তার সামনে তার সম্মানার্থে পদভ্রজে উপস্থিত হয়। এটা ছিল তার অভিষেক আরোহণ। এরপব থেকে সে নিয়মিত অশ্বারোহণ ও ক্রীড়া বিনোদনে অংশগ্রহণ করতো।

আর সফর মাসের সতেরো তারিখে দামেশকের আমীর উমারা তাদের সুলতান আলমুদ্দীন সানজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এরপর তারা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে পরাজিত করে। তিনি তখন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তারা তার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে। অতঃপর তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বা'লাবাক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় আমীর আলামুদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তি দামেশক দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন জামালুদ্দীন য়া'মূরের ক্রীতদাস আর তিনি ছিলেন সুলতান সালিহ আয়ূব ইবন্ কামিলের মালিকানাধীন। তার দিকে আলমালিক আয্‌যাহিরকে সম্পৃক্ত করা হয়, অতঃপর সুলতান যাহির তাকে প্রেরণ করেন আলামুদ্দীন সানজার থেকে দামেশক শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য। তখন তিনি তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সুলতান যাহিরের স্থলাবর্তীরূপে সেখানে বাস করতে থাকেন। অতঃপর তারা বালাবাকে সানজার হালবীর বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করে এবং তাকে গ্রেফতার করে খচ্চরের পিঠে আরোহন করিয়ে সুলতান যাহিরের কাছে মিশর পাঠিয়ে দেয়। মিশরে পৌছে রাত্রিকালে তিনি যখন যাহিরের সাথে সাক্ষাত করেন, যাহির তখন তাকে প্রথমে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন; এবং পরে তাকে একাধিক বকশিস দ্বারা সম্মানিত করেন। আর রবিউল আউয়ালের আঠারো তারিখ সোমবার সুলতান যাহির বাহাউদ্দীন আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ওযীর নিয়োগ করেন। এছাড়া রবিউল আখির মাসে সূলতান যাহির তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত বেশ কয়েকজন আমীর উমারাকে গ্রেফতার করেন। এ বছরই তিনি শাওবাকে ফৌজ প্রেরন করেন এবং তারা

কারা-প্রশাসক মুগীদের নিয়োগকৃতদের থেকে তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। আর এ বছরই সুলতান যাহির তাতারীদের বিতাড়নের জন্য হালব অভিমুখে ফৌজ প্রেরণ করেন। কিন্তু এই মুসলিম ফৌজ যখন গাযা পর্যন্ত পৌছে, তখন খ্রিস্টানরা পত্র প্রেরণ করে তাতারীদের সর্তক করে দেয়। তখন তারা দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করে এবং হালবাসীদের একদল লোক হালবের গ্রহণ করে। এরপর সেখানে তারা লুটপাট ও বাজেয়াপ্ত করনের পদ অনুসরণ করে নিজেদের উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে থাকে। এরপর সুলতান যাহিরের প্রেরিত বাহিনী এসে এসব কিছু দূর করে। তারা সেখানে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে ষোল লক্ষ দিরহাম উসূল করেন। এরপর সুলতান যাহিরের পক্ষ থেকে আমীর শাসসুদ্দীন আশোক তুর্কী আগমন করেন এবং শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সেখানে ন্যায়বিচার কায়েম করেন।

আর জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার মিশরের কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন শায়খ তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহহাব ইবন্ কাযী আবুল কাসিম খলফ ইবন্ রশীদুদ্দীন ইবন্ আবু ছানা মাহমূদ ইবন্ বদর। আর তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন সুলতান যাহিরের উমর কঠোর শর্তসমূহ সাপেক্ষের মাধ্যমে। তখন সুলতান তার শর্তসমূহ জেনে নেন এবং তিনি কাযীর পদ থেকে বদরুদ্দীন আবুল মাহাসিন য়ূসুফ ইবন্ আলী সানজারীকে অপসারণ করেন এবং কয়েকদিন তাকে আটক রাখবার পর মুক্ত করে দেন। তিনি বাগদাদে বন্দি ছিলেন, এরপর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। আর ইতোপূর্বে তিনি একদল বেদুঈনের কথা জানতে পারেন, তখন তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় তিনি বেদুঈন আরবদের দশজন আমীরের সাহচর্যে মিশরে গমন করেন। এদের অন্যতম হলেন আমীর নাসিরুদ্দীন। এটা ছিল রজব মাসের আট তারিখ, এদিন সুলতান যাহির, তার ওযীর সাক্ষী ও ঘোষকগণ সব একসাথে বের হয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান, আর তা ছিল এক স্মরনীয় দিন। এদিন তাওরাতের অনুসারী য়াহূদীরা তাদের তাওরাত নিয়ে এবং ইনজীলের অনুসারী খ্রিস্টানরা তাদের ইনজীল নিয়ে বের হয়ে আসে। আর মুস্তানসির বিরাট জাকজমক ও আড়ম্বরের সাথে বাবুন নাসর দিয়ে মিশরে প্রবেশ করেন। এরপর রজব মাসের তেরো তারিখে সোমবার সুলতান এবং খলীফা আলজাবাল দুর্গে সিংহাসনে উপবেশন করেন। আর ওযীর কাযী এবং আমীর উমারাগণ তাদের মর্যাদানুসারে আসন গ্রহণ করেন। এই খলীফা হলেন মাদরাসা মুসতানসিরিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা মুসতানসিরের ভাই এবং মুসর্ষাসিমের চাচা। মিশরে তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। তার হাতে বায়আত করেন সুলতান যাহির, তার কাযী, ওযীর ও আমীর উমারাগণ। এ সময় খলীফা মিশরীয় ভূখণ্ডে খিলাফতের পোশাক পরিধান করে বাহনে আরোহণ করে, আর তখন আমীর-উমারাগণ তার সামনে এবং প্রজা সাধারণ ছিল চারপাশে বিদ্যামান। ইনি হলেন আটত্রিশতম আব্বাসীয় খলীফা, তার মাঝে এবং হযরত আব্বাস (রা)-এর মাঝে চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান। সর্বপ্রথম তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন কাযী তাজুদ্দীন, অতঃপর সুলতান যাহির, অতঃপর শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবন্ আব্দুল সালাম, অতঃপর আমীর উমারাগণ। এরপর তার নামে জুমুআর খুৎবা প্রদান করা হয় এবং তার নাম মুদ্রায় খোদিত হয়। এদিকে তার পূর্বে প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় খিলাফত পদ শূন্য ছিল, কেননা, খলীফা মুসতাসিম নিহত হন ৬৫৬ হিজরীর শুরুর দিকে, আর তার রায়আত গৃহীত হয় এ বছর অর্থাৎ ৬৫৯ হিজরীর রজব মাসের তেরো তারিখ সোমবার।

তিনি ছিলেন বাদামী গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট এবং সুশ্রী ও উজ্জ্বল মুখাবয়বের অধিকারী, প্রচণ্ড শক্তিশালী উঁচু মনোবল সম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তি। তার ভাই মাদরাসাই মুসতান সিরিয়ার প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় তাকেও মুসতারিদির উপাধি প্রদান করা হয়, এটা অবশ্য অভিনব বিষয় যে, সহোদর এই খলীফা একে অন্যের উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদের দুজনের মত দুই সহোদর মাফফাহ ও মানসূর খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করে ছিলেন। এরূপই ছিলেন মুহাম্মাদ্ ইবন্ আলী ইবন্ 'আবুদল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস, আসহাচী ও আররশীদ, খলীফা মুসতাযাইরে দুইপুত্র মুসতারিশিদ ও মুকতাফী। আর যারা তিন ভাই খলীফা ছিলেন, তারা হলেন : খলীফা আর রশীদের তিনপুত্র যথা : আলআমীন, আলমুমিনূন ও আলমুনতাসিম, খলীফা মুকতাদিরের তিনপুত্র যথা আলমুন তাসির আলমু'তায-আলমুতীআ, আর যারা চার ভাই খলীফা ছিলেন, তারা হলেন : খলীফা আব্দুল মালিক ইবন্ সারওয়ানের চারপুত্র যথা : ওয়ালীদ, সুলায়মান, যাযীদ ও হিশাম। তার খিলাফতকাল ছিল মাত্র পাঁচমাস বিশ দিন, যা ছিল আব্বসীয় খলীফাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ততম, অবশ্য বানু উমায়্যার খলীফা মুআবিয়া ইবন্ য়াযীদ ইবন্ মু'আবিয়া খিলাফতকাল ছিল আরও সংক্ষিপ্ত সময়, মাত্র চল্লিশ দিন, আর য়াযীদ ইবন্ ইবরাহীমের খিলাফতকাল ছিল সত্তর দিন, আর ভাই য়াযীদ ইবন্ ওয়ালিদের খিলাফতকাল পাঁচ মাস। এছাড়া হযরত হালান ইবন্ 'আমীর (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল সাতমাস এগারো দিন, আর মারওয়ান ইবন্ হাকামের খিলাফতকাল ছিল নয় মাস দশ দিন। এছাড়া বানু 'আববানের এমন অনেক খলীফা ছিলেন, যাদের খিলাফতকাল বছর পূর্বে হয়নি। তাদের মধ্যে আলমুনতাসির ইবন্ আলমুতাওয়াক্কিল দুই মাস, আলমুহতাদী ইবন্ ওয়াদিক এগারো মাস কয়েকদিন।

এই খলীফা এবং তার সেবক পরিচালকদের আল জাবাল দুর্গে অবস্থান করানো হয়। অতঃপর রজব মাসের সাত তারিখে তিনি বাহনে আরোহন করেন এবং দুর্গের জামে মসজিদে আগমন করে মিম্বরে আরোহণ করেন। এরপর খুৎবায় তিনি বানু 'আব্বাসের মর্যাদা বর্ণনা করেন। অতঃপর বিজয় প্রার্থনা করেন এবং সূরা আনআমের শুরুর অংশ পাঠ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের জন্য দুআ করেন এবং সুলতান যাহিরের জন্যও দু'আ করেন। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে ইমামতি করেন। উপস্থিত লোকজন তার এই কার্যক্রম পছন্দ করে। আর এটা ছিল এক স্মরণীয় ও উত্তম দিন।

খলীফা কর্তৃক সুলতান যাহিরকে শাসনকর্তৃত্ব অর্পন : এ বছর শা'বান মাসের চার তারিখ সোমবার খলীফা, সুলতান, ওযীর, কাযীগণ, উমারাগণ এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ কায়রো শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত একটি বিশাল তাঁবুতে গমন করেন। সেখানে তারা সকলে আসন গ্রহণের পর খলীফা নিজ হাতে সুলতান যাহিরকে কালো পরিধেয় বস্ত্র পড়িয়ে দেন এবং তার গলায় একটি হার পড়িয়ে দেন, এবং তার উভয় পায়ে স্বর্ণবেড়ি পড়িয়ে দেন। এ সময় ফাখরুদ্দীন ইবরাহীম ইবন্ লোকমান, যিনি প্রধান কাতিব, তিনি মিশরে আরোহণ করেন এবং লোকদেরকে সুলতান যাহিরের শাসন কর্তৃত্ব লাভের ফরমান পাঠ করে শোনান, যা তিনি নিজ হস্তাক্ষরে প্রস্তুত করেছিলেন। অতঃপর সুলতান যাহির এই রাজকীয় পরিধেয়ে জাকজমকের সাথে অশ্বারোহণ করেন। এ সময় ওযীর তার সামনে আরোহীরূপে শাহী ফরমান বহন করেছিলেন,

আর আমীর উমারা সকলেই পদব্রজী ছিলেন, এ উপলক্ষে কায়রো শহরে সজ্জিত করা হয় এবং তিনি তা প্রদীক্ষণ করেন। আর এটা ছিল এক স্মরণীয় দিন, শায়খ কুতুবুদ্দীন এর সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক অবহিত।

খলীফার বাগদাদ গমন

অতঃপর খলীফা সুলতানকে নির্দেশ দিলেন তাঁর বাগদাদ যাত্রার ব্যবস্থা করতে, তখন সুলতান এই উদ্দশ্যে বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং তার জন্য খলীফার শান অনুযায়ী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলেন। অতঃপর সুলতান নিজেও তার সাহচর্যে দামেশকে রওয়ানা হলেন। আর সুলতান যাহিরের মিশর থেকে শাম যাত্রার কারণ ছিল যে, ইতোমধ্যে তুর্কীর হালব জবরদখল করেন। তখন সুলতান যাহির সেখানে আমীর আলামুদ্দীন সানজার হালকীতে প্রেরণ করেন যিনি দামেশক দখল করে তুর্কী হালব থেকে বিতাড়িত করে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেখানে সুলতান যাহিরের নায়েবরূপে অবস্থান করেন। অতঃপর এক সময় তুর্কী বা তার থেকে হালব পুনরুদ্ধার করেন। এবং আলমুদ্দীন সেখান থেকে পলায়ন করেন,

এমতাবস্থায় সুলতান যাহির মিশরে ইয্যূদ্দীন হালবীকে তার স্থলাবর্তী নির্ধারিত করেন এবং রাজ্যের পরিচালনা কার্যক্রম ন্যস্ত করেন ওযীর বাহাউদ্দিন হান্নার হাতে আর পুত্র ফখরুদ্দীনকে নিজের সাথে ওযীর ও পরামর্শকরূপে নিয়ে নেন এবং ফৌজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন আমীর বদরুদ্দীন খাযিনদারের উপর। অতঃপর তারা রওয়ানা হয়ে জিলক্বদ মাসের সাত তারিখ সোমবার দামেশকে প্রবেশ করেন। এটি ছিল ঐতিহাসিক দিন, এরপর তারা জামে দামেশকে জুমুআর নামায আদায় করেন। খলীফা দামেশকে প্রবেশ করেন বাবুর বারীদ দিয়ে, আর সুলতান যাহির প্রবেশ করেন বাবুয যিয়ারাহ দিয়ে, অতঃপর সুলতান খলীফার বাগদাদ যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন, এ সময় খলীফার সাথে ছিল মাওসিল শাসকের পুত্রগণ, তখন সুলতান তাদের জন্য এবং তাদের দেহরক্ষী বাহিনীর জন্য দশ লক্ষ দীনার ব্যয় করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এছাড়া এ সময় তার কাছে হিমসের শাসক সুলতান আশরাফ আগমন করেন। তখন তিনি তাকে রাজ পরিধেয় ও বখশীশ প্রদান করেন এবং তাকে তালবাশিব এলাকার শাসন কর্তৃত্ব অর্পন করেন, যা ছিল হিমসের অতিরিক্ত। তদ্রুপ হামা-প্রাশাসক মানসূরও আগমন করেন। তখন তিনি তাকেও রাজ পরিধেয় ও বখশীস প্রদান করেন এবং তার ভূখণ্ডে তার শাসন কৃর্তত্বের অনুকূলে লিখিত ফরমান প্রদান করেন। অতঃপর তিনি হালব-জবর দখলকারী তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমীর আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এটাই হল এ বছরের ঘটনা সংক্ষেপ।

৬৬০ হিজরীর সূচনা

এ বছরের শুরুতে মুহারমের তিন তারিখে খলীফা মুসতানসির বিল্লাহ নিহত হন, যার অনকূলে এর পূর্বের বছর রজব মাসে মিশরে বায়আত গৃহীত হয়। তার সঙ্গী যোদ্ধারা পরাজিত হওয়ার পর তিনি ইরাক ভূখণ্ডে নিহত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এ ঘটনার পর সুলতান যাহির সমগ্র শাম ও মিশরের একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এ সময়

একমাত্র তুর্কী ব্যতীত আর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না, মুনীরা শহরে গমন করে এবং সেখানে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বছর মুহাররম মাসের তিন তারিখে সুলতান যাহির মিশরে সকল আমীর উমারা ও সভাসদকে রাজ পরিধেয় ও উপঢৌকন দ্বারা সম্মানিত করেন। তাদের অন্যতম হলেন তার ওযীর এবং কাযী তাজুদ্দীন। আর মুহাররম মাসের শেষের আমীর বরুদ্দীন খাযিনদার মাওসিল প্রশাসক আমীর বরুদ্দীন লু'লু-এর কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, সুলতান যাহির এই উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। ঐতিহাসিক ইবন্ খাল্লিকান বলেন : এ বছর সুলতান যাহিরের জনৈক আমীর হামা শহরের সীমান্তে একটি নীল গাই শিকার করেন। অতঃপর তারা যখন রান্না করতে চাইল, তখন তা সিদ্ধ হতে চাইলনা এবং জ্বালানী কাঠের আধিক্য ও তাতে কোন কাজ করলো না। এরপর তারা এর চামড়া সন্ধান করলো, তখন হঠাৎ দেখা গেল, তার কানের অংশে বাহরামজূর লিখিত। তিনি বলেন : এটিকে তারা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল এবং আমি তা এমনই পড়েছি, এ কথার অর্থ হলো : এই নীল গাইয়ের বয়স হলো প্রায় আটশত বছর। কেননা, বাহরামজূর—এর সময়কাল ছিল নবুওয়াতের বহু পূর্বে, আর নীল গাই বহু বছর জীবিত থাকে।

আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : অবশ্য ইনি আলমালিক আলআমজাদ বারোম শাহ হতে পারেন। কেননা, এটি নীল গাইয়ের শিকার না হয়ে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকা অসম্ভব প্রায়। আর যে তা লিখেছে সে হয়ত ভুলক্রমে বাহরাম শাহ লেখার পরিবর্তে বাহরাম জূর লিখে ফেলেছে। ফলে এ বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

হাকিম বিআমরিল্লাহর আয়াত

এ বছর রবিউল আখির মাসের সাতাশ তারিখে খলীফা আবুল "আব্বাস হাকেম বি-আমরিল্লাহ আমোদ ইবন্ আমীর 'আবু আলী আলকাব্বী ইবন্ আমীর আলী ইবন্ আমীর আবূবকর ইবন্ ইমাম মুসতারিশিদ বিল্লাহ ইবন্ মুসতায়হির বিল্লাহ আবুল 'ইব্বাস ইবন্ আহমাদ প্রাচ্য দেশ থেকে প্রবেশ করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন সে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি দল, ইতোপূর্বে তিনি মুসতানসিরের সাহচর্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আর একদল যোদ্ধার সাথে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার কারণে তিনি রক্ষা পান। তিনি যেদিন শহরেও প্রবেশ করেন, সেদিন সুলতান যাহির তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তার জন্য আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করেন এবং তাকে আলজাবাল দুর্গের বৃহত্তম প্রকোষ্ঠে অবস্থান করান। এ সময় তার জন্য সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। আর এ বছর রবিউল আখির মাসে সুলতান যাহির আমীর জামালুদ্দীন আকাশ নাজীবীকে তার পদ থেকে অপসারিত করে তার স্থলে কন্যাকে নিয়োগ করেন। এরপর তিনি তাকে শামসের প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠান, যার বিবরণ অচিরেই আসছে।

রজব মাসের নয় তারিখ মঙ্গলবার সুলতান যাহির একটি কূপের মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় কাযী তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহহাবের দরবারে উপস্থিত হন, তখন তার সম্মানার্থে কাযী সাহেব ব্যতীত সকলেই উঠে দাঁড়ায়। কেননা, সুলতান পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়ে তাকে উঠে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। অতঃপর বাদী-বিবাদী তাদের দাবী উত্থাপন করে আর এ মামলায় সুলতান ছিলেন

প্রকৃত হকদার এবং তার উপযুক্ত প্রমাণও ছিল। ফলে তার প্রতিপক্ষের হাত থেকে কূপের দখল অপসারণ করে তার মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। আর তার এই প্রতিপক্ষ ছিল জনৈক আমীর।

এ বছর শাওয়াল মাসে সুলতান যাহির হালবের প্রশাসক নিয়োগ করেন আলাউদ্দীন আশশাহবানীকে এবং তখন শীস শহরের ফৌজ হালবে দুর্গের দিকে জড়ো হয়, তখন আমীর শাহবানী তার বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তাদেরকে আক্রমণে পর্যুদস্ত করেন, এ সময় তিনি শত্রুপক্ষের একদল লোককে বন্দি করে মিশরে প্রেরণ করেন এবং সেখানে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এছাড়া এ বছরই সুলতান দামেশকের আমীর নিয়োগ করেন আমীর জালালুদ্দীন আকোশ নাজীবীকে। তিনি ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট আমীর। এছাড়া এ সময় তিনি আলাউদ্দীন তাবরাল ওযীর ও অপসারণ করে তাকে কায়রো প্রেরণ করেন। আর এ বছর জিলকদ মাসে কাযী তাজুদ্দীন এর কাছে সুলতানের এই ফরমান প্রেরিত হয় যে,তিনি যেন তিন মাযহাবের প্রত্যেক মাযহাবের জন্য একজন নাউবা বা সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। তখন তিনি হানাফী মাযহাবের জন্য নিয়োগ করেন সদরুদ্দীন সুলায়মান হানাফোকে, হাম্বলী মাযহারের জন্য শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ শায়খ ইমাদকে এবং মালেকী মাযহাবের জন্য শারফুদ্দীন উমর সাবাকীকে নিয়োগ করেন। এ বছর জিলহজ্জ মাসে নিরাপত্তা প্রর্থনা করে তাতারীদের বহু দূত সুলতান যাহিরের দরবারে আসে, তখন তিনি তাদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে উৎকৃষ্ট জায়গীর প্রদান করেন। মাওসিল শাসকের পুত্রের সালেও এরূপ আচরণ করেন এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া এ বছরই হালাকু খাঁ প্রায় দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তারা মাওসিল অবরোধ করে এবং এ সময় তারা চব্বিশটি পাথর কামান স্থাপন করে এবং মাওসিলবাসী রসদ ও খোরাক সংকটে পতিত হয়। এ বছরই সুলতান ইসমাইল ইবন্ লু'লু তুর্কীর কাছে দূত প্রেরণ করে তাতারীদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন তিনি নিজেই তার সাহায্য আগমন করেন, ফলে তাতারীরা প্রথমে পরাস্ত হয়, তারপর তারা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে তার মোকাবিলা করে। আর তার সাথে ছিল মাত্র সাতশ যোদ্ধা, ফলে তাতারীরা তাকে পরাজিত ও আহত করে এবং তিনি ধারা শহরে ফিরে আসেন। এ সময় তার অধিকাংশ সহযোদ্ধা তাকে ছেড়ে মিশরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। অতঃপর তিনি নিজেও সুলতান যাহিরের সাথে সাক্ষাত করেন। তখন সুলতান তাকে সসম্মানে পুরস্কৃত করেন এবং সত্তরজন অশ্বারোহী প্রদান করেন। এদিকে তাতারীরা মাওসিলে ফিরে আসে এবং সেখানে অবরোধ আরোপ করে নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তার শাসক সুলতান ইসমাইলকে আত্মসমর্পণ রাজী করায় এবং শহরে জানমালের নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে। এ ঘোষণার শহরবাসীর মাঝে যখন স্বস্তি ফিরে আসে, তখন তারা অকস্মাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এভাবে ক্রমাগত নয়দিন তারা হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। এ সময় তারা সুলতান ইসমাইল তার পুত্রে আলাউদ্দিনকে হত্যা করে এবং নগরপ্রাচীর ধ্বংস করে মাওসিলকে বিরান শহরে পরিণত করে ফিরে যায়। আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন।

এ বছরই সম্রাট হালাকু খাঁর ও তার পিতৃব্যপুত্র বারকা খানের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়, এবং তিনি হালাকুর কাছে তার জয়কৃত ভূখণ্ড ও ধন-সম্পদের অংশ দাবী করে বসেন। আর সেখানে এ ধরনের দাবী প্রচলিত ছিল। কিন্তু হালাকু খাঁ তার দূতদের হত্যা করেন। তখন

বারাকা খাঁন ক্রুদ্ধ হয়ে হালাকুর বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার জন্য সুলতান যাহিরের কাছে পত্র প্রেরণ করেন।

আর এ বছর শামে দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে, বিশেষত প্রধান খাদ্যশস্য গম ও যব এবং গোশতের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ বছর মধ্য শা'বানে তাতারীদের আক্রমণের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বহু মানুষ মিশর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এ সময় দুর্গে রক্ষিত এবং আমীর উমারাদের খাদ্যশস্য বিক্রি করে দেয়া হয় এবং শহরের প্রাশাসকগণ যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে দামেশক ত্যাগ করে মিশরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এ বছর শাম দেশে এবং রোম দেশে বিরাট ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। কেউ কেউ বলেন : এ ভূমিকম্পের কারণে তাতারীদের ভূখণ্ডের বিরাট আতঙ্ক দেখা দেয়। মহিমাময় ও পবিত্র ঐ সত্তা! যিনি অবধারিত তাবেদার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন এবং যার হাতে সকল কর্তৃত্ব। দামেশকবাসীকে দামেশক ত্যাগ করে মিশরে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশদাতা ছিলেন দামেশকের প্রশাসক আমীর আলাউদ্দীন তায়বরদা আলওযীঙ্গ এরপর এ বছর জিলকদ মাসে সুলতান যাহির তার কাছে দূত প্রেরণ করে তাকে গ্রেফতার করেন এবং তাকে অপসারণ করে তার স্থলাবর্তী নিয়োগ করেন বাহাউদ্দিন নাজীবীকে, আর দামেশকের উযীর নিয়োগ করেন ইযযুদ্দীন ইবন্ ওয়াদাআকে।

এছাড়া এ বছরই 'আল্লামা ইবন্ খাল্লিকান 'আল্লামা আবু শামার অনুকূলে মাদরাসা রুকনিয়্যার পাঠদান ত্যাগ করেন এবং আবূ শামা তখন মুখতাসারুল মুখনীর পাঠদান শুরু করেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

খলীফা মুসতানজির ইবন্ যাহির বিআমরিল্লাহ আব্বাসী

ইনি হলেন ঐ খলীফা, যার হাতে সুলতান যাহির মিশরে আয়আত গ্রহণ করেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর তিনি নিহত হন এ বছর মুহাররম মাসের তিন তারিখে। তিনি ছিলেন দুঃসাহী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সুলতান যাহির তার দশ লক্ষ দীনারের অধিক অর্থ ব্যয় করে তার জন্য একটি ফৌজ সংগঠিত করেন এবং তিনি নিজে একদল বিশিষ্ট আমীর উমারা ও মাওসিল শাসকের পুত্রদের নিয়ে তার সাহচর্যে যাত্রা করেন। এ সময় সুলতান ইসমাইল সুলতান যাহিরের কাছে রাজপ্রতিনিধিদলের সাথে গমন করলে তাকেও তিনি খলীফার সাহচর্যে প্রেরণ করেন। অতঃপর যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন খলীফা মুসতানসির নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সুলতান ইসমাইল তার দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর তাতারীরা এসে তাকে অবরুদ্ধ ও হত্যা করে এবং তার দেশের অধিবাসীদের হত্যা করে তাকে বিরান ভূমিতে পরিণত করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভাষাও ব্যাকরনবিদ আল্‌ইয

তার নাম হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ নাজা মূলত তিনি নাসীবায়নের অধিবাসী, আর তিনি প্রতিপালিত হন আরবীল শহরে। তিনি বিভিন্ন প্রকার আদি শাস্ত্রের চর্চা করতেন এবং তার কাছে অনেক যিশী ও অন্যান্যরা শিক্ষা লাভ কতো, তার ধার্মিকতার বেশ শিথিলতা ছিল। তিনি মেধাবী ছিলেন, কিন্তু পরিশুদ্ধ নন। তার জিহবা ছিল জ্ঞানপূর্ণ, অন্তর ছিল মূর্খ, বাক্য ছিল বুদ্ধিময়, কর্ম ছিল অপবিত্র। তার রচিত কবিতা বিদ্যমান, শায়খ কুতুবদ্দীন

তার জীবনীতে তার একাংশ উল্লেখ করেছেন। অন্ধ কবি আবুল আলা মারব্বীর সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে।

ইবন্ 'আব্দুস সালার

'আব্দুস আযীব ইবন্ 'আব্দুস সালাম ইবন্ কাসিম ইবন্ হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ আলমুহায়যাব, শায়খ ইয়যুদ্দীন ইবন্ আব্দুস সালাম আবূ মুহাম্মাদ আলমুলামী আদ-দামেশকী আশ্-শাফেয়ী। ইনি ছিলেন শাফী মাযহাবের অন্যতম শায়খ, তার রচিত বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আত্তাতফসীর ইখতিসারুর নিহায়া আল কওয়াইদুল কুবরা ওয়াসমুগরা, কিতাবুস সালওয়া, ফাতাওয়া আলমাওসিলিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৭৭ অথবা ৫৭৮ হিজরী সনে। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফখরুদ্দীন ইবন্ আসাকির ও অন্যান্যদের কাছে ইলম চর্চা করেন। তিনি বহু বিষয় ও শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন এবং মাযহাবে পারদর্শিতা লাভ করেন। এছাড়া তিনি দামেশকের একাধিক মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি কিছুকাল দামেশকের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মিশরে গমন করেন। সেখানে তিনি দরূদ পাঠ করেন এবং খতীব ও কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ে তিনিই ছিলেন শাফেয়ী মাযহারের শীর্ষ আলিম দূর দুরান্ত থেকে ফাতওয়া জানার জন্য মানুষ তার কাছে আসতো, তিনি ছিলেন কোমলস্বভাব ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কবিতা পঙক্তি আবৃত্তি করে প্রমাণ পেশ করতেন। শাম থেকে তার চলে আসার কারণ, তিনি নগদ ও ছাকীফ অঞ্চল খ্রিস্টানদের হাত রক্ষা করার কারণে সুলতান সালিহ ইসমাইলের সমালোচনা করেছিলেন। শায়খ আবূ আমর ইন হাজির মালিকীও তার সাথে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছিলেন। তখন ইসমাঈল তাদের দুজনকে তার শহর থেকে নির্বাসিত করেন। তখন আবূ আমর গমন করেন কারণ প্রশাসক নানের দাউদের কাছে, যিনি তাকে সাদরে গ্রহণ করেন, আর ইবন্ আব্দুস সালাম গমন করেন সালিহ আয়্যুব ইবন্ কামিলের কাছে। তখন তিনি তাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাকে মিশরের কাযী ও খতীবের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে এ দুটি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাদরাসা সালেহিয়্যার পাঠদানের দায়িত্বে বহাল রাখেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি কাযী তাজুদ্দীনকে এই দায়িত্ব অর্পনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আর তিনি ইনতিকাল করেন জুমাদাল 'উলা মাসের দশ তারিখে। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আশির বেশি। পরদিন তাকে মুকাত্তমের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। তার জানাযায় বহুমানুষ শরীক এমনকি সুলতান যাহিরও তার জানাযায় হাযির ছিলেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

কামালুদ্দীন ইবন্ আদীম আল্ হানাফী

"উমর ইবন্ আহমাদ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ হিবাতুল্লাহ ইবন্ আহমাদ ইবন্ য়াইয়া ইবন্ যুহায়র ইবন্ হারুন ইবন্ মূসা ইবন্ ঈসা ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবূ জাররাদা আমির ইবন্ রাবিতা ইবন্ খওয়ালিদ ইবন্ 'আওফ ইবন্ আমির ইবন্ 'আকীল আলহালবী আল্হানাফী আবুল কাসিম ইবন্ আজীম। যিনি একাধারে বিশিষ্ট আমীর ওযীর ও বড় নেতা ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫৮৬ হিজরীতে। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন। ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফাতওয়া প্রদান করেন, পাঠদান করেন এবং গ্রন্থ

সংকলন করেন। বহু শাস্ত্রে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন, একাধিকবার তিনি খলীফা ও বাদশাদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তার হস্তাক্ষর ছিল চমৎকার, প্রায় চল্লিশ খণ্ডে তিনি হালবের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। হাদীস শাস্ত্রে তার ভাল জানাশোনা ছিল। এবং তিনি দরিদ্র ও নেককারদের প্রতি সদাচারী ছিলেন। নাসিরীয় সাম্রাজ্যে তিনি দামেশকে অবস্থান করেন। তিনি মিশরে ওফাত লাভ করেন এবং মুকাত্তমের পাদদেশে সমাহিত হন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ইবন্ আব্দুস সালামের দশদিন পর। ঐতিহাসিক কুতুবুদ্দীন তার অনেকগুলি চমৎকার কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করেছেন।

য়ুসূফ ইবন্ য়ূয়ুফ ইবন্ সালামা

ইনি ছিলেন ইবন্ ইবরাহীম ইবন্ হাসান ইবন্ ইবরাহীম ইবন্ মুসা ইবন্জাফির ইবন্ সুলায়মান ইবন্ মুহাম্মাদ আলফাকানী আয্যায় নানী ইবন্ ইবরাহীম ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আব্বাস ইবন্ 'আব্দুস মুত্তালিব, মুহীয়ূদ্দীন আবুল মুইস। আর কারও মতে আবুল মাহাসিন আলহাশিমী আলহাও গিলী, যিনি কবি ইবন্ যায়লাক নামে পরিচিত। এ বছর মাওসিল জবরদখলের সময় ৫৭ বছর বয়সে তাতারীরা তাকে হত্যা করে। তার কয়েকটি কবিতা পঙক্তি হলো :

"তোমার চোখের যাদু থেকে তুমি আমাদের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্নতা প্রেরণ করেছ যা নিদ্রাকে সমৃদ্ধ করে চোখের পাতার সাথে সখ্য স্থাপনে। আমার দেহকাঠামো তোমার কোমর সৌন্দর্য ক্ষীণতা প্রত্যক্ষ করেছে, ফলে সে তাকে অনুকরণ করেছে, কিন্তু তা তার ভাবকে ক্ষীণতা করেছে। তুমি এমন দীপ্তিময় মুখমণ্ডল প্রকাশ করেছে, যা প্রভৃতি কিরণকে ম্লান করে দিয়েছে এবং তোমার দেহকোঠামো সকলকে বিমোহিত করেছে।

একবার তাকে কোনো এক স্থানে আহবান করে পাঠান্নো হয়, তখন সে নিম্নোক্ত পঙক্তিদ্বয় পাঠায় :

"আমিতো এমন নিবাসে রয়েছি, যেখানে আল্লাহ্ সহচর, সঙ্গিনী ও সম্পদের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের থেকে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে তারা আমার অজুহাতকে ব্যবহার করেছে।

ঐতহাসিক আবূ শামা বলেন : এ বছরই জুমাদান আখিরা মাসের বারো তারিখ তিনি ইনতিকাল করেন।

আলবদর আল্মুরাগী আল্খিলাফী

যিনি 'আততাবীল বা দীর্ঘকায় ও লম্বা' নামে পরিচিত। তার ধার্মিকতা ছিল শিথিল। তবে সে নিজের জ্ঞান গরিমার বেশ তুষ্ট ছিল।

মুহম্মাদ ইবন্ দাঊদ ইবন্ য়াকূত সারিমী

তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রবিদ। তাবাকাত ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তিনি ছিলেন নেককার ও দীনদার। তিনি তার কিতাবসমূহ অন্যদেরকে ধার দিতেন এবং নিয়মিত হাদীস শ্রবণ করতেন। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

৬৬১ হিজরী শুরু

এ বছর যখন সূচিত হয়, তখন শাম ও মিশরের শাসক ছিলেন সুলতান যাহির বায়বারাস। এ সময় শাম এলাকায় তার প্রশাসক ছিলেন আকোশ নাজীবী দামেশকের কাযী ছিলেন ইবন খাল্লিকার এবং ওযীর ছিলেন ইয়যুদ্দীন ইবন্ ওয়াদা। এ সময়ে কোনো খলীফা ছিলেন না। ইতোপূর্বে নিহত খলীফা মুসতানিসিরের নামেই মুদ্রা প্রস্তুত করা হতো।

হাকিম বি আমরিল্লাহ্ আবুল আব্বাস-এর খিলাফত

আহমাদ ইবন্ আমীর আবূ আলী কাব্বী ইবন্ আমীর আবূ বকর ইবন্ ইমাম মুসতারশিদ বিল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীন আবূ মানসূর ফযল ইবন্ ইমাম আল্-মুল্তাযহির বিল্লাহ আহমাদ আল্-আব্বাসী আল হাশিমী। এ বছর মুহাররম মাসের দুই তারিখ বৃহস্পতিবার সুলতান যাহির এবং আমীর উমারাগণ আলজাবাল দুর্গের বৃহত্তর দরবারে উপবেশন করেন। অতঃপর খলীফা হাকিম বি-আমরিল্লাহ এসে সেখানে অবতরণ করেন। সুলতান যাহিরের পাশে উপবেশনের জন্য তার আসন প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর তার নির্দেশ সকলকে পাঠ করে শোনার হয়, এরপর প্রথমে সুলতান যাহির বায়বারুল তার হাতে বায়আত করেন এবং তারপর অন্যান্য সকলে বায়আত করেন। এটা ছিল একটি স্মরণীয় দিন। এরপর দ্বিতীয় জুমাআর দিন খলীফা সকলের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেছিলে, তা ছিল নিম্নরূপ :

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি বানু 'আব্বাসের জন্য এক প্রকাশ্য স্তম্ভ স্থাপন করেছেন এবং তাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সাহয্যকারী নির্ধারণ করেছেন। মুখাচ্ছন্দে এবং দুঃখ দুর্দশায় আমি তাঁর প্রশংসা করছি, এবং তাঁর প্রদত্ত নিআমতের শোকর আদায়ের জন্য আমি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। শত্রু প্রতিহত করার ব্যাপারে আমি তাঁর মদদ তলব করছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক্ব নেই এবং মুহাম্মাদ (স) হলেন তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি এবং হেদায়েতের তারকা ও অনুসারণীয় পুরোধা তার সহচরগণের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষন করুন। বিশেষত চার জনের প্রতি, এবং আব্বাসের প্রতি, যিনি ছিলেন তাঁর দুশ্চিন্তা দুরকারী খলীফাদের পিতৃত্বের অধিকারী এবং বাকী সাহাবীদের প্রতি শেষ দিবস পর্যন্ত তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণকারিদের প্রতি।

হে লোক সকল! জেনে রাখ যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হলো একটি অবশ্যপালনীয় বিধান, আর জিহাদ হলো তাবৎ মাখলূকের উপর আরোপিত অনিবার্য বিষয়। আর মুসলমানদের ঐক্য ব্যতীত জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ হতে পারে না। হারাম লিপ্ত হওয়ার কারণেই হারেশবাসীদের বন্দি করা হয়েছে, অপরাধ সংঘটিত করার কারণেই রক্তপ্রবাহিত করা হয়েছে। যদি তোমরা আল্লাহর দুশমনদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে, তাহলে তারা বাগদাদে প্রবেশ করতে পারতো না, জানমাল লুণ্ঠন করতে পারতো না, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা করতে পারতো না, পারতো না নারীদের বন্দি করতে, পারতো না তাদেরকে পিতৃমাতৃহীন করতে, এবং পারতো না খিলাফতের এবং শাহী খান্দানের মর্যাদা ও সম্ভ্রম নষ্ট করতে। সেই বিভীষিকাময় দিন পৃথিবী মানুষের আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়েছিল; কত বৃদ্ধ এমন ছিল, যার রাজপথে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, কত শিশু

কেঁদেছিল, কিন্তু তার কান্নার প্রতি দয়া করা হয়নি। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! জিহাদের বিধান পুনজীবিত করার জন্য তোমরা তৎপর হও এবং আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।',

আর তোমরা শোন, জান এবং মাল ব্যয় কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।

সুতরাং দীনের দুশনদের মোকাবিলা থেকে এবং মুসলমানদের রক্ষা করা থেকে বিরত থাকার কোনো অজুহাত আর বাকী থাকলো না। সুলতান নাহির হলেন স্বভাব নেতৃত্বের অধিকারী জ্ঞানী ও মহিমান্বিত, ন্যায়পরায়ণ, সংগ্রামী আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত এবং দীন দুনিয়ার স্তম্ভ। যখন সাহয্যকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তখন তিনি আমানতে খিলাফতের সহযোগিতায় তৎপর হয়েছেন। এছাড়া তিনি মুসলমানদের বাড়িঘর তছনছকারি কাফির বাহিনীকে বিতারিত করেছেন। তার মনোবলের কারণে বায়আত হয়েছে সুবিন্যস্ত এবং আব্বাসীয় সম্রাজ্য হয়েছে অধিক সংখ্যার সৈন্য দ্বারা সুসংহত, সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা এই নি'আমতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। তোমরা তোমাদের নিয়ত খাঁটি কর! তাহলে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর বিজয় লাভ করবে। অতীতে যা সংঘটিত হয়েছে, তা যেন তোমাদের ভীত না করে। কেননা, যুদ্ধের জয় পরাজয় আবর্তনশীল, আর ভাল পরিণাম হলো আল্লাহ ভীরুদের জন্য কালের দুই অবস্থা, আর পুরষ্কার মু'মিনদের জন্য হিদায়েতের উপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং ইমানের ভিত্তিতে তোমাদের সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করুন। আমি আমার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

এরপর কিছুক্ষণ বিরতির পর তিনি দ্বিতীয় খুৎবা দেন, তারপর মিম্বর থেকে নেমে সালাত আদায় করেন।

তার বায়আতের বিষয় বিভিন্ন এলাকায় লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়া হয় এবং তার নামে মুদ্রিত করে মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। ঐতিহাসিক আবু শামা বলেন : এরপর এ বছর মুহাররম মাসের ষোল তারিখ শুক্রবার জামে দামেশক এবং অন্যান্য সকল জামে মসজিদে তার বামে খুৎবা প্রদান করা হয়। আর ইনি হলেন আবূ আব্বাসের ঊনচল্লিশতম খলীফা। সাফফাহ ওয়া মনসূরের পর উনি ব্যতীত এমন কোনো 'আব্বসীয় খলীফা ছিলেন বা,যার পিতা ও পিতামহ খলীফা নন। তবে সে সকল খলীফার পিতা খলীফা ছিলেন না, তাদের সংখ্যা অনেক, এদের মধ্যে রয়েছেন মুসতারীন আহমাদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ মু'তাসিম, মু'তাবিদ ইবন্ তালহা ইবন্ মুতাওয়াককিল, কাদির ইবন্ ইসহাক ইবন্ মুকতাদির এবং আলমুকতাদী ইবন্ যাখীরা ইবন্ কাইম বি আমরিল্লাহ্।

সুলতান যাহিরের কারকদখল

সুলতান যাহির এ সময় বিজয়ী বাহিনী নিয়ে মিশর থেকে কারক অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সময় তিনি কারক প্রশাসক সুলতান মুগীছ উমর ইবন্ আদিল আবূ বকর ইবন্ কামিলকেও ডেকে পাঠান। অতঃপর তিনি যখন বেশ প্রচেষ্টার পর তার সাক্ষাতে আগমন করেন তখন যাহির তাকে বন্দি করে মিশরে প্রেরণ করেন। আর সেটাই ছিল তার সর্বশেষ পরিজ্ঞাত অবস্থা। আর তার এ

অবস্থার কারণ ছিল যে তিনি হালাকু খাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে আরেকবার পাশে আসার জন্য উৎসাহিত করেন। এ সময় তার কাছে এই মর্মে তাতারীদের পত্র আসে যে, তিনি যেন অবিচল থাকেন এবং তাদের স্থলাবর্তীরূপে বহাল থাকেন এবং শীঘ্রই মিশরীয় ভূখণ্ড জয়ের জন্য তাদের বিশ হাজার সৈন্যবাহিনী তার কাছে উপস্থিত হবে, এ সংবাদ অবস্থিত হওয়ার পর সুলতান যাহির তার হত্যার বৈধতার অনুকূলে ফকীহদের ফাতওয়া সংগ্রহ করে তা কাযী ইবন্ খাল্লিকানের সামনে উপস্থাপন করেন। আর তিনি তাকে দামেশক থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তদ্রুপ এই ফাতওয়া তিনি তার বিশিষ্ট আমীর উমারাদের সামনেও পেশ করেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে জুমাদাল উলা মাসের তোরো তারিখ শুক্রবার কারকের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সে দিন তিনি সেখানে প্রবেশ করেন রাজকীয় পাক জনকের সাথে। অতঃপর তিনি বিজয়ী বেশে মিশরে ফিরে আসেন।

আর এ বছরই বারাকা খানের দূতগণ সুলতান যাহিরের কাছে এসে তার এই বক্তব্য পৌছে দেন যে, আপনি তো ইসলামের প্রতি আমার মহব্বতের কথা ভালোভাবেই জানেন। আর হালাকু খাঁ মুসলমানদের সাথে কী করেছে তাও আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং আপনি একদিক থেকে আসুন, আর আমি অন্য দিক থেকে এসে তাকে আমরা উৎপাটিত করে ফেলি, অথবা মুসলিম বসতি থেকে বহিষ্কার করি। আর তার কবল থেকে উদ্ধারকৃত ভূখণ্ডের শাসন কর্তৃত্ব হতে আপনার। সুলতান যাহির উক্ত প্রস্তাব-কে স্বাগত জানান এবং তার দূতদের রাজ পরিধেয় এবং উপহার উপঢৌকন দ্বারা সম্মানিত করেন।

এছারা এ বছরই মাওসিল শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভূত হয় এবং শহরের অভ্যন্তরে বাড়িঘর ভেঙে পড়ে। এ বছর রমযান মাসে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদে নবাব পুনঃনির্মাণের জন্য সুলতান যাহির দক্ষ নির্মাণকর্মী এবং উৎকৃষ্টমানের নির্মাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। অতঃপর সেই সকল নির্মাণ উপকরণ মিশরের বিভিন্ন অংশে তার মর্যাদা প্রকাশার্থে প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর সেগুলি মদীনায় প্রেরণ করা হয়। আর এ বছর শাওয়াল মাসে সুলতান যাহির আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন এবং সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি যাচাই করেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেখানকার খতীব ও কাযী নাসেরুদ্দীন 'আহমাদ ইবন্ মুনীরকে অপসারণ করেন এবং অন্য একজনকে তার স্থলবর্তী করেন।

এছাড়া এ বছরই বারাকা খান ও হালাকু খার মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রত্যেকের সাথে ছিল বহুসংখ্যক যোদ্ধা, এ যুদ্ধে হালাকু খাঁ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, অধিকাংশ যোদ্ধা নিহত হয় এবং অক্ষতদের অধিকাংশ পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং মুষ্টিমেয় যোদ্ধাদের নিয়ে যেকোনো মতে প্রাণে বেঁচে যায়। যুদ্ধ শেষে বারাকা খাঁর যখন নিহতের সংখ্যাধিক্য দেখতে পান, তখন মন্তব্য করেন তাতারীদের এনে অন্যান্য হত্যা করতে দেখা আমার জন্য বেদনাদায়ক, কিন্তু চেঙ্গিস খানের রীতি যারা পরিবর্তন করেছে, তাদের ব্যাপারে আর আমি কী কৌশল অবলম্বন করতে পারি। অতঃপর বারাকা খান কনসট্যান্টি নেপাল আক্রমণ করেন; তখন তার প্রশাসক তার সাথে সন্ধি করেন এবং সুলতান যাহির বারাকা খানের কাছে বিপুল পরিমাণ উপহার উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

এদিকে জনগণ হালবে আরেকজন খলীফা নির্ধারিত করে তাকে 'হাকিম' উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর যখন 'মুসতানসির'তাকে অতিক্রম করেন, তখন তিনি তার সাথে ইরাকে রওয়ানা হন এবং তারা উভয়ে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে একমত হন এবং হাকিমকে মুনতান্‌সিরের অনুগামী করার ব্যাপারে একমত হন। কেননা, তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু তাতারীদের একটি দল তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং তাদের অনেক যোদ্ধাকে হত্যা করে, আর এ সময়ই মুস্‌তানসির নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং হাকিম বেদুঈন আরবদের সাথে পলায়ন করেন। এই মুস্‌তান্‌সির তারপর শাম দেশে ইরাক যাত্রার পথে বহু শহর জয় করেন। এ সময় বাহাদুর যখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তখন মুস্‌তান্‌সির তাকে পর্যুদস্ত করেন এবং তার অধিকাংশ যোদ্ধাদের হত্যা করেন। কিন্তু তার পক্ষে হঠাৎ তাতারীদের একদল আত্মগোপনকারী যোদ্ধাদের আবির্ভাব ঘটে। তখন মুস্‌তান্‌সিরের সাথে যে সকল আবর ও কুর্দি যোদ্ধা ছিল, তারা পলায়ন করে। আর তিনি একদল তুর্কী যোদ্ধাদের নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। অতঃপর এ ব্যবস্থা থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আর এ সময় একদল যোদ্ধা নিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৬০ হিজরীর মুহাররম মাসের শুরু দিকে।

বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা সমৃদ্ধ ইরাক ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশের ক্ষেত্রে এর অবস্থা ছিল হযরত হুসায়ন ইবন্ আলী (রা)-এর সাথে সাদৃশ্যপুর্ণ। তার জন্য অধিক সঙ্গত ছিল তার অনুকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত শামে অবস্থান করা। কিন্তু এটা ছিল তার তাকদীর। এ ছাড়া এ সময় সুলতান দামেশক থেকে খ্রিস্টানদের ভূখণ্ড অভিমুখে ফৌজ প্রেরণ করেন। তারা শত্রুভুখন্ড আক্রমণ করে শত্রুযোদ্ধাদের হত্যা ও বন্দি করে এবং নিরাপদে শামদেশে ফিরে আসে। এ সময় খ্রিস্টানরা তাদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তখন সুলতান হালব ও অনুগামী ভূখণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুকালের জন্য সন্ধি করেন।

ইতোপূর্বে শাওয়াল মাসে তিনি মিশরের কাযী তাজুদ্দীনকে অপসারণ করে তার স্থলবর্তীরূপে নিয়োগ করেন। বুরহানুদ্দীন আল্-খাযির ইবন্ হুসায়ন সানজারীকে তিনি কাযীর দায়িত্বের সাথে ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান জামে মসজিদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধান এবং সাতটি মাদরাসার পাঠদানের দায়িত্ব অর্পন করেন। এই মাদরাসাগুলি হলো আদিলিয়া, নালেরিবিয়্যা, গাদরাবিয়্যা, ফালাকিয়া, রুকনিয়া, ইকরালিয়্যা, এবং বাহানসিয়্যান মাদরাসা,জামে দামেশকে আরাফার দিন শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর তার দায়িত্ব লাভের ঘোষণা পাঠ করে শোনানো হয়। আর অপসারিত কাযী অভিযোগ নিয়ে প্রস্থান করেন। আল্লামা আবূ শামা তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন : তিনি কারও গচ্ছিত রাখা স্বর্ণকে মুদ্রার রূপান্তরিত করে তার আমানতদারীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন। আর তিনি এই পদে দায়িত্ব পালন করেন এক বছর কয়েক মাস। এ বছর ঈদের দিন শনিবার সুলতান মিশর যাত্রা করেন। এ সময় দামেশকে সুলতানের কাছে ইসমাইলিয়্যা সম্প্রদায়ের দূত আগমন করে। এই দূতের মাধ্যমে তারা সুলতানকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং তার থেকে অনেক ভূসম্পত্তির জায়গীর দাবী করে। কিন্তু মূলত সুলতান কৌশলে তাদের মাঝে

অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মূলোৎপাটন করে তাদের ভূখণ্ডে নিজের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হন।

আর এ বছর রবিউল আউয়াল মাসের ছাব্বিশ তারিখে সুলতান সালাহুদ্দীন য়ূয়ুফ ইবন্ 'আযীয মুহাম্মাদ ইবন্ যাহির গাযী ইবন্ নাসের সালাহদ্দীন য়ুযূফ ইবন্ আয়্যুব ইবন্ প্রাচীরের মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভা পালন করা হয়। সুলতান যাহির রুকনুদ্দীন বায়বাসের নির্দেশে মিশরের আল্‌জাবাল দুর্গে এই শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় যখন একথা জানা যায় যে, তাতারী সম্রাট হালাকুর নির্দেশে তাকে হত্যা করে হয়েছে। তার তিনি দীর্ঘাদিন যাবৎ তার কাছে বন্দি ছিলেন। এরপর যখন হালাকু খাঁর কাছে এই সংবাদ পৌছে যে, তার প্রেরিত বাহিনী 'আয়নে জালুত' যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে তখন সে সুলতান সালাহুদ্দীন য়ুযুফকে তার সামনে হাযির করে বলে নিশ্চয় তুমি মিশরীয় বাহিনীর কাছে দূত প্রেরণ করেছে, ফলে তারা এসে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে পরাজিত করেছে, এই অভিযোগ উত্থাপনের পর হালাকু খাঁ তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করে। বর্ণিত আছে যে, এ সময় সালাহুদ্দীন য়ুযুফ এই অভিযোগ সম্পর্কে তার অজুহাত পেশ করে বলেন : মিশরীয়রা তার শত্রু ছিল এবং তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিদ্যামন, একথা শুনে হালাকু খাঁ তাকে ক্ষমা করে, কিন্তু তার কাছে তার মর্যাদা হ্রাস পায়, অথচ ইতোপূর্বে তিনি তার কাছে বেশ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আর ইতোমধ্যে হালাকু খাঁ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে যদি মিশর জয় করতে পারে, তাহলে সে তাকে হিমসের প্রশাসক নিয়োগ করবে। আর এ বছর যখন হিমসের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং তাতে হালাকু খাঁর সৈন্যরা তাদের বীর সেনাপতি বায়দারাসহ নিহত হলো, তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে সালাহুদ্দীন য়ূযুফকে বললো : আযীরিয়্যার অবস্থানরত তোমার অনুসারীরা হলো তোমার পিতার আমীর উমারা, আর নাসেরিয়্যার অবস্থানরতরা হলো তোমার অনুসারী এরা সকলে মিলে আমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেছে। একথা বলার পর হালাকু খাঁ তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

কীভাবে তাকে হত্যা করা হয়, সে সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হালাকু খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন, তখন তাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এ সময় হালাকু খাঁ তার সহোদর ভাই যাহির আলীকেও হত্যা করে। তবে তাদের দুজনের পুত্রদ্বয় 'আযীয মুহাম্মাদ ইবন্ নাসের এবং যুবালা ইবন্ যাহিরকে মুক্ত করে দেয়। তারা দুজন ছিল অতিসুদর্শন দুই শিশু। এদের মাঝে আযীয সেখানে তাতারীদের হাতে বন্দি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, আর যুবালা সেখান থেকে মিশর গমন করেন। সে ছিল সেখানকার সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, তার মা ছিল আযাদকৃত দাসী মনিকের মৃত্যুর পর জনৈক আমীর তাকে বিবাহ করেন। বর্ণিত আছে যে, হালাকু খাঁ যখন নাসিরকে হত্যা করার সংকল্প করে, তখন পরস্পর দূরত্বে অবস্থিত চারটি গাছের মাথায় দড়ি বেধে সেগুলিকে টেনে যথাসম্ভব কাছাকাছি আনা হল। অতঃপর চার দড়ি দ্বারা নাসিরের চার হাত পা বেঁধে দড়িগুলির ছেড়ে দেয়া হলো। তখন গাছের মাথাগুলি স্বস্থানে ফিরে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে নাসিরের দেহ চারভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তার উপর রহম করেন। বর্ণিত আছে যে, এটা ছিল ৬০৮ হিজরীর শাওয়াল মাসের ২৫ তারিখের ঘটনা, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৫২৭ হিজরীতে হালবে। ৬৩৪ হিজরীতে যখন তার পিতা ইনতিকাল করেন, তখন মাত্র সাত বছর বয়সে হালবের সুলতানরূপে তার অনুকূলে

বায়আত গৃহীত হয়। আর তার শাসনকার্য পরিচালনা করে তার পিতার ক্রীতদাসদের একটি দল।

আর সকল বিষয় পরিচালিত হতো তার পিতামহী উম্মে খাতূন বিনত আদিল আবু বকর ইবন্ আয়্যূবের মতানুসারে, অতঃপর ৬৪০ হিজরীতে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, সুলতান নাসির তখন একছত্র শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন।

তিনি ছিলেন প্রজা হিতৈষী সর্বাদৃত ও বদান্য শাসক। আর তার এই বদানদ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষভাবে যখন তিনি দামেশক, হালব, হালবের অনুগামী এলাকা, বা'লাবাক, হারারান এবং জাযীরার একটি বিরাট অংশের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। বর্ণিত আছে যে, তার দস্তরখানে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক মুরগী, রাজহাস এবং বিভিন্ন প্রকার পাখির গোশত ব্যতীত, চারশ' ভেড়া-ছাগলের গোশত রান্না করা হত। তার সাথে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য। এই দস্তরখানের প্রতিদিনের ব্যয় ছিল বিশ হাজার দিরহাম। আর প্রস্তুতকৃত এই খাবারের অদিকাংশ দুর্গদ্বারে ন্যূনতম মুল্যে বিক্রি করে দেয়া হতো। ফলে অনেক সফল ব্যাক্তিরাও তা খরীদ করে নিয়ে যেতেন। কেননা, সেখানে আধা বা এক দিরহামের বিনিময়ে সে খাবার খেতেন, তা প্রস্তুত করতে তাদেরকে এর বহুগুণ বেশি ব্যয় করতে হতো। তার শাসনমলে খাদ্য সামগ্রীর যোগান ও সরবরাহ ছিল পর্যাপ্ত। তিনি ছিলেন সুদর্শন, বুদ্ধিমান, তবে কিছুটা ইন্দ্রিয় পরায়ণ প্রকৃতির সাহিত্যসেবী। তিনি মধ্যম মানের কবিতা রচনা করতেন। ঐতিহাসিক শায়খ কুতুবুদ্দীন তার বেশ কিছু কবিতা পঙক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি নিহত হন প্রাচ্যদেশে এবং সেখানেই সমাহিত হন। কাসীয়ূনের পাদদেশে তিনি নিজের জন্য একটি সমাধি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, কিন্তু সেখানে সমাহিত হওয়া তার তাকদীরে ছিল না। আর এই কাসীয়ুনের পাদদেশে অবস্থিত মাদরাসা নাসিরিয়া বুরহানিয়্যা হলো সে কালের সবচেয়ে অভিনব ও সুন্দর ভবন, যা কামে আফরাসের সামনাসামনি অবস্থিত। অবশ্য এই মসজিদটি নির্মিত হয় এই মাদরাসা ভবনের বহুপূর্বে। তদ্রুপ মাদরাসা নাসেরিয়্যা জুওয়া নিয়া, যা তিনি বাবুল ফারাদীসের অভ্যন্তরে নির্মাণ করেন, সেটিও অন্যতম সুন্দর মাদরাসা, এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি ঐতিহবাহী স্থাপনা নির্মাণ করেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবুদুল্লাহ

ইনি হলেন ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ য়াইয়া ইবন্ সায়্যিদুন্নাস আবূ বকর আলয়াসুরী আল্-আব্দুলুগী আল্-হাফিয। তিনি ৫৯৭ হিরজীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং বহু কিতাব সংগ্রহ করেন।

এছাড়া তিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তার অঞ্চলে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ 'হাফিযে হাদীস'। তিনি এ বছর রজব মাসের সাতাশ তারিখে তূনুস শহরে মৃত্যুবরণ করেন। আর এ বছর আরও যারা মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অন্যতম হলেন :

আবদুর রাযযাক ইবনে আব্দুল্লাহ

ইবন আবু বকর ইবন খালফ ইযযুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আর রাস্আ'লী আল মুহাদ্দিস আল-মুফাসসির তিনি অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন ইনি ছিলেন

আরবি সাহিত্যের বিশেষ পণ্ডিত এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মুসেল অঞ্চলের শাসনকর্তা বদর লু'লু' এর নিকট তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে সানজার অঞ্চলের শাসনকর্তার নিকটও তাঁর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। রবিউল আখির মাসের ১২ তারিখ শুক্রবার রাত্রে তথায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছরেরও বেশি, তাঁর কয়েকটা কবিতার পঙক্তি এখানে পেশ করা হচ্ছে :

نعب الغراب فدلنا بنعيبه * ان الحبيب دنا اوان مغيبه

ياسائلي عن طيب عيشي بعدهم * جدلى بعيش ثم سل عن طيبه

কাক কা কা করার মাধ্যমে আমাদেরকে জানান দেয় প্রিয়তমের অন্তর্ধানের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

যে ব্যক্তি তাদের পর আমার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আমি তাকে বলছি আগে জীবনকে উপভোগ কর, অতঃপর জীবন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর।

মুহাম্মদ ইবন আহমদ বিন আন্তার আস্ হুলামী আদ্ দামেস্কি তিনি ছিলেন দামেস্ক নগরীর প্রশাসক। অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। দামেস্কে তার ভূ-সম্পত্তি এবং ওয়াকফ ষ্টেট ছিল। তিনি কায়রো শহরে ইন্তিকাল করেন এবং আল-মাকতাম অঞ্চলে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলামুদ্দিন আবুল কাশিম

ইবন আহমদ ইবনুল মুয়াফাক ইবন জা'ফর আল-মিরসী আল বুরাকী। তিনি ছিলেন আরবি অভিধান এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তাজবীদ শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি। তিনি আল সাযিবিয়া' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। এ ছাড়া আল- মুফাসসর গ্রন্থের কয়েক খণ্ডে ভাষ্য রচনা করেন। তিনি আল জাযুলিয়া গ্রন্থেরও ব্যাখ্যা গ্রন্থর আলোচনা করে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে মত বিনিময় করেন। ইনি বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, সুপুরুষ, তাঁর পোষাক পরিচ্ছেদ ছিল তার চেহারার মতই সৌন্দর্য মণ্ডিত। আল-কিনদী প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন।

আল শায়খ আবু বকর আল দাইনওয়ালী। তিনি ছিলেন আল-ফাবিয়া আল-সারিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে তাঁর একদল মুরিদ ছিল, যারা সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর যিকির করতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ও শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়ার জন্ম। শায়খ শামসুদ্দীন যা হাঠী বর্ণনা করেন যে, এই বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ আমাদের শায়খ তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শায়খ শিহাবুদ্দীন আবদুল হালিম ইবন আবুল কাশেম ইবন তাইমিয়্যা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী ৬৬১ সালের ১০ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আল-আমির আল কবীর মুজিব উদ্দীন আবুল ফিদা ঈসা ইবন হাসির আল আযকাসি আল কুর্দী আল উমাবী। তিনি ছিলেন বীর বাহাদুর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আইন জালুতের যুদ্ধে

তাতারী দেবকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে ইনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের পর মালিক মুযাফফর দামেস্ক শহরে আগমন করলে তিনি তাঁকে আমির আলামুদ্দীন সাঞ্জারের সঙ্গে দামেস্ক শহরের নায়েব এবং উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন, বিশেষ ফরমান জারী এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ গ্রহণ করা হত। তিনি বিচারালয়ের উপদেষ্টার সঙ্গে একই কক্ষে উপবেশন করতেন। তিনি ছিলেন বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক এবং অবারিত জীবিকার অধিকারী। এই বছর তিনি ইন্তিকাল করেন। আবু শাহমা বলেন: তাঁর পিতা আমির হুসামুদ্দীন মালিখ আশরাফের সৈন্য বাহিনীতে প্রাচ্য দেশে মৃত্যুবরণ করেন। আমির ইমাউদ্দীন আহমদ ইবন মাশতুরও এ সময় ইন্তিকাল করেন। আমি অর্থাৎ, গ্রন্থকার ইমাযুদ্দীন ইবন কাসির বলছি, তাঁর পুত্র আমির ইযযুদ্দীন দীর্ঘদিন দামেশ্ক শহরের আমীর ছিলেন। ইনি ছিলেন পূতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। আল-তাগা আল আতির্কাদারো ইবন এনুন তাঁর নামে চালু করা হয়। কতিথ আছে যে, ইবনু আবুল হিজা তাঁর বিপুল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ। তার নামে চালু করা হয়, কারণ তিনি সেখানে বসবাস এবং কৃর্তত্ব করতেন। ফলে এই নামেই তা পরিচিত হয়, তাঁর মৃত্যুর পরে হুরান অঞ্চল থেকে যাত্রাকালে আমরা সেখানে অবস্থান করি। এ সময় আমি ছোট ছিলাম এবং কেবল কুরআন মজীদ পাঠ শেষ করেছি। আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার মালিক।

অতঃপর শুরু হল হিজরী ৬৬২ সন (খ্রিস্টাব্দে ১২৬৪)

এ বছরের শুরুতে আব্বাসী খলীফা ছিলেন আল- হাকিম বিআমরিল্লাহ আর সুলতান ছিলেন যাহির বাইবারবাস এবং দামেস্কে নগরীর নায়িব ছিলেন তামালুদ্দিন আবুশ আননাযীবী এবং দামেস্কে নগরীর বিচারপতি ছিলেন ইবন খাল্লিকান। বছরের শুরুতে আল- কাছরিন- এ আল-মাদরাসা আল- খাচেরিয়ার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষাদানের জন্য কাজী তকিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল রাযীনকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি শাফেয়ী মাযহাব শিক্ষা দিতেন। আর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্তি পান মাজদুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন কামালুদ্দীন উমর ইবনুল আদিমকে। আর হাদীসের পাঠ দানের জন্য নিযুক্ত করা হয় শায়খ শরফুদ্দিন আব্দুল মুমিন ইবন খলফ আল হাফিয আল-দিমইয়াতীকে। এ বছর সুতান আল-যাহীর বায়তুল মুকাদ্দাসে একটা সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং এ জন্য তথায় অবস্থানকারীদের নিমিত্ত অনেক সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। যার ফলে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেখানে তিনি একটা চাক্কি এবং একটা চুলাও নির্মাণ করেন। এ বৎসর বকর খানের দূত মালিক আল যাহিরী নিকট আগমন করেন। তার সঙ্গে ছিলেন আশরাফ ইবন শিহাব গাজী ইবন আল আদিলও। এবং তাদের সঙ্গে ছিলো পত্রাবলী এবং মৌখিক নির্দেশবলী; যাতে ছিলো ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য হালাকুখানের ধ্বংস যজ্ঞের পর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আনন্দের উপকরণ। এ বছর জুমাদাল উখরা মাসে শায়েখ শিহাবুদ্দীন আবু শামা আব্দুর রহমান ইবন ইসমাঈল আল মাসাদেসী দারুল হাদীস আল আশরাফিয়া করেন। আর এ কাজ করা হয় ইমামুদ্দীন ইবন আল হারস্তানীর ওফাতের পর। দরস বা পাঠ দান অনুষ্ঠানে কাজী ইবন খাল্লিকান অন্যান্য বিচারপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এতে তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থ আল মারআম এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সনদ এবং মতনসহ তিনি হাদীস উল্লেখ করেন

এবং অনেক কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কতিথ আছে যে, তিনি পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে পাঠ দান করতেন এবং তিনি কোনো গর্ববোধ করতেন না।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

এ বছর নাসিরউদ্দিন তুসী হালাকু খানের পক্ষ থেকে বাগদাদে আগমন করেন। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তি এবং শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। আর বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে 'মারাগা অঞ্চলে নির্মিত মান মন্দিরের জন্য অনেক গ্রন্থ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওয়াসিত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে গমণ করেন। এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করণ, তাদের অন্যতম হলেন আল-মালিক আল আশরাফ মুসা ইবনুল মালিক আল-মানগুর ইবরাহীম ইবনুল মালিখ আল মুজাহিদ আগাদুদ্দিন শেরকেহ ইবন নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আসাদুদ্দিন শেরকোহ শুনাল কাবীর। এরা ছিলেন প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হিমস নগরীর শাসনকর্তা দামেস্কের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। খাদ্য-পানীয় বস্ত্র, যানবহন এবং আশা-আকাংখা চরিতার্থ করার কাজে এরা গায়িকা আর নর্তকী নিয়ে বেশির ভাগ সময় মত্ত থাকতেন। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেন তা বিক্ষিপ্ত স্বপ্নরাজি এবং অস্থায়ী ছায়া সদৃশ্য। অবশিষ্ট আছে কেবল তাদের স্মৃতিটুকু। মৃত্যুর পর মূল্যবান বিলাসদ্রব্য আর প্রচুর অর্থ-সম্পদ পাওয়া যায় আর তার রাজত্ব চলে যায় অন্যদের হাতে। এ বৎসর তাঁর সঙ্গে হালব শহরের নায়িব আমীর হুসামুদ্দিন গুনাহনদারও মৃত্যুবরণ করেন। একই বছর হিমস আর প্রচুর অর্থ–সম্পদ পাওয়া যায় আর তার রাজত্ব চলে যায় অন্যদের হাতে। এ বছর তাঁর সঙ্গে হালব বা শহরের আহলংক নায়িব আমীর মুহমুদ্দিন যুগোনদারও মৃত্যুবরণ করেন। একই বৎসর হিম্‌স নগরীতে তাতারীয়া পরাজিত হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের অগ্রবর্তী সৈন্য "বারদারাৎ নির্মমভাবে নিহত হয়। অন্য বৎসর মিশরে হাদীস বিশারদ রশীদ আল-আত্তারও নিহত হন। ইনি মালিক আল আশরাফ মুসা ইবন আল আদিলের লঙ্গিনা কালে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী নসর ইবন দরগও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিয়মিত জামে মসজিদে আদায় করতেন। তিনি ছিলেন বেশ সুখি-সমৃদ্ধি ব্যক্তি। আল খাতীব ইমামুদ্দীন ইবন আল–হারাস্তানী আব্দুল করীম ইবন জামালুদ্দীন আব্দুস সাদাম, ইবন আল হারাস্তানী ছিলেন দামেস্কে মসজিদের খতীব এবং দৌলত আশরাফিয়ার সহকারী বারেব। ইবনুস সালাহ এর পর তিনি এই পদে নিযুক্ত হন। জুমাদাল উলা মাসের উনত্রিশ তারিখ দারুল খিতাবায় তিনি ইন্তেকাল করেন। জামে মসজিদে নামাযে জানাযা শেষে তাকে পিতার পাশে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখক লোক সমাগম হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স পঁচিশ বছরের বেশি ছিলো। অতঃপর তদ্বীয় পুত্র মাজউদ্দিন খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর শায়েখ শিহবাউদ্দিন আবু শামা দারুস সানামে শায়েখ হিসাবে নিযুক্ত হন।

মহিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আল হুসাইন ইবন সুরাকা আল–হাফিয আল- মুহাদ্দিস আল আনসারী আল শাতেবী আবু বকর আল মাগরেবী। তিনি সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি। দীর্ঘদিন হালব অঞ্চলে অবস্থান করেন। অতঃপর মিশরের সাথে দামেস্ক নগরী ত্যাগ করেন। জাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম আল মুনযুরীর পর আল

জামালিয়াস্থ দারুল হাদীস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাগদাদ ইত্যাদি নগরীতে তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর বয়স ছিলো সত্তর (৭০) এর বেশি।

আল শায়েখ আল সালেহ মুহাম্মদ ইবন মানসুর ইবন ইয়াহহিয়া আল শায়েখ আবু কাশেম আল কুবারী আল ইসকানদারানী। তিনি তার বাগানে অবস্থান করতেন এবং তথা থেকে জীবিকা অর্জন করতেন। সেখানেই তিনি শ্রম দিতেন। বেশ সাধুতা বজায় রেখে জীবন-যাপন করতেন এবং লোকজনকে তার বাগানের ফল খাওয়াতেন। শাবান মাসের ছয় তারিখ আলোজান্দ্রিয়া নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি ভালো কাজের নির্দেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতেন এবং শাসকবর্গকে অন্যায় অবিচার থেকে বারণ করতেন। তার কথা শুনতো এবং তাকে মান্য করতো। শাসকরা সাক্ষাৎ প্রার্থীর সঙ্গে কথপোকথন করতেন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে এতেই লোকজন সন্তুষ্ট হতো। তার সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট একটা জন্তু বিক্রয় করেন। কয়েকদিন পর ক্রেতা তাঁর কাছে এসে বলল: জনাব, আমি আপনার কাছ থেকে যে জন্তুটি ক্রয় করেছি আমার কাছে সে কিছুই আহার করে না। শায়েখ লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন: তুমি কি কাজ কর? লোকটি বলল: আমি শাসকের দরবারে নর্তন করি। তখন শায়েখ তাকে বললেন: আমার পশু হারাম ভক্ষণ করে না। এই বলে তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ করে লোকটিকে অনেকগুলো দিরহাম দান করলেন। এই দিরহামগুলো আরো দিরহামের সঙ্গে মিশে গেলো। ফলে পার্থক্য করা সম্ভব হলো না। অতঃপর লোকজন নর্তক লোকটি নিকট থেকে তিন দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহামে ক্রয় করল বরকত লাভের আশায় এবং তিনি তার জন্তুটি ফেরত নিয়ে এলেন। মৃত্যুকালে তিনি যে সম্পদ রেখে যান তা ছিলো পঞ্চাশ (৫০) দিরহামের সমান যা বিশ হাজার (২০.০০০) দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়।

আবু শামা বলেন, রবিউল আখের মাসের ২৪ তারিখ মহিউদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন শফীউদ্দিন ইবরাহীম ইবন যারযুক দামেস্কের নিজ গৃহে নুরিয়া মাদরাসার নিকটে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর তার প্রতি রহম করুন। আমি অর্থাৎ, গ্রন্থকার ইবন কাছীর বলছি তাঁর এই গৃহ থেকে মাফেঈদের জন্য মাদ্রাসায় পরিণত করা হয়। আমীর জামালুদ্দিন আবু নজিবীখেনকে ওয়াকফ করেন আর এটাকে বলা হয় নজীবিয়া। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন। আর তথায় আমাদের অবস্থান। আল্লাহ তায়ালা সেই গৃহকে আমাদের জন্য মহাসাফল্যের শান্তি নিবাসে পরিণত করুন। আবু জামালুদ্দিন নজীবি ছিলেন মালিক আশরাফের উজীর আর ইনি ছিলেন শফীউদ্দিন। সহায়-সম্পদ ছাড়াও তার ছিল ছয় লক্ষ দিনার স্বর্ণমুদ্রা। তার পিতা মিশরে উনষাট (৫৯) সনে ইন্তেকাল করেন "আল মক্তব" ঃ গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। আবু শামা বলেন– মিশর থেকে আল ফখর উসমান আল মিগরী যিনি আইন- গাইন নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। জিলহজ্জ মাসের আট তারিখ শামস আল ওয়াবার আল মুসলী ইন্তেকাল করেন। ইনি শিষ্টাচার বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন এবং দীর্ঘদিন আল মাযা জামে' মসজিদে খুতবা দেন। তিনি নিজ আমাকে বার্ধক্য এবং খিযার সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান–

وكنت وإياها مذ اختط عارضي * كروحين في جسم وما نقضت عهدا

فلما أتاني الشيب يقطع بيننا * توهمته سيفا فألبسته غمدا

যখন আমার চেহারায় সজীবতা ফুটে ওঠে তখন সে আর আমি ছিলাম এক দেহে দুই প্রাণ আমি প্রতিজ্ঞা ভংগ করিনি।

অতঃপর বার্ধক্য আমার নিকটবর্তী হয়ে বিচ্ছেদ ঘটায় তখন আমি তাকে তরবারী বলে ধারণা করি এবং তাকে কোষবদধ করি।"

এ বৎসর বাদশা হালাকু খাঁন সুলাইমান ইবন আমীর আলআকরাবানী যিনি আলযাইন আল-হাফেজী নামে পরিচিতি ছিলেন, তাঁকে তলব করেন। হালাকু খাঁন তাকে বলেনঃ তোমার বিশ্বাস ঘাতকতা আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে। ততারীয়া যখন হালাকু খাঁনের সঙ্গে দামেস্কে ইত্যাদি শহরে আগমন করেন তখন এই প্রতারিত ব্যক্তিটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করে এবং মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে সহায়তা করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা নানাবিধ শাস্তির আকারে তাতারীদেরকে তার উপরে শাস্তিস্বরূপ ন্যাস্ত করেন। আর আল্লাহ এভাবে জালেমকে তার জলুমের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি জালিমের সহায়তা করে আল্লাহ এভাবে তাকে প্রতিদান দেন আর জালিম দ্বারা জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এরূপে আল্লাহ সমস্ত জালিমদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর গযব, শাস্তি আর প্রতিশোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হিজরী ৬৬৩ সন (ঈসায়ী ১২৬৫ সন)

এ বৎসর সুলতান আয-যাহের ফোরাত অভিমুখে আল বায়রায় অবস্থানকারী তাতার বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা এ সম্পর্কে খবর পেয়ে পশ্চাদপসরণ করে। ফলে সে অঞ্চল অতি সহজে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। ইতিপূর্বে এ থায় ভীতির অবস্থা বিরাজ করছিল। একই বৎসর আল মালিক আল যাহির সৈন্য সামন্ত নিয়ে সাহেল অঞ্চল অভিমুখে গমন করেন, ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে। ফলে তথায় অবতরণের দিন ৮ জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার ৩ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে "কায়সারিয়া" অঞ্চল জয় করেন, পরবর্তী বৃহস্পতিবার '১৫ জুমাদাল উলা তথাকার দুর্গ তার হস্তগত হয়। তিনি তা ধ্বংস করে অন্য দুর্গ অভিমুখে রওনা হন। অতঃপর তাঁর কাছে এ মর্মে খবর আসে যে, তাঁর বাহিনী আরসুক নগরী অধিকার করে ফিরিঙ্গিদের বধ করে। দূত তাঁর নিকট এ খবর বহন করে আনে। ফলে মুসলিম অঞ্চলে সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং সকালে আনন্দে উল্লাসিত হয়। এ সময় পশ্চিম অঞ্চল থেকে সবর আসে যে, সেখানে তারা ফিরিঙ্গিদের উপর বিজয় লাভ করেছে এবং ৪৫ হাজার লোককে হত্যা এবং ১০ হাজার লোককে বন্দি করেছে। এ সময় তারা ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে ৪২টি নগর পুনঃরুদ্ধার করে। এসব নগরের মধ্যে বুননস, আশরিবিয়্যা, কাততাবা, মারছুয়া অন্যতম। আর এ বিজয় অর্জিত হয় এ বৎসর ১৪ রমযান বৃহস্পতিবার এ বৎসর রমযান মাসে আমি জামে মসজিদের বাবুল বারিদে ফরাস বিছানোর কাজ শুরু করেন। মসজিদের নালী থেকে সামনের রাস্তা বরাবর এ কাজ বিস্তৃত ছিল, এখানে একটা নালী ছিল যাদ্বারা লোকজন উপকৃত হত এবং "মানাস' নহর বন্ধ হওয়ার পর এ নালী দ্বারা জনগণ উপকূলে আসতো। ফলে তিনি তা পরিবর্তন করে শায়রাওয়াল নির্মাণ করেন। অতঃপর তা পরিবর্তন করে তথায় দোকান নির্মাণ করেন আর এ বৎসর বাদশাহ আয-যাহির দামেশকের নায়েব আমীর আকুশকে তলব

করেন। তিনি নির্দেশ মেনে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। আমীর আলামুদ্দীন আল হাছানী তার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বৎসর বাদশাহ আয যাহির মিশরের অন্যান্য মাযহাবের কাজী নিযুক্ত করেন। এই সব কাজী ছিলেন নির্দেশদানের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের কাজীদের মত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, শাফেয়ী মাযহাবের কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আততায আবদুল ওয়াহাব ইবন বিনত আল আহায়ায। হানাফী মাযহাবের কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন শামসুদ্দীন সুলাইমান। মালিকী মাযহাবের কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন শামসুদ্দীন সুরকী আর হাম্বলী মাযহাবের কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল মাগদিযী। আর এই ঘটনা ঘটে ২২ জিলহজ্জ সোমবার দারুল আদল তথা আদালত কক্ষে। এর কারণ ছিল শাফেয়ী মাযহাব সংক্রান্ত বিষয়ে কাজী ইবন বিনতুল আ'য়াজ এর সিদ্ধান্তহীনতা। আর অন্যান্য মাযহাবের ক্ষেত্রে তার ঐক্যমত প্রকাশ করা। ফলে আমীর জামালুদ্দীন আইসুদী আল আজিজী সুলতানকে পরামর্শ দেন প্রত্যেক মাযহাবের স্বতন্দ্র কাজী নিয়োগ করার জন্য, যিনি তার মাযহাবের দাবি অনুযায়ী নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি হামীর জামাহুদ্দীনের পরামর্শ ও মতামতকে পছন্দ করতেন। তিনি মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজের জন্য অনেক কাঠ, সীসা, এবং বহুবিধ উপকরণ প্রেরণ করেন। তিনি একটা মিম্বরও প্রেরণ করেন, যা সেখানে স্থাপন করা হয়। এ বৎসর মিশর দেশে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এ জন্য নাসারাদেরকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বাদশাহ যাহির তাদেরকে প্রচণ্ড শাস্তি দেন। এ বৎসর সংবাদ আসে যে, তাতার বাদশাহ হালাকু খান আল্লাহর লানত এবং গাজবে পতিত হয়ে ৭ রবিউল আখের মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাগা অঞ্চলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার প্রতি আল্লাহর লানত। তাকে তালা দুর্গে দাফন করা হয়। সেখানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয় এবং তাতারীরা তদীয় পুত্র আবগার ক্ষেত্রে একমত হয়, বাদশাহ্ খান তথার ছুটে এলে সে স্মৃতি স্তম্ভ ধ্বংস করেন এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এতে বাদশাহ্ যাহির আনন্দিত হন ইরাক অঞ্চল অধিকার করার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ করার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু সৈন্যরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় এ কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ বৎসর ১২ শাওয়াল বাদশাহ্ যাহির তদীয় পুত্র মুহাম্মদ বরবা খানকে বাদশাহ বানায় এবং তার পক্ষে আমীরদের নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তাকে সওয়ারীতে আরোহণ করায় এবং আমীররা সম্মুখ দিয়ে গমন করে। আর তদীয় পিতা আয যাহির নিজে এবং আমীর বদরুদ্দীন বেসরী, যিনি ছিলেন রুটি বহনকারী যবনিকা উম্মোচন করেন। কাজী তাজউদ্দীন এবং উজির বাহা ইবন হেনা সওয়ারীতে আরোহণ করে তাঁর অগ্রভাগে গমন করে নামি. দামি ব্যক্তিবর্গ বাহনে আরোহণ করে। অন্যরা পদব্রজে গমন করেন। এ অবস্থান তারা কায়রো অতিক্রম করে। এই বৎসর যিলক্বদ মাসে বাদশাহ যাহির তদীয় পুত্র বাদশাহ সাঈদের খতনার কাজ সম্পন্ন করেন। এতদসঙ্গে অনেক আমীরের সন্তানদের খতনার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এই বৎসর মৃত্যুবরণ করেন আলিঙ্গ ইবন ইউসুফ ইবন সা'দ ইবন নাবলুসী, শায়খ আয়নুদ্দীন ইবনুল হাফিয, দামেশকের দারুল হাদীস নূরীয়ার শায়খ। তিনি হাদীস শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত এবং রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ের হাফিয। এ বিষয়ে শায়খ মহিউদ্দীন নববী তাঁর উপর নির্ভর করেন। তার পরে দারুল হাদীস নূরীয়ার শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শায়খ

তাজউদ্দীন আল ফাযারী, শায়খ যয়ন উদ্দীন ছিলেন উত্তম স্বভাবের অধিকারী, মুহাদ্দিসদের রীতি অনুযায়ী তিনি হাসি-তামাশা এবং খোসগল্প করতেন। তিনি বাগদাদে সফর করেন এবং তথার কাজে নিয়োজিত হন। তিনি তথায় হাদীস শ্রবণ করেন। তার মধ্যে অনেক মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত ছিল এবং তিনি ইবাদতে নিয়োজিত থাকেন। তার জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোক সমাবেশ হয়। আল সগীর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

শায়খ আবুল কাশেম আল হাওয়ারী। তিনি আবুল কাশেম ইউসুফ ইবন আবুল কাশেম ইবনু আবদুল সীলাম আল উমারী। ছিলেন হাওয়ায়ী খানকার প্রসিদ্ধ শায়খ। আপন শহরে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইনি ছিলেন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি। অনেক সঙ্গী সাথী তাকে ভালবাসেন। হুরান অঞ্চলে তাঁর অনেক ভক্ত মুরিদ আছে। এরা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। এরা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার বৈধ মনে করে না। এমনকি হাতে তালি দেওয়াও নয়। এরা অন্যদের থেকে অনেক উন্নত ও স্বতন্ত্র।

কাজী বদরুদ্দীন আল কুর্দ্দী সাঞ্জারী ইনি মিশরে কয়েকবার কাজী পদে নিয়োজিত হলো এবং কায়রো নগরীতে ইন্তিকাল করেন। আবু শামা বলেন, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে তিনি ভদ্রও ছিলেন।

অতঃপর শুরু হল ৬৬৪ হিজরী ঈসায়ী ১২৬৬ সন

এ বৎসরের শুরুতে আব্বাসী শাসক ছিলেন খলীফা আর বাদশা যাহির ছিলেন সুলতান। মিশরের কাজী ছিলেন চার জন আর এই বৎসর দামেস্কে চারজন কাজী নিযুক্ত প্রত্যেক মাযহাব থেকে এক একজন কাজী, যেমন করেছেন গত বছর মিশরে আশ শাম দেশের নায়েব ছিলেন আকুশ আননাযিবী আর শাফেঈ মাযহাবের প্রধান কাজী ছিলেন ইবন খাল্লিকান আর হানাফী মাযহাবের কাজী ছিলেন শামসুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আতা আর হাম্বলী মাযহাবের কাজী ছিলেন শামসুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন শায়েখ আবু উমর এবং মালেকী মাযহাবের কাজী ছিলেন আব্দুস সালাম ইবন যাওয়ারী। তিনি দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকেন। তাকে বাধ্য করা হলে তিনি গ্রহণ করেন এবং নিজে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। আবার বাধ্য করা হলে তিনি শর্ত সাপেক্ষে মেনে নেন। আর শর্তটি ছিলো এই যে, তিনি ওয়াকফের বিষয় দেখা শোনা করবেন না। তিনি সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য বেতন-ভাতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমার দিনতো কেটে যাচ্ছে ভালভাবে। ফলে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। আর এ ছিলো এমন এক কর্ম যে ধরনের কর্ম আর ইতিপূর্বে হয়নি। ইতিপূর্বে এর আগের বছর মিশরে এমন কাজ হয়েছিলো, যে সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই ধারায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয। আর একই বৎসর বাবুল বারিদের নালার পূর্বদিকের হাউজের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় আর তিনি এজন্য শায রাওয়াল গম্বুজ এবং পাইপ নির্মাণ করেন যাতে করে পানি উত্তর দিকের রাস্তা দিয়ে প্রবাহিত হয। আর এ বৎসর বাদশাহ যাহির সগদ এর সঙ্গে লড়াই করেন এবং দামেস্কে থেকে মিনযানক [অগ্নি বিষ্ফোরক যন্ত্র বিশেষ বর্তমান কালের ক্ষেপণাস্ত্র] তলব করে এনে এলাকাটি অবরোধ করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তা জয় করে নেন।

তথাকার অধিবাসীরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং সাওয়াল মাসের অক্টোবর ১৮ তারিখ শুক্রবার শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করেন আর শিশুদেরকে বন্দি করেন। অনুরূপভাবে বাদশাহ সালাহউদ্দিন ইউসুফ ইবন আইউব পচিশ চুরাশি সনের সাওয়াল মাসের উক্ত অঞ্চল জয় করে নেন আর তারপর ফিরীশিরা পুনঃঅধিকার করে নিলে বাদশাহ যাহির এই বৎসর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা পুনরুদ্ধার করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আর সুলতান যাহির মনে মনে তাদের প্রতি বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি উক্ত নগর জয় করার প্রতি মনোবিশে করলে নগরের অধিবাসীরা তার নিকট নিরপত্তা দাবী করে। তিনি রাষ্ট্রের সিংহাসনে বসার পর আমীর সাইফুদ্দিন করমুন আলম বসেনি আর তার দূতেরা আগমন করে তাকে অপসারণ করে ফিরে যায়। তারা বুঝতে পারেনি যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তিনি ছিলেন সেই আমীর, যাকে সিংহাসনে বসানো হয়েছে। আর যুদ্ধ হচ্ছে একটা প্রতারণা মাত্র। ফলে ইসতেনাযিয়া এবং দাবিয়া কি দূর্গ থেকে বের হয়নি। তারা মুসলমানদের সঙ্গে অনেক গর্হিত ও বিভৎস কার্যকলাপ করে। আল্লাহ তাকে তাদের উপর ক্ষমতা দান করেন তখন সুলতান সকলকে হত্যার নির্দেশ দেন আর ডাক হরকরা এই বিজয়ের খবর নিয়ে আসে। ফলে সুসংবাদের ডংকা বাজানো হয় এবং নগরকে সজ্জিত করা হয়। ফলে ডানে-বাঁয়ে যোদ্ধা দল প্রেরণ করা হয় ফিরিঙ্গিদের অঞ্চলে এবং মুসলমানরা অনেক দূর্গ অধিকার করে নেয়, তার সংখ্যা প্রায় বিশটি হবে। তারা প্রায় এক হাজার নারী এবং শিশুকে বন্দি করে নেয় এবং অনেক গণীমত হস্তগত করে নেয়। আর একই বৎসর খলীফা মুসতাসীর ইবন মুসতাসীর পুত্র বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসেন। তার নাম ছিলো আলী। তাকে সম্মান জানানো হয় এবং আল আযীযিয়ার বিপরীত দিকে দারুল আগাদিয়ায় অবতরণ করা হয়। তিনি তাদেরকে হাতে বন্দি ছিলেন। বরকা খান যখন তাদেরকে পরাজিত করেন তখন তিনি তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে দামেস্ক অভিমুখে রওনা করেন আর সুলতান নগদ অঞ্চল ব্যয় করলে সেখানে যে সব মুসলমান বন্দি ছিলো তাদের একজন তাকে জানায় যে, তাকে বন্দি করার কারণ ছিলো এই যে, যারা জনপদের অধিবাসীরা তাদেরকে পাকড়াও করে ফিরীঙ্গিদের কাছে নিয়ে যেত এবং তারা তাদেরকে সেখানে বিক্রয় করে দিতো। এ সময় সুলতান ফারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি প্রচণ্ড হামলা চালান এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করেন। তিনি মুসলমানদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের নারী এবং শিশুদেরকে বন্দি করেন। আল্লাহ তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিন। অতঃপর সুলতান গীস জঞ্চল অভিমুখে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এবং সীস অঞ্চল শক্তি প্রয়োগে জয় করে নেয় এবং তথাকার শাসকের পুত্রকে বন্দি করে, তার ভাইকে হত্যা করে এবং তথাকার লোকদের হত্যা করে। এভাবে ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কারণ তাতারীদের যুগ থেকে মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধণ করা এরা। কারণ, তারা যখন খালফ শহর অধিকার করে নেয় তখন মুসলিম নারী, পুরুষসহ বিপুল ব্যক্তিকে বন্দি করে নেয়। এরপর তারা হালাকু খানের জমানায় মুসলিম অঞ্চলে লুটতরাজ চালাতো।

আল্লাহ তায়ালা তাকে আমরি কুযুবগা সহ ইসলামী বাহিনীর হাতে অপদস্ত করেন। এই বৎসর যিলক্বাদ মাসের বিশ (২০) তারিখ মঙ্গলবার সীস অধিকার করা হয়। এই সুসংবাদ সারা

দেশে প্রচারিত হয় এবং পঁচিশ (২৫) জিলহজ্জ তারিখে সুলতান নগরে প্রবেশ করেন। এ সময় তার সম্মুখে ছিলো সীস অঞ্চলের শাসনকর্তার পুত্র এবং আরমান অনঞ্চলের একদল শাসক বন্দি হিসাবে উপস্থিত ছিলো আর তাদের সঙ্গে ছিলো সেনাদল আর দিনটি ছিলো শুক্রবার। অতঃপর বিজয়ীর বেশে তিনি মিশর সফর করেন। এই সময় সীস অঞ্চলের শাসনকর্তা তার নিকট পুত্রকে উৎসর্গ করার দাবী জানান। সুলতান জানান যে, আমরা এর বিনিময়ে আমাদের সেই বন্দিকে গ্রহণ করব যা আছে তা তাতারীদের কাছে যাকে বলা হয় শংকর আল-আশকর। এরপর সীস অঞ্চলের শাসক তাতার বাদশার নিকট গল্প করে এবং তার কাছে বিনয় প্রকাশ করে। অবশেষে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। শংকর আল আশকার সুলতানের নিকট পৌঁছলে তিনি সীস অঞ্চলের বাদশার পুত্রকে মুক্ত করে দেন।

একই বৎসর বাদশা যাহির ফারার ও দামিয়া অঞ্চলের মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ সেতু নির্মাণ করেন। আমীর জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর এবং নাবলুস ও আগওয়ার অঞ্চলের শাসনকর্তা বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন রাহাল এই সেতু নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এর একটা পিলার নড়বড়ে হয়ে যায়। এতে সুলতান বিচলিত হন এবং পিলারটি সুদীর্ঘ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে পানি প্রবাহের কারণে তা করতে সক্ষম হননি। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে সেদিকে নদীর বুকে একটা টিলার সৃষ্টি হয়, যার ফলে পানি সেখানে আটকা পড়লে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। অতঃপর পানি পূর্বের মতো প্রবাহিত হতে থাকে আর এ ছিলো আল্লাহর কুদরতের এক বিস্ময়কর প্রকাশ। এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ইদগুদী ইবন আব্দুল্লাহ আল আমীর জামালুদ্দিন আল আযীযি। ইনি ছিলেন বড় আমীর উমরাদের অন্যতম এবং বাদশা যাহিরের নিকট তার ছিলো বিরাট স্থান। বাদশা যাহির তার মতের বাহিরে যেতে পারতেন না। তার ইনি তাকে পরামর্শ দেন প্রত্যেক মাযহাব থেকে স্বতন্ত্র কাযী নিয়োগ করার জন্য। ইনি ছিলেন বিনয়ী স্বভাবের লোক। তিনি কোনো হারাম বস্ত্র পরিধান করতেন না। তিনি ছিলেন ভদ্র, নম্র এবং সরকারের নিকট বিরাট সম্মানের অধিকারী। নগদ অঞ্চল অবরোধকালে তিনি আহত হন। তখন থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে আরাফার রাত্রে তার ইন্তেকাল হয়। কাসিয়ুন এর পাদদেশে নাসিরী খানকায় যার অবস্থান ছিলো দামেস্কের ছালাহিবা অঞ্চলে তথায় তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

হালাকু খান ইবন তাওলী খান ইবন চেঙ্গিস খান তাতার বাদশার পুত্র এ ছিলো তাদের বাদশাদের পিতা জনগন তাকে বলতো হালাদু যেমন কালাদু আর এই হালাকু ছিলো একজন পাপিষ্ঠ উদ্ধত এবং কাফের শাসক। তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। সে পাচ্য এবং প্রতিচ্যে এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করেছে যার সংখ্যা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ অনতি বিলম্বে এজন্য তাকে বিরাট শাস্তি দিবেন। সে কোনো দ্বীন-ধর্ম কিছুই মানতো না। তার স্ত্রী সফর খাতুন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো এবং গোটা সৃষ্টির পর সে খ্রিস্টানদেরকে প্রাধান্য দিতো বুদ্ধি-বৃদ্ধির প্রতি তার চরম আকর্ষণ ছিলো। তবে এর বাস্তব কোনো চিত্র তার কাছে ছিলো না। তবে দার্শনিকদের নিকট তার বিশেষ স্থান ও মর্যাদা ছিলো। তার সংকল্প ছিলো দেশ পরিচালনা এবং ধীরে ধীরে দেশ অধিকার করা। শেষ পর্যন্ত এ বৎসর আল্লাহ তাকে

ধ্বংস করেন। ভিন্ন মতে, ছয়শ তেষট্টি সনে তার পতন হয় এবং তালা শহরে তাকে দাফন করা হয়। তারপর তদ্বীয় পুত্র আবগা খান বাদশা হয় আর সে ছিলো দশ ভাইয়ের অন্যতম। মহান আল্লাহ ভালো জানেন। আব্বাসীয়া বংশের শেষ খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ্ তদ্বীয় শিয়া মতালম্বী মন্ত্রী মুহাম্মদ ইবন আলকামীর পরামর্শে তিনশত অমাত্য ও সুধীকে সঙ্গে নিয়ে হালাকু খানের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন (১০ ফেব্রুয়ারি)। কিন্তু দুর্দান্ত হালাকুর আদেশে মোঙ্গলগণ তিন দিবস পর্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকল অধিবাসীকে হত্যা করে। ষোল লক্ষ নর-নারীর রক্ত স্রোত বাগদাদে ও রাজপথে ধারণ করে। ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত নগরের ঘর-বাড়ি লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। পাঁচশত বছরের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার-রাজকীয় পুস্তকালয় অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত অথবা দজলা নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়। হতভাগ্য খলীফা মুস্তাসিম পরিবারবর্গ ও অমাত্যবর্গ সহ নির্দয়ভাবে নিহত হন (২০ ফেব্রুয়ারী) খলীফা মনসুরের নির্মিত বাবুজ্জাহাব কুবায়ো খাজরা কছরুল খুলদ, খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহ দারুস সাজার মঈজদৌলা নির্মিত মঈজিয়া প্রাসাদ প্রভৃতি সুরম্য হুর্মম্যালা তাতার ও মঙ্গল আক্রমণকারীদের নিষ্ঠুর হস্ত নিশ্চিহ্ন হয়। হাসপাতালসমূহের রোগী, বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র শিক্ষক সকলেই নরপশুদের হস্তে নিহত হয়। গোরস্তানের কবরসমূহ উৎখাত করিয়া ইমাম, সুধী, তাপসগণের পবিত্র দেহাবশেষ ভষ্মীভূত করা হয়। ছয় শতাধিক বর্ষকাল পূর্বে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে পরিণত হয়।

হালাকু খার দূত দিল্লী নগরে উপনীত হলে দিল্লীর সম্রাট নাসিরউদ্দীন এক অভূতপূর্ব দরবারের অনুষ্ঠান করত মোঘল দূতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বাংলা একাডেমি প্রণীত ঐতিহাসিক অভিধান পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭)

হিজরী ৬৬৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৬৭ সন)

এ বৎসর দোসরা মুহাররম রোববার বাদশা আযাযাহীর দামেস্ক থেকে মিশরীয় অঞ্চলে গমন করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলো বিজয়ী বাহিনী। এই বৎসর মুসলিম বাহিনী সীস অঞ্চল এবং ফিরিঙ্গিদের অনেক দূর্গ অধিকার করে নেয়। তিনি গাযা অঞ্চল অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নিজে আল কারগ পর্যন্ত অঞ্চল অগ্রসর হন। খিযী অঞ্চলের পুকুরের নিকট পৌছে তিনি শিকার করেন। এই সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার উরুর হাড় ভেঙ্গে যায় সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসা নেয়ার পর অবশেষে পালকিতে আরোহণ করতে সক্ষম হন।

অতঃপর মিশর অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সময় তার পা সুস্থ হলে তিনি একা অশ্বের পিষ্ঠে আরোহণ করতে সক্ষম হন। ফলে জাঁকজমক সহকারে তিনি কায়রো নগরীতে পৌছেন। এ উপলক্ষ্যে শহর সজ্জিত করা হয় এবং বিরাট আয়োজন করা হয়। তার আগমনে জনগন ভীষণ আনন্দিত হয় এবং তার জন্য সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। অতঃপর রজব মাসে কায়রো থেকে সগদ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে দূর্গের চতুস্পার্শে খন্দক খনন করেন এবং এ কাজে আমীর এবং সৈন্যদের সঙ্গে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করেন এবং আককা অঞ্চলে অভিযান চালান। অনেককে হত্যা এবং বন্দি করে ফিরে আসেন। এই উপলক্ষ্যে দামেস্কে নগরীতে বিপুল আনন্দ উল্লাস করা হয়। বারো রবিউল আউয়াল বাদশা যাহির জামে আল আকবারে জুমআর

নামায আদায় করেন। উবাইদীদের শাসনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেখানে জুমআর নামায আদায় করা হতো না। অথচ কায়রোতে এটা ছিলো প্রথম মসজিদ যা আল কায় যাওহার নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনি জুমআর নামায আদায় করেন। আল হাকিম যখন নিজে মসজিদ নির্মাণ করেন তখন আল আযহারে জুমআ বাদ দিয়ে তার মসজিদে জুমআ আদায় করেন। তখন থেকে সেখানে জুমআর নামায আদায় করা হতো না। আলে হাকিম নির্মিত মসজিদ ছিলো অন্যান্য মসজিদের স্থলাভিষিক্ত। এর ফলে জামে আল আযহারের দেখতে পান আর এসব কিছু বের করার ফলে লোকজন স্বস্তিবোধ করে। তারপর নামাযীদের জন্য মসজিদ প্রস্তুত হয় আর একই বৎসর বাদশা সগদ অঞ্চলের নগর প্রাচীর এবং দুর্গ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন এবং নগর প্রাচীরের ফটকে কোরআন মজীদের দু'টি আয়াত লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। আয়াত দু'টি ছিলো এই–

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ - (الانبياء : ١٠٥)

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে (আম্বিয়া : ১০৫)।

অপর আয়াতটি হলো–

أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (المجادلة : ٢٢)

এরাই আল্লাহর দল, যারা জেনে রাখবে, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে (সূরা মুজাদালা : ২২)।

আর এ বৎসর আবগা এবং মনকু তনয় এর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ মনকু তমর ছিলেন বরকা খানের স্থলাভিষিক্ত। আবগা তাকে পরাজিত করে এবং তার নিকট থেকে প্রচুর গণীমত লাভ করেন।

আর ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান শায়খ কুতুবউদ্দিন ইউনিনির পত্র উল্লেখ করেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, বসরা অঞ্চল থেকে আবু সালাবা নামক জনৈক ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্য। তার কাছে মেসওয়াক এবং তার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হলে যে বলে আল্লাহর কসম আমি তো কেবল পায়ু পথে মেসওয়াক করি। এ কথা বলে যে একটা মেসওয়াক হাতে নিযে পায়ু পথে প্রবেশ করায় অতঃপর বের করে আনে। এ ঘটনার পর লোকটি কেবল নয় মাস বেঁচে ছিলো। সে পেটের ব্যথায় অভিযোগ করে। এরপর লোকটি ইদুরের আকৃতি সদৃশ একটা পুত্র সন্তান জন্ম দেয় যার পা ছিলো চারটি আর তার মাথা ছিলো মাছের মাথার মতো। তার চারটি দাঁত ছিলো স্পষ্ট। আরো ছিলো একটা দীর্ঘ লেজ যা ছিলো চার আঙ্গুল লম্বা এবং তার পাছা ছিলো খরগোশের পাছার মতো আর ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রাণিটি তিনবার চিৎকার দেয়। চিৎকার শুনে লোকটির কন্যা সন্তান ছুটে এসে মস্তকচূর্ণ করে ফলে সে মারা যায়। এরপর লোকটি দুই দিন বেঁচে ছিলো।

লোকটি বলতো এই জন্তুটি আমাকে শেষ করেছে এবং আমার নাড়ী ভুরি কেটে দিয়েছে। উক্ত অঞ্চলের এক লোক এবং তথাকার খতীবরা এই দৃশ্য অবলোকন করেন। তাদের কেউ কেউ জন্তুটিকে জীবিত দেখতে পেয়েছে, আর কেউ কেউ দেখতে পেয়েছে মৃত। এ বৎসর যে

সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম সুলতান বরকা খান ইবন তাওলী খান ইবন চেঙ্গিস খান আর এ ছিলো হালাকু খানের চাচাতো ভাই। এই বরকাখান পরে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি আলেম ওলামা এবং সৎলোকদের ভালবাসতেন। তার সবচেয়ে ভালো কাজ ছিলো হালাকু খানকে পরাজিত করা এবং তার সৈন্যদেরকে ছত্র-ভঙ্গ করে দেয়া। তিনি বাদশা যাহিরের শুভ কামনা করতেন। তাকে সম্মান করতেন এবং তার পক্ষ থেকে আগত দূতদের সম্মান করতেন এবং তাকে অনেক উপহার দিতেন। তার পরে তার পরিবার থেকে মানকুত ইবন উমর ইবন তুরান ইবন বাবু ইবন তাওলীদ ইবন চেঙ্গিস খানের উদ্ভব ঘটে। তিনিও ছিলেন পূর্বসূরীর অনুসারী মিশরীয় অঞ্চলে কাজী আল কুয়াত তাজউদ্দিন ইবন আব্দুল ওহাব ইবন খলফ ইবন বদর বিনতুন আয আশ শাফেঈ। ইনি ছিলেন দ্বীনদার পরহেযগার। আল্লাহর ক্ষেত্রে তিনি কোনো নিন্দকের নিন্দার পরোয়া করতেন না এবং কারো সুপারিশ গ্রহণ করতেন না। মিশরীয় অঞ্চলের বিচারভাব তার উপর ন্যস্ত হিনো। এ ছাড়া খুতবা দেয়া বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ এবং শায়েখদের দেখা শোনা করা, সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি রাখা, শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী দারস দেয়া, সালেহিয়া সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান এবং জামে মসজিদের ইমামতি ও তার উপর ন্যস্ত ছিলো। তার হাতে ছিলো পনেরোটা বিভাগের দায়িত্ব। কখনো কখনো মন্ত্রীর দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। সুলতান তাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং উজীর ইবন হেনা তাকে ভীষণ ভয় করতেন। তিনি সুলতানের কাছে নিজেকে সর্ম্পণ করতে চাইতেন, কিন্তু তা করতে পারতেন না। তার রোগীর সেবা করার অজুহাতেও তিনি সুলতানের গৃহে আগমন করতে চাইতেন। একদা তিনি অসুস্থ হলে কাজী তাকে দেখতে আসেন। এই সময় তিনি তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য দণ্ডায়মান হন। তখন কাজী বলেন, আমি এসেছি আপনাকে দেখার জন্য আপনিতো দেখি সুস্থ আছেন এই বলে তিনি সালাম দিয়ে চলে যান, কিন্তু তার কাছে বলেননি। ছয়শ চার (৬০৪) হিজরী সনে তার জন্ম হয়। তারপর কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তকীউদ্দিন ইবন রাযী।

আল আমীর কবীর নাসির উদ্দিন

আবুল মাআলী আল হুসাইন ইবন আল আযীয ইবন আবুল ফাওয়ারেস আল কিনরি আল কুদদি। ইনি ছিলেন বড় আমীরদের অন্যতম। তার বক্তব্য ছিলো বাদশাদের দরবারের আমীরদের সমান। মিশরের তুরান শাহ ইবন সালেহ আইউব নিহত হলে ইনি খালকের শাসনকর্তা বাদশা নাসিরের নিকট শামদেশে সমর্পণ করেন আর তিনিই ফিরোজের আযান খানার নিকট কিমরিয়া মাদ্রাসা ওয়াকফ করেন। এই মাদ্রাসার দেয়ালে তিনি ঘড়ি স্থাপন করেন, যার নিদর্শন ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। আর এ ধরনের কাজ ইতিপূর্বে কেউ করেনি। কথিত আছে যে, তিনি এজন্য চল্লিশ হাজার দিরহাম ব্যয় করেন।

শায়েখ শিহাবউদ্দিন আবু শামা

আব্দুর রহমান ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন উসমান ইবন আবু বকর ইবন আব্বাস আবু মুহাম্মদ ও আবুল কাশেম আল মাজাদেগী। ইনি ছিলেন শায়েখ, ইমাম, আলীম, হাফিয, মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং ইতিহাসবিদ। দারুল হাদীস আল আশলাফিয়ার শায়েখ আবু শামার নামে ইনি পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন আর বুকনিয়া শিকউষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং অনেকগুলো উপকারী গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি দীর্ঘ কয়েক খণ্ডে দামেস্ক নগরীর ইতিহাস গ্রন্থের সার সংক্ষেপ

সংকলন করেন। তিনি আশ সাদরিয়া গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। পুনরুত্থান এবং মেরাজ বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুর রওযাতাইনও তার রচিত গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থের টিকাও লেখেন। এ ছাড়া আরো অনেক উপকারী গ্রন্থ তিনি রচনা করেন পঁচিশ নিরানব্বই (৫৯৯) হিজরী ২৩ রবিউল আখেরী মাসের ২৩ তারিখ শুক্রবার রাত্রে তার জন্ম হয়। তিনি নিজের জন্ম বৃত্তান্ত শৈশব কাল বিদ্যা অর্জন হাদীস এবং ফেকহের জ্ঞান লাভ এবং তার শিক্ষকদের মধ্যে আল ফখর ইবন আসাদী, ইবন আব্দুস সালাম ইনি আল সাইয আল আমীরি এবং শায়েখ মুআফফাপ উদ্দিন ইবন উদামা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি যে সব ভালো স্বপ্ন দেখেছেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন ইনি ছিলেন বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ। হাফেজ আলাম উদ্দীন আল বারখালী শায়েখ তাজউদ্দিন ফাযারী সূত্রে আমাকে জানান যে, তিনি বলতেন, শায়েখ শিহাব উদ্দীন আবু শামা ইজতিহাদের মক্তবায় উন্নীত হন। তিনি কখনো কখনো কবিতা রচনা করতেন। এই সব কবিতার কিছু ছিলো অলংকারময় আর কিছু অলংকারবিহীন আল্লাহ তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। মোট কথা তার জীবদ্দশায় তার মত দ্বীনদার, আমানতদার বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ছিল বিরল। তার প্রতি লোকজনের শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পোষণই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাকে হত্যা করার জন্য গুপ্ত ঘাতকদল প্রেরণ করা হয়। এ সময় তিনি তাওয়াহীন আল আশনান গ্রন্থ বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, বাহ্যত তিনি ছিলেন এ অভিযোগ থেকে মুক্ত। একদল হাদীস বিশারদ বলেন যে, তিনি ছিলেন মজলুম। তিনি নিয়মিত ইতিহাস বিষয়ে লিখে চলছিলেন। এমনকি এ বৎসরের রজব মাস পর্যন্ত তিনি লিখেছেন। তাঁর নিজ বাসভবনে তিনি তাকে নির্যাতন করা হয়। যারা তাকে হত্যা করেছে ইতিপূর্বে তারা তার কাছে এসে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়; কিন্তু তিনি মারা যাননি। তাকে বলা হয় ঘাতক দলের বিরুদ্ধে আপনি কি অভিযোগ করবেন না? তিনি কোন অভিযোগ না করে একটা কবিতা পাঠ করেন:

قلت لمن قال الا تشتكى * ما قد جرى فهو عظيم جليل

يقيض الله تعالى لنا * من ياخذ الحق ويشفى الغليل

اذا توكلنا عليه كفى * فحسبنا الله ونعم الوكيل

যে আমাকে বলে আপনি কি অভিযোগ করবেন না? আমি তাকে বলি, যা কিছু ঘটে গেছে তা অনেক বড়। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য এমন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করবেন যে ভালো করবে এবং পিপাসা নিবৃত্ত করবে।

আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।

তার ঘাতকদল পুনরায় তার কাছে আগমন করে তিনি তখন স্বগৃহে অবস্থান করছিলেন। ফলে তারা উনিশ রমযান, দিবাগত রাত্রে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। করমদিন দারুল ফারাদিস মাগুরায় তাকে দাফন করা হয়। শায়েখ মহিউদ্দিন নববী পরবর্তীকালে দারুল হাদীস আল আশলাফিয়ার শায়েখের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর এই বৎসরই জন্মগ্রহণ করেন হাফেয আলামুদ্দীন আল কাশেম ইবন মুহাম্মাদ আল বারযালী। ইনি আবু শামার

ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করেন। যেই বৎসর আবু শামা মৃত্যুবরণ করেন সেই বৎসর হাফেযা আলামুদ্দিন জন্ম গ্রহণ করেন। ফলে হাফেজ আলামুদ্দিন আবু শামার রীতি অবলম্বন করেন এবং তিনি গ্রন্থরাজি পুনর্বিন্যাস করেন। তার সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতাটি পঠিত হয়:

ما زلت تكتب فى التاريخ مجتهدا * حتى رايتك فى التاريخ مكتوبا

ইতিহাসে পরিশ্রমী হিসাবে আপনার নাম লিখিত থাকবে এমনকি ইতিহাসে আমি আপনার নাম লিখিত দেখতে পাই।

এখানে নিম্নোক্ত কবিতাটি উদ্ধৃতি করা অপ্রসঙ্গিক হবে না:

اذا سيد منا خلا قام سيد * قوول لما قال الكرام فعول

আমাদের কোনো নেতা বিগত হলে অপর নেতা তদস্থলে দাঁড়ায় আর মণীষীদের উক্তি অনুযায়ী সে হয় কথা এবং কাজে দৃষ্টান্ত (হিজরী ৬৬৬ সন খ্রিস্টাব্দ ১২৬৮ সন)।

এই বৎসরের শুরুতে আব্বাসী আগমনকর্তা আল হাকিম খলীফা ছিলেন আর নগরের শাসক ছিলেন বাদশা যাহির। জুমাদাল উখরার প্রথম তারিখ বিজয়ী বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সুলতান মিশর দেশ থেকে বহির্গত হন। হঠাৎ করে তিনি ইয়াফা শহরে অবতরণ করে শক্তি প্রয়োগে তা অধিকার করে নেন আর তথাকার অধিবাসীরা সন্ধি সূত্রে দূর্গ তার নিকট হস্তান্তর করেন এবং সুলতান তথাকার অধিবাসীদেরকে তথা থেকে নির্বাসিত করেন ইক্কা শহরে আর দূর্গ এবং নগরী ধ্বংস করে তথা হতে, আস শাকীফ দূর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে ফিরীঙ্গি ডাক হরকরার নিকট থেকে ইক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে শাকীফ দূর্গের বাসিন্দাদের প্রতি একটা পত্র তার হস্তগত হয়। এই পাত্র তাদের কাছে সুলতানের আগমন সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হয়। এতে নগরীকে সুদৃঢ় করার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয় আর যে সব স্থান থেকে শহর সম্পর্কে আশংকা দেখা দিতে পারে সে সব স্থানকে দ্রুত ঠিক করার জন্য বলা হয়। ফলে সুলতান বুঝতে পারেন কিভাবে নগর অধিকার করতে হবে। উপরন্তু তিনি এটাও বুঝতে পারেন যে, কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে। তিনি তৎক্ষণাত জনৈক ফিরিঙ্গিকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাদের ভাষায় শাকীক' দূর্গের বাসিন্দাদের প্রতি একটা পত্র প্রেরণ করেন এবং বাদশাকে উজির সম্পর্কে আর উজিরকে বাদশা সম্পর্কে যেন সতর্ক করা হয় এবং শাসনকার্যের বিরোধ সৃষ্টি করা হয়। দূত তার নিকট উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ নিজ শক্তিতে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেন। এরপর সুলতান আগমন করত তাদেরকে অবরুদ্ধ করে নেন এবং মিনযানিক দ্বারা তাদের প্রতি হামলা চালায়। ফলে উনত্রিশ রজব দুর্গটি সুলতানের নিকট সমর্পণ করে এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে সূর অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠায়। এবং গণীমতের মাল দামেস্কে নগরীতে প্রেরণ করে। অতঃপর সৈন্যদের একটা চৌকস দল ত্রিপলী এবং তার আশ পাশের এলাকায় অভিযান পরিচালিত করে লুটতরাজ আর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে। অতঃপর চারণ ভূমির আকর্ষণে কুর্দি দুর্গে অবতরণ করে। ফিরীঙ্গি অধিবাসীরা যথারীতি তার নিকট উপহারসামগ্রী উপস্থিত করলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, তোমরা আমার বাহিনীর একজন সৈন্যকে হত্যা করেছো। আমি তার রক্তপণ দাবি করছি এক লাখ দিনার।

অতঃপর তিনি রওয়ানা করে হিমস অঞ্চলে গিয়ে অবতরণ করেন। সেখান থেকে হিমাত হয়ে ফামিয়া গমন করেন। সেখান থেকে অন্যত্র গমন করেন। এরপর রাত্রিবেলা যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে সৈন্যরা এগিয়ে আসে। তারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং এরা ইনতাকিয়া অভিমুখে গমন করত নগরটি অবরুদ্ধ করে নেন।

বাদশা যাহিরের হাতে ইনতাকিয়া শহর বিজয়। শরহটি অতি বড় এবং তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। কথিত আছে যে, নগর প্রাচীরের চৌহদ্দি ছিলো বারো (১২) মাইল দীর্ঘ আর শহরে বুরুজের সংখ্যা ছিলো একশ ছত্রিশটি এবং নগরীর বিশেষ ভবনের সংখ্যা ছিলো চব্বিশ হাজার। তিনি সেখানে রমযান মাসের শরুতে উপস্থিত হন। নগরবাসীরা নিরাপত্তার দাবি নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। তারা কিছু শর্ত তার প্রতি আরোপ করে। তিনি সে সব শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং তিনি দূর্গ অবরোধ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পনা হন। অবশেষে চৌদ্দ রমযান শনিবার আল্লাহর মেহেরবাণীতে দুর্গটি জয় করে অধিবাসীরা যখন সুলতানের অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করার জন্য তার নিকট দাবি জানান। ফলে তিনি তেরো রমযান আপন গৃহ শিক্ষক আমীর আশংকার আল ফারেককানিকে প্রেরণ করেন এবং তিনি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারা অনেক বড় বড় দুর্গ অধিকার করে নেন এবং সুলতান বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বৎসর সাতাশ রমযান তিনি বিরাট শান-শওকতের সাথে দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। তার জন্য নগরকে সজ্জিত করা হয়। হীন কাফেরের উপর ইসলামের বিজয়ে তার সম্মানে আনন্দ-উল্লাস করা হয় কিন্তু তিনি এতোই সন্তুষ্ট নন। তিনি আরো অনেক অঞ্চল জনপদ এবং বাগ-বাগিচা অধিকার করার সংকল্প করেন। এসব অঞ্চল পূর্বে মুসলমানদের অধিকারে ছিলো। তিনি মনে করেন যে, তারা এ সব অঞ্চল জোরপূর্বক অধিকার করে নেয়। তাদের হাত থেকে তিনি সে সব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে নেন। কোনো কোনো হানাফি মতালম্বী ফকিহ এই মর্মে ফতওয়া দেন যে, কাফিররা মুসলমানদের কোনো সম্পদ জোরপূর্বক হস্তগত করলে তারই হবে সে সম্পদের মালিক কিন্তু সেই সম্পদ তাদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করলে তা আগের মালিককে ফেরত দিতে হবে না। এটা একটা প্রসিদ্ধ মাসয়ালা। এ সম্পর্কে দু'টি উক্তি পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ উক্তি হলো জমহুর ফকিহদের অভিমত। আর তা এই যে, এমন সম্পদ ফেরত দেয়া ওয়াজেব। এর সমর্থনে একটা হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আযবা নামক উস্ট্রটি ফেরত নিয়েছিলেন। অথচ মুশরিকরা তা অধিকার করে নিয়েছিলো। ফকিহরা উপরোক্ত হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা মাযহাবের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে। আর কোনো কোনো আলিম বলেন কাফিররা যদি মুসলমানদের সম্পদ অধিকার করে নেওয়ার পর নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করে আর সে সম্পদ তাদের হাতে থাকে তবে তারই হবে সে সম্পদের মালিক। এক্ষেত্রে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীসকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন। হাদীসটি হল এই যে, আকীল কি আমাদের জন্য কোন গৃহ রেখে গেছে তিনি মুসলমানদের সম্পদ অধিকার করে নেন যারা হিজরত করেছিলো আর আকীল যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন সে সম্পদ তার নিকট ছিলো; কিন্তু তা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়নি। কিন্তু যখন সে সম্পদ তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে

নেয়া হবে তখন বলা হয় যে, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। মোটকথা এই যে, বাদশা বাহির কাজী এবং ফকীহদের একটা মজলিসের আয়োজন করেন। এতে সকল মাযহাবের ফকিহরা অংশ গ্রহণ করে এবং সকলে নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন আর সুলতান এ ব্যাপারে তার কাছে যে ফাতওয়া উপস্থাপন করা হয় তদনুযায়ী আমল করা রঢ় সংকল্প করেন। আর লোকজন এ ব্যাপারে বিপদের আশংকা করে ফরে উজির বাহাউদ্দিন ইবন আহনার পুত্র ফকরুদ্দিন মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন আর তিনি ইবনু বিনতিন অভিনয় এরপর শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী অধ্যয়ন করেন। তিনি বললেন, মহাত্ম নগরবাসী এক কোটি দিরহামের বিনিময়ে আপনার সঙ্গে সমঝোতা করতে চায়। প্রতি বৎসর আপনাকে দুই লাখ দিরহামের কিস্তি পরিশোধ করা হবে। তিনি তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন কিছুকাল তা নগদ পরিশোধ করতে হবে। এরপর তিনি মিশরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা হন এবং কিস্তিতে পরিশোধ করার কথা মেনে নেন আর এ সুসংবাদও প্রচার করা হয়। তিনি নির্দেশ জারি করেন যে, তারা এর থেকে চার লক্ষ দিরহার তাৎক্ষণাকে পরিশোধ করবে। তিনি এ নির্দেশও জারি করেন যে, ফল আরোহণ এবং বিতরণকালে তিনি যে তত্ত্বাবধান করেছেন সেই সব খাদ্য-শস্য তাকে ফেরত দিতে হবে। এর ফলে সুলতান সম্পর্কে জনগণের ধারণা খারাপ হয়ে যায়। তাতারীদের উপর আবগার শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তদীয় উজির নাসিরউদ্দিন তুসীকে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার নির্দেশ দেন আর রোম অঞ্চলের উপর বরওয়ানকে নায়েব নিযুক্ত করেন। ফলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব তিনি লাভ করেন আর এতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

একই বৎসর ইয়মানের শাসনকর্তা বাদশা যাহিরের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। তিনি ইয়ামান অঞ্চলে তার নামে খুতবা পাঠ করারও দাবি জানান। তিনি অনেক উপহার সামগ্রীও প্রেরণ করেন।

সুলতানও তার জন্য অনুরূপ উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন। এ বৎসর জিয়াউদ্দিন ইবনে কিফায়ি বাহাউদ্দিন ইবনে হেনাকে আয যাহিরের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে হাজির করেন। ইবনুল হেনা তার উপর বিজয়ী হন ফলে বাদশা যাহির তাকে তার নিকট সমর্পণ করেন তাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করতে থাকে এবং তার নিকট থেকে অর্থও আদায় করা হয়। শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, মুত্যর পূর্বে তাকে সতেরো হাজার সাত শত চাবুক মারা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

একই বৎসর কাওনিয়া অঞ্চলের শাসনকর্তা বাদশা আলাউদ্দিনকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তদস্থলে তদ্বীয় পুত্র গিয়াসউদ্দিনকে দাঁড় করেন। অথচ তখন সে মাত্র দশ বছরের শিশু। ফলে বুনা দেশের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে। জনগণের উপর ও তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমক বাহিনীও তার কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

একই বৎসর বাগদাদের দিওয়ান প্রধান সাহেব আলাউদ্দিন কবি ইবনুল আশাবাদি আন নুমানীকে হত্যা করার। এর কারণ ছিলো এই যে, তার সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে একটা ছিলো এই যে, সে বিশ্বাস করতো যে, তার কবিতা কুরআন মজিদের চেয়ে

শ্রেষ্ঠ। ঘটনাক্রমে সাহেব আলাউদ্দিন ওয়াসিত অঞ্চলে গমন করেন। তিনি যখন নুমানীয়া স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন ইবনুল খাসকারী তার নিকট আগমন করে তাকে কবিতা শোনায়। তিনি যখন কবিতা শোনাচ্ছিলেন তখন মুয়াজ্জিন আযান দিলে তিনি তাকে চুপ থাকতে বললেন। তখন ইবনুল খাসকারী বলে, জনাব নতুন কিছু শ্রবণ করুন। তার ব্যাপারে দীর্ঘদিন থেকে এড়িয়ে চলা উচিত ছিলো। তার সম্পর্কে যা বলা হতো। সাহেব আলাউদ্দিনের নিকট তা প্রমাণিত হয়। অতঃপর জালাউদ্দিন খাসকারীর সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। তিনি এমন ভাব দেখান যে, তিনি নিজে একজন কবি। ইবনুল খাসকারী সাওয়ারিতে আরোহণ করলে তার সঙ্গের লোকটিকে বলা হয় পথিমধ্যে তাকে একাকি পেয়ে হত্যা করবে। লোকটি তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। এক সময় সে লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তার সঙ্গের লোকটি রশিকতা করে তাকে বলল, তার অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করাও। তারা তাকে অবতরণ করায়। এই সময় সে তাদেরকে গালি-গালাজ আর ভর্ৎসনা করছিলো। অতঃপর তার বস্ত্র খুলে ফেলল। ফলে বস্ত্র খুলে ফেলা হয় আর সে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করছিলো আর বলছিলো তোমরা তো দেখছি বড় উল্লুক এতো এক শিতল লড়াই। এরপর বলা হলো তার গর্দান উড়িয়ে দাও। ফলে তাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে তরবারির আঘাতে তার মস্তক ছিন্ন করে দেয়।

এ বৎসর মৃত্যবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হলেন শায়েখ অফিফুদ্দিন ইউসুফ ইবন বাকাল। ইনি ছিলেন মুরযুবানিয়া খানকার শায়েখ, নেক্কার, পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন– আমি মিশরে ছিলাম। এই সময় বাগদাদের তাতারী ফিৎনায় বহু লোকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারি। আমি মনে মনে একে খারাপ জানি এবং বলি, হে আল্লাহ, এ কেমন কাণ্ড। তাদের মধ্যে তো শিশু রয়েছে যাদের কোনো অপরাধ নেই। আর আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম তার হাতে একটা কিতাব রয়েছে। তার হাত থেকে কিতাবটি নিয়ে আমি পাঠ করলাম। তাতে নিচের কবিতাটি লেখা রয়েছে। এ কবিতায় আমার নিন্দা করা হয়েছে–

دع الاعتراض فما الامر لك * ولا الحكم فى حركات الفلك

ولا تسال الله عن فعله * فمن خاض لجة بحر هلك

اليه تصير امور العباد * دع الاعتراض فما اجهلك

আপত্তি করা ছেড়ে দাও, আকাশের গতি বিধিতে তোমার কোনো নির্দেশ আর কর্তৃত্ব চলতে পারে না।

আল্লাহর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করবে না, কেউ সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। বান্দার সবকিছু আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, অভিযোগ ছেড়ে দাও, তুমি কতো বড় নাদান।

আরেকজন হাফেজ আবু ইবরাহীম ইশহাক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন কাজী আল ইয়ামান নামে পরিচিত। আটষট্টি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল শরফ আল আ'লা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বেশ কিছু বর্ণনায় তিনি ছিলেন একক। তদ্বারা জনগণ উপকৃত

হয়। একই বৎসর শায়েখ তকিউদ্দিন ইবন তাইমিয়ার ভাই শায়েখ শরফুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া খতিব কাযবীনিও জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরী ৬৬৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৬৯ সন)

এ বৎসর সফর মাসে সুলতান আযযাহির তদীয় পুত্র মালেক সাঈদ বরকা খানের পক্ষে নতুন করে বাই'আত গ্রহণ করেন যে, তার পরে পুত্র বাদশা হবেন। এই বাই'আত গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমির উমরা, কাযী-বিচারক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বরকা খানকে সম্মুখে রেখে একটআ শোভাযাত্রা বের করা হয়। আর ইবন লোকমান তার পক্ষে এক ভয়ংকর চুক্তিপত্র রচনা করেন যে, পিতার পর তিনি বাদশা হবেন। এতে আরো উল্লেখ ছিলো যে, পিতার জীবদ্দশায় পুত্র শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। অতঃপর জুমাদাল উখরা মাসে সুলতান সৈন্য সীমান্ত নিয়ে শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। তিনি দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করলে তাতারীদের বাদশা আবগার পক্ষ্য থেকে একজন দূত উপস্থিত হন। তার সঙ্গে ছিলো কিছু লিখিত এবং কিছু মৌখিক নির্দেশ। মৌখিক নির্দেশের মধ্যে একতাও ছিলো– তুমি ছিলে একজন ক্রীতদাস তাকে সীওয়াস বাজারে বিক্রয় করা হয়। সুতরাং পৃথিবীর শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচারণ করা তোমার জন্য শোভা পায় না। তোমার জেনে রাখা উচিত যে, তুমি যদি আসমানে আরোহণ করো অথবা ভূমিতে অবতরণ করো তাতে আমার থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। সুতরাং সুলতান আবগার সঙ্গে আপোস করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। কিন্তু, তিনি এই নির্দেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। এবং এটাকে তিনি কোনো কিছুই মনে করেননি বরং এই নির্দেশের কড়া জবাব দেন : তাকে জানিয়ে দেবে যে, আমি তার জবাবের অপেক্ষায় আছি।

তিনি যে সব অঞ্চল অধিকার করেছেন তা ছিনিয়ে না নেয়া পর্যন্ত আমি তার পেছনে লেগে থাকবো, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল তার হাত থেকে উদ্ধার করে ছাড়বো। এই বৎসর জুমাদাল উখরা মাসে সুলতান মালেখ যাহির গোটা দেশে মদ প্রবাহিত করার এবং বিপথগামী নারীদের মুক্ত করার নির্দেশ জারি করেন। ফলে এই সব নারীদের নিকট যা কিছু ছিলো তা ছিনতাই করা হবে। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। তিনি গোটা দেশে লিখিত নির্দেশ জারী করেন যে, এদের কাছ থেকে যে সব কর আদায় করা হতো তা রহিত করা হলো। আর যে ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব ছিলো সেখানে বিনিময় দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আর আনুগত্য মহান আল্লাহর প্রাপ্য। অতঃপর সুলতান তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মিস্কার দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে তিনি যখন খারবহ আল লুছুছ নামক স্থানে পৌছেন তখন জনৈক নারী তার অনুগমন করেন। আর নারীটি তাকে বলে যে, তার সন্তান ছুর নগরীতে প্রবেশ করে। নগরীর ফিরিস্তী শাসনকর্তা বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক তাকে হত্যা করে এক তার মাল-সামানা নিয়ে যায়। এ কথা শুনে সুলতান সওয়ারীতে আরোহণ করে "ছুর" নগরীতে উপস্থিত হয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালান, অনেক কিছু লুণ্ঠন করেন এবং অনেককে হত্যা করেন। নগরীর শাসনকর্তা এ ঘটনার কারণ জানার জন্য তার কাছে দূত পাঠান। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাস ঘাতকতার কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর সুলতান অগ্রবর্তী বাহিনীকে জানান যে, লোকদের মনে

আমি এই ধারণা সৃষ্টি করি যে, আমি অসুস্থ। আমি বিশ্রাম গ্রহণ করছি। তোমরা চিকিৎসকদের ডেকে আনো এবং আমার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো। তারা যখন চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা দিবে তখন চলন্ত অবস্থায় আমার জন্য পানীয় দ্রব্য নিয়ে আসবে। অতঃপর সুলতান ডাক বিভাগের বাহনে আরোহন করে দূত রওয়ানা হন। তারপর পুত্রের অবস্থা কেমন হবে তাও তিনি জানতে পারেন এবং মিশরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি পরবর্তী পা অবস্থায় কেমন দাঁড়াবে তাও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। অতঃপর তিনি দ্রুত সৈন্যদের দিকে ছুটে যান এবং তিনি নিরাপদ স্থানে উপবেশন করেন। লোকেরা তার সুস্থতার কথা প্রচার করে এবং একে অপরকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেয়। আর এটা ছিলো এক দুঃসাহসিক কর্ম এবং এক ভয়ংকর অভিযান।

আর এ বৎসর সুলতান মালেক আয যাহির হজ্জ সমাপন করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন আমির বদরুদ্দিন আল খাযানদার, কাযী আল কুথাক (প্রধান বিচারপতি) ছদরুদ্দিন সুলাইমান আল হানাফী, ফখরুদ্দিন ইবন লোকমান, তাজউদ্দিন ইবনুল আছীর এবং প্রায় তিনশত ভৃত্য এবং বিজয়ী বাহিনীও ছিলো। তারা সকলে আল কারগ এর পথে গমন করেন এবং তথাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর তথা থেকে নাবীর শহর হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং মদীনাবাসীদের সঙ্গে সদাচার করেন এবং তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর মক্কা গমন করত তথাকার বাসীন্দাদের প্রতি দান-দক্ষিণা করেন। সেখান থেকে আরাফার প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান করেন এবং তওয়াফে ইফাযা সম্পন্ন করেন। তার জন্য কাবা শরীফের দরজা খুলে দেয়া হয়। তিনি স্বহস্তে গোলাপের পানি দ্বারা ধৌত করেন এবং তা পরিচ্ছন্ন করেন। অতঃপর কথার দরজায় দাঁড়িয়ে হাতে ধরে লোকজনকে কাবা শরীফে প্রবেশ করেন। এ সময় লোকজনের মধ্যস্থলে তিনিও ছিলেন। অতঃপর ফিরে এসে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং দ্রুত মদীনা শরীফ ফিরে যান এবং নবীজীর রওযা যেয়ারত করেন দ্বিতীয়বার এবং দরূদ ও সালাম পেশ করেন। অতঃপর তিনি আল কারক অভিমুখে রওয়ানা করেন এবং জিলহজ্জ মাসের ২৯ তারিখ আল কারক শহরে প্রবেশ করেন এবং তার নিরাপদে ফিরে আসার সুসংবাদ বহনকারী দূত প্রেরণ করেন। দামেস্কের শাসনকর্তা জামালউদ্দিন আকুস আন-নাজীবী সুসংবাদ বাহককে অভিবাদন জ্ঞাপন করার জন্য দোসরা মুহাররম শহর থেকে বের হন। তিনি দেখতে পান যে, সুলতান নিজেই সবুজ প্রান্তরে উপস্থিত আছেন। আর তিনি আছেন সকলের সম্মুখভাগে। তার দ্রুত আগমন আর ধৈর্য ও বীরত্ব দর্শন করে লোকজন বিস্ময় বোধ করে। অতঃপর তিনি দ্রুত রওয়ানা করে ছয় মুহাররম হালব নগরীতে প্রবেশ করেন তথাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। তথা হতে হীমাত শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে দামেস্কে ফিরে আসেন এবং দামেস্কে থেকে পরবর্তী বছর তেসরা সফর মঙ্গলবার মিশরে প্রবেশ করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

জিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে প্রচণ্ড ঝড়ে নীল নদে দুইশত নৌযান নিমজ্জিত হয়। এতে বহু লোক নিহত হয়। এই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় শাম দেশে বজ্রপাতে ফল-ফসলের বিপুল ক্ষতি হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই বৎসর আল্লাহ তা'আলা ইবগা এর সঙ্গী তাতারী এবং তার চাচাতো ভাই ইবন মানুক তামার সঙ্গীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেন। ফলে তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। একই বৎসর হারবান অঞ্চলের অধিবাসীরা

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তাদের মধ্য কিছু লোক শাম দেশে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল ইসলাম আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ ইবন তায়ামী। তিনি তার পিতার সঙ্গে আগমন করেন। এ সময় ইবন তায়সীর বয়স ছিলো ছয় বৎসর। তার সঙ্গে ছিলেন তার ভাই জয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান এবং শরফুদ্দিন আবদুল্লাহ্ এরা দু'জন বয়সে ইবন তায়মীদের চেয়ে ছোট ছিলেন।

এ বৎসর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাবা ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন জামির ইযযুদ্দিন আইাবমার ইবন আব্দুল্লাহ আল হালবী আল খালহি। ইনি ছিলেন অন্যতম প্রধান আমির। বাদশাদের নিকট তার বিশিষ্ট স্থান ছিলো। বাদশা যাহিরের নিকটও তার বিশিষ্ট মর্যাদা ছিলো। বাদশার অবর্তমানে তিনি তার প্রতিনিধিত্ব করতেন। এই বৎসর শুরু হলে বাদশা তাকে সঙ্গে নিয়ে যান দামেস্ক দূর্গে তার ওফাত হয়। আল ইয়া ইয়াগমুরিয়ার নিকট কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি বিপুল পরিমাণ সম্পদ রেখে যান। সন্তানদের সম্পর্কে তিনি বাদশার জন্য ওসীয়ত করে যান। তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করার জন্য সুলতান দামেস্কের প্রধান মসজিদে উপস্থিত হন।

শরফুদ্দিন আবু যাহির

মোহাম্মদ ইবন আল হাফিয আবুল খাত্তাব উমর ইবন দিহায়া ইবন আল মিগরী ৬১০ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। তার পিতা এবং একদল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। আল কামেলিয়াস্থ দারুল হাদীসে তিনি দীর্ঘদিন শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হাদীসের দারস দান করেন এবং তিনি একজন হাদীস বিশারদ ছিলেন।

কাযী তাজউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ

মোহাম্মদ ইবন ওয়াহাব আল বাহিনী আল হানাফী। তিনি দামেস্কে দারস দান করেন এবং ইবন আতার পক্ষ থেকে ফতওয়া দেন হামামখানা থেকে বের হওয়ার পর উহার চত্তরে অকস্মাৎ ইন্তেকাল করেন এবং কাসীউন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

দক্ষ চিকিৎসক শরফুদ্দীন আবুল হাসান

আলী ইবন ইউসুফ ইবন হায়দারা আর রাহাবী। ইনি ছিলেন দামেস্কের চিকিৎসকদের মধ্যে সেরা। ওয়াকফকারীর ওসীয়ত অনুযায়ী তিনি ছিলেন দাখওয়ারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন তার সমকালীন শিক্ষকদের মধ্যে অগ্রগন্য। এখানে তার কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করা যায় :

يساق بنو الدنيا الى الحتف عنوة * ولا يشعر الباق بحالة من يمضى
كانهم الانعام فى جهل بعضها * بما تم من سفك الدماء على بعض

দুনিয়ার সন্তানদেরকে জোরপূর্বক মৃত্যুপানে চালিত করা হয়। অন্যরা কিছুই টের পায় না, যে চলে যাচ্ছে তার সম্পর্কে। অপরকে জানার ক্ষেত্রে তারা যেন চতুষ্পদ জন্তুবৎ। কারণ, তারা একে অপরের রক্তপাতে হত-বিভোর।

শায়খ নাসিরউদ্দিন

আল মুবারাক ইবন ইয়াহইয়া ইবন আবুল হাসান আবুল বারাকাত ইবন আছইযছিয়াগ আল শাফেঈ। ইনি ছিলেন ফেকহ এবং হাদীস শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত। ইনি হাদীসের দারস দান করেন এবং ফেকহের বিষয়ে ফতওয়া দেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার দ্বারা অনেকে উপকৃত হয়। তিনি আশি বৎসর জীবিত ছিলেন। এ বৎসর এগারো জুমাদাল উলা মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

শায়খ আবুল হাসান

আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আল কুফী আল মুকরী আন নাহবী। তার লকব ছিলো সীবাওয়াইহি। আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে ইনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এই বৎসর কায়রো আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে ইনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এই বৎসর কায়রো হাসপাতালে ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

عذبت قلبى بهجر منك متصل * يا من هواه ضمير غير منفصل

فما ذادنى غير تاكيد صدك لى * فما عدولك من عطف الى بدل

অবাধ বিচ্ছেদ তুমি আমার অন্তরে জমা দিয়েছ, ও হে যে বক্তি যার ভালবাসা হলো সংযুক্ত সর্বনাম। আর সে আমাকে জোর দিয়েছে তোমার থেকে বিরহের তরে; আর 'আত্ক' থেকে 'বদল' পর্যন্ত তোমার কোনো দুশমন নেই।

আর একই বৎসর আমাদের শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আলী আনসারী ইবন শামলাকানী। তিনি ছিলেন শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

হিজরী ৬৬৮ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭০ সন)

এ বৎসর দোসরা মুহাররম সুলতান হিশহাম থেকে আল হাযান প্রত্যাবর্তন করেন। সবুজ চত্ত্বরে তাকে ভ্রমন করতে দেখে লোকজন আনন্দিত হয। হাদিয়া- তোহফা নিয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্য আগমন করা থেকে তিনি লোকজনকে বারণ করেন। এটাই ছিল তার নিয়ম। তার দ্রুত গমনা-গমন এবং ভীষণ সাহস দেখে লোকজন অবাক হয়ে যেত। এরপর তিনি হালব অঞ্চল সফর করেন। সেখান থেকে মিশর গমন করেন। মিশরীয় অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সফর মাসের ছয় তারিখ তিনি মিশরে প্রবেশ করেন। এই সময় তার স্ত্রী উম্মুল মালেক আস সাঈদ হিয়াযে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ছফর মাসের ১৩ তারিখ সন্তান এবং আমীর- উমরাকে নিয়ে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া সফরের উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে শিকার করেন এবং আমির উমরাদেরকে বিপুল সম্পদ ও খিলাফত দান করেন। বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে আসেন।

এ বৎসর মুহাররম মাসে মরক্কোর শাসনকর্তা আবুল আলা ইদ্রীস ইবন আবদুল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ইবন ইউসুফ, যার উপাধি ছিলো আল- ওয়াসিক। তিনি নিহত হন। মরক্কোর নিকটে সংঘটিত একটা যুদ্ধে বনূ মযীন তাকে হত্যা করে। আর রবিউল আখের মাসের তেরো তারিখ একদল সৈন্য নিয়ে সুলতান দামেস্ক নগরীতে পৌছেন। পথিমধ্যে তীব্র শীতে চরম কষ্টের সম্মুখীন হন। ফলে যাক্বারিয়া নামক স্থানে তাবু স্থাপন করেন। এখানে তিনি খবর পান যে,

যাইতুনের বোনের পুত্র মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে 'এক্কা' শহর থেকে বহির্গত হয়েছেন। তিনি দ্রুত ছুটে যান তাদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং তাদের ভয়ে তিনি 'এক্কা' শহরে প্রবেশ করেন। রজব মাসে সুলতানের প্রতিনিধিরা ইসমাইলিয়া শহরের গ্রীষ্মকালীন নিবাস অধিকার করে নেন এবং তথাকার যামির ছালেম মুবারক ইবন রাযী পলায়ন করে। এবং হেমা শহরের শাসনকর্তা কৌশলে তাকে আটক করে সুলতানের নিকট প্রেরণ করে এবং সুলতান তাকে কায়রোর কোন এক দূর্গে বন্দি করে রাখে। আর এই বৎসর সুলতান নবীজীর হুযরার জন্য কাঠের স্বম্ভ প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, এসব দ্বারা নবীজীর রওযার চারিপাশে বেষ্টনি গড়ে তোলা হয়। তিনি এইসব দ্বারা মিশরীয় অঞ্চলের লোকদের জন্য গেট নির্মাণ করেন যা প্রয়োজনে খোলা এবং বন্ধ করা হতো। তিনি সেখানে এসব কাজে লাগান। এই সময় তিনি খবর পান যে, ফিরিঙ্গীরা শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে। ফলে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সুলতান সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন। এতদ সত্ত্বেও আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর ব্যাপারে তিনি সংকিত ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নগর রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং হঠাৎ শত্রুদল হামলা চালালে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেতু নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরে কুকুর বধ করার নির্দেশ দেন। আর এই বৎসরই মরক্কো দেশ থেকে বনূ আব্দুল মুমিনের শাসনকালের অবসান ঘটে। তাদের শেষ শাসনকর্তা ছিলো ইদ্রীস ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ। এই বৎসর বনূ সিরীন তাকে হত্যা করে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা এ বৎসর ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন–

সাহেব যায়নুদ্দিন ইয়াকুব ইবন আব্দুল্লাহ আল রাফী ইবন যায়েদ ইবন মালেক আল মিশরী, যিনি ইবন যুবাইরি নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। মালেক মুযাফফর কাতার-এর উজির ছিলেন। অতঃপর আয যাহির বায়বাগ-এর শাসনকালের শুরুতে তার উজির হন। অতঃপর তাকে পদচ্যুত করে বাহাউদ্দিন বিনুল হেনাকে উজির করেন। আর এই বৎসর রবিউল আগের মাসের মৃত্যুও পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বগৃহে অবস্থান করেন। তার অনেক উন্নতমানের কবিতা আছে।

আল শায়েখ মুয়াফফাস উদ্দীন

আহমদ ইবন কাশেম ইবন খলীফা আল খাযরাজী। ইনি ছিলেন একজন চিকিৎসক ইবন উমাবিয়া নামে তিনি মশহুর ছিলেন। তারিখুল আতিববা দীর্ঘ দশ খণ্ডে তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থটি জামে উমাবিয়ার মাজারে ইবন রওযা নামে ওয়াকফ করা আছে। সারখাদ নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিলো নব্বই বছরের বেশি।

শায়খ যাইনুদ্দিন আহমাদ ইবন আবদুল দায়েম

ইবন লেখা ইবন আহমাদ ইবন মোহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আহমদ বিন বাকী আবুল আব্বাস আল মাগদেসী আন নাবলিসী। একদল শায়েখ থেকে বর্ণনা ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। পাঁচশ পচাত্তর হিজরী সনে তার জন্ম হয়। তিনি অনেকের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি আর লিখতেন খুব দ্রুত। শায়েখ আলামুদ্দিন বর্ণনা করেন যে, তিনি মুকতাসার আল খারাকী গ্রন্থটি এক রাত্রে কপি করেন্ তার

হাতের লেখা ছিলো খুব সুন্দর। তারীখে ইবন আসকি'র গ্রন্থটি তিনি দুই দফা কপি করেন এবং নিজের জন্য তার একটা সার সংক্ষেপও প্রস্তুত করেন। শেষ বয়সে তিনি চার বছর দৃষ্টিশক্তি হারান। তার কিছু কবিতা আছে যার কিছু অংশ কুতুবুদ্দিন তার তাযঈল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কাসিউন অঞ্চলে তার মৃত্যু হয় এবং সেখানে দশই রজব ভোর বেলা তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো নব্বই এর অধিক।

কাযী মহিউদ্দীন যাকী

আবুল ফযল ইয়াহহিয়া ইবন কাযী আল কুখাত বাহাউদ্দিন আবুল মাআলী মোহাম্মদ ইবন আলী ইবন মোহাম্মদ ইবন ইয়া হযিয়। ইবন আলী ইবন আব্দুল আযীয ইবন আলী ইবন আব্দুল আযীয ইবন আলী ইবনুল হুসাইন ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান ইবনুল কাশিম ইবনুল ওয়ালিদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবান ইবন উসমান ইবন আফফান আল কারশী আল উমারির ইবনুয বাকি। তিনি একাধিকবার দামেস্কের কাযীর পদ গ্রহণ করেন। তার পূর্ব পুরুষদের এ অবস্থা ছিলো। সকলেই কাযীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি হাম্বল, ইবন তবরযাদ, আল বিলীদ এবং আল হারাস্তানী প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। অনেক মাদরাসায় তিনি হাদীস শিক্ষা দান করেন। তিনি শাম দেশের কাযীর পদ গ্রহণ করেন কিন্তু আবু শামার বর্ণনা অনুযাী তিনি প্রসংশা লাভ করতে পারেননি। রজব মাসের চৌদ্দ তারিখ মিশরে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালকালে তার বয়স ছিলো সত্তর এর বেশি। তাকে আল মাকতাম কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর বেশকিছু চমৎকার কবিতা আছে। শায়েখ কুতুবুদ্দিন এই প্রসঙ্গে তার বংশধারা বর্ণনাপূর্বক তদীয় পিতা কাযী বাহাউদ্দিনের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি তদীয় শায়েখ ইবনুল আরাবির অনুসরণে হযরত উসমান (রা)-এর উপর হযরত আলী (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতেন। একদা দামেস্ক নগরীর জামে মসজিদে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, সিফফীন যুদ্ধকালে বনূ উমাইয়ার দ্বারা কষ্ট পাওয়ার ফলে তিনি বিমুখ হয়ে আছেন। ভোরবেলা তিনি একটি কবিতা রচনা করেন যাতে হযরত আলী (রা)-এর প্রতি তার আকর্ষণের কথা উল্লেখ করেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন উমারী। তার কবিতার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো–

ادين بما دان الوصی ولا اری ٨ * سواه وان كانت امية محتدی
ولو شهدت صفين خيلی لاعذرت * وشاء بن حرب هنالك مشهدی
لكنت اسن البيض عنهم تراضيا * وامنعهم نيل الخلافة باليد

১. আমি স্থীর দ্বীন গ্রহণ করছি আর এছাড়া আর কোনো মত নাই যদিও বনূ উমাইয়া ও ছিলো সরলপথের অভিসারী।

২. আমার অশ্ব যদি সিফফীনে উপস্থিত থাকতো তাহলে তথায় আমার উপস্থিতি বনূ হারবের উষ্টকে বিপদে ফেলতো।

৩. আমি তাদের সন্তুষ্টি দ্বারা তরবারীকে তীক্ষ্ম করতাম এবং তাদের খেলাফত অর্জনকে হস্ত দ্বারা বারণ করতাম।

তার আরো দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য :

قالوا ما في جلق نزهة * تسليك عمن انت به معزا
يا عازلي دونك في لحظة * سهما وقد عارضه سطرا

১. তারা বলে, দামেস্ক নগরীতে কোনো বিনোদনের স্থান নেই তুমি যে জিনিসের প্রতি আসক্ত তা ভুলে যাও।

২. হে আমার নিন্দুক, তার দৃষ্টির বর্শা থেকে নিজেকে রক্ষা করো একটা ছত্র তো তার প্রতিরোধ করেছে।

সাহেব ফখরুদ্দীন

মোহাম্মদ ইবনুস সাহেব বাহাউদ্দিন আলী ইবন মোহাম্মদ ইবন সালীম ইবন আল হেনা আল খিসরী। তিনি ছিলেন পরিবেশ বিষয়ক উজির এবং তিনি ছিলেন বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি। আল কোরাফা আল কুবরা' অঞ্চলে তিনি একটা খানকা তৈরী করেন। মিশরে তার পিতার মাদরাসায় তিনি শিক্ষা দান করেন। আর ইবন বিনতুল আয এর পরে শাফেঈ মাদরাসায় তিনি শিক্ষা দান করেন। শা'বান মাসে তার ইন্তেকাল হয় এবং আল মাকতাম কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয। তার পুত্র তাজউদ্দিন-কে সুলতান পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী করেন।

শায়েখ আবু নছর ইবন আবুল হাসান

ইবনুল খাযযায বাগদাদের অধিবাসী এ মহান ব্যক্তি ছিলেন সুফী এবং কবি। তার চমৎকার কাব্যগ্রন্থ আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক এবং আলাপ- আলোচনায় খুব অমায়িক। জনৈক বন্ধু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তার সম্মানে দণ্ডায়মান না হয়ে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

نهض القلب حين اقبلت * اجلالا لما فيه من صحيح الوداد
ونهوض القلب بالود اولى * من نهوض الاجساد للاجساد

১. যখন তুমি উপস্থিত হলে তখন আন্তরিক ভালোবাসার টানে অন্তর উত্থিত হয়েছে।

২. আর ভালোবাসার সঙ্গে হৃদয়ের উত্থান দেহের উত্থানের চেয়ে শ্রেয়।

হিজরী ৬৬৯ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭১ সন)

এই বৎসর সফর মাসের শুরুতে সুলতান একদল সৈন্য নিয়ে মিশরীয় অঞ্চল থেকে আসকালান গমন করেন এবং তথাকার নগর প্রাচীর, যা সালাউদ্দিনের শাসনকালে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলো তা ভেঙ্গে ফেলেন এবং এই ভেঙ্গে ফেলা প্রাচীরের নিচে তিনি দুইটি পেয়ালা পান যাতে ছিলো এক হাজার দিনার। এগুলো তিনি আমিরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি এই মর্মে সুসংবাদ লাভ করেন যে, মনুকুতময় আবগার বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। এই সংবাদ তিনি আনন্দিত হয়ে কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন। আর রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান জানতে পারেন যে, এক্কাবাসীরা তাদের হাতে বন্দী মুসলমানদের এক্কার বাহিরে হত্যা করে। তার অধিকারে এক্কাবাসীদের যে সব বন্দি ছিলো তাদের সম্পর্কে হত্যার নির্দেশ

দেন। এই দিন প্রত্যুষে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এদের সংখ্যা ছিলো প্রায় দুইশ। আর এ সময় আল মুসিয়া মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং বাইশ রবিউল আউয়াল সেখানে জুমার নামায আদায় করা হয়। একই বৎসর তিউনিশিয়াবাসী এবং ফিরিঙ্গীদের মধ্যে যুদ্ধ হয় যার আলোচনা অনেক দীর্ঘ। উভয় পক্ষের অগনিত লোক নিহত হওয়ার পর তারা যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয় এবং এ ব্যাপারে সমঝোতায় উপনিত হয়।

আর রজব মাসের বৃহস্পতিবার বাদশা যাহির দামেস্ক শহরে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন পুত্র মালেক সাঈ, উজির ইবনুল হেনা এবং বিপুল সৈন্য সামন্ত। অতঃপর পৃথক পৃথক ভাবে তারা বের হন এবং সকলে মিলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, সাহেল অঞ্চলে তারা মিলিত হবেন যাতে জাবালা, লাযেকিয়া, সারকাব এবং আশপাশের শহরগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে পারে। অতঃপর তারা একত্র হয়ে ছাফিনা এবং মাযদাল অঞ্চল অধিকার করে নেন। সেখান থেকে রওনা করে উনিশ রজব মঙ্গলবার কুর্দি দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই দুর্গে তিনটি প্রাচীর ছিলো। সেখানে তারা মিনযানিক স্থাপন করেন এবং বল প্রয়োগে মধ্য শা'বানে অধিকার করে নেন। পরে সৈন্যরা দূর্গে প্রবেশ করে। দুর্গ অবরোধকারী ছিলেন সুলতানের পুত্র মালেক সাঈদ। সুলতান দূর্গবাসীদেরকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং সকলকে ত্রিপলিতে নির্বাসনে পাঠান। জয় করার দশ দিন পর দুর্গ হস্তগত হয়। দুর্গের অধিবাসীদেরকে নির্বাসিত করা হয় এবং শহরের গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করা হয়। সেখানে জুমার নামায আদায় করা হয় এবং সেখানে নায়েব কাযী নিযুক্ত করা হয়। শহর নির্মাণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর তারসুস অঞ্চলের শাসনকর্তা এই শর্তে তার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন এবং নগরীর চাবি তার কাছে প্রেরণ করেন যে, শহরের অর্ধেক খাদ্য শস্যের অধিকারী হবেন সুলতান। আর সেখানে তার একজন প্রতিনিধি থাকবেন। তিনি এই শর্ত মেনে নেন। অনুরূপভাবে আল মারকাব অঞ্চলের শাসনকর্তাও অর্ধেক খাদ্য-শস্য এবং দশ বছর যুদ্ধ বিরতির শর্তে সন্ধি করেন। আর সুলতান কুর্দি অঞ্চলের অতঃপর সুলতান রওয়ানা করেন এক্কা দুর্গে মিনযানিক স্থাপন করেন যার দূর্গের অধিবাসীরা এই শর্তে তার নিকট দাবি করেন যে, তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিবেন। তিনি এই শর্ত নেনে। ঈদুল ফিতরের দিন শহরে প্রবেশ করেন এবং তার কাছে শহর জ্ঞাপন করা হয়। এই দুর্গটি দ্বারা মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি করা হয। আর এটা ছিলো দুটি পর্বতের মধ্যস্থলে একটা উপত্যকা। অতঃপর সুলতান ত্রিপলি অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সময় ত্রিপলির অধিপতি সুলতানের নিকট এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে, এদেশে সুলতানের উদ্দেশ্য কি? তিনি জবাব দেন যে, আমি এসেছি তোমাদের শস্যক্ষেত পদদলিত করতে এবং তোমাদের নগর ধ্বংস করতে। পরবর্তী বছর তোমাদের দুর্গে আবার ফিরে আসবো। অতঃপর তিনি অনুগ্রহ আর সমঝোতা কামনা করে তার কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। এতে দশ বছর যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব ও ছিলো। তিনি এই প্রস্তাব মেনে নেন। আর তিনি ঈসমাইলিয়াকে এ মর্মে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন পিতা সম্পর্কে তার কাছে অনুকম্পার আবেদন জানান। তিনি কায়রোয়ে বন্দী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আল আলিকা অঞ্চল সমর্পণ করো এবং নিচে অবতরণ করো এবং কায়রোয় জায়গীর গ্রহণ করো এবং স্বীয় পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করো। তারা নিচে অবতরণ করলে তিনি কায়রোয় তাদেরকে আটক করার নির্দেশ দেন এবং আল আলিকা দুর্গের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন।

আর বারো সাওয়াল রোববার দামেস্ক শহরে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয় এতে অনেক কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বন্যায় বহু লোক ডুবে মারা যায়। বিশেষ করে রোম দেশের হাজীরা।

যারা দুই নদীর মধ্যস্থলে অবস্থান করছিলেন। বন্যা তাদের উস্ট্র আর দ্রব্য-সামগ্রী ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়। এবং শহরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পঁচিলের সিঁড়ি এবং বাবুল ফরাদি দিয়ে নগরে পানি প্রবেশ করে। ফলে ইবনুল মাকদাম সরাইখানা ডুবে যায় এবং এতে অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আর এ ঘটনা ঘটে গ্রীস্মের মওসুমে। আর সুলতান সাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ বুধবার দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। এবং কাযী ইবন খাল্লিকানকে পদচ্যুত করেন। তিনি বিচার বিভাগে দশ বছর নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর ইযযুদ্দিনকে নিযুক্ত করেন এবং তাকে খিলাত দ্বারা ভূষিত করেন। আর তিনি ত্রিপলির বাইরে উজির ইবনুল হেনার দূতিয়ালিতে এই ফরমান জারি করেন। অতঃপর ইবন খাল্লিকান যিলক্বদ মাসে মিশর গমন করেন। আর সাওয়াল মাসের বারো তারিখ শায়খ সুলতান মালেক যাহির এবং তার সঙ্গিরা কুর্দিদের দূর্গে ইয়াহুদী গীর্জায় প্রবেশ করে তথায় নামায আদায় করেন এবং তথা হতে ইয়াহুদীদের চিহ্ন মুছে ফেলেন এবং সেখানে দস্তরখানা বিছান এবং 'ছামা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বেশ কয়েকদিন এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। অতঃপর গীর্জা ইয়াহুদীদেরকে ফেরত দেয়া হয়। অতঃপর সুলতান সাওয়ায়েল অঞ্চলের অভিমুখে রওয়ানা করেন এবং তথাকার কোনো কোনো অঞ্চল জয় করে নেন এবং মক্কা নগরীর নিকটবর্তী হন এবং এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেন। পরে তিনি মিশরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা করেন। আর এ সময় এবং এসব যুদ্ধ বিগ্রহে তার ঋণের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় আঠারো হাজার দিনার। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময় দান করেন।

যিলহজ্জ মাসের তেরো তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি কায়রো পৌছেন। আর কায়রো পৌছার সপ্তদশ দিবসে একদল আমিরকে তিনি বন্দি করেন। এদের মধ্যে আল হালবী প্রমুখও ছিলো। তিনি জানতে পারেন যে, তারা সাকিফ অঞ্চলে তাকে আটক করার ইচ্ছা পোষণ করছিলো। যিলহজ্জ মাসের ১ম তারিখ সারা দেশের মধ্যে মদ প্রবাহিত করার নির্দেশ জারি করেন এবং মদ প্রস্তুতকারী এবং পানকারীকে হত্যা করার হুমকি দেন এবং এ ব্যাপারে জামিনদান রহিত করেন। কেবল কায়রো নগরীতে প্রতিদিন মদ্যপানের জামানতের পরিমাণ ছিলো এক হাজার দিনার। অতঃপর বার্তাবাহক এ খবর সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়। আর এ বৎসর সুলতান আল কারক অঞ্চলের শাসনকর্তা আযীয ইবন মুমিয এবং তার একদল সঙ্গীকে আটক করেন। এরা তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো :

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন

মালেক তকিউদ্দিন আব্বাস ইবন মালেক আদেল আবু বকর ইবন আউয়ুব ইবন মাদী। তিনি সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ জীবিত ব্যক্তি। আল কিনদি এবং ইবনুল হারাস্তানির নিকট তিনি হাদীস শ্রবণ করেন রাজা বাদশাদের দরবারে তার বিরাট মর্যাদা ছিলেন। কোমল স্বভাব আর সুন্দর আচরণের অধিকারী। তার সাহচর্যে কেউ বিরক্তি বোধ করতো না। বাইশ জুমাদাস সানি শুক্রবার দারবে রায়হানী নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কাসিউল অঞ্চলের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কাযী আল কুখাত আবু হাযজ

উমর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সালেহ ইবন ঈশা আল সুবগি আল মালেকি। পাঁচিশ পঁচাশি সনে তার জন্ম হয়। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফেকহে শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করে আল সালাহিযায় ফতওয়া দানের কাজে নিয়োজিত হন। পরে কায়রো নগরীর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। পরে ৬৬৩ হিজরী সনে কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সকল মাযহাবের কাযী নিযুক্ত করেন। তিনি এ পদ গ্রহণ করতে তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। অনেক জবর দস্তি করার পর এ শর্তে কাযীর পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন যে, এ জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন না। জ্ঞান এবং দ্বীনদারিতে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাযী বদরুদ্দিন ইবন জামাআ প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যিলক্বদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাওয়াযি সুজাউদ্দিন মোরশেদ আল মাযফারি আল হামাবী ইনি ছিলেন অন্যতম বীর বাহাদুর ব্যক্তি। তার পরামর্শ ছিল নির্ভুল ও সঠিক। তার শিক্ষকও তার বিরোধিতা করতেন না। একই অবস্থা ছিলো মালেক যাহিরেরও। হেমাত নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং নিকস্থ মাদরাসার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ইবনু সাবীন আব্দুল হক ইবন ইবরাহীম ইবন মোহাম্মদ ইবন নছর ইবন মোহাম্মদ বিন নছর ইবন মোহাম্মদ ইবন কুতুবউদ্দিন আবু মোহাম্মদ আল মাগদেসী আল মারকুতি। মীর সিয়ার নিকটবর্তী একটা শহর রাকুতা থেকে রাকুতি। ৬১৪ হিজরীতে তার জন্ম। পূর্ববর্তীদের জ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্র চর্চা করেন, ফলে তার মধ্যে এক প্রকার নাস্তিকতা জন্ম নেয়। এ বিষয়ে তিনি একটা গ্রন্থও রচনা করেন যা আল সীসিয়াহ নামে খ্যাত। আর এর দ্বারা তিনি ধনী আমির এবং বোকা আমিরদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করতেন আর তিনি মনে করতেন যে, এটাই মানুষের অবস্থা। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে কিতাবুল আদব আর কিতাবুল হাওয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন এবং তথাকার শাসনকর্তা ইবন সুমাই এর জ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। কখনো কখনো তিনি হেরা গুহায় সংস্বর্গ অবলম্বন করেন। তিনি আশা পোষণ করতেন যে, যেভাবে নবীজীর (সা)-এর নিকট ওহী আগমন করতো অনুরূপভাবে তার নিকটও ওহী আগমন করবে। তিনি বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, নবুওয়াত অর্জন করা যায়। যদিও তার এ বিশ্বাস ছিলো ফাসিদ। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, এটা একটা গুণ যা জ্ঞান বুদ্ধির উপর আপতিত হয যখন তা হয স্বচ্চ ও নির্মল। দুনিয়া এবং আখিরাতে লাঞ্ছনা ছাড়া তিনি আর কিছুই লাভ করবে না যদি এ বিশ্বাসের উপর তার মৃত্যু হয়ে থাকে। বায়তুল্লাহর চারপাশের তাওয়াফকারীদেরকে দেখে তাদের সম্পর্কে তিনি বলতেন এরা যেন আবর্তনস্থলে গাধার দল। আর তারা যদি আবর্তন স্থলের তাওয়াফ করতো তবে তা হতো বায়তুল্লাহর তাওয়াফের চেয়ে উত্তম। এবং তার অনুরূপ অন্যদের সম্পর্কে আল্লাহ ফয়সালা করবেন। তার সম্পর্কে বড়ো বড়ো উক্তি এর কীর্তি বর্ণিত আছে। আটাশ সাওয়াল মক্কায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিজরী ৬৭০ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭১ সন)

এ বৎসরের শুরুতে আল হাকিম বিআমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ আব্বাসী খলীফা ছিলেন। আর মালেক যাহির ছিলেন সুলতানুল ইসলাম। মুহাররম মাসের চৌদ্দ তারিখ রোববার

সুলতান সমুদ্র গমন করে, যাতে শাওয়ানীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। সাইপ্রাস দ্বীপে ডুবে মারা গিয়েছিলো তাদের বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেন। আর তারা ছিল চল্লিশ শীনী। তিনি শীনীর সঙ্গে গমন করেন আর তার সঙ্গে ছিলেন আমির বদরুদ্দিন। তাদেরকে নিয়ে নৌকা কাত হয়ে গেলে খাযানদার সমুদ্রে পতিত হয়। এবং সমুদ্রের পানিতে ডুব দেয়। তার পিছনে এক বক্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় এবং চুল ধরে ডুবে মরা থেকে উদ্ধার করে। ফলে সুলতান লোকটিকে খিলাত তথা পারিতোষিক দান করেন এবং তার সঙ্গে স্বদাচার করেন আর মরহরম মাসের শেষ দিকে সুলতান আল খাসকিয়ার একটা ক্ষুদ্র দল এবং মিশরীয় অঞ্চলের আমিরদেরকে নিয়ে আল কারক অঞ্চলে পৌছেন এবং তথাকার অঞ্চলের নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে দামেস্ক শহরে উপনীত হন এবং ছফর মাসের বারো তারিখ শহরে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে আমির ইযযুদ্দিন আইদমার যিনি আল কারক অঞ্চলের নায়েব ছিলেন, তিনিও মনিভগ হন। সুলতান তাকে দামেস্কের নায়ব নিযুক্ত করেন এবং জামালউদ্দিন আকুশ আল নাহিবীকে ছফর মাসের চৌদ্দ তারিখ উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করেন। এরপর হেমাত অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা করেন এবং দশ দিন পর ফিরে আসনে। আর রবিউল আউয়াল মাসে তাতারীদের ভয়ে ভীত লোকজন হালব, হেমাত এবং হিমস অঞ্চল হতে দামেস্কে পৌছেন। দামেস্ক অধিবাসীদের মধ্যে ও অনেকে পলায়ন করে। আর রবিউল আখের মাসে মিশরীয় সৈন্যরা দামেস্কে সুলতানের দরবারে পৌছে এবং সুলতান তাদেরকে নিয়ে মাসের সাত তারিখ রওয়ানা করেন এবং হিমাত অঞ্চল অতিক্রম করে তথাকার বাদশা মনসুরকে করেন এরপর হালব অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা করেন এবং তথাকার সবুজ প্রান্তরে তাবু স্থাপন করেন এর কারণ ছিলো এই যে, রোমক সৈন্যরা প্রায় দশ হাজার পদাতিক সৈন্য সমবেত করে এবং তাদের এক দলকে প্রেরণ করলে তারা আইনতার অঞ্চলে লুণ্ঠন চালায়। এভাবে নাছতুন অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে এবং হারেম ও এনতাকিয়ার মধ্যস্থলে একদল তুর্কমানের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে নির্মূল করে। তাতারীয়া যখন শুনতে পায় যে, সুলতান উপস্থিত হয়েছেন এবং তার সঙ্গে আছে একদল বিজয়ী বাহিনী তখন তারা পশ্চাদদিকে ফিরে যায়। আর তিনি জানতে পারেন যে, ফিরিডঙ্গীরা কাবুল অঞ্চলে লুটতরাজ চালিয়েছে এবং একদল লোক দ্রব্য-সামগ্রী লুন্টন করেছে। তখন তিনি সেখানকার আমিরদেরকে আটক করেন। কারণ তারা দেশ রক্ষার কাজের প্রতি কোনো গুরুত্বারোপ করেনি। অবশেষে তিনি মিশরীয় অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন।

আর সা'বান মাসের তিন তারিখ সুলতান মিশরে হাম্বলীদের কাযী শামসুদ্দিন আহমাদ ইবনুল ইযাদ আল নাগদেসীকে গ্রেফতার করেন তার কাছে যে সব বস্তু গচ্ছিত ছিলো তাও আদায় করেন এবং সে সব বস্তুর যাকাতও উদ্ধার করেন এবং গচ্ছিত বস্তুর কিছু অংশ মালিকদের নিকট ফেরত দেন। ছয়শ বাহাত্তর হিজরীর শা'বান মাস পর্যন্ত তাকে আটক রাখে। তার সম্পর্কে যে ব্যক্তি অভিযোগ করে সে ছিলো হাররান অঞ্চলের জনৈক বাসিন্দা তাকে বলা হতো শাবির। অতঃপর সুলতানের নিকট কাযীর নিষ্কলুলুষতাব প্রকাশ পেলে ছয়শ বাহাত্তর হিজরীতে তাকে পূর্বপদে বহাল করেন। আর শা'বান মাসে সুলতান একা অঞ্চলে আগমন করত লংকাকাণ্ড ঘটান। এক্কা অঞ্চলের শাসনকর্তা সুলতানের কাছে সমঝোতার আবেদন জানালে তিনি দশ বছর দশ মাস দশ দিন দশ ঘন্টার জন্য আপোষ করতে সম্মত হন। এরপর তিনি দামেস্ক প্রত্যাবর্তন

করলে সেখানে দারুস সাদায় সন্ধিপত্র পাঠ করে শোনানো হয় এবং এই অবস্থা বহাল থাকে। অতঃপর সুলতান ইসমায়িলিয়া অঞ্চলে জয় করে নেন। কুতুবুদ্দিন বর্ণনা করেন যে, জুমাদাল উখরা মাসে আল সাবল দূর্গে জিরাফের জন্ম হয় এবং তাকে গাভীর দুধ পান করানো হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, এ এমন এক কাজ যার কোনো দৃষ্টান্ত নাই। এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম শায়খ কামালউদ্দীন :

সালার ইবন হাসান বিন উমর ইবন সাঈদ আল আরবালি আল শাফেঈ। ইনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের শায়েখদের অন্যতম। আর শায়েখ মহিউদ্দিন নববী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকখণ্ডে আল বুইয়ানির আল বাহার' গ্রন্থের সার সংক্ষেপ প্রস্তুত করেন। তার হাতের লেখার কপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। দামেস্কে ফতওয়া তার মত অনুযায়ী আবর্তিত হতো। সত্তরের দশকে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং বাব আল সগীরে তাকে দাফন করা হয় এবং ওয়াকফ করার কাল থেকে তিনি আল বাদ রাইয়িবা অঞ্চলে কল্যাণ সাধন করে আসছেন। তার চাওয়া পাওয়ার কোন লোভ ছিল না। এই অবস্থায় একই বৎসর তিনি ইন্তিকাল করেন।

ওয়াজীহুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবু তলেব

ইবন সুয়াইদ আল তাকরিতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। ইবন সুয়াইদ অনেক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। সরকারের নিকট তিনি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষ করে বাদশা যাহিরের নিকট। বাদশা তাকে সম্মান করতেন এবং বিশেষ মর্যাদা দিতেন। কারণ তার এযাতকালে রাজত্ব লাভ করার পূর্বে তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন। নিজের খানকায় তাকে দাফন করা হয়। কাসিউন অঞ্চলে রাবাত এ নাছিরির নিকটে তার কবর রয়েছে। খলীফা সব সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আর তার পত্রাবলী সকল বাদশার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। এমনকি সাওয়াহেল অঞ্চলের ফিরিঙ্গী বাদশাদের নিকটও। তাতারী এবং হালাকুখার শাসনকালেও তার বেশ মর্যাদা ছিল। তিনি বেশ দান-দক্ষিণা করতেন। নাযমুদ্দিন ইয়াহহিয়া ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহেদ ইবনুল্লুবদী হামাম আল ফালাক যা চিকিৎসদেরকে দান করা হয় তার নিকেট লাবুদিয়া অঞ্চলের ওয়াকফদাতা ছিলেন তিনি। চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে তার যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিলো। দামেস্কে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিলো। লাবুদিয়ার নিকট কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ আলী আল-বাক্বা

হযরত ইবরাহীম খলিল (আ)-এর নাম উৎসর্গিত বালাদ আল খলিলের নিকটে একটা সরাইখানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। কল্যাণ সাধন, ইবাদত এবং পথচারী ও যেয়ারতকারীদেরকে আহার করানোর ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। মালেক আল মনসুর কালাউন তার প্রশংসা করে বলতেন, তিনি যখন আমির ছিলেন তখন আমি তার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি কিছু বিষয়ে পূর্বাভাস দেন যার সবটাই সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে একটা ছিলো এই যে, অদূর ভবিষতে তিনি বাদশা হবেন। আর কুতুব আল ইউনিনি একথা নকল করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তার অধিক ক্রন্দন করার কারণ ছিলো এই যে, তিনি এক ব্যক্তির

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যার অনেক কেরামতি এবং অলৌকিক ঘটনার জনশ্রুতি ছিলো। উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে একবার তিনি বাগদাদ থেকে বের হন। তারা এক ঘন্টায় এমন এক শহরে পৌঁছেন বাগদাদের সঙ্গে যার দূরত্ব ছিল এক বছরের। লোকটি তাকে বলল, অমুক সময় আমি যাবো তখন আমাকে অমুক শহরে দেখতে পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় উপস্থিত হলে আমি তার কাছে যাই তখন তার অন্তিম দশা এক তিনি পূর্বদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। আমি তাকে কেবলামুখি করি। তিনি আবার পূর্ব দিকে ফিরে যান।

পুনরায় আমি তাকে কেবলামুখি করি। তখন তিনি দুই চক্ষু খুলে বলেন, তুমি বিচলিত হবে না এই দিকে মুখ করণ ছাড়া আমি মারা যাবো না। এবং তিনি দুনিয়াত্যাগী সন্যাসীদের মতো কথা বলতে শুরু করলেন। এই অবস্থায় তিনি মারা যান আমরা তাকে তথায় একটা খানকায় নিয়ে যাই। আমরা তাদেরকে ভীষণ ব্যথিত দেখতে পাই। তাদেরকে বললাম তোমাদের কি অবস্থা? তারা বললো আমাদের কাছে শতবর্ষী এক প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন আজ তিনি ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করেছেন। আমরা তাদেরকে বললাম তার পরিবর্তে একে গ্রহণ করো এবং আমাদের সঙ্গী আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন আমরা তার দায়িত্ব গ্রহণ করি। তাকে গোসল করাই, কাপড় পড়াই এবং তার জানাযার নামায পড়াই এবং মুসলমানদের গোরস্থানে তাকে দাফন করি। আর তারা লোকটির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তাকে নাসারাদের করবস্থানে দাফন করে। আমরা আল্লাহর নিকট উত্তম সমাপ্তি কামনা করি। এই বছর রজব মাসে শায়েখ আলী ইন্তেকাল করেন।

হিজরী ৬৭১ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭২ সন)

মুহাররম মাসের পাঁচ তারিখ বাদশা যাহির সাওয়ারুন অঞ্চল হতে দামেস্ক শহরে পৌঁছেন। এই সাওয়াহেল অঞ্চল তিনি জয় করেন এবং তাকে সঞ্চিত করেন। মুহাররম মাসের শেষ দিকে তিনি কায়রো পৌঁছেন এবং সেখানে এক বৎসর অবস্থান করে চৌচা সফর করে দামেস্কে ফিরে আসেন। আর এই মুহাররম মাসে নওয়বার শাসনকর্তা ইযাব অঞ্চলে পৌঁছেন। ব্যবসায়ীদেরকে বন্দি করেন এবং অনেক লোককে হত্যা করেন। এদের মধ্যে কাযী এবং ওয়ালীও ছিলো। আমির আলাউদ্দিন আইদগাদি আল খাযানদার এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং তিনি দেশের বিপুল লোককে হত্যা করেন, লুন্টন করেন, অনেককে পুড়িয়ে মারেন, বাড়ি-ঘর ধ্বংস করেন এবং নগর অধিকার করে প্রতিশোধ নেন। সমস্ত প্রশংসা আর স্তুতি আল্লাহর প্রাপ্য।

রবিউল আউয়াল মাসে ছাহইউরুন অঞ্চলের

শাসনকর্তা আমির সাইফুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন মোযাফফর উদ্দিন উসমান ইবন নাসিরউদ্দিন মানকুরস ইন্তেকাল করেন। সত্তর সালের দশকে পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। ছাহইউরুন এবং বজরিয়া অঞ্চলে তিনি এগারো বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর পুত্র সাবিকুদ্দিন সে অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাদশা যাহিরের নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে বার্তা পাঠান। বাদশা অনুমতি দেন। তিনি উপস্থিত হলে বাদশা তাকে খায়েয অঞ্চল জায়গীর হিসাবে দান করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে দুটি শহরের নায়েব করে পঠান।

আর জুমাদাল উখরা মাসের ৫ তারিখ সুলতান তার বাহিনী নিয়ে ফুরাত অঞ্চলে পৌঁছেন। কারণ তিনি খবর পান যে, সেখানে একদল তাতারী আছে। ফলে, তিনি এবং তার সৈন্যরা ফুরাত উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধান চালায় এবং তাদের অনেককে হত্যা করে। আর সব প্রথম ফুরাতে উপস্থিত হন আমির সাইফুদ্দিন কালাবুন এবং বদরুদ্দিন বেসরী। আর সুলতান তাদের উভয়ের অনুগমন করে এবং তাতারীদের সাথে যে আচরণ করার তাই করেন। অতঃপর বাহারা অঞ্চল অভিমুখে গমন করেন যা অবরোধ করে রেখেছিলো অপর একদল তাতারী। তারা যখন আমির সাইফুদ্দিনের আগমন সম্পর্কে জানতে পারেন তখন মাল–সামান সব ফেলে পালিয়ে যায় এবং সুলতান বিরাট শান-শওকতের সাথে বায়রা অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং অধিবাসীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দেন। অতঃপর জুমাদাল উখরার তিন তারিখ দামেস্ক ফিরে আসেন। তখন তার সঙ্গে অনেক বন্দি ছিলো এবং সাত জুমাদাল উখরা মিশরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বের হন। তদ্বীয় পুত্র মালেক সাঈদ ও তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করার জন্য বের হন এবং পিতা-পুত্র উভয়ে কায়রো নগরীতে প্রবেশ করেন। আর এ দিনটি ছিল সকলের উপস্থিতির দিন অর্থাৎ, শুক্রবার। আর কাযী শিহাবউদ্দিন মাহমুদ আল কাতবীর সন্তানদেরকে বানু শিহাব মাহমুদ বলা হয়। সৈন্যদেরকে নিয়ে বাদশার ফুরাত অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

سر حيث شئت لك المهيمن جار * واحكم فطوع مرادك الاقدار

لم يبق للدين الذى اظهرته * يا ركنه عند الاعادى ثار

لما تراقصت الروس تحركت * من مطربات قسيك الاوتار

خضت الفرات بعسكر افضى به * موج الفرات كما اتى الاثار

حملتك امواج الفرات ومن راى * بحرا سواك تقله الانهار

وتقطعت فرقا ولم يك طودها * اذ ذاك الا جيشك الجرار

১ যেখানে খুশি তুমি ভ্রমণ করো আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন আর ফয়সালা কর, নিয়তি তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করবে।

২. তুমি যে দ্বীন প্রকাশ করেছো দুশমনদের জন্য তার কোন বিনিময় অবশিষ্ট নাই।

৩. যখন মস্তকগুলো নর্তন করে তখন তোমার কামানের গর্জন শুরু হয়।

৪. তুমি সৈন্যদেরকে নিয়ে ফুরাত নদীতে ঝাঁপ দিলে, ফুরাতের ঢেউ যাকে যথারীতি তীরে নিয়ে যায়।

৫. ফুরাতের ঢেউ তোমাকে উদ্ধার করে, তুমি ব্যতীত আর কে সমুদ্র দেখেছে, যাকে ঢেউ কুলে নিয়ে গেছে।

৬. আর তা নানা অংশে বিভক্ত হয় তখন সেখানে তোমার সাহসী বাহিনী ছাড়া অন্য কোনো টিলা ছিলো না।

এই দৃশ্য অবলোকন করেছে এমন এক ব্যক্তি বলেন–

ولما تراءينا الفرات بخيلنا * سكرناه منا بالقنا والصوارم

ولجنا فاوقف التيار عن جريانه * الى حين عدنا بالغنى والغنائم

১. আমরা যখন অশ্ব নিয়ে ফুরাতের মুখামুখি হই তখন আমরা তাকে বিচলিত করে তুলি বর্শা আর তরবারি দ্বারা।

২. আমরা প্রবেশ করি তখন সে অর্থ সম্পদ দ্বারা তার গতিবোধ করে আমাদের ফিরে আশা পর্যন্ত।

অপর এক ব্যক্তি বলেন, আর তাতে কোনো ক্ষতি নেই

الملك الظاهر سلطاننا * نفديه بالاموال والاهل

اقتحم الماء ليطفى به * حرارة القلب من الغل

১. বাদশা যাহির আমাদের সুলতান, আমরা ধন-জন তার জন্য উৎসর্গ করি।

২. তিনি পানিতে পবেশ করেন যাতে পিপাসার কারণে সৃষ্ট চিত্তের উষ্ণতা প্রশমিত করতে পারে।

আর তোমরা রজব মঙ্গলবার তিনি নিকটস্থ সকল আমিরকে প্রশাসন কর্মকর্তাসহ সকলকে খিলাত দ্বারা ভূষিত করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী অশ্ব, স্বর্ণ তার পশু দ্বারা ভূষিত করেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি যা ব্যয় করেন তার পরিমান আনুমানিক তিন লক্ষ দিনার। আর শা'বান মাসে সুলতান মানুকুতামার এর নিকট বিপুল উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন আর বারো সাওয়াল সোমবার সুলতান তার নিকট ডেকে পাঠান এবং তিনি করেছেন এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় সুলতান তাকে বন্দি করার নির্দেশ দেন। অতঃপর কৌশলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এটা ছিলো তার সঙ্গে সর্বশেষ অঙ্গিকার। আর যিলক্বদ মাসে ইসমাইলিয়া তাদের হাতে যে সব দূর্গ ছিলো, যেমন- আল কাহাফ, আল কাদামুস এবং আল মানতকা তা সর্ম্পণ করেন এর পরিবর্তে তাদেরকে জায়গীর দেয়া হয়। ফলে, শাম দেশে তাদের হাতে আর কোনো দুর্গ অবশিষ্ট থাকলো না। এ উপলক্ষ্যে সুলতান তার নায়েব নিযুক্ত করেন। একই বৎসর সুলতান সাওয়াহেল অঞ্চলে সেতু নির্মাণ করার নির্দেশ দেন এবং এ কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এর ফলে জনগণের অনেক সুবিধা হয়।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন।

শায়খ তাজউদ্দিন আবু মোযাফফার মোহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন হামযা আলী ইবন হেবাতুল্লাহ আল হাবী আল তাগনিবী আল দামেস্কি। ইনি ছিলেন দামেস্কের বৈশিষ্ট বক্তিবর্গের অন্যতম। এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাব-কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর বায়তুল মালের দায়িত্বও পালন করেন। অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইবন বিলইয়ান তার জন্য শায়েখের পদ সৃষ্টি করেন। আর শায়খ সরফুদ্দিন আল ফারাবি জামে মসজিদে তা পাঠ করে শুনান এবং এক দল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা শ্রবণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

খতীব ফখরুদ্দিন আবু মোহাম্মদ

আব্দুল কাহর ইবন আব্দুল গণি ইবন মোহাম্মদ ইবন আবু কাশেম ইবন মোহাম্মদ ইবন আইমিয়া আল হারবানি, যিনি সেখানে খতিব ছিলেন আর তার গৃহ জ্ঞান চর্চা, বাগ্মীতা এবং কর্তৃত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। সুফিয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো প্রায় ষাট বছর। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তার দাদা ফখরুদ্দিনের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, যিনি দ্বীওয়ান আল খুতুব' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। দামেস্কের অদূরে আল কছর খানকায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ খিযির ইবন আবু বকর আল মেহরানী আল আদবী, ইনি ছিলেন বাদশা যাহির বায়বার্গ এর শায়খ ছিলেন। বাদশার নিকট তা বিরাট স্থান ও মর্যাদা ছিলো। বাদশা তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আল হুসাইনিয়ায় তার নির্মিত খানকায় সুলতান নিজে দু'একবার আগমন করতেন। সুলতান তার জন্য সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন, জুমার দিন এ মসজিদে তিনি খুতবা দিতেন এবং তাকে প্রচুর অর্থদান করতেন এবং তিনি যা চাইতেন তাই দিতেন। তার খানকার জন্য সুলতান অনেক কিছু ওয়াকফ করেন। আর সুলতান তাকে সম্মান করার কারণে সর্বস্তরের মানুষের নিকট তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আর সুলতান তার নিকট বসলে তিনি তার সঙ্গে হাসি-কৌতুক করতেন। আর এতে নিহিত থাকতো দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গল ও কল্যাণ। সুলতান তার নিকট অনেক কিছু ব্যক্ত করতেন। একদা বায়তুল মুকাদ্দাসের আল কামামা গির্জায় প্রবেশ করে পাদরীকে স্বহস্তে বধ করেন এবং সেখানে যা কিছু ছিলো সব সঙ্গীদেরকে দান করে দেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গীর্জায়ও তিনি অনুরূপ কাজ করেন। আর এ গীর্জা ছিলো তথাকার সবচেয়ে বড় গীর্জা। তিনি তা লুট করেন এবং এগুলোকে মসজিদ মাদরাসায় পরিণত করেন এবং এর জন্য বায়তুল মাল থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন এবং এ মাদরাসার নামকরণ করেন মাদরাসা আল খাদরা। দামেস্কেও ইয়াহুদী গীর্জার সঙ্গেও তিনি অনুরূপ আচরণ করেন। তিনি তথায় প্রবেশ করে সেখানে অস্ত্র-শস্ত্র এবং দ্রব্য-সামগ্রী যা ছিলো সব লুণ্ঠন করেন এবং সেখানে দস্তরখানা বিছান এবং তাকে দীর্ঘ সময় মসজিদে পরিণত করে রাখেন। অতঃপর তারা তা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করে এবং তা যেন তাদের হাতেই থাকে এ জন্য অনুরোধ জানায়। অতঃপর একই বৎসর তার দ্বারা এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ছিলো সুলতানের নিকট অপ্রীতিকর এবং এর ফলে তার জন্য কারাগার অবধারিত হয়ে ওঠে অতঃপর সুলতান তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দেন। এই বছরই তার মৃত্যু হয় এবং খানকায় তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। সুলতান তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। এমনকি তার নাম অনুযায়ী সুলতান তার কোনো একজন সন্তানের নামও রাখেন। রাবওয়া পর্বতের পশ্চিম দিকে স্থাপিত মাজার শায়খ খিযিরের মাজার নামে খ্যাত।

আল তাযীয গ্রন্থের লেখক

আল্লামা তাজউদ্দিন আব্দুর রহীম ইবন মোহাম্মদ ইবন ইউনুস ইবন ইউনুস ইবন মোহাম্মদ ইবন সাদ ইবন মালেক আবুল কাশেম আল মুসেলী। ইনি ছিলেন ফিকহ দারস দান এবং রঈস পরিবারের সন্তান। পঁচিশ আটানব্বই হিজরী সনে তার জন্ম হয়। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, জ্ঞান

চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং গ্রন্থ রচনার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন এবং তার রচিত আল তাযীয গ্রন্থে সার সংক্ষেপ রচনা করেন আল ওয়াযিয়া নামে। তিনি আল মাহছুল গ্রন্থেরও সার সংক্ষেপ রচনা করেন। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তিনি একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যা তিনি গ্রহণ করে রুকনুদ্দিন তাওসির নিকট থেকে। আর তার দাদা ছিলেন ইমামুদ্দিন ইবন্ উনুস যিনি ছিলেন মাযহাবের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বক্তি বলে খ্যাত। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হিজরী ৬৭২ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৩ সন)

এ বৎসর ছফর মাসে বাদশা যাহির দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন। তিনি জানতে পারেন যে, আবগা বাগদাদ পৌঁছেছে এবং তিনি এতদ অঞ্চলে শিকার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ফলে, তিনি মিশরীয় বাহিনীর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, তারা যেন আমার জন্য প্রস্তুত হয় আর সুলতানও এ জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ বৎসর জুমাদাল উখরা মাসে আল কারক অঞ্চলের বাদশাকে দামেস্কে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন আর তিনি বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে বায়তুল মুকাদ্দাস যেয়ারত করার জন্য আগমন করেন। তিনি উপরে আরোহণ করলে তাকে তার সম্মুখে উপস্থিত করে দুর্গে আটক করা হয়। আর এ বৎসর কায়রোর অদূরে দীন আল ভীন' মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং সেখানে জুমার নামায আদায় করা হয়। আর এ বৎসর সুলতান কায়রো আগমণ করেন এবং সাত রজব নগরীতে প্রবেশ করেন। আর রমযান মাসের শেষের দিকে বাদশা যাহিরের পুত্র বাদশা যাঈদ একদল সৈন্য নিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করেন এবং সেখানে এক মাস অবস্থান করে ফিরে যান। আর ঈদুল ফিতরের দিন সুলতান তার পুত্র খিযিরেরর খতনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। যার নামকরণ করেছিলেন তার শায়খের নামানুসারে। এতদসঙ্গে আমির উমরাদের একদল সন্তানের খতনার কাজও সম্পন্ন করেন। সময়টা ছিল খুব ভয়ংকর। আর এই বৎসর তাতারী বাদশা বাগদাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আলাউদ্দিনকে তস্তর এবং তার আশ পাশের অঞ্চল দেখা-শোনার দায়িত্ব দেন। তিনি তথ্যাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে গমন করেন। সেখানে তিনি ব্যবসায়ীদের এক যুবক সন্তানকে দেখতে পান যাকে বলা হতো 'লী'। যুবকটি কুরআন মজীদ পাঠ করেছে, কিছু ফিকহের জ্ঞান লাভ করেছে এবং ইবন সীনা রচিত আল ইশরাত গ্রন্থ ও পাঠ করেছে। এ ছাড়া অতি বিদ্যা বিষয়ক কিছু গবেষণা করেছে। অতঃপর যুবকটি নিজেকে ঈশা ইবন মরিয়ম বলে দাবী করে। উক্ত অঞ্চলের কিছু অজ্ঞ-মুর্খের দল যুবককে বিশ্বাস করে। সে ভক্তদের আসর এবং এশার নামাযের ফরয নামায তাদের জন্য রহিত করে দেন। তাকে ডেকে এনে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে দেখা যায় যে, যুবকটি তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। সে ইচ্ছা করেই এমনকি করছে। ফলে, তাকে হত্যার নির্দেশর দেয়া হয় এবং সুলতানের সামনে তাকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযাই দিন। আর জনগণকে নির্দেশ দেন, যা যুবকের সব কিছু এবং তার অনুসারীদের জিনিসপত্র লুটতরাজ করতে। এ বছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন মুয়াইয়েদুদ্দিন আবুর মাআলী আল সদয় আল রহীম আসআদ ইবন জালীর আল মাযফারী ইবনুল উজীর যুয়াইয়েদুদ্দিন আমজাদ ইবন হামযা ইবন আসআদ ইবন আলী ইবন মোহাম্মদ আল তামীমি ইবনুল কালানসী। তাঁর বয়স ছিলো সত্তরের অধিক। তিনি ছিলেন বিপুল

নেয়ামতের অধিকারী, অত্যন্ত সুখি ব্যক্তি। কোনো দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতেন না। ইবন সুমাইদের পর সুলতানের বিষয়াদি দেখে শোনার দায়িত্ব তার অপর অর্পণ করা হলে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে দায়িত্ব পালন করেন। 'বাস্তানায়' তার মৃত্যু হয় এবং মুহাররম মাসের তেরো তারিখ মঙ্গলবার কাসিউন এর পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়। দামেস্ক এবং কায়রোর রঈস ব্যক্তি সদর ইযযুদ্দিন হানযার তিনি পিতা ছিলেন এবং মুয়াইহোদুদ্দিন আসআস। ইবন হাযমা আল কাবির এর দাদা ছিলেন। আর ইনি ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ী আলী ইবন নাসের যিনি আল মালিক আল আফজাল নামে খ্যাতি ছিলেন তার উজীর। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট রঈস ব্যক্তি। কিতাবুল জযীয়া ফিল আখলাক আল মারযিয়া ইতাদি গ্রন্থের রচয়িতা। কাব্য চর্চায় তার বিশেষ দক্ষতা ছিলো। তার দুটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হলো–

يارب جدلى اذا ماضمنى جدثى * برحمة منك تنجينى من النار

احسن جوارى اذا امسيت جارك فى * لحدى فانك قد اوصيت بالجار

১. হে আমার রব, যখন কবর আমাকে দিনে নেবে তখন তুমি আমার জন্য রহমত উজার করে দিবে। যাতে আমি জাহান্নাম থেকে নাযাত পেতে পারি।

২. কবরে আমি যখন তোমার প্রতিবেশি হবো তখন আমার সঙ্গে সুপ্রতিবেশির মতো আচরণ করো কারণ, প্রতিবেশি সম্পর্কে তুমি উপদেশ দিয়েছো।

হামযা ইবন আসআদ ইবন আলী ইবন মোহাম্মাদ আল তাযীযির পিতা হলেন আল আমীদ। তিনি ছিলেন ভালো লেখক। পাঁচশ পাঁচ হিজরীতে তার মৃত্যু পর্যন্ত চারশ চল্লিশ হিজরী পরবর্তী ঘটনাবলীর ইতিহাস রচনা করে যান।

আমির কবির ফারিদ্দীন আতওয়াী

আল মুসতারেবি মিশরীয় অঞ্চলের আতআবিক। সর্বপ্রথম ইনি ছিলেন ইবনে ইয়াহানের দাস। এরপর তিনি সালেহ আউয়ুবের দান হন এবং তিনি তাকে আমির বানান। অতঃপর মুসাফরের রাজত্বে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সৈন্যদের প্রধান হন। তিনি নিহত হলে আমিরদের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ হয় কর্তৃত্ব লাভের জন্য। তাই আততায়ী বাদশা যাহিরের আনুগত্য করেন এবং সৈন্যরাও অনুসরণ করেন। বাদশা যাহির এটা জানতেন এবং তা তিনি তুলেননি। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বাদশা যাহিরের নিকট তার মর্যাদা খর্ব হয়। এই বৎসর কায়রোয় তার মৃত্যু হয়।

শায়তা আব্দুল্লাহ ইবন গাদীন

ইবন আলী ইবন ইবরাহীম ইবন আযতাবীর ইবনুল হুসাইন আল মাগদোনী। নাবুলসে তার একটা খানকা আছে। তার উন্নত মানের কিছু কবিতা আছে। আর তাসাউফ বিষয়ে তার শক্তিশালী বক্তব্য আছে। আল ইউনীনি তার জীবনিকে দীর্ঘ করেছেন এবং তার অনেক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। কাযী আল কুযাত কামালউদ্দিন আবুল যাতার উপর ইবন বিন্দার ইবন উযর ইবনে আলী আল তাফলিসী আল শাফেঈ। ছয়শ এক হিজরী সনে তাফলিযে তার জন্ম হয়। ইনি ছিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তি, দক্ষ বিচারক এবং ফিকহের মূলনীতি বিষয়ে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘ

দিন তিনি বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন নায়েব হিসাবে। অতঃপর হালাকুখানের রাজত্ব কালে স্বতন্ত্র বিচারক হয়। তিনি ছিলেন সাধু-সজ্জন, অধিক সন্তান আর স্বল্প সম্পদ সত্ত্বেও তিনি দারস দানের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেননি। তাদের শাসনকালের অবসান ঘটলে কিছু লোক তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে কায়রো গমন করতে বাধ্য করে। তথায় অবস্থান করে রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তেকাল পর্যন্ত মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। আল কারাফা আল যোবরায় তাকে দাফন করা হয়।

ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন শাকের ইবন আব্দুল্লাহ

আল তানুখি। আর তানুখ কাযাআ অঞ্চলের একটা স্থান। ইনি ছিলেন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব নামর দাউদ ইবন আল মুয়াযমান এর জন্য ইনি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেন। মুরী হাসপাতাল ইত্যাদির দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার জীবন চরিত্র ছিলো প্রশংসনীয়। অনেকেই তার প্রশংসা করেন। তার বয়স ছিলো আশি বছরের বেশি। তাঁর কয়েকটা কবিতা উল্লেখযোগ্য।

خاب رجاء امرى له امل * بغير رب السماء قد وصله

ايبتغى غيره اخو ثقة * وهو ببطن الاحشاء قد كفله

وله ايضا:

خرس اللسان وكل عن * اوصافكم ماذا يقول وانتم وما انتم

الامر اعظم من مقالة قائل * قد تاه عقل ان يعبر عنكم

العجز والتقصير وصفى دائما * والبر والاحسان يعرف منكم

১. আসমানের পালনকর্তার পরিবর্তে অপরের নিকট যে ব্যক্তি আশা-পোষণ করে তার আশা ব্যর্থ হবে। অথচ সেই তাকে একত্র করেছে।

২. সে কি তাকে ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সত্ত্বাকে অন্বেষণ করে। অথচ তিনি তো নাড়ির ভিতর তার প্রতিপালন করেছে।

৩. যবান বন্দি হয়েছে এবং তোমাদের গুণপনা বর্ণনা করতে অক্ষম হয়েছে। সে কি বলে? আর সে নিজে কি আর তোমরা তো আছো তো আছেই।

৪. বিষয়টা বক্তার বক্তব্য থেকে অনেক বড়ো। আর জ্ঞান বুদ্ধি তা ব্যক্ত করতে অক্ষম।

৫. অক্ষমতা আর ত্রুটি আমার স্থায়ী গুণ। আর মঙ্গল ও কল্যাণ তোমাদের থেকে জানা যায়।

আল ফিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা ইবন মালেক

শায়খ জামালুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মালেক আবু আব্দুল্লাহ আল তায় আল হায়াতি আল নাহবী। অনেক প্রসিদ্ধ ও উপকারি গ্রন্থ রচয়িতা। সে সব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আল কাফিয়িয়া, আল শাফিয়া এবং তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আরো আছে তাসহীল গ্রন্থ ও তার ব্যাখ্যা এ ছাড়া আছে আল ফিয়া গ্রন্থ যার ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন তার পুত্র বদরুদ্দিন। এটি অনেক উপকারী গ্রন্থ। হিজরী ছয়শ সনে হাব্বান নামক স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন হালব

অঞ্চলে অবস্থান শেষে দামেস্কে আগমন করেন। ইবন খাল্লিকানের সাথে অনেক সাক্ষাত করতেন এবং অনেকে তার প্রশংসা করেন। কাযী বদরুদ্দিন ইবন বুযাদা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি শায়েখ আলামুদ্দিন আল বারযানীকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দেন। ইবন মালেক দামেস্ক নগরীতে বারো রমযান বুধবার রাত্রে ইন্তিকাল করেন এবং কাযী ইযযুদ্দিন আল শায়খের কবরস্থানে 'কাসিউন'- এ তাকে দাফন করা হয়।

আল নাসির আল তুসী

মোহাম্মাদ আল আব্দুল্লাহ আল তুসী, তাকে মাওলা নাসিরউদ্দিনও বলা হয় এবং খাযা নাসিরউদ্দিন ও বলা হতো। যৌবনে তিনি জ্ঞান অর্জন মনোনিবেশ করেন এবং পূর্ববর্তীদের জ্ঞান ভালভাবে অর্জন করেন। তার এ সম্পর্কে 'ইলমুল কালাম' রচনা করেন এবং ইবন সীনা আল ইশরাত গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'আল মৃত' দুর্গের অধিপতি হন এবং হালাকু খানের উজির হন। বাগদাদ অভিযানকালে তিনি হালাকু খানের সঙ্গে ছিলেন। কিছু লোক মনে করে যে, হালাকু খানকে তিনি ইঙ্গিত করছিলেন বাগদাদের খলীফা (মুস্তাসিম বিল্লাহকে) হত্যা করার জন্য। আল্লাহ ভালো জানেন। অবশ্য আমার মতে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন কাজ করতে পারেনা। বাগদাদের কোনো ব্যক্তি এই ঘটনা উল্লেখ করে এ জন্য তার প্রশংসা করেছেন। উক্ত ব্যক্তি তাকে বিশিষ্ট, বিজ্ঞ এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে উল্লেখ করেন। সাদ্দাম অঞ্চলে মুসা ইবন জাফর এর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ গোরস্থানটি প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো খলীফা নাছির মেদিনিল্লাহ এর জন্য। আর তিনি যারা এ অঞ্চলে মান মন্দির নির্মাণ করেন এবং তথায় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কালাম শাস্ত্রবিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শ্রেণির গুণীজনকে নিয়োগ করেন। বাদশা সেখানে নিজের জন্য তথায় একটা বড় গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং সেখানে প্রচুর গ্রন্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। একই ব্যয়বার যিলহজ্জ ৭৫ বৎসর বয়সে বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার অনেক উন্নত কবিতা আছে। মূলত তিনি যুক্ত ছিলেন আল মুইন সালেম ইবন বিদ্যনার ইবন আলী নামে পরিচিত। মিশরের জনৈক মুতাযিলা পন্থি শিয়ার সঙ্গে। উক্ত ব্যক্তি তার উপর গভীর প্রণের বিস্তার করেন, এমনকি তার ধর্ম বিজ্ঞানে বিকৃতি সাধন করেন।

শায়খ সালেম আল বারকী

আল বারাকা আল সুগরায়। ইনি ছিলেন খানকার অধিপতি। ইনি ছিলেন সৎ ও ইবাদত গুজার। তাকে দেখা এবং তার দোয়া দ্বারা বরকত হাসিলের জন্য অনেকের তার দ্বারে উপস্থিত হতেন। তার তরিকা অনুযায়ী অনেক শিষ্য আজও প্রসিদ্ধ।

হিজরী ৬৭৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৪ সন)

এই বৎসর সুলতান তেরোজন আমীর সম্পর্কে জানতে পারেন, যাদের মধ্যে কাযকার আলহামারীও ছিলেন। যারা তাতারীদেরকে পাত্র মারফত মুসলিম দেশে হামলা চালানোর জন্য আমন্ত্রণ জানায় তারা একথাও নিয়ে দেয় যে, সুলতানের বিরুদ্ধে তারা তাতারীদের সঙ্গে থাকবেন। ফলে, তাদেরকে পাকড়াও করা হয় এবং তারা একথাও স্বীকার করে। দূতদের সঙ্গে

তাদের পত্রও আসে আর এটা ছিলো বাদশার সঙ্গে তাদের শেষ সাক্ষাত। আর এ বৎসর সুলতান সৈন্য সামন্ত নিয়ে অগ্রসর হয় এবং একুশ রমযান সোমবার নগরীতে প্রবেশ করে বিপুল জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে যাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এছাড়া জন্তু জানোয়ার এবং বিপুল মূল্যবান সম্পদ লুণ্টন করে নামমাত্র মূলে তা বিক্রয় করে। অতঃপর বিজয়ের বেশে যিলহজ্জ মাসে দামেস্ক নগরীতে ফিরে আসেন এবং নতুন বৎসর শুরু হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। আর একই বৎসর মুসেল অধিবাসীদের উপর বালির হামলা হয় যাতে দিগন্ত বালিতে ছেয়ে যায় এবং তারা এ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট কাতর ফরিয়াদ জানাবার জন্য গৃহত্যাগ করে। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করেন। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন। এরপর এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন :

ইবন আতা আল হানাফী

কাযী আল কুযাত শামসুদ্দিন আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন শায়খ সরফুদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে আতা ইবনে হাসান ইবন আতা ইবন যুবাইর ইবন জাবের ইবন ওয়াহাইব আল আযরায়ী আল হানাফী। ৫৯৫ হিজরীতে তার জন্ম হয়। হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইমাম আবু হানিফার (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন এবং দীর্ঘদিন শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দানের ক্ষেত্রে নায়েব হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কাযীর স্বতন্ত্র পদ লাভ করেন। ইনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি চার মাযহাবের কাযী নিযুক্ত করেন। জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধানকালে সুলতান ইচ্ছা করেন তিনি যেন তার মাযহাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেন তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন এই সব সম্পদ মালিকদের অধিকারে আছে তাতে হস্তক্ষেপ করা কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয় এ বলে তিনি এজলাস ত্যাগ করে চলে যান। এর ফলে সুলতান ভীষণ যুদ্ধ হন। অতঃপর তার রাগ প্রশমিত হলে তার প্রশংসা করেন। এবং বলেন কেবল তার সূত্রেই নির্দেশ লিপিবদ্ধ করো। ইবন আতা ছিলেন দুনিয়াত্যাগী উত্তম আলেমদের অন্যতম এবং একান্ত বিনয়ী ব্যক্তি। তার সূত্রে ইবন জুম'আ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি বারযালীকে হাদীয় বর্ণনার অনুমতি দেন। জুমাদাল উলা মাসের নয় তারিখ শুক্রবার তিনি ইন্তিকাল করেন এবং কাসিউনের অদূরে আল মুয়াবেনিয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

বায়মান্দ ইবন বায়হান্দ ইবন বায়মান্দ

আবরান্স তারাবলীস আল ফারানসী। তার দাদা ছিলেন বিনতে সায়হালের নায়েব। যিনি হিজরী ৫০০ সালের দিকে ইবন আম্মার এর হাত থেকে তারাবলীস বা ত্রিপলি নগরী উদ্ধার করেন। ইনি কোনো এক দুর্গম দ্বীপদেশে বাস করতেন।

অতঃপর তিনি নগর অধিকার করে নেন। অতঃপর তার পুত্র এবং প্রপুত্র স্বতন্ত্রভাবে উক্ত অঞ্চলের অধিপতি হন। আর ইনি ছিলেন অতীব সুদর্শন ব্যক্তি। কুতুবুদ্দীন আর ইউনিনি বলেন আমি তাকে ছয়শ আটান্ন হিজরী সনে বলাবাক শহরে দেখতে পেয়েছি। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কুতুবগানুন এর নিকট আগমণ করেন। এ সময় তিনি তার কাছ থেকে বাআলা বাক শহর ফেরত নেয়ার ইচ্ছা করেন কিন্তু মুসলমানদের নিকট এটা কঠিন ঠেকায়। মৃত্যুর পর

ত্রিপলির গীর্জায় তাকে দাফন করা হয়। কিন্তু হিজরী সনে মুসলমানরা যখন তা বিজয় করে নেয় তখন তারা তার কবর খনন করে কবর থেকে তার মৃতদেহ বের করে আবর্জনাস্তুপ কুকুরের জন্য নিক্ষেপ করে।

হিজরী ৬৭৪ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৫ সন)

এই বৎসর আট জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার তাগরিয়া ত্রিশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে আল কায়রো অঞ্চলে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে পনের হাজার ছিল মোঘল এবং পনেরো হাজার ছিল রোমক। আর সকলের অগ্রভাগে ছিলেন আল বারওয়ানা তাতারী নৃপতি আব্বাস খানের নির্দেশ অনুযায়ী। আর তাদের সঙ্গে ছিলো মুসলমান এবং কুর্দি সৈন্যরাও এবং তারা সেখানে তেইশটি মিনযানিক স্থাপন করে। আর আল কায়রো অঞ্চলের অধিবাসীরা রাত্রিবেলা বের হয়ে তাতারী সৈন্যদের ওপর হামলা চালায় মিনযানিকের অগ্নি সংযোগ করে এবং অনেক কিছু নিয়ে যার এবং নিরাপদ নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়। উপরোক্ত মাসের উনিশ তারিখ পর্যন্ত সৈন্যরা উপরোক্ত শহরে অবস্থান করে। অতঃপর ক্ষোভ নিয়ে তারা ফিরে আসে। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং পরাক্রমশালী (সূরা আহযাব আয়াত ২৫)। সুলতান যখন আল কায়রো অঞ্চলে সৈন্যদের মধ্যে ছয় লক্ষ দিনার খরচ করেন। অতঃপর তিনি দূত হিসেবে বের হন এবং তার সঙ্গে ছিলেন পুত্র সাঈদও। পথিমধ্যে তিনি জানতে পারেন যে, তাতারীরা সেখান থেকে প্রস্থান করেছে তখন তিনি দামিস্কে ফিরে আসেন। অতঃপর রজব মাসে কায়রো অভিমুখে রওনা হন এবং আঠারো তারিখ কায়রো নগরীতে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি পঁচিশ জন দুতকে তার জন্য অপেক্ষমান দেখতে পান। তারা তার সঙ্গে সাক্ষাত করে কথা বলে এবং তার সম্মুখে মৃত্তিকা চুম্বন করত সারস্বরে দূর্গে প্রবেশ করেন। আর বারওয়ানা যখন রোম দেশে ফিরে আসেন তখন বড় বড় আমির যাদের মধ্যে ছিলেন সরফুদ্দিন মাবুদ এবং জিয়াউদ্দিন মাকুসদ। এরা উভয়ে ছিলেন আল হারির পুত্র। আমিন উদ্দিন মীকাঈল ও হুসামুদ্দিন মিযান এবং তার পুত্র বাহাউদ্দিন এরা সকলে শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা বাদশা যাহিরের পক্ষে এবং আবগা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এই মর্মে তারা বাদশা যাহিরকে লিখিত নিশ্চয়তা দেন। তারা আরো নিশ্চয়তা দেন যে, তারা তাতারীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করবেন এবং তাদের প্রতি যত সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব তা প্রেরণ করবেন। আর গিয়াসউদ্দিন কানযারী যথাস্থানে বহাল থাকবেন এবং তিনি রোম সরকারের সিংহাসনে বসবেন।

আর এ বৎসর বাগদাদবাসীরা তিন দিন ধরে বৃষ্টির জন্য নামায আদায় করে কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। আর এ বৎসর রমযান মাসে দিনের বেলা জনৈক নারী পুরুষকে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পেলে ফৌজদারি বিধি অনুযায়ী আলাউদ্দিন তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ দেন। বাদগাদ নগরী পতনের পর কাউকে এভাবে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়নি। ঘটনাটি বিরল এবং ব্যতিক্রমধর্মী। একই বৎসর দামেস্কবাসীরাও বৃষ্টির জন্য নামায আদায় করে দু'বার। রজব মাসের শেষ এবং শা'বান মাসের শুরুতে। আর সময়টা ছিলো জানুয়ারি মাসের শেষের

দিক। কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। আর এ বৎসর সুলতান 'দানকালা' অভিমুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করলে তারা সুদানী সৈন্যদেরকে পরাজিত করে। এবং তাদের অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দি করে এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ লুন্টন করে। ফলে, একজন দাসের মাথা বিক্রি করা হয় তিন দিরহাম। আর তাদের বাদশা দওদা নাওবা অঞ্চলের শাসনকর্তার নিকট আশ্রয় নেয়। তিনি নিরাপদে বাদশা যাহিরের নিকট প্রেরণ করেন। আর বাদশা যাহির দানকালাবাসীদের উপর জিযিয়া আরোপ করেন যা প্রতিবছর তার কাছে প্রেরণ করা হবে। আর এসব ঘটনা ঘটে এ বছর শা'বান মাসে।

আর এ বৎসর বাদশা যাহিরের পুত্র বাদশা সাঈদের বিবাহ আমির সাইফুদ্দিন ফালাউন আলফির কন্যার সঙ্গে শাহী মহলে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের মোহরানা ছিলো পাঁচ হাজার দিনার। এর মধ্যে নগদ পরিশোধ করা হয় দুই হাজার দিনার। মহিউদ্দিন ইবন আব্দুল বাহির বিবাহ পড়ান এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। তাকে একশত দিনার এবং খিলাফত দান করা হয়। অতঃপর সুলতান দ্রুত আরোহণ করে আল কারক দূর্গে গমন করেন এবং সেখানে যে সব কিমরিয়া বর্তমান ছিলেন যাদের সংখ্যা ছিলো হয়তা তাদেরকে সমবেত করেন। সুলতান তাদের ফাসির আদেশ দিলে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। ফলে, সুলতান তাদেরকে মুক্তি দিয়ে মিশরে নির্বাসনে পাঠান। তাদের সম্পর্কে সুলতান জানতে পারেন যে, দূর্গে যারা আছে তাদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে এবং এভাবে তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এবং শামসুদ্দিন রেদওয়ান গুছইলির নিকট দূর্গ হস্তান্তর করতে চায়। অতঃপর মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনি দামেস্কে ফিরে আসেন এবং মাসের আঠারো তারিখ শুক্রবার তিনি শহরে প্রবেশ করেন। আর এ বৎসর খালাত অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় এবং তা বিলাদে বকর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ বৎসর যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে আছেন।

শায়খ, ইমাম এবং আল্লামা

আল আদিব তাজউদ্দিন আবুস খানা মাহমুদ ইবন আবেদ ইবন আল হুসাইন ইবন মোহাম্মদ ইবন আলী তামিনী আল ছারকখাদী আল হানাফী। ফিকহ এবং আরবি সাহিত্যে ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সততা, স্বচ্ছতা, চিত্তের পরিচ্ছন্নতা এবং উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হিজরী সনে তার জন্ম হয়। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনা করেন এ বৎসর রবিউল আখের মাসে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে সূফীদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

শায়খ ইমাম ইমাদুদ্দিন আব্দুল আযীয ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল কাদির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন খলিল ইবন মাখলাদ আল আনসারী আল দামেস্কি। ইনি ইবনুস সাবেক নামে পরিচিত ছিলেন। আর রাবিয়া মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এবং দূর্গে হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং ভালো হিসাব জানতেন। তিনি হাদীস শ্রবণ এবং বর্ণনা করেন। তাকে কাসিউন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঐতিহাসিক ইবনুস সাঈ

তাজউদ্দিন ইবন আল মুহতাসির ইবনুস সাঈ নামে খ্যাত। বাগদাদের অধিবাসী বলতে ৫৯৩ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইতিহাস বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয়ে দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। আর ইবন নাযযা মৃত্যুকালে তার প্রতি ওসীয়াত করে যান তারিখে কবির নামে একটা গ্রন্থ আছে যার বেশির ভাগ অংশ আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া তার আরো উপকারী গ্রন্থ আছে। তিনি সর্বশেষ দুনিয়াত্যাগীদের সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। যাকি উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ বিন হাবীব আল কাতেব তার গ্রন্থে লিখেছেন।

ما زال تاج الدين طول المدى * من عمره يعتق فى السير
فى طلب العلم وتدوينه * وفعله نفع بلا ضير
علا على بتصانيفه * وهذه خاتمة الخير

১. তাজউদ্দিন সারা জীবন সফরে সোজা গমন করেছেন।

২. জ্ঞান অন্বেষণ আর তা সংকলনে তার কর্ম নিঃসন্দেহে কল্যাণকর।

৩. আর তিনি তার গ্রন্থ রচনায় আমার উপর স্থান করে নিয়েছেন। আর এটা হচ্ছে শুভ সমাপ্তি।

হিজরী ৬৭৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৬ সন)

এই বৎসর মুহাররম মাসে সুলতান দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন এবং সৈন্যরা হালব অঞ্চলে অগ্রসর হয়। সৈন্যরা যখন সেদিকে অগ্রসর হয় তখন তারা আমির বদরুদ্দিন মোতাবেক এক হাজার অশ্বারোহীসহ আল বালাসতিন অঞ্চল অভিমুখে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি একদল রোমক সৈন্যের সাক্ষাত পান এবং তিনি অশ্বারোহণ করে সেদিকে ছুটে যান এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যান। তাদের একদল মুসলিম দেশে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। ফলে, তাদের একদল বায়যার' এবং ইবনুল খাজির অঞ্চলে প্রবেশ করে। তাদেরকে কায়রো প্রবেশের অনুমতিদান করলে বাদশা সাঈদ তাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। আর এই বৎসর পাঁচ জুমাদাল উলা তদীয় পুত্র মালেক সাঈদের বিবাহ উপলক্ষে ওলিমার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, ইতিপূর্বে বালাউনের কন্যার সাথে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। এই উপলক্ষে সুলতান এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ সময় সৈন্যরা পাঁচ দিনব্যাপী খেলা-ধুলার আয়োজন করে। এক দল সৈন্য অপর দলের উপর অভিযান চালায়। অতঃপর আমির উমরা এবং বড় বড় পদের অধিকারীদেরকে বিশেষ খিলাফতদানে ভূষিত করেন আর এই খিলাফতের মোট পরিমাণ ছিলো তেরশ। এবং শাম দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও খিলাফতে ভূষিত করার জন্য নির্দেশ আসে। এ উপলক্ষ্যে সুলতান এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন এবং তাতে সাধারণ অসাধারণ এবং নবাগত ও প্রবীন সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হন। আর এতে তাতারী এবং ফিরিঙ্গীদের দূতকে উপস্থিত হতে বারণ করা হয়। এদের সকলেই ছিলেন বিস্ময়কর খিলাফতের অধিকারী। আর সময়টা ছিলো সমাবেশের উপযুক্ত। আর

হিমাস্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন এবং মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য মিশর গমন করেন। আর রবীউল আওয়াল মাসের এগারো তারিখ কা'বা শরীফের গিলাফ এবং মহমল কায়রোয় প্রদীক্ষণ করা হয়। আর দিনটি ছিল সকলের উপস্থিত হওয়ার অর্থাৎ, শুক্রবার দিন।

আল বালাসতিন যুদ্ধ ও কায়সারিয়া বিজয় সুলতান সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে সতেরো সাওয়াল দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তথা থেকে গমন করে যিলকদ মাসের শুরুতে হালব অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং সেখানে এক দিন অবস্থান করত তথাকার নায়েবকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন হালবের সৈন্যদেরকে ফুরাতের মিনার রক্ষার কাজে নিয়োজিত করেন। সুলতান রওয়ানা করে একদিনের অর্ধেক সময় দরবন্দ অঞ্চল অতিক্রম করেন। আর পথিমধ্যে সানকার আল আশকার তিন হাজার মঙ্গলবাহিনী নিয়ে হামলা চালায়। তিনি নয় যিলকদ বৃহস্পতিবার তাদেরকে পরাজিত করেন এবং সৈন্যরা পর্বতে আরোহণ করে এবং তারা আল বালাসতিন অঞ্চলের রাস্তার কাছাকাছি এসে যায়। তারা তাতারীদেরকে দেখতে পায়। তারা নিজদের সৈন্যদেরকে সুসজ্জিত করে নিয়েছে। আর তারা ছিলো এগারো হাজার লড়াকু সৈন্য। আর রোমক সৈন্যরা তাদের পদে একাকার হয়ে যাওয়ার আশংকায় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর উভয় বাহিনী যখন পরস্পরকে দেখতে পায় তখন তাতারীদের মাইসারা' বাহিনী ওদের উপর হামলা চালায় এবং সুলতানের পতাকাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। আর তাদের একদল ভিতরে প্রবেশ করে পতাকাকে লাঞ্ছিত করে। অতঃপর তারা মাইমানা বাহিনীর প্রতি গমন করে। সুলতান এ অবস্থা দেখে তিনি নিজে এবং তার সঙ্গীরা মুসলমানদের অনুগমন করে। তিনি যখন মাইসারা বাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন দেখতে পান যে, তা ধ্বংসের সম্মুখীন তখন তিনি একদল আমিরকে নির্দেশ প্রদান করেন তার সঙ্গে গমন করার জন্য। তখন সৈন্য সামন্ত একজোট হয়ে তাতারীদের উপর হামলা চালায় এবং তাদের প্রতিটি সৈন্য বাহনের পৃষ্ঠ থেকে নিচে অবতরণ করে মুসলমানদের সঙ্গে প্রাণপন লড়াই করে। আর মুসলমানরা অটুট ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়। ফলে, আল্লাহ তার সাহায্য প্রেরণ করেন মুসলমানদের উপর এবং সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তাতারীদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে এবং তাদের অনেককে হত্যা করে। এ উপলক্ষ্যে একদল মুসলমানও নিহত হয়। এ সময় মুসলমানদের যে সব সরদার নিহত হন তাদের মধ্যে ছিলেন আমির যিয়াউদ্দিন ইবন খাতির, সাইফুদ্দিন কায়মাস, সাইফুদ্দিন বানযু আল তাসকির এবং ইযযুদ্দিন আইবক শাকফী। আর মঙ্গলবাহিনীর একটা দলকে বন্দি করা হয়। এছাড়া একদল রোমককেও আটক করা হয়। আর আল বারওয়ানা পলায়ন করে প্রাণে বেঁচে যান এবং যিলক্বদ মাসের বারো তারিখ ভোর বেলা কায়সারিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করেন। আর রোমক আমিররা বালসতিনে তাতারীদের পরাজয় সম্পর্কে তাদের আমিরকে অবহিত করেন তারা পরাজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করলে তাদের পরাজয় ঘটে এবং তারা পরাজিত হয়ে অঞ্চল খালি করে দেয়। ফলে, বাদশা যাহির তথায় প্রবেশ করেন এবং সাত যিলকদ সেখানে জুমার নামায আদায় করেন। সেখানে তার নামে খুতবা দেন এবং বিজয়ের বেশে তথা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর দেশে দেশে সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুমিনরা

আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হয়। আর আবগা খান এই যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরেও তিনি নিজে উপস্থিত হন এবং সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধস্থল প্রত্যক্ষ করেন এবং সকল বাহিনীর নিহত ব্যক্তিদের পতনের দৃশ্য অবলোকন করেন। আর এতে তিনি ক্ষিপ্ত হন এবং এটাকে বেশ বড় ঘটনা বলে জ্ঞান করেন এবং তিনি আল বারওয়ানার পতি ক্ষুব্ধ হন কারণ তিনি তাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেননি। আর তিনি বাদশা বাহিরের ব্যাপারটাকে এত সব বিষয় থেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করতেন। কায়সারিয়াবাসীদের প্রতি তার ক্রোধও তীব্র হয়। এর ফলে তিনি সেখানে প্রায় দু'লাখ লোককে হত্যা করেন। আবার কারো কারো হাতে তিনি কায়সারিয়ায় পাঁচ লাখ লোককে হত্যা করেন। আর আনুমানিক পরিমাণ রোমকদেরকেও হত্যা করা হয়। আর নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কাযী জালালউদ্দিন হাবীর ও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন।

শায়খ আবুল ফজল ইবন শায়খ ওবাইদ ইবন আবদুল খালেক দামেস্কি। শায়খ আরসালান এর নিকট তাকে দাফন করা হয়। শায়খ আলামউদ্দিন বলেন তিনি নিজে বলতেন যে, ৫৬৪ হিজরী সনে তার জন্ম হয়েছে।

তাওয়াযি ইয়ামান আল হাবজী

হারাম শরীফের খাদেমদের শায়খ। তিনি ছিলেন দ্বীনদার, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যবাদী সত্তর এর দশকে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

শায়খ মুহাদ্দিস শামসুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর আল মুসলী আল দামেস্কি আল সুফী। তিনি অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিরাট বিরাট গ্রন্থ স্পষ্ট ও শানদার লিপিতে লিপিবদ্ধ করেন। তার বয়স ছিলো সত্তরের অধিক। বাবুল ফরদিসে তাকে দাফন করা হয়।

কবি শিহাবউদ্দীন আবুল মাবনরিম

মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবন মাসউদ ইবন বারকা ইবন সালম ইবন আব্দুল্লাহ সায়বানি তালাফোরি। ইনি কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা। আশি সালের অধিক বয়সে হিম্মাত অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। কবিরা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন এবং কাব্যচর্চায় তার অগ্রগামিতা মেনে নিতেন। এখানে তার দুটি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

لسانى طرى منك يا غاية المنى * ومن ولهى انى خطيب وشاعر

فهذا المعنى حسن وجهك ناظم * وهذا الدمعى فى تجنيك ناشر

১. হে আমার চরম আকাঙক্ষা, আমার যবান স্মরণে সিক্ত, আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমি খতিব এবং বক্তা।

২. এর অর্থ এই যে, তোমার চেহারার দীপ্তির কারণে আমি কবিতা লিখি আর তোমার প্রেমে আমার অশ্রু প্রবাহিত হয়।

কাযী শামসুদ্দীন আলী ইবন মাহমুদ ইবন আলী ইবন আসেম শহরযুরি দামেস্কি। কিমরিয়া মাদরাসার জন্য সম্পদ ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী তিনি এ মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। ওয়াকফের শর্ত অনুযায়ী তার পরবর্তীকালে সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাদানের যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবে। তিনি এই বৎসর মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত এই মাদরাসায় শিক্ষা দান করেন। তার পরে তা পুত্র সালাউদ্দিন শিক্ষা দান করেন। অতঃপর ইবন জুম'আর পর তার নাতি এ দায়িত্ব পালন করেন। আর নাতির শিক্ষাদানের মেয়াদ ছিল দীর্ঘ। ইবন খাল্লিকানের প্রতিনিধি হিসাবে বেলায়াতে উলায়" শামসুদ্দিনকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রে বিজ্ঞ এবং মাযহাব বিষয়ে দক্ষ। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। ইবনুল আদিমের সঙ্গে তিনি বাগদাদ সফর করেন এবং তথায় হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইবন সালার নিকটে সূফীদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ সালেহ আলেম ও যাহিদ

আবু ইসহায ইবরাহীম ইবন সাদুল্লাহ ইবন জুমতনা ইবন আলী ইবন জুমআ ইবন হাযিম ইবন সানযার আল কেনানি আল হাযাবি। তিনি ছিলেন ফিকহ এবং হাদীসে দক্ষ। ৫৯৩ হিজরী সনে হিমাত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং তথায় আমলা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। ফখর ইবন আসাকির নিকট তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তার পুত্র কাযী আল কুখ্যাত বদরুদ্দিন ইবন জুমআ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

শায়খ ছালেহ জুদুল ইবন মোহাম্মদ আল বাহিনী। তিনি ছিলেন ইবাদত গুজার, দুনিয়াত্যাগী এবং নেক আমলের অধিকারী। দলে দলে লোক তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসতো মিনীন অঞ্চলে। তিনি অপরিচিত শব্দে অধিক কথা বলতেন যা উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কেউ বুঝতো না। তার সম্পর্কে শায়খ তাজউদ্দিন বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে বলতে শুনেছেন: কোন ব্যক্তির বিনয় প্রকাশ আর নিজেকে ছোট করে উপস্থাপন করা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তিনি তাকে আরো বলতে শুনেছেন: বিচলিত ব্যক্তি আল্লাহর পথ থেকে দূরে থাকে। অথচ যে নিজেকে মনে করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বলে। যে যদি জানতো যে, আল্লাহ থেকে সে দূরে আছে তবে সে যে অবস্থায় আছে তার থেকে ফিরে আসতো। কারণ, কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৎ পথে অটল থাকতে পারে। তিনি আরো বলতেন: 'ছামা' হলো বাতিল পন্থিদের ওযীফা। শায়খ তাজউদ্দিন বলেন, শায়খ জুনদুল ছিলেন তরীকত পন্থি বিজ্ঞ আলিমদের অন্যতম। বর্ণনাকারী বলেন, ছয়শ একষট্টি হিজরী সনে তিনি আমাকে বলেন যে তিনি পঁচানব্বই বছর বয়সে পৌঁছেছেন। আর আমি অর্থাৎ, গ্রন্থকার বলি এই হিসাবে তার বয়স একশ বছর অতিক্রম করে। কারণ, এ বৎসর রমযান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন আর মানীন জনপদের প্রসিদ্ধ আস্তানায় তাকে দাফন করা হয়। দামেস্ক এবং তার আশপাশ থেকে দীর্ঘদিন যাবত তার কবর যেয়ারত করার জন্য আগমন করে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

মোহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন মোহাম্মদ আন, হাফিয বদরুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ ইবন মাবিয়া আস সুনামী আল হানাফী। তিনি দদর বুলাইযান এবং ইবন আতার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং আরবি ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করেন এবং আরবি ব্যাকরণে জ্ঞান অর্জন

করেন মালেক থেকে। জ্ঞান অর্জনে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং পদ্য ও গদ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। শিবশিয়া এবং কাসাআইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দানে নিয়োজিত হন। কাযীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। মারেফাত সংক্রান্ত কবিতা রচনা করেন। মৃত্যুর পর জনৈক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন:

ماكان لى من شافع عنده * غير اعتقادى انه واحد

"তিনি একজন আমার এই বিশ্বাস ছাড়া আল্লাহর নিকট আমার সুপারিশকারী আর কিছু ছিল না।" জুমাদাল উখরা মাসে তার ইন্তেকাল হয় এবং দামেস্কের বাহিরে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব ইবন মনসুর

শাহসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ আল হাররানী আল হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি কাযী তাজউদ্দিন বিনতুন আয়ায এর প্রতিনিধি হিসাবে মিশরীয় অঞ্চলে বিচার-ফয়সালা করেন। অতঃপর শামসুদ্দীন ইবনে মায়খ আল ইবাদ তবে প্রতিনিধি হিসাবে বিচারকের দায়িত্ব স্বতন্দ্রভাবে গ্রহণ করেন এবং তিনি তাকে নায়েব নিযুক্ত করেন। পরে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে শাম দেশে ফিরে যান এবং সেখানে জ্ঞান চর্চা এবং ফতওয়া দানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার বয়স ছিলো সত্তরের বেশি। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী ৬৭৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৭ সন)

এই কসর বাদশা বাহির রুকুনুদ্দিন বায়বারম মৃত্যুবরণ করেন। যিনি ছিলেন মিশরীয় অঞ্চল শাম দেশ এবং হালাব ইত্যাদি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তারপর তিনি তদ্বীয় পুত্র নাসির উদ্দিন আবুল মাআলী মোহাম্মদ বরকাখান যার উপাধি ছিলো আল সাঈদকে নিযুক্ত করেন। আর এ বৎসর সাত মুহাররম শাফেঈ মাযহাবের ইমাম শায়খ মহিউদ্দিন নবী ইন্তেকাল করেন আর সুলতান যাহির রোম অঞ্চল থেকে আগমন করে বানাসতিন অঞ্চলে তাতারীদেরকে পরাজিত করেন এবং বিজয়ীর বেশে দামেস্কে নগরীতে প্রবেশ করেন। এ দিনটি ছিল শুক্রবার। দামেস্ক নগরীতে আবলাপ্রু প্রাসাদে তিনি অবস্থান করেন। দামেস্কের পশ্চিম দিকে দুটি সবুজ প্রান্তরের মধ্যস্থলে এ প্রাসাদটি তিনি নির্মাণ করেন। এ সময় তিনি ক্রমাগত সংবাদ পান যে, আব্বাজান যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। তিনি অপ্রতি দৃষ্টিপাত করে মোগলদের মধ্যে নিহত ব্যক্তিদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং রুয়ানাতকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন যে, তিনি আহ দেশে গমন করার সংকল্প করেছিলেন তখন আমীদেরকে সমবেত করে তাদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। ফলে, আমীররা সকলে একমত হয়ে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আর তিনি প্রাসাদের সম্মুখ ভাগে সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর খবর আসে যে, আবগা খান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে, তখন তিনি ঐ সংকীর্ণ পথ নির্মাণের নির্দেশ প্রত্যাহার করেন। ফলে, তিনি আবলাপ্রু প্রাসাদে অবস্থান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমির উমরারা

সানন্দে তার সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হয়। অবশ্য আবগাযান রাওয়ানাতকে হত্যার নির্দেশ দেন। আর তিনি ছিলেন রোথ দেশে তার প্রতিনিধি। আর তার নাম ছিলো মঙ্গনুদ্দিন সুলাইমান ইবন আলী ইবন মোহাম্মদ ইবন হামান। তিনি হত্যার নির্দেশ এ কারণে দেন যে, তার বিরুদ্ধে বাদশা যাহিরের সাহায্য করার অভিযোগ করেছেন এবং তিনি ধারণা করেন যে, রোম অঞ্চলে প্রবেশ করা খুবই শোভন করে দেখিয়েছেন। আর রওয়ানা ছিলেন বীর। বাহাদুর, বিচক্ষণ এবং দানবীন ব্যক্তি। আর বাদশা যাহিরের প্রতি তার আকর্ষণ ছিলো। নিহত হওয়ার সময় তার বয়স ছিলো পঞ্চাশের অধিক।

অতঃপর পনেরই মুহাররম শনিবার বাদশা বাহারউদ্দিন আব্দুল মালেক ইবন সুলতান মুয়াযযম ইশা ইবন আদেল আবু বকর ইবন আইউব ৬৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ হৃদয়, উত্তম চরিত্র, মিষ্টিভাষী এবং অতিব বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি আরবদের পোশাক-আশাক এবং তাদের বাহনের ব্যাপারে কষ্ট স্বীকার করতেন আর শাসনকার্যেও তিনি ছিলেন সাহসী এবং অগ্রগামী। আর তিনি ইবন লাইসীর সূত্র বর্ণনা করেন এবং আল বারযানীকে বর্ণনা করার অনুমতি দেন। কথিত আছে যে, তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। আর অন্যরা বলে যে, বাদশা যাহির পান পাত্রে তাকে বিষ প্রয়োগ করেন। আর বাদশা যাহির তাকে সে পান পাত্র ধারণ করেন এবং তিনি তা পান করেন। অতঃপর সুলতান বিশ্রাম স্থানের দিকে গমন করেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে সাকী আল কায়েহেরের হস্ত হতে পান পাত্র গ্রহণ করে তা পূরণ করতে সুলতান যাহিরের হাতে তুলে দেন। আর ঘটনা যা ঘটেছে সাকী সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা সুলতানকে পান পাত্র সম্পর্কে ভুলায়ে দেন অথবা তিনি ধারণা করেন যে, এ পান পাত্র অন্যটা। ঘটনাটি ঘটে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী। আর পান পাত্রে সেই বিষের বিরাট অংশ বর্তমান ছিলো। পান পাত্রে যা ছিলো বাদশা যাহির অজ্ঞাতসারে তা পান করেন আর পান করা মাত্রই তার উদরে গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে তৎক্ষণাত তিনি অস্থিরতা, উষ্ণতা এবং ভীষণ কষ্টবোধ করেন। আর আল কায়ে হরকে তার অবস্থান স্থানে পৌঁছানো হয়। বাসায় পৌঁছে আরহায় অবস্থায় সেই রাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর বাদশা যাহির এ কারণে কিছু দিন অসুস্থ থাকেন। অবশেষে ২৭ মুহাররম বৃহস্পতিবার যোহরের পর আরলাক প্রাসাদে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মুত্যুর দিনটি বাদশার সভাসদের জন্য কঠিন ছিল। এই উপলক্ষ্যে সাম্রাজ্যের অস্থায়ী কর্মকর্তা ইহাউদ্দিন আইদমার এবং বড় বড় কর্মকর্তা উপস্থিত হন। সত্যি সঙ্গোপনে তারা বাদশার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তার মৃতদেহ একটা সিন্দুকে ভরে সুর দূর্গে নিয়ে যায় এবং সেখানে একটা সামুদ্রিক গৃহে কিছু সময়ের জন্য রাখা হয়। অবশেষে তার লাশ কবরে স্থানান্তর করা হয়। বাদশার পুত্র তার মৃত্যুর পর তার জন্য এই কবর প্রস্তুত করেন। আর এটা ছিল আল আদিলিয়া আল কাবিয়ার বিপরীতে দারুল আকিকী। একই বৎসর ৫ই রজব শুক্রবার রাত্রে তার লাশ দাফন করা হয়। তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। ফলে সাধারণ মানুষ তা জানতে পারে না। অবশেষে রবিউল আউয়ালের শেষ দশক উপস্থিত হয় এবং তদ্বীয় পুত্র সাঈদের জন্য মিশর থেকে বায়াতের খবর আসে। এ সময় লোকেরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করে এবং তার জন্য রহমতের দোয়া করে। আর

দামেস্কে বাই'য়াত নবায়ন করা হয়। আর সিরিয়ার মায়ের ইযুদ্দিন আইদ মায়ের নিকট সব পর্যায়ে শাম দেশের কর্তৃত্বের নির্দেশ পৌছে।

আর বাদশা মাহির ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী, বীর বাহাদুর, অসীম সাহসী, ধীর স্থির এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় কাজে যত্নবান এবং ইসলামের অনুরাগী শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ভূষিত ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য তার সদিচ্ছার অভাব ছিল না। রাষ্ট্রের গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখায় তিনি যত্নবান ছিলেন। আর ১৭ যিলক্বদ শনিবার ৬৫৮ হিজরী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ ৬৭৬ হিজরী) তার রাজত্ব বা শাসনকার্য অব্যাহত থাকে। আর এ সময়ে তিনি অনেক বিজয় লাভ করেন। বিজিত অঞ্চলের মধ্যে কায়সারিয়া, আরসূন, ইয়াফা, শাকীফ, ইনতাকিয়া, ইয়ারাজ, তাবারিয়া, আল কাছির ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি জয় করেন কুর্দি দূর্গ আক্কা দূর্গ, আল গারি হাফিনা ইত্যাদি দূর্গ যা ছিল ফিরিঙ্গীদের করতলগত। আর এসব দূর্গ ছিল দূর্ভেদ্য। ইসমাইলিয়ার নিকট কোন দূর্গই বিজয় না করে তিনি ছাড়েননি। আর আল মারকাব, বানইয়াস, আনতারসুস নগরী এবং ফিরিঙ্গীদের অধিকারভুক্ত অন্যান্য নগরী এবং দূর্গ আধা-আধি ভাগ করে নেন এবং নিজের অর্ধেক অংশের জন্য তিনি কর্মকর্তা এবং প্রশাসক নিয়োম করেন এবং রোম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কায়সারিয়া দূর্গ অধিকার করে নেন। বালারতিমের রোমক এবং মোগলদের সঙ্গে তিনি এমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন যেমন যুদ্ধের কথা দীর্ঘ শীস অঞ্চলের শাসনকর্তার নিকট থেকে অনেক অঞ্চল অধিকার করে নেন এবং তাদের গৃহ আর দূর্গে গুপ্তচরের মতো প্রবেশ করেন এবং অধিকৃত মুসলিম দেশ থেকে বা বালাবাক, বছরা ছালখাদ, হিমছ, আজলুন, ছালত, তাদসুর, রাহবা, তিন এবং বাগল ইত্যাদি অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। ছাড়া ও তিনি জয় করেন আল কারক ও তনাল শাবিক অঞ্চল। সুদানিদের অধিকার থেকে নওবা অঞ্চল তিনি সম্পূর্ণ উদ্ধার করেন। এ ছাড়া তিনি তাদের নিকট থেকেও অনেক শহর ছিনিয়ে নেন। এ সবের মধ্যে রয়েছে শেরযুল এবং বায়রা অঞ্চল। আর তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয় ফোরাত অঞ্চল থেকে নওবা অঞ্চলের দূর-দুরান্ত পর্যন্ত। তিনি অনেক দূর্গ নির্মাণ করেন। অনেক পার্বত্য অঞ্চল আবাদ করেন এবং বড় বড় নদীর উপর পুল নির্মাণ করেন এবং আল জাবাল দূর্গে তিনি স্বর্ণ দ্বারা একটা গৃহ নির্মাণ করেন এবং ১২ স্তম্ভের উপর স্বর্ণ দিয়ে একটা গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং সেই গম্বুজে অনেক চিত্রকর্ম অংকিত করেন এছাড়া তিনি অনেক নহর খনন করেন এবং মিশরীয় অঞ্চলে অনেক নদী নালা প্রবাহিত করেন । এই সবের মধ্যে ছদাস নহর উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি অনেক প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। এবার মসজিদে নববী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি তা পুনঃর্নির্মাণ করেন এবং হুজরা শরীফের আশ-পাশে লৌহ বেষ্টনী নির্মাণ করেন। আর তথায় একটা মিম্বর নির্মাণ করেন যার ছাদ ছিলো স্বর্ণের এবং মদিনা শরীফের হাসপাতালগুলো নবায়ন করেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কবর নতুন করে নির্মাণ করেন। এবং তার এককোণে পথচারীদের অবস্থান স্থল তিনি সংযোগ করেন। আর হযরত মুসা (আ)-এর কথিত কবরে গম্বুজ নির্মাণ করেন। আর এই গম্বুজ নির্মাণ করেন আরিহা অঞ্চলের বিপরীত দিকে। আর আল কুদুস তথা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে তিনি অনেক সংস্কার সাধন করেন। এ সবের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সিলসিলা গম্বুজ। এবং ছখরার ছাদ ইত্যাদি সংস্কার করের এবং আল কুদস এর মামলা নামক

স্থানে একটা বিরাট সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং মিশরে ফাতেমী খলীফাদের প্রাসাদ তথায় স্থানান্তর করেন এবং সেখানে একটা চাক্কি, একটা চুলা, এবং একটা বাগান নির্মাণ করেন। আর তথায় আগমনকারীদের জন্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখার ব্যবস্থা করেন। সংস্কার কাজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে এইসব অর্থ ব্যয় করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আর তিনি আমতানা এর নিকট হযরত আবু হুরায়রার কবরে মাজার নির্মাণ করেন। এবং তথায় আগমনকারীদের জন্য বিভিন্ন বস্তু ওয়াকফ করেন। এছাড়া তিনি দানিয়া সেতু নির্মাণ করেন এবং আল কারকের দিকে হযরত জাফর হাইয়ারের কবর পুনর্নির্মাণ করেন এবং কবর জিয়ারতকারীদের জন্য অনেক কিছু ওয়াকফ করেন। এছাড়া তিনি ছাফত দূর্গ এবং জানে জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। বিশেষ করে রাযলায় তিনি মসজিদ সংস্কার করেন এবং ফিরিঙ্গীরা যেই সব মসজিদ ইত্যাদি ক্ষতি সাধন করে তিনি সেগুলো সংস্কার করেন। এছাড়া তিনি হালব তথা আলেপ্য অঞ্চলে এক প্রকাণ্ড গৃহ নির্মাণ করেন। উপরন্তু দামেস্ক নগরীতে আবলাক প্রাসাদ; যাহেরিয়া ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তদুপরি জনগণের সুবিধার্থে খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা দিরহাম, দিনার মুদ্রা চালু করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি এমন অনেক নিদর্শন এবং সাদৃশ্য স্থান নির্মাণ করেন যেমন ইতিপূর্বে খলীফা এবং বনু আইউবের রাজা বাদশাদের শাসন আমলেও নির্মিত হয়নি। আর তিনি সেনাবাহিনীকে বহুমুখী কাজে ব্যবহার করেন। তার নিকট প্রায় তিন হাজার মোঘল আগমন করলে তিনি তাদেরকে জায়গীর দান করেন। তাদের অনেককে আমীর নিয়োগ করেন। আর খাওয়া দাওয়া এবং বস্ত্র পরধিানের ক্ষেত্রে তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। আর তার সৈন্যরা ও অনরূপ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। আর আব্বাসীয়াদের চিহ্ন মুছে যাওয়ার পর তিনি নব পর্যায়ে তাদেরকে পুনরুজ্জীবীত করেন। প্রায় তিন দশক তারা কোন খলীফা বা শাসনকর্তা ছাড়া জীবন অতিবাহিত করে। আর তিনি প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র প্রধান বিচারক বা কাজী নিযুক্ত করেন। এই সব বিচারকরা ছিলেন বিচক্ষণ, সাহসী এবং বুদ্ধিমান। দুশমনদের সম্পর্কে তারা দিবা-রাত্র সতর্ক থাকতেন, কোন রকম ত্রুটি করতেন না। বরং ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের দুশমনদের সঙ্গে সতত সংঘাত মুখর থাকতেন। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা তাকে শেষ সময় ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করেন। ফলে ফিরিঙ্গী, তাতারী এবং মুশরিকদের গলার হাড্ডির মতো বাঁধেন। তিনি মদ্যপান রহিত করেন এবং পাপাচারীদেরকে দেশ ত্যাগে নির্বাসিত করেন। কোথাও কোনো বিকৃতি এবং বিপর্যয় দৃষ্টিগোচর হলে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি রোধ করার চেষ্টা করতেন। তার জীবন চরিত্র সম্পর্কে আমরা যেসব ঘটনা উল্লেখ করেছি যাতে তার সুন্দর চরিত্র এবং আচরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর তার সেক্রেটারী ইবনে আব্দুয যাহের তার বিকৃত জীবন চরিত্র লিপিবদ্ধ করেন। অনুরুপভাবে ইবনু সাদ্দাদ ও তার জীবন চরিত্র প্রণয়ন করেন। তিনি দশজন সন্তান রেখে যান যাদের মধ্যে তিনজন ছিল পুত্র এবং সাতজন ছিলো কন্যা সন্তান। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ৫০ এবং ৬০ এর মাঝামাঝি। তিনি অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি ছাড়াও অনেক দান-দক্ষিণা করে যান। আল্লাহ তার নেক আমলগুলো কবুল করুন এবং তাঁর মন্দ কাজগুলো নিশ্চিহ্ন এবং ক্ষমা করুন। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

আর তারপর তদ্বীয় পুত্রে সাইদ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং পিতা তার জীবদ্দশায় সন্তানের পক্ষে বাইআত গ্রহণ করেন। শাসনভার গ্রহণ করার সময় সাঈদের বয়স ছিলো বিশ বছরের কম। এ সময় তিনি ছিলেন সুদর্শন এবং পরিপূর্ণ যুবক। তনার এ বৎসর সফর মাসে আলফানস এর পক্ষ থেকে দূতদের মাধ্যমে দিয়ারে মিশরে উপঢৌকন পৌঁছে। তারা এসে দেখতে পায় যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবং তদস্থলে তদ্বীয় পুত্র সাঈদকে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এর ফলে শাসনকার্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং রাষ্ট্রের পরিচয় ও বদলে যায়নি। অবশ্য রাষ্ট্র তার সিংহকে হারায়। বরং এমন ব্যক্তিকে হারায় যিনি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাজে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আর যখন ইসলামের কোনো কার্যক্রমে কোনো ফাটল দেখা দেয় তখন তিনি তা বন্ধ করেন। আর যখন দৃঢ়তার কোন গিট খুলে যায় তিনি তাকে শক্তভাবে বাঁধেন। আর যখন নীচ শ্রেণির মধ্যে কোনো বিদ্রোহী দল ইসলামের আশ্রয়স্থলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তিনি তা প্রতিহত করে বিদ্রোহী দলকে হটিয়ে দেন। মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন তার দয়া দ্বারা। তার কবরকে সিক্ত করুন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা ও আশ্রয় নির্ণয় করুন।

আর সিরীয়বাহিনী দিয়ারে মিশর অভিমুখে গমন করে। তাদের সঙ্গে ছিল একটা পালকি। তারা এ কথা প্রকাশ করছিল যে, অসুস্থ সুলতান পালকিতে পড়ে আছেন। অবশেষে তারা কায়রো পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তারা সত্যাশ্রয়ী বাদশার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করার পর সাঈদের জন্য নতুন করে বাইআত গ্রহণ করে, যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় শহীদ হবেন আর সফর মাসের ২৭ তারিখ শুক্রবার মিশরীয় অঞ্চলের সমস্ত মসজিদে বাদশা সাঈদের জন্য খুতবা পাঠ করা হয় এবং তার পিতা বাদশা যাহিরের জন্য দোয়া করা হয়। এ সময় তার চক্ষু অশ্রু বিগলিত হয়। আর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময় বাদশা সাঈদ অভ্যাস অনুযায়ী মিশরীয় সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করেন, সৈন্যরা ছিল তার দু'পাশে; সামনে পিছনে পুরোপুরি। তিনি এই অবস্থায় লাল পর্বত পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তাকে দেখে লোকজন ভীষণ আনন্দিত হয়। এ সময় তার বয়স ছিল উনিশ বৎসর। তখন তার অবস্থা ছিল রাজকীয় শৌর্য-বীর্যে ভরপুর তা থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল শাসন-কর্তৃত্ব। আর চার জুমাদাল উলা রোজ সোমবার আমীর শামসুদ্দিন আকসনকর আল ফারকানী মাদরাসার কায়রো উদ্বোধন করা হয়। এই মাদরাসা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী উজিরয়া মহল্লায় চালু করা হয় এবং উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদীস এবং ক্বারী নিয়োগ দেয়া হয়। আর এর একদিন পর খলীফার পুত্র আল মুসতামসিক বিল্লাহ ইবন আল হাকীম বিআমরিল্লাহর খলীফা মুসতানসির ইবন যাহিরের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং তার পিতা, সুলতান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং ৯ জুমাদাল উলা রোজ শনিবার তিনি দারুল আফিকি নামে একটা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এটি প্রাসাদ আল আদেলিয়া প্রাসাদের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিলো। এটাকে মালেক যাহিরের মাদরাসা এবং খানকা করার উদ্দেশ্যে ছিলো। ইতিপূর্বে সেখানে কেবল দারুল আকিকি ছিলো, যা ছিলো আকিকির হাম্মামখানার নিকটে। আর ৫ জুমাদাস সানী মাদরাসা এবং খানকার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

আর এ বৎসর রমযান মাসে ছফত নগরীতে এক বিরাট ঝড় বয়ে যায়, যার ফলে প্রচণ্ড বিদ্যুতের ঝলক সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে এবং তা থেকে এক ভয়াবহ শব্দ শোনা যায়। এর ফলে ছফত অঞ্চলের মিনারের উপর বিদ্যুতের চমক পড়ে। এর ফলে মিনারে এমন ফাটল উপর থেকে নিচে পর্যন্ত দেখা দেয়; যেই ফাটলে হাত পর্যন্ত প্রবেশ করানো যায়। এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে ছিঁলেন মুহাররম মাসের প্রথম দশকে আল বরওয়ানা এবং একই মাসের শেষ দশকে মৃত্যুবরণ করেন বাদশা যাহির। আর তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

আমীর কবির বদরুদ্দিন বেলবেক ইন আবদুল্লাহ

মিশরীয় অঞ্চলে বাদশা যাহিরের প্রতিনিধি। তাঁর ডাক নাম আল খানাদার। তিনি ছিলেন প্রসংশনীয় দাতা ব্যক্তি। ইতিহাস এবং মানববংশ সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলো। জামে আযহারে শাফেঈ মাযহাব সম্পর্কে ইলমে দারস দান করতেন। কথিত আছে যে, তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর বাদশা সাঈদের রশি খুলে যায় এবং তার অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করে।

কাযী আল কুখাত হাম্বলী

মোহাম্মদ ইবন শায়খুল ঈসাদ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন আব্দুল ওয়াহেদ বিন আলী ইবন সারওয়ার আল মাবদেসী মিশরীয় অঞ্চলে ইনি প্রথম হাম্বলী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইনি বিশেষভাবে আলী ইবনে তবরযাতের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। পরবর্তীকালে বাগদাদ নগরী গমন করত তথায় ফিকহ শাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বহুবিধ জ্ঞানের পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং তিনি সাঈদ আস সুহাদার শায়খ হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শায়েখ, সুদর্শন পুরুষ, অতিশয় বিনয়ী, নেক্‌কার এবং অনেক দান-দক্ষিণাকারী বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি শর্তারোপ করেন যে, এজন্য তিনি কোনো পারিশ্রামিক গ্রহণ করবেন না। যাতে মানুষের মধ্যে যথাযথ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বাদশা যাহির ৬৭০ হিজরী সনে তাকে কাযীর পদ থেকে বস্কিার করেন এবং তার নিকট যেসব আমানত ছিলো সেজন্য তাকে বন্দী করেন। দুবৎসর পর তাকে মুক্ত করেন। এরপর তিনি কেবল গৃহে অবস্থান করেন এবং সালেহিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন এবং মুহাররম মাসের শেষের দিকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত শিক্ষাদান কাজে প্রবৃত্ত থাকেন। তদ্বীয় চাচা হাফেয আব্দুল গনীর কবরের নিকট আল মাকতাম পর্বতের পাদেশে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি আর বারযানীকে অনুমতি দিয়ে যান। হাফেয আল বারযানী বলেনঃ বারো রবিউল আউয়াল শনিবার মিশরীয় অঞ্চল থেকে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর খবর আসে। তারা হলেন সানকার আল বাগদাদী, বাসতা আল বাগদী আল মুসতারী, বদরুদ্দিন আল উজিরী, সানকার আল রুমী এবং আক সানকার আল ফারকানী। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন।

শায়খ খিযির আল কুর্দি মালেক যাহিরের শায়খ খিযির ইবন আবু বকর ইবন মুসা আল কুদি আল না হরওয়ানী আল আদবী। কথিত আছে যে, ইনি ছিলেন মূলত ইবন মুর দ্বীপের মোহাম্মাদিয়া জনপদের অধিবাসী। তার সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর কথাও বর্ণিত আছে। কিন্তু

তিনি যখন জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করেন তখন কোন কোন আমিরের কন্যার কারণে তিনি পরীক্ষায় নিপতিত হন। তিনি বাদশা যাহির সম্পর্কে বলতেন, যখন তিনি আমির ছিলেন অদূর ভবিষ্যতে তিনি বাদশা হবেন। এই কারণে বাদশা যাহির তাকে অনেক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর অতিমাত্রায় তার প্রতি সম্মান দেখাতেন এবং সপ্তাহে দু'একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। বিভিন্ন সফরে তাকে সঙ্গী করতেন। বাদশা তার সঙ্গে সময় কাটাতেন তাকে সম্মান করতেন এবং তিনিও বাদশাকে মতামত জানাতেন এবং সঠিক মুকাশাফা দ্বারা পরামর্শ দিতেন। এইসব মুকাশাফা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে হতো। এই সময় তার অবস্থা হতো ভিন্ন রকম। কিন্তু যখন তিনি জনগণের সঙ্গে মিশেন তখন কোন কোন আমীরের কন্যা দ্বারা ফেতনায় পতিত হন। এইসব কন্যারা তার সঙ্গে পর্দা না করার ফলে তিনি ফেতনায় পড়েন। আর সাধারণত অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রে খুব কমই নিরাপদ থাকতে পারে। বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করে নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য নিরাপদ থাকা কঠিন। ঘটনা যা ঘটার তার ঘটে যাওয়ার পর বাদশার নিকট অভিযোগ করা হলে তিনি অপরাধ স্বীকার করেন। ফলে বাদশা তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেন, তখন তিনি বলেন তোমার এবং আমার মধ্যে কেবল কয়েকটা দিন বাকি আছে। ফলে বাদশা তাকে আটক করার নির্দেশ দেন। ফলে ৬৭১ হিজরী থেকে ৬৭৪ হিজরী সন পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হয়। এই সময় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে একটা গির্জা ধ্বংস করেন এবং গীর্জার পাদ্রীকে হত্যা করত গীর্জাকে খানকায় পরিণত করেন। ইতিপূর্বে এই ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। এর তিনি কারাগারে আটক থাকেন। অবশেষে একই বছর ছয় মুহাররম বৃহস্পতিবার দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তার নাম দুর্গ থেকে বের করে স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং নিজের তৈরি করা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো ৬০ বছরে বেশি। আর তিনি কোন কোন ব্যাপারে বাদশাকে মুকাশাফার মাধ্যমে অবহিত করতেন। পর্বতের টিলায় পশ্চিম প্রান্তে তার নামে মাজার স্থাপিত আছে। এছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাসেও তার নামে খানকা আছে।

শায়েখ মহিউদ্দিন নববী

ইয়াহহিয়া ইবন শরফ ইবন হাসান ইবন হোসাইন ইবন জুমআ ইবন হাযাম আল হাযেমি আল আলিম মহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া নববী অতঃপর দামেস্কি। শাফেঈ মাযহাবের অনুযায়ী এই মনীষী ছিলেন মহাজ্ঞানী এবং তার সময়ের অন্যতম বড় ফকীহ। হিজরী ৬৩১ সনে নাওয়া গ্রামে তার জন্ম হয়। নাওয়া হুবানের একটি জনপদের নাম। ৬৪৯ হিজরী সনে তিনি দামেস্কে আগমন করেন। প্রথমে কুরআন মাজীদ হিফয করেন। অতঃপর তিনি তাম্বী নামক গ্রন্থ পাঠ শুরু করেন এবং কথিত আছে যে, সাড়ে চার মাস সময়ের মধ্যে এ গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। এরপর বছরের অবশিষ্ঠ সময় বিভিন্ন মাযহাবকে ইবাদাত সম্পর্কিত বিষয়ের এক চতুর্থাংশ পাঠ সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি সংশোধন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের জন্য শায়খদের নিকট অবস্থান করেন। তিনি প্রতিদিন শায়খদের নিকট বারোটি দারস গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কিছু গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন এবং কিছু গ্রন্থ সমাপ্ত করতে পারেননি। যে সব গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন মুসলিম শরীফের

ব্যাখ্যা, কিতাবুর রওজা, কিতাবুল মিনহায, রিয়াদুস সালেহীন, কিতাবুল আসগার, কিতাবুত তিবইয়ান, তাহরীকুত তাম্বী ও তার সম্পাদনা, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, তাবাকাযুন ফুকাহা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। আর যে সব গ্রন্থ রচনা তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শরহুল মুহাযযাব তিনি যার নামকরণ করেছেন আল মাজমা। এই গ্রন্থে তিনি সুদ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে যে পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেছেন এক কথায় তাকে বলা যায় অন্যান্য। এ গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করেন। এতে তিনি ফেকহী মাযহাব ও ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। দুবোধ্য শব্দের অর্থ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তার সম্মুখে যা উদ্ভাসিত হয় তার সারাংশ তিনি এই গ্রন্থে উপস্থাপন করেন। ফিকহী বিষয়ে এর চেয়ে বেশি চমৎকার গ্রন্থ রচিত হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও তাকে আরো অনেক কিছু যোগ করার আছে। অসমাপ্ত গ্রন্থগুলো তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারলে তা হতো রীতিমত তুলনাহীন। ইবাদত, দুনিয়া ত্যাগ, খোদা ভীতি, অনুসন্ধিৎসা এবং নির্জনাসের ক্ষেত্রে তার বিরাট ভূমিকা ছিলো। কোন ফকীহ এইসব ক্ষেত্রে তার ধার কাছেও ঘেঁষতে পারেননি। তিনি সারা বৎসর রোযা রাখতেন। তিনি বিবিধ তরকারী একত্র করতেন না অর্থাৎ, একবেলা দু'তিরকারী দিয়ে আহার করতেন না। তার অধিকাংশ খাবার নাওয়া গ্রাম থেকে পিতা তার জন্য নিয়ে আসতেন। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকানের প্রতিনিধি হিসাবে ইকবালিয়ায় তিনি পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেন। অনুরূপভাবে তিনি হালাকিয়া এবং আল রুকনিয়ার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন তদুপরি তিনি দারুল হাদীস আল আশরাফিয়ার শায়েখের দায়িত্ব পালন করেন। এক মুহূর্ত সময়ও তিনি অপচয় করতেন না। দামেস্কে অবস্থানকালে তিনি হজ্জও সম্পন্ন করেন শাসকবর্গকে তিনি ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করতেন। এ বৎসর চব্বিশ রযব দিবাগত রাত্রে নাওয়া গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন। নাওয়া গ্রামে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন এবং তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো বড়জোর পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

আলী ইবন আলী ইবন ইস্পানদিয়ার :

নাযমুদ্দিন আল ওয়ায়েয। দামেস্কের জামে মসজিদে শনিবার দিন তিন মাসব্যাপী তিনি ওয়ায করতেন। তিনি ছিলেন মুজহাদিয়া খানকার শায়খ বা প্রধান। এই বৎসর সেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার দাদা খলীফা নাসেরের জন্য খুতবা লিখে দিতেন। মূলত তিনি ছিলেন বুশনায-এ জন্মগ্রহণকারী। এখানে তার কবিতায় কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে–

اذا زار بالجثمان غيرى فاننى * الزور مع الساعات ربعك بالقلب

وماكل ناء عن ديار بنازح * ولاكل دان فى الحقيقة ذو قرب

যখন আমি ছাড়া অপর কেহ দেহ দর্শন করে তখন আমি পলে পলে মনে-প্রাণে তোমার গৃহ দর্শন করি। আর যে কেউ গৃহ থেকে দূরে অবস্থান করে সে যেমন দূরগামী হয় না, তেমনি নিকটে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তি সত্যিকারভাবে নিকটবর্তীও হয় না।

হিজরী ৬৭৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৮ সন)

এ বৎসরের প্রথম দিন ছিল বুধবার। এই সময় আব্বাসী খলীফা ছিলেন হাকীম বিতানামবিল্লাহ এবং সিরিয়া ও মিশর চলের শাসনকর্তা ছিলেন বাদশা সাঈদ। মুহাররম মাসের প্রথম দিকে দামস্কে নগরীতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে সাত বৎসর কাল পদচ্যুত থাকার পর ঐতিহাসিক ইবন খাল্লেকান যিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে পুনরায় দামেস্ক নগরীর কাযীর পদ গ্রহণ করেছেন। ছয় মুহাররম কাযী ইযযুদ্দীন আস সায়েগ বিচারকার্য থেকে বিরত থাকেন এবং ইবন খাল্লিকানকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে জনতা বের হয়ে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রামলা নগরী পর্যন্ত পৌঁছে এবং তেইশ মুহাররম বৃহস্পতিবার তিনি নগরীতে প্রবেশ করেন। আর বাদশার সহকারী ইযুদ্দীন আইগামার আমীর উমরা এবং দলবল নিয়ে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য বের হয়ে আসেন। এতে জনতা আনন্দিত হয় এবং কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট ফিকহবিদ শামসুদ্দীন মোহাম্মাদ ইবন জাফর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

لما تولى قضاء الشام حاكمه * قاضى القضاة ابو العباس ذو الكرم

من بعد سبع شداد قال خادمه * ذا العام فيه يغاث الناس بالنعم

কঠিন সাত বৎসর পর মহান কাযী আল-কুয়াত আবুল আব্বাস যখন শামদেশের বিচারের ভার গ্রহণ করেন তখন তার খাদেম বলেন, এই বৎসর নিয়ামতের মাধ্যমে জনগণ ফরিয়াদ জানাবে। আর সা'দউল্লাহ ইবনে মারওয়ান আল ফারিকী বলেন–

اذقت الشام سبع سنين جدبا * غداة هجرته هجرا جميلا

فلما زرته من ارض مصر * مددت عليه من كفيك نيلا

তুমি শামদেশকে সাত বৎসর দুর্ভিক্ষের স্বাধ আস্বাদন করায়েছ, আর যেদিন ভোরে তুমি শামদেশে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো। শামদেশ ত্যাগ করেছো ভালভাবে। আর যখন মিশর দেশ থেকে তুমি এসেছো শামদেশ দর্শন করতে তখন তুমি উভয় হস্ত দ্বারা তাকে দানে ধন্য করেছো। অপর এক কবি বলেন–

رايت اهل الشام طرا * ما فيهم قط غير راض

نالهم الخير بعد شر * فالوقت بسط بلا انقباض

وعوضوا فرحة بحزن * قد انصف الدهر التقاضى

وسرهم بعد طول غم * بدور قاضى وعزل قاضى

وكلهم شاكر وشاك * بحال مستقبل وماض

তুমি শামবাসীদেরকে দেখেছো সকলে আনন্দিত, তাদের মধ্যে কেউ কখনো অসন্তুষ্ট নয়। অমঙ্গলের পর মঙ্গল তাদের নোগাল পেয়েছে, ফলে এই সময়টা হয়েছে বিস্তৃত কোন সংকোচন ব্যতীত। আর তাদেরকে দেওয়া হয়েছে দুঃখের বদলে আনন্দ আর যমানা ইনসাফ করেছে বিচারকার্যে। আর দীর্ঘ দুঃখের পর তাদেরকে আনন্দিত করেছে কাযীর আগমন ও নির্গমন। আজ তাদের সকলেই শোকর আদায় করছে, আবার সকলেই সন্দেহ পোষণ করছে ভবিষ্যতের

বিষয় চিন্তা করে। আল ইউনিলী বলেন, তের সফর বুধবার তিনি যাহেরিয়ায় দারস শুরু করেন। এতে উপস্থিত হন রাষ্ট্রের অস্থায়ী কর্মকর্তা আইসামার যাহিরি। আর এ দারসের অনুষ্ঠান ছিল সফল এতে বিচারকরা ও উপস্থিত হন। এ অনুষ্ঠানে শাফেঈ মাযহাবের দারসদাতা ছিলেন শায়খ রশীদ ইদ্দন মাহমূদ ইবনুল ফারেকী, আর হানাফী মাযহাবের দারসদাতা ছিলেন শায়খ সদরুদ্দিন সুলাইমান হানাফী। তখন পর্যন্ত মাদরাসা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। আর জুমাদাল উলা মাসে হানাফী মাযহাবের কাযীর পদ গ্রহণ করেন সদরুদ্দিন সুলাইমান আল মাযকুর। ইনি কাযীর পদ গ্রহণ করেন মাযদুদ্দিনে ইবনু আল আদিনের পরিবর্তে তার মৃত্যুর পর। এরপর কাযীর পদ গ্রহণ করেন হুসানউদ্দিন আবুল ফাযায়েল আল হাসান ইবন আনু শেরওয়ান আল রাযী আল হানাফী। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন মালতিয়ার কাযী। আর যিলক্বদ মাসের প্রথম দশকে নখিবিয়া মাদ্রাসা উদ্ভোধন করা হয়। এ মাদ্রাসার পাঠদান অনুষ্ঠানে ইবন খাল্লিকান নিজে উপস্থিত হন। এরপর আপন পুত্র কামালউদ্দিন মুসার জন্য তিনি এ পদ ছেড়ে দেন। এ সময় নযিবিয়া খানকা উদ্বোধন করা হয় এ দুটি প্রতিষ্ঠান এবং তার ওয়াকফ সম্পত্তি অদ্যাবধি তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

আর পাঁচ যিলহজ্জ মঙ্গলবার সুলতান সাঈদ দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। তার জন্য শহরকে সজ্জিত করা হয়। তার আগমন উপলক্ষ্যে বিশাল বিশাল তাবু খাটানো হয়। শহরবাসী তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বের হয় এবং তার পিতার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য তারা ভীষণ আনন্দিত হয়। তিনি ঈদুল আযহার নামায খোলা প্রান্তরে আদায় করেন। এ উপলক্ষে আল মানসুরা দূর্গে আনন্দ প্রকাশ করা হয় এ সময় দামেস্ক নগরীতে আস সাহেল ফাতুহদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন আল কায়সারানিকে উজীর নিযুক্ত করা হয়। আর মিশরীয় অঞ্চলে বাহাউদ্দিন ইবন আল হিনার মৃত্যুর পর বোরহানউদ্দিন ইবনুল হাযার ইবনুল হাসান সানযালিকে উজীর নিযুক্ত করা হয়। আর যিলহজ্জ মাসের শেষ দশকে সুলতান আমীর সাইফুদ্দিন কানাউন আস সালেহির সাথে সৈন্যদেরকে শীশ অঞ্চল অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং সুলতান আমীর উমারাদের একটা সংক্ষিপ্ত দল এবং খানকিয়া চিন্তাধারায় ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে দামেস্ক নগরীতে অবস্থান করেন এবং তিনি অনেকবার যাম্বাকিয়া অঞ্চলে আগমন করেন। আর ছাব্বিশ যিলহাজ্জ মঙ্গলবার "বাব' আর 'নসরৎ এর অভ্যন্তরে দারুল আদল উপবেশন করেন। দামেস্কবাসীদের উপর তার পিতা বাগান খাতে নূতন করে যেসব কর আরোপ করেছিলেন তিনি তা প্রত্যাহার করেন। ফলে জনগণ তার জন্য বহুগুণ দোয়া করেন এবং তার জন্য বিপুল ভালোবাসা প্রকাশ করেন। কারণ এই কর অনেক বাগান মালিককে ধ্বংস করে দিয়েছিল আর এই করের কারণে অনেকেই দেশ ছেড়ে যাওয়ার মনস্ত করেছিল। আর একই বৎসর দামেস্কবাসীদের নিকট পঞ্চাশ হাজার দিনার দাবি করেন, যা তাদের মালিকানাধীন সম্পদের উপর দু'মাস সময়ের মধ্যে আরোপ করা হয় এবং জোরপূর্বক তাদের নিকট থেকে তা আদায় করা হয়। এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন আকুশ ইবন আব্দুল্লাহ আল আমীর আল কাবির জামালুদ্দিন নাযিবী, আবু সাঈদ সালেহি নাযমুদ্দীন আউয়ুব আল কামিল তাকে মুক্তা করে অন্যতম প্রধান আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাকে নিজ গৃহ শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত করে। তার প্রতি বিপুল আস্থা ছিল। ছয়শ নয় বা দশ হিজরীতে

তার জন্ম হয়। বাদশা যাহির ও তাকে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অতঃপর শামদেশে নয় বৎসর কাল প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখেন। তিনি সেখানে নযিবিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এজন্য বিপুল সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। কিন্তু সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য তিনি উপযুক্ত পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। অতঃপর সুলতান তাকে পদচ্যুত করত মিশরে ডেকে পাঠান। কর্মহীন অবস্থায় তিনি দীর্ঘদিন তিনি মিশরে অবস্থান করেন। অতঃপর পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চার বৎসর কাটান। এই সময় বাদশা সেবা যত্নের ব্যাবস্থা করেন অবশেষে পাঁচ রবিউল আখের শুক্রবার রাত্রে কায়রো নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আপন গৃহ দারব আল মালুকিয়ায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং শুক্রবার জুমার নামাযের পূর্বে তার নির্মিত আল কারাফা আর লুগরা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। নাযিবিয়া অঞ্চলে তিনি নিজের জন্য গোরস্থান নির্মাণ করেছিলেন। এই গোরস্থানের জানালা রাস্তার দিকে খোলা হতো কিন্তু সেখানে তাকে দাফন করা সম্ভব হয়নি। শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী এ মহান ব্যক্তি অধিক দান সদকা করতেন, আলেমদেরকে ভালোবাসতেন এবং তাদের কল্যাণ সাধন করতেন। তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতেন। সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ এবং রাফেযীদেরকে নিন্দা করার ক্ষেত্রে তিনি বাড়া-বাড়ি করতেন। তার ওয়াকফকৃত সম্পদের মধ্যে রয়েছে বাগান বাড়ি এবং ভূমি। এই সব সম্পত্তি তিনি ওয়াকফ করেন। একটা সেতুর জন্য যা বর্তমানে জামে করিমুদ্দিনের বিপরীত দিকে অবস্থিত। এ জন্য অনেক সম্পত্তি ওয়াকফ করা আছে আর এসব ওয়াকফ সম্পত্তি দেখা শোনার দাযিত্ব ন্যস্ত করেন তিনি ইবন খাল্লেকানের উপর।

আইদকীন ইবন আব্দুল্লাহ

ইনি ছিলেন মহান আমীর আলাউদ্দিন শিহাবী। বাব আল ফারাযের অভ্যন্তরে শিহাবিয়া খানকার ওয়াকফদাতা ছিলেন তিনি। আর ইনি ছিলেন দামেস্ক নগরীর অন্যতম প্রধান আমীর্ বাদশা যাহির দীর্ঘদিন তাকে হালব অঞ্চলের দায়িত্বে রাখেন। ইনি ছিলেন সর্বোত্তম আমীর এবং বীর বাহাদুরদের অন্যতম। ফকীর বা তাপশ ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ভালো ধারণা প্রকাশ করতেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। পনের রবিউল আউয়াল কাছিউন এর পাদদেশে শায়খ আম্মার রুমির কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো পঞ্চাশের কোঠায়। বাব আল ফারাযের অভ্যন্তরে তার খানকা অবস্থিত। রাস্তার দিকে এ খানকার জানালা ছিলো। শিহাবউদ্দিন রশিদ কবির সালেহির দিকে নিসবোত করে তাকে শিহাবী বলা হয়।

কাযী আল কুযাত মদরুদ্দিন সুলাইমান ইবন আবুল ইজ ইবন ওহাইব আবুর রবি আল হানাফী। ইনি ছিলেন তার সময়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারিদের শায়খ এবং প্রাচ্য প্রতীচ্যে হানাফীদের বড় আলেম। দীর্ঘকাল দামেস্ক নগরীতে অবস্থান করে তিনি ফাতওয়া এবং দারস দিতেন। অতঃপর মিশরীয় অঞ্চলে প্রস্থান করে সালেহিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দিতেন। এরপর তিনি দামেস্ক প্রত্যাবর্তন করে যাহেরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন। মাযদুদ্দিন ইবনুল আদিসের পর তিন মাসের জন্য তিনি কাযীর পদ গ্রহণ করেন্ ছয় শা'বান জুমার রাত তার ওফাত হয়। পরের দিন জুমার নামাযের পর কাসিউন-এর পাদদেশে তাকে দাফন করা

হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো তিরাশি বৎসর। এক যুবক মহান বাদশার দাসীকে বিবাহ করে। এই উপলক্ষে তার কিছু সূক্ষ্ম কবিতা পাওয়া যায় :

يا صاحبي قفالي وانظرا عجبا * اتى به الدهر فينا من عجائبه

البدر اصبح فوق الشمس منزلة * وما العلو عليها من مراتبه

اضحى يماثلها حسنا وشاركها * كفوا وسار اليها في مواكبه

فاشكل الفرق لولا وشي نمنمة * بصدغه واخضرارا فوق شاربه

হে মোর বন্ধুদ্বয় আমার জন্য একটু থামো এবং দেখ, সময় আমাদের জন্য কত বিস্ময়কর খবর নিয়ে এসেছে। চন্দ্র, সূর্যের উর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছে কিন্তু সূর্যের উপরে চাঁদের অবস্থান বেমানান। রূপের কারণে সে দাসীর প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং রুকুতে সে তার শরীক হয়েছে এবং দলবল নিয়ে তার দিকে ছুটে গেছে। যদি তার কানপট্টির উপর কারুকার্যের ধারা না থাকতো এবং তার গোঁফের উপর সবুজ রেখা দেখা না দিতো তাহলে পার্থক্য করা কঠিন হতো।

ত্বাহা ইবন ইবরাহীম ইবন আবু বকর কামালউদ্দিন হামদানী আল আরিলী আল শাফেঈ :

তিনি ছিলেন বিজ্ঞ সাহিত্যিক এবং কবি। এক বিশেষ ধরণের কবিতা রচনায় তার দক্ষতা ছিল। এই বৎসর জুমাদাল উলা মাসে মৃত্যুবরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কায়রো নগরীতে অবস্থান করেন। একবার তিনি বাদশা সালেহ আইয়ূবের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বাদশা আইয়ূব তার সঙ্গে জ্যোতি বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা শুরু করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দুইটি কবিতা রচনা করে তাকে শোনান :

دع النجوم لطرقي يعيش بها * وبالعزيمة فانهض ايها الملك

ان النبي واصحاب النبي نهوا * عن النجوم وقد ابصرت ما ملكوا

আমার রাত্রি আগমন পর্যন্ত জ্যোতি বিদ্যার প্রসঙ্গ বাদ দিল। জ্যোতি বিদ্যা নিয়েই সে জীবন যাপন করে তাই বাদশা আপনি উটে পড়ান। নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা জ্যোতি বিদ্যা চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। আর তাঁরা যা কিছুর অধিকারী ছিলেন আমি তা দেখতে পেয়েছি। শামসুদ্দিন নামে এক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে তিনি দু'টি কবিতা উল্লেখ করেন বন্ধুটি চোখের পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করার পর এ পত্র লেখেন–

يقول لي الكحال عينك قد هدت * فلا تشغلن قلبا وطب بها نفسا

ولي مدة يا شمس لم اركم بها * واية برء العين ان تبصر الشمسا

সুরমা বিক্রেতারা আমাকে বলে, তোমার চক্ষু মেরে গেছে। তাই তুমি অন্তরকে লিপ্ত করবেনা এবং এতেই তৃপ্তি লাভ করো। হে সূর্য, রাত হয়েছে সেখানে আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। আর চক্ষু পীড়া সেরে ওঠার লক্ষণ হল সূর্য দেখতে পাওয়া।

আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ

ইবন মোহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবন আফফান জামালুদ্দিন ইবনুশ শায়খ নাযমুদ্দিন আল বাদরাযীঈ আল বাগদাদী অতঃপর দামেস্কি। তিনি তার পিতার পর

তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। ছয় রযব বুধবার ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি অবস্থান করেন এবং কাছিউনের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী রইস ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার বয়স ছিলো পঞ্চাশের বেশি।

কাযী আল কয়াত মাযযুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন জামাল উদ্দিন ওমর ইবন আহমদ বিন আল আদিন আল হালবী অতঃপর দামেস্কি। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইবন আতার পর তিনি দামেস্কে হানাফী মাযহাবের কাযীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রইসের পুত্র। কায়রোর বড় মসজিদে খুতবা দানের দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী প্রথম ব্যক্তি যিনি এ পদ গ্রহণ করেন। এ বৎসর রবিউল আখের মাসে দামেস্কের জাওমাকা স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিম যাইতুনের বিপরীত দিকে অবস্থিত আল হারীরী চত্বরে তাকে দাফন করা হয়।

উযীর ইবনুল হিনা

আমী ইবন মোহাম্মদ ইবন সলীম ইবন আব্দুল্লাহ আছ ছাহেব বাহাউদ্দিন আবুল হাসান ইবন আল হিনা, মিশরীয় উযীর বাদশা যাহিরের উযীর। যিলক্বদ মাসে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাদশা যাহির এবং তার পুত্র সাঈদের উযীর ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অতীব ভাগ্যবান। আর তিনি ছিলেন দৌলতে মাহিরিয়ায় ক্ষমতাধর ব্যক্তি, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং বিচক্ষণ শাসক। তার পরামর্শ এবং মতামত নিয়ে সব কাজ সমাধা হতো। পরিষদবর্ষের উপর তার কর্তৃত্ব ছিলো। কবি সাহিত্যিকরা তার প্রশংসা করেন। আর তার পুত্র তাজউদ্দিন ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী। পরে তাকে সাঈদিয়া প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শায়খ মোহাম্মদ ইবন বাহির অভিধানবিদ মোহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উমর ইবন আহমদ ইবন আবু শাকের মাজদুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ আল আরীলী আল হানাফী। ইবন যাহির নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। আরীল অঞ্চলে ৬০২ হিজরীতে তার জন্ম হয়। অতঃপর তিনি দামেস্কে অবস্থান করেন এবং কায়মাযিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান করেন এবং বারো রবিউল আখের জুমার রাত্রে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং সূফীদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আরবি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান বিষয়ে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। কবিতা রচনায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। তার কবিতা সংকলন প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার কবিতা ছিল উন্নত মানের। এখানে তাঁর কবিতার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো–

كل حي الى الممات مابه * ومدى عمره سريع ذهابه

يخرب الدار وهي دار بقاء * ثم يبني ما عما قريب خرابه

عجبا وهو في التراب غريق * كيف يلهيه طيبه وعلابه؟

كل يوم يزيد نقصا وان عمـ * ـر حلت اوصاله اوصابه

والورى في مراحل الدهر ركب * دائم السير لا يرجى ايابه

فتزودان التقى خير زاد * ونصيب اللبيب منه لبابه

واخو العقل من يقضى بصدق * شيبته فى صلاحه وشبابه

واخو الجهل يستلذ هوى النفـ * س فيغدوا شهد الديه مصابه

প্রতিটি জীবিত মানুষকে ফিরে যেতে হবে মৃত্যুর কাছে আর তার আয়ুষ্কাল দ্রুত ফুরিয়ে যায়। সে গৃহকে ধ্বংস করে অথচ বাই চিরস্থায়ী নিবাস। অতঃপর সে নির্মাণ করে এমন গৃহ যা দ্রুত ধ্বংস হবে। বাকী অবাক কাণ্ড যে ডুবে থাকবে মাটির মধ্যে। সুগন্ধ আর দুর্গন্ধ কেমন করে তাকে বিমুখ করে? যত দীর্ঘ আয়ু সে লাভ করুন না কেন, প্রতিদিন দ্রুত তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার গ্রন্থি আর রোগ-শোক তাকে দুর্বল করে তুলছে। গোটা সৃষ্টিকুল কালের প্রবাহে এমন যাত্রীদল যা ছুটে চলছে, তার ফিরে আসার কোন আশা নেই, তুমি তুমি পাথেয় সংগ্রহ করো, কারণ আল্লাহর ভয় উত্তম পাথেয়। আর সেখানে বুদ্ধিমানের অংশ খুব সামান্যই। আর বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার সঠিক সিদ্ধান্তের মধ্যেই নিহিত আছে বার্ধক্য আর যৌবন। আর অজ্ঞ ব্যক্তি মানস কামনায় তৃপ্ত থাকে এবং ভোরে মধু তার কাছে বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তার কবিতাটি অতি দীর্ঘ। এতে একশ পঞ্চাশের বেশি শ্লোক আছে। আর শায়খ কুতুবউদ্দিন তার অনেক উত্তম কবিতা উল্লেখ করেছেন।

ইবন ইসরাঈল আল হারীরী

মোহাম্মদ ইবন সেওয়ার ইবন ইসরাঈল ইবন আল খিযির ইবন ইসরাঈল ইবনুল হাসান ইবনু আলী ইবনু মোহাম্মদ ইবনুল হুসাইন নাজমুদ্দিন আবুল মা'লী আল শায়বাদী আল দামেস্কি। ৬০৩ হিজরির বারো রবিউল আউয়াল তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শায়খ আলী ইবন আবুল হাসান মনসুর আল ইয়াসরি আল হারীরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ৬১৮ হিজরী সনে। ইতিপূর্বে তিনি শায়খ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে সিরকা গ্রহণ করেন। আর তার ধারণা মতে শায়খ তাকে তিনটি নির্জন বৈঠকে বসান। আর ইবন ইসরাঈলের মতে তার পরিবার পরিজন খালিদ ইবন ওয়ালিদের সঙ্গে শামদেশে আগমন করেন এবং দামেস্কে বসবাস করেন। কাব্য শিল্পে তিনি দক্ষ ছিলেন, চমৎকার কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু তার কথায় এবং কবিতায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা ইবনুল আরাবি, ইবনুল ফারেয় এবং তার শায়খ আল হারীরীর চিন্তা-ধারা অনুযায়ী হুলুল ও ঐক্যের প্রতি তার আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ আসল এবং তার অবস্থা ভালো জানেন। এ বৎসর রবিউল আখের মাসের চৌদ্দ তারিখ রোববার রাত্রে তিনি দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বৎসর। শায়খ রাশলানের কবরস্থানে গম্বুজের অভ্যন্তরে তাকে দাফন করা হয। আর শায়খ রাশলান ছিলেন আলী আল মুগরিলের শায়খ, শায়খ আলী আল হারীরী শায়খ ইবন ইসরাঈল যার নিকট প্রতিপালিত হন। এখানে তার কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করা হচ্ছে—

لقد عادنى من لاعج الشوق عائد * فهل عهد ذات الخال بالسفح عائد؟

وهل نارها بالا اجرع الفرد تعتلى * لمنفرد شاب الدجى وهو شاهد

نديمى من سعدى اديرا حديثها * فذكرى هواها والمدامة واحد

منعمة الاطراف رقت محاسنا * حلى لى فى حبها ما اكابد

যে আমাকে দেখতে এসেছে সে আমার সেবা করেছে ইশকের আগুনে। তবে কি পর্বতের পাদদেশে থালওয়ালা যুগ ফিরে আসবে? তার আগুন কি উষর প্রস্তরে একক ব্যক্তির জন্য উদ্ভূত হবে, যে ব্যক্তির অন্ধকার দূরীভূত করেছে আর সে নিজেই সাক্ষী। আমার সৌভাগ্যের সঙ্গী, তার কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করো, তার প্রতি আমার ভালোবাসা উচ্চারণ করা আর শরাব পান করা এক কথা। সেতো ভালো পাহারাদার। তার গুণাবলী সুমিষ্ট আর আমি যে কষ্ট স্বীকার করছি তার ভালোবাসার জন্য তা আমার কাছে মনে হয় অতি মধুর। আর পুর্নচন্দ্রের উপর তার ওড়নায় আবরণ পড়েনি। আর সূর্যের উপর নক্ষত্র পরিক্রম করেনি।

তিনি আরো বলেন–

ايها المعتاض بالنوم السهر * ذاهلا يسبح فى بحر الفكر
سلم الامر الى مالكه * واصطبر فالصبر عقباه الظفر
لا تكونن ايسا من فرج * انما الايام تاتى بالعبر
كدر يحدث فى وقت الصفا * وصفى يحدث فى وقت الكدر
واذا ما ساء دهر مرة * سر اهليه ومهما ساء سر
فارض عن ربك فى اقداره * انما انت اسير للقدر

নিদ্রার পরিবর্তে নিদ্রাহীনতাকে যে ব্যক্তি করে এবং যে ব্যক্তি নিদ্রার কথা ভুলে যায় সেতো সাঁতার কাটে চিন্তার সাগরে আর বিষয়টা তার মালিকের হাতে অর্পণ করো এবং সবর করো, সবরের পরিণতি তো সাফল্য। আনন্দ সম্পর্কে কখনো নিরাশ হবে না, কাল তো উপস্থাপন করে কেবল শিক্ষা। স্বচ্ছতার সময় পঙ্কিলতা প্রকাশ পায়। তথায় পঙ্কিলতার সময় প্রকাশ পায় স্বচ্ছতা। আর কাল যদি কখনো দুঃখ দেয় তখন আনন্দিত হয় সময়ের লোকেরা। আর যখনই দুঃখ দেয় তারা আনন্দিত হয়। সুতরাং তুমি তুষ্ট থাকো তোমার রবের প্রতি তার ভাগ্য নির্ধারণের উপর। তুমিতো কেবল ভাগ্যের হাতে বন্দি।

নবী করিম (সা)-এর প্রশংসায় তার দীর্ঘ কাসিদা আছে, শায়খ কামাল উদ্দিন ইবন জামলুকানী এবং তার সঙ্গীরা শায়খ আহমদ আ'ফাফ এর নিকট থেকে কাসিদাটি শ্রবণ করেন। আর শায়খ কুতুবউদ্দিন আল ইউনীনী তার অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দালিয়া কাসিদা। এ দীর্ঘ কাসিদা শুরু করা হয় এভাবে–

وافى لى من اهواه جهرا لموعدى * وارغم عذالى عليه وحسدى
وزار على شط المزار مطولا * على مغرم بالوصل لم يتعود
فيا حسن من اهدى لعينى جماله * ويا برد ما اهدى الى قلبى الصدى
ويا صدق احلامى ببشرى وصاله * ويا نيل امالى ويا نجح مقصدى
تجلى وجودى اذ تجلى لباطنى * بجد سعيد او بسعد مجدد
لقد حق لى عشق الوجود واهله * وقد علقت كفاى جمعا بموجدى

আমি যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় প্রকাশ্যে ওয়াদাস্থলে আর সে অপদস্থ করে আমার নিন্দুকদেরকে। সে অনেক দূরে অবস্থান করেও আগ্রহের কারণে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে। সে রূপের কথা কি আর বলবো যিনি আমার চক্ষুকে উপহার দিয়েছেন তার সৌন্দর্য। আর সে শীতিলতার কথা কি বলবো যিনি আমার হৃদয়কে তৃষ্ণা দিয়েছেন উপহার স্বরূপ।

আমার সত্য স্বপ্ন সম্পর্কে কি আর বলবো যে আমাকে তার মিলনের সুসংবাদ দিয়েছে। হে আমার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা, হে আমার উদ্দেশ্যের সফলতা। তিনি যখন সাঈদ বা সরের মাধ্যমে আমার বাতেনে তাজাল্লি প্রকাশ করেন তখন আমার গোটা অস্তিত্ব তার তাজাল্লিতে উদ্ভাসিত হয়। আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে অস্তিত্ব এবং অস্তিত্ববাদীকে ভালোবাসায় আর আমার উভয় হস্ত একত্র হয়েছে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে। অতঃপর এক দীর্ঘ গজল রচনা করেন এবং তাতে বলেন–

فلما تجلى لى على كل شاهد * وسامرنى بالرمز فى كل مشهد
تجنبت تقييد الجمال ترفعا * وطالعت اسرار الجمال المبدد
وصار سماعى مطلقا منه بدوه * وحاشى لمثلى من سماع مقيد
ففى كل مشهود لقلبى شاهد * وفى كل مسموع له لحن معبد

তিনি যখন আমার নিকট উদ্ভাসিত হলেন পূর্ণমাত্রায় এবং অতি গোপনে আমার সঙ্গে গোপন আলাপ করলেন তখন আমি দূরে সরে গেলাম সৌন্দর্যের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হতে, তার উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায়, এবং সৌন্দর্যের রহস্য আমি অবলোকন করলাম নব পর্যায়ে। আর আমার কর্ণ হলো মুক্ত তা থেকেই সূচনা হয়, আর সেখান থেকেই শুরু হয় আমার অর্গলবদ্ধ শ্রবণের। তাই আমার অনুরোধ সকল দৃশ্যের জন্য আছে এক স্বাক্ষী। আর সকল শ্রুত বিষয়ের জন্য আছে অভ্যস্থ শ্রবণনীতি।

এরপর তিনি মাশাহেদে জামাল বিষয়ে বলেন–

اراه باوصاف الجمال جميعها * بغير اعتقاد للحلول المبعد
ففى كل هيفاء المعاطف غادة * وفى كل مصقول السوالف اغيد
وفى كل بدر لاح فى ليل شعره * على كل غصن مائس العطف املد
وعند اعتناقى كل قد مهفهف * ورشفى رضابا كالرحيق المبرد
وفى الدر والياقوت والطيب والحلا * على كل ساجى الطرف لدن المقلد
وفى حلل الاثواب راقت لناظرى * بزبرجها من مذهب ومورد
وفى الراح والريحان والسمع والغنا * وفى سجع ترجيع الحمام المغرد
وفى الدوح والانهار والزهر والندى * وفى كل بستان وقصر مشيد
وفى الروضة الفيحاء تحت سمائها * يضاحك نور الشمس نوارها اندى
وفى صفو رقراق الغدير اذا حكى * وقد جعدته الريح صفحة مبرد

وفى اللهو والافراح والغفلة التى * تمكن اهل الفرق من كل مقصد
وعند انتشار الشرب فى كل مجلس * بهيج بانواع الثمار المنضد
وعند اجتماع الناس فى كل جمعة * وعيد واظهار الرياش المجدد
وفى لمعان المشرفيات بالوغى * وفى ميل اعطاف القنا المتاود

আমি তাকে দেখি জামাল এর সমস্ত গুণে বিভূষিত, দূরে সরাই নেয় এমন হলুমে বিশ্বাস করা ছাড়া। আমি তাকে দেখি সূক্ষ্ম সুদর্শন কোটিদেশ আর উজ্জ্বল ঘাড় এবং নাজুক ভঙ্গিতে। আর দেখি তাকে চন্দ্রের মধ্যে যা রাত্রিকালে নরম এবং উজ্জ্বল শাখায় চক্‌চক্‌ করে। আরো তাকে দেখি সূক্ষ্ম কোটি দেশের সাথে মিলিত হওয়ার সময় এবং শীতল শরাবের মতো মুখের লালা চুষে খাওয়ার সময়। আর দেখি মনি-মুক্তা, সুঘ্রাণ এবং অলংকারের মধ্যে, যা পতিত হয় অবনত দৃষ্টির ওয়ালার ঘাড়ে। আরো দেখি তাকে কাপড়ের ভাঁজে যা আমার চক্ষুকে শীতল করে মনি-মুক্তার দর্শনের মতো। আরো দেখি তাকে শরাব খুশবু শ্রবণ এবং গানের মধ্যে এবং কুবুতরের মতো ছন্দবদ্ধ বুলির মধ্যে। আরো দেখি তাকে বৃক্ষরাজি, নদ-নদী এবং ফুলের বাগানে এবং সুউচ্চ প্রাসাদে। আরো দেখি তাকে আকাশের নীচে খুশবুভরা বাগানে যার আলো সূর্যের আলোকেও হাসায়। আর দেখি তাকে পুকুরের পানি স্বচ্ছতায় যখন সে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করে। আর দেখি তাকে খেলা-ধুলায় এবং আনন্দে বিভোর অবস্থায়, যা সকল উদ্দেশ্য থেকে ভাবুককে মুক্ত করে। আর দেখি তাকে আসরে মদ পরিবেশনকালে যা বিভিন্ন ধরনের মনো-মুগ্ধকর ফলে সুসজ্জিত। আর দেখি তাকে জুমার দিন এবং ঈদের দিন মানুষের সমাবেশস্থলে যখন নতুন নতুন বস্ত্রের প্রদর্শনী করা হয়। আর দেখি তাকে প্রাচ্যের তরবারি ঝিলিক মারার সময় এবং তীর থেকে নেয়া নিক্ষেপকালে। এ সময় আমি তার রূপের সকল উচ্ছাস প্রত্যক্ষ করি।

আর মাযাহেরে উলুবিয়ায় তার কবিতা–

وفى الاعوجيات العتاق اذا نبرت * تسابق وفد الريح فى كل مطرد
وفى الشمس تحكى وهى فى برج نورها * لدى الافق الشرقى مراة عسجد
وفى رحمة المعشوق شكوى محبة * وفى رقة الالفاظ عند التودد
وفى اريحيات الكريم الى الندى * وفى عاطفات العفو من كل سيد
وحالة بسط العارفين وانسهم * وتحريكهم عند السماع المقيد
وفى لطف ايات الكتاب التى بها * تنسم روح الوعد بعد التوعد

আর ভালো জাতের ঘোড়ার মধ্যে যখন সে প্রান্তরে বাতাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। আর তা সূর্যের অনুরূপ হয়ে যায় যখন সে আলোর বৃত্তে অবস্থান করে এবং পূর্ব দিগন্তে তা স্বর্ণের আয়নায় পরিণত হয় আর পূর্ণ চন্দ্রে যখন সে পূর্ণ রজনীতে আকাশে উদিত হয় তখন আসমান তাকে শীসা ঢালা মহলের মতো উজ্জ্বল করে তোলে। আর নক্ষত্ররাজির মধ্যে যে নক্ষত্র তার অন্ধকারকে আলোক ধন্য করেছে যেন তা মনি-মুক্তার ফরাশে বিক্ষিপ্ত মুক্তামালা। আর বৃষ্টির মাঝে যে বৃষ্টি শুষ্ক ভূমিকে করে সিক্ত, তার দান যেন নজদ গমন করার পর তেহামা গমনকারীর

মতো। আর বিজলীর মধ্যে যা বাদলা দিনে কখনো উজ্জ্বল দাঁতের মতো আবার কখনো ধারালো তরবারির মতো প্রকাশ পায়। আর বাক-চাতুর্যের কারুকার্যে তার রূপসৌন্দর্যে এবং উপস্থিত জবাবদানের মধ্যে এবং চমৎকার রেখার মধ্যে আমি দেখতে পাই মাযাহেরে উলুবিয়া।

মাযাহেরে জালালিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

كذلك اوصاف الجلال مظاهر * اشاهده فيها بغير تردد

ففى سطوة القاضى الجليل وسمته * وفى سطوة الملك الشديد السمره

وفى حدة الغضبان حالة طيشه * وفى نخوة القرم المهيب المسود

وفى صولة الصهباء جاز مديرها * وفى بؤس اخلا النديم المعربد

وفى الحر والبرد اللذين تقسما * الزمان وفى ايلام كل محسد

وفى سر تسليط النفوس بشرها * على وتحسين التعدى لمعتدى

وفى عسر العادات يشعر بالقضا * وتكحيل عين الشمس منه باثمد

وعند اصطدام الخيل فى كل موقف * يعثر فيه بالوشيج المنضد

وفى شدة الليث الصوول وباسه * وشدة عيش بالسقام منكد

وفى جفوة المحبوب بعد وصاله * وفى غدره من بعد وعد موكد

وفى روعة البين المسىء وموقف الـ * ـوداع لحران الجوانح مكمد

وفى فرقة الالاف بعد اجتماعهم * وفى كل تشتيت وشمل مبدد

وفى كل دار اقفرت بعد انسها * وفى طلل بال ودارس معهد

وفى هول امواج البحار ووحشة الـ * ـقفار وسيل بالميازيب مزبد

وعند قيامى بالفرائض كلها * وحالة تسليم لسر التعبد

وعند خشوعى فى الصلاة لعزة الـ * ـمناجى وفى الاطراق عند التهجد

وحالة اهلال الحجيج بحجهم * واعمالهم للعيش فى كل فدفد

وفى عسر تخليص الحلال وفترة الـ * ـحلال لقلب الناسك المتعبد

অনুরূপভাবে তার সৌন্দর্যের গুণাবলী স্পষ্ট, যা কোন রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আমি প্রত্যক্ষ করি। আর মহান কাযীর দাপটে এবং নীরবতায় এবং কঠোর নৃপতির দাপটে, আর ক্ষুদ্ধ ব্যক্তির তীব্র ক্ষোধের সময় এবং প্রতাপশালী কর্তা ব্যক্তির অহমিকাকালে। আর সাহবার আক্রমনকালে যাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে তার সঞ্চালনকারী। আর মন্দ স্বভাব সাথীর স্বভাবের তীব্রতায়। আর

গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে, যা সময়কে বিভক্ত করেছে, এবং হিংসুকের হিংসার আগুনে। আর আমার উপর মন্দ আরোপ করার রহস্যের মধ্যে এবং যালিমের যুলুমকে শোভন করে দেখার মধ্যে। আর স্বভাব চরিত্রের সংকীর্ণতায় যা সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুভূত হয়। আর তদ্বারা সূর্যকে সুরমা দ্বারা রঙিন করার মধ্যে। আর সংঘাত ক্ষেত্রে অশ্বের হানাহানির সময় যখন তীর- বর্শা দ্বার উসকানী দেওয়া হয়। আর হামলাকারী সিংহের প্রবল আক্রমণকালে এবং পড়িাদায়ক ব্যাধির চরম দুঃসময়ে। আর প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার অন্যায় অনাচার আর পাকা পোক্ত কথা দেওয়ার পর তার বিশ্বাস ঘাতকা। আর পীড়াদায়ক বিচ্ছেদের আশংকায় এবং ব্যাথাতুর ব্যক্তির ব্যাথাদানের স্থলের স্মরণে যেখানে তারা বিদায় আসায়। আর বন্ধুদের মিলিত হওয়ার পর বিচ্ছেদের স্মরণে এবং প্রতিটা সমাবেশ ভঙ্গ হওয়ার স্মরণে। আর প্রতিটি গৃহ যা আবাদ হওয়ার পর ধ্বংস হয়ে গেছে আর প্রতিটি উচ্চ স্থান যার চিহ্ন মুছে গেছে। আর সমুদ্রের ঢেউ এবং নির্জন স্থানের ভয়াবহতা এবং ভীতি সঞ্চারকারী নালা-নর্দমার প্রবাহের মধ্যে। আর ফরয নামাযে আমার দণ্ডায়মান হওয়ায় এবং আমার ইবাদতের রহস্য সম্পর্ণ করা অবস্থায়। আর নামাযে আমার, বিনয়কালে এবং রাতের বেলা তাহাজ্জুদের জন্য আমার গাত্রোত্থানকালে এবং হজ্জের সময় হাজীদের তালবিয়া উচ্চারণকালে এবং প্রতিটি প্রান্তরে জীবনের জন্য তাদের কাজ করা অবস্থায়। আর ইবাদতকারীর অন্তরে জড়তার সময় যে আলস্য সৃষ্টি হয় এবং হালালকে কলুষমুক্ত করার সংকীর্ণতার সময় আমি তার জালালী দীপ্ত প্রত্যক্ষ করি।

মাজাহেরে কামালিয়া সম্পর্কে তার কবিতা—

وفى ذكريات العذاب وظلمة الـ * ـحجاب وقبض الناسك المتزهد
ويبدو باوصاف الكمال فلا ارى * برويته شيئا قبيحا ولا ردى
فكل مسىء لى الى كمحسن * وكل مضل لى الى كمرشد
فلا فر عندى يبن انس ووحشة * ونور واظلام ومدن ومبعد
وسيان افطارى وصومى وفترتى * وجهدى ونومى وادعاء تهجدى
ارى تارة فى حانة الخمر خالعا * عذارى وطورا فى حنية مسجد
تجلى لسرى بالحقيقة مشرب * فوقتى ممزوج بكشف مسرمد
وقلبى على الاشياء اجمع قلب * وشربى مقسوم على كل مورد
فهيكل اوثان ودير لراهب * وبيت لنيران وقبلة معبدى
ومسرح غرلان وحانة قهوة * وروضة ازهار ومطلع اسعد
واسرار عرفان ومفتاح حكمة * وانفاس وجدان وفيض تبلد
وجيش لضرغام وخدر لكاعب * وظلمة نيران ونور لمهتدى
تقابلت الاضداد عندى جميعها * لمحنة مجهود ومنحة مجتدى
واحكمت تقرير المراتب صورة * ومعنى ومن عين التفرد موردى

فما موطن الا ولى فيه موقف * على قدم قامت بحق التفرد

فلا غرو ان فت الانام جميعهم * وقد علقت بحبل من حبال محمد

عليه صلات الله تشفع دائما * بروح تحيات السلام المردد

আযাবের আলোচনা অন্ধকারের আবরণ এবং সাধু সাধকের সাধনায় তিনি পূর্ণতার গুণে প্রকাশ পান, আর তার দর্শনে আমি কোন বস্তুকে কুৎসিত আর অপদার্থ দেখতে পাই না। আর আমার নিকট সকল কষ্ট দায়ককে মনে হয় যেন সে আমার বন্ধু আর সকল বিভ্রান্তকারীকে মনে হয় যেন পথ প্রদর্শক। আর আমার নিকট কোনো পার্থক্য নেই ভয় আর ভালোবাসার মধ্যে, পার্থক্য নেই আলো আর অন্ধকার এবং দূর আর নিকটের মধ্যে। আর আমার রোযা রাখা এবং ইফতার করা এবং আলস্য করা এবং চেষ্টা করা আর শয়ন করা এবং তাহাজ্জুদের দো'আ করা আমার নিকট এক সমান। আমি কখনো নিজেকে দেখি শরাবের দোকানে। আবার কখনো দেখি গোমরাহীতে নিমজ্জিত। আবার কখনো দেখি মসজিদের মেহরাবে নিমগ্ন। আমার নিকট প্রকাশ পায় আসল রহস্য আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী, তাই আমার সময় চিরন্তন রহস্যে ঘেরা। বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আমার অন্তর তৃপ্ত আর আমার পান করা প্রতিটি ঘাটে বন্টন করা আছে। সুতরাং প্রতিমার প্রতিকৃতি এবং সাধকের বিষ এবং আগুনের ঘর এবং আমার পাসনালয়ের কেবলা, আর হরিণের চারণভূমি এবং কবিঘর এবং ফুলের বাগান আর সৌভাগ্যের উদয়স্থল এবং দর্শনের রহস্য আর তত্ত্বকথার চাবিকাঠি আর ভাবাগের মুহূ এবং জনবসতির প্রাচুর্য এবং ব্যাঘ্রের উত্তেজনা আর যুবতি নারীর যৌবন প্রতিযোগীদের অন্ধকার এবং পথ প্রাপ্তদের আলো- এসবই আমার নিকট উদ্ভাসিত হয় বিপরীতধর্মী কষ্ট ক্লেশ এবং দাতার দান হিসাবে। আর আমি অর্থ এবং আকৃতির দিক থেকে সকল মর্তবা ভালোভাবে ব্যক্ত করেছি আর আমার অবস্থানস্থল নির্জনতার নিবাশ থেকে প্রকাশ পায়। আর এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমার অবস্থান নেই, যা একক অধিকার বলে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান আছে। আমি যদি সকলকে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হই তাতে নাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি তো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রজ্জু ধারণ করেছি। তাঁর প্রতি সদা সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক। মাজাহেরে জানাদিয়া সম্পর্কে তার কবিতা :

وفى اقة الاشعار راقت لسامع * بدا تعيا فى حقصر ومقصد

وفى عود محبد الومل من بعد جفوة * وفى امن احشاد الطريد المشرد

وفى رحمة المعشوق شكوى محبة * وفى دقة الالفاظ محند الثورد

وفى ادمجامت امتريح الى النرى * وفى عائفات العفو من حكى سيد

وحالة يسد العا وفيس وافهم * وتعريكم عند الماع المقيد

وفى لطف ايات الكتاب التى بما * تنسم اوح الوعد بعد التوعد

কবিতার নাজুকতায় যা শ্রোতার মন গলায়, আর কবিতার চমৎকারিত্ব প্রকাশ পায় অক্ষম ব্যক্তি আর উত্তম কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। আর প্রকাশ পায় অন্যায়ের পর বিনয়ের আনন্দ ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। আরো প্রকাশ পায় বিজড়িত ব্যক্তির মধ্যে স্বতস্ফূর্ত ক্রন্দনের মধ্য

দিয়ে। আরো প্রকাশ পায় ভালোবাসার পাত্রের দয়া অনুকম্পার মধ্য দিয়ে যে অভিযোগ করে প্রিয় পাত্রের বিরুদ্ধ আর ভালোবাসা কোমল শব্দে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। আরো প্রকাশ পায় ভদ্র মানুষের বদান্যতায় এবং সকল মহান ব্যক্তির ক্ষমার অনুভূতির মধ্য দিয়ে। আরো প্রকাশ পায় আরিফদের আনন্দ প্রকাশকালে সামা অনুষ্ঠানকালে তাদের আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ার মধ্য দিয়ে। আরো প্রকাশ পায় কিতাবুল্লাহর আয়াতের কোমল ভাবধারার মধ্য দিয়ে, যাতে শাস্তির পর প্রতিশ্রুতির মৃদু-মন্দ বায়ু ধীরে সুস্থে প্রবাহিত হয়।

ইবনুল উদ রাফেযী

আবুল কাশেম আল হুসাইন ইবন উদ নযীবুদ্দিন

আল আসাদী আল হালবী। ইনি ছিলেন শিয়াদের শায়খ এবং তাদের আলেম। তার অনেক শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো এবং অনেক বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ছিলেন মিষ্টভাষী,সদাচারী এবং দুলর্ভ চরিত্রের অধিকারী। ইনি রাত্রিকালে অধিক ইবাদত করতেন। তার কিছু চমৎকার কবিতা আছে। ৫৮১ হিজরীতে তার জন্ম হয় এবং এই বৎসর রমযান মাসে ৯৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বান্দাদের অবস্থা, তাদের নিয়ত এবং গোসল বিষয় আল্লাহ ভালো জানেন।

হিজরী ৬৭৮ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৭৯ সন)

এ বৎসরের প্রথম দিন ছিল রোববার। ইতিপূর্বে যে সব খলীফার নাম উল্লেখ করা হয় তারা সে সব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বৎসর কতকগুলো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে আর তা এই যে সকল রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাতারীদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ দেখা দেয় তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সাওয়াহেল অঞ্চলে মতভেদ দেখা দেয় ফিরিঙ্গীদের মধ্যে, একে অপরের উপর হামলা চালায়, একে অপরকে হত্যা করে। যে সব ফিরিঙ্গী দ্বীপ অঞ্চল এবং সমুদ্রে বসবাস করত তাদের মধ্যোক্ত মতানৈক্য দেখা দেয় এবং সংঘাতে লিপ্ত হয়। এবং একে অপরকে হত্যা করে। আরব গোত্রগুলো সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং জুলুম লড়াই হয়। অনুরূপভাবে আল আশির অঞ্চলে হাওয়ারানাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়। অনুরূপভাবে যাহেরী আমিরদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়। আর এ বিরোধ দেখা দেয় এ কারণে যে সুলতান মালেক সাঈদ ইবনে যাহের সীস অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ কালে তিনি দামেস্ক নগরীতে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি 'খাছকিয়া' অঞ্চলের লোকজনের সঙ্গে আনন্দ বিলাসে লিপ্ত হন। আর তারা বেশ কিছু অঞ্চলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন বড় বড় আমির ওমরাগণ বাদশা থেকে দূরে সরে যান। তাদের মধ্যে একটা দল অসন্তুষ্ট হয়ে বাদশাকে ছেড়ে চলে যায়। যে সব সৈন্য সীস ইত্যাদি অঞ্চলে গমন করেছিল এরা তাদের পথে দাড়ায়। তারা একত্র হলে বাদশা সাঈদের বিরুদ্ধে তাদের মনকে উপসকানী দেয়। ফলে সৈন্যরা বাদশা সম্পর্কে বিরোধ মনোভাব পোষণ করেন। তারা বলতে শুরু করে বাদশার জন্য আমোদ ফুর্তিতে মত্ত হওয়া সাজে না। বরং বাদশার কর্তব্য হচ্ছে মুসলমানদের কল্যাণ সাধন ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং তাদের রক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত থাকা যেমন ছিলেন তাঁর পিতা। আর তারা যা বলেছেন ঠিকই বলেছে। কারণ খেলাধুলা আর আমোদ-প্রমোদে শাসক গোষ্ঠীর মত্ত হওয়া প্রমাণ করে নেয়ামতের অবসান শাসনকার্যের পতন এবং প্রজা

সাধারণের বিকৃতি। অতঃপর সৈন্যরা বাদশার সঙ্গে এ মর্মে যোগাযোগ করেন যে তিনি যেন খাছকিয়াকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং তার পিতার মত জ্ঞানী গুণীজনকে কাছে টেনে আনে কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ খাছকিয়াদের শক্তি, সামর্থ্য এবং সংখ্যাধিক্যের কারণে এটা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে সৈন্যের প্রস্তুতি নিয়ে মারাজ আল সফর অভিমুখে রওয়ানা হয়। তারা দামেস্ক দূর্গ অতিক্রম করার আগেই দামেস্কের পূর্ব প্রান্তে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। সমস্ত সৈন্য মারাজ আল সফরে একত্র হলে বাদশা তাঁর মাতাকে সৈন্যদের নিকট প্রেরণ করেন। সৈন্যরা তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সম্মুখে ভূমি চুম্বন করেন এবং কৃত্রিম উপায়ে তার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করে এবং সংস্কারমূলক কাজ শুরু করেন। তারা বাদশার মাতার কথা মেনে নেন এবং তাঁর পুত্র সুলতানের উপর কিছু শর্ত আরোপ করেন। তিনি সুলতানের নিকট ফিরে আসলে তারা শর্তগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং আল খাছকিয়া তাঁকে সে সব করতে দেয় নি। ফলে সৈন্যরা মিশরীয় অঞ্চলে গমন করে এবং সুলতানও তাঁদের অনুসরণ করে, যাতে বিকৃতি দেখা দেওয়ার আগেই সংশোধন করা যায়। কিন্তু তিনি সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি, তারা আগে ভাগে কায়রো নগরীতে পৌছে যায়। আর তিনি সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন এবং মাল-সামান আল কার্ক অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং সেখানে নিরাপদে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে যারা তার সাথে অবস্থান করছিলো তাদেকে নিয়ে আল খাছকিয়াসহ তিনি মিশরীয় অঞ্চলে রওয়ানা হন। যখন তারা মিশরের কাছা-কাছি পৌছে তখন তারা মিশরে প্রবেশ করতে বাধ দেয় এবং যুদ্ধ কাঁঠে। অল্প সংখ্যক লোক নিহত হয় এবং একজন আমির তাঁকে নিয়ে সারি অতিক্রম করত আল স্যাবাল দূর্গে প্রবেশ কেরন, যাতে পরিস্থিতি শান্ত হয়। কিন্তু এতে তিনি আরো বিগড়ে যান এবং দূর্গ অবরোধ করে নেন এবং পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন ফলে ভীষণ বিপদ দেখা দেয়। অতঃপর আমির সাইফুদ্দিন কালাউন আল আলফি আল সালেহির সমঝোতা হয় এই মর্মে যে বাদশা সাঈদ শাসন কর্তৃত্ব ত্যাগ করবেন। এর পরিবর্তে আল কার্ক এবং আল শতাবাগ লাব করবেন। তার সঙ্গে অবস্থান করবেন তার নাজমুদ্দিন খিযির। কিন্তু শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবেন তার ছোট ভাই বদরুদ্দিন শালামাস এবং আমির সাইফুদ্দিন কালাউন হবেন তার দীক্ষা গুরু।

মালিক সাঈদের পদচ্যুতি এবং তদীয় ভ্রাতা মালেক আদেল মালমাশ এর নিযুক্তি

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৭ রবিউল আখের সুলতান মালেক সাঈদ দূর্গ থেকে বের হয়ে দারুল আদেলে আগমন করেন। তথায় বিচারকমণ্ডলী এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তথায় মালেক সাঈদ নিজেকে শাসন কর্তৃক থেকে মুক্ত করেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য রাখেন। উপস্থিত সকলে তদ্বীয় ভ্রাতা বদরুদ্দিন সালামাশের হাতে বাই'য়াত করেন এবং তার উপাধি দেন আল মালিক আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর। আমির সাইফুদ্দিন কালাবুন আল আলফি আল সালেহিকে তার দীক্ষা গুরুত্ব নিয়োগ করেন। বক্তারা তার স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন এবং তাদের উভয়ের নামে মুদ্রা প্রচলন করা হয় এবং তিনি তদীয় ভ্রাতা আল কার্ক এবং তদীয় ভ্রাতা খিযিরকে আল শাওবাস দান করেন, এই মর্মে পত্র লিপিবদ্ধ করা হয়।

বিচারপতি এবং মুফতিরাও এতে স্বাক্ষর করেন। এবং দূত শামীদের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য তারা আগমন করে। যে চুক্তিতে শিমরীয়ও স্বাক্ষর করে। আর শাম দেশের নায়েব আমির আইনমার যাহিরীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার নায়েবের নিকট দূর্গে আবদ্ধ রাখা হয়। তখন তার নায়েব ছিল আলামুদ্দিন সানজার দাওয়াদারি। আর সিরিয়ার নায়েবের সম্পদ ইত্যাদি তার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। আর আমির শামসুদ্দিন সানকার আল আশকার শান শওকত সহকারে আর বিরাট জ্যাঁক জমকের সঙ্গে শাম দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সৌভাগ্য গৃহে অবতরণ করেন লোকেরা তার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং বাদশা সুলভ আচরণ করে তাঁর সঙ্গে। আর সুলতান মিশরের সাফেঈ, হানাফী এবং হাম্বলী তিন মাযহাবের কাযীদেরকে পদচ্যুত করেন এবং শাফেঈ মাযহাবের কাযীর পরিবর্তে সদরুদ্দিন উমর ইবনুল কাযী তাজউদ্দিন বিনতুল আয়াযকে কাযী নিযুক্ত কনে। তার নাম ছিল তকিউদ্দিন ইবন যরীন। তাকে পদচ্যুত করা হয় এ কারণে যে তিনি বাদশা সাইদকে পদচ্যুত করায় ইতস্তত করেছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

মালেক মনসুর কালাউন ছালেহির বাই'আত

২১ রজব মঙ্গলবার মিশরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মিশরের আল জাবাল দূর্গে সমবেত হয় এবং তারা মালেক আদিল সালামাশ ইবনে যাহিরকে পদচ্যুত করেন এবং তাকে বংশচ্যুত করেন। তারা কেবল এজন্য তার বাই'আত করেছিল যে যাতে সাঈদকে পদচ্যুত করায় অন্যায়ের অবসান ঘটে। অতঃপর মালেক মনসুর কালাউন সালেহির বায়াতের ব্যাপারে একমত হয়। তারা তাকে মালেক মনসব উপাধি দান করেন। প্রসঙ্গটা দামেস্কে উত্থাপিত হলে সকল আমির ওমরা ঐক্যমত প্রকাশ করে এবং এ ব্যাপারে তারা শপথ গ্রহণ করে। কথিত আছে যে, আমির শামসুদ্দিন সানকার আল আশকার অন্যদের সঙ্গে কসম খাননি এবং কিছু সংঘটিত হয়েছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেন ভিতরে ভিতরে তিনি মনসুরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

কারণ তিনি নিজেকে যাহেরের দরবারে বড় জ্ঞান করতেন। মিশরীয় অঞ্চল এবং শাম দেশে মিম্বরের উপর মনসুরের নামে খুতবা দেওয়া হয় এবং যার নামে মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়। তার মতামত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। তিনি নিয়োগ এবং বদলি করেন তার ফরমান জারি করা হয়। তিনি যোরহান উদ্দিন বুখারীকে মন্ত্রিত্ব থেকে পদচ্যুত করেন এবং তদস্থলে ফয়যুদ্দিন ইবন লোকমানকে সচিব নিযুক্ত করেন এবং তাকে মিশরীয় অঞ্চলে পত্র যোগাযোগের বড় কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। একই বৎসর ২১ যিলক্বদ বৃহস্পতিবার দিনে মালেক সাঈদ ইবন মালেক যাহের আল কার্ক অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। পরে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ্ আর একই বৎসর শামদেশের নায়েব আমির আদমারকে একটা রোগের কারণে পালকি যোগে মিশরীয় অঞ্চলে আনা হয়। যিলক্বদ মাসের শেষের দিকে তিনি তথায় প্রবেশ করেন এবং তাকে মিশর দূর্গে আটক রাখা হয়।

দামেস্কে সানকার আল আশাকারের রাজত্ব

২৪ যিলক্বদ জুমার দিন আমির শামসুদ্দিন সানকার আল আশকার আছর নামাযের পর দারুস শাহাদাত থেকে রওয়ানা করেন। তার অগ্রভাগে ছিল আমির ওমরাদের দল এবং সৈন্যরা পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছিল। দূর্গের যে দরজাটা শহরের নিকটবর্তী তিনি সে দরজার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান এবং হঠাৎ করে তথা থেকে দূর্গে প্রবেশ করেন এবং আমির উমরাদেরকেও ডেকে

নেন। তারা সকলে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তার হাতে বাই'আত করেন এবং তিনি মালেক কামিল উপাধি ধারণ করত দূর্গে অবস্থান করেন এবং ঘোষকরা দামেস্ক শহরে এ কথা ঘোষণা করে দেয়। শনিবার সকালে বিচারক মণ্ডলী জ্ঞানী-গুণীজন এবং নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দূর্গন্ধ আবুদ দারদা মসজিদে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সকলেই তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সেনাবাহিনীর লোকজনও শপথ গ্রহণ করে। সীমান্ত রক্ষা এবং খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য তিনি সৈন্যদেরকে প্রেরণ করেন এবং মালেক মনসুরকে প্রেরণ করেন আল শাওয়াবাগ অঞ্চলে। আর তার সহকর্মীরা তার কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এবং নাযমুদ্দিন খিযির কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। আর একই বৎসর কুবাবুল নসর অঞ্চলের পশ্চিম দিকে চারটি নতুন জেলা স্থাপন করা হয়। আর একই বৎসর দামেস্কে উজিড়ের পদ থেকে ফাতহুদ্দিন কায়সারীকে পদচ্যুত করা হয়। এবং তদস্থলে একি উদ্দিন ইবনে তাওবা তাকরিতীকে নিযুক্ত করা হয়। এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইযযুদ্দিন ইবন গানিম আল ওয়ায়েস আব্দুস সালাম ইবন আহমদ ইবন গানিম তিনি মর্মস্পর্শী দীর্ঘ ভাষণ দেন। শায়খ তাজইদ্দন আল ফাযারী এই ভাষণের বিবরণ পেশ করেন। এই সময় তার বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বৎসর।

মালেক সাইদ ইবন মালেক যাহির বরকা খান নাসির উদ্দিন মাহমুদ ইবন বরকা খান আবুল মাআলী ইবনসুল মালিক যাহির রুকমুদ্দিন বায়বারস বান্দাদারী। তার পিতা নিজের জীবদ্দশায় তার পক্ষেবায়যাত গ্রহণ করেন তার পিতার ইন্তেকালের পর উনিশ বছর বয়সে তার পক্ষে বাইআত গ্রহণ করা হয়। শুরুতে তার কার্যক্রম ভালোই চলে। অতঃপর খাছকিয়া গোষ্ঠী তার ঘাড়ে সাওয়ার হয় এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে সবুজ প্রান্তরে খেলাধুলায় মত্ত হন। কথিত আছে যে, এটাই ছিল তার প্রথম ভ্রষ্টতা। অতঃপর এমন সময় আসে যখন তিনি এতে নেমে পড়েন বড় বড় আমির ব্যক্তিরা এটাকে না পছন্দ করেন। তাদের বাদশা শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলায় মগ্ন হবে তা তারা পছন্দ করেননি। তিনি নিজেকে এ পর্যায়ে নাসাবেন তা ও তারা ভালোভাবে দেখেননি। এ প্রসঙ্গে আমির ওমরারা তার সঙ্গে পত্রালাপ করেন, তারা তাকে এ পথ তেকে ফিরে আসতে অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফলে তারা তাকে পদচ্যুত। নাযমুদ্দিন খিযির আল কার্ক অঞ্চলের বাদশা হন এবং মালেক মাসুদ উপাধি ধারণ করেন। আর মনসুর তার হাত থেকে আল কার্ক অঞ্চলের বাদশা হন এবং মালেক মাসুদ উপাধি ধারণ করেন আর মনসুর তার হাত থেকে আল কার্ক অঞ্চল ছিনিয়ে নেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিজরী ৬৭৯ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮০ সন)

এই বৎসরের প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার তিন মে এবং আল হাকিম বিআমরিল্লাহু ছিলেন খলীফা এবং মিশরের বাদশা ছিলেন আল মালেক আল মনসুর কালাউন আল সালেহী। অনুরুপভাবে তিনি শাম দেশের কোনো এক নগরীর বাদশা ছিলেন। অবশ্য দামেস্ক এবং তার কোন কোন অঞ্চলের বাদশা ছিলেন সানকার আর অংশকার। আর আল কার্ক অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন মালেক মাসুদ ইবন যাহের। আর হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন মালেক

মনসুর নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ ইবন মালেক মুযাফফর তকীউদ্দিন মাহমুদ। আর ইরাক, আল জাজিরা, অঞ্চল খোরাসান, মুছিল, এরিল আজরাইজান, বিপদে বকর সালাত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইত্যাদি ছিল তাতারীদের অধিকারে। অনরূপভাবে রোম অঞ্চল ও তাদের হাতে ছিল কিন্তু সেখানে ছিল গিয়াসউদ্দিন ইবন রুকুনদ্দিন। নাম ছাড়া তার আর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আর ইয়ামানের শাসনকর্তা ছিলেন। মালেক মুযাফফর শামসুদ্দিন ইউসুফ ইবন উমর। আর হেরেম শরীফের শাসনকর্তা ছিলেন নাযমুদ্দিন ইবন আবী নামী আল হাসানী এবং মদিনার শাসনকর্তা ছিলেন ইযযুদ্দিন যিমায ইবন শিয়া আল হাসানী।

উপরোক্ত বছরের প্রথম দিকে সুলতান মালেক কামেল কানকার আল আশকার দুর্গ থেকে অশ্বারোহনপূর্বক ময়দান অভিমুখে গমন করেন আর তার অগ্রভাগে ছিল আসির উমরা এবং নাম করা সেবক দল। তিনি খিলাত পরিধান করেন এবং বিচারবর্গ আর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার সঙ্গে আরোহণ করেন। তিনি ময়দান অঞ্চলে কিছু সময় অবস্থান করত দূর্গে ফিরে আসেন। আরবের বাদশা আমির শরফুদ্দিন ঈসা ইবন মেহনা তার খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি বাদশার সম্মুখে ভূমি চুম্বনপূর্বক তার নিকটে বসেন। এ সময় বাদশা দস্তরখানে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সম্মুখে ভূমি চুম্বনপূর্বক তার নিকটে বসেন। এ সময় বাদশা দস্তরখানে উপবিষ্ট ছিলেন।তার সম্মনার্থে কামেল উঠে দাড়ান। অনুরূপভাবে তার খেদমতে উপস্থিত হন আরবের হিজাজ অঞ্চলের বাদশা। আর কামিল সানকার নির্দেশে পরিচালিত করেন, অবশেষে মিশরীয় বাহিনী দামেস্কে নগরীর কাছাকাছি পৌছে যায়। তখন বাদশা কামেল নির্দেশ দেন জাসুরা অঞ্চলের পথ সংকীর্ণ করে দেওয়ার জন্য। আর এই ঘটনা ঘটে সফর মাসের বারো তারিখ বুধবার। আর তিনি নিজে সঙ্গি সাথি নিয়ে অগ্রসর হয়ে এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিপুল জনগোষ্ঠীকে সেবকে পরিণত করেন এবং তাদের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। আর তাদের সঙ্গে যোগ দেন আরবদের আমির শরফুদ্দিন ঈসা ইবন মেহনা এবং শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবন হিজা। নাজদা হাল, হিমাত অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক লোক এবং বা'শলাবাক অঞ্চলের বহু লোক তার সঙ্গে যোগ দেয়। আর সফর মাসের ষোল তারিখ রোববার উপস্থিত হলে হালব অঞ্চলের সৈন্যরা অমির আলামুদ্দিন সানযার আল হালবির সাথে উপস্থিত হন। উভয় দল মিলিত হলে দিনের চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে বহু লোক নিহত হয়। যুদ্ধে বাদশা কামেল সানকার আল আশকার দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। কিন্তু সৈন্যরা গরবর সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে কিছু লোক মিশরীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং কিছু লোক সব দিক থেকে পরাজিত হয়। সঙ্গি সাথীরা তাদের ছেড়ে চলে যায়। আর ঈসা ইবন মেহনার সাথে আল মারাহ এবং পথে একটা ক্ষুদ্র দল নিয়ে পরাজয় বরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ফলে তিনি সৈন্যদেরকে নিয়ে আর রাহবার জঙ্গল অভিমুখে গমন করে এবং তাদেরকে কেশ বিশিষ্ট তাবুতে অবস্থান করায়। যতদিন তিনি তথায় অবস্থান করেন ততদিন সেখানে তাদেরকে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর যে সব আমির পরাজিত হয় তাদের প্রতি দূত প্রেরণ করেন এবং আসির সানযারের নিকট থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তা অর্জন করেন। এই সময় তিনি দামেস্ক নগরীর বাইরে অবস্থান করেন। এবং তখন দামেস্ক নগরীর দরজা রুদ্ধ ছিল। তখন তিনি দূর্গের দায়িত্বশীলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অবশেষে তিনি

দিনের ভাগে বাধ আল ফারাজ জয় করেন এবং শহরের ভিতর থেকে দূর্গ জয় করে নেন এবং তিনি মনসুরের জন্যে দূর্গের কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। আমির রুকনুদ্দিনে বায়বারস আল আযমীকে,যিনি হালিক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং আমির লাজীন হুমামউদ্দিন আল মানসুরী প্রমুখ আমিরাকে মুক্ত করে দেন, যাদেরকে সদকার আল আশকার বন্দি করেছিলেন। আর মানযার দূতদেরকে মালেক মনসুরের নিকট প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। আর মানযার সানকার আল আশকারের সন্ধানে তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। আদ্য ইবন খাল্লিকান আমির সানযার হালবিকে সালাম জানাবার জন্য আগমন করলে তিনি তাকে নাজিরিয়া খানকার উপরি অংশে আটক করে রাখেন এবং বিশ সফর বৃহস্পতিবার মুক্ত করেন এবং কাযী নাজমুদ্দীন ইবন সিনি- উদ–দৌলাকে কাযী নিযুক্ত করার নির্দেশ জারি করেন। আর তিনি উপরোক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর মালেক মনসুর কালাউনের পত্র বহন করে নিয়ে আসে দূত। এতে কিছু লোক সম্পর্কে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করা হয় এবং তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর তার জন্য অতিরিক্ত দোয়া করা হয় এবং আমির হুমাদ্দীন সালাহদারি আল মানসূরীর জন্য শাম দেশের কর্তত্বের নির্দেশ আসে। আর আলমুদ্দিন যানযার হালবী ও তার সঙ্গে আগমন করেন এবং তিনি তাকে দারুস সাআদাতে নিয়োগ করেন এবং সানযার কাযী ইন খাল্লিকানকে মাদরাসা আদিলিয়া কবিরায় স্থানান্তরের নির্দেশ দেন, যাতে নাযমুদ্দিন ইবন সিনি-উদ দৌলা তথায় অবস্থান করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি পিড়াপিড়ি করলে একটা ভার বহনকারী ডেকে দেন যে তাকে মালসামানসহ সালেহিয়ায় নিয়ে যেতে পারে। এই সময় দূত সুলতানের পত্র নিয়ে আগমন করে। পত্রে ইবন খাল্লিকানের কাযীর পদে নিযুক্তি এবং তাকে ক্ষমা করার প্রসঙ্গ উল্লেখ ছিল। উপরন্ত পত্রে তার প্রসংশা করা হয়, এতে তার অতীত সেবার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়। এতদসত্বেও তার জন্য একটা মূল্যবান খিলাফত প্রেরণ করা হয় যা তিনি পরিধান করেন এবং এ পোশাক পরিধান করে তিনি জুমার সালাত আদায় করেন এবং আমিরদেরকে সালাম করেন। এতে তারা তাকে সম্মান করেন এবং লোকজনও খুশি হয়। এই ক্ষমার কথা শুনে সকলে আনন্দিত হয়।

আর সৈন্যরা যখন সানকার আল আশকারের সন্ধানে বের হয় তখন তিনি আমির ঈসা ইবন মেহনাকে মুক্ত করে দেন এবং নিজে সাওয়া হেল অঞ্চল অভিমুখে গমন করেন এবং সেখানে তিনি অনেক দূর্গ অধিকার করে নেন। এসব দূর্গে ছাহদুনও ছিল এবং তাতে তার সন্তান এবং সম্পদও ছিল। তথায় আরও ছিল বালাতস, বার্জিয়া, আটকা, জাবালা, লাজেকিয়া, শফর বকার্শ, এবং শিজার দূর্গ। তিনি তথায় আমির ইযযুদ্দিন, ইযদমুর আল হাজকে নায়েব নিযুক্ত করেন। আর সুলতান মনসুর শিজার দূর্গ অবরোধের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সময় তাতারীরা মুসলমানদের মতভেদ সম্পর্কে জানতে পারলে অকস্মাৎ তিনি উপস্থিত হন এবং অবশিষ্ট অঞ্চলের লোকজন তার সম্মুখ দিয়ে শাম দেশ হয়ে মিশর গমন করে। আর তাতারীরা হালব অঞ্চল পৌছে অনেককে হত্যা করে এবং বিরাট সৈন্যদলকে অধিকার করে নেয়। তারা ধারণা করে যে সানকার আল আশকারের সৈন্যরা মানসুরের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু তারা দেখতে পান যে বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। আর ঘটনা ছিল এই যে, মনসুর

সানকার আল আশকারকে লেখেন যে, তাতারীরা মুসলমানদের অভিমুখে এগিয়ে আসছে। আর পরিস্থিতির দাবি এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে আমাদের এবং তাদের মধ্যে মুসলমান ধ্বংস না হয়। আর তারা নগরী অধিকার করে নিলে আমাদের কাউকে রক্ষা করবে না। আর সানকার তাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করার জন্য পত্র লেখেন। তিনি দূর্গের বাইরে এসে সৈন্যদের সঙ্গে তাবুতে অবস্থান গ্রহণ করেন যাতে প্রস্তুত থেকে ডাক পাওয়া মাত্র উপস্থিত হতে পারেন। আর তার নায়েবরাও দূর্গ থেকে বের হয়ে আসেন্ এবং আতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হন। ঐদিকে মালেক মনসুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে জুমুদাস সানি মাসের শেষ দিকে মিশর থেকে বের হন এবং একই মাসের তৃতীয় জুমা দামেস্কের জামে মসজিদের মিম্বর থেকে সুলতানের পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। এতে উল্লেখ ছিল যে, তিনি তদীয় পুত্র আলী সম্পর্কে ওসিয়ত করেছেন এবং তিনি মালেখ সালেহ উপাধি ধারণ করেছেন। তিনি পত্র পাঠ শেষে করলে দূতরা আগমন করত সংবাদ দেয় যে তারিরা হালব অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশ গমন করেছে। আর এই ঘটনা তখন ঘটে যখন তারা জানতে পারে যে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এতে মুসলমানরা আনন্দিত হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর মনসুর মিশর প্রত্যাবর্তন করেন অথচ তিনি তখন গাজা অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে চাপ কমানো। অবশেষে শা'বান মাসের মাঝামাঝি সময় তিনি মিশর পৌঁছেন।

আর জুমাদাস সানি মাসে বোরহান উদ্দিন সানযারীকে পুনরায় মিশরের উজির পদে নিয়োগ করা হয় এবং ফখরুদ্দিন ইবনে লোকসান পাত্র বিনিময় বিভাগে ফিরে আসেন রমযান মাসের শেষ দিকে ইবন লাজীনকে পুনরায় কাযী এ সময় তিনি তদীয় পুত্র সালেহ আলী ইবন মনসুরকে তার ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। শায়খ কুতুবউদ্দিন বর্ণনা করেন যে, আরাফার দিন মিশরে, ভীষণ তুষারপাত হয় যাতে খাদ্য শস্যের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং আলোক জান্দ্রিয়ায় বজ্রপাত হয়। একই দিন তাবালে আহমারের নিচে পুনরায় বজ্রপাত হয়। এর ফলে পর্বতটি ভষীভূত হয়। এর ফলে লোহা বিগলিত হয়ে যায়। এবং মিশরীয় মুদ্রা নির্গত হয। এ সময় সুলতান সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উপস্থিত হন। আর এর ফলে ফিরিস্তারা ভিষণ ভীত হয় এবং পুনরায় আপোশ করার জন্য আবেদন জানায়। আর আমীর ঈসা ইবন মেহনা ইরাক অঞ্চল থেকে লুৎসুরের খেদমতে উপস্থিত হয়। আর সুলতান সেখানে সৈন্য নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তার সঙ্গে সদাচার করেন। এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন আমীর কবির জামালুদ্দিন আকুশ শামসী। ইনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম প্রধান আমির। তাতারীদের অন্যতম প্রধান কুতুব গানবিন এর হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আইনে জালুতের দিন ইনি তাদের মধ্যে স্বীকৃতি ছিলেন। আর ইনিই গত বৎসর ইযযুদ্দিন আইগমার যাহিরীকে অঞ্চল নগরীতে গ্রেফতার করেন। সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

শায়খ সালেহ বাউদ ইবন হাতেম ইবন ওমর আর হিবাল। ইনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তার ছিল কারামাত এবং সত্য ঘটনা এবং বহু মুগা আফাত। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন হারবান অঞ্চলের অধিবাসী। তার অবস্থান ছিল বালাহুদ শহরে। ৯৬ বছর বয়সে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। শায়াখা কুতুবুউদ্দিন বিন শায়খ ফকী আল ইউনীনী তার প্রশংসা করেন।

আমীর কবির

নুরুউদ্দিন আলী ইবন ওমর আবুল হালাল তূরী। ইনি ছিলেন অন্যতম বড় আমীরে। তার বয়স ছিল ৯০ বছরের বেশি। তার মৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, সানকার আল আশঝারের যুদ্ধের দিন ঘোড়ার পদতলে পড়ে তিনি আহত হন এবং দু'মাস অসুস্থ থাকার পর তিনি মারা যান এবং কামীউন অচলের গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।

বিশিষ্ট কবি

ইয়াহহিয়া ইবন আব্দুল আযীম ইবন ইয়াহহিয়া ইবন মোহাম্মদ ইবন আলী জামালউদ্দিন আবুল হুসাইন আল মিসরী। ইনি আল জাযার কবি নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি রাজা, বাদশা, উজির, নাজির, এবং আমির ওমরাদের প্রশংসার কবিতা রচনা করেন। ইনি ছিলেন ধীশক্তির অধিকারী, অহেতুক বাকপটু এবং চিত্তাকর্ষক কথক। হিজরী ছয়শত সালের দু' এক বছর পর তার জন্ম হয় এবং এই বৎসর বারো সাওয়াল মঙ্গলবার তিনি ইন্তেকাল করেন। এখানে তার কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত করা হচ্ছে–

ادركوني فبي من البرد هم * ليس ينسى وفي حشاي التهاب

البستني الاطماع وهما فها * جسمي عار ولي فرى وثياب

كما ازرق لون جسمي من الـ * ـبرد تخيلت انه سنجاب

আমাকে ধারণ কর, এমন ঠাণ্ডা আমাকে ঘাস করেছে যা ভোলা যায় না। আর তোমার মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আকাংখা আমাকে কল্পনার পোশাকে জাগিয়েছে অথচ দেখ, আমার দেহ নগ্ন। আর আমার কাছে আছে কম্বল ও বস্ত্র।

আর যখন শীত আমার গায়ের রংকে নীল করে দেয় তখন আমার মনে হয় যে তা যেন কাঠবিড়ালী।

আর তার পিতা এক বৃদ্ধা রমনীকে বিবাহ করলে তিনি লেখেন–

تزوج الشيخ ابي شيخة * ليس لها عقل ولا ذهن

كانها في فرشها رمة * وشعرها من حولها قطن

وقال لي كم سنها * قلت ليس في فمها سن

لو اسفرت غرتها في الدجى * ما جسرت تبصرها الجن

অর্থ: আমার বৃদ্ধ পিতা এক বৃদ্ধা রমনীকে শাদী করেছে, যার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। বিছানায় তিনি যেন জীর্ণ হাড়। আর তার মাথার চুলগুলো যেন তুলা আর কি।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তার বয়স কত? আমি বললাম এর মুখে কোন দাঁত নেই। তিনি যদি অন্ধকারে কপাল উন্মুক্ত করেন তবে জীন-পরীও তাকে দেখতে সাহস করবে না।

হিজরী ৬৮০ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮১ সন)

এ বৎসরের শুরুতে আল হাকেম খলীফা ছিলেন। নগরীর শাসক ছিলেন মালেখ মনসুর কালাউন। দশ মুহাররম ইক্বাবাসী আল মারকায এবং সুলতানের মধ্যে সন্ধি হয়, তখন সুলতান রাওহা অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। যে সব আমির তার সেঙ্গ ছিলেন। তাদের একটা দলকে তিনি আটক করেন। অন্যরা সাহয়ুন অঞ্চল অভিমুখে সানকার আল–আশকার সমীপে পলায়ন করে। ১৯ মুহাররম আল-মনসুর দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে নগরীকে সজ্জিত করা হয়। আর মুহাররম মাসের ২৯ তারিখ ইযযুদ্দীন ইবন শায়েখকে বিচার বিভাগে পুনরায় অর্পণ করা হয। ইবন খাল্লিকানকে পদচ্যুত করা হয়। আর পয়লা সফর নাযমুদ্দীন ইবন শায়খ শাসন হঠন আবু ওমর হাম্বলী মাযহাবের কাযীর পদ গ্রহণ করেন তদীয় পিতা তাকে কাযীর পদ থেকে বিচ্যুত করার পর থেকে এ পদটি শূণ্য ছিল। আর এই মাসে তাজউদ্দীন ইয়াহহিয়া ইবন মোহাম্মদ ইবন ইসমাঈল কুর্দী হালব অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একই মাসে মালেক মনসুর দারুল আদল- এ উপবেশন করেন এবং বিরোধ-নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং আলেমের নিকট হতে মজলুমের হক আদায় করেন। আর হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা তার নিকট আগমন করলে মনসুর দলবল নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তিনি বাবুল ফরাদিসে অবতরণ করেন। রবিউল আউয়াল মাসে মালেক মনসুর কালাউন এবং সানকার আল আমকার মালেক কামেলের মধ্যে এই শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, তিনি সুলতানকে মিজার অঞ্চল দান করবেন এবং তিনি এর বিনিময়ে তাকে দেবেন ইতাকিয়া। কফরতাম এবং সগর বকাস ইত্যাদি অঞ্চল দান করবেন। উপরন্তু তার হস্তে যে ছয়শত অশ্বারোহী আছে, তিনি তাদের দেখাশুণা করবেন। উভয়ে এই শর্তে স্বাক্ষর করে এবং আনন্দ প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে আল কার্ক অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং মালেক মনসুর খিজির ইবন যাহির এই শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন যে তার কাছে যা আছে তা তার কাছে থাকবে। নগরীতে এই ঘোষণা প্রচার করা হয়। আর এই মাসের প্রথম দশকে তিনি দামেস্ক নগরীতে মদ্যপান এবং ব্যভিচার প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিষয়টি দেখাশুনা করার জন্য একটা পরিষদ এবং কড়াকড়ি করার জন্য ব্যক্তি নিয়োগ করেন। তার নির্দেশ রহিত করার জন্য একদল সাধু সজ্জন দাঁড়িয়ে যান। তাদের প্রতিরোধের মুখ বিশ দিনের মাথায় এ নির্দেশ রহিত করেন। ফলে নগরীতে মদ প্রবাহিত হয় এবং শরীয়ত নির্ধারিত দন্ত কার্যকর করা হয়। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।

১৯ রবিউল আওয়াল বাদশা যাহিরের স্ত্রী খাতুন বরকা খান এবং এদসঙ্গে তার পুত্র সাঈদও পৌছে এবং তিনি তাদেরকে আল কার্ক-এর নিকট কারিয়া আল মাসাদের থেকে তুলে আনেন যাতে তাকে তদীয় পিতার নিকট যাহিরিয়া কবরস্থানে দাফন করতে পারে। তাই তাকে পাঁচিল থেকে রশির সাহায্যে তুলে এনে তদীয় পিতা যাহিরের নিকট দাফন করা হয়। এবং তার মাতা হিমসের শাসনকর্তার নিকট অবস্থান করেন এবং তার পাহারায় লোক নিয়োগ করা হয়। আর তিনি উপরোক্ত কবরাস্থানে ২১ রবিউল আখের পুত্রের জন্য শোক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এতে সুলতান মনসুর সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী। ক্বারী এবং ওয়াযকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন।

রবিউল আখের মাসের শেষ দিকে দামেস্কের জারত থেকে তর্কী ইবন নাওবা তাকরীতিকে বরখাস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে তাজউদ্দিন সানহুরী উপরোক্ত পদ গ্রহণ করেন। আর সুলতান মনসুর তাতারীদের আগমন সম্পর্কে মিশরসহ বিভিন্ন শহরে পত্র প্রেরণ করেন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করার জন্য। ফলে আহমদ ইবন হেজা আগমন করেন। তার সঙ্গে ছিল আরও অনেক আরব। আর আল কার্ক অঞ্চলের শাসনকর্তা মালেক মাসুদ বারো জুমাদাল আখের শনিবার সুলতানের সাহায্যে উপস্থিত হন তার নিকট বিভিন্ন স্থান থেকে আরো অনেক লোক আগমন করে। আর তুর্কমান এবং আরবরাও তার কাছে আগমন করে। আর দামেস্ক নগরীতে অনেক বলল কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে তথায় অনেক সৈন্য সামন্তের সমাবেশ ঘটে এবং হালব অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লোকজন পালিয়ে যায়। তার পালিয়ে যায় এই আশংকায় যে তাতারী শত্রুরা যাতে অকস্মাৎ তাদের উপর হামলা করে না বসে আর তাতারীয়া মানকুর তামার ইবন হালাকু খাঁনকে সঙ্গে নিয়ে মানবতার অঞ্চলে পৌঁছে যায়। সঙ্গে জিম্মীদেরকে মুসলমান করা হোক এবং কেউ ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে শূলীবিদ্ধ করা হোক। ফলে তারা তাকে যে আমরা ঈমান এনেছি এবং সুলতান আমাদের ঈমান আনার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি পূর্বাভাস দেন যে তাদের মধ্যে কেউ অস্বীকার করলে তাকে সূক আল খাইলে শূলীবিদ্ধ করা হবে এবং গলায় রশি লাগানো হবে। ফলে এ অবস্থায় তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর মালেক মনসুর হিমস নগরীতে পৌঁছে মালেক কামেল সানকার আল আশ্বারকে পত্র প্রেরণ করেন তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা মুছাল্লার দিকে এগিয়ে যায়। আর তাতারীরা একটু একটু করে অগ্রসর হয়। তারা হিমায অঞ্চলে পৌঁছে বাদনার বাগান, মহল এবং তথাকার বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। আর এই সময় সুলতান মনসুর তুর্কি এবং তুর্কমান সৈন্যদের সঙ্গে হিমস নগরীতে তাবুতে অবস্থান করছিলেন। অন্যান্য সৈন্য-সামন্ত ছিল সংখ্যায় বিপুল। আর তাতারীরা লক্ষাধিক লড়াকু সৈন্য নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

হিমস নগরীর ঘটনা

১৪ রজব বৃহস্পতিবার উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং সূর্য উদয়ের সময় দুই বিপরীত বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাতারীর বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ আর মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তার অর্ধেক বা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি। আর সৈন্যরা ছড়িয়ে ছিল খালিদ ইবন ওয়ালিদের মাজারের মধ্যস্থল রাস্তা পর্যন্ত। তাতারী সৈন্যরা তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ দিন থেকে এমন তুমুল যুদ্ধ দেখা যায়নি। দিনের প্রথম ভাগেই তাতারীয়া বিজয়ী হয় এবং তারা ডান দিকের দলকে পরাজিত করে। অনুরূপভাবে বাম দিকের দলও অস্থির হবে ওঠে। কেবল আল্লাহর নিকট সাহায্য কামানা করে। মূল বাহিনীর বাম বাহু ভেঙ্গে পড়ে। একটা ক্ষুদ্র দল নিয়ে দৃঢ়তার পরিচয় দেন। মুসলিম বাহিনীর অনেকেই পরাজিত হয়। তার তাতারীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। তারা হিমস নদী পর্যন্ত পৌঁছে। আর তথায় দরজা বন্ধ ছিল। তাই সেখানে তারা বিপুল বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। আর মুসলমানরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

অতঃপর বীর বাহাদুর যোদ্ধাদের বড় বড় আমির যেমন সানকার আল আশকার, তায়বারস আল ওয়াযিরী, বদরুদ্দিন আমির সালাহ, আইতামাশ সাদী, হুসামউদ্দিন লাজিন, হুসামুদ্দিন

তারাণতায় এবং দুয়াইদারী প্রমুখ এরা সকলে পরস্পর পরামর্শ করে তারা যখন সুলতানের দৃঢ়তা দেখতে পায় তখন সৈন্যদের সুলতানের দিক ধাবিত করে আর সুলতান বীরত্বের সঙ্গে অনেক গুলো হামলা পরিচালনা করেন অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নিজ শক্তি বলে তাতারীদেরকে পরাজিত করেন। আর মানকুর তামার আহত হয় আর আমির ঈসা ইবন মেহনা আল আরয এর পক্ষ থেকে তার নিকট আগমন করে এবং তাতরিদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে সৈন্যরা আহত হয় এবং পরাজয় সম্পন্ন হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি বিপুল সংখ্যক তাতারীকে হত্যা করেন। আর যে সব তাতারী পরাজিত মুসলমানদের পশ্চাৎদ্বান করেছিল তারা ফিরে এসে দেখতে পায় যে, তাদের সঙ্গিরা পরাজিত হযেছে আর সৈন্যরা তাদের পশ্চাৎদ্বান করত তাদের হত্যা করছে এবং বন্দি করছে আর সুলতান পতাকা তলে স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জনাব তার পিছনে ঢোল-বাজনা বাজানো হচ্ছে। অথচ আর সঙ্গে কেবল এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রয়েছে। ফলে তারা একে প্রলুব্ধ হয় এবং তাদেরকে হত্যা করে। তাদের সামনে চরম দৃঢ়তা অবলম্বন করে। তারা তার সম্মুখেই পরাজয় বরণ করে। তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দেনে এবং অধিকাংশকে হত্যা করেন। আর এতে বিজয় সম্পন্ন হয়। সূর্যাস্তের পূর্বেই তাতারীরা পরাজিত হয়। আর তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের একদল সালমিয়া অঞ্চলে গমন করে আর অপর দল গমন করে হালক ও ফোরাত অঞ্চলে আর সুলতান তাদের পশ্চাদ্বন করার জন্য লোক প্রেরণ করেন আর ১৫ রজব শুক্রবার দামেস্কে বিজয়ের বার্তা পৌছে এবং সেখানে আনন্দ প্রকাশ করা হয। এই উপলক্ষ্যে শহরকে সজ্জিত করা হয় এবং মশাল জ্বালানা হয়। এতে সকলেই আনন্দিত হয়। আর শনিবার সকালে একদল পরাজিত লোক আগমন করে, তাদের মধ্যে ছিল বেলেক নাসেরি এবং হালেক প্রমুখ। প্রথমদিকে তারা যে পরাজয় দেখেছে সে বিষযে লোকজনকে অবহিত করে। এরপর তারা আর কিছুই দেখেনি। লোকজন ভীষন ভয় ভীতি এবং অস্থিরতায় থাকে এবং অনেকে পলায়ন করতে উদ্ধত হয়। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ দূত আগমন করে শুরু এবং শেষের পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করে। ফলে লোকজন ফিরে যায় এবং সকলে ভীষণ আনন্দিত হয়। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর প্রাপ্য।

অতঃপর ২২ রজব সুলতান দামেস্কে নগরীতে প্রবেশ করেন। তার সম্মুখে ছিল বন্দিদল। তাদের হাতে ছিল তীর বর্ষা যাতে ছিল নিহত ব্যক্তিদের মস্তকের অংশবিশেষ, দিনটি ছিল শুক্রবার জুমআর দিন। আর সুলতানের সঙ্গে ছিল সানকার আল আশকারের একদল সঙ্গি সাথী। যাদের মধ্যে ছিল আলামুদ্দিন দুয়াইদারী। আল্লাহ তাদের থেকে লোকজনকে মুক্তি দেন। আর এ ঘটনায় শীর্ষস্থানীয় আমিরদের একটা দল শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আমির কবির ইয়াযুদ্দিন আযমুর জন্মদার। আর এই দিন তিনি তাতারীদের বাদশা মনকুর অমরকে আহুত করেন। আর তিনি নিজেই নিজেকে বিপদে ফেলেন এবং ধারণা করেন যে তিনি তাদের প্রতি লাপ দেবেন। আর তিনি নিজেই নিজের বর্শাকে উল্টিয়ে ধরেন যাতে তা সে পর্যন্ত পৌছে যায়। এবং বর্শা নিক্ষেপ করে তাকে আহত করেন। অবশেষে তারা তাকে হত্যা করে। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। মহাকবি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়।

দোসরা শা'বান রোববার মিশরের উদ্দেশে দামেস্ক নগরী ত্যাগ করেন। এ সময় লোকজন তার জন্য দোআ করছিল। সুলতানের সঙ্গে আলামুদ্দিন দুয়াইদারীও বের হন গাজা উপত্যকা থেকে তিনি ফিরে আসেন। আল মাশাদ তাকে শাম দেশের আমির বিভিন্ন বিষয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। বার শা'বান সুলতান মিশরে প্রবেশ করেন এবং শা'বান মাসের শেষ দিকে তিনি মিশর এবং কায়রোর বিচারক নিয়োগ করেন কাযী তাযীউদ্দিন আল-বাহানসী আল শাফেঈকে। সাত রমযান রোববার দামেস্ক নগরীতে যাওহারিয়া মাদরাসা তার প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশায় উদ্বোধন করা হয় তার নাম ছিল নাযমুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আব্বাস ইবনে আবুল মাতাবেন আল যাওহারি এবং হানীফা মাযহাবের কাযী হুসাসুদ্দিন রাযী উক্ত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। আর ২৯ শা'বান শনিবার ভোরবেলা আবু ওমরের মাদরাসায় আযান খানা পুরান মসজিদের ওপর ভেঙ্গে পড়লে এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করেন। আর দশ রমযান দামেস্ক নগরীতে এক বিপুল শিলাবৃষ্টি এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড শীত নেমে আসে। ভূমির ওপর বরফের স্তূপ কাঁধ পর্যন্ত জমে যায়। এতে শাক সবজির বিপুল ক্ষতি হয় এবং জনসাধারণের জীবন জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি হয়। আর শাওয়াল মাসে সানযার অঞ্চলের শাসনকর্তা তাতারীদের ভয়ে পলায়ন করে দামেস্ক নগরীতে উপস্থিত হন এবং পরিবার পরিজন আর সহায় সম্পদ নিয়ে সুলতানের বৈশ্যতা স্বীকার করেন এবং শহরের নায়েব তাকে অভিনন্দন জানান এবং স্ব-সম্মানে তাকে মিশরে পৌছান।

শাওয়াল মাসে আহলে কিতাব জিম্মীদের সম্পর্কে একটা বৈঠক বসে যারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সম্পর্কে একদল মুফতি ফতোয়া দেন যে, তারা স্ব-ধর্মে ফিরে যেতে পারে। কারণ, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল। আর কাযী জামালুদ্দিন ইবন আবু ইয়াকুব আল মালেকির দরবারে বাধ্য করার বিষয়টা প্রমাণ করা হয়। ফলে তাদের অধিকাংশ স্বধর্মে ফিরে যায় এবং পূর্বের মতো জিজিয়া কর আরোপ করা হয়। যেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে সেদিন আল্লাহ তাদের চেহারা কালো করুন। কথিত আছে যে, এ জন্য তাদের উপর অনেক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়। আল্লাহ তাদের মন্দ করুন।

যিলক্বদ মাসে সুলতান ইতাসাস সাদীকে আটক করে আল জাবাল দূর্গে বন্দি করেন এবং তার নায়েব দামেস্ক নগরীতে সাইফুদ্দিন বলবান আল হারুনীকে বন্দি করে দূর্গে আবদ্ধ করে রাখেন। এবং ২৯ যিলক্বদ বৃহস্পতিবার ভোরে অর্থাৎ ১০ মার্চ লোকজন দামেস্কের ঈদগাহে ইসতিসকার নামায আদায় করে এবং ১০ দিন পর বৃষ্টি বর্ষণের ফলে তারা তৃপ্ত হয়। আর এই বৎসর মালেক মনসুর মালেক খাতুনের পরিবারের সকল সদস্য অর্থাৎ, নারী পুরুষ শিশু খাদেম সকলকে মিশর দেশ থেকে আল কার্ক অঞ্চলে বিতাড়িত করে, যাতে তারা মালেক মাসুদ খিযির ইবন যাহিরের আশ্রয় লাভ করে। এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন তাতারীদের বাদশা আবগা ইবন হালাকু খান।

ইবনে তাওলী ইবনে চেঙ্গিস খান

তিনি ছিলেন ভীষণ সাহসী এবং অতীব ভাবুক ব্যক্তি এবং সুস্থ চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর এবং তার রাজত্বকাল ছিল আঠার বৎসর। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় ইনি পিতার সমপর্যায়ের ছিলেন না। আর হিমস অঞ্চলের এই যুদ্ধ তার মতামত এবং পরামর্শ

অনুযায়ী হয় নি। তদীয় ভ্রাতা মানকুর তামার এটা পছন্দ করতেন এবং তিনি এর বিরোধীতা করেননি। আমি জনৈক বাগদাদীর ইতিহাস গ্রন্থে দেখেছি যে। সিরিয়া অভিমুখে মানকু তামারের আগমন ঘটেছে সানকার আল আশকারের পত্র যোগাযোগের ফলে। আল্লাহ ভালো জানেন। আর আবগা নিজে উপস্থিত হন এবং ফোরাত নদীর তীরে এসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তাতে তিনি ব্যথিত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুই ঈদের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং অবসর তদীয় পুত্র আহমদ বাদশা হন। এই বৎসর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কাযীউল কুযাত

নাযমুদ্দীন আবু বকর ইবন কাযীউল কুযাত সদবুদ্দীন আহমদ বিনকাযীউল কফত শামসুদ্দিন ইয়াহহিয়া ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আল হাসান ইবন ইয়াহীয়া ইবন মোহাম্মদ ইবন আলী আল শাফেঈ ইন সীনী উদ দৌলা। তিনি ৬১৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাতে দক্ষতা অর্জন করেন। ইনি ছিলেন তদীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত। তার জীবন ছিল প্রশংসনীয় এবং তিনি ছিলেন মাফফারিয়া রাজ্যে কর্তৃত্ব সম্পন্ন কাযী। এখনে তিনি অনেক প্রশংসার অধিকারী হন। আর শায়খ শিহাবউদ্দিন তাকে এবং তার পিতাকে গাল মন্দ দিত। আর আল যারযানী বর্ণনা করেন যে ধর্মীয় বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ইনি ছিলেন কঠোর এবং স্বাধীনচেতা। তিনি মিশরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং তথাকার জাখে মসজিদে শিক্ষাদান করেন অতঃপর দামেস্ক নগরীতে ফিরে আসেন এবং তথায় আমিনিয়া এবং রুকনিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন। পরবর্তী কালে হালব অঞ্চলের কাযীর পদ গ্রহণ করেন এবং দামেস্ক নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সাগযার দামেস্ক নগরীতে তাকে কাযীর দায়িত্ব দেন। অতঃপর ইবন খাল্লিকানের মাধ্যমে তাকে পদচ্যুত করা হয। যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর মুহাররাম মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার তার ইন্তেকাল হয় এবং পরদিন তদীয় দাদার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কাযীউল কুযাত সদরুদ্দীন ওমর

ইবনুল কাযী তাজউদ্দিন আব্দুল ওয়াহাব ইবন খালব ইবন আবুল কাশেম আল গালবি ইবন বিনতুল আয়াশ আল মিসরী। ইনি ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ। ধর্মীয় বিষয়ে পিতার মত তিনি ছিলেন অনুসন্ধানী। তাকে আপল কারাফা গোরস্থানে দাফন করা হয়।

শায়খ ইবরাহীম ইবন সাঈদ আল শাসুরী

আত্মবিস্মৃত এই ব্যক্তি জীয়ানা নামে খ্যাত এবং দামেস্ক নগরীতে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধিহীন লোকজনের মুখে মুখে আর অলৌকিক কাহিনী এবং অনেক মুকাশাফা সম্পর্কে আলোচনা হতো। যারা নিয়মিত নামায, রোযা পালন করে ইনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এতদ্বসত্ত্বেও সাধারণ অসাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। সাত জুমাদাল উলা রোববার তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কাসীউন গোরস্থানে শায়খ ইউসুফ কিমীনির কবরের পাশে অপ্রকৃতি লোকদের সঙ্গের তাকে দাফন করা হয়। শায়খ ইউসুফ অনেক দিন

আগে ইন্তেকাল করে। আর শায়খ ইউসুফ শহীদ হাসাম নুরউদ্দিনের বাসস্থান আল বায়রিনে অবস্থান করতেন। ইনি আবর্জনার মধ্যে বসে কাটাতেন এবং অপরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় পরিধান করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল এবং অনেকে তাকে মান্য করতো এবং ভালবাসত। এমনকি সাধারণ মানুষ তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং ভাল ভাষায় বাড়াবাড়ি করত। তিনি নামায পড়তেন না এবং নাপাকী থেকে দূরে থাকতেন না। কেউ তাকে দেখতে এলে আকমীনে ময়লা- আবর্জনার উপর তার পাশেই উপবেশন করত। সাধারণ মানুষ তার অনেক ঝরামাত বুজর্গি এবং মুকাশাফার কথা আলোচনা করত। আর এ সবই সাধারণ মানুষের নির্বুদ্ধিতা এবং অতিভক্তি। আর আত্ম-বিস্তৃত লোকজন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এমন ভক্তি শ্রদ্ধাই পোষণ করে। আর শায়খ উসুফ আল বিলীনি মৃত্যুবরণ করলে বিপুল সংখ্যক লোক তার জানাযায় যোগদান করে। এরা সকলেই ছিল সাধারণ মানুষ। এদের উপস্থিতিতে তার জানাযার অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে ওঠে। জনগণ তার লাশ কাঁধে বহন করে কাসীউন গোরস্থানে নিয়ে যায়। আর শবযাত্রার সম্মুখ ভাগে ছিল নিম্নশ্রেণির লোকেরা। উপস্থিত লোকজনের মুখে মুখে ছিল তাকবীর আর তাহলীল। এমন সব শব্দ তারা উচ্চারণ করে যা জায়েয নয়। তারা তার লাকা কাসীউন গোরস্থানে মাজনুনের পাশে দাফন করেন। তার কবর সম্পর্কে কোনো এক ভক্ত যত্ন নেয় এবং নকশা করা পাথর কবরে স্থাপন করে এবং তার কবরের উপর সুসজ্জিত ছাদ নির্মাণ করে এবং সেখানে দরজা বিশিষ্ট একটা হুজরাও স্থাপন করে। এসব ভক্তের দল তার কবর নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে। একদল লোক তার কবরের পাশে দীর্ঘদিন অবস্থান করে এবং কুরআন তেলাওয়াত ও তসবী তাহলীল পাঠ করতে থাকে। জনৈক ভক্ত এসব লোকের জন্য পানাহারের আয়োজন করে। এই সব লোক কবরের পাশে অবস্থান করে পানাহার করতে থাকে। আর শায়খ ইউসুফ আল কিমীনি ইন্তেকাল করলে শায়খ ইবরাহিম জীয়ানা শাগুর অঞ্চল থেকে একদল ভক্ত অনুরক্ত সঙ্গে নিয়ে কাবুস সগীর আগমন করত অনেক হৈ হুল্লগামা করে। তথায় এরা দাবি তোলে আমাদেরকে নগরীতে প্রবেশ করতে দিতে হবে। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলে দীর্ঘ বিশ বছর যাবত আমি দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করতে পারছি না, যখনই আমি নগরী প্রাচীরে উপস্থিত হই তখনই দেখতে পাই যে, তথায় হিংস্র জন্তু ঘেরাও করে আছে। ফলে আমি নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হই না। কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করলে সেই হিংস্র জন্তু আমাকে প্রবেশ করতে দেয়। এ সবই হচ্ছে গান গল্প। মুল বিষয় গোপন রাকার জন্য এসব গাল গল্প প্রচার করা হয়। আর এসব লোকরাই তথাকথিত সাধু পুরুষদের ভক্ত সাজে। কথিত আছে যে, শায়খ ইউসুফের নিকট যে সব উপহার সামগ্রী আসতো সে সব তিনি জীয়ানা অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। মহান আল্লাহ বান্দাদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল জানেন। তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনিই সকলের নিকট থেকে হিসাব করবেন।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, হিমসের ঘটনায় একদল আমির শাহাদাত বরণ করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন আমির ইযযুদ্দিন ইজদিসুর সালাহদারী। যিনি আনুমানিক ষাট বৎসর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি ছিলেন অন্যতম উত্তম আমির। আর ইনি ছিলেন অসীম বীরত্বের অধিকারী। আশা করা যায় যে, জান্নাতে তিনি উচ্চ মাকাম হাসিল করবেন।

কাযী আল কুযাত

তকীউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ্ বিনুল হুসাইন ইবন রযীন ইবন মুসা আল আমেরি আল হাসাবী আল শাফেঈ। ইনি হিজরী ৬০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শায়খ তকীউদ্দিন ইবন সালেহ এর নিকট থেকে উপকৃত হোন। এবং দীর্ঘদিন তিনি দারুল হাদীসে ইমামযি করেন এবং শামিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ ছাড়া তিনি দামেস্ক নগরীতে বায়তুল মালের। দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি মিশর গমন করেন এবং তথায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করেন। তথায় তিনি শাসন কার্যেও অংশ নেন। ইনি ছিলেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। একই বৎসর দোশরা রজব রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। এবং আল মাকতাম গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। যিলক্বদ মাসের ২৪ তারিখ শনিবার তিনি আল মালেক আশরাফ ইন্তেকাল করেন। ইনি ছিলেন মুজাফফরউদ্দিন মুসা ইবন আল মালেক আয যাহের দাউদ্ আল মুজাহিদ ইবন আসাদউদ্দিন চোরানে ইবন আন নাসের উদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আসাদউদ্দিন শ্রেবকো ইবন শাযী ইবন সাহেবে হিমস তথা হিম্‌স অঞ্চলের শাসনকর্তা। কাসীউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আর যিলক্বাদ মাসে মৃত্যুবরণ করেন শায়খ জামালউদ্দিন আল ইস্কান্দারী। ইনি ছিলেন দামেস্ক নগরীর হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা। কায়রোজ মিনারের নিকটে তার মকতব ছিল। এই মকতব দ্বারা বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। তার সময়ে ইনি ছিলেন হিসাব কিতাবে দক্ষ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

শায়খ আলামুদ্দিন আবুল হাসান

মোহাম্মদ ইবনুল ইমাম আবু আলী আল হুসাইন ইবন ঈসা ইবন আব্দুল্লাহ ইবন রাশীক আল রীফি আল মালেকী আল মিসরী। তাকে আল কারাফা গোরস্থানে দাফন করা হয়। তার জানাতায় বিপুল লোক অংশ গ্রহণ করে। ইনি ছিলেন ফকীহ এবং মুফতি। হাদীস শ্রবণ করেন। তার বয়স হয়েছিল। ৮৫ বৎসর ২৫ যিলহজ্জ সোমবার মৃত্যুবরণ করেন।

আল সদর আল বকীর আবুল গামায়েস আর মুসলিম

মোহাম্মদ ইবন আল মুসলিম মাক্কী ইবন খলফ ইবন গাইলান আল কাইসী আল দামেস্কি। ৯৪ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন বড় মাপের আমির এবং উচ্চ পরিবারের সন্তানা দামেস্ক ইত্যাদি নগরীতে তিনি বড় বড় পদে দায়িত্ব পালন করেন অবশেষে এই সব ত্যাগ করে তিনি ইবাদত এবং হাদীস লেখায় আত্ম নিয়োগ করেন। ইনি দ্রুত লিখতে পারতেন। এবং একদিনে তিনটি খাতা শেষ করে ফেলতেন। তিনি মুসনাদে ইমাম আহমদ তিন বার শ্রবণ করেন এবং সহীহ মুসলিম আর জামে তিরমিযী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ বয়ান করেন। আর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে বারযালী। আল পারি এবং ইবন তায়মিয়া। একই দিন কাসিউন গোরস্থানে ৮৬ বছর বয়সে তাকে দাফন করা হয়। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

শায়খ শফীউদ্দিন

আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইবন ওসমান ইবন মোহাম্মদ আল তামীমী আল হানাফী। বসরা নগরীতে ইনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের শায়খ। তথায় আমিনীয়া মাদরাসায় তিনি অনেক বৎসর শিক্ষতা করেন। ইনি ছিলেন প্রাজ্ঞ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বড় আলেম এবং আবেদ।

জনসাধারণ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। ইনি ছিলেন কাযী আল কুযাত সদরুদ্দিন আলীর পিতা। ইনি দীর্ঘ হায়াত পান। ৫৮৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বৎসর শা'বান মাসের মধ্য ভাগে ৯৯ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

হিজরী ৬৮১ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮২সন)

৭ বৎসরের শুরুতে হাকেম বি আমরিল্লাহ খলীফা ছিলেন আর সুলতান ছিলেন মালেক মনসুর কালাউন্ এই বৎসর তাতারীদের সম্রাট আহমদ মালেক মনসুরের নিকট বাণী প্রেরণ করেন এবং সমঝোতা স্থাপনের মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য তার নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। দূতদের মধ্যে নাসীরউদ্দিন তূসী জনৈক শিষ্য শায়খ কুতুবউদ্দিন সিরাজী ও ছিলেন। মালেক মনসুর এতে সাড়া দেন এবং এ মর্মে তাতারীদের সম্রাটের নিকট পত্র প্রেরণ করেন আর সফর মাসের শুরুতে সুলতান আমির কবির বদরুদ্দিন বায়বরী সাদী এবং আসির আলাউদ্দিন সাদী আল শাসসীকে গ্রেফতার করেন।

আর এই বৎসর কাযী বদরুদ্দিন ইবন জুমআ আল কাইসারিয়ায় এবং শায়খ শামসুদ্দিন আবুস সূফী আল হাবিরী সারহানিয়ায় এবং আলাউদ্দিন ইবন জাম্বিকানি আমিনিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন। আর রমযান মাসের সোমবার রাবাদিন অঞ্চলে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তথায় রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত, আমির হুমাশ উদ্দীন লাজীনসহ একদল আমির উপস্থিত হন। এই রাতটি ছিল অতি ভয়ংকর। সেই রাতের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন। এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কাযী নাযমুদ্দিন ইবন নাহাস, যিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন এবং পূর্বের চেয়ে আরও সুন্দর গৃহ নির্মাণ করেন। সমস্ত প্রশংসা আর কৃতিত্ব মহান আল্লাহর জন্য। এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন

শায়খ সালেহ বাকিয়াতুস সলফ বুরহানুদ্দিন আবু ইসহাক ইবন শায়খ শফিউদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন ইয়াহহিয়া ইবন আলাবী ইবনুল রাযী আল হানাফী। ইনি ছিলেন কাশাফ অঞ্চলে মা'যিয়া মসজিদের ইমাম।

একদল লোককে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, তাদের মধ্যে আল কিনদী হানাস্তনীও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পুর্বে এটা প্রকাশ পায়নি। আর তাকে অনুমতি দেন আবু নসর সাঈদালানী, আফিয়া আল ফারকানীয়া এবং ইবনুল মায়দানী। ইনি ছিলেন সাধু ব্যক্তি যিনি হাদীস শ্রবণ করানোকে ভালবাসতেন এবং ছাত্রদের প্রতি সদাচার করতেন। আর হাফেয জামালুদ্দিন আল মাজী তার নিকট মুযাম আল তাবরানী আল কাবীর পাঠ করেন এবং তিনিসহ আরও একটা বড় দল তার নিকট থেকে হাফেয আল বারযানীর কিরা'আতে তা শ্রবণ করেন। হিজরী ৫৯১ সালে তার জন্ম হয়। সফর মাসের ৭ তারিখ রোববার তিনি ইন্তেকাল করেন। আর এটা ছিল এমন দিন, যে দিন হাজীরা হিজায থেকে দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন। তিনিও তাদের সঙ্গে ছিলেন। দামেস্ক নগরীতে অবস্থান শেষে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কাযী আমিনুদ্দিন আল তলাশতারী

আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শামসুদ্দিন আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল জব্বার ইবন তালহা আল হালবী, যিনি আল আশতারী নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী একজন মুহাদ্দিস। তিনি অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং দারুল হাদীস আশরাফিয়ার কিছু অংশ ওয়াকফ করে দেন। আর শায়খ মহিউদ্দিন নববী তার প্রশংসা করতেন এবং তার নিকট পড়ার জন্য শিশুদেরকে প্রেরণ করতেন। কারণ, তিনি ছিলেন শিশুদের জন্য বিশ্রস্ত এবং পুত-পবিত্র ব্যক্তিত্ব।

শায়খ বুরহানউদ্দিন আবুস সানা

মাহমুদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল মারাগী আল শাফেঈ। ইনি ছিলেন আল ফালাকিয়া মাদরাসার শিক্ষক। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম। কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য তার নিকট প্রস্তাব করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তেইশ রবিউল আখের শুক্রবার ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করেন। তার পরে ফালাকিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন কাযী বদরুদ্দিন ইবন যাবী।

কাযী ইমাম আল্লামা শায়খুল কুররা যয়নুদ্দিন

আবু মোহাম্মদ ইবন আব্দুস সালাম ইবন আলী ইবন ওমর আয যাহাবী আল মালেকী। ইনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের সবচেয়ে বড় কাযী। ইনি প্রথম ব্যক্তি যিনি মালেকী মাযহাবের কাযী নিযুক্ত হন খোদাভীতি এবং পদের প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকায় তিনি পদত্যাগ করেন এবং আট বৎসর কোন পদ গ্রহণ না করে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিরাশি বৎসর বয়সে আট রজব রাত্রিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং সানযারী ও ইবন হাকিমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

শায়খ সালাহউদ্দিন

মোহাম্মদ ইবন কাযী শামসুদ্দিন আলী ইবন মাহমুদ ইবন আলী শহরযুরী। ইনি ছিলেন কায়মারিয়া মাদরাসার শিক্ষক এবং শিক্ষকের সন্তান। রজব মাসের শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার এক মাস পর তার ভাই শরফুদ্দিন ইন্তেকাল করেন। সালাহউদ্দিনের পর কাযী বদরুদ্দিন ইবন জুম'আ কায়মারিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন।

কাযী আল কুযাত ইবন খাল্লিকান

শামসুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মোহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আবু বকর ইবন খাল্লিকান আল আরবালী আল শাফেঈ। ইনি ছিলেন অন্যতম ইমাম এবং একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বিশিষ্ট আলেম এবং রইস ব্যক্তিদের অন্যতম গুরুজন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি নব পর্যায়ে সব মাযহাবের প্রধান কাযীর পদ সৃষ্টি করেন। এরপর তারা বিচার কাজে নিযুক্ত হন। আর এ পদটি তার এবং কাযী ইবনুস সায়েবের মধ্যে আবর্তন করত। কখনো কখনো ইনি দায়িত্ব ত্যাগ করতেন, উনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। প্রভাবে উভয়ের মধ্যে পদটি আবর্তন করতো। ইবন খাল্লিকান বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, যা অন্য কারো পক্ষে সংঘটিত হয়নি। শেষ সময় তার হাতে আমিনিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব ছিল না। আর তদীয় পুত্র

কামালুদ্দিন মুসার হাতে ছিল মজিযিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব। আর উপরোক্ত নজিবিয়া মাদরাসায় রজব মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিন শেষ বেলা ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ৭৩ বছর। পরদিন কাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। আর কথপোকথন ছিল অতি চমৎকার। তার একটি উপকারী ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। যা ওয়াকিয়াত আল আ'ইয়ান নামে পরিচিত। এটি ইতিহাস বিষয়ে এক অনুপম গ্রন্থ।

হিজরী ৬৮২ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৩ সন)

৭ বৎসর সাত রজব জুমার দিন বাদশা মনসুর বিপুল শান-শওকত সহকারে দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন দামেস্কের ইতিহাসে দিনটি ছিল স্মরণীয়। আর বৎসর মহিউদ্দিন ইবনুল হারাস্তানীর মৃত্যুর ফলে শায়খ আব্দুল কাফী ইবন আব্দুল মালেক ইবন আব্দুল কাফী দামেস্ক মসজিদে খুতবা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এই বৎসর ২১ রজব শুক্রবার তিনি মসজিদে খুতবা দেন। আর এই দিন নামাযের পূর্বে কাযী ইবযুদ্দিন ইবনুল সায়েবের দূর্গে তদারকিতে রাখা হয়। আর ইবনুল হাসী বিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের নায়েব, তিনি মালপত্র লিপিবদ্ধ করেন। যাতে এ কথা উল্লেখ ছিল যে, ইবনুল আসকাফের পক্ষ থেকে তার নিকট আট হাজার দিনার পরিমাণ সমুদ্র রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ কথা ছড়িয়েছে তিনি হালব অঞ্চল থেকে আগমন করেন যাকে বলা হয় তাজউদ্দিন বিনুস সানযারী এবং তারপর কাযীর পদ গ্রহণ করেন বাহাউদ্দিন ইউসুফ ইবন মহিউদ্দিন ইবনী যকী। আর রজব মাসের রোববার তিনি প্রথম রায় প্রদান করেন। এবং ইবনুস সায়েবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোকজনকে বারণ করেন। অপর এক মানপত্রে অভিযোগ করা হয় যে, তার নিকট সালেহ ইসমাঈল ইবন আসাদউদ্দিনের ২৫ হাজার দিনার এর সমপরিমাণ আমানত রয়েছে। আর এ ব্যাপারে ইবন শাকেরী এবং জামাল ইবন হামাবী এবং অন্যরা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সকলে তৃতীয় মাথলা প্রসঙ্গের কথা বলে। অতঃপর এ জন্য আর একটা মজলিস ডাকা হয়। যাতে তিনি তিনি ভীষণ কষ্ট পান। তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে এবং তাকে পুনরায় সালতানাত লাজীন এবং একদল আমির দাঁড়ায়। তারা এ ব্যাপারে সুলতানের সঙ্গে কথা বললে তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। এবং তিনি স্বগৃহে গমন করেন আর ২০ শা'বান সোমবার ছিল লোকজন তাকে অভিবাদন জানাতে আগমন করে। পরে তিনি আদিলিয়া থেকে দারবুন নাকাশায় স্বগৃহে স্থানান্তর হন। আর তিনি সাধারণত নিজ গৃহের সম্মুখে মসজিদের সামনে বসতেন।

রজব মাসে জামালুদ্দিন ইবন শাসরী দামেস্ক শহরের তদারকির দায়িত্ব তার গ্রহণ করেন আর শা'বান মাসে খতিব জামালুদ্দিন ইবন আব্দুল কাফী খতিব ইবনুল হারাস্তানীর স্থলে গাজালিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন। আর তার নিকট থেকে দাওয়ারিয়া দায়িত্ব নিয়ে নেন, যিনি ছিলেন বায়তুল মালে দায়িত্বপ্রাপ্ত। অতঃপর শামসুদ্দিন আল আরিরী উপরোক্ত ইবন আব্দুল কাফীর নিকট থেকে আল সাজালিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দানের দায়িত্ব নিয়ে নেন। আর শা'বান মাসের শেষ দিকে ইবনুল যাকীর নিকট থেকে শরফুদ্দিন আহমাদ ইবন নে'মাত আল মাকদেসী আদালতের নায়েবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইবন নে'মাত আল মাকদেসী ছিলেন

অন্যতম বিশিষ্ট আলেম এবং ইমাম। ইনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় লেখক আলেমদের অন্যতম। তার ভ্রাতা শাতাসুদ্দিন মোহাম্মদ শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করলে তিনি তদস্থলে শামিয়া আল বারালিয়া মাদরাসায় দারস দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার নিকট থেকে ছোট আদিলিয়ার দায়িত্ব ও হস্তগত করেন। অতঃপর যিলক্বদ মাসেকাযী নাযমুদ্দিন আহমদ ইবন ছাছরী তাদলীবী তত্তায় দারস দান করেন। অনুরূপভাবে শরফুদ্দিনের নিকট থেকে রাওয়াহিয়া মাদরাসায় দারসদানের দাযিত্ব হস্তগত করেন এবং তথায় নাযমুদ্দিন বায়াবী যিনি ছিলেন আদালতের নায়েব তিনি সেখানে দারস দান করেন। তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন আল সদর আল কবির ইমাদুদ্দিন আবুল ফজল মোহাম্মদ ইবন কাযী শামসুদ্দিন আপু নসর মোহাম্মদ ইবন হেবাতুল্লাহ সিরাজী। ইনি ছিলেন লিপি কলায় একটা পদ্ধতির উদ্ভাবক। ইনি হাদিস শ্রবণ করেন এবং দামেস্ক নগরীর অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এ বৎসর সফর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খুল জাবাল শায়খ আল্লামা শায়খুল ইসলাম শামসুদ্দিন আবু মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবন শায়খ আবু ওমর মোহাম্মদ ইবন আহমদ বিন মোহাম্মদ ইবন কুদাসা আল হাম্বলী। দামেস্ক নগরীতে হাম্বলী মাযহাবের কাযীর পদ গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন ইনি। অতঃপর তিনি এ দায়িত্ব ত্যাগ করলে তদীয় পুত্র নাযমুদ্দিন তা গ্রহণ করেন ইনি জাবাল অঞ্চলে আশরাফিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দেওয়ার দায়িত্ব নেন, ইনি প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেন আর তিনি ছিলেন সে সময়ের আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এতদ্‌সঙ্গে তিনি ছিলেন সদিচ্ছা এবং বিনয় ও মর্যাদার প্রতীক। একই বৎসর রবিউল আখের মাসের শেষ দিকে মঙ্গলবার রাতে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। পিতার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ইবনু আবি জাফওয়ান

আল্লামা শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্বাস ইবন আবু জাফওয়ান আল আনসারী আল দামেস্কি। ইনি ছিলেন বড় মাপের মুহাদ্দিস এবং শাফেঈ মাযহাবের বড় ফকীহ এবং আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ে বড় মাসের পণ্ডিত। শায়খ তকীউদ্দিন এবং শায়খ হাফেজ হাজ্জাজ এদের প্রত্যেককে একে তার সম্পর্কে বলতে শুনেছি : এই ব্যক্তি মুসনাদে ইমাম আহমদ পাঠ করেন আর এরা উভয়ে শ্রবণ করেন এরা উভয়ে একমত হয়ে কোনো ভুল লিপিবদ্ধ করেননি। এরা উভয়ে তার প্রশংসা করাই তার জন্য যথেষ্ট। এরা উভয়ই ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

আল খতীব মহিউদ্দিন

ইয়াহহিয়া ইবনুল খতিব কাযীউল কুয়াত ইমামদুদ্দিন আবদুল করীম। বিন কাযীউল কুয়াত জামালুদ্দিন ইবনুল হায়াস্তানী আল শাফেঈ। ইনি ছিলেন দামেস্ক মসজিদের খতীব এবং আল গাজালিয়া মাদরাসার শিক্ষক। ইনি ছিলেন দক্ষ আলেম। তিনি ফতওয়া দান করেন এবং শিক্ষকতা করেন। তদ্বীয় পিতার পর তিনি খুতবা দান এবং আল গাজালিয়ার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার জানাযার নামাযে সরকারী কর্মকর্তাসহ বিপুল জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেন,

জুমাদাস সানী মাসে আটষট্টি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আর রজব মাসের পাঁচ তারিখ ইন্তেকাল করেন। আমির কবি মালেক আরাফ আল মাশরা আহমদ ইবন হাযা। ইনি বসরা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। দামেস্ক নগরীতে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করা হয়।

শায়খ ইমাম আলেম শিহাবউদ্দীন

আব্দুল হালিম ইবন শায়খ ইমাম আল্লামা মাজদুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবুল কাসেম ইবন তাইমিয়া আল হাররানী, আমাদের শায়খ আল্লামা মহান ব্যক্তিত্ব তাকীউদ্দিন ইবন তাইমিয়ার পিতা। ইনি ছিলেন বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে পার্থক্যকারী মুফতি। তার ছিল অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দামেস্কের জামে মসজিদে তার জন্য একটা আসন ছিল। সে আসনে বসে তিনি ইচ্ছে মত কথা বলতেন। আর তিনি কাসাঈনে অবস্থিত সাকারিয়া দারুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানেই তিনি অবস্থান করতেন। পরবর্তী বৎসর তথায় তদ্বীয় পুত্র শায়খ তকীউদ্দিন দারস দান করতেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তাকে সুফিয়ানের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

হিজরী ৬৮৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৪ সন)

এই বৎসর দোসরা মুহাররম সোমবার শায়খ ইমাম আল্লামা তকীউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আব্দুল্‌ হাশীম ইবন আব্দুস সালাম আল হাররানী কসাইন এ অবস্থিত দারুল হাদীস আল সাকারিয়ায় দারস দান করেন। এই সময় তার কাছে উপস্থিত ছিলেন কাযী আল কুযাত বাহাউদ্দিন ইবন যাকী, শাফেঈ, মাযহাবের অনুসারীদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব শায়খ তাজউদ্দিন আল ফাজারী, শায়খ যাইনুদ্দিন ইবনুল মারহাল, এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী যাইনুদ্দিন ইবন আল মানযা প্রমুখ তার এই দারস ছিল জমকালো। এই দারসের বিপুল কল্যাণের কারণে শায়খ তাজউদ্দিন আল-ফাজারী তার নিকট স্বহস্তে পত্র লেখেন উপস্থিত জনতা ও এই দারসের প্রশংসা করেন। কম বয়সের কারণে উপস্থিত জনতাও এজন্য তাকে অভিনন্দন জানান, কারণ এই সময় তার বয়স ছিল মাত্র বাইশ বৎসর। অতঃপর উপরোক্ত শায়খ তকীউদ্দিন দশই সফর শুক্রবার জুমার নামায শেষে তার জন্য প্রস্তুতকৃত মিম্বারে বসেন। কুরআন মজীদের তাফসীর করার নিমিত্ত এই মিম্বর প্রস্তুত করা হয় তাই তিনি কুরআন মাজীদের শুরু থেকে তাফসীর আরম্ভ করেন। আর বৈচিত্র্যপূর্ণ রকমারি তাফসীরের কারণে এতে বিপুল জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে। তার এই তাফসীরে ইবাদাত, আমানতদারী এবং দুনিয়া ত্যাগ সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা স্থান পেত। আর লোকজন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার সম্পর্কে আলোচনা ছড়িয়ে দিত। তিনি একটানা কয়েক বৎসর এই তাফসীর মাহফিল চালিয়ে যান।

এ বৎসর জুমাদাস সানী মাসের বারো তারিখ শনিবার সুলতান মিশর থেকে দামেস্ক আগমন করেন। এই সময় হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা মালেক মনসুর ও তার খিদমতে উপস্থিত হন। সুলতান দলবল নিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। শা'বান মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার রাতে উপস্থিত হলে দামেস্ক নগরীতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। এর সঙ্গে ছিল বজ্রপাত এবং বিদ্যুতের চমক। এর ফলে মহা প্লাবন দেখা দেয় যাতে বাবুল ফরাদিবসের তালা ভেঙ্গে যায় এবং পানি

অনেক উপরে উঠে যাতে অনেক লোক ডুবে মারা যায়। আর মিশরীয় বাহিনী তাদের উষ্ট্র এবং মাল-সামানা নিয়ে যায়। তিন দিন পর সুলতান মিশরীয়দের উদ্দেশ্যে বের হন এবং আলামুদ্দিন সানযার দুয়াইদারীর পরিবর্তে আমির শামসুদ্দিন শানকার বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর এই বৎসর তাতারীরা তাদের শাসনকর্তা সুলতান আহমদ সম্পর্কে মতভেদে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে পদচ্যুত করে হত্যা করে। এবং তদস্থলে আরগুণ ইবন আবগাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীর মধ্যে তারা এই ঘোষণা প্রচার করে এবং তাদের অবস্থা স্থির হয়ে যায়। এভাবে তাদের নাম টিকে থাকে এবং সুলতান আহমদের রাজত্ব ধ্বংস হয়। আর আরগুন ইবন আবগার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন–

শায়খ তালেব গিফায়ী

কাছরে হাজ্জাযে তার একটা প্রসিদ্ধ খানকা আছে। তার কোনো কোনো এক মুরিদ এই খানকা দর্শন করতেন। তথায় তার ইন্তেকাল হয়। এছাড়া, একই বৎসর যে সকল বিশিষ্টবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন

কাযী ইমাম ইযযুদ্দিন আবুল মাযাকের

মুহাম্মদ ইবন শরফুদ্দিন আব্দুল কাদির ইবন আফিফুদ্দিন ইবন আব্দুল খালেক ইবন খালি আল আনসারী আল দামেস্কি। ইনি দুইবার দামেস্কে কাযীর পদ গ্রহণ করেন। পরে ইবন খাল্লিকানের মাধ্যমে তিনি পদচ্যুত হন। অতঃপর দ্বিতীয় বার ও ইবন খাল্লিকান তাকে পদচ্যুত করেন। তিনি পদচ্যুত হয়ে বন্দি হন। এবং তারপর বাহাউদ্দিন ইবন তকী কাযীর পদ গ্রহণ করেন পদচ্যুত অবস্থায় নয় রবিউল আউয়াল মাসে বাসতানায় তিনি ইন্তেকাল করেন। আল খায়েল বাজারে তার জানাযার নামায আদায় করা হয় এবং কাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। হিজরী ৬২৮ সনে তার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। সাধু সজ্জন ব্যক্তিরা তার প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। ইবন বালবান মাশিখা সূত্রে তার জন্য হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইবন জাফওয়ান তাকে সে হাদীস শোনান। তারপর আযরাবিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন শায়খ যাইনুদ্দিন ওমর ইবন মাক্কী ইবন মারহাল ইনি ছিলেন বায়তুল মালের দায়িত্বশীল। তদ্বীয় পুত্র মহিউদ্দিন আহমদ এমাদিয়া মাদরাসা এবং দামেস্ক মসজিদের কালাসা খানকায় দারস দান করেন আটই রজব বুধবার তার পুত্র মৃত্যুবরণ করার পর এমাদিয়া এবং দেমাযিয়ায় মাদরাসায় দারস দান করেন শায়খ যাইনুদ্দিন ইবনুল ফারেকী। তদ্বীয় পুত্র কাযী ইযযুদ্দিন ইবন শায়েখ বদরুদ্দিন এবং আলাউদ্দিনের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি দারুল হাদীসে এই দারস দান করেন। এ বৎসর আরো ইন্তেকাল করেন

মালেক সাঈদ ফাহউদ্দীন

আব্দুল মালেক ইবন মালেক সালেহ আবুল হাসান ইসমাঈল ইবন মালেক আদিল। ইনি হচ্ছেন মালেক কামিল নাসিরুদ্দিনের পিতা। দেসরা রমযান সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন এবং পরদিন উম্মে সালেহ গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ইনি ছিলেন অন্যতম উত্তম আমির।

বিপুল সম্মানের অধিকারী এই ব্যক্তি ছিলেন অন্যতম রইস। তিনি ইয়াহহিয়া ইবন বাকীর সূত্রে আকরাম ইবন আবু শামামের বরাতে মুয়াত্তা বর্ণনা করেন এবং তার নিকট থেকে ইবনুল লায়সী প্রমুখ শ্রবণ করেন।

কাযী নাযমুদ্দিন ওমর ইবন নসর ইবন মনসুর

আল বায়ানী আল শাফেঈ। ইনি শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। ইনি ছিলেন পণ্ডিত এবং গুণী ব্যক্তি। প্রথমে তিনি যারা অঞ্চল, অতঃপর হালব অঞ্চলে কাযীর পদ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দামেস্কের নায়েবের পদ গ্রহণ করেন। তিনি রাওয়াহিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন এবং তারপরে শামসুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন নূহ আল মাকদেসী দশ সাওয়াল দারস দান করেন। আর অদ্য হিমাত অঞ্চলে তার বাদশা ইন্তেকাল করেন।

মালেক মনসুর নাসিরউদ্দীন

মোহাম্মদ ইবন মাহমুদ ইবন ওপর মালেক শাহ ইবন আইয়ুব। হিজরী ৬৩০ সালে তিনি জন্ম লাভ করেন এবং ৬৪২ হিজরী সনে তিনি হিম্মাত অঞ্চলের বাদশা হন। এ সময় তার বয়স ছিল বারো বছর এবং ৪০ বছরের বেশি সময় তিনি রাজত্ব করেন।

ইনি দান খয়রাত করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনেক দাসীকে মুক্ত করে দেন। তারপরে তদ্বীয় পুত্র মালেক মুজাফফর পিতা মালেক মনসুরের অনুকরণে রাজত্ব পরিচালনা করেন।

কাযী জামালুদ্দিন আবু ইয়াকুব

ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর আল রাযী। ইনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের কাযী আল কুয়ত। কাযী যাইনুদ্দিন আল জাবাবী, যিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন, তারপরে ইনি মালেকী মাযহাবের শিক্ষক হন। ইনি কাযী যাইনের প্রতিনিধিত্ব করতেন, তারপর ইনি স্বতন্ত্র ফয়সালাকারী হন। যিলক্বদ মাসের পাঁচ তারিখ হিজাযের পথে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইনি ছিলেন বড় মাপের আলেম এবং গুণী ব্যক্তি। তিনি কোন মানুষকে কষ্ট দিতেন না এবং নিজেও কোন কষ্ট করতেন না। তার মৃত্যুর পর তিন বৎসর যাবত তার পদ শূণ্য থাকে। তারপরে শায়খ জামালুদ্দিন আল শারীসী মালেকী মাযহাব অনুযায়ী শিক্ষা দান করেন। এরপর শিক্ষা দান করেন আবু ইসহাক আল লাওযী। তারপর বদরুদ্দিন আবু বকর আল বারীসী। অতঃপর কাযী জামালুদ্দিন ইবন সুলাইমান বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। মাদরাসায় পাঠ দান করেন। মহান আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

হিজরী ৬৮৪ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৫ সন)

১৭ বৎসর মুহাররম মাসের কোনো একদিন মালেক মনসুর দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন তাঁর সঙ্গে ছিল সেনাদল। তার সমীপে উপস্থিত হয় হিম্মাত অঞ্চলের শাসক মালেক মুজাফফর ইবন মনসুর তিনি সৈন্য– সামন্ত নিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান এবং রাজকীয় খিলাফতে ভূষিত করেন। অতঃপর সুলতান মিশরীয় এবং সিরীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে সফরে বের হন এবং আল মারকাব অঞ্চলে অবস্থান করেন। সফর মাসের আঠারো তারিখ শুক্রবার আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করেন। এ বিজয়ের সুসংবাদ দামেস্ক নগরীতে পৌঁছলে আনন্দ প্রকাশ করা হয়

এবং শহরকে সুসজ্জিত করা হয় এবং এতে মুসলমানরা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। কারণ, এ দূর্গটি ছিল মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর। কোন মুসলিম শাসনের পক্ষে এই দূর্গ জয় করা সম্ভব হয়নি, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ূবী এবং মালেক যাহের রুকুনদ্দিন বায়বারস আল বান্দাদারীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তিনি পাশ্ববর্তী বালনিয়াস এবং মারকাব অঞ্চলও জয় করেন। এটা ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী একটা ক্ষুদ্র শহর। এখানেই ছিল একটা সুরক্ষিত দূর্গ। এই দূর্গে তীর বল্লম, বর্শা কিছুই আঘাত করতে পারতো না, এমনকি প্রস্তর এবং মিনজানিকও ব্যর্থ হত। তিনি ত্রিপলির শাসনকর্তার নিকট বার্তা প্রেরণ করেন এবং তিনি সুলতান মালেক মনসুরের নৈকট্য লাভের আশায় দূর্গটি ধসিয়ে দেন। এভাবে মালেক মনসুর বিপুল সংখ্যক মুসলিম বন্দিকে মুক্ত করেন। এরা ফিরিঙ্গীদের নিকট বন্দি ছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। অতঃপর মালেক মনসুর দামেস্ক নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর মিশরীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কায়রো নগরী সফরে গমন করেন।

জুমাদাস সানী মাসের শেষের দিকে বাদশা মনসুরের পরিবারে পুত্র মালেক নাসের মোহাম্মদ ইবন কালাবুন জন্মগ্রহণ করেন। আর একই বৎসর মহিউদ্দিন ইবন নুহাশকে জামে মসজিদের দায়িত্ব থেকে আপসারণ করে এবং তদস্থলে ইযযুদ্দিন ইবন মহিউদ্দিন ইবন তাকী দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাকী তাওবা তাকরীতির স্থলে ইবন নুহাশ ওযারতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং তাকী তাওবাকে মিশরে তলব করা হয় এবং তার সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তদুপরি সাইফুদ্দিন তুঘানকে মদীনার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয় এবং ইযযুদ্দিন ইবন আবুল হায়যা মদীনার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন

শায়খ ইযযুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আলী

ইবন ইবরাহীম ইবন সাদাদ। ইনি সফর মাসে ইন্তেকাল করেন। ইনি ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি। বাদশা যাহিরের জীবনী বিষয়ক তার একটা গ্রন্থ রয়েছে। ইনি ছিলেন ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধিতসু।

আল-বানদাকদারী

ইনি ছিলেন বাদশা যাহির বায়বারস এর শিক্ষক। আর তিনি ছিলেন আমির কবি আলাউদ্দিন আইদকীন আল বান্দাকদারী আল সালেহী। ইনি ছিলেন অন্যতম উত্তম আমির। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এই বৎসর রবিউল আখের মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। আর ইনি ছিলেন সালেহ নাযমুদ্দিন সাদের আল বানদাকদারী। বায়বারস তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং তার যোগ্যতাবলে তার সঙ্গে উক্ত রাজত্ব যুক্ত করেন এবং তিনি তার নিকট শিক্ষকের চেয়েও অগ্রগণ্য হন।

শায়খ সালেহ আবেদ যাহিদ

শরফুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন ইসমাঈল আখামিনী। তার জানাযায় বিপুল মানুষ উপস্থিত হয় এবং কাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

ইবন আমির আল মুকরী

আল মিয়াদুল কাবির গ্রন্থ যার প্রতি সম্পর্কিত ইনি ছিলেন শায়খ সালেহ আল মাকরী মখসুদ্দিন আর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন আমির ইবনু আবু বকর আল গাসুলী আল হাম্বলী। ইনি শায়খ মুয়াফফাকুদ্দিন ইবন উদামা প্রমুখের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। ইনি রোববার রাতকে প্রতিশ্রুতির সময় হিসেবে পালন করতেন। এ থেকে অবসর হয়ে তিনি সকলকে ডেকে ওয়ায শুনাতেন। জুমাদাস সানী মাসের এগারো তারিখ বুধবার তিনি ইন্তেকাল করেন এবং শেখ আব্দুল্লাহ আরমানীর মাজারের নিকট তাকে দাফন করা হয়।

কাযী ইমাদুদ্দীন

দাউদ ইবন ইয়াহহিয়া ইবন কামিল আল কারশী আল নাছরাবী আল হানাফী। ইনি ছিলেন কাশাফ অঞ্চলের আজিজিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। বিচারকার্যে ইনি ছিলেন মাযদুদ্দিন ইবনুল আদিল এর স্থলাভিষিক্ত এবং হাদীস শ্রবণ করেন। শা'বান মাসের মধ্যভাগে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইনি ছিলেন শায়খ নাযমুদ্দিন আল কা'কারীর পিতা যিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের শায়খ এবং তখনকার জামে মসজিদের খতীব।

শায়খ হাসান রুমী

ইনি ছিলেন কায়রোর অতীব ভাগ্যবান ব্যক্তিদের শায়খ। তারপর উপরোক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন শামসুদ্দিন আতাবেকী, রশিদ সাঈ, ইবন আলী ইবন সাইদ। পরে শিবলিয়া মাদরাসার শিক্ষক সাঈদ রশিদ উদ্দিন হানাফী তার রয়েছে অনেক উপকারী গ্রন্থ। তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করতেন। তার কয়েকটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

قل لمن يحذر ان تدركه * نكبات الدهر لا يغنى الحذر
اذهب الحزن اعتقادى * ان كل شىء بقضاء وقدر

অর্থাৎ, দৈব দুর্বিপাকে যে ভয় পায় যে দুর্যোগ আপতিত হবে তাকে বলে দাও যে ভয়ে কোন কাজ হবে না।

সবকিছু ভাগ্যলিপি অনুযায়ী হবে এই বিশ্বাস আমার সব চিন্তা দূর করে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন–

الهى لك الحمد الذى انت اهله * على نعم منها الهداية للحمد
صحيحا خلقت الجسم منى مسلما * ولطفك بى مازال مذ كنت فى المهد
وكنت يتيما قد احاط بى الردى * فاويت واستنقذت من كل ما يردى
وهبت لى العقل الذى بضيائه * الى كل خير يهتدى طالب الرشد
ووفقت للاسلام قلبى ومنطقى * فيا نعمة قد حل موقعها عندى
ولو رمت جهدى ان اجازى فضيلة * فضلت بها لم يجز اطرافها جهدى
الست الذى ارجو حنانك عندما * يخلفنى الاهلون وحدى فى لحدى
فجد لى بلطف منك يهدى سريرتى * وقلبى ويدنينى ايك بلا بعد

অর্থঃ হে আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি প্রশংসার মালিক। এই প্রশংসা তোমার নেয়ামতের জন্য। হিদায়াতের প্রতি পথ দেখানোর জন্য তোমার প্রশংসা।

সত্য বটে, তুমি আমার দেহকে সুস্থ সবল করে সৃষ্টি করেছে। আর যখন আমি দোলনায় ছিলাম তখন থেকে আমার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে তোমার করুনা।

আমি ছিলাম এতিম, ধ্বংস আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ এবং রক্ষা করেছ ধ্বংস থেকে।

তুমি আমাকে দান করেছ জ্ঞান বুদ্ধি, যার আলোতে হিদায়াত প্রত্যাশী কল্যাণের দিকে পথ পায়।

তুমি আমাকে তাওফিক দিয়েছ, আমার বিবেক আর বোধ বুদ্ধিকে চালিত করেছ, কি নিয়ামত আমার উপর বর্ষিত হয়েছে তার কোনো সীমা নেই।

আমি ইচ্ছা করলেও তোমার দানের বদলা দিতে পারব না। আমার চেষ্টা তোমার দানের ধারে কাছেও পৌছতে পারবেনা।

আমি কি সেই ব্যক্তি নই যে কামনা করে তোমার অনুকম্পা যখন আমার স্বজনরা গোরস্থানে আমাকে একা ফেলে চলে আসে। সুতরাং তুমি আমায় দয়া করো যা আমার অন্তর আর অভিপ্রায়কে পথ দেখায় এবং আমাকে দূরে না ঠেলে কাছে ডেকে আনে।

পবিত্র রমযান মাস শনিবার ইনি ইন্তেকাল করেন। জামে মুজাফফরিতে আদুরের সময় তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং পর্বতের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়।

আবুল কাশেম আলী-বলবান ইবন আব্দুল্লাহ

আল লাহিরী, আল মুহাদ্দিস, আল মুকীদ, আল মাহির। রমযান মাসের শুরুতে বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

আল- আমির মুজীর উদ্দিন

মোহাম্মদ ইবন ইয়াকুব ইবন আমীর বিন তামিম আল হাসাবী সাথে পরিচিত এ ব্যক্তি ছিলেন একজন কবি। তার একটি কবিতা গ্রন্থ আছে। তার অন্যতম কবিতা এই :

عاينت ورد الروض يلطم خده * ويقول قولا فى البنفسج يحنق

لا تقربوه وان تضوع نشره * ما بينكم فهو العدو الازرق

আমি বাগানে গোলাপকে দেখেছি তার গানে আপপড় মারতে আর সে বানশাফা সম্পর্কে রাগ করে একটা কথা বলছিল। তার কাছে যাবে না যদিও তার সুঘ্রাণ উপচে পড়ে, কারণ সে তো একজন বড় দুশমন।

আল'শায়েখ আল আরিফ শরফুদ্দীন

আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ বিন শায়খ উসমান ইবন আলী আল রুমী। কাসিউল কবরস্থানে অন্যদের সঙ্গে তাকে দাফন করা হয়। আর তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে আসেন শায়খ জামালুদ্দিন মোহাম্মদ আল সাবেহী। এরপর তিনি মস্তক মুণ্ডন করেন এবং জাওয়ানেকিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাদের শায়খও নেতায় পরিণত হন।

হিজরী ৬৮৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৬ সন)

এ বৎসরের শুরুতে আল হাকিম আবুল আব্বাস আহমদ খলীফা ছিলেন আর সুলতান ছিলেন মালেক মনসুর বালাউন। শাম দেশে তার মায়ের ছিলেন আমির হুসামুদ্দিন লাজীন আর-সাহদারী আল মনসুরী। আর আমির বদরুদ্দিন আল ছাওয়াবী বিগত বৎসরের শেষের দিকে আল কার্ক নগরী অবরোধ করেছিলেন। আমির হুসামুদ্দিন তারাতাঈর সঙ্গে তার নিকট আগমন করেন মিশর থেকে সেনাদল এবং তারা আল কারাক নগরী অবরোধ করার ব্যাপারে একমত হন। অবশেষে তারা আল-কারাক নগরীর শাসনকর্তা মালেক মাসুদ খিযীর ইবন মালেক খাযিরকে সফর মাসের প্রথম দিকে তথা থেকে বের করে আনেন। এই সুসংবাদ দামেস্ক নগরীতে পৌঁছে এবং তিন দিন আনন্দ উৎসব করা হয়। আর তারাতাঈ মালেক খিযীর আর তার পরিবার পরিজনকে মিশর দেশে ফিরিয়ে আনেন। তার পিতা মালেক যাহিরও মালো মবিশ ওমর ইবন আদিলের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেছিলেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং মনসুরের নির্দেশক্রমে তিনি আর কার্ক নগরীর আমির হন। তিনি নগরীর ব্যবস্থা নবায়ন করেন এবং তথা থেকে আল কার্ক অঞ্চলের অনেক অধিবাসীকে বিতাড়িত করেন। এবং তিনি দামেস্ক দূর্গকে ব্যবহার করেন। আর আল যাহিরের লোকজন যখন কায়রো নগরীতে প্রবেশ করা শুরু করে তখন মনসুর অভিবাদন জ্ঞাপন করেন এবং স্বসম্মানে তাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং উভয় ভ্রাতা নযমুদ্দিন খিযির এবং বদরুদ্দিন সালামের সঙ্গে সদাচার করেন এবং এরা উভয়ে তাদের দুই সন্তান আলী এবং আশরাফের সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন আর তিনি তাদের উভয়ের উপর গোয়েন্দা নিয়োগ করেন যারা তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে। তাদেরকে দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করানো হয় এবং তাদের প্রয়োজনীয় খোরপোষের ব্যবস্থা করেন যা ছিল তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। আর আমির বদরুদ্দিন বাতত্তু আল গোলয়ী, যিনি হিমস নায়েব লাজীনকে পত্র লেখেন যে, সফর মাসের সাত তারিখ বৃহস্পতিবার হিমস ভূমিতে এক ঘূর্নিঝড় প্রবাহিত হয়। অতঃপর তা প্রকান্ড স্তম্ভের আকারে বিশাল সাপের রূপ ধারণ করে আকাশ পানে উত্থিত হয় এবং বিশাল পাথরকে দুলি মরার মত উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে মহাশূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যায় যেমন তা তীর আর কি এই ঘূর্ণিঝড় ভারবাহী অনেক উষ্ট্রকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এছাড়া আরো অনেক দ্রব্য সামগ্রী, অনেক তাঁবুতে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আরো উড়িয়ে নিয়ে যায় অনেক চতুষ্পদ জন্তু। ফলশ্রুতিতে লোকজন অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহির রাজিউন: নিশ্চয় আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমাদের সকলকে তার দিকে ফিরে যেতে হবে। দামেস্ক নগরীতে এদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে মহাপ্লাবন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মালেহিয়া অঞ্চলে। আর একই বৎসর নব পর্যায়ে আলাম উদ্দীন দুইদারীকে দামেস্ক নগরীর কাচারীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সাহেব তাকীউদ্দিন ইবন তাওবা দামেস্কের উজীর হিসাবে নিয়োগ পান ঠিক একই বছর মিশরে কাযী তকীউদ্দিন বরসাশের স্থলে যয়নুদ্দিন ইবন আবু মাখনু আল বারিন্দীকে মিশরে মালেকী মাযহাবের কাযী নিয়োগ করা হয। এ বৎসর গাযালিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দান করেন বদরুদ্দিন ইবন জুয়াআ। তিনি আল-গাজালিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিনিয়ে নেন ইমামুল কালাসা শামসুদ্দিনের হাত থেকে, যিনি ছিলেন শামসুদ্দিন আল আইবীর স্থলাভিষিক্ত, আর আল আইবী ছিলেন ভাগ্যবান ব্যক্তিদের শায়খ তথা বড় ভাগ্যবান। তিনি এক মাস তথায় দায়িত্ব পালন করেন অতঃপর পুনরায় সে দায়িত্ব আল আইবীর নিকট

অর্পণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন জামালুদ্দিন আল-বাজিরীকী। রজব মাসের তিন তারিখ আল-বাজিরীকী এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন–

আহমদ্ বিন শায়বান

ইবন তাগলব আল শায়যানী। ইনি ছিলেন দামেস্ক নগরীর বয়োবৃদ্ধ হাদীস বিষারদদের অন্যতম। ৮৮ বৎসর বয়সে সফর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং কাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ ইমাম বিজ্ঞ আলেম

শায়েখ জামালুদ্দিন আবু বকর মোহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবন রহমান আল-বাকরী আল শারিসী আল মালেকী। শারিস নগরীতে ৬০১ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন অতঃপর তিনি ইরাক সফর করেন এবং তথায় বিজ্ঞ আলিম এবং হাদীসের শায়খ যথা আল কাতীয়হী। ইবন যাওদীয়া ইবন যাওরীয়া এবং ইবন লাইসী প্রমুখ্ হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হন এবং যুগের লোকদের নেতা পর্যবসিত হন। অতঃপর তিনি মিশর প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথাকার আল ফাসেলিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাসে শায়খুল হারাম হিসাবে অবস্থান করেন। এরপর দামেস্ক নগরীতে আগমন করত উম্মে সালেহ গোরস্থানে স্থাপিত মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সাফাহ অঞ্চলের রাবাতে নাসিরীতে শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের শায়খ কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। রজব মাসের চব্বিশ তারিখ সোমবার কাসিউন অঞ্চলের রাবাতে নাসিরীয়াতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এই এলাকা ছিল আল নাসিরীয়ার বিপরীত দিকে। আর নাসিরীয়ার বিপরীত দিকে কাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযায় বিপুল জনগোষ্ঠী উপস্থিত হয়।

কাযী আল কুযাত

ইউসুফ ইবন কাযী আল কুযাত মহিউদ্দিন আবুল ফজল ইয়াহহিয়া ইবন মোহাম্মদ ইবন আলী ইবন মোহাম্মদ ইবন ইয়াহহিয়া ইবন আলী ইবন আব্দুল আযীয ইবন আলী ইবন হোসাইন ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আবআন ইবন উসমান বিন আফান আল কারশী আল দামেস্কি। ইবন জাকির শাফেঈ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। বণী যকীর মধ্য থেকে আজ পর্যন্ত যারা কাযীর পদ গ্রহণ করেন ইনি ছিলেন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি। ৬৪০ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এগার যিলহজ্জ সোমবার রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। কাসিউল গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তারপরে ইবনুল খাবী শিহাবউদ্দিন কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শায়খ খাযদুদ্দীন

ইউসুফ ইবন মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল মিছরী অতঃপর আর দামেস্কি আল শাফেঈ ইবন মেহতাব নামে পরিচিত আল কাতীদ। ইনি ছিলেন হাদীস এবং আরবি

সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তি। তার হাতের লেখা ছিল অতি চমৎকার। দারুল হাদীস আল নুয়ার শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন অনেকেই তার দ্বারা উপকৃত হন এবং তার হস্তলেখা অনুসরণ করেন। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন এবং বাবুল ফারাদিস গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কবি ও সাহিত্যিক

শিহাবউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুনঈম বিন মোহাম্মদ, বিন উখাইনিম নামে পরিচিত। বহুবিধ জ্ঞানে তার অংশিদারিত্ব ছিল এবং চমৎকার বয়স অতিক্রম করেন। ইনি এবং নযমুদ্দিন ইবন ইসমাঈল একটি আরবি কাসিদায় বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে উভয়ে ইবনুল ফরিযকে বিচারক মানেন। তিনি উভয়কে একই ধারায় কবিতা রচনার নির্দেশে দিলে উভয়ে চমৎকার কবিতা রচনা করেন কিন্তু ইবনুল খাইমী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। অনুরূপভাবে ইবন খাল্লিকান ও কবিতা রচনা করতে বলেন এবং চমৎকার কবিতা রচনার জন্য তার প্রশংসা করেন আর আর জাযরী তদীয় গ্রন্থে তার দীর্ঘজীবনী আলোচনা করেন।

আলহাজ্জ শারফুদ্দীন

ইবনে মিরী, শায়খ মহিউদ্দিন নববী (র.)-এর পিতা: ইয়াকুব ইবন আব্দুল হক আবু ইউসুফ আল মাদিনী। ইনি পশ্চিমাহ চলের সুলতান ওয়াসেক বিল্লাহ আবু দাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তার নিকট থেকে মরক্কোর বাইরের রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। তিনি ৬৬৮ হিজরি সনে জাযিরা খাজরা অধিকার করে নেন। এই বৎসর মুহাররম মাসে পর্যন্ত তথায় তার কর্তৃত্ব বহাল থাকে এবং তার হাতে মুহিদের রাজত্বের পতন ঘটে।

অনেক গ্রন্থের রচয়িতা আল বায়যাবী

তিনি ছিলেন কাযী ইমাম আল্লামা নাসিরউদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর সিরজি। কাযী ও আলিম এবং আজারবাইজান ও আশ পাশের অঞ্চলের আলিম। ৬৮৫ হিজরি সনে তাবরীয় অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফিকহের মূলনীতি বিষয়ে আল মিনহায।

তার এই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ অনেকেই এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি চার খণ্ডে তাসবীহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। তার আর একটি গ্রন্থের নাম আল গায়া আল উসওয়া ফি দেরায়াতিন ফাতওয়া। তিনি আল মুনতাখাব গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন এবং মানতের তথা যুক্তিবিদ্যা আর কাফিয়া নামে গ্রন্থ রচনা করেন এছাড়াও তার আরো গ্রন্থ আছে যথা আল তাওয়ালে এবং আর মাসুল গ্রন্থের ব্যাখ্যা। তার আরো অনেক উপকারী গ্রন্থ রয়েছে। (আমাদের দেশে সরকারী এবং বেসরকারী মাদ্রাসায় তাফসীর শাস্ত্রে বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে বায়দাবী তারই রচনা অনুবাদক তিনি ওসীয়ত করে যান যে তারবীযে কুতুব সিরাজীব পাশে যেন তাকে দাফন করা হয়।

হিজরী ৬৮৬ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৭ সন)

এ বৎসর মুহাররম মাসের শুরুতে শাম দেশের মায়েয হুমাসুদ্দিন মনজীলের সঙ্গে সৈন্যরা সাহ্উন এবং বারযীয়া দূর্গ অবরোধ করার জন্য রওয়ানা হয়। আমীর সাইফুদ্দিনে সানকার আল আশকার সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা তার পতন ঘটায় এবং তাদের নিকট দেশের কর্তৃত্ব সমর্পণ করে। তিনি সুলতান মালেক মনসুরের খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাকে স্ৰাদরে গ্রহণ করেন এবং উপহার হিসেবে তাকে এক হাজার অশ্ব দান করেন। মনসুরী সাম্রাজ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত সমাসের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুহাররাম মাসের মধ্য ভাগে জালালুদ্দিন হানাফী তদীয় পিতা হুমামুদ্দিন সঙ্গীন কর্তৃত্বে ফয়সালা জারী করেন এবং রবিউল আউয়াল মাসের তেরো তারিখ কাযী শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ইবন কাযী শামসুদ্দিন ইবন আল খালিদ আল খাবীর কায়রো থেকে আগমন করত দামেস্কের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। রবিউল আখের মাসের প্রথম দিকে শুক্রবার দিন তার নিয়োগের নির্দেশনা পাঠ করে শোনানো হয়। এবং সারফুদ্দীন আল-সাকদেসীর তত্ত্বাবধানে তা অব্যাহত থাকে। আর তোমরা শাওয়াল রোবাবার দিন শায়খ সুফীউদ্দীন আর হিন্দী আর রাওয়াহিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ দান করেন। এ সময় বিচারপতি এবং শায়খ তাজউদ্দীন আল ফাযারী এবং আলামুদ্দিন দুয়াইদারী উপস্থিত ছিলেন। আর বুরহানউদ্দিন খিযীর সানযারীর পরিবর্তে তকীউদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন বিনতুর আৎয়ায কায়রোর বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইবনুল খাবীর একমাস পর এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি গোটা মিশর অঞ্চরে কাযী হয়ে যান। এই ঘটনা সফর মাসের প্রথম দিকে।

আর এই বৎসর সাইফুদ্দিন সামেরীকে দামেস্ক থেকে মিশর দেশে তলব করা হয়, যাতে তার নিকট থেকে গ্রীক দেশের এক চতুথাংশ ক্রয় করা যায়। যা তিনি ক্রয় করেছিলেন মালেখ আশরাফ মুসার কন্যার নিকট থেকে। আর তিনি তাদের নিকট ব্যক্ত করেন যে এটা ওয়াকফ সম্পত্তি। এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন, আলামুদ্দিন আল শাজায়ী, যিনি ছিলেন একজন যালিম লোক। আর বাদশা মনসুর মিশর দেশে তাকে নায়েব নিযুক্ত করেন আর তিনি অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করেন। এ ব্যাপারে নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আল মাকদেসী ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, আল সামেরী আশরাফের কন্যার নিকট থেকে এ সম্পদ ক্রয় করেন। আর সে মহিলা ছিল নির্বোধ। আর তিনি যালিম এবং অজ্ঞ যাইনুদ্দিন ইবন মাখলুফের সম্মুখে তার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করেন। এভাবে তিনি বিক্রয়টি ব্যক্ত প্রমাণ করেন্ এবং সামেরীকে বিশ বৎসরের উৎপাদনের দুই লাখ দিরহাম ফেরত দেন। এভাবে তারা তার নিকট থেকে আল জাম্বকিয়ার অংশ অর্জন করেন যার মূল্য ছিল পূর্ণ আশি হাজার দিরহাম। এভাবে তাকে শীতের মৌসুমের নিঃশ্ব করে ছেড়ে দেয়। অথবা তারা আশরাফ তনয়ার বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করেন এবং তার নিকট থেকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সে সব অংশ খরীদ করে নেয়।

অতঃপর তারা এক এক করে দামাশেককে তলব করতে চান এবং এ ব্যাপারে তারা জোর দাবী জানান। আর এ কাজ তারা করেন এ কারণে যে, তারা জানতে পারেন যে, যে ব্যক্তি শামদেশে যুলুম নির্যাতন চালাবে সে সফল হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মিশরে যুলুম অবিচার

করবে সে সফল হবে এবং তার শাসন কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে। যুলুম নির্যাতন এবং ফেরাউনদের পুণ্যভূমি মিশরে তাদেরকে তলব করে এবং তাদের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করে।

এ বৎসর সেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন–

শায়খ ইমাম আল্লামা

কুতুবুদ্দিন আবু বকর মোহাম্মদ ইবন শায়খ ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন আলী ইবন মোহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ আল মায়মুনী আল কায়সী আন নবী আল মিশরী অতঃপর আল মালেকী আল শাফেঈ। যিনি আল কাস তালানী নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি ছিলেন কায়রোস্থ দারুল হাদীস আল কামেলিয়ার শায়খ। ৬১৪ হিজরিতে তার জন্ম হয়। অবশেষে তিনি বাগদাদ গমন করেন, অনেকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বহুবিধ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী ফত্ওয়া দান করতেন। মক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থান শেষে মিশর গমন করে দারুল হাদীসে শায়খের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী এবং মানুষের নিকট প্রিয়পাত্র। মুহাররম মাসের শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আল কারাফা আল কুবরা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি চমৎকার কিছু কবিতা রচনা করেন যার উল্লেখযোগ্য অংশ ইবন জাযরী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমামুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আল দানিসারী

ইনি ছিলেন দক্ষ তবীর এবং বিজ্ঞ কবি মহান ব্যক্তিত্ব এবং উজীর নাজিরাদের সেবা করেন। তার জীবনকাল ছিল আশি বৎসর। একই বৎসর সফর মাসে দামেস্কে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কাযী আল কুফত

বুরহানউদ্দিন আল খিযির ইবনুল হুসাইন ইবন আলী আল মানযারী। তিনি মিশরে একাধিকবার বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উজীরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রতাপশালী এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রঈস। তার পরে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন তকীউদ্দিন ইবনু বিনতিল আয়ায।

সরফুদ্দিন সুলাইমান ইবন উসমান ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি। তার একটি কবিতা গ্রন্থ আছে। একই বৎসর সফর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ সালেহ ইযযুদ্দিন

আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল মুনাইয়িম আল ছাকীর আল হাররানী। ৫৯৪ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর মিশরকে রামসহান বানান। একই বৎসর ১৪ রজব মিশরে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল নব্বইয়ের বেশি। হাফেয আলমুদিনে আল বারযালী ৬৮৪ হিজরী সনে মিশর হয়। তার সূত্রে আরো বর্ণিত আছে যে, একদা আমির 'কালইউযুব' গ্রামে ছিলাম। আমার সম্মুখে ছিল গমের একটা স্তুপ। সেখানে উপস্থিত হয় একটা ভিমরুল এবং তথা থেকে একটা গম নিয়ে চলে যায়। অতঃপর আবার এসে আরেকটা পথ নিয়ে চলে যায়। এভাবে ভিমরুলটি চারবার আগমন করে। তিনি বলেন যে, আমি ভিমরুলটিকে অনুসরণ করলাম আমি দেখতে পেলাম যে, ভিমরুলটি

তথায় একটা জ্ঞাগলের মধ্যে একটা অন্ধ চড়ুই পাখির মুখে গমের ছানা পুরে দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, শায়খ আব্দুল কাফী আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা এক জানাযায় উপস্থিত হন তথায় ছিল এক কৃষ্ণকায় দাস। লোকজন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করল কিন্তু কৃষ্ণকায় দাসটি জানাযার নামায আদায় করল না। আমরা যখন মৃত ব্যক্তির দাফন করতে গেলাম তখন দাসটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি হলাম মৃত ব্যক্তির কর্ম। এই বলে সে নিজেকে উক্ত কবরে নিক্ষেপ করল। তিনি বলেন, আমি কবরটির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

হাফেয আবুল ইয়ামনী

আমিনুদ্দিন আব্দুস সামাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব ইবনুল হাসান ইবন মোহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন আসারকীর আল দামেস্কি। তিনি শায়-শওকত এবং সহায়-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর মক্কা নগরীর প্রতিবেশন হয়ে ইবাদত ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সিরীয় এবং মিশরীয় প্রমুখের নিকট তিনি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। একই বৎসর মদীনা শরীফে দোসরা রজব মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিজরী ৬৮৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৮ সন)

এই বৎসর আল সাজাযী মিশর থেকে শাম দেশে আগমন করেন এই নিয়তে যে তিনি শাম দেশের ধন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট দাবি উপস্থাপন করবেন এবং রবিউল আখের মাসের শেষ দিকে শায়খ নাসিরউদ্দিন আব্দুর রহমান আল মাকদেসী কায়রো থেকে শাম দেশে আগমন করেন বায়তুল মাল দেখাশুনা করা এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তদারকি করার উদ্দেশ্যে। এছাড়াও তার উদ্দেশ্য ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পর্যবেক্ষণ করা। তার সঙ্গে ছিল কিছু বিধি-বিধান এবং কিছু খিলাত।

ফলে একজন তার গৃহ দরজায় উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি লোকজনকে পীড়া দেন। আর তার কর্তৃত্ব ছিল আমীর আলামুদ্দিন আল সাজায়ীর দূতীয়ালী, যিনি ছিলেন মিশরীয় অঞ্চলের মুখপাত্র। শায়খ শামসুদ্দিন আরগী এবং ইবনুল ওয়াহিদ কাতীবের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করেন। তার নিকট এ দুই ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি দামেস্কের এক দল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে এই বৎসরের শুরুতে মিশরে তলব করেন। এবং তাদের কাছে বিপুল সম্পদ দাবি করেন। ফলে তাদের একে অপরকে প্রতিরোধ করেন। যাতে করে তাদের উপর যুলুম অত্যাচার হ্রাস পায়।

অন্যায়ভাবে তারা যদি ধৈর্য্যধারণ করে তাহলে যালিম দ্রুত শাস্তি পাবে এবং তারা যে জিনিসটা না পছন্দ করেন তা তাদের থেকে দ্রুত অপসৃত হয়ে যাবে। ইবনুল মাগদেসী যখন দামেস্কে উপস্থিত হন তখন তিনি 'তুরবাতে' উম্মে সালেহ'তে ফয়সালা দান করতেন এবং লোকজন তার নিকট ছুটে যেত এবং তার অনিষ্টকে ভয় পেত। আর তিনি বাবুল ফরাদিসের এবং বাবুস 'সাআতে স্বাক্ষীদের জন্য চত্বর প্রস্তুত করেন এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাবুল জামিয়াকে নব পর্যায়ে প্রস্তুত করেন এবং তাকে উঁচু করেন। ফলে তা চলাচলের উপযোগী হয় এবং তিনি

সেখানকার পুল মেরামত করেন। অনুরূপভাবে তিনি ক্ষুদ্র বাজারের নিচের পুলকেও উভয় দিক থেকে নতুন করে নির্মাণ করেন। আর এটা ছিল ইবনুল মাগদেনীর অন্যতম চমৎকার কীর্তি। এতদ্বসঙ্গে তিনি জনগণের প্রতি বিরাট অবিচার করেন এবং তাদের অনেক কিছু ছিনিয়ে নেন। এভাবে জনগণের ওপর অত্যাচারের নতুন দ্বার উম্মোচিত হয় যা বর্ণনা করা নিস্প্রয়োজন।

আর দশ জুমাদাল উলায় কাযী উল কুযাত হুসাযদ্দিন আল হানাফী, সাহেদ তাকীউদ্দিন তাওবা তাকরীতী এবং কাযী উল কুযাত জামালুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন সুলাইমান আল জাওয়াবী আল মালেকী দামেস্ক নগরী সাড়ে তিন বৎসর বিচারপতিহীন থাকার পর মালেকী মাযহাবের কাযী হয়ে মিশর থেকে দামেস্কে আগমন করেন এবং তিনি বিচারপতি পদে প্রতীক নির্ধারণ করেন পাঠদান করেন এবং ধর্মের বিস্তার ঘটান। এ ব্যাপারে ছিল তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব আর ৪ঠা শা'বান শুক্রবার রাতে মালেক সালেহ আলাউদ্দিন ইবন মালেক মনসুর কালাউন সানতারিয়ায় ইন্তেকাল করেন। এতে তার পিতা ভীষণ ব্যথিত হন। তিনি তারপর পুত্রকে যুবরাজ নিয়োগ করেন এবং তার পক্ষে খুতবা দান করেন এবং একাধারে কয়েক বৎসর তার প্রতি মিম্বরে খুতবা পাঠ করা হয় এবং শাহী গোরস্থানে তাকে দমন করা হয়। তারপর তদীয় পুত্র আশরাফ খলিলকে যুবরাজ নিয়োগ করা হয় এবং শুক্রবার এ মর্মে খুতবা প্রচার করা হয়। এই উপলক্ষে সাত দিন নগরকে সজ্জিত করা হয় এবং আনন্দ প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষে সৈন্যরা বিশেষ পোশাক পরিধান করে এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আনন্দ প্রকাশ করে। লোকেরা তার বিচক্ষণতায় আনন্দ প্রকাশ করে। যদিও পিতার মৃত্যুতে তাদের অন্তর ব্যথিত ছিল। কারণ আল সাজায়ী তার প্রতি যুলুম করেছিল।

আর এই বৎসর রমযান মাসে শামসুদ্দিন ইবন সালুসী সরফুদ্দিন সাবজারীর পরিবর্তে দামেস্ক নগরী পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর একই মাসে শায়খ বদরুদ্দিন ইবন জুমাআ বাইতুল মুকাদ্দাসের খতীব কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর আবার খুতবার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং কায়সারিয়ায় পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জালাউদ্দিন আহমদ ইবন কাযী তাজউদ্দিন ইবন বিনতুল আয়ায। রমযান মাসে জনৈক খ্রিস্টান তথায় হামলা চালায়। আর তার সঙ্গে ছিল এক মুসলিম রমণী। তারা উভয়ে রমযান মাস দিনের বেলা মদ্যপান করে। এতে নায়েবে সালতানাত হুমামুদ্দীন লাজীন খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। নিজের জীবন বাঁচানো জন্য সে বিপুল অর্থদানে সম্মত হলেও তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হয়নি এবং সুকুল খাইরং এ তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এই উপলক্ষে শিহাব মাহমুদ এক চমৎকার কবিতা রচনা করেন। আর তার সঙ্গী নারীকে শাস্তি হিসেবে চাবুক মারা হয়।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন–

খতীব ইমাম কুতুবউদ্দীন

আবুয যাকা আব্দুল মানুয়ীম ইবন ইয়াহহিয়া ইবন ইবরাহীম ইবন আলী ইবন জাফর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মোহাম্মদ ইবন সাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুর রহমান ইবন আওফ আল-কারশী আল যুহরী। তিনি চল্লিশ বৎসর বাইতুল মুকাদ্দাসের খতীব ছিলেন। ইনি ছিলেন বড় সাধু ব্যক্তিদের অন্যতম এবং জনগণের নিকট প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তার চেহারা সুরত ছিল সুদর্শন এবং

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তিনি জনগণকে ফতওয়া দিতেন এবং ফযর নামাযের পর মেহরাব থেকে কিতাব না দেখে তাফসীর করতেন। অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করতেন। আর তিনি ছিলেন নেককার। ৬০৩ হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এবং সাত রমযান মঙ্গলবার রাত্রে চুরাশি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ সালেহ আবিদ

ইবরাহীম বিন মেযাদ ইবন সাদদাদ ইবন মাজিদ আল জি'বালী তাকীউদ্দিন আবু ইসহাক। মূলত তিনি ছিলেন জীবার দূর্গের অধিবাসী। অতঃপর তিনি কায়রো নগরীতে অবস্থান করেন। তথায় তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়ায করতেন। জনগণ তাঁর ওয়ায দ্বারা উপকৃত হত। মুহাররম মাসের চব্বিশ তারিখ শনিবার তিনি কায়রো নগরীতে ইন্তেকাল করেন এবং হাসানিয়া গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কিছু চমৎকার কবিতা রয়েছে। তিনি ছিলেন অন্যতম নেককার ব্যক্তি। সাধু পুরুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

শায়খ সালেহ

ইয়াসিন ইবন আব্দুল্লাহ আল মুকরী আল হাজজাম। তিনি ছিলেন মুহিউদ্দিন নববীর শায়খ। বিশবার হজ্জ পালন করেন। তাঁর অনেক কারামাত প্রসিদ্ধ আছে।

আর খুন্দা রাজিয়া খাতুন

তিনি ছিলেন মালেক মনসুর কালাউনের কন্যা এবং মালেক সাঈদের স্ত্রী।

হাকিম রঈস আলাউদ্দিন ইবন আবুল হাজ্জ ইবনে নাফস

তিনি ইবনে সিনার আল কানূন গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন এবং আল মুযেয ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তার এইসব গ্রন্থ অনেক উপকারী। তিনি নিজের স্মৃতি থেকে গ্রন্থ রচনা করতেন। আর তিনি ইবনুদ দাখওয়ারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যিলক্বদ মাসে মিশরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ বদরুদ্দীন

আব্দুল্লাহ ইবন শায়খ জামালুদ্দিন ইবন মালেক নাহবী। তাঁর পিতা রচিত আল ফিয়া গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এটা হচ্ছে উক্ত গ্রন্থের সর্বোত্তম ভাষ্য এবং সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর। তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবধারী হাস্য-রসিক এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। আট মুহাররম রবিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন বাদ আসরের সময় তাঁকে দাফন করা হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

হিজরী ৬৮৮ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৮৯ সন)

দীর্ঘ ৭ বৎসরে ত্রিপলি শহর জয় করা হয়। সুলতান কালাউন মিশরের বিজয়ী সৈন্যদের সঙ্গে দামেস্ক আগমন করেন এবং সফর মাসের তেরো তারিখ দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এবং দামেস্কি বাহিনীসহ আরো বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি নিয়ে রওয়ানা হন। এদের মধ্যে ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের কাযী নাযমুদ্দিন হাম্বলী এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের আরো অনেক লোক। রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে জুমার দিন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে

বের হন এবং মিনযানিক ব্যবহার করে তীব্র অবরোধ গড়ে তোলেন। ত্রিপলির অধিবাসীদেরকে কঠোর সংকীর্ণতায় নিক্ষেপ করে এবং নগরীর চতুর্দিকে উনিশটি মিনযানিক স্থাপন করে। আর চার জুমাদাস সানী মঙ্গলবার দিন উপস্থিত হলে দিনের চতুর্থ প্রহরে ত্রিপলি শহর শক্তি প্রয়োগে জয় করা হয় এবং নগরীর অধিবাসীদেরকে হত্যা এবং বন্দী করা হয় এবং মিনা অঞ্চলের অনেক লোক ডুবে মারা যায় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে প্রচুর ধন-সম্পদ অধিকার করা হয়। এই নগরী হিজরী ৫০৩ সন থেকে অদ্যবধি ফিরীঙ্গিদের করতগত ছিল। ইতিপূর্বে হযরত মু'আবিয়া (রা) এর শাসনকাল থেকে এই নগরী ছিল মুসলমানদের অধিকারভুক্ত। এই অঞ্চলটি হযরত মু'আবিয়া (রা) এর জন্য সুফিয়ান ইবন রাযীর জয় করেন এবং হযরত মুআবিয়া (রা) তথায় ইয়াহুদীদেরকে বসবাস করতে দেন। অতঃপর আব্দুল মালক ইবন মারওয়ান নগরীর ইমারত এবং দুর্গ পুনরায় নির্মাণ করেন এবং তথায় মুসলমানদের পুনর্বাসন করেন। তখন থেকে নগরীটি ছিল সুখে শান্তিতে বসবাসের জন্য একটা উত্তম নগরী। আর এখানে ছিল শাম দেশ এবং মিশরের নানবিধ ফলমূল। এখানে পাওয়া যেত আখরোট, কলা, বরফ এবং শাক-সবজি। সেখানে পানির ফোয়ারা ছিল প্রবাহমান যা উঁচু স্থানে প্রবাহিত হত। ইতিপূর্বে তথায় পাশাপাশি তিনটি নগরী ছিল। পরে তা এক নগরীতে পরিণত হয়। অতঃপর নগরীটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হয় যা পরে আলোচনা করা হবে। যখন এই সুসংবাদ দামেস্ক নগরীতে পৌঁছে তখন আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং নগরীতে সজ্জিত করা হয়। তখন জনগণ বিপুলভাবে আনন্দিত হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য।

অতঃপর সুলতান মালেক মনসুর কালাউন নগরীর ইমারত, বাড়ি-ঘর এবং সুদৃঢ় প্রাচীরাজি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। তিনি এ নির্দেশও দান করেন যে, নগরী থেকে এক মাইল দূরে আর একটি শহর স্থাপন করা হউক যা হবে পূর্বের নগরী থেকে আরো সুন্দর এবং সুদর্শন। নির্দেশ অনুযায়ী তাই করা হয়। আর এটা হচ্ছে সে শহর যাকে ত্রিপলি বলা হয়। অতঃপর বিজয় আর আনন্দের বেশে তিনি দামেস্ক নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পনেরো জুমাদাস সানী তিনি নগরীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু, নগরীর সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা-বার্তা বলার দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন আলাউদ্দিন সুয়াঈর হস্তে। একদল লোক বের হয়ে আসে এবং প্রচুর সম্পদ আহরণ করে। এর ফলে জনগণ বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়। এটি ছিল খুব খারাপ কাজ। কারণ এর ফলে যালিমের ধ্বংস ও বিন্যাস ত্বরান্বিত হয়। মা শাজায়ী যে সব সম্পদ আহরণ করেন তা মনসুরের কোনো কাজে আসেনি। কারণ, এর পর তিনি খুব অল্প ছিল দিন বেঁচে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকড়াও করেন যেমন তিনি পাকড়াও করেন যালিম জনগণকে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। অতঃপর দোসরা শা'বান সুলতান তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে মিশরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বের হন এবং শা'বান মাসের শেষ নাগাদ তথায় প্রবেশ করেন। তথায় হালবের নিকটবর্তী কারকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে অনেক দুর্গ জয় করা হয়। একদল তাতারীকে তথায় পরাজিত করা হয় এবং তাতারীদের বাদশা খারবান্তা যিনি ছিলেন মাতলিয়া অঞ্চলের তাতারীদের নায়েব, তাকে হত্যা করা হয়।

আর একই বৎসর জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবন তকী তাওবা তাকরীতী দামেস্ক নগরী পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর কয়েক মাস পরে তাজউদ্দিন সিরাজী সে দায়িত্ব

গ্রহণ করেন। আর একই বৎসর হুজরা নির্মাণের কারণে মিম্বরকে সাহাবাদের মেহরাবের কাছে স্থাপন করা হয় এবং বুরহানউদ্দিন ইস্কান্দারী যিনি ছিলেন নায়েব খতীব তিনি তথায় এক মাস যাবত লোকদের নামায পড়ান এবং তদর উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। তিনি জুমু'আ এবং জামায়াতে ইমামতি করেন এবং যিলহজ্জ মাসের বাইশ তারিখ শুক্রবার থেকে তিনি এ কাজ শুরু করেন।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন

শায়েখা ফাতেমা বিনতে শায়খ ইবরাহীম ইনি ছিলেন নায ইবন ইসরাঈলের স্ত্রী। ইনি ছিলেন ফকীহ পরিবারের সদস্য। হারিরিয়া ইত্যাদি তরীকায় তার কর্তৃত্ব দক্ষতা এবং তার কিছু বাণী ছিল। তার জানাযায় বিপুল জনগোষ্ঠী উপস্থিত হয়। তাকে শায়াখ রাসলানের নিকট দাফন করা হয়।

আলেম ইবন ছাহেব

ইনি ছিলেন মাজীন তথা নির্লজ্জ শায়খ। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ শায়খ আলামুদ্দিন আহমদ ইবন ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন শকর। জ্ঞান সাধনা এবং কর্তৃত্ববান পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। কোন কোন মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা করেন। তার ছিল বিশাল ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব। পরে তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করেন এবং হানাফী তরিকা অবলম্বন করেন এবং হানাফীদের সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং পোশাক আমাকে এদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেন এবং মাদকদ্রব্য সেবন ও ব্যবহার করা শুরু করেন। পরে তিনি এমন নির্লজ্জতা এবং অহেতুক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন যার অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না। তার ছিল অনেক যোগ্য সন্তান যারা তাকে এসব করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু তিনি তাদের নিষেধের প্রতি কর্ণপাত করতেন না। এটাই ছিল তার রীতি। অবশেষে রবিউল আউয়াল মাসের একুশ তারিখ শুক্রবার রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। আর যখন চারজন কাযী দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তার পূর্বে তার খালাতো ভাই তাজউদ্দিন ইবন বিনতুল আয়ায স্বতন্ত্র্য কাযী ছিলেন। যখন উপরোক্ত ইবনুস ছাহেব তাকে বলেন তুমি চতুর্থাংশের মালিক হয়েছেন তা দেখার পূর্বে আমি মৃত্যুবরণ করব না। তিনি তাকে বলেন, চুপ থাকো অন্যথায় আমার আশংকা হচ্ছে তারা তোমাকে বিষপানে হত্যা করবে। তখন তিনি বললেন, তুমি এটা করবে দীনের ব্যাপারে স্বল্পতার কারণে। আর তারা তোমার নিকট থেকে এটা শুনবে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে। ঘৃণ্য হাশীশ তথা মাদক দ্রব্যের প্রশংসায় তিনি বলেন–

في خمار الحشيش معنى مرامى * يا اهيل العقول والافهام
حرموها من غير عقل ونقل * وحرام تحريم غير الحرام

হে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! হাশীশের মাওতা আমার মর্ম লুকায়িত। তারা এটাকে হারাম করেছেন জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়া। আর যে বস্তু হারাম তাকে হারাম করা হলো হারাম। তিনি আরো বলেন–

يا نفس ميلى الى التصابى * فاللهو منه الفتى يعيش
ولا تملى من سكر يوم * ان اعوز الخمر فالحشيش

হে আমার মন খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হও। আর খেলাধুলার দ্বারাই নওজোয়ান বেঁচে থাকে। আর একদিনের মাতলমীতে অতীষ্ট হবে না, যদি মন সংগ্রহ করা কঠিন হয় তবে হাশীশই যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেন–

جمعت بين الحشيش والخمر * فرحت لا اهتدى من السكر

يا من يرينى لباب مدرستى * يربح والله غاية الاجر

আমি হাশীশ আর মদকে একত্র করেছি, আর আমি আনন্দিত এজন্য যে, নেশায় আমি পথ পেতে পারি না। হে সেই ব্যক্তি যে আমাকে দেখায় মাদরাসার দরজা, আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে প্রচুর প্রতিদান দেবেন। আর তিনি ছাহেব বাহাউদ্দিন ইবনুল হিরান নিন্দা বলেন–

اقعد بها وتهنا * لابد ان تتعنى

تكتب على بن محمد * من اين لك يا ابن حنا

উপবেশন কর তথায় এবং আনন্দিত হও যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে আলী ইবন মোহাম্মদ লিখেছেন - হে ইবন হিরান! তুমি কোথা থেকে এ কথা জানতে পেলে? অতঃপর তিনি তাকে ডেকে এনে প্রহার করেন। অতঃপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তথায় এক বৎসর অবস্থান শেষে তাকে বিদায় দেয়া হয়।

শামসুদ্দিন ইস্পাহানী

ইনি ছিলেন আল মাহসুর গ্রন্থের ভাষ্যকার। মোহাম্মদ ইবন মাহমুদ ইবন মোহাম্মদ ইবন ইবাদ সালমান। ইনি ছিলেন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি ৬৫০ হিজরির পর দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন এবং ফকীহদের সঙ্গে মুনাযারা তথা তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এর ফলে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে প্রবৃত্ত হন। এর ফলে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইমাম রাযী রচিত আল মাহসুল গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এবং চারটি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করেন: ১ ফিকহের মূলনীতি ২ দীনের মূলনীতি ও মানতিক শাস্ত্র এবং ৪ মুনাযারা শাস্ত্র। মানতিক তথা তর্ক শাস্ত্র, আরবি ব্যাকরণ এবং আরবি সাহিত্যে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। তিনি মিশর সফর করেন এবং হুসাইন এবং শাফেঈর মাজারে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারুস দান করেন। ফলে ছাত্ররা তার নিকট ছুটে আসে। তিনি ৭২ বৎসর বয়সে কায়রো নগরীতে রজব মাসের বিশ তারিখ ইন্তেকাল করেন।

শামস মোহাম্মদ ইবন আল-আফীক

সুলাইমান ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ তিলমীসানী। ইনি ছিলেন বড় মাপের কবি। পিতার জীবদ্দশায় তার ইন্তেকাল হয়। এজন্য তাঁর পিতা ভীষণ দুঃখিত হন এবং অনেক কবিতায় শোক প্রকাশ করেন। রজব মাসের ১৪ তারিখ বুধবার তিনি ইন্তেকাল করেন। জামে মসজিদে তার

জানাযার নামায পড়া হয়। এবং সুফীয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার অন্যতম চমৎকার কবিতা উল্লেখযোগ্য-

وان ثناياه نجوم لبدره * وهن لعقد الحسن فيه فرائد
وكم يتجافى خصره وهو ناحل * وكم يتحلى ثغره وهو بارد

তার উপরের পাটির দাঁত চাঁদের মতো চকচকে আর তিনি হচ্ছেন রূপার মালার জন্য কে মুক্তার মতো। আর তার কটিদেশ কত দূরে ছিল আর তিনি ছিলেন দুর্বল।

আর তার দাঁত কত শুভ্র ছিল আর তা ছিল শীতল। হাশীশের নিন্দায় তিনি বলেন-

ما للحشيشة فضل عند اكلها * لكنه غير مصروف الى شده
صفراء فى وجهه خضراء فى فمه * حمراء فى عينه سوداء فى كبده

হাশীশ সেনবাকারীর নিকট এর কোন মূল্য নেই, কিন্তু তার পরও সে সৎ পথে ফিরে আসবে না।

তার চেহারায় কোনো আকর্ষণ নেই, তার মুখে নেই কোন সজীবতা, তার চক্ষুতে আছে লাভা আর অন্তরে আছে কালিমা। তার আরো উল্লেখযোগ্য কবিতা -

بدا وجه من فوق ذابل حده * وقد لاح من سود الذوائب فى جنح
فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجا * وقد طلعت شمس النهار على رمح

তার চেহারা প্রকাশ পেয়েছে তার গালের সূক্ষ্মতায় আর তা উজ্জল হযে উঠেছে জুলফির কৃষ্ণতায়। তখন আমি বললাম কি অবাক কাণ্ড অন্ধকার কেন দূর হবে না; অথচ দিবা সূর্য উদিত হয়েছে বর্ষার পর বজ্র। তার আরো উল্লেখযোগ্য কবিতা-

ما انت عندى والقضيب * اللدن فى حد سوى
هذاك حركه الهوا * وانت حركت الهوى

আমার নিকট তুমি এবং তুলতুলে বরশা এক সমান। তাকে বাতাস দোলা দেয় আর তুমি দোলা দেও ভালবাসাকে।

মালেক মনসুর শিহাবউদ্দিন

মাহমুদ ইবন মালেক সালেহ ইসমাঈল ইবন আছিল। ১৮ই শা'বান মঙ্গলবার তিনি ইন্তেকাল করেন। জামে মসজিদে তার জানাযার নামায পড়া হয় এবং একই দিন তাকে দাদার গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন সে গোরস্থানের পাহারদার, তিনি প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি আহলে হাদীসকে ভালবাসতেন। তার মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা ছিল।

শায়খ ফখরুদ্দীন আবু মোহাম্মদ

আব্দুর রহমান ইবন ইউসুফ বা'লাবাকী আল হাম্বলী। তিনি ছিলেন দারুল হাদীস নববীর শায়খ এবং ইবন উরওয়া মাজারের প্রধান ব্যক্তি। এছাড়া তিনি ছিলেন আল সাদরিয়ার শায়খ। তিনি ফাতওয়া দান করতেন এবং তার দিনদারী ও কল্যাণকামীতা এবং ইবাদত ও সাধুতা দ্বারা জনগণ উপকৃত হত। ৬১১ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং একই বৎসর রজব মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিজরী ৬৮৯ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯০ সন)

এই বৎসর মালেক মনসুর কালাউন মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় আব্বাসী খলীফা ছিলেন আল হাকিম এবং মিশরের নায়েব ছিলেন হুশামউদ্দিন তরকতায়ী এবং শাম দেশের নায়েব ছিলেন হুশামউদ্দিন লাজীন। আর শাম দেশের কাযী ছিলেন শিহাবউদ্দীন ইবনুল খাবী শাফেঈ, হুশামউদ্দিন আল হানী নাজমুদ্দিন শায়খ আল জাবাল এবং জামালুদ্দিন যাবারী আল মালেকী। আর শামসুদ্দিন সানকার আল আশকারের সন্ধানে দূত মিশর অঞ্চলে আগমন করেন সুলতান স্বসম্মানে গ্রহণ করে, তাকে শক্তিশালী করেন, তার হস্তকে বলিষ্ঠ করে এবং তাকে অর্থ সঞ্চয়ের নির্দেশ দেন। এছাড়াও তাকে হুকুম করেন সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার এবং আল বিরা ও কাফতা ইত্যাদি দূর্গ বিষয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা দেন। এর ফলে তার মন বলিষ্ঠ হয়, এবং তা আরো শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ভদ্রতা আর লজ্জাশীলতার প্রতি। আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পৃক্ত হত তিনি তার কল্যাণ সাধন করতেন। আর এটা ছিল দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত দিনগুলোতে ভালবাসার প্রতীক। আর জুমাদাস সানী মাসে বায়তুল মালের দায়িত্বশীল এবং বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সম্পর্কে অনুসন্ধানের নির্দেশ নিয়ে দূত আগমন করে। ফলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আত্মসাত করার কালিমা তার উপর প্রকাশ পায়। সুতরাং তার উপর আল আযাবিয়অর ছাপ লাগে এবং তার নিকট থেকে আত্মসাত করা অর্থ তলব করা হয় এবং এজন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। আর সাইফুদ্দিন আবুল আবাস মাসেরী এ প্রসঙ্গে একটা কাসীদা রচনা করেন, যাতে তিনি এই যুলুম অবিচার দ্বারা শীতলতা লাভ করেন। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি তার নিকট গমন করেন এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উভয়ে সেখানে হাসি-কৌতুক করেন। অতঃপর মিশরীয় অঞ্চলে গমন করার দাবি নিয়ে দূত আগমন করে। তখন তার গমন করায় নায়েবরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং জুমার দিন প্রত্যুষে আল আযরাবিয়া মাদরাসায় তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এরপর কাযী এবং সাক্ষীদেরকে তলব করলে তারা এসে তা প্রত্যক্ষ করে। এরপর তাকে তৈয়ার করা হয় এবং জুমার নামাযের পর জানাযার নামায শেষে সূফীদের গোরস্থানে পিতার পাশে তাকে দাফন করা হয়। উম্মুস সালেহ মাজারে রাওয়াহিয়ায় তিনি শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন তথাকার দায়িত্বশীল।

আর আক্কা দূর্গের জন্য মিনযানিক প্রস্তুতের বার্তা নিয়ে দূত আগমন করে। সুতরাং বালাবাক অঞ্চলে দূর্গম এলাকায় তিনি আরোহণ করে গমন করেন। কারণ সেখানে এমন সব প্রকাণ্ড খনি আছে, যার অনুরূপ খনি দামেস্ক নগরীতে পাওয়া যায় না। আর এ কাজের জন্য এটাই উপযোগী। এর ফলে পাপাচার, খরচপাতি এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এভাবে জনগণ অসুবিধার সম্মুখিন হয়। এবং তারা গ্রেফতার করে অপ্রয়োজনীয় লোকজনকে। তাদেরকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে দামেস্ক নগরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

মালেক মনসুর কালাউনের মৃত্যু

জনগণ যখন এই ক্ষোভ দুঃখ আর নানাবিধ দাবি দাওয়ার মধ্যে উদ্বেলিত ছিল ঠিক তেমন মুহূর্তে দূতরা আগমন করত মালেক মনসুরের মৃত্যুর খবর দেয়। একই বৎসর ছয় যিলক্বদ শনিবার কায়রো নগরীর শহরতলীতে আল মাখিম এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর

রাত্রিকালে আল জাবাল দূর্গে তার লাশ আনা হয় এবং তারপর তার পুত্র মালেক আশরাফ খলিল যুবরাজ নিযুক্ত হয়। সকল আমীর তার নিকট শপথ গ্রহণ করেন এবং মিম্বরে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। এবং শাহী শান-শওকতের সাথে অশ্বারোহনপূর্বক সকল বাহিনী আল জাবাল দূর্গ থেকে পদব্রজে কৃষ্ণ ময়দান তথা সূক আল খায়রে উপস্থিত হয়। এ সময় আমির ওমরা, অগ্রবর্তী বক্তিবর্গ, বিচারকমণ্ডলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ খিলাত পরিধান করেন। এই খবর শাম দেশে পৌছলে তথাকার আমীররাও তার পক্ষে শপথ গ্রহণ করেন এবং তিনি তার পিতার নায়েব হুশামউদ্দীন তারাক তায়ীকে বন্দী করত তার নিকট থেকে বিপুল সম্পদ উদ্ধার করে তা সৈন্যদের মধ্যে ব্যয় করেন।

আর একই বৎসর দামেস্ক মসজিদে খুতবাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জামালুদ্দিন ইবন আব্দুল কাফীর পরিবর্তে যাইনুদ্দিন ওমর ইবন মাক্কী ইবন মারহাল। আর এ কাজ সম্পন্ন হয় আল আ'সার এর সহযোগিতায় এবং জামে মসজিদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাসিরউদ্দিন ইবনুল মাকদেসীর পরিবর্তে রঈস ওয়ীহুদ্দিন ইবনুল মানযী আল হাম্বলী। তিনি এর ওয়াক্ফ সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন, তাকে সম্প্রসারিত করেন, এমনকি তা এক লাখ পঞ্চাশ হাজারে বৃদ্ধি পায়। আর এ বৎসর হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তার গৃহে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আর ঘটনা ছিল এই যে তার অনুপস্থিতিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফলে কেউ ঘরে প্রবেশ করার সাহস করতে পারেনি। একটানা দুই দিন আগুন জ্বলতে থাকে এবং সবকিছু জ্বলে ছাই হয়ে যায়।

এ বৎসর শাওয়াল মাসে ইবনুল মাকদেসীর পরে ইমামুদ্দিন কাওনাবী উম্মে সালেহ মাজারে পাঠদান করেন। আর হুসাইন ইবন আহমদ ইবন শায়খ আবু ওমর তার চাচাতো ভাই নাযমুদ্দিন ইবন শায়খ আল জাবালের পরিবর্তে হাম্বলী মাযহাবের কাযী নিযুক্ত করেন। মৃত্যুর পূর্বে মালেক মনসুরের নির্দেশ অনুযায়ী এই নিযুক্তি কার্যকর হয়। আর একই বৎসর শাম দেশে থেকে আমীর বদরুদ্দিন বাকতূত দোবাসী জনগণকে নিয়ে হজ্জে গমন করেন। এছাড়াও কাযী উল কুযাত শিহাবউদ্দিন ইবনুল খাবী এবং শামসুদ্দিন ইবন সালাউস এবং কাফেলার নেতা আমীর ওতবা ও হজ্জ করেন। আর এর ফলে আবু নামী সন্দেহ করেন এবং তাদের উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল তাই তিনি মক্কার দরজা বন্ধ করে দেন এবং লোকজনকে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে বারণ করেন। ফলে উত্তেজিত লোকেরা মক্কার দরজায় অগ্নিসংযোগ করে এবং একদল লোককে হত্যা করে এবং কোনো কোনো স্থানে লুটতরাজের ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের লক্ষ্যে কাযী ইবনুল খাবীকে সকলে প্রেরণ করে। তিনি যখন আবু নামীর নিকট অবস্থান করছিলেন তখন অশ্বারোহী কাহিনী গমন করে তিনি একা হেরেম শরীফে অবস্থান করছিলেন। আর আবু নামী তার সঙ্গে লোক প্রেরণ করে যারা তাকে স্বসম্মানে তাদের সঙ্গে মিলিত করেন। আর আরাফাতের ময়দানে লোকেরা মনসুরের মৃত্যুর খবর শুনতে পায়। এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। আর এ সময় একটা পত্র আসে, যাতে উজীর ইবন সালাউস-কে এ মর্মে উদ্বুদ্ধ করা হয় যে তিনি যেন মিশরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে গমন করেন আর পত্রের মধ্যভাগে মালেক আশরাফের হস্তাক্ষরে লেখা ছিল যে, হে শাকীর মোবারক চেহারার অধিকারী, উজীরের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হও, ফলে তিনি কায়রোর উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং ১০ মুহাররম মঙ্গলবার তিনি কায়রো পৌছেন এবং

সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। এ বৎসর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হচ্ছেন–

সুলতান মালেক মনসুর কালাউন

ইবন আব্দুল্লাহ আর তুর্কী আল সালেহী আল আলফী, মালেক সালেহ নাযমুদ্দিন আউয়ুব ইবনুল মালেক কামিল মোহাম্মদ ইবন আদিল আবু বকর ইবন আউয়ুব তাকে দুই হাজার দিনার দিয়ে খরীদ করেন। আর তিনি ছিলেন তার সময় এবং তার পরবর্তী সময়ের বড় আমীরদের অন্যতম। আর যখন মালেক সায়েদ বিন যাহের তার কন্যা গাজিয়া খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন আযযাহেরের নিকট তার সম্পর্ক বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং সরকারে তিনি একের পর এক উন্নতি করতে থাকেন। অবশেষে সালমা ইবনে যাহেরের শিক্ষা গুরুতে পরিণত হন। এতে তার মর্যাদা আরো ও বৃদ্ধি পায় এবং ৬৮২ হিজরী সনে তিনি সতন্ত্র বাদশায় পরিণত হন। পরে ৩৮৮ হিজরি সনে তিনি ত্রিপলি জয় করেন এবং একা অঞ্চল জয় করারও সংকল্প করেন এবং সেদিকে গমন করেন। কিন্তু ২৬ যিলক্বদ দ্রুত মৃত্যু তাকে পাকরাও করে এটা ২৬ যিলকদ রাতের ঘটনা এবং তার মহান মাদ্রাসার গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। যে মাদ্রাসাটি তিনি স্থাপন করেন দুটি বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যস্থলে মিনার এবং শাম দেশে যার কোনো তুলনা নাই সেখানে আছে দারুল হাদীস এবং হাসপাতাল আর এজন্য অনেক গৃহ ওয়াকফ করা হয। অনতিবিলম্বে ৬০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার রাজত্বকাল ছিল ১২ বছর। তিনি ছিলেন সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তাতে ছিল শাহী সান সওকত এবং বাদশাহী আভিজাত্য। তার আকার ছিল দীর্ঘ ও পূর্ণ এবং দাড়ি ছিল সুন্দর। তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় সাহসী বীর পুরুষ এবং আভিজাত্যের প্রতীক। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

আমর হুসাম উদ্দীন তারাক তাই

ইনি ছিলেন মিশরে মনসুরী সরকারের নায়েব। আশরাফ তাকে গ্রেফতার করে আল যাবাল দূর্গে বন্দী করেন। অতঃপর তাকে হত্যা করেন তার লাশ ৮দিন পরে থাকে কেউ তার খবর রাখতো না। অতঃপর চাটাইতে পুড়ে ময়লা আবর্জনার স্তুপে তার লাশ নিক্ষেপ করা হয়। কোনো কোনো মানুষ তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। অনেক সুখ ভোগ করার পর একজন ফকিরের বেশে তাকে কাফন পরানো হয়। জীবদ্দশায় তিনি দুনিয়ার অনেক সুখ ভোগ করেন। সুলতান তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্য থেকে ৬ লক্ষ দীনার এবং ৭০ কেন্ডার মিশ্রিত রোপ্য গ্রহণ করেন। অনেক মনি-মানিক্য মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্পদরাজি উদ্ধার করেন। মিনায় এবং শাম দেশের সম্পদ থেকে এসব ছিল অশ্ব, গাধা, এবং উস্ট্র এবং সাজ-সরঞ্জাম ব্যক্তি তিনি রেখে যান দুইজন পুত্র সন্তান। যাদের একজন ছিল অন্ধ। এই অন্ধ পুত্র রমজান দিয়ে চেহারা আবৃত করে আশরাফের নিকট আগমন করে বলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু দান করো। এবং আশরাফকে লক্ষ্য করে বলেন যে, কয়েকদিন থেকে খাবার মতো কিছুই তারা পাচ্ছে না। ফলে তার কথায় আশরাফের মন গলে যায় এবং তাকে সম্পদ ফেরত দেয়। যা থেকে তারা আহার করতে পারে। আল্লাহ অতি পবিত্র তিনি তার সৃষ্টিতে যেমন খুশি কার্য করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা অপমান করেন।

শায়খ ঈমান আল্লামা

রশিদউদ্দিন ওমর ইবনে ইসমাইল ইবনে মাসউদ আন ফারুকী আল শাফেয়ী। ছিলেন যাহেরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ৯০ বছরের বেশি বয়সে। হেরেস তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয় এ অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায় এবং সুফিয়াদের গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন জ্ঞানের অনেক শাখায়। তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব যথা আরবি সাহিত্য অনুবাদ লিপিকলা, প্রবন্ধ সাহিত্য, জ্যোতিরবিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র ইত্যাদি। তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করেন।

খতিব জামাল উদ্দিন আবু মুহাম্মদ

আব্দুল কাফির ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল কাফির আল রবিঈ দারুল ফোরায় তিনি ইন্তেকাল করেন। আর জুমাদাল উলার শেষ দিকে শনিবার লোকজন তার জানাযার- নামাযে উপস্থিত হয় তার লাশ মোরবাদের পাদদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেখানে শায়খ ইউসুফ ফোগাইলের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

ফকরুদ্দীন আবু যাহের ইসমাঈল

ইবনে ইযুল কুযাত আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুল ইয়ামান শায়খ যাহের। ইনি দুনিয়ার সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। রমযান মাসের ২০ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন। জামে মসজিদে তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়। বনী যকীর কাসীউন গোরস্থানে শায়খ মহিউদ্দিন ইবন আরাবীর ভালবাসায় তাঁকে দাফন করা হয়। কারণ, তিনি প্রতিদিন ইবন আরাবীর কথা থেকে দু'পৃষ্ঠা এবং হাদীস থেকে দু'পৃষ্ঠা লিখতেন। শায়খ মহিউদ্দিন ইবন আরাবী সম্পর্কে তিনি সুধারণা পোষণ করতেন এবং সকল ইমামের সঙ্গে তিনি মসজিদে নামায আদায় করতেন। কোনো কোনো আলীম তার সম্পর্কে বলে যে তারা তার লেখায় দেখতে পেয়েছেন–

وفى كل شىء له اية * تدل عدل على انه عينه

সমস্ত কিছুতে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে যা প্রমাণ করে যে তিনিই একমাত্র সত্ত্বা। এই কবিতাটি ভিন্নভাবে বর্ণিত আছে যাতে বলা হয়েছে যে তিনি একক সত্তা। তার আরো অনেক কবিতা আছে যার কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

والنهر مذ جن فى الغصون هوى * فراح فى قلبه يمثلها
فغار منه النسيم عاشقها * فجاء عن وصله يميلها
لما تحقق بالامكان فوقكم * وقد بدا حكمه فى عالم الصور
فميز الجمع عنه وهو متخذ * فلاح فرقكم فى عالم الصور
لى سادة لا ارى سواهم * هم عين معناى وعين جوفى
لقد احاطوا بكل جزء * منى وعزوا عن درك طرفى
هم نظروا فى عموم فقرى * وطول ذلى وفرط ضعفى
فعاملونى ببحت جود * وصرف بر ومحض لطف

فلا تلم ان جررت ذیلی * فخرا بهم او ثنيت عطفی
مواهب ذي الجلال لدى تترى * فقد اخرستنى ونطقن شكرا
فنعمى اثر نعمى * وبشرى بعد بشرى بعد بشرى
لها بدء وليس لها انتهاء * يعم مزيدها دنيا واخرى

১. আর নবী যখন থেকে শাখায় লুপ্ত থাকে তখন তা তাঁর অন্তরে নমুনা হয়ে যায়।

২. আর মৃদু মন্দ বায়ু তাকে ঈর্ষা করে যে তার আকাঙ্খী তখন সে তাকে মিলন থেকে হটাতে চায়।

৩. যখন প্রমাণ হয় তোমার উপর সম্ভাবনা তখন প্রকাশ পায় আকৃতি জগতে তার হুকুম।

৪. তখন সে পৃথক করে যে মিলনকে, অথচ তা তো মিলন চায় তখন প্রকাশ পায় আকৃতি জগতে তোমাদের পার্থক্য।

৫. আমার তরে আছে কিছু কর্তা ব্যক্তি তাদেরকে ছাড়া আমি কিছুই দেখি না। তারাই হচ্ছে আমার প্রকৃত অর্থ, তারাই আমার উদর।

৬. তারা আয়ও করে নিয়েছে আমার সকল অংশ এবং তারা তৃপ্তি পেয়েছে আমার দর্শন লাভের ফলে।

৭. তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে আমার দারিদ্র্যের গভীরে, আমার অপমানের দৈর্ঘ্যে এবং আমার দুর্বলতার গভীরে।

৮. ফলে তারা আমার সঙ্গে আচরণ করেছে নিছক বদান্যতা, কল্যাণকামীতা এবং অনুগ্রহের।

৯. আমি যদি সংকুচিত করি আমার আচরণ তাদের জন্য গৌরববশত অথবা আমি ফিরিয়ে নিই আমার ঘাড় তখন তুমি আমাকে তিরস্কার করো না।

১০. মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ আমাকে বোবা করে দিয়েছে এবং প্রকাশ করেছে কৃতজ্ঞতা।

১১. নেয়ামতের পর নেয়ামত এবং সুসংবাদের পর সুসংবাদ অর্জিত হয়েছে।

১২. সে সবের সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই, আর সে সব অনুগ্রহের অতিরিক্ত অংশ দুনিয়া এবং আখিরাতকে আচ্ছন্ন করবে।

আলহাজ্জ তাইবারস ইবন আব্দুল্লাহ

উজীর জালাউদ্দীন, মালেক যাহিরের জামাতা তিনি ছিলেন বড় আমীরদের অন্যতম, যারা ছিল খোলা এবং বাঁধার অধিকারী অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ইনি ছিলেন অতি দীনদার এবং দানশীল ব্যক্তি। দামেস্ক নগরীতে তার একটা সরাইখানা ছিল যা তিনি ওয়াকফ করে দেন। তিনি অনেক বন্দিকে মুক্ত করেন। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করে যান। শাম এবং মিশর দেশের সৈন্যদের জন্য তিন লাখ দিরহাম ব্যয় করার জন্য। ফলে এক এক জন সৈন্য পঞ্চাশ দিরহাম লাভ করেন। যিলহজ্জ মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আল মাকতামের পাদদেশে নিজস্ব গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কাযী আল কুযাত

নাযমুদ্দীন আবুল আব্বাস ইবন শায়খ শামসুদ্দিন ইবন আবু ওমর আল মাকদেসী। বারো রজব 'বাসওয়া' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন খতীব। তিনি অনেক মাদরাসায় দারস দান করেন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের শায়খ এবং তাদের শায়খের পুত্র। তারপরে কাযীর পদ গ্রহণ করেন শায়খ শরফুদ্দিন হুসাইন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবু ওমর। মহান আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

হিজরী ৬৯০ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯১ সন)

এই বৎসর এক্কা ও অবশিষ্ট উপকূলীয় অঞ্চল যা দীর্ঘদিন ধরে ফিরিঙ্গীদের অধিকারে ছিল তা জয় করা হয়। সেখানে ফিরিঙ্গীদের একটা পাথরও অবশিষ্ট ছিল না। সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর জন্য।

এই বৎসর যখন শরু হয় তখন আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন হাকিম বিআমরিল্লাহ আবুল আব্বাস। আর নগরীর সুলতান ছিলেন মালেক আশরাফ খলিল ইবন মনসুর কালাউন এবং মিশর ও সন্নিহিত অঞ্চলের নায়েব ছিলেন বদরুদ্দিন বায়বারস। আর তার উজীর ছিলেন ইবন কানযাসার, তিনি ছিলেন রুকনুদ্দিন কালাজ আরসালান সারফুকীর পুত্র। আর হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন তকীউদ্দিন মাহমুদ ইবন মালেক মনসুর নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ ইবন মালেক মুযাফফর তকীউদ্দিন মোহাম্মদ এবং ইরাক খোরাসান সন্নিহিত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন আরগুণ ইবন আবগা ইবন হালাকু খান ইবন তাওয়াল্লি খাঁন ইবন চেঙ্গিস খাঁন।

এ বৎসরের প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার। এই দিনে মালেক মনসুরের পক্ষ থেকে বিপুল স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা হয়। আর বৃহস্পতিবার রাত্রে সুলতানকে কবরে নামানো হয়। এবং সেখানে গম্বুজের নীচে তাকে দাফন করা হয়। আর তার কবরে নামেন বদরুদ্দিন বায়দারা এবং আলামুদ্দিন সুজারী। এই সময় বিপুল অর্থ বন্টন করা হয়। আর সাহেব শামসুদ্দিন ইবন সালউস হিজাজ থেকে আগমন করলে তাকে খিলাত এবং ওযাফত দান করা হয়। আর কাযী মহিউদ্দিন ইবন আব্দুয যাহির যিনি ছিলেন প্রধান সচিব তিনি নিজ হাতে অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করেন। আর উজীর শান শওকতের সাথে অশ্বারোহনপূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আর শুক্রবার দিন তিনি শামসুদ্দিন সানকার আল আশকার এবং সাইফুদ্দিন ইবন যুরমুখ নাসিরীকে গ্রেফতার করেন এবং আমির যাইনুদ্দিন কুতুবগাকে মুক্ত করে দেন। তারাকতায়ীর সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তার জায়গীর তাকে ফেরত দেওয়া হয়। আর দামেস্কের ওযারতীতে তাকী তাওবাকে দ্বিতীয়বার ফেরত আনা হয়। আর এই বৎসর ইবনুল খাবী এমন এক স্মারক রচনা করেন যাতে উল্লেখ ছিল যে নাসিরীয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের দায়িত্ব কাযী শাফেঈর হাতে ন্যস্ত করা হবে যাইনুদ্দিন আল ফারুকীর নিকট থেকে এ পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়।

এক্কা ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল বিজয়

আর এই বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের ১ম দিকে দূত দামেস্ক নগরীতে এই মর্মে বার্তা নিয়ে আসে যে, এক্কা অঞ্চল অবরোধ করার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। আর দামেস্ক

নগরীতে ঘোষণা জারী করা হয় যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারীরা এক্কা অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা হবে। এ সময় এক্কাবাসীরা তথায় বিদ্যমান মুসলিম বণিকদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে হত্যা করত তাদের অর্থ সম্পদ অধিকার করে নেয়। তাই আল জাসূরা অঞ্চল অভিমুখে মিনযানিক বের করা হয়। উল্লেখ্য যে মিনযানিক ছিল তৎকালের জন্য এক ধরণের ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষ। সেকালে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য এর চেয়ে মারাত্মক কোন অস্ত্রের কথা জানা যায় না। অনুবাদক বলেন, ঘোষণা অনুযায়ী সাধারণ নাগরিক, স্বেচ্ছাসেবী দল এমনকি ফকীহ্ শিক্ষক সমাজ এবং সাধু সজ্জনরাও তৎক্ষণাত বেরিয়ে আসেন। এবং আলামুদ্দিন দুয়াইদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর সৈন্যরা শাম দেশের নায়েবের অগ্রভাগে এগিয়ে যায়। আর তিনি ছিলেন সকলের পিছনে। আর হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা মালেক মুযাফফার ও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। চতুর্দিক থেকে লোকজন ছুটে আসে। আর ত্রিপলির সৈন্যরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং আশরাফও একদা গমন করার জন্য মিশর অঞ্চল থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে বের হন। সেখানে সৈন্যরা পরস্পর মিলিত হয় এবং তিনি চার রবিউস সানী বৃহস্পতিবার দিন যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এক্কা অঞ্চল চতুর্দিকে যেখানে মিনযানিক স্থাপন করা সম্ভব ছিল সেখানে মিনযানিক স্থাপন করা হয়। যুদ্ধে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করা হয় এবং এক্কাবাসীদেরকে কাবু করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। লোকজন জামে মসজিদে মিলিত হয়ে বুখারী শরীফ পাঠ করেন। আর তা পাঠ করেন শায়খ শরফুদ্দিন আল ফাজারী। বুখারী শরীফ পাঠের মজলিসে উপস্থিত হন কাযীবর্গ, পণ্ডিতবর্গ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আর এক্কা নগরী অবরোধকালে শাম দেশের নায়েব হুসামুদ্দিন লাজীনের পক্ষ থেকে কিছু হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হয়। এতে তার ধারণা জন্মে যে সুলতান তাকে আটক করতে চান। আর এ বিষয়ে তাকে অবহিত করেন একজন আমীর যাকে বলা হয় আবু খারাস। তিনি অশ্বারোহণপূর্বক পলায়ন করতে উদ্ধত হলে আলামুদ্দিন দুাইদারী আর মাসা অঞ্চলে আটক করে সুলূতানের নিকট নিয়ে আসেন। এতে সুলতান খুশী হয়ে খিলাত দান করেন এবং তিনদিন পর তাকে আটক করে সফর দূর্গে প্রেরণ করেন এবং তার মালপাত্র হেফাযত করে রাখেন। এবং তার শিক্ষক বদরুদ্দিন বাকদারকে লিখেছেন সেখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা ছিল অনাকাঙ্খিত। কারণ সে সময়টা ছিল কঠিন, সংকীর্ণ, এবং অবরোধের। আর সুলতান অবরোধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন এবং তিন'শ বোজার জন্য ভারবাহী নিযুক্ত করেন। অতঃপর সতেরো জুমাদাল উলা জুমার দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সূর্যোদয়কালে সকলে একযোগে বের হন এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে অঙ্গে মুসলমানরা প্রাচীরের ওপর আরোহণ করেন এবং নগর প্রাচীরের ওপর ইসলামী পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সময় ফিরিঙ্গীরা পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করে এবং তারা পলায়নকাল বণিকদের নৌকায় আরোহণ করে। তাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হয় যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আর মুসলিম বিজেতা দল গণীমত হিসেবে লাভ করে অনেক সম্পদ, দাস-দাসী এবং আরো অনেক পণ্য- সামগ্রী। আর সুলতান এক্কা নগরী এমনভাবে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন যাতে পরবর্তী সময়ে কোনো কাজে না লাগে। আল্লাহ তা'আলা জুমার দিন সে নগরী জয় করা সহজ করে দেন। যেমন ফিরিঙ্গীরা মুসলমানদের নিকট থেকে শুক্রবার তা অধিকার করে নিয়েছিল। শূর এবং সায়দা নগরীর নেতৃত্বে আশরাফের নিকট অর্পণ করেন এবং উপকূলীয় অঞ্চল মুসলিম অধিকারে আসে এবং তা কাফিরদের থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা। (সূরা আনআ'ম আয়াত- ৪৫)

এ সম্পর্কে দামেস্ক নগরীতে পত্র পৌছলে মুসলমানরা আনন্দিত হয়। এবং সকল দূর্গের সুসংবাদ প্রচার করা হয়। এবং নগরীতে সজ্জিত করা হয় যাতে দর্শক এবং পর্যটক আনন্দিত হয়। এবং সুলতান শূর অভিমুখে আমীর প্রেরণ করেন। তিনি নগরীর প্রাচীর ধ্বংস করেন এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এই নগরী ৫১৮ হিজরী সন থেকে ফিরিঙ্গীদের অধিকারে ছিল আর এক্কা নগরী ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে অধিকার নেন মালেক নাসের ইউসুফ ইবন আইউব। এরপর ফিরিঙ্গীরা আগমন করে অনেক সৈন্য নিয়ে তা ঘেরাও করে। অতঃপর সুলতান সালাউদ্দিন ৩৭ মাস তাদেরকে নগরী থেকে বারণ করেন। অবশেষে ফিরিঙ্গীরা তা অধিকার করে নেয় এবং তথ্যকার সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করে যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর সুলতান মালেক আশরাফ যালিল ইবন মনসুর কালাউন রাজকীয় শান শওকত এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে এক্কা থেকে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তার সঙ্গে ছিল উজীর ইবন সানউস এবং বিজয়ী বাহিনী। আর এই দিনে তিনি আমীর আলামুদ্দিন সানযার শাজায়ীকে শাম দেশের নায়েব নিযুক্ত করেন। এবং তাকে দারুস সাআদাতে অবস্থান করেন। এবং তার জায়গীরে হারাস্তা সংযোজন করেন যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। আর এটা করা হয় দূর্গ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের স্বার্থে। এবং তিনি তার জন্য প্রতিদিন তিনশ দিরহাম বাবুর্চিখানার খরচের জন্য মনজুর করেন। এবং তাকে সুযোগ দেন যে কোন রকম পরামর্শ এবং আলাপ আলোচনা ছাড়া ভাণ্ডার থেকে দান করছে পারেন এবং সুলতান তাকে ছোয়াত অঞ্চলে প্রেরণ করেন, কারণ সেখানে একটা অবাধ্য দূর্গ অবশিষ্ট ছিল তিনি তা জয় করে নেন এবং এজন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর তিনি দ্রুত সুলতানের নিকট আগমন করলে সুলতান তাকে বিদায় জানান। রজব মাসের শেষ দিকে সুলতান মিশরীয় অঞ্চল সফর করেন এবং সুলতান তাকে বৈরুত্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাতে তা জয় করতে পারেন। ফলে তিনি তথায় গমন করত অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা জয় করে নেন এবং 'আসলিয়া' আন্তাতারতুস এবং জাবাল অঞ্চল তার বৈশ্যতা স্বীকার করে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে ফিরিঙ্গীদের হাতে আর কোন দূর্গ অবশিষ্ট ছিল না। সমস্ত দূর্গই মুসলমানদের হস্তগত হয়। নগর এবং জনগণকে আল্লাহ তাদের থেকে উদ্ধার করেন। সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর জন্য। আর শা'বান মাসের ৯ তারিখে সুলতান বিরাট মহা শান-শওকতের সাথে কায়রো নগরীতে প্রবেশ করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার জুমার দিন এবং তিনি বদরুদ্দিন বায়সারীকে সাত বৎসর আটক রাখার পর মুক্ত করে দেন। আর একই মাসের সাতাশ তারিখ দামেস্কের নায়েব আলামুদ্দিন শাজায়ী ফিরে আসেন এবং তিনি উপকূলীয় অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিঙ্গীমুক্ত করেন। সেখানে তাদের চিহ্নস্বরূপ একটা প্রস্তরও অবশিষ্ট ছিল না। আর রমযান মাসের চার তারিখ তিনি হুসাসুদ্দিন লাজীনকে ছপদ' দূর্গ থেকে মুক্ত করে দেন। এই সময় তার সঙ্গে আমীরাদের একটা দলও ছিল। তাদের জায়গীরও ফেরত দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতি সদাচার করা হয় এবং সম্মানও প্রদর্শন করা হয়।

রমযান মাসের শুরুতে তিনি কাযী বদরুদ্দিন ইবন জুম'আকে কাতাস শরীফ অর্থাৎ, বায়তুস মুকাদ্দাস থেকে তলব করেন। তিনি ছিলেন তথাকার শাসক এবং খতীব। দূত মারফত তাকে মিশরীয় অঞ্চলে ডেকে পাঠান এবং ১০১৪ তারিখ তিনি মিশর প্রবেশ করেন এদিক সন্ধ্যায় তিনি উজীর ইবন সালউসের নিকট ইফতার করেন এবং উজীর তাকে অতি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সময়টা ছিল জুমার রাত্রি। এবং উজীর তকীউদ্দিন ইবন বিনতুল আয়াজকে পদচ্যুত করার এবং মিশরে প্রধান কাযীর পদে নিয়োগ করার বিষয়টা স্পষ্ট করেন। এজন্য কাযীরা তাকে অভিনন্দন জানাতে আসেন এবং প্রত্যুষে সাক্ষীরা তার সমীপে উপস্থিত হয়। এতদসঙ্গে জামে আল আজহারে খুতবা দান এবং সালেহীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব ও তার উপর ন্যস্ত করা হয়। ফলে তিনি বিশেষ বস্ত্র এবং সবুজ চাদর পরিধান করে অশ্বারোহণ করেন এবং তিনি অপরাপর কাযীদেরকেও নির্দেশ দেন যে তারাও যেন সবুজ বস্ত্র পরিধান করে। তিনি জামে আজহার গমন করত তথায় খুতবা দান করেন এবং পরে তিনি সালেহিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করেন এবং পরবর্তী জুমুআর দিন তথায় দারস দান করেন। দারসের এ অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। আর জুমার দিন উপস্থিত হলে সুলতান হাকিম বিআমরিল্লাহকে নির্দেশ দেন তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। খুতবায় তিনি যেন একথা উল্লেখ করেন যে, তিনি আশরাফ খলিল ইবন মানসুরকে রাজ্যের ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ খিলাত পরিধান করত জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। যেমন খুৎবা তিনি দিয়েছিলেন যাহিরীয়া রাজ্যে। আর এই খুৎবা লিপিবদ্ধ করেছেন শায়খ শরফুদ্দিন আর মাকদেসী ৬৬০ হিজরীতে। উভয় খুৎবার মধ্যে ৩০ বছরের বেশি ব্যবধান ছিল। এই খুতবা দেওয়া হয় আল জাবাল দূর্গস্থ মসজিদে। অতঃপর ইবন জুমাআ সলতানের নিকট দূর্গ মসজিদে খুৎবা অব্যাহত রাখেন। আর তিনি জামে আযহারে নায়েব নিযুক্ত করতেন।

অবশ্য ইবনু বিনতিল আয়ায উজীরের পক্ষ থেকে ভৎর্সনা এবং চরম তিরষ্কার ও অবমাননা লাভ করেন। তার কোন পদই আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। ইতিপূর্বে তার হাতে ছিল সতেরোটা পদ। এইসব পদের মধ্যে ছিল বিচারকের পদ, খতীবের পদ, ওয়াকফে সম্পত্তি দেখাশুনার পদ, সবচেয়ে বড় শায়খের পদ, ধনভাণ্ডার রক্ষাণবেক্ষণ ও বড়দের শিক্ষাদান অন্যতম। এজন্য তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার দিরহাম দাবি করেন। বাহন এবং আরো অনেক বস্তু ছাড়া এই দাবি করা হয়। তার পক্ষ থেকে কোনো বিনয় এবং বৈশ্যতা প্রকাশ পায়নি। এরপর তিনি ফিরে আসেন এবং উজীর তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী দারস দানের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন। আর যিলক্বদ মাসের চার তারিখ সোমবার রাত্রে মনসুরের কবরের নিকট খতম পড়াবার আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানে কাযী এবং আমীরগণ যোগদান করেন। এবং প্রত্যুষে সুলতান খলীফাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং খতম শেষে খলীফা এক আবেগময় ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাতারীদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য। ইতিপূর্বে খলীফা আত্মগোপন করেছিলেন। এ অনুষ্ঠানে জনগণ তাকে প্রকাশ্যে দেখতে পায়। এরপর তিনি বাজারে গমন করেন। আর দামেস্কের অধিবাসীরা সবুজ প্রান্তরে আবলাক প্রাসাদের নিকট এক বড় খতমের আয়োজন করে। এর সঙ্গে আরো অনেক খতম যুক্ত হয়।

অতঃপর শায়খ ইযযাদ্দিন কারুণী জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর ভাষণ দেন ইবনুল বাযুরী। অতঃপর কথা বলেন সে সব লোক যাদের কথা বলার অভ্যাস আছে। এরপর দূত ইরাক যুদ্ধে গমন করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান এবং জনগণের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করা হয়। বাগদাদের নিকট দাজলা নদীতে সেতুর কারণে দীর্ঘ জিঞ্জীর প্রস্তুত করা হয় এবং এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করা হয়। যদিও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি এবং এতে জনগণ বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়।

আর একই বৎসর শাম দেশের নায়েব মুজায়ী ঘোষণা প্রচার করেন যে নারীরা বড় বড় পাগড়ী পরিধান করতে পারবে না। ইনি বানইয়ার নদীর উপর যে সব ইমারত ছিল সে সব ধ্বংস করেছেন। এছাড়াও ছোট ছোট নহর এবং হাউজ যা নদীর উপর ছিল সেগুলোও ধ্বংস করে দেন। তিনি যালাবিয়া সেতু এবং তার উপর দোকান-পাটও ধ্বংস করেন এবং ঘোষণা প্রচার করেন যে কেউ যেন এশার নামাযের পর রাস্তা-ঘাটে চলাচল না করে। এরপর তিনি কেবল তাদের জন্য চলাচলের অনুমতি দেন। মালেক সাইদ যাহের বাবুন নসর এ যে হাম্মাখানা তৈয়ার করেছিলেন তিনি তাও ধ্বংস করে দেন। দামেস্ক নগরীতে এর চেয়ে সুন্দর কোন হাম্মামখানা ছিল না। এবং তিনি সবুজ প্রান্তরকে উত্তর দিক থেকে ষষ্ঠাংশ পরিমাণ প্রসস্ত করে দেন উত্তর প্রান্তর এবং নহরের মধ্যস্থলে সামান্য পরিমাণ জায়গা ছাড়া আর কিছুই ছাড়েননি। তিনি নিজে তার এবং তার আমীররা এর দেয়াল নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন।

আর একই বৎসর জামালুদ্দিন আকুশ আল আকরাম মনসুরীকে অন্যান্য আমীরদের সঙ্গে দূর্গে বন্দী করা হয়। এবং এই বৎসর আমীর জালামুদ্দিন দুয়াইদারীকে বন্দী করে মিশর অঞ্চলে আনয়ন করা হয়। এক্কা নগরী জয় সম্পর্কে শায়খ শিহাবউদ্দিন মাহমুদ একটা কাসীদা রচনা করেন–

الحمد لله زالت دولة الصلب * وعز بالترك دين المصطفى العربي

هذا الذى كانت الامال لو طلبت * رؤياه فى النوم لاستحييت من الطلب

ما بعد عكا وقد هدت قواعدها * فى البحر للترك عند البر من ارب

لم يبق من بعدها للكفر اذ خربت * فى البحر والبر ما ينجى سوى الهرب

ام الحروب فكم قد انشات فتنا * شاب الوليد بها هولا ولم تشب

يا يوم عكا قد انسيت ما سبقت * به الفتوح وما قد خط فى الكتب

لم يبلغ النطق حد الشكر فيك فما * عسى يقوم به ذو الشعر والادب

اغضبت عباد عيسى اذ ابدتهم * لله اى رضى فى ذلك الغضب

واشرف الهادى المصطفى البشير على * ما اسلف الاشرف السلطان من قرب

فقر عينا لهذا الفتح وابتهجت * ببشره الكعبة الغراء فى الحجب

وسار فى الارض سيرا قد سمعت به * فالبر فى طرب والبحر فى حرب

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে ক্রুশের ডাকে রাজত্ব সমাপ্ত হয়েছে আর মোস্তফা আরবীর দীন তুর্কিদের দ্বারা শক্তি সঞ্চায় করেছে।

আর এ হচ্ছে এমন বিষয় যে যদি আকাঙক্ষা স্বপ্নযোগে তা কামনা করত তবে আমি তার কামনায় লজ্জাবোধ করতাম।

আর এক্কার পর তার ভিত ধ্বংসে পড়েছে সমুদ্রে আর তুর্কিদের জন্য স্থলভাগে রয়েছে এর প্রয়োজন।

যখন তা ধ্বংস হয়েছে তখন তার পর কুফরের জন্য জলে-স্থলে পলায়ন ছাড়া অন্য কোনো মুক্তিদাতা।

আর যুদ্ধ বিদ্রোহ কত ফেতনা সৃষ্টি করেছে যাতে তার ভয়ে শিশু বৃদ্ধ হয়ে যায়, অথচ সে বৃদ্ধ নয়।

হে এক্কার দিন, তুমি সেই সব বিজয়কে ভুলে বসেছ যা ইতিপূর্বে ঘটেছে এবং যা পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

তোমার বিষয়ে কথা বলা কৃতজ্ঞতার পর্যায়ে পৌছে না। আর কোন কবি কোন সাহিত্যিক সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে তা সম্ভব নয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে যখন তুমি ঈসার পূজারীদেরকে ধ্বংস করেছো অর্থাৎ, এই অসন্তুষ্টিতে তারা তুষ্ট হয়েছে।

আর সুসংবাদদাতা হাদী মোস্তফা তার দিকে দেখেছেন যা নিকট থেকে প্রেরণ করেছেন সুলতান আশরাফ।

তাই তুমি সে বিজয়ে চক্ষু শীতল করো আর উজ্জল কা'বা পর্দার অন্তরালে সেই সুসংবাদে আনন্দিত হয়। আর সে পৃথিবীর বুকে এমন সফর করছে যে তার সম্পর্কে আমি শুনেছি তাই স্থলভাব আনন্দে মত্ত আল জলভাগ মত্ত যুদ্ধে।

এই কাসীদা অতি দীর্ঘ। তিনি ছাড়া আরো অনেকে এক্কা অঞ্চল বিজয় সম্পর্কে আরো অনেক কবিতা রচনা করেছেন। আর দূত যখন ফিরে এসে খবর দেয় যে সলতান মিশরে ফিরে এসেছেন তখন তিনি নিজের পরিহিত সমুদয় মূল্যবান বস্ত্র উজীর ইবন সালউসকে খিলাত হিসাবে দান করেন। এছাড়া সমুদয় বাহন ও তাকে দান করেন এবং তিনি তৎক্ষণাত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করত দাদেস্কের ধন ভাণ্ডার থেকে তাকে আটাত্তর হাজার দিরহাম প্রদান করার নির্দেশ দেন।

যাতে তিনি আনন্দিত হযে বায়তুল মাল থেকে একটা জনপদ ক্রয় করতে পারেন।

আর একই বৎসর হালব দূর্গ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। হালাকু খাঁন এবং তার সঙ্গীরা হিজরি ৬৫৮ সালে এই দূর্গটির ক্ষতি সাধন করে। আর এই বৎসর শাওয়াল মাঝে দামেস্ক দূর্গের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এছাড়া রাজকীয় বাড়ি-ঘর, তারেমা এবং কুব্বাতুষ যারকার নির্মাণ কাজ শরু করা হয় সুলতান আশরাফ খলিক ইবন মনসুর কালাউনের নির্দেশক্রমে, যা তিনি তার নায়েব আলামুদ্দিন সানযার মুজায়ীকে দিয়েছিলেন। আর এ বৎসর রমযান মাসে আমীর আরয়ুয়াশকে

পুনরায় দূর্গের প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় এবং মূল্যবান জায়গীর দান করা হয় এবং একই বৎসর শায়খ রাযীহী শায়খ নুবুসের সন্তানদের নিকট থেকে তাকে সংকীর্ণকারী এবং কায়রো অভিমুখে অবরোধকারী প্রেরণ করে। আর এই বৎসর ইযযুদ্দিন আল কারুণী কামালুদ্দিন ইবন খাল্লিকানের পরিবর্তে নজিবিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন। আর একই দিন নাসিরুদ্দিন ইবনুল মাকদেসীর পরিবর্তে নযমুদ্দিন মাক্কী রাওয়াহিয়ায় দারস দান করেন এবং কামালুদ্দিন তবীব দারস দান করেন দাখাওরিয়া তিবরিয়া মাদরাসায়। এবং এই মাসেই শায়খ জালালুদ্দিন আল খাবাযী শাতুনিয়া বারানিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন। আর জামালুদ্দিন ইবন নাসের দারস দান করেন ফাতেহিয়া মাদরাসায় এবং বুরহান উদ্দিন ইস্কান্দারী জামে মসজিদে অবস্থিত কাওছিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন আর শায়খ নাজমুদ্দিন দামেস্কি দারস দান করেন হারাতুল গারবার নিকটে সেবিপিয়া মাদরাসায়। আর একই বৎসর নাসিরিয়া মাদরাসায় ফারুকীকে ফেরত দেওয়া হয় এবং তথাকার আমিনীয়া মাদরাসায় দারস দান করেন ইবন ছাছরী। ইনি দারস দান করেন ইবন ফামলিকনীর পর।

আর তার নিকট থেকে আদেলিয়া ছগীরা কামালুদ্দীন ইবন যামালেবানীর নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়।

এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন–

তাতার সম্রাট আরগুন ইবন আবগা

ইনি ছিলেন বিচক্ষণ বীর এবং রক্ত পিপাসু। ইনি আপন চাচা সুলতান আহমদ ইবন হালাকুকে হত্যা করেন। ফল মোগলদের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ বৎসর বিষ মিশ্রিত মদ পানের ফলে তিনি মারা যান। আর মোগলরা এজন্য ইয়াহূদীদেরকে অভিযুক্ত করে। আর তার উজীর ছিল ইয়াহূদী সা'দ উদ দৌলা ইবনুস ছফী। ফলে তারা বিপুল ইয়াহূদীকে হত্যা করে এবং ইরাকের বিভিন্ন শহর থেকে তারা প্রচুর অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করে। এরপর কাকে বাদশা করা হবে তা নিয়ে তারা বিরোধে লিপ্ত হয়। একদল ঝুঁকে পড়ে কায়খাতুর প্রতি এবং তার তাকে রাজ্যাসনে বসায়। তিনি কিছুকাল বেঁচে ছিলেন। কেউ বলে এক বৎসর আবার কেউ বলে এর চেয়ে কম সময়। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে তারপর বেদরাকে বাদশা বানায়। মালেক আশরাফ এক্কা অবরোধকালে তার কাছে আরগুনের মৃত্যু সংবাদ পৌছলে তিনি ভীষণ খুশী হন। আরগুণের রাজত্বকাল ছিল আট বৎসর। ইরাকের জনৈক ঐতিহাসিক তার সুবিচার এবং সুরাজনীতির প্রসংশা করেন।

আল মুসনাদ আল মুয়াম্মার আর রাহালা

ফখরুদ্দিন ইবনুল নায্যার। তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ইবন আব্দুল ওয়াহেদ আল মাকদেসী আল হাম্বলী। তিনি ইবন নায্যার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৫৭৬ হিজরির শুরু বা শেষে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি সফর করেন তিনি ছিলেন নেক্কার, ইবাদত গুজার, মুত্তাকী এবং দরবেশ শ্রেণির লোক। দীর্ঘ আয়ুর কারণে অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক বক্তি। আর অনেক প্রবীণ নারী তার জন্য বের হয়ে আসে এবং বিপুল সংখ্যক লোক তার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ

করে। আর তিনি এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধ বয়সে চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তার চমৎকার কবিতা আছে তা থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে–

تكررت السنون على حتى * بليت وصرت من سقط المتاع

وقل النفع عندى غير انى * اعلل بالرواية والسماع

فان يك خالصا فله جزاء * وان يك مالقا فالى ضياع

বার বার আমার উপর অতিক্রান্ত হয়েছে অনেক বৎসর এমনকি আমি হয়ে পড়েছি অন্তসারশূণ্য এবং পরিণত হয়েছি পতিত সম্পত্তিতে। আমার উপকারিতা হ্রাস পেয়েছে তবে আমি বর্ণনা আর শ্রবণ দ্বারা নিজেকে প্রবোধ দেই যদি সে হয় নিষ্ঠাবান তবে তার তরে রয়েছে প্রতিদান। আর যদি হয় সে তোষামোদকারী তবে তার ধ্বংস অনিবার্য। তার আরো কয়েকটা কবিতা উল্লেখযোগ্য–

اليك اعتذارى من صلاتى قاعدا * وعجزى عن سعى الى الجمعات

وتركى صلاة الفرض فى كل مسجد * تجمع فيه الناس للصلوات

فيارب لا تمقت صلاتى ونجنى * من النار واصفح لى عن الهفوات

বসে বসে নামায আদায় করার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। জুমার নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হতে অক্ষমতার জন্য আমি তোমার নিকট মিনতি জানাই। প্রতিটি মসজিদে ফরয নামায তরক করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী যেখানে নামযের জন্য মানুষ সমবেত হয়।

হে আমার পরওয়ার দীগার। আমার নামাযকে না পছন্দ করো না এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও। এবং আমার ভুল-ভ্রান্তি আর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করো।

এ বৎসর দোসরা রবিউস সানি বুধবার চাশত নামাযের সময় পঁচানব্বই বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বিপুল সংখ্যক লোক তার জানাযায় অংশগ্রহণ করে। কাসিউন গোরস্থানে তদ্বীয় পিতা শায়খ শামসুদ্দিন আহমদ্ বিন আব্দুল ওয়াহেদের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ তাজউদ্দীন ফাযারী

আব্দুর রহমান ইবন সিবা ইবন জিয়াউদ্দিন আবু মোহাম্মদ আল ফাযারী। ইনি ছিলেন ইমাম, আল্লামা এবং আলিম। তার সময় শাফেঈ মাযহাবের শায়খ। তার সময়ের লোকদেরকে তিনি অতিক্রম করে যান। তিনি ছিলেন আমাদের শায়খ আল্লামা বুরহান উদ্দিনের পিতা। শায়খ তাজউদ্দিন ৬৩০ হিজরি সনে পাঁচ জুমদাস সানি সোমবার দিন বাদরাইয়া মাদরাসায় তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যোহর নামাযের পর উমাবী মসজিদে তার জানাযার নামায আদায় করা হয। তার জানাযার নামাজে ইমামতি করেন কাযী উল কুযাত শিহাবউদ্দিন ইবনুল খাত্তাবী। এরপর শায়খ যাইনুদ্দিন আল ফারুকী জিরাহ মসজিদে পুনরায় তার জানাযার নামায পড়ান এবং

তার পিতার নিকট যাবুস সগীরে তাকে দাফন করা হয়। দিনটি ছিল খুব ভিড়ের। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে অনেক কল্যাণকর জ্ঞানের সুন্দর চরিত্র, চমৎকার কথা বলার ভঙ্গি, চমৎকার লেখার রচনার ক্ষমতা, উন্নত সাহস এবং মানুষের মন বুঝার ক্ষমতা। আর তার গ্রন্থ 'উগলীদ' যা সংকলন করা হয়েছে আত তাসবীহ গ্রন্থের রীতি অনুযায়ী। তাতে তিনি ক্রোধ অধ্যায় পর্যন্ত পৌঁছেন যা প্রমাণ করে তার মানুষের মন বুঝার ক্ষমতা এবং উন্নত মান মর্যাদা ও সাহসের ক্ষমতা ও তীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তিনি সাধারণত যা কিছু লিপিবদ্ধ করেন সে সম্পর্কে তার সঠিক ইযতিহাদের গুণে গুনান্বিত হওয়া। লোকজন তার দ্বারা উপকৃত হয়। তিনি এবং ইমাম মহিউদ্দিন নববী আমাদের বড় বড় শায়খেরও শায়খ। ইবনুল জাওযী রচিত আল মাওযু'আত গ্রন্থের তিনি সার-সংক্ষেপ রচনা করেন। এ গ্রন্থের হাতে লেখা কপি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। আর সহীহ বুখারী শ্রবণ করার জন্য তিনি ইবন যুবাইদীর নিকট উপস্থিত হন। এবং তিনি ইবনুল লাইসী এবং ইবনুস সালাহ এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। শেষোক্ত জনের নিকট দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। এছাড়া তিনি ইবন আব্দুস সালামের নিকট ও অবস্থান করেন এবং উভয়ে দ্বারা উপকৃতও হন। আর তার অন্যতম শিষ্য হাফেয আলাউদ্দিন বারযালী একশ জন শায়খ থেকে দশজন শায়খের তালিকা প্রস্তুত করেন। তার নিকট থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সে তালিকা শ্রবণ করেন। তার রয়েছে অনেক চমৎকার কবিতা। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

لله ايام جمع الشمل ما برحت * بها الحوادث حتى اصبحت سمرا

ومبتدا الحزن من تاريخ مسالتى * عنكم فلم الق لا عينا ولا اثرا

يا راحلين قدرتم فالنجاة لكم * ونحن للعجز لا نستعجز القدرا

আমি তোমার সম্পর্কে ইতিহাস অনুসন্ধান করেছি তাতো দুঃখের সূচনা মাত্র সে সম্পর্কে আমি অবিকল আর অনুসরণ কিছুরই সন্ধান পাইনি।

হে প্রস্থানকারী দল, তোমরা শক্তি সঞ্চয় করেছো আর মুক্তি তোমাদের জন্য। আর আমরা হলাম অক্ষমতার জন্য। আমরা ভাগ্যলিপিকে অক্ষম পাই না।

আর তার পরে দারস দান এবং ফতওয়া দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পুত্র আমাদের শায়খ বুরহানউদ্দিন। তিনি পিতার রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আর তেসরা শা'বান ইন্তেকাল করেন বিজ্ঞ তবীর।

ইযযুদ্দীন ইবরাহীম ইবন মোহাম্মদ ইবন তরখান আল সুয়াইদী আল আনসারী

নব্বই বৎসর বয়সে পর্বতের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়। তিনি কিছু হাদীসও বর্ণনা করেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি ছিলেন তার যুগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। এ বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেন। তার সম্পর্কে দীনদাবীর ব্যাপারে শৈথিল্য, আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে ত্রুটি এবং পরকাল বিষয়ক অনেক কিছু অস্বীকার করার অভিযোগ করা হয়। এসব বিষয়ে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যিনি কারো প্রতি যুলুম অবিচার করেন না। তবে তার কবিতায় এমন কিছু

পাওয়া যায় যা তার জ্ঞান বুদ্ধির ক্রটি এবং দীনদারীর কমতি এবং ঈমানহীনতা প্রমাণ করে। মদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কেও তার আপত্তি দেখা যায় এবং রমযান মাসে রোযা না রাখার জন্য ও তিনি গর্ববোধ করতেন।

শায়খ ইমাম আল্লামা

আলাউদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবন ইমাম আল্লামা কামালুদ্দিন আব্দুল ওয়াহেদ ইবন আব্দুল করীম ইবন খালফ আল আনসারী আল-যামাললিকানী।

পিতার পর তিনি আমিনীয়া মাদরাসায় দারস দান করেন। তার পিতা উনত্রিশ রবিউস সানী মঙ্গলবার রাত্রে আমিনীয়া মাদরাসায় ইন্তেকাল করেন। এবং সুফিয়া গোরস্থানে তার পিতা আমির কবির বদরুদ্দিন আলী ইবন আব্দুল্লাহ আল নসেরীর পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার ওস্তাদের ওসীয়ত অনুযায়ী তিনি ছিলেন সালেহিয়া খানকার তত্ত্বাবধায়ক। এবং তিনিই ইবলিশ শারিশী জামালুদ্দিনের পর শায়খ শরফুদ্দিন আল ফাযারীকে খানকার শায়খ নিয়োগ করেনর এবং উপরোক্ত খানকার বাহিরে বড় গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ ইমাম আবু হাফস ওমর ইবন ইয়াহহিয়া ইবন ওমর

তিনি ছিলেন শায়খ তকীউদ্দিন ইবন সালেহ এর জামাতা এবং তার অন্যতম ছাত্র। হিজরী ৫৯৯ সালে তার জন্ম হয় এবং এই বৎসর দোসরা রবিউস সানী বুধবার তিনি ইন্তেকাল করেন এবং ইবন সালাহ এর পাশে তাকে দাফন করা হয়।

মালেক আদেল বদরুদ্দীন সালামাশ ইবন যাহির

তদীয় ভ্রাতা মালেক সাঈদের পর তার কর্তৃত্বের বায়'আত করা হয় এবং মালেক মনসুর কালাউনকে তার নীতি শিক্ষার গুরু নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বালাউন সতন্ত্র বাদশা হন এবং তিনি তাদেরকে 'আল কারক' অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং পরে তাদেরকে কায়রো নগরীতে ফেরত আনেন। অতঃপর আশরাফ খলিল তার রাজত্বের প্রথম দিকে তাদেরকে ইস্তাম্বুলের দিকে বেলাত আল আশকারী অঞ্চলে প্রেরণ সালামাশ আশকারী তথায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তদীয় ভ্রাতা নাযমুদ্দিন খিযির এবং তার পরিবার পরিজন উক্ত অঞ্চলে অবস্থান করেন। আর সালামাশ ছিলেন শাকল- সূরত এর দিক থেকে সুদর্শন পুরুষ এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি। তার কারণে অনেক লোক এবং সমাকামী গোষ্ঠী যারা দাড়ি-গোঁফহীন সুদর্শন যুবকদের পছন্দ করতো তারা ফেতনায় পতিত হয়। অনেক কবি সম্পর্কে জ্ঞান-গাঁথা রচনা করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুদ্ধিমান এবং মর্যাদা সম্পন্ন ভয়ংকর ব্যক্তি।

আফীফ তিলমে সানী

আব্দুর রবী'স সুলাইমান ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সানী ইবন ইয়াসিন আল আবিদীহ আল কুমী অতঃপর জিলমেসানী। ইনি ছিলেন স্বভাব কবি এবং আরবি ব্যাকরণ আরবি সাহিত্যে ফিকহে এবং উসূল ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এসব বিষয়ে তার লিখিত গ্রন্থ আছে। এছাড়াও রয়েছে শরহে মাওয়াহে আন নফর এবং শরহে আসমাউল হুসনা গ্রন্থ। আর তদীয় পুত্র মোহাম্মাদেরও অপর একটি দেওয়াল বা কবিতা সংকলন আছে। আর এই ব্যক্তির কথা, বিশ্বাস

ইত্যাদিকে হুলুল, ইহতেহাদ, নাস্তিকতা এবং নিছক কুফরীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আর তার খ্যাতি। জার জীবনী আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে বারণ করে। তিনি পাঁচ রজব বুধবার ইন্তেকাল করেন এবং সুফিয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি চল্লিশটি নির্জনবাস করেন। তার এক-একটি নির্জবাস ছিল একটানা চল্লিশ দিন। আল্লাহ, তা'আলা ভাল জানেন।

হিজরী ৬৯১ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯২ সন)

এ বৎসর রোমক দূর্গ জয় হয়। দানকালা থেকে মিশর এবং তথা থেকে শামদেশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গোটা অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকাসহ হালব ইত্যাদি অঞ্চলের বাদশা ছিলেন মালেক আশরাফ সালাউদ্দিন খলীফা ইবন মালেক মনসুর কালাউন। তাঁর উজীর ছিলেন শামসুদ্দীন ইবন সালাউশ। শাম এবং মিশর দেশে যারা জাযী ছিলেন তাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে মিশরের নায়েব ছিলেন বদরুদ্দিন বিনদার আর শাম দেশের নায়েব ছিলেন জালামুদ্দিন সানযার আশ শাজায়ী এবং তারিদের সুলতান ছিলেন বেদার ইবন আরগুণ ইবন অব্যবগা। আল খাযীনা নির্মাণকার্য অনেক সঞ্চিত ধনরাজি, চমৎকার দ্রব্য-সামগ্রী এবং গ্রন্থরাজি ধ্বংস করেছে। রবিউল আউয়াল মাসের উনিশ তারিখ খলীফা আল হাকেম ভাষণ দেন এবং তার ভাষণে জিহাদ এবং জনযুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং জনগণকে নিয়ে তিনি জুমুআর নমায আদায় করেন এবং প্রকাশ্যে বিসমিল্লাহ পাঠ করেন। তেরো সফর শনিবার রাত্রে 'এক্কা' অঞ্চলের বাবুল বারা'আতে পড়ে থাকা 'লাল ছড়ি' এনে তার স্থানে স্থাপন করা হয়। আর রবিউল আউয়াল মাসে 'তারেনা' প্রসাদ এবং তার আশপাশের গৃহ এবং নীল কোব্বার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। এই কোব্বা ছিল অতীব সুদর্শন, পরিপূর্ণ এবং অতি উচ্চ। জুমাদুল আউয়াল মাসর দুই তারিখ সোমবার আলাউদ্দীন ইবন বিনতিল আয়াত-এর পরিবর্তে শায়খ শফিউদ্দীন মোহাম্মদ আব্দুর রহীম আরযাবী যহিরিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন আর একই দিন কামালুদ্দিন ইবন যাকী দাওলাবায় দারস দান করেন এবং সাত জুমাদাস সানী সোমবার নযিবিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন শায়খ জিয়াউদ্দিন আব্দুল আযীয তূসী। আর তা করেন আল ফারেসী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যাহতি লাভের প্রেক্ষিতে। সঠিক তথ্য আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

রোম দূর্গ জয়

এই বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে সুলতান আশরাফ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শাম দেশের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তিনি দামেস্ক উপস্থিত হন। তার সঙ্গে ছিল উজীর সালউশ। তিনি সৈন্যদেরকে নিয়োজিত করেন এবং তাদের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। অতঃপর তিনি সৈন্যদেরকে নিয়ে হালব অঞ্চল অভিমুখে রওয়ানা হন। অতঃপর রোম দূর্গ অভিমুখে যাত্রা করলে এগারো রজব শনিবার তরবারির জোরে তা জয় করে নেন। এই সুসংবাদ দাসেস্ক নগরীতে পৌঁছে এবং সাত দিন ধরে নগর সজ্জিত করা হয় এবং মুসলিম সৈন্যদের প্রচেষ্টায় আল্লাহ বরকত দান করেন। আর শনিবার দিন রোববার দিনের অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে

একমত ছিল। প্রচণ্ড অবরোধের পর বিজয় অর্জিত হয়। ত্রিশ দিন অবরোধ চলে। এই অবরোধে ত্রিশটির বেশি কামান মোতায়েন করা হয়। আর আমীরদের মধ্যে শরফুদ্দিন ইবন খাতিব শাহাদাত বরণ করেন। নগরবাসীদের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হয়। মুসলমানরা অনেক গণীমত লাভ করে। অতঃপর সুলতান দামেস্ক নগরীতে ফিরে আসেন এবং মাজায়ীকে রোম দূর্গে রেখে আসেন। তার দায়িত্ব ছিল অবরোধকালে দূর্গের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা মেরামত করা। শা'বান মাসের উনিশ তারিখ প্রত্যুষে তিনি দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। তার আগমন উপলক্ষে লোকজন সমবেত হয়, তারা তার জন্য দো'আ করেন এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার জুম'আর দিন। এই উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। যেমন আনন্দ প্রকাশ করা হয় তিনি মিশর দেশ থেকে আগমন করার পর। আর এটা করা হয় ইবন ঝালউশের ইঙ্গিতে। আর ইনি হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। আর তার পিতা হিম্‌স নগরী প্রতিরোধে তাতরীদেরকে পরাজিত করেন কিন্তু তারা এজন্য আনন্দ প্রকাশ করেননি। অনুরূপভাবে বাদশা যাহির তাতারী এবং রোমকদেরকে বালাস্তিনে পরাজিত করেন। এছাড়া অন্যত্রও তাদেরকে পরাজিত করা হয় কিন্তু এজন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করেনি। আর এই আনন্দ প্রকাশ একটা নিন্দনীয় বেদআত, যা উদ্ভাবন করেছেন এই উজীর বাদশাদের জন্য। এতে অর্থের অপচয় হয় এবং অহমিকা প্রকাশ করা হয়। এটা একটা লোক দেখানো কাজ এতে জনসাধারণের অসুবিধা হয়। অর্থ সংগ্রহ করে তা কারো সঙ্গে চিরকাল থাকবে না এবং কোন মানুষ দুনিয়াতে চিরকাল বেঁচে থাকবে না। মহান আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

আর রোম দূর্গের বাদশা সুলতানের সঙ্গে বন্দী ছিলেন এবং আর বড় বড় সঙ্গিরাও বন্দী ছিল। সুলতান তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন। এই সময় তারা বর্শার মাথায় নগরীর মহান ব্যক্তিদের মস্তক বহন করে চলছিলেন। আর সুলতান একদল সৈন্যকে সজ্জিত করে কাসওয়ান এবং জুযুর পর্বত অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং প্রাচীনকাল থেকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গীদেরকে সাহায্য করে আসছিলেন। সৈন্যদের অগ্রভাগে ছিল বিন্দার এবং তাদের সঙ্গে ছিল সানকার আল আশকার। আর তিনি হালব অঞ্চলের নায়েব সানকার আল মানসুরীকে বহাল রাখেন। সুলতান তাকে পদচ্যুত করেন এবং তদস্থলে সাইফুদ্দিন বলবন আল বাতহী আল মনসুরীকে নায়েব নিযুক্ত করেন। বড় বড় আমীরদের একটা দলকে নিযুক্ত করেন। তারা যখন পর্বত অবরোধ করে নেয় এবং তথাকার লোকজনের ধ্বংসই কেবল অবশিষ্ট ছিল তখন তারা রাত্রি-বেলা বিন্দারের নিকট অনেক বোঝা নিয়ে আগমন করে, ফলে তিনি তাদের ব্যাপারে নরম হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা করেন এবং সুলতানের নিকট ফিরে আসেন তখন সুলতান তাদেরকে অভিনন্দিত করেন এবং তিনি আমির বিন্দারের নিকট পদব্রজে আগমন করেন। অথচ তিনি হচ্ছেন মিশরের তার নায়েব। অতঃপর ইবন সালউশ সুলতানকে বিন্দারের কর্মকান্ড সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। এতে তিনি তাকে তিরষ্কার করেন এবং তার নিন্দা করেন। এতে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাতে মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয়। এমনকি বলা হয় যে তিনি মারা যান। অবশেষে তিনি আরোগ্য লাভ করেন এবং এই উপলক্ষ্যে দামেস্ক নগরীর জামে মসজিদে এক বিরাট খতমের আয়োজন করেন যাতে

কাযীবর্গ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। এতে দামেস্কের জামে মসজিদ পনেরো শা'বান শবে বরাত পালন করে। এ ছিল যেন রমযান মাসের প্রথম দশকের রজনী। সুলতান এ উপলক্ষ্যে বন্দীরেকে মুক্ত করেন।

সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য বিধি নিষেধ শিথিল করেন এবং সুলতানের পক্ষ থেকে অনেক কিছু দান-সদকা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে তিনি অনেক দণ্ড রহিত করে দেন, যে সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্বে হলফ করে বলেছিলেন। আর রোম দূর্গ জয় করা উপলক্ষ্যে মালেক আশরাফ খলিলের প্রসংশায় শিহাব মাহমুদ এক দীর্ঘ কাসিদায় রচনা করেন, যার সূচনা ছিল নিম্নরূপ :

لك الراية الصفراء يقدمها النصر * فمن كيقباذان راها وكيخسروا

اذا خفقت فى الافق هدت بنورها * هوى الشرك واستعلى الهدى والنجلى الثغر

وان نشرت مثل الاصائيل فى الوغى * جلى النقع من لالاء طلعتها البدر

وان يممت زرق العدى سار تحتها * كتائب خضر دوحها البيض والسمر

كان مثار النقع ليل وخفقها * بروق وانت البدر والفلك الحتر

وفتح اتى فى اثر فتح كانما * سماء بدت تترى كواكبها الزهر

فكم قطمت طوعا وكرها معاقلا * مضى الدهر عنها وهى عانسة بكر

بذلت لها عزما فلولا مهابة * كساها الحيا جاءتك تسعى ولا مهر

قصدت حمى من قلعة الروم لم يتح * لغيرك اذ غرتهم المغل فاغتروا

ووالوهم سرا ليخفوا اذاهم * وفى اخر الامر استوى السر والجهر

صرفت اليهم همة لو صرفتها * الى البحر لاستولى على مده الجزر

وما قلعة الروم التى حزت فتحها * وان عظمت الا الى غيرها جسر

طليعة ما ياتى من الفتح بعدها * كما لاح قبل الشمس فى الافق الفجر

فصبحتها بالجيش كالروض بهجة * صوارمه انهاره والقنا الزهر

وابعدت بل كالبحر والبيض موجه * وجرد المزاكى السفن والخود الذر

واغربت بل كالليل عوج سيوفه * اهلته والنجم انجمه الزهر

ولحظات لا بل كالنهار شموسه * محياك والاصال راياتك الصفر

لبوث من الاتراك اجامها القنا * لها كل يوم فى ذرى ظفر ظفر

فلا الريح يجرى بينهم لاشتباكها * عليهم ولا ينهل من فوقهم قطر
عيون اذا الحرب العوان تعرضت * لخطابها بالنفس لم يغلها مهر
ترى الموت معقود بهدب نبالهم * اذا ما رماها القوس والنظر الشزر
ففى كل سرح غصن بان مهفهف * وفى كل قوس مده ساعد بدر
اذا صدموا شم الجبال تزلزلت * واصبح سهلا بتحت خيلهم الوعر
لو وردت ماء الفرات خيولهم * لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر
اداروا بها سورا فاضحت كخاتم * لدى خنصر او تحت منطقه خصر
وارخوا اليها من اكف بحارهم * سحاب ردى لم يخل من قطره قطر
كان المجانيق التى قد قمن حولها * رواعد سخط وبلها النار والصخر
اقامت صلاة الحرب ليلا صخورها * فاكثرها شفع واكبرها وتر
ودارت بها تلك النقوب فاسرفت * وليس عليها فى الذى فعلت حجر
فاضحت بها كالصب يخفى غرامه * حذار اعاديه وفى قلبه جمر
وشبت بها النيران حتى تمزقت * وباحت بما اخفته وانهتك الستر
فلاذوا بذيل العفو منك فلم تجبب * رجاءهم لو لم يشب قصدهم مكر
وما كره المغل اشتغالك عنهم * بها عندما فروا ولكنهم مروا
فاحرزتها بالسيف قهرا وهكذا * فتوحك فيما مضى كله فسر
واضحت بحمد الله ثغرا ممنعا * تبيد الليالى والعدى وهو مفتر
فيا اشرف الاملاك فزت بغزوة * تحصل منها الفتح والذكر والاجر
ليهنيك عند المصطفى ان دينه * توالى له فى يمن دولتك النصر
وبشراك ارضيت المسيح واحمد * وان غضب اليعفور من ذاك الكفر
فسر حيث ما تختار فالارض كلها * تطيعك والامصار اجمعها مصر
ودم وابق للدنيا ليحيى بك الهدى * ويزهى على ماضى العصور بك العصر

তোমার পতাকা পীতবর্ণ যার অগ্রভাগে ছুটে যায় বিজয় আর কায়কোবাদান এবং কায়াখসরু তা দেখতে পেয়েছে।

যখন মহাশূন্যে তা পত্পত্ করে উড়ে তখন তার আলোকে চুরমার হয়ে যায় শিরকের কামনা-বাসনা এবং বুলন্দ হয়ে যায় হেরোয়াত এবং উত্থান হয়ে ওঠে দমত।

আর যদি তা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের মতো তখন ধুলা-বালি চন্দ্র উদয়ের আলোতে আলো ঝলমল হয়ে ওঠে।

আর যদি তা অভিপ্রায় করে নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুশমনের তখন সবুজ বর্ণের আতর তার নিচে চলে যাবে, যার শামীয়ানা হচ্ছে তরবারি এবং গন্ধমবর্ণের বর্শা হবে।

আর ধুলাবালি ছড়ানোর জায়গা রাত্রি হয়ে যাবে আর তার স্পন্দন হবে বিদ্যুতের মতো আর তুমি হবে পূর্ণ চন্দ্রব্রত আর আকাশ হবে গোলাকার।

আর বিজয় এসেছে বিজয়ের পথ দরে যেমন আসমান প্রকাশ পেয়েছে যার নক্ষত্র হচ্ছে ফল।

আর তুমি কত পর্বতকে বর্তন করেছে আর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তা ছিল নিছক কুমারী।

তুমি তার জন্য ব্যয় করেছো সংকল্প আর যদি ভয় না থাকতো যা লজ্জাশীলতা তাকে পরিধান করায়েছে তবে তা তোমার নিকট ছুটে আসতো কোন মোহ ছাড়া।

তুমি সংকল্প করেছো রোম দূর্গের হেমা তথা রক্ষা যা তুমি চাড়া কারো জন্য অবধারিত ছিল না মোগলরা যখন তাদেরকে প্রতারিত করে তখন তারা প্রতারিত হয়।

আর তারা গোপনে তাদের সঙ্গে প্রনয় করে যাতে তাদের অতীষ্ট থেকে রক্ষা পায় এবং শেষ পর্যন্ত গোপন আর প্রকাশ্য এক সমান হবে।

তুমি তাদের জন্য এমন সাহস ব্যয় করেছো তা যদি তুমি ব্যয় করতে সমুদ্রের তার তবে তার জোয়ারের উপর ভাটা প্রবল হতো।

আর যে রোম দূর্গ তুমি জয় করেছো যদিও তা অনেক বড় কিন্তু অন্যান্য দূর্গের প্রতি রয়েছে সেতু।"

এরপর যে সব বিজয় সূচিত হবে এ হচ্ছে তার অগ্রভাগ যেমন প্রত্যুষে সূর্য উদয়ের পূর্বে দিগন্তে ফজর উদিত হয়।

তুমি এমন সৈন্য নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়েছো যা রূপ সৌন্দর্যে বাগানের মতো আর তার তরবারি যেন তার নহর আর তার বর্শা যেন ফুল।

আর তুমি চলে গেছো অনেক দূরে বরং যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যখন তার ঢেউ উত্তাল আর সুউচ্চ পর্বতমালা যেন প্রকাণ্ড জাহাজের মতো। আর তুমি প্রবেশ করেছো অনেক দূরে যখন রাত্রির মতো তার তরবারি বাঁকা তারা তাকে আহ্বান জানায় আর তীরের নক্ষত্র ছিল ফুলের মতো।

আর ছিল অনেক দৃষ্টি না বরং দিবসের মতো তার ছিল সূর্য আর তোমার পতাকা ছিল মুক্ত।

তুর্কি সিংহের মতো তাদের বর্শা যা প্রতিদিন শীর্ষদেশে বিজয় অর্জন করে। ফলে তা পরস্পর মিলিত হওয়ায় তাদের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হয় না বর্ষিত হয় তাদের উপর বৃষ্টির ফোঁটা।

তারা যেন গুপ্তচর যখন তীব্র যুদ্ধ বেঁধে যায় তখন তারা তার মহলকে বোঝা মনে করে না।"

তুমি মৃত্যুকে দেখতে পাবে তাদের বর্শার ফাঁদের সাথে বাঁধা যখন কামান তা নিক্ষেপ করে তখন দৃষ্টি অবনত হয়ে যায়।

প্রত্যেক দীর্ঘ বৃক্ষে থাকে সূক্ষ্ম ডাল-পচা আর প্রতিটি কামানকে বেঁধে রাখে চাঁদের মতো সুতো।

'আর যখন তা আঘাত হানে প্রকান্ড পর্বত গাত্রে তখন তা কেঁপে ওঠে আর তাদের অশ্বের খুঁড়ের নিচে শক্ত ভূমি-প্রান্তরে রূপ নেয়।

যদি তাদের অশ্ব উপস্থিত হয় ফোরাত নদীর তীরে তখন বলা হয় আতীতে এখান থেকে নহর প্রবাহিত হয়েছে।

'তারা এর আশপাশে গড়ে তুলেছে প্রাচীর যা রূপ নিয়েছে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির আংটির মতো, অথবা তার পেটি কম্পনের নিচে কোমরাব্রত হয়ে পড়েছে।

তারা নিক্ষেপ করেছে তাদের প্রতি ধ্বংসের বাদল নিজেদের হাতের তালুর সমুদ্র থেকে যার কোন বিন্দু মুক্ত ছিল না।"

আর যে সব মিনযানিক সম্পন্ন করা হয়েছে তার চতুর্পাশে তা ছিল অসন্তুষ্টির গর্জন আর তার বৃষ্টি ছিল আগুন আর পাথর।

তার প্রকাণ্ড প্রস্তর রাত্রিকালে দাঁড় করিয়েছে যুদ্ধের নামায, আর তার সবচেয়ে বড় অংশ জোড় এবং আর সবচেয়ে বৃহৎ অংশ বেজোড়।

আর তার আশপাশে সৃষ্টি হয়েছে অনেক গর্ত আর প্রস্তর যা কিছু করেছে তাতে তার কোন চিহ্ন নাই।

যে পরিণত হয়েছে প্রেমিক প্রবরে যে শত্রুর ভয়ে প্রেমকে গোপন করে আর তার অন্তরে রয়েছে স্ফুলিঙ্গ।"

আর তাতে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে আগুন শেষ পর্যন্ত তা ফেটে পড়েছে। আর যা সে গোপন করেছিল তা প্রকাশ পেয়েছে আর পর্দা বিদীর্ণ হয়েছে।

তারা আশ্রয় নিয়েছে তোমার ক্ষমার আঁচল তলে তুমি তাদেরকে আকাঙক্ষার কোনো জবাব দাওনি; সে যদি প্রতারণা না করতো তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতারণা করা।

আর মোঘলরা তোমাকে তা থেকে বিমুখ করে সেখান থেকে পলায়নকালে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে কিন্তু তারা পলায়ন করে যায় কিন্তু তারা হয়েছে আনন্দিত।

আর তুমি তাকে সংরক্ষণ করেছো তরবারির জোরে শক্তি প্রয়োগ করে। অনুরূপভাবে আগের বিজয় ও অর্জন করেছো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

আল্লাহর অনুগ্রহে তা পরিণত হয়েছে সুদৃঢ় সীমান্তে। আর সে রজনী এবং দুশমনকে ধ্বংস করে ছাড়ে দুর্বল অবস্থায়ও।"

হে মর্যাদার অধিকারী সম্রাট, যুদ্ধে তুমি জয়ী হয়েছো, যার দ্বারা অর্জিত হয় বিজয়, খ্যাতি এবং পুরুষ্কার।

মোস্তফার সঙ্গী হওয়া তোমার জন্য মোবারক হউক কারণ তার দীন তোমার রাজত্বে বরকতের উপর্যপুরি বিজয় অর্জন করেছে।

সুসংবাদ তোমার জন্য তুমি মসীহ সবং আহমদকে সন্তুষ্ট করেছো, যদিও ইয়া'হুদ অসন্তুষ্ট হয় কারণ তা তো কুফরী মাত্র।

সুতরাং যথা ইচ্ছা তুমি সফর কর এবং গোটা ভূমি তোমার বৈশ্যতা স্বীকার করে আর সকল নগরী তোমার অনুগত।

তুমি সদা বাস করো এবং দুনিয়ার জন্য জীবিত থাকো যাতে তোমার দ্বারা হেদায়াত জীবিত থাকে আর অতীত কালের জন্য গর্ব করে যুগ। সমস্ত যুগ তোমার জন্য গর্ব করবে।

তার দীর্ঘ কাসীদার বহুলাংশ আমি বাদ দিয়েছি।

আর এই বৎসর যয়নুদ্দিন ইবন মারহালের ইন্তেকালের পর শায়খ ইযযুদ্দিন আহমদ ফারুকী আল ওয়াসেতী দামেস্ক মসজিদে খুতবা দানের দায়িত্বগ্রহণ করেন এবং তিনি তার খুৎবায় জনগণের তৃপ্তির জন্য দো'আ করেন কিন্তু জনগণ তৃপ্ত হয়নি। এর কয়েকদিন পর তিনি মসজিদ আল কদমে পুনরায় খুৎবা দেন। এরপরও তারা তৃপ্ত হয়নি। এরপরও জনগণ কোনো ঘোষণা ছাড়াই বৃষ্টির জন্য কামনা ছাড়াই বিনয় প্রকাশ করলে তারা তৃপ্ত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এর কিছু দিন পর খতীব মুয়াফফাউদ্দিন আবুল মা'আলী মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল মনইম ইবন হাসান আল মেহরানী আল হামাবীয় মাধ্যমে ফারুবীকে পদচ্যুত করা হয়। ইনি ছিলেন হিমাত অঞ্চলের খতীব। এ বৎসর তাকে দামেস্ক নগরীতে আনয়ন করা হয। তিনি দামেস্কে দাড়িয়ে খুৎবা দেন। এতে আল ফারুকীর কষ্ট হয় এবং তিনি সুলতানের নিকট গমন করেন। তার বিশ্বাস ছিল যে, সুলতানের অজ্ঞাতসারে উজীর তাকে পদচ্যুত করেছে। অথচ সুলতান বিষয়টা জানতেন এবং সুলতান বিনয়ের সঙ্গে তাকে জানান যে শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। তিনি সুলতানকে জানান যে তিনি অর্ধ-রজনীতে একশত বার সূরা ইখলাস দিয়ে একশ রাকাআত নফল নামায আদায় করেন। কিন্তু সুলতান তার কথা গ্রহণ করেননি এবং হাশাবীকেই খতীব হিসাবে বহাল রাখেন। আর এটা ছিল খতীব ফারুকীর নির্বুদ্ধিতা, নিষ্টাহীনতা এবং নীচতার পরিচায়ক। সুলতান তাকে পদচ্যুত করে ঠিক করেছেন।

আর এই দিন সুলতান আমীর সানবার আল আশকার প্রমুখকে গ্রেফতারের নির্দেশ দান করেন। আমীর হুসামউদ্দিন লাজীন সালাহদারী পলায়ন করে। ফলে ঘোষক দামেস্ক নগরীতে ঘোষণা প্রচার করে যে, যে ব্যক্তি তাকে ধরে দিতে পারবে সে এক হাজার দিনার পুরুষ্কার পাবে আর যে ব্যক্তি তাকে লুকিয়ে রাখবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আর সুলতান এবং ভৃত্যরা তার

অনুসন্ধানে বের হয় এবং খতীব সবুজ ময়দানে নামায পড়ান। সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা জনগণের নানা মত আর বিশৃঙ্খলার কারণে জনগণ অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত ছিল। আর ছয় শাওয়াল আরবরা আ সানকার আন আশকারকে পাকড়াও করে সুলতানের নিকট উপস্থিত করে এবং সুলতান তাকে বন্দী করে মিশরে প্রেরণ করেন। আর এই দিনে সুলতান মিশরের প্রেরণ করেন। আর এই দিনে সুলতান আশ শাজায়ীর পরিবর্তে ইযযুদ্দিন আইবক আল হামাবীকে দামেস্কের নায়েব নিযুক্ত করেন। আর আশ শাজায়ী তার পদচ্যুতির দ্বিতীয় দিনে রোম থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আর ফারুকী তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি বলেন, আমাকে তো খুৎবার দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে তখন তিনি বললেন, খতীবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও আমি তো নায়েব আছি। তখন ফারুকী বললেন–

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবে এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কেমন আচরণ কর তা তিনি নিরীক্ষণ করবেন। (সূরা আ'রাফ আয়াত- ১২৯) ইবন সালাউশ এ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আর কায়মারিয়া তাকে নিযুক্ত করেন ফলে তিনি এই কাজ ত্যাগ করেন আর সুলতান শাওয়াল মাসের দশ তারিখ মিশর অভিমুখে রওয়ানা করেন এবং রাজকীয় শান-শওকতের সাথে নগরীতে প্রবেশ করেন। আর তিনি তার আগমনের দিন কারা আনন্দময় কে হালবের নায়েবীর পরিবর্তে মিশরে একশত অশ্বদান করেন। আর একই বৎসর আমীর সাইফুদ্দিন আগামী তাসায়ী আল আশকারী কারসারিয়া আল কাতল, যা নির্মাণ করেছিলেন বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে সালেক মুয়াজ্জম ইবন আবেদল তা আমির সাইফুদ্দিন ক্রয় করেন। তার নিকট এটার ছিল বিরাট মর্তবা। আর এই সময় 'সুক আল হারীরী' তথা রেশমী পোশাকের বাজারে তাকে হস্তান্তর করা হয়। আর সুলতান রোম দূর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন শেষে তালামুদ্দিন দুয়াইদারীকে মুক্ত করত তাকে দামেস্ক নগরীতে উপস্থিত করেন এবং তাকে মূল্যবান খিলাফত দান করেন এবং তাকে সঙ্গে করে কায়রো নগরীতে গমন করেন এবং তাকে একশত অশ্বদান করেন এবং জোরপূর্বক তাকে বিভিন্ন দফতরের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন।

আর যিলক্বদ মাসে সুলতান সানকার আল আশকার এবং তাফসুকে তলব করে এনে তাদেরকে শাস্তি দান করেন ফলে তারা স্বীকার করে যে, তারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তিনি তাদের উভয়কে নাজীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে, তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন না এবং এই সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। ফলে তিনি তাদের উভয়কে গলা টিপে হত্যা করেন আর লাজীনকে টুটী টেপে ধরার পর মুক্ত করে দেন। তিনি দীর্ঘসময় তার সঙ্গে অবস্থান করেন। এ সময়টা তার সঙ্গে কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। এরপর তিনি বাদশা হন, এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো।

আর যিলহজ্জ মাসে শায়খ বুরহানউদ্দিন ইবন শায়খ তাজউদ্দিন আল বাদরায়ীযার কাযী কুযাত শিহাবউদ্দিন আল হুবাই এর কন্যাকে বিবাহ করেন। আর একই বৎসর আমীর সানকার

আল আ'শার উজীর শামসুদ্দিন ইবন সালাউশের কন্যাকে এক হাজার দিনার মোহরানায় বিবাহ করেন এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচশত দিনায় পরিশোধ করেন আর একই বৎসর তার তিনশত তাতারীর একটা দল মিশর গমন করলে তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেয়া হয়।

এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন–

খতীব যয়নুদ্দীন আবু হাফস

ওমর ইবন মাক্কী ইবন আব্দুস সামাদ আল শাফেঈ ইবন মারহাল নামে পরিচিত। ইনি ছিলেন শায়খ সদরুদ্দিন ইবনুল ওযাকিন-এর পিতা। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিকহের বিভিন্ন জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। এসব জ্ঞানের মধ্যে জ্যোতিরবিদ্যা হচ্ছে অন্যতম। এ বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থও আছে। তিনি দামেস্ক মসজিদে খুৎবা দানের দায়িত্বগ্রহণ করেন এবং তথায় দারস দান ও ফতওয়া দান করেন। তেইশ রবিউল আউয়াল শনিবার রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন বাবুল খিতাবায় তার জানাযার নামায পড়া হয়।

শায়খ ইযযুদ্দীন আল ফারূসী

ইনি স্বল্প সময়ের জন্য খতীবের দায়িত্ব পালন করেন, পরে পদচ্যুত হন এবং মৃত্যু বরণ করেন। তাকে বাব আল সগীর এ দাফন করা হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করুন।

সাহেব ফাতহুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ

মোহাম্মদ ইবন মহিউদ্দিন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুস যাহের। ইবন লোকমানের পর মনরুরিয়া রাজ্যে তিনি ছিলেন সচিব। আর এ বিষয়ে তিনি ছিলেন দক্ষ এবং মনসুরের নিকট তার উচ্চ মর্তবা ছিল। অনুরূপভাবে তার পুত্র আশরাফের কাছেও তার মর্তবা ছিল। আর ইবন সালাউশ তার নিকট দাবি করেন যে তিনি যা কিছু লেখেন প্রতিদিন তা তাকে শুনাবেন। তিনি বললেন, এটা সম্ভব নয় কারণ রাজা বাদশাদের গোপন বিষয় অন্যদেরকে জানানো যায় না। আপনি বরং এই উদ্দেশ্যে অন্য কাউকে খুঁজে নেন, যিনি এ ক্ষেত্রে আপনার কাজে আসতে পারে। আশরাফ যখন বিষয়টা জানতে পারেন তখন এটা তার পছন্দ হয় এতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রমযান মাসের মাঝামাঝি শনিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে একটা কাসীদা বের করা হয় যাতে তিনি তাজউদ্দিন ইবন অপসীরের জন্য শোক প্রকাশ করেন্ আর এ সময় তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তার বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি মারা যাবেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সুস্থ হয়ে যান এবং পরেও তার কাসীদাটি বেঁচে থাকেন। তার পরে তার সচিন হন ইবনুল আসীর। এবং ইবনুল আসীর তার জন্য শোক গাঁথা প্রকাশ করেন যেমন তিনি করেছিলেন। আর তার এক মাস চার দিন পর ইবনুল আসীর ইন্তেকাল করেন।

ইউনুস ইবন আলী ইবন দিরওয়ান ইবন বারকশ

আল আমীর ইমামুদ্দিন। দৌলতে মনসুরিয়ার তবল খানায় তিনি ছিলেন অন্যতম আমীর। অতঃপর তিনি মনসুরিয়া রাজত্বের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন

করেন দৌলতে মুজাফ্‌ফরিয়ায় এবং এই বৎসর পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বাদশা যাহির তাকে সম্মান করতেন। শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। এবং খযিমীন গোরস্থানে পিতার পাশে তাকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন।

জালালুদ্দীন আল খাবাযী

ওমর ইবন মোহাম্মদ ইবন ওমর আবু মোহাম্মদ আল খাযানদী। তিনি ছিলেন হানাপী মাযহাবের অন্যতম প্রধান শায়খ। মূলত তিনি ছিলেন 'মাওয়ারা উল নহর' একটা জনপদ 'খাযন্দার' অধিবাসী। তিনি খাওয়াযীন নগরীতে জ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তীতে বাগদাদ নগরীতেও জ্ঞান চর্চা করেন। অতঃপর দামেস্ক নগরীতে আগমন করত : আল আযিহইয়া এবং খানদিয়া বারানিয়ায় শিক্ষাদান করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ ও বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তি। এবং বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন কৃতিত্বের অধিকারী। একই বৎসর যিলহজ্জ মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বাষট্টি বৎসর। সুফীয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মালেক মুযাফফর

কারা আরসালান তাক্রিকী। ইনি ছিলেন মারদিল অঞ্চলের শাসনকর্তা। আশি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তারপরে তদীয় পুত্র শামসুদ্দিন দাউদ শাসক হন এবং মালেক সাঈদ উপাধি ধারণ করেন। মহান আল্লাহ সবচেয়ে ভালে জানেন।

হিজরী ৬৯২ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৩ সন)

যহিরুদ্দীন কাযরুনীর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ বৎসর মদীনা মুনাওয়ারায় আগুন দেখা দেয় যা ছিল হিজরী ৬৫৪ সনের অগ্নিকাণ্ডের অনুরূপ। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের শিখা অনেক উপরে উঠে এবং এতে বড় বড় পাথরও জ্বলে যায়। কিন্তু খেজুর গাছের ডাল এই আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়নি। একটানা তিনদিন এই আগুন জ্বলতে থাকে।

এ বৎসরের সূচনায় আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন হাকিম আর দেশের সুলতান ছিলেন মালেক আশরাফ ইবন মনসুর এবং মিশরে তার নায়ের ছিলেন বদরুদ্দিন বায়দারা। আর শাম দেশে নায়েব ছিলেন ইযযুদ্দিন আয়বক আল হামাবী। এবং মিশর ও শামদেশের কাযীরা উক্ত পদে বহাল ছিলেন। আর উজীর ছিলেন শামসুদ্দিন ইবন সালউশ। আর উজীর ছিলেন শামসুদ্দিন ইবন সালউশ। আর জুমাদাস সানী মাসে আশরাফ দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন এবং আবলাগহ প্রাসাদ আর সবুজ প্রান্তরে অবস্থান করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করেন এবং শাম দেশে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে সীস অঞ্চলের দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগমন করেন এবং আমিররা পরামর্শ দেন এবং তারা বাহানসা, তিল, হামদুন এবং মারআশ, অঞ্চল সমর্পণ করেন। এগুলো ছিল সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত শহর।

আর এগুলো ছিল দারউন নগরীর প্রবেশ পথে। অতঃপর সুলতান দোসরা রজব সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে সালমিয়া অঞ্চল গমন করেন। তার সঙ্গে ছিল অনেক সৈন্য। বাহ্যত তিনি আমীর হুসামুদ্দিন লাজীনের ক্ষতি সাধন করতে চান। তখন আমীর মেহনা ইবন ইসা অতিথি হিসাবে তাকে আপ্যায়ন করেন আর যিয়াফত শেষ হলে তিনি হুমামুদ্দিন লাজীনকে পাকড়াও করেন। এ সময় তিনি নিকটেই ছিলেন। পরে তাকে আনয়ন করা হয় এবং দামেস্ক দূর্গে আটক রাখা হয় এবং মেহনা ইবন ইসাকে ও আটক করেন এবং তদস্থলে মোহাম্মদ ইবন আলী ইবন হুযাইফাকে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। অতঃপর সুলতান তার নায়েব বেতরা এবং উজীর ইবন সালউশের সঙ্গে সাধারণ সৈন্যকে মিশরীয় অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে খাসকিয়ায় অবস্থান করেন পরে তাদের সঙ্গে মিলিত হন।

এ বৎসর মুহাররম মাসে কাযী হুসামুদ্দীন হানাফী আলাবী এবং জাফরীদের মধ্যে দুইশত বৎসর ধরে যে বিরোধ চলে আসছিল সে সম্পর্কে 'তাশরীফ' এর ফয়সালা দেন। আর এ ফয়সালা দেওয়া হয় ছাব্বিশ মুহাররম মঙ্গলবার 'দাবুল আদরে' কিন্তু ইবনুল খুবাইব ও অন্যরা এ ফয়সালার সঙ্গে একমত হননি এবং তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, আনাকিরা জাফর তাইয়ারের সম্পর্কের যে দাবি করে তা ঠিক।

একই বৎসর আশরাফ শাওবক দূর্গ ধ্বংস করার নির্দেশ দিলে তা ধ্বংস করা হন। অথচ এ দূর্গটি ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং কল্যাণকর কিন্তু এ দূর্গ ধ্বংসের নির্দেশ দেন আল আ'বির পরামর্শক্রমে। এই ব্যক্তি সুলতান এবং মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন না। কারণ এই দূর্গটি ছিল তথাকার আরব অধিবাসীদের গলার কাঁটা স্বরূপ। আর একই বৎসর সুলতান আমীর আলামুদ্দিন দুয়াইদারীকে কনস্টানিনোপলের শাসনকর্তা এবং 'বরকার' সন্তানদের প্রতি দূত মারফত প্রচুর উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন কিন্তু এই সব উপহার সামগ্রী নিয়ে গমন করার তার সুযোগ হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান নিহত হন এবং তিনি দামেস্ক নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

জুমাদাল উলায় কাযী ইমামুদ্দিন কাযবিনী যাহেরিয়া বারানিয়া মাদরাসায় পাঠ দান করেন এবং এ অনুষ্ঠানে কাযী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আর বাইশ যিলহজ্জ সোমবার মালেক আশরাফ তদীয় ভ্রাতা মালেক নামের মোহাম্মদ এবং ভ্রাতৃষ্পুত্র মালেক মুজ্জফর উদ্দিন মুসা ইবন সালেহ আলী ইবন মনসুরকে পরিচ্ছন্ন করেন এবং এক বিরাট কার্য সাধন করেন এবং আশরাফ করকের সঙ্গে খেলায় মত্ত হন এবং তাদের বিরাট আনন্দ সম্পন্ন হয়। আর এটা ছিল দুনিয়া থেকে তার রাজত্বের বিদায়ের মতো। আর মুহাররম মাসের প্রথম তারিখ শায়খ শামসুদ্দিন ইবন গানিম আস বুনিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন। আর সফর মাসের শুরুতে কামালুদ্দীন ইবন যামীকানী নাযিমুদ্দিন ইবন মক্কীর পরিবর্তে রাওয়াহিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন। কারণ হালব অঞ্চলে তার স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত মাদরাসায় দারস দানে তিনি আপত্তি করেন। আর সফর মাসের শেষ নাগাদ শাম দেশের পর্যক দল আগমন করে এ বৎসর যারা হজ্জ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন তকীউদ্দীন ইবন তাইমিয়া (র)ও। আর হজ্জযাত্রী দলের আমির ছিলেন আল বাসিতী আর মাআ'ন অঞ্চলের প্রকাণ্ড ঝন্বতা বায়ু তাদেরকে

ত্রাস করে যাতে একদল লোক নিহিত হয়। এই ঝঞ্ঝা বায়ু অনেকগুলো উডতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং মানুষের মাথা থেকে পাগড়ি উড়ে যায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়। আর এই বৎসর সফর মাসে দামেস্ক নগরীতে প্রচণ্ড তুষারপাত হয় যাতে অনেক খাদ্য-শস্য নষ্ট হয়ে যায় এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে এক দিরহামের বিনিময়ে দশ উখিয়া গম বিক্রি হয় এবং অনেক গবাদি পশু মারা যায় আর একই সময় আল কারক অঞ্চলের অনেক বাড়িঘর ধ্বসে পড়ে।

এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন এদের অন্যতম হচ্ছেন।

শায়খ আল মবীশায়খ সালেহ

আল কুদওয়া আল আরিফ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন শায়খ সালেহ আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ ইবন ইউনুস ইবন ইবরাহীম ইবন সালমান আরমাতী। ইন কাসিউনের পাদদেশে আপন খানকায় অবস্থান করতেন। সেখানে তিনি ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। তিনি ওযীফা কালাম এবং যিকর আযকারে মগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন জনগণের নিকট প্রিয় পাত্র। মুহাররম মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তার পিতার পাশে কাসিউনের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়।

মাকামা গ্রন্থের রচয়িতা অন্ধ তনয় (ইবনুল আ'মা)

শায়খ যহিরউদ্দীন মোহাম্মদ ইবন মবারক ইবন সালিম ইবন আবুল সানাইম দামেস্কি, ইনি ছিলেন ইবন আম্মা নামে পরিচিত। হিজরী ৬১০ সনে তার জন্ম হয়। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং তিনি ছিলেন বিজ্ঞ এবং দক্ষ ব্যক্তি। তার কিছু কাসীদা আছে যাতে তিনি রাসূল (সা) -এর প্রসংশা করেন। তিনি এ কাসীদার নামকরণ করেন কাসীদা শাফাইয়া। প্রতিটি কাসীদায় রয়েছে বাইশটি পংতি। আল বারযালী বলেন, আমি শুনেছি যে, তার একটি বাহরিয়া মাকাসা গ্রন্থ যা প্রসিদ্ধ। মুহাররম মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং সুফীয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মালেক যাহের মুজউদ্দীন

আবু সুলাইমান দাউদ ইবন মালেক মুজাহিদ আসাদুদ্দিন শেরকো, যিনি ছিলেন হিমসের শাসনকর্তা, ইবন নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন মালখ মুয়াজ্জম। আশি বৎসর বয়সে বাস্তানা অঞ্চলে তিনি ইন্তেকাল করেন। মুযাফফরি মসজিদে তার জানাযার নামায আদায় করা হয় এবং কাসিউদের পাদদেশে গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ইনি ছিলেন দীনদার মসজিদে বেশি নামায আদায়কারী ব্যক্তি। মুযাইযাত জুসী যায়নার আশ শাহরিয়া এবং আবু রাওহ প্রমুখের নিকট থেকে তিনি অনুমতিপ্রাপ্ত হন এবং জুমাদাস সানী মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ তকীউদ্দীন ওয়াসেতী

আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন আলী ইবন আহমদ ইবন ফযল ওয়াসেতী অতঃপর দামেস্কি এবং হাম্বলী। ইনি ছিলেন দামেস্কির যাহেরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শায়খুল হাদীস। জুমাদাস সানী মাসের চব্বিশ তারিখ শুক্রবার দিন শেষ বেলা নব্বই বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন ইবাদত গুজার নেক বান্দা। উচ্চাঙ্গের রেওয়াতে তিনি ছিলেন একক ব্যক্তি। তারপর তার

মত আর কেউ সৃষ্টি হয়নি। বাগদাদ নগরীতে তিনি ফেকহ শাস্ত্র চর্চা করেন। অতঃপর তিনি শাম দেশ সফর করেন এবং তথায় সালেহিয়া মাদরাসায় বিশ বৎসর কাল শিক্ষকতা করেন। তিনি আবু ওমর মাদরাসায় ও শিক্ষকতা করেন এবং শেষ বয়সে সফর আর ফারুসীর পর যাহেরিয়া মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম যুদ্ধের সালফের মাযহাবের প্রচারক। তিনি পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন, জানাযার নামাযে উপস্থিত হতেন, ভালো কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতেন এবং ইনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার উত্তম বান্দাদের অন্যতম। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তার পরে সালেহিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন শায়খ শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল কাবী আল মারদাবী আল দারুল হাদীস যাহেরিয়ায় দারস দান করেন শরফুদ্দিন ওমর ইবন খাবেয়া, নাসেহ নামে পরিচিত জামে মসজিদের ইমাম।

ইবন সাহেব হেমাতুল মালেক আফজাল

নুরুদ্দিন আলী ইবন মুযাফফর তকীউদ্দিন মাহমুদ ইবন মালেক মনসুর মোহাম্মদ ইবন মালেক মুযাফফর তকীউদ্দিন ওমর ইবন শাহেন শাহ ইবন আইউব। দামেস্ক নগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তথাকার জামে মসজিদে তার জানাযার নামায পড়া হয়। এবং বাবুল ফারাদিস থেকে তার লাশ তার পিতার শহরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তথায় নিয়ে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন আমীর ইবন কবীর ইবন বদরুদ্দিন হাসান এবং ইমদুদ্দীন ইসমাঈলের পিতা যিনি পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন হিম্মাত অঞ্চলের বাদশা ছিলেন।

ইবন আব্দুয যাহের

মুহিউদ্দিন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন রশীদউদ্দীন আব্দুয যাহের ইবন নাসওয়ান ইবন আব্দুয যাহের ইবন আলী ইবন নাযদা সা'লীহ। ইনি ছিলেন মিশরীয় অঞ্চলের সেক্রেটারী এবং ইনি ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি ছিলেন তাঁর যুগের লোকদের মধ্যে অগ্রগামী। আর ইনি ছিলেন সাহেব ফাতহুদ্দিন নাদীমের পিতা। তার পিতার পূর্বে তার মৃত্যু প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। তার অনেকগুলো রচিত গ্রন্থ আছে তম্মধ্যে একটা হচ্ছে মালেক যাহেরের জীবনী গ্রন্থ। ইনি ছিলেন মার্জিত চরিত্রের অধিকারী। আরবি ভাষায় পদ্য এবং গদ্যে তার চমৎকার রচনা রয়েছে। রজব মাসের চার তারিখ মঙ্গলবার দিন ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এবং আল বারাফা অঞ্চলে তার নিজের স্থাপিত গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আমীর আলামুদ্দিনে সানযার হালবী :

ইনি ছিলেন দামেস্কের তাতারীদের নায়েব। তার কাছে যাহেরিয়ার বাই'য়াতের খবর পৌছলে তিনি নিজের দিকে আহ্বান জানান এবং তার বায়'আত করা হয় এবং তার নামকরণ করা হয় মালেক মুজাহিদ। অতঃপর তাকে অবরোধ করে রাখা হয়। সেখান থেকে তিনি যাহেরের খেদমতে উপস্থিত হন এবং যাহের তাকে কিছু কাল আটক করে রাখেন এবং পরে মুক্তি দেন। মনসুর তাকে কিছু কাল আটক রাখেন এবং আশরাফ তাঁকে মুক্তি দেল এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন তাঁর বয়স ছিল আশি বৎসর। এই বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিজরী ৬৯৩ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৪ সন)

এ বৎসরের শুরুতে আশরাফ নিহত হয়। তারা মুহাররম তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে বের হন। আর বারো মুহাররম যখন তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটবর্তী বারুজা ভূমিতে পৌঁছেন তখন একদল আমীর তার উপর হামলা চালায়। এরা পূর্বে একমত হয়েছিল যে, তিনি যখন সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন তখন তার উপর হামলা চালানো হবে। সর্বপ্রথম তাঁর নায়েব বেদরা তাকে হত্যা করার প্রসঙ্গটি অনুমোদন করেন। লাজীন মনসূরী এ ব্যাপারে চোগলখুরী করে এবং রমযান পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। পরে ঈদের দিন তিনি বের হয়ে আসেন। আশরাফের হত্যার ব্যাপারে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন বদরুদ্দিন বায়সরী এবং শামসুদ্দিন কারা সানকার আল আলসুরী। যখন আশরাফকে হত্যা করা হয় তখন আমীররা দেরকে বাদশা বানাবার ব্যাপারে একমত হয়। এবং তারা তার নাম দেন মালক কাহের বা মালেক আওহাদ। কিন্তু এই পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়নি বরং দ্বিতীয় দিন কাতবগাঢ় নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর যাইনুদ্দীন কাতাবগা এবং আলামুদ্দীন সানযার শাজায়ী একমত হন, যে, তারা তার ভাই নাসের ইবন কালাউনকে বাদশা বানাবে। এই সময় তার বয়স ছিল মাত্র আট বৎসর কয়েক মাস। চৌদ্দ মুহাররম তারা তাকে সিংহাসনে বসায়। এই সময় উজীর ইবন সালউশ ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। সুলতানের সঙ্গে তিনি বের হন এবং আলেকজান্দ্রিয়া গমন করেন বিপদ যে তাকে পরিবেষ্টন করে আছে তিনি তা ধারণাও করতে পারেন নি। সব দিক থেকে আযাব তাকে ঘেরাও করে ফেলে। আর তা এভাবে যে তিনি বড় আমীরের সঙ্গে ছোট আমীরের মতো আচরণ করতেন। সুতরাং তারা তাকে পাকড়াও করে এবং শাজায়ী তাকে শাস্তি দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাকে প্রচণ্ড মার দেয় এবং তিনি অর্ধেক বিষয় স্বীকার করেন। তারা তাকে একটানা শাস্তি দিতে থাকে অবশেষে সফর মাসের দশ তারিখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তার সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়। এবং আশরাফের মৃতদেহ আনয়ন করে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে জনগণ দুঃখিত হয় এবং তারা এটাকে একটা নির্মম ঘটনা বলে মন্তব্য করে। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, বীর বাহাদুর এবং সুদর্শন পুরুষ। তিনি ইরাকীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাতারীদের হাত থেকে এই অঞ্চল ফেরত নেওয়ার সংকল্প করেছিলেন। এ জন্য তিনি প্রস্তুতি ও গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের এলাকায় এ মর্মে ঘোষণাও প্রচার করেন। তিনি তার তিন বৎসর শাসনকালে একশ অঞ্চলসহ সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল জয় করে নেন এবং তথায় ফিরিঙ্গীদের জন্য কোনো চিহ্ন এবং কোনো পাথর অবশিষ্ট রাখেননি। তদুপরি তিনি রোম দূর্গ এবং বাহালসা ইত্যাদি অঞ্চলও জয় করেন।

দামেস্ক নগরীতে নাসেরের বায়'আতের খবর পৌঁছলে তথায় মিম্বরে তার নামে খুৎতবা পাঠ করা হয়। এবং এই অবস্থা বহাল থাকে এবং তিনি আমির কাতাবগাকে তার দীক্ষাগুরু এবং শাজয়ীকে প্রথম উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। এর কিছুদিন পর আল জাবাল দূর্গে তিনি নিহত হন এবং কাতাবগার নিকট তার মস্তক আনয়ন করা হয় এবং তিনি নির্দেশ দেন, সে খণ্ডিত মস্তক শহরের প্রদক্ষিণ করতে। এ ঘটনায় জনগণ আনন্দিত হয় এবং যারা তার খণ্ডিত মস্তক বহন করে এনেছিল তাদেরকে অর্থ দান করা হয় এবং কাতাবগার সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য কেউ অবশিষ্ট থাকলো না। এতদ্বসত্ত্বেও আমীরদের মন জয় করার জন্য তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

আর ইবন সালাউশের মৃত্যুর পর বদরুদ্দিন ইবন জুমাআকে কাযীর পদ থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং তকীউদ্দিন ইবন বিদতুল আয়াযকে কাযীর পদে ফিরায়ে আনা হয় এবং ইবন জুমআত' মিশরে সচ্ছন্দে শিক্ষকতা করতে থাকেন। মিশরের উজীরের পদ গ্রহণ করেন তাজউদ্দীন ইবন হেনা। একুশ সফর বুধবার যোহরের সময় তাকে সাহাবির মেহরাবে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন কামালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন কাযী মহিউদ্দিন ইবন যকী এবং এ সময় খুতবার পর তিনি নামায পড়ান এবং তাকে বাবুর নাতেকানিনে মক্তবে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। আর তিনি হচ্ছেন জিয়াউদ্দিন ইবন বুরহানউদ্দিন ইবন ইস্তান্দারি এবং জামে শরীফের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন যাইনুদ্দিন হুসাইন ইবন মোহাম্মদ ইবন আদনান এবং রেশমী বাজার উক্ত বাজারের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। তারা কাযসারিয়া আল-কাতান খালি করে দেয়, যেখানে তাবগীল নায়েবরা বসবাসস্থলে পরিণত করেছিল। এবং মুযাফফার উদ্দিন আল হামাবীকে বরখাস্ত করার পর দামেস্ক মসজিদে খুৎবা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শায়খ আল্লামা শরফুদ্দিন আহমদ ইবন জামালুদ্দীন আহমদ ইবন নে'মা ইবন আহমদ আল মাগদেসী। তাকে হেকমতা অঞ্চলে ডেকে পাঠানো হয়। আর আল মাগদেসী পনেরো রজব শুক্রবার জুমার দিন খুৎবা দান করেন এবং তার নিযুক্তি পত্র পাঠ করে শোনানো হয় আর মিশরের উজীর তাজউদ্দিন ইবন হেনার নির্দেশক্রমে তাকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন অতি মিষ্টভাষী এবং বড় মাপের আলেম।

আর রজব মাসের শেষ দিকে আমীররা আমীর যাইনুদ্দীন কাতাবগার পক্ষে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এতে মালেক মাসের মোহাম্মদ ইবন কালাউনও ছিলেন। আর তার মাধ্যমে অবশিষ্ট শহর এবং অঞ্চলের বাই'আতের খবর পৌঁছে যায়।

ওসাপ নাসরানীর ঘটনা

লোকটি ছিল সুহাইদা অঞ্চলের অধিবাসী। তার সম্পর্কে একদল লোক সাক্ষ্য দেয় যে, লোকটি নবী করীম (সা)-কে গালি দিয়েছে এবং লোকটি ইবন আহমদ বিন হিযা আলে আলীর আমীর এর আশ্রয় নিয়েছে। এ বিষয়ে শায়খ তকীউদ্দিন তাইমিয়া এবং শায়খ যাইনুদ্দিন আল ফারেঙ্গী যিনি ছিলেন দারুল হাদীসের শায়খ। উভয়ে মিলিত হন এবং তারা দুই জন রাষ্ট্রের নায়েব আমীর ইযযুদ্দিন আয়বক হামাবীর নিকট গমন করেন এবং লোকটি সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি এ দু'জনের কথা শ্রবণ করে তা মেনে নেন এবং লোকটিকে ডেকে পাঠাবার জন্য একজনকে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে যখন সেখান থেকে বের হয়ে আসেন তখন তাদের সঙ্গে অনেক লোক ছিলেন। উসাফ উপস্থিত হলে লোকজন দেখতে পান যে তার সসেঙ্গ একজন আরব লোকও আছে। তারা লোকটিকে গালমন্দ দেন। তখন বন্ধ লোকটি বলে এই লোকটি তোমদের চেয়ে উত্তম অর্থাৎ খ্রিস্টান লোকটি। তখন লোকজন উভয়কে প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং প্রস্তর উসাফের গায়ে লাগে তখন নায়েব পয়গাম প্রেরণ করে ইবন তাইমিয়া এবং আল ফারুকীকে ডেকে পাঠান এবং লোকটির সম্মুখে উভয়কে প্রহার করে। এবং তাদের উভয়কে আল আযরাবিয়া সম্পর্কে লিখেন এবং নাসরালী লোকটি আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এ উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লোকটি প্রমাণ করে যে, তার এবং সাক্ষীদের মধ্যে দুশমনী আছে। ফলে লোকটির রক্ত নিরাপদ হয়ে যায়। তখন লোকটি উভয় শায়খকে

ডেকে পাঠায় এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং উভয়কে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর খ্রিষ্টান লোকটি হিযায গমন করেন এবং ঘটনাচক্রমে মদীনা শরীফের সন্নিকটে ঘাতকের হাতে নিহত হয় ভ্রাতুস্পুত্র তাকে হত্যা করে। শায়খ তকী উদ্দীন ইবন তাইমিয়া এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং গ্রন্থটির নামকরণ করেন আছছারেম আল মাসলূন আলা সাব্বির রাসূল (রাসূলকে গালমন্দ দাতার উপর উন্মুক্ত তরবারি)।

এ বৎসর শা'বান মাসে মালেক নাসের শাহী শানশওকতের সাথে কায়রো গমন করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। আর এই দিনই তিনি প্রথম সাওয়ার হন এবং শাম দেশে আনন্দের বাদ্য বাজানো হয় এবং তার পক্ষ থেকে সরকারী পরওয়ানা আসে যা জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে পাঠ করে শোনানো হয়। এতে সুবিচারের প্রসার ঘটানো এবং যুলুম সংকুচিত করার এবং ওয়াকফে সম্পত্তির মালিকের ইচ্ছাক্রমে দায়িত্ব বাতিল করার নির্দেশ ছিল। আর শা'বান মাসের বাইশ তারিখ মাসরুরীয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন ইমামুদ্দিনের ভাই কাযী জামালুদ্দীন কাযবীনি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তার ভাই এবং কাযী আল কুযাত শিহাবউদ্দিন খুবাই এবং শায়খ তকীউদ্দিন ইবন তাইমিয়া এই দারসের এই অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। আর বারযালী বলেন এই বৎসর শাওবান মাসে প্রকাশ পায় যে জাসরীনের জঙ্গলে একটা অজগর আছে, যে একটা বড় গোখরীর আস্ত মাথা গিলে খায়। আর রমযান মাসের শেষের দিকে আমীর হুসামুদ্দিন লাজীন প্রকাশ পায়। আশরাফের হত্যার পর তিনি আত্মগোপন করেছিলেন এবং তিনি সুলতানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সুলতান তা মঞ্জুর করেন এবং তাকে খিলাফত দ্বারা সম্মানিত করেন এবং আশরাফকে তিনি ইচ্ছা করে হত্যা করেন নি।

এ বৎসর শাওয়াল মাসে প্রকাশ পায় যে, মেহনা ইবন ইসা সুলতান নাসিরের বৈশ্যতা অস্বীকার করে তাতারীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর আট যিলক্বদ বুধবার কাযী উল কুযাত শিহাবউদ্দিন আল খাবীর পরিবর্তে খতীব শরফুদ্দিন আল মাসদেসী গাজারিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন।

কাযী শিহাবউদ্দিন ইন্তেকাল করেন এবং আল শামিয়া আল বাগানিয়া ত্যাগ করেছেন। এবং শাম দেশে কাযীর পদ গ্রহণ করেন কাযী বদরুদ্দিন আহমদ ইবন জুমা'আ। তিনি যিলহজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি আল আদেলিয়ায় অবস্থান করেন। নায়েবে সুলতান এবং সমস্ত সৈন্যরা তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করার জন্য বের হয়ে আসেন। আর কবিরা তার প্রসংশা করেন এবং তাজউদ্দিন আল জিবালী তাকে নায়েবে খতীব নিয়োগ করেন এবং শরফুদ্দিন আল মাগদেসীর পরিবর্তে শায়খ যয়নুদ্দিন আল ফারুনী শামিয়া আল বারানিয়ায় দারস দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার অধিকার থেকে নাসিরিয়াকে মুক্ত করেন এবং তথায় ইবন জুমু'আ দারস দান করেন যিলহজ্জ মাসের বিশ তারিখ ইবন জুমা'আ তথায় এবং আল আদিলিয়ায় পাঠদান করেন আর এই মাসে তারা দামেস্ক নগরী থেকে কুকুরকে জঙ্গলে বিতাড়িত করে দেন দামেস্ক নগরীর ওয়ালী জামালুদ্দিন আকিয়ার নির্দেশক্রমে এবং এ ব্যাপারে জনগণ এবং দারোয়ানের প্রতি কঠোরতা আরোপ করেন।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মালেক আশরাফ খলিল, ইবন কালাউন আল মনসুর।

শায়খ ইমাম আল্লামা তাজউদ্দীন মূসা ইবন মোহাম্মদ ইবন মাসউদ আল মারাবী। আবুল যাওয়ার শাফেঈ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ইকবালিয়া প্রমুখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি দারস দানকরেন্ ইনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের বিজ্ঞ ব্যক্তি। ফিকহে, উসূল এবং আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইনি ছিলেন দক্ষ ব্যক্তি। এসব বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল। শনিবার হঠাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবুস সগীর কবরাস্থানে তাকে দাযম করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল সত্তরের বেশি।

খাতূন মুনীস বিনতে সুলতান আদিল আবু বকর ইবন আইয়ুব

তিনি দারুল কাতীবা এবং দারে ইকবা নামে পরিচিত। ৬০৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আফীকা আল ফাকানিয়া এবং আইনুস শামস বিনতে আহমদ বিন আবুল ফরয আস সাকবিয়ার নিকট থেকে বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেন এবং রবিউস সানী মাসে কায়রো নগরীতে ইন্তেকাল করেন বাবে যুয়াইলা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ছাহেব উজীর ফখরুদ্দীন

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন লোকমান ইবন আহমদ ইবন মোহাম্মদ আল বানী আল মিশরী আল-মূকিঈন। ইনি ছিলেন মাশহুর উজীরদের ওস্তাদ। হিজরী ৬১২ সনে তিনি জনমগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। কায়রো নগরীতে জুমাদাস সানী মাসের শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মালেক হাফেয গিয়াস উদ্দীন ইবন মোহাম্মদ

মালেক সাঈদ মঈনুদ্দিন ইবন মালেখ আমজাদ বাহরাম শাহ ইবনুল মুইয ইযযুদ্দিন ফররুখ শাহ ইবন শাহেনশাহ ইবন আইয়ুব। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বুখারী শরীফ রেওয়ায়াত করেন। তিনি আলেম ওলামা এবং ফকীর মিসকীনকে ভালবাসতেন। ছয় শা'বান শুক্রবার তিনি ইন্তেকাল করেন এবং বাবুল ফারাদিস গোরস্থানের বাহিরে নানা ইবনুল মুকাদ্দিসের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

কাযী আল কুযাত মিহাবউদ্দীন ইবনুল খুবাই

আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবন কাযী আল কুয়াত শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন খলিল ইবনসা'আদাত ইবন জাফর ইবন ইসা ইবন মোহাম্মদ আল শাফেঈ। তার পূর্বপুরুষ খুয়াই। তিনি জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত হন এবং অনেক জ্ঞান অর্জন করেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করে। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে একটা গ্রন্থ এমন আছে যাতে বিশটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রকে তিনি পদ্যে রূপ দেন। এছাড়া কিফায়াতুল মুজা হাফফিস ইত্যাদি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি হাদীস এবং আহলে হাদীসকে ভালবাসতেন। শৈশবে দেমাগিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর

তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস এবং পরে বাহানসার কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি হালব অঞ্চলের কাযীর পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি মহল্লায় ফিরে আসেন এবং কায়রোতে কাযীর পদ গ্রহণ করেন পরে শাম দেশে আগমন করে কাযীর পদ গ্রহণ করেন। এতদ্‌সঙ্গে তিনি আদিলিয়া এবং গাযালিয়া ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন। তিনি ছিলেন সময়ের অন্যতম শুভ কীর্তি এবং খ্যাতনামা আলীমদের অন্যতম। তিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র পরহেজগার মুত্তাকী ব্যক্তি। তিনি হাদীস এবং হাদীসের আলিমকে ভালবাসতেন। আমাদের শায়খ হাফেয আল মাদী তার সনদে চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তকীউদ্দীন ইবন উতবা আল আসওয়াদী আল আসআরদি, তিনি বর্ণানুক্রিমক ধারায় দুইশত ছত্রিশজন শায়খের তালিকা সম্বলিত একটি জীবনী অভিধান সংকলন করেন। আর বারযালী বলেন, তার আরো প্রায় তিনশ জন শায়খ আছেন যাদের নাম এ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তিনি পঁচিশ রমযান বৃহস্পতিবার সাতষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জানাযা শেষে তাকে কাসীউন গোরস্থানে পিতার পাশে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

অন্ধ আমীর আলাউদ্দীন

তিনি ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের পর্যবেক্ষক এবং অনেক নিদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। আর তিনি হলেন আমীর কবির আলাউদ্দীন আইদকীন ইবন আব্দুল্লাহ সালেহী নাযমী। তিনি ছিলেন বড় আমিরাদের অন্যতম। দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করেন তথায় তিনি নতুন ভবন দেখাশুনা করতেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। তার নির্দেশ অমান্য করা যেতে না। আর তিনি সেই ব্যক্তি যিনি মসজিদে নববীর নিকটে পাক-পবিত্রতা অর্জনের স্থান নির্মাণ করেন্ যেখানে জনগণ অযু ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হত এবং জনগণের জন্য এসব কাজ অনেক সহজ হয়। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে অনেক খানকা নির্মাণ করেন এবং অনেক নেক কাজ করেন।

তিনি নিজে এসব কাজ তদারকি করতেন এবং তিনি ছিলেন অনেক সম্মানের অধিকারী। একই বৎসর শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

উজীর শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইবন উসমান

ইবন আবুর রিজাল তানুকি ইবন সালউশ নামে পরিচিত। ইনি ছিলেন মালেখ আশরাফের উজীর। এই বৎসর সফর মাসের দশ তারিখ প্রহারে আহত হয়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তার দেহে এক হাজারের বেশি চাবুকের আঘাত ছিল। তাকে আল কারাফা গোরস্থানে দাফন করা হয। কারো কারো মতে, মৃত্যুর পর তাকে শামদেশে স্থানান্তর করা হয়। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। অতঃপর তিনি তকীউদ্দীন ইবন তাওবার দূতীয়ালীতে শামদেশে হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সরকারী কাজে অংশ নেয়ার আগে মালেক আশরাফের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তার থেকে সততা এবং ন্যায়-নীতি প্রকাশ পায়। পিতা মনসুরের পর তিনি যখন বাদশা হন তখন তিনি তাকে হজ্জ থেকে ডেকে এনে মন্ত্রিত্ব দান

করেন। বড় বড় আমীরদের সামনে তিনি বাহাদুরী প্রকাশ করতেন এবং তাদেরকে নাম ধরে ডাকতেন এবং তাদের জন্য সম্মান স্বরূপ উটে দাঁড়াতেন না। যখন তার ওস্তাদ আশরাফ নিহত হয় তখন তিনি তাকে প্রহার, অপদস্ত করা এবং অর্থ গ্রহণ করার জন্য বশীভূত করেন। শেষ পর্যন্ত তারাই তার জীবনাশ করে। তাকে বেঁধে প্রহার করে এবং মাটির ওপরে বসায়। অথচ ইতিপূর্বে তিনি সাত আসমানে পৌছেছিলেন। তবে এটা আল্লাহর নীতি যে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, উপরে গেলেন আবার পরে তাকে নীচে নামান। তিনি তাকে প্রহার, অপদস্ত করা এবং অর্থ গ্রহণ করার জন্য বশীভূত করেন। শেষ পর্যন্ত তারাই তার জীবনাশ করে। তাকে বেঁধে প্রহার করে এবং মাটির ওপরে বসায়। অথচ ইতিপূর্বে তিনি সাত আসমানে পৌছেছিলেন। তবে এটা আল্লাহর নীতি যে, তিনি যাকে উপরে উঠান আবার পরে তাকে নীচে নামান।

হিজরী ৬৯৪ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৫ সন)

এ বছরের শুরুতে খলীফা ছিলেন হাকিম বিআমরিল্লাহ্। আর নগরীর সুলতান ছিলেন মালেক নাসের মুহাম্মদ ইবন কালাউন। এই সময় তার বয়স ছিল বারো বৎসর কয়েক মাস আর বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপক এবং সৈন্যদের দীক্ষা গুরু ছিলেন আমির জয়নুদ্দীন কাতাবরা এবং শামদেশের নায়েব ছিলেন আমির ইযযুতদ্দীন আইবক আল হামারি। আর দামেস্কের উজির ছিলেন তকীউদ্দিন তাওবাহ তাকরীতি। আর বিভিন্ন দফতরের সংযোগকারী ছিলেন শামসুদ্দীন আৎসার এবং শাফেয়ী মাযহাবের কাযী ছিলেন শামসুদ্দিন ইবন জুম'আ এবং হানাফী মাযহাবের হুমাযুদ্দিন রাযী এবং মালেকী মাযহাবের শাযী ছিলেন জামাল উদ্দিন যা আবী এবং হাম্বলী মাযহাবের কাযী ছিলেন শরফুদ্দনি হাসান এবং হিসাব রক্ষক ছিলেন শিহাবুদ্দিন হানাফী এবং যয়নুদ্দীন ইবন আহনাফ ছিলেন নকীবুল আশরাফ। আর বায়তুল মালের দায়িত্বশীল ছিলেন তাযউদ্দীন শিরাযী। শেষোক্তজন জামে মসজিদের দেখা শুনার দায়িত্বে ছিলেন এবং নগরীর খতীব ছিলেন শরফুদ্দীন মাকদানী।

আর আশুরার দিন উপস্থিত হলে আশরাফের একদল ভৃত্য এগিয়ে এসে সুলতানের সম্মান হানীর চেষ্টা করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্যত হয়। তারা অস্ত্রের ভাণ্ডারে উপস্থিত হয়ে সেখানে যা কিছু ছিল সব নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে পাকড়াও করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে কাউকে শূলীবৃদ্ধ করা হয় এবং কতককে ফাঁসি দেয়া হয়। আবার অন্য কিছু লোকের হাত কেটে দেয়া হয় এবং তাদের মুখও বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে এক অস্বস্থিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন বা তার চেয়ে বেশি।

মালেক আদিল কাতারবার রাজত্ব

১১ ই মুহাররম সকালবেলা আমির কাতারবার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি মালেক নাহির মুহাম্মদ ইবন মনছুরকে পদচ্যুত করেন এবং তাকে গৃহবন্দী করে রাখেন। বাইরে বের হওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সমস্ত আমিররা তার বায়'আত করে এবং তাঁকে অভিনন্দন

জানায়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। আর দূতেরা এই সংবাদ বিভিন্ন অঞ্চলে বহন করে নিয়ে যায়। সর্বত্র তার জন্য বায়'আত করা হয় এবং স্বতন্ত্র ভাবে তার নামে খুৎবাহ পাঠ করা হয় এবং তার নামে মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়।

এভাবে তার নেতৃত্ব সম্পন্ন হয় এবং নগরীকে সজ্জিত করা হয় এবং তোলবাজি যে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। আর মালিক আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ উপাধিতে তাকে ভূষিত করা হয়। এ সময় তার বয়স ছিল প্রায় ৫০ বৎসর। আর আইনে জালূত এর যুদ্ধের পর হেমছের প্রথম যুদ্ধে, যা সংঘটিত হয় মালেক যাহেরের শাসনকালে তখন তিনি বন্দী হোন এবং তিনি ছিলেন গুয়াইরানিয়াদের অন্যতম। এরা ছিল তাতারীদের একটা গোত্র। আর তিনি আমীর হুসামুদ্দীন লাজীম।

সালাদারী মনসুরীকে মিশরের নায়েব নিযুক্ত করেন। আর তার সম্মুখে ছিল ভৃত্যদের ব্যবস্থাপক। আর ঐতিহাসিক ইবনুল জায়রী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কোনো কোনো আমীরের সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি হালাকু খানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তার জ্যোতীষীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তার সৈন্যদের মধ্যে যে সব অগ্রবর্তী দল থেকে বাছাই করে নিবেন যারা মিশরে অঞ্চল অধিকার করবে। আর জ্যোতীষী গণনা করে তাকে বলে যে, অমি মনে করি এই ব্যক্তি মিশর অঞ্চল অধিকার করবে সক্ষম হবে তার নাম হবে কাতাবরা। আর তিনি তাকে ধারণা করেন কাতাবগা নাবীন। আর তিনি ছিলেন হালাকু খানের জামাতা। তাই তিনি তাকে সেনাবাহিনীর কর্তা নিয়োগ করেন কিন্তু আসলে তিনি সেই লোক ছিলেন না। তিনি আইনে যালুদ যুদ্ধে নিহত হন যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। আর যে ব্যক্তি তাকে মিশরের অধিপতি বানায় তিনি ছিলেন আমীরদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং স্বভাব চরিত্র। ইনসাফ এবং ইসলামের সাহায্য করার অভিপ্রায়ের দিক থেকে আমীরদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে বুধবার রাজকীয় শান শওকতের সাথে তিনি কাতাবগা অশ্বারোহণ করে বের হন। তিনি কায়বো নগরী অতিক্রম করে যান। এ সময় জনতার জন্য দোআ করে। তখন সাহেব তাজউদ্দিন ইবন হেনাকে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্ত করেন এবং ফখরুদ্দিন আল খালিলিকে উজীর নিযুক্ত করেন। এ সময় দামেস্ক নগরীর লোকজন মাসজিদুল কদমে'র নিকট বৃষ্টির জন্য নামায আদায় করে দো'আ করেন। এবং তাজউদ্দিন সালেহ আল জিবারী শরফুদ্দিন আল মাগদেসীর নায়েব হিসাবে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে খুৎবা দেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন ফলে তিনি নিজেকে কাযীর পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং এরপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। আর এই ঘটনা পাঁচ জুমাদাল উলা বুধবার দিনে কিন্তু বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে শনিবার ছিল সাত জুমাদাস সানি একই স্থানে পুনরায় বৃষ্টির জন্য নমায পড়া হয় এবং এই উপলক্ষ্যে জনতার উদ্দেশ্যে খুৎবা দেন শরফুদ্দিন আল মাগদেসী। এই দিনের সমাবেশ ছিল প্রথম সমাবেশের চেয়ে বড় কিন্তু এই দিনেও বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। আর রজব মাসে কাযী বদরুদ্দিন ইবন জামা'আর প্রতিনিধি হিসাবে জামালুদ্দিন ইবন শারীসী ফয়সালা দান করেন। আর এই মাসে কাযী শামসুদ্দিন ইবনুল ইযমুয়াজ্জিয়ামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করেন। এবং আলাউদ্দিন ইবন দাকাকের নিকট থেকে তিনি এই দায়িত্ব ছিনিয়ে নেন। এবং একই মাসে

মালেক আওহাদ ইবন মালেক নাসের দাউদ ইবন মুয়াজ্জম বায়তুল মুকাদ্দাস এবং আল খালীলের ওপর অধিকার বিস্তার করেন। আর রমযান মাসে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের নির্দেশ দান করেন যে, তারা যেন বড় ইমামের পূর্বে নামায আদায় করে নেয়। আর এই নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয় যে, তারা বড় ইমামের পরে নামায আদায় করলো। পরে যখন "মেহরাবুস সাহাব'র জন্য নতুন ইমাম নিযুক্ত করা হয় তখন সকলে এক ওয়াক্তে নামায আদায় করতো। এতে অনেক অস্থিরতা সৃষ্টি হতো। পরে এই নিয়ম স্থির করা হয় যে তারা বড় ইমামের আগে নামায আদায় করে নিবে এবং তা আদায় করবে সঠিক সময়ে পশ্চিম দিকে তৃতীয় বারান্দায় মেহরাবের নিকটে আঙ্গিনার। আমি বলি ৭২০ হিজরীর পর এই নিয়ম পরিবর্তন হয়ে যায়। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে। আর রমযান মাসের শেষ দিকে কাযী নাযীমুদ্দিন ইবন ছাছরী মিশরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেন সিরীয় সৈন্যদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য। এবং পাঁচ শাওয়াল বৃহস্পতিবার খতীব এবং মুদাররিস শারফুদ্দীন আল মাগদেসীর পরিবর্তে কাযী বদরুদ্দিন ইবন জুমা'আ জামে মসজিদের মেহরাবে ইমাম এবং খতীব হিসাবে যোহরের নামায পড়ান। এবং পরদিন তিনি খুতবা দান করেন। তার খুৎবা এবং কেরাত ছিল উন্নত মানের। তার হাতে বিচার ইত্যাদির যে দায়িত্ব ছিল, এটা ছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত। আর শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে মিশর অঞ্চল থেকে অনেকগুলো নির্দেশ আসে যার অন্যতম ছিল এই যে খতীব মাগদেসীর পরিবর্তে ইবন ছাছরী গাযালিয়া মাদরাসায় শিক্ষা দান করবেন। আর আমিনিয়া মাদরাসায় শিক্ষাদান সম্পর্কে নির্দেশ আসে যে, নাযমুদ্দিন ইবন ছাছরীর পরিবর্তে তথায় দারস দান করবেন ইমামুদ্দিন কাযবিনী। এবং তিনি তার ভাই জালালুদ্দীনকে নির্দেশ দেন যে, তিনি তার পরিবর্তে যাহিরীয়া বারানিয়ায় পাঠদান করবেন। এবং শাওয়াল মাসে হাম্মামখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় যার নির্মাণ কাজ শুরু করেন ইযযুদ্দিন হাম্বাবী মসজিদ আল কাছাবে। এটা ছিল মনোরম হামযামখানার অন্যতম। আর দারুল হাদীস নূরীয়ার শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শরফুদ্দিন আল মাগদেসীর পরিবর্তে শায়খ আলাউদ্দিন ইবন আখতার। আর একই বৎসর মালেক আদিল কাতাবগার পুত্র মালেক মুজাহিদ আনআস হজ্জ পালন করেন এবং তারা হেরেম শরীফের বিপুল দান সাদরে করেন। আর আরাফার দিন দামেস্ক নগরীতে ঘোষণা প্রচার করা হয় যে যিম্মীদের মধ্যে কেউ যেন ঘোড়া এবং খচ্চরে আরোহণ না করে এবং মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে এই নির্দেশ অমান্য করতে দেখে সে যেন তার নিকট থেকে মাল সম্মান অধিকার করে নেয়। এই বৎসরের শেষ এবং পরবর্তী বৎসরের মিশর দেশে দ্রব্যমূল্য ভীষণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে বহু লোক মারা যায়। আর যিলহজ্জ মাসে প্রায় বিশ হাজার লোক মারা যায়। আর একই বৎসর তাতারীদের সম্রাট কাযান ইবন আরগুন ইবন আবগা ইবন তাওরাল্লি ইবন চেঙ্গিস খাঁন ইসলাম গ্রহণ করে এবং আমীর তুযুনের হাতে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করে। তাতারী বা তাদের অধিকাংশ ইসলামে প্রবেশ করে এবং তার ইসলাম গ্রহণের দিন জনগণের মাথায় স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মণি-মুক্তা ছড়ানো হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মাহমুদ নাম ধারণ করেন। তিনি জুমার জামাত এবং খুৎবায় উপস্থিত হন। তিনি অনেক গীর্জায় ক্ষতি সাধন করেন এবং তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করেন এবং বাগদাদ ইত্যাদি শহরে অনেক

যুলুমের প্রতিবিধান করেন। আর তাতারীদের সঙ্গে প্রকাশ পায় দীপ্তি এবং কুরবানীস্থ। সমস্ত প্রসংশা কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্য।

এই বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন।

শায়খ আবুর রিযাল আল মানীনী

শায়খ সালেহ যাহির আবিদ আবুর রিযাল ইবন মারআ, যিনি ছিলেন বাহতাব আল মানীনের অন্তর্ভুক্ত। তার ছিল বিভিন্ন অবস্থা এবং বহুবিধ মুকাশাফা। দামোস্ক নগরীসহ বিভিন্ন শহরের লোকজন মানীন জনপদে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। কখনো কখনো তিনি নিজে দামেস্ক নগরীতে আগমন করতেন তখন তার প্রতি সম্মান দেখানো হত এবং তার মেহমানদারী করানো হত। নিজ শহরে তার খানকা ছিল। আর তিনি শয়তানী সামা তথা গান-বাজনা থেকে মুক্ত ছিলেন। আর তিনি ছিলেন শায়খ জন্দলের শিক্ষক। আর তার গুরু শায়খ জন্দল ছিলেন মহান নেক্কারদের অন্যতম। তিনি সালফের রীতি অবলম্বন করতেন। তিনি আশি বৎসর বয়সে উন্নীত হন। মুহাররম মাসের দশ তারিখ মানীনস্থ বাসস্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। দামেস্ক থেকে লোকজন ছুটে যায় তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য। তাদের মধ্যে কেউ জানাযার নামায পেয়েছে আর কেউ পায়নি। যারা জানাযার নামায পায়নি তারা তার কবরের ওপর তার জানাযার নামায আদায় করেন। নিজস্ব খানকায় তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আর এই বৎসরের শেষ দিকে রবিউল আউয়াল মাসে খবর আসে যে হুসাম ইবন হাযায, যে খ্রিষ্টান রাসূল (সা)-কে গালি দিয়েছিল তাকে আশ্রয়দাতা ব্যক্তি ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছে। এতে জনগণ আনন্দিত হয়।

শায়খ সালেহ আবিদ যাহিদ ওয়ারা

ইনি ছিলেন সালফে সালিহীনের অন্যতম নিদর্শন জামালুদ্দিন আবুল কাশিম আব্দুস সালাদ ইবনুল হারাস্তানী ইবন কাযী আল কুযাত এবং খাতীবুল খুতাবা ইমাদুদ্দিন আব্দুল করীম ইবন জামালুদ্দিন আব্দুস সামাদ। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইমামতি ও গাযালিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার পিতার প্রতিনিধি। অবশেষে তিনি সমস্ত পদ-পদবী, দুনিয়া ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করেন। জনগণ তার সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতো। লোকজন তার হস্ত চুম্বনপূর্বক তার নিকট দোয়ার আবেদন জানাতো। তিনি আশি বছরের বেশি বয়স পান এবং রবিউল আখের মাসের শেষ দিকে পর্বতের পাদদেশে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ মুহিব্বুদ্দিন তাবারী মাক্কী

তিনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে একটা গ্রন্থ কিতাবুল আহকাম, এই গ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত। সবগুলো খণ্ডই উপকারী। তার আপর একটি কিতাব রয়েছে জামেউল মাসালীর গ্রন্থের পুনর্বিন্যাস বিজয়ে। তিনি হাকেম সাহেব ইয়ামানকে গ্রন্থটি পাঠ করে শোনান। একই বৎসর সাতাশ জুমাদাস সানি বৃহস্পতিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাকে মক্কা নগরীতে দাফন করা

হয়। তার কিছু চমৎকার কবিতা রয়েছে যা মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কে রচিত। এ কবিতার সংখ্যা তিনশর অধিক। হাফেয শরফুদ্দিন দিমইয়াতি তার মুযাম গ্রন্থে তার সূত্রে কবিতাগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

মালেক মুযাফ্ফর ইয়ামানীর শাসনকর্তা

ইউসুফ ইবন মানসুর নূরুদ্দীন ইবন ওমর ইবন আলী ইবন রাসূল। তার পিতার পর তিনি ইয়ামান দেশে সাত চল্লিশ বৎসর অবস্থান করেন। তিনি আশি বৎসর বয়স পান। আর তার পিতা মালেক ওফসীস্ বিন কামিল মোহাম্মদ-এর পর বিশ বৎসরের বেশি সময় ওয়ালী ছিলেন এবং ওমর ইবন রাসূল ছিলেন ওফসীস বাহিনীর অধিকর্তা। আর ওফসীস মারা গেলে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করেন এবং তার শাসনকার পরিপূর্ণ হয় এবং তিনি মালেক মনসুর নামধারণ করেন। তিনি একটানা বিশ বৎসরের বেশি সময় বাদশাহ ছিলেন। অতঃপর তার পুত্র-মুযাফফর সাতচল্লিশ বৎসর বাদশা ছিলেন। অতঃপর তার পুত্র আশরাফ বাদশা হন, যিনি দীনকে নব পর্যায়ে বিন্যস্ত করেন। কিন্তু তিনি এক বৎসর পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার ভাই আল মুয়াইআত ইযযুদ্দিন দাউদ ইবনুল মুযাফফর দাঁড়ান এবং তিনি দীর্ঘ সময় বাদশাহী করেন। উপরোক্ত মালেখ মুযাফফর এই বৎসর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আশি বৎসরের বেশি। তিনি হাদীস চর্চা এবং হাদীস শ্রবণকে ভালবাসতেন। তিনি নিজের জন্য চল্লিশ হাদীসের একটা সংকলন তৈরী করেন।

শরফুদ্দীন আল মাগদেসী

শায়খ ইমাম খতীব, মুদাররেস, মুফতী শরফুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শায়খ কামালুদ্দীন আহমদ ইবন নে'মাত ইবন আহমদ ইবন জাফর ইবন হুসাইন ইবন হাম্মাদ আল মাগদেসী আল শাফেঈ। ৬২২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার রচিত গ্রন্থ অতি উন্নতমানের। তিনি দামেস্ক নগরীতে নায়েব হিসাবে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন এবং দামেস্ক নগরীতে দারস এবং খুৎবা দান করেন। খুৎবা দানের সাথে তিনি গাযালিয়া মাদরাসা এবং নুর দারুল হাদীস নূরিয়ায় শিক্ষকতা করেন। এক সময় তিনি শামিয়া বারানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং একদল বিজ্ঞ আলেমকে তিনি ফতওয়া দানের অনুমতিপত্র দেন। তাদের অন্যতম হচ্ছেন শায়াখ ইমাম, আল্লামা শায়খুল ইসলাম আবুল আব্বাস ইবন তাইমিয়া। এবং এ জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন এবং আনন্দ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, ইবন তাইমিয়াকে ফাতওয়া দানের অনুমতি আমি দিয়েছি। জ্ঞানের অনেক শাখায় তিনি ছিলেন দক্ষ। তার কিছু চমৎকার কবিতা রয়েছে। উসূলে ফিকহ বিষয়ে তিনি একটি কিতাব রচনা করেন যাতে অনেক কথার সমাবেশ ঘটান। তার চমৎকার হাতের লেখার গ্রন্থটি আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। সতের রমযান রোববার তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল সত্তরের বেশি। বাবে কায়সানের কবরস্থানে পিতার পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার এবং তার পিতার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তারপরে ঈদের দিন জারাহ মসজিদের খতীব শায়খ শরফুদ্দিন আল ফাযারী খুৎবা দান করেন। অতঃপর ইবন

জুমাআর খুৎবা দানের সরকারী নির্দেশ আসে। খতীব শরফুদ্দিন ইবন মাগদেসীর দুইটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হল–

احجج الى الزهر لتسعى به * وارم جمار الهم مستنفرا

من لم يطف بالزهر فى وقته * من قبل ان يحلق فقد قصرا

তুমি পুষ্পের অভিপ্রায় করে তৎপ্রতি গমন করো যাতে সে দিকে ছুটে যেতে পারো এবং নিক্ষেপ করো দুঃখের স্ফুলিঙ্গ পলায়নকালে আর যে ব্যক্তি পুষ্প গলায় পড়াবার পূর্বে তা প্রদক্ষিত করে না যথা সময়ে সে তো এটি করলো।

ওয়াকিফুল যাওহারিয়া সদর নাযমুদ্দিন

আবু বকর মোহাম্মদ ইবন আইয়াশ ইবন আবুল ম্যাকরেব নামীমী যাওহারী। তিনি ছিলেন দামেস্কে নগরীতে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যাওহারীয়ার ওয়াক্‌ফদাতা। উনিশ শাওয়াল মঙ্গলবার রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং নিজস্ব মাদরাসায় তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল আশির বেশি। তার অনেক খাদেম ছিল, তাদের অন্যতম হচ্ছেন শায়খ ইমাম আলেম মুফতি খতীব এবং তবীব (চিকিৎসক) মাজদুদ্দিন আবু মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব ইবন আহমদ ইবন আবুল ফাতহ ইবন সাহনূন তানূখী, হানাফী। ইনি ছিলেন নাযরব মসজিদের খতীব এবং দেমাগিয়া মাদরাসায় হানাফী শিক্ষক। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চিকিৎসক। তিনি নায়েব ইন্তেকাল করেন এবং সালেহিয়া মসজিদে তার নামাযে জানাযা পড়া হয়। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তার কিছু চমৎকার কবিতা রয়েছে। তিনি কিছু হাদীস ও রিওয়ায়াত করেন। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পাঁচ যিলক্বদ শনিবার রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খ আল ফারুনী ইমাম আবিদ যাহির

খতীব ইযযুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শায়খ মহিউদ্দীন ইবন ইবরাহীম্ বিন ওমর ইবনুল ফারায ইবন সাবুর ইবন আলী ইবন গানীমা আল ফারুনী আল ওয়াসেতী। হিজরী ৬১৪ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং এজন্য সফর করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে তার বিরাট দক্ষতা ছিল। এ ছাড়াও তাফসীর ফিকহ, ওয়ায নসিহত এবং আরবী ব্যাকরণের অলংকার শাস্ত্রে তিনি বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দীনদার, পরহেযগার মুত্তাকী।

বাদশা যাহিরের শাসনকালে তিনি দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন। তখন তাকে আল যারুজিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করা হয়। তার জন্য এক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। তার মধ্যে পাওয়া যেত অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কিছু গুণ। তার ছিল কিছু সুস্থ সুন্দর অবস্থা এবং অনেক মুকাশাফাত। একদিন তিনি ইবন হিসাম মসজিদে লোকদের নামায পড়াবার জন্য এগিয়ে যান মেহরাবের দিকে। তাকবীরে তাহরিমা বাঁধার আগে ডান দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, বের হয়ে যাও এবং গোসল করে নাও কিন্তু কেউ বের হলো না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার তিনি একই কথা বললেন, কিন্তু, এবারও কেউ বের

হলো না। তখন তিনি বললেন, হে উসমান তুমি বের হয়ে যাও এবং গোসল করে নাও। তখন সারি থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে গোসল করল এবং ফিরে এসে শায়খের নিকট ওযর পেশ করল। লোকটি ছিল মূলত ভালো লোক। আর লোকটি বলল যে, কোনো ব্যক্তিকে না দেখে তিনি কিছু ফয়েয হাসিল করেছেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে এতে তার জন্য গোসল যা বলার লাযিম হবে না। কিন্তু শায়খ যখন যা বলার বললেন তখন তার বিশ্বাস হলো যে, তিনি অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করা কথা বলছেন। কিন্তু, শায়খ যখন তার নাম ধরে নির্দিষ্ট করে বললেন তখন তিনি মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলেন।

আল ফারুনী দ্বিতীয় দফা মনসুর কালাউনের শেষ দিনগুলোতে আগমন করেন এবং কয়েকমাস তিনি দামেস্কের জামে মসজিদে খুতবা দান করেন। অতঃপর মুওয়াফফারউদ্দিন আল হামাবীর মাধ্যমে তাকে পদচ্যুত করা হয়। এ কথা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই সময় তিনি নযিবিয়া মাদরাসা এবং দারুল হাদীস যাহেরিয়ায় শিক্ষাদান করেন। এক পর্যায়ে তিনি এই সব ছেড়ে নিজ আবাস ভূমিতে ফিরে যান এবং যিলহজ্জ মাসের শুরুতে বুধবার দিন সাকল বেলা তিনি ইন্তেকাল করেন। আর তার মৃত্যুর দিন ওয়াসিত অঞ্চলে ছিল শুক্রবার দিন এবং দামেস্ক ইত্যাদি নগরে তার জানাযার নামায পড়া হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। এবং তিনি সোহরায়ার্দী তরিকা অনুযায়ী তাসাউফের খিরকা পরিধান করেন। এবং তিনি দশ কিরআতে জ্ঞান অর্জন করেন এবং দুই হাজার দুই শত যিলদ গ্রন্থ রেখে যান এবং তিনি কাসীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন আল বারযালী সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী সুনানে ইবন মাযাহার বিরাট অংশ। এছাড়া মুসনাদে শাফেঈ এবং মুসনাদে আবদ ইবন হুমাইদ এবং মু'জামুদ তাবারানী আস সগীর এবং মুসনাদে দারিনী এবং আবু উবাইদ রচিত ফাযায়েলে কুরআন গ্রন্থের আশি খণ্ড ইত্যাদি তিনি বর্ণনা করেন।

আল-জামাল আল মুহাক্কিক

আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন দামেস্কি। শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী তিনি ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এতে দক্ষতা অর্জন করেন এবং অনুযায়ী ফাতওয়া দান করেন এবং তা পুনর্ব্যক্ত করেন। তীব তথা চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি বিজ্ঞ ছিলেন। আর চিকিৎসাশাস্ত্রে অন্যদের ওপর অগ্রগণ্য হওয়ার কারণে তিনি দাখওয়ারিয়ার শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসকের নীতিমালা অনুযায়ী নুরী হাসাপাতালের রোগীদের সেবাযত্ন করেন এবং ফররুখসানিয়া মাদরাসায় শাফেঈ মাযহাবের শিক্ষক ছিলেন এবং অনেক মাদরাসায় তিনি পাঠ পুনরাবৃত্তি করেন। আর তিনি ছিলেন বিরাট মেধার অধিকারী এবং অনেক বিষয়ে তিনি অংশীদার ছিলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

আলাক্ত খাতুন বিনতে মালেক আশরাফ

মুসা ইবন আদিল চাচাতো ভাই মনসুর ইবন সালেহ ইসমাঈল ইবন আদিল এর স্ত্রী। আর ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মনসুর কালাউনের শাসনকালে নিজের নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করে এবং এর ফলে তিনি তার নিকট থেকে 'হিযরাম' ক্রয় করেন এবং তিনি যয়নুদ্দিন সামেরীর নিকট থেকে যাম্বাকিয়া গ্রহণ করেন।

ছদর জামালুদ্দীন

ইউসুফ ইবন ইবন মুহাযির তাকরীতী। ইনি ছিলেন ছাহেব তকীউদ্দিন তাওবার ভাই। এ সময় ইনি ছিলেন দামেস্ক নগরীর পরিদর্শক। পর্বতের পাদদেশে তার ভ্রাতার পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার জানযায় বিপুল লোক সমাগত হয়। আর তিনি ছিলেন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী, বিত্তশালী এবং মার্জিত ব্যক্তি। তিনি তিনজন পুত্র সন্তান রেখে যান। তার হলেন শামসুদ্দিন মোহাম্মদ, সালাউদ্দীন আলী এবং বদরুদ্দীন হাসান।

হিজরী ৬৯৫ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৬ সন)

এই বৎসরের শুরুতে আব্বাসী খলীফা হাকিম বিআমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ ছিলেন শাসনকর্তা। আর নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন মালিক আদিল যয়নুদ্দীন কাতাবগা আর মিশর দেশে তার নায়েব ছিলেন হুসামুদ্দীন লাজীম সালাহদারী আল মানসুরী এবং তার উজীর ছিলেন ফখরুদ্দীন ইবন আল কলীলী এবং মিশর আর শাম দেশের কাযী যারা ছিলেন ইতিপূর্বে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং শাম দেশের নায়েব ছিলেন ইযযুদ্দীন হামাবী এবং তার উজীর ছিলেন তকীউদ্দীন তাওবা এবং কাচারির কর্মকর্তা ছিলেন আল আ'সার এবং নগরীর খাতিব এবং কাযী ছিলেন ইবন মুজা'আ। আর মুহররম মাসে শরফুদ্দীন ইবন শেরযীর পরিবর্তে বুরহানউদ্দীন ইবন হিলাল এতিমদের দেখা ভাবধারায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ বছরের শুরুতে মিশর দেশে দ্রব্য-মূল্য ভীষণ বেড়ে যায় এবং ভীষণ ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। সামান্য কিছু লোক ছাড়া সব ধ্বংস হয়ে যায়। একটা গর্ত খনন করে তাতে কয়েকজন লোককে দাফন করা হয়। আর দ্রব্যমূল্যে ছিল চরম উর্ধ্বগতি। খাদ্য-দ্রব্য ছিল চরম অভাব এবং দুর্মূল্য। চারিদিকে ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। সফর মাসে প্রায় এক লাখ তিরিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। শাম দেশেও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং একটা চাটাইয়ের দাম দুইশ দিরহাম হয়ে যায়। আর উয়াইরা নিয়অ তাতারীরা যখন জানতে পারে যে কাতাবগার রাজত্ব শামাদেশ পর্যন্ত পৌছেছে। আর তিনি ছিলেন তাদের অন্তর্গত, তখন তাদের একদল লোক আগমন করলে সৈন্যরা সানন্দে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। অতঃপর তারা আমীর কারাসানকার মনসুরীর সঙ্গে মিশরীয় অঞ্চল সফরে বের হয় আর তখন মিশরে দ্রব্য সামগ্রীর দুর্মূল্য এবং ব্যাপক প্রাণহানির খবর পৌছে। এমনকি আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে শিশুর একটা জামার দাম হয় ছত্রিশ দিরহাম এবং কায়রো নগরীতে শিশুর একটা জামা বিক্রি হয উনিশ দিরহামে। আর তিনটা ডিম বিক্রি হয় এক দিরহামে। আর ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, কুকুর মানুষে খাওয়ার ফলে এগুলো হ্রাস পেয়ে যায়। এসব জন্তুর মধ্যে যা-ই দৃষ্টিতে পড়তো তাকেই মানুষ খেয়ে ফেলতো। আর বারো জুমাদাল উলা শনিবার দিন তকীউদ্দিন ইবন বিনতুন আয়ায এর পরিবর্তে শায়খ আল্লামা তকীউদ্দিন ইবন দাকীক আল-ইক মিশরের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। এরপর মিশরে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেতে থাকে এবং জুমাদাস সানি মাসে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর হতে থাকে। সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য।

রজব মাসের দুই তারিখ বুধবার কাযী ইমামুদ্দীন কাযমারিয়ায় সদরুদ্দীন ইবন রাযীনের পরিবর্তে পাঠ দান করেনি, কারণ তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল-বারযালী বলেন– এ বছর জমজম গম্বুজে বজ্রপাতের ফলে মসজিদুল হারামের মুয়াযযিন শায়খ আলী ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুস সালাম ইন্তেকাল করেন। আর তিনি উপরোক্ত গম্বুজের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। তিনি কিছু হাদীস ও বর্ণনা করেন। আর এই বছর রমযান মাসের শেষ দিকে মালেক যাহেরের স্ত্রী উম্মে সালামাশ বিলাদুল আশকারী' থেকে দামেস্কে নগরীতে আগমন করেন তখন নগরীর নায়েব তার নিকট উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন এবং তার জন্য তিউটির রুটিন প্রণয়ন করেন। আর খলীল ইবন মনসুর দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন।

ঐতিহাসিক আল জাযীরী বর্ণনা করেন– যে, এ বছর রজব মাসে জালালুদ্দীন কাযরীনীর পরিবর্তে কামালুদ্দীন বিন কালানসী দারস দান করেন, এবং সতের রমযান বুধাবার শায়খ যায়নুদ্দীন ইবনুল মানযার পরিবর্তে শায়াখ ইমাম আল্লামা শায়াযুল ইসলাম তকীউদ্দিন ইবন তাইমিয়া আল হাররানী হাম্বলী মাদরাসায় দারস দান করেন, কারণ ইবন মানযা তখন ইন্তেকাল করেন এবং ইবন তাইমিয়া আল– ইমাম ইবন মানযার মজলিস ইবন শামসুদ্দিন ইবন ফখর বা'লা বাক্কীর জন্য ত্যাগ করেন। শাওয়াল মাসের শেষ দিকে যারা অঞ্চলের শাসনকর্তা সুলাইমান ইবন ওমর ইবন সালিম আওয়াযী দামেস্ক নগরীতে ইবন জুমা'আর প্রতিনিধিত্ব করেন। আর এ বৎসর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে সুলতান কাতাবগা মিশর থেকে শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দূত যখন এই সংবাদ বহন করে আনে তখন আনন্দে বাদ্য বাজানো হয় দূর্গে। আর সুলতান এবং তার নায়েব লাজীন এবং উজীর ইবন খালীলী দূর্গে অবস্থান করেন। এবং ষোল যিলক্বদ রোববার তিনি শায়খ তকীউদ্দিন সুলাইমান ইবন হামযা আল মাগদেসী শরফুদ্দীনের পরিবর্তে হাম্বলী মাযহাবের কাযী নিযুক্ত করেন। এই সময় শরফুদ্দীন ইন্তেকাল করেন এবং তিনি তাকে এবং অবশিষ্ট শাসক এবং বড় বড় ওয়ালী এবং আমীরদেরকে খিলাত দান করেন এবং নাযমুদ্দীন ইবন তাইয়েবকে ইবন শীরযীর পরিবর্তে বায়তুল মালের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং দলবলসহ তাকেও খিলাফত দান করেন এবং আল আ'সার আর তার একজন সঙ্গী এবং অনেক সেক্রেটারী এবং দায়িত্বশীলদেরকে লেখেন এবং তাদের নিকট থেকে অনেক অর্থ সম্পদ দাবি করা হয় এবং তাদের অর্থ সম্পদ এবং ইবন সালউশের কন্যা এবং ইবন আদনানসহ অনেকের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। এ সময় বেশ গোলযোগ দেখা দেয়। এবং শায়খ আলী আল হারীরীর দুই পুত্র হাসন এবং শীস 'বসর' অঞ্চল থেকে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করেন। উভয়ে সুলতানের নিকট থেকে সাহায্য এবং অনুদান লাভ করেন। পরে তারা নিজ শহরে ফিরে যান। এবং আল মাথায় পর্বতের পাদদেশে কালান দারিয়ায় সুলতানের উদ্দেশ্যে ভোজের আয়োজন করা হয় এবং তাকে প্রায় দশ হাজার দিরহাম দান করা হয় এবং হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা সুলতানের খিদমতে উপস্থিত হয়। এবং তার সঙ্গে মাঠে কলো খেলেন। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নকীব যয়নুদ্দীন ইবন আদলানের হাতে নিগৃহীত হয়। ফলে সাহেব তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নেন এবং তাদের ব্যাপারটা শাফেঈ মাযহাবের কাযীর হাতে ন্যস্ত করেন। আর বাইশ যিলক্বদ জুমুআর দিন উপস্থিত হলে সূলতান মালিক আদিল কাতাবগা

ভাষণ দানের পক্ষে নামায আদায় করেন এবং তাঁর ডান দিকে ছিল হিমাত অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং তার নিচে ছিল বদরুদ্দীন আমীর সালাহ এবং তার বাম দিকে ছিল আল হারীরীর সন্তান হাসান এবং তার দুই ভাই এবং তার নিচে ছিল রাজ্যের নায়েব হুসামুদ্দীন লাজীন এবং তার পাশে ছিল ইয়যুদ্দীন হামাবী এবং তার নিচে ছিল বদরুদ্দীন বায়সারী। এবং তার নিচে ছিল কারা সানকার এবং তার পাশে ছিল আলহাজ্জ বাহাদুর। এবং তাদের পিছনে ছিল বড় বড় আমীররা এবং খতীব ইবন বদরুদ্দীন জুমা'আকে মূল্যবান খিলাত দান করা হয় এবং নামায শেষে তিনি সুলতানকে সালাম দেন এবং সুলতান উসমানী মাসহাফ দর্শন করেন। এরপর শনিবার ভোরে ময়দানে পলো খেলেন।

আর যিলহজ্জ মাসের দুই তারিব সোমবার তিনি আমীর ইযযুদ্দীন হামাবীকে শাম দেশের নায়েবের পদ থেকে বাদ দেন এবং তার দ্বারা সাধিত অনেক কাজের জন্য সুলতান তাকে ভীষণ তিরষ্কার করেন। পরে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে মিশর সফরের আর সঙ্গী হতে নির্দেশ দেন এবং শাম দেশের নায়েব নিযুক্ত করেন আমীর সাইফুদ্দিন গারলূল আল আদিলকে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং পদচ্যুত ব্যক্তিদেরকে খিলাফত দান করেন। সুলতান দারুল আদনে উপস্থিত হন এবং তার নিকট উপস্থিত হন কাযী এবং আমীররা। আর তার নামের মতো তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারকারী। অতঃপর যিলহজ্জ মাসের বারো তারিখ সুলতান হালব অঞ্চল অভিমুখে রাওয়ানা হন এবং তিনি হারাস্তা অঞ্চল অতিক্রম করে অগ্রসর হন। পরে তিনি বারিয়ায় কয়েকদিন অবস্থান করেন। এবং পুনরায় ফিরে এসে হিমস নগরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং শহরের নায়েবরা তার নিকট আগমন করে এবং দামেস্ক নগরীর নায়েব আমীর গারলূল পদারুল আরবে উপবেশন করেন এবং সেখানে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন এবং নির্দেশ দান করেন। আর তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দানকারী ব্যক্তি। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

এ বছর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন–

শায়খ যয়নুদ্দীন ইবন মানজা

ইমাম আলেম, আল্লামা, মুফতিল, মুসলিমীন, কামিল সদর যয়নুদ্দীন আবুল বরাকাত ইবনুল মাজা ইবনুস সদর ইযযুদ্দীন আবু ওমর ওসমান্‌ বিন আসআদ ইবন মানজা ইবন বারাকাত ইবন মুতাওয়াক্কেল তানূযী। ইনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের শায়খ এবং আলীম। ৬৩১ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিকহ উসূল হিব্রু আরবি ভাষা সাহিত্য এবং তাফসীর বিষয়সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আর মাযহাবের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব তাকে সমাপ্ত হয়। উসূল বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন এবং আল মুকান্না'- গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন এবং তাফসীর বিষয়ে তার অনেক টীকা রয়েছে। আর তিনি ছিলেন সত্য, সরল পথের অভিসারী, বিশ্বস্ত জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতীক, সুস্থ শরীর, আকীদা বিশ্বাস এবং মন-মানসিকতার অধিকারী এবং মুনাযারাকারী এবং বিপুল পরিমাণ দান সদকাকারী ব্যক্তি। তিনি সর্বদা সেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে জামে মসজিদের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অবশেষে চার শা'বান বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। আর তার সঙ্গে তার স্ত্রী উম্মে মুহাম্মদ সিততুল বাহা

বিনতে সদরুদ্দীন আল ফাজানদীহ ও ইন্তেকাল করেন। এবং দামেস্ক নগরীর জামে মসজিদে উভয়ের জানাযার নামায আদায় করা হয় এবং উভয়কে জামে মুযাফরির উত্তর দিকে কাসিউনের পাদদেশে বাগানের নিচে একই কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন কাযী আলাউদ্দিনের পিতা। তিনি ছিলেন নিসমারিয়ার শায়খ এবং তার পরে তার দুই পুত্র শরফুদ্দীন এবং আলাউদ্দিন নিসমারিয়ার শায়খ নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের শায়খ। তার পর সেখানে দারস দান করেন শায়খ তকীউদ্দিন ইবন তাইমিয়া, যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

আল- মাযাহ অঞ্চলে হামাম খানার অধিকারী আল মাসউদী

তিনি ছিলেন বড় আমীরদের অন্যতম। আমীর বদরুদ্দীন নূরু ইবন আব্দুল্লাহ আল মাসউদী। বাদশাদের সেবক অন্যতম আমীর শা'বান মাসের সাতাশ তারিখ শনিবার আল মাযাহর বাসতানা নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং পর দিন রোবার আল মাযাহ গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় রাজ্যের নায়েব উপস্থিত হন এবং দামেস্ক নগরীর জামে মসজিদের 'কুব্বাতন নসর' এর নিচে তার শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শায়েখ খালিদী

তিনি হচ্ছেন শায়খ সালেহ ইসরাঈল ইবন আলী ইবন হুসাইন আল খালিদী। বাবুস সালামার বাহিরে এক কোনে তার একটা খানকা আছে। সেখানে তার জিয়ারত করা হয়। তিনি ছিলেন আবিদ এবং যাহির। তিনি কারো জন্য উঠে দাঁড়াতেন না, সে ব্যক্তি যে কেউ হোক না কেন। আর তার দরবারে ছিল প্রশান্তি, বিনয়, নম্রতা এবং তরীকতের দীক্ষা। জুমু'আর দিন ছাড়া তিনি বাসস্থান ছেড়ে বের হতেন না। অবশেষে রমযানের মধ্যভাগে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং বাসিউন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

শরীফ হুসাইন আল-মাগদেসী

তিনি হলেন কাযী আল কুখাত শরফুদ্দীন আবুল ফজল হুসাইন ইবন ইমাম খতীব শরফুদ্দীন আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবন শায়খ উমর। ইনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিকহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং আরবী অভিধানসহ বিভিন্ন শাখা শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে ছিল পরিচ্ছন্নতা। কথা বলার উত্তম ধারা এবং তিনি ছিলেন নমনীয় অবয়বের অধিকারী। হিজরি ৬৮৭ সনের শেষ দিকে নাযমুদ্দীন ইবন শায়খ শামসুদ্দীনের পর তিনি কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পর্বতের পাদদেশে দারুল হাদীস আশরাফিয়ায় দারস দান করেন। বাইশ শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। এই সময় তার বয়স ছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পর দিন পর্বতের পাদদেশে দাদার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। বিচারপতি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি-বর্গ উপস্থিত হন, এবং পর দিন জামে মুযাফফারিতে তাঁর শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পরে কাযীর পদ গ্রহণ করেন তকীউদ্দিন সুলাইমান ইবন হামযা। অনুরূপভাবে, পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত দাবুল হাদীস আল আশরাফিয়ার শায়খের দায়িত্ব ও তিনি গ্রহণ করেন। আর কয়েক মাসের জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন শরফুদ্দীন আল

গাবির আল হাম্বলী আন নাবলুসী। পরে তিনি সে দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং তকী সুলাইমান আল মাগদেসীর হাতে এ দায়িত্ব স্থিত হয়।

শায়েখ ইমাম আলিম নাসিখ

আবু মোহাম্মদ ইবন আবু হামযা আল মাগরিবী আল মালেকী। তিনি যিলক্বদ মাসে মিশরীয় অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন সত্য-ভাষী এবং ভালো কাজের নির্দেশদাতা এবং মন্দ কাজের নিষেধকারী।

মুহিউদ্দিন ইবন নুহাশ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন বদরুদ্দীন ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন তারীক ইবন সালিম ইবন নুহাশ আল আসআদী আল হালবী আল হানাফী। ছয়শ চৌদ্দ হিজরী সনে হালব অঞ্চলের তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত হন এবং দক্ষতা অর্জন করেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন আর দীর্ঘদিন দামেস্ক নগরীতে অবস্থান করেন এবং দামেস্কের বড় বড় মাদরাসায় তিনি শিক্ষা দান করেন। এ সব মাদরাসার মধ্যে রয়েছে যাহেরিয়া এবং যানজেরিয়অ মাদরাসা। পরে তিনি হালবে কাযীর পদ এবং দামেস্কে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অর্থ দপ্তর আর ওয়াক্ফ দপ্তর এবং বহুবিদ বিভাগের পরিদর্শক। তিনি সর্বদা সম্মান আর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং এ জন্য তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। আর মুনাযারার ক্ষেত্রে তিনি ইনসাফ করতেন। অতীত মনীষীদের রীতি অনুযায়ী তিনি হাদীস এবং হাদীসের অনুশারীদেরকে ভালোবাসতেন। তিনি শায়খ আব্দুল কাদের এবং তার দলকে ভালোবাসতেন। যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে বিসতানাস্থ আল মাযায় সোমবার দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি ইন্তেকাল করেন। এই সময় তার বয়স ছিল আশি বৎসরের বেশি এবং হিজরী ছয়শ ছিয়ানব্বই সনের শুরুতে মঙ্গলবার দিন আল মাযাযস্থ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযার নামাযে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা এবং বিচারকমণ্ডলী উপস্থিত হন।

কাযী আল কুযাত তকীউদ্দিন আবুল

কাশিম আব্দুর রহমান ইবন কাযী আল কুযা'ত তাজউদ্দিন আবু মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব ইবন কাযী আল আয়ায আবুল কাশিম খলফ ইবন বদর আল আলা'ই আল শাফেঈ। জুমাদাল উলা মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আল কারাফাস্থ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

হিজরী ৬৯৬ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৭ সন)

এ বৎসরের শুরুতে খলীফা, সলতান মিশর এবং শাম দেশের নায়েব এবং কাযীবর্গ তারাই ছিলেন যাদের সম্পর্ক ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সূলতান মালিক আদিল কাতাবগা হিমস নগরীর আশ-পাশে শিকারে মত্ত ছিলেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মিশরের নায়েব এবং বড় বড় আমীররা এবং দামেস্কস্থ শাম দেশের নায়েব ছিলেন আমীর সাইফুদ্দীন গারলীল আল আদিলী। দোসরা মুহাররম বুধবার সুলতান কাতাবগা দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করে মকসুদায় জুমু'আর নামায আদায় করেন এবং তার নিকটস্থ হযরত হুদ আর এর কবর যিয়ারত করেন। তিনি মানুষের নিকট থেকে ঘটনাবলী শ্রবণ করেন এবং

মনিবার দিন 'দারুল আদলে' উপবেশন করেন। তিনি এবং তার উজীর ফখরুদ্দীন খলীলী ঘটনাবলীর ওপর মোহর লাগান। আর একই মাসে শিহাব উদ্দিন ইবন মহিউদ্দীন ইবন নুহাশ তার পিতার দুইটি মাদরাসায় যানযানিয়া এবং যাহেলিয়ায় উপস্থিত হন। এই সময় তার পাশে জনগণ উপস্থিত হয়। অতঃপর মঙ্গলবার সুলতান 'দারুল আদলে উপসিথত হন এবং শুক্রবার দিন উপস্থিত হলে তিনি মাকসুরায় জুমার নামায আদায় করেন। অতঃপর একই দিন তিনি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 'মাগারাতুদ দাম' গমন করেন। সেখানে তিনি দু'আ করেন এবং কিছু মাল সদর করেন। মুহাররম মাসের তেরো তারিখ রোববার রাতে উজীর খলীলী ইশার নামাযের পর জামে মসজিদে উপস্থিত হন এবং কামেলিয়া প্রাসাদের জানালার পাশে বসেন এবং তার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং মসজিদের ভিতরের ফরশের (মেঝের) কাজ স্মপন্ন করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। প্রায় দুই মাস এ কাজ চলতে থাকে এবং তা পূর্ণতায় পৌছে। আর আজকের দিন প্রত্যুষে কাযী শামসুদ্দীন্ বিন হারীরী পারষ্পারিক সম্মতিক্রমে ইবন নুহাশের পরিবর্তে কিমাযিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দারস দান করেন। এই সময় তার নিকট একদল লোক উপস্থিত হয়। অতঃপর সুলতান বিশেষ কক্ষে আর একটি জুমআর নামায আদায় করেন। তার সঙ্গে ছিল উজীর ইবন খালীলী। যিনি অসুস্থতার কারণে দুর্বল ছিলেন। আর মুহাররম মাসের সতেরো তারিখ তিনি মালেক কামেল ইবন মালেক সাইদ ইবন সালেহ ইসমাঈল ইবন আদিল তালখানায় বিশেষ টুপি পরিধান করার নির্দেশ দেন। তিনি দূর্গে প্রবেশ করেন এবং তার নিমিত্ত দূর্গের দরজায় ঢোল বাজানো হয়। মুহাররম মাসের বাইশ তারিখ মঙ্গলবার প্রত্যুষে সুলতান আদিল কাতাবগা সৈন্যদেরকে নিয়ে দামেস্ক নগরী থেকে বের হন এবং তারপর বের হন উজীর এবং তিনি দারুল হাদীসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন এবং নবীজীর স্মৃতি চিহ্ন দর্শন করেন। এবং শায়খ যয়নুদ্দীন আল ফারুকী তার দিকে এগিয়ে আসেন এবং নাসিরিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলেন। আর যয়নুদ্দীন শামিয়া আল বারানিয়ায় শিক্ষাদান ত্যাগ করলে কাযী কামালুদ্দীন ইবন শারীশী সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, উজীর শায়খকে দুনিয়ার কিছু বস্তু-সম্ভার দান করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি স্মৃতিচিহ্নের খাদেমকেও কিছু জিনিস দান করেন, যিনি ছিলেন আল মুঈম খিতাব এবং উজীরের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কাযীরা তাকে বিদায় জানাবার জন্য বের হন। আর এই দিন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়, যদ্বারা মানুষ শেফা কামনা করেন এবং এই বৃষ্টিপাত সৈন্যদের ময়লা- আবর্জনা ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে দেয়। আর তাকী তাওবা উজীরকে বিদায় দান থেকে ফিরে আসেন। তখন রসদ-ভাণ্ডার দেখা শুনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয় এবং শিহাবউদ্দীন নুহাশকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আর শায়খ নাসরুদ্দীন শহররম মাসের শেষ দিন বুধবার নাসেরিয়া যাওয়ানিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাযী বদরুদ্দীন ইবন জুমা'আর পরিবর্তে দাস দান করেন। এসময় সেনাবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা সম্পর্কে লোকজন কথা বলেন এবং দূর্গের নিকটস্থ্ শহরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। সাহেব শিহাবউদ্দিন জানালা দিয়ে তাতে প্রবেশ করেন এবং নায়েব আর আমীররা প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং একদল সৈন্য বাবুন নসর এ অবস্থান গ্রহণ করে। আছর নামাযের সময় হলে সুলতান মালিক আদিল কাতাবগা পাঁচ ছয় জন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে দূর্গে পৌছেন। অতঃপর তিনি দূর্গে প্রবেশ করলে আমীররা তার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি ইবন জুমা'আ ও হুসামুদ্দীন হানাফীকে ডেকে পাঠান এবং তারা

আমীরদের জন্য শপথ বাক্যকে দ্বিতীয়বার নবায়ন করেন এবং তারা শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন এবং আমীর তাদেরকে খিলাফত দান করেন। এবং তিনি নির্দেশ দেন যে, আমীর হুসামুদ্দীন লাজীনের নায়েব এবং তাঁর দ্রব্য-সামগ্রী সংরক্ষণ করা হোক। আর এই দিনগুলোতে আদিল দূর্গে অবস্থান করেন। আর তাদের মধ্যে ঊনত্রিশ মুহাররম সোমবার 'ওয়াদি ফাহমায় বিরোধ দেখা দেয়। আর তা দেখা দেয় এভাবে যে, অমীয় হুসামুদ্দীন লাতীম গোপনে আমীরদের একটা দলকে আদিলের বিরুদ্ধে একমত করে তোলে এবং তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে এবং তিনি দামেস্ক থেকে বের হলে তিনি আদিলকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন ধন ভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে যান যাতে দামেস্কে কোন অর্থ অবশিষ্ট না থাকে। যাতে করে আদিল তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অবস্থায় দামেস্কে ফিরে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে এবং সে পথিমধ্যে তার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করার সংকল্প করেছিল তাতে সহায়তা হয়। আর তারা যখন উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে তখন লাজীন আমীর সাইফুদ্দিন বায়হাস এবং বাখতুত আল আযলাদকে হত্যা করে। এরা দু'জন ছিল ন্যায়-বিচারককারী এবং তার সম্মুখ থেকে অর্থ-কড়ি এবং সৈন্যদেরকে কব্জা করে নেন। আর তারা মিশরীয় অঞ্চলে পৌঁছার সংকল্প করে কিন্তু। আদিল যখন এ বিষয় জানতে পারেন তখন তিনি দেহলীজে বের হয়ে আসেন এবং তিনি একদল সৈন্যকে দামেস্কে প্রেরণ করেন এবং তারা দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করেন, যে সম্পর্কে আমরা ইতপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তার কোনো সেবক তার নিকট ফিরে আসে যেমন যয়নুদ্দীন গালীব প্রমুখ। আর শিহাবউদ্দিন হানাফী দূর্গে অবস্থান করেন রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদনের জন্য । আর সফর মাসের শুরুতে বৃহস্পতিবার সকালে ইবন শারীসী শামিয়া বারানিয়ায় দারস দান করেন। এ সময় অনেক ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সুলতান দূর্গে অবস্থান করেন। তিনি সেখান থেকে বের হতে চান না এবং তিনি অনেকবার রহিত করে দেন এবং এ সম্পর্কে তিনি বিধান লিখে দেন, যা জনগণকে পড়ে শোনানো হয়। এ সমর দ্রব্য-মূল্য ভীষণ বৃদ্ধি পায়। এমনকি একটা ফলের দাম দুইশ দিরহাম পর্যন্ত হয়েছে এবং পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহির রাজিউন।

'মালেক মনসুর লাজীন সালাহদারীর রাজত্ব

আর ঘটনাটি এই যে, যখন তিনি ধন-ভাণ্ডার সৈন্যদেরসহ মিশর গমন করেন তখন অতীত শান শওকতের সাথে সে দেশে প্রবেশ করেন এবং বড় বড় আমীররা তার সঙ্গে একমত হন এবং তার বাই'আত হাতে গ্রহণ করেন এবং তাকে নিজেদের বাদশা বানান।

সফর মাসের দশ তারিখ জুমুআর দিন তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং মিশর দেশে আনন্দের ঢোল বাজানো হয়, নগরীকে সজ্জিত করা হয় এবং মিম্বরের ওপর ভাষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস এবং আলী খলীলে অনুরূপ আয়োজন করা হয় এবং তাকে মালেক মনসুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আল-কারার নাবলীস এবং ছফদ নগরীতেও আনন্দ প্রকাশের আয়োজন করা হয়। এবং দামেস্ক নগরীর আমীরদের একটা দল তার নিকট গমন করে এবং'আর রাহবা' অঞ্চলের সৈন্যদের একটা দল আমীর সাইফুদ্দীন কাজ কাল এর সঙ্গে আগমন করে কিন্তু তারা নগরীতে প্রবেশ করেনি; বরং দূর্গের ময়দানে অবতরণ করে। এবং তারা বাদশা

আদিলের বিরোধিতা এবং মিশরের শাসনকর্তা মনসুর লাজীনের আনুগত্য প্রকাশ করে। আর আমীররা দলে দলে আর সৈন্যরা সংঘবদ্ধ হয়ে তার নিকট আগমন করে। এতে আদিলের সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, তার শাসন কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন তিনি আমীরদেরকে বললেন, তিনি একজন বিশেষ দাসী। এবং আমি আর তিনি একই বস্তু। আমি তার অনুগত এবং শ্রোতা এবং দূর্গের যে জায়গায় খুশী আমি বসতে পারি। তোমরা তার সঙ্গে পত্র যোগাযোগ কর এবং তিনি কি বলতে চান তা দেখ। অতঃপর দূত পত্র নিয়ে আগমন করে যাতে দূর্গ এবং আদিলের প্রতি যত্ন এবং তার দেখাশুনার নির্দেশ ছিল। লোকজন তখন বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা এবং নানা রকম কথা-বার্তা বলতে শুরু করে। এ সময় নগরীর দরজা রুদ্ধ ছিল, 'কেবল বাবুল নসর' এর একটা জানালা খোলা ছিল। শহরের অন্যান্য দরজাও বন্ধ ছিল। আর জনতা দুর্গের চতুর্দিকে ভীড় জমায়। এমনকি তাদের একটা দল গর্তে পতিত হয় এবং তাদের কেউ কেউ মারা যায়। আর এই অবস্থায় লোকজনের শনিবার সন্ধ্যা হয়ে যায়। আর এ সময় মালেক মনসুর লাজীন নামে ঘোষণা প্রচার করা হয় এবং আসর নামাযের পর আনন্দের বাজনা বাজানো হয়। এবং পরদিন রোববার ভোরে দামেস্ক নগরীর মসজিদে মুয়াজ্জিনরা তার জন্য দো'আ করে এবং এ সময় মসজিদ থেকে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করা হয়–

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (سورة آل عمران : ٢٦-٢٧)

বল, হে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর আর যাকে ইচ্ছা তুমি অপদস্থ কর। কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান। তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করা তুমি মৃত্যু হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও আবার জীবন্তের থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও এবং যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করো (সূরা আল- ইমরান : ২৬-২৭)।

পরদিন রোববার অতি প্রত্যুষে কাযী এবং আমীররা একত্রে সমবেত হন। তাদের মধ্যে গারলূল আল–আদিল 'দারুস সাআ'দা'তে ছিলেন। তারা মনসুর লাজীনের পক্ষে শপথ গ্রহণ করে এবং নগরীতে এ মর্মে ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, জনগণকে দোকান পাট খোলা রাখতে হবে অতঃপর ছাহেব শিহাবউদ্দিন এবং তার ভ্রাতা যয়নুদ্দীন মুহতাসিব আত্মগোপন করেন এবং তিনি ওয়ালী ইবন নাসাবীকে শহরের রক্ষক নিযুক্ত করেন। অতঃপর যয়নুদ্দিন আত্মপ্রকাশ করেন এবং তিনি যথারীতি নগরীর নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে, তার ভ্রাতা শিহাব উদ্দিনও আত্মপ্রকাশ করেন এবং শহরের নায়েব গারলূল এবং আমীর জা'আ'ন মিশরে গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে তারা সুলতানকে শপথ গ্রহণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর এ মর্মে

সুলতানের পত্র আসে যে, দশ সফর শুক্রবার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাহী সৌর্য-বীর্যের সঙ্গে তিনি ষোল সফর কায়রো নগরী অতিক্রম করেন। এ সময় তার পরিধানে ছিল খেলাফতী বস্ত্র এবং আমীর ওমরারা তার অগ্রভাগে ছিলেন। এ সময় তিনি আমীর সাইফুদ্দীন সানকার আল মনসুরীকে মিশরের নায়েব নিযুক্ত করেন এবং পয়লা রবিউল আউয়াল দামেস্ক নগরীতে মনসুর লাজীনের পক্ষে খুৎবা পাঠ করা হয়। এবং বিশেষ কক্ষে উপস্থিত হন কাযীবর্গ এবং শামসুদ্দীন আল আ'সার এবং কাজকান। এ সময় দামেস্ক থেকে একদল আমীর অকস্মাৎ উপস্থিত হন এবং কাযী ইমামুদ্দীন কাযবীনী, হুসামুদ্দীন হানাফী এবং জামালুদ্দীন মালেকীর আদিষ্ট হয়ে মিশর অঞ্চলে উপস্থিত হন। এবং দারস সুলতানের ওস্তাদ আমীর হুসামুদ্দীন এবং সাইফুদ্দীন জাআ'ন সুলতানের পক্ষ থেকে আগমন করেন এবং তারা দ্বিতীয়বার আমীদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করেন এবং তারা দূর্গে আদিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন কাযী বদরুদ্দীন ইবন জুমা'আ এবং কাজকান। তারা তুর্কী ভাষায় নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর তাকে কঠোরভাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এবং তারা তুর্কী ভাষায় তার বায়'আতের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা যে কোনো শহরের ব্যাপারেই সন্তুষ্ট। আর শপথ গ্রহণের পর 'সারখাদ দূর্গ' নির্দিষ্ট করা হয এবং তকীউদ্দিন তাওবার মন্ত্রিত্বের ফরমান জারী করা হয় এবং শিহাব উদ্দিন হানাফীকে পদচ্যুত করা হয় এবং যায়নুদ্দিন হানাফীর পরিবর্তে আমীনউদ্দিন ইউসুফ আরমানী রুমীকে, যিনি ছিলেন শামসুদ্দিন আইকীর বন্ধু, তাকে ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হয়। এবং ষোল রবিউল আউয়াল শনিবার প্রত্যুষে শাম দেশের নায়েবের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সাইফুদ্দীন কাবযাক মনসুরী দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন এবং তিনি সাইফুদ্দীন গারলূল আর আদিলের পরিবর্তে দারুল সা'আদাতে অবস্থান করেন। এই সময় তাকে অভ্যর্থণা জ্ঞাপন করার জন্য সমস্ত সৈন্য বের হয়ে আসে। এবং জুমার দিন তিনি বিশেষ কক্ষে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করেন। তার নামায শেষে ওয়াকফ সম্পত্তি অন্যান্য ভূ-সম্পদের মালিকের সন্তুষ্টি ছাড়াই তাদের দায়িত্ব বাতিল করার পক্ষে রাজকীয় পত্র পাঠ করে শোনান এবং তা পাঠ করেন কাযী মহিউদ্দিন ইবন ফয়লুল্লাহ, যিনি ছিলেন দিওয়ানী ইনশার কর্মকর্তা। এবং এই সময় নগরীতে ঘোষণা প্রচার করা হয় যে, কারো প্রতি যুলুম করা হলে তিনি যেন মঙ্গলবার দারুল আদলে উপস্থিত হন। এ সময় তিনি আমীর ওমরা, অগ্রগন্য ব্যক্তি-বর্গ এবং বড় বড় পদে নিয়োজিত ব্যক্তি তথা কাযী এবং সচিবদেরকে খিলাফত দান করেন। এবং ইবন জুমা'আকে দুইটি খিলাফত দান করেন একটি কাযীর পদের জন্য আর অপরটি খতীবের পদের জন্য।

জুমাদাস সানি মাসের এগারো তারিখে দ্রুত এসে খবর দেয় যে, বদরুদ্দীন ইবন জুমা'আর পরিবর্তে ইমামুদ্দীন কাযবীনীকে কাযী নিযুক্ত করা হয়েছে এবং খতীবের দায়িত্ব ইবন জুমা'আর হাতে বহাল আছে। আর আল কাইমারিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের দায়িত্ব যা ইমামুদ্দীনের হাতে ছিল তা ইবন জুমা'আকে দেয়া হয়েছে। এই মর্মে সুলতানের পত্র আসে আর এতে সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং তিনি দোসরা রজব বৃহস্পতিবার দিন কায়মারিয়ার পাঠদান করেন এবং আট রজব বুধবার যোহর নামাযের পর ইমামুদ্দীন দামেস্ক শহরে আগমন করেন এবং তিনি আল আদেলিয়ায় উপবেশন করেন এবং জনগণের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেন। কবিতার মাধ্যমে তার এ কাজের প্রসংশা করেন।

তন্মধ্যে কোনো এক কবির কাসীদার প্রথম পংতিতে বলা হয়েছে–

تبدلت الايام من بعد عسرها يسرا * فاضحت ثغور الشام تفتر بالبشرى

অর্থ: যমানা সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততায় বদলে গেছে আর শাম দেশের সীমান্ত সুসংবাদে ঝলমল করছে।

দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করার সময় তার শরীরে ছিল রাজকীয় খিলাত এবং তার সঙ্গে ছিল কাযী জামালুদ্দীন যাবাবী, যিনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের কাযী আল কুযাত। তাকেও খিলাতে ভূষিত করা হয়। এবং সফর কালে তিনি ইমামুদ্দীনের চরিত্রের প্রশংসা করেন এবং তার উত্তম চরিত্র আর সুন্দর আচরণের কথা উল্লেখ করেন এবং তিনি পনেরো রজব বুধবার দিন প্রত্যুষে আল আদেলিয়ায় দারস দান করেন এবং তা দান করেন তদীয় ভ্রাতা জালালুদ্দীন আদালতের নায়েব নিযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর। এবং খিলাত পরিধান করে দিওয়ানে সগীরে উপবেশন করেন এবং তাকে মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য লোকজন আগমন করে এবং জুম'আর দিন নামাযের পর জানালা দিয়ে পত্র পাঠ করা হয় নায়েবে সালতানাত এবং অন্যান্য কাযীদের উপস্থিতিতে। আর তা পাঠ করেন শরফুদ্দিন আল হাযারী। এবং শা'বান মাসে খবর আসে যে শামসুদ্দীন আল আসার মিশরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এক সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং দামেস্ক নগরীতে বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যয়নুদ্দীন ইবন ছাচরীর পরিবর্তে ফখরুদ্দীন্ বিন সীরজী। অতঃপর এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আমীর উদ্দিন ইবন হিলাল এর মাধ্যমে তাকে পদচ্যুত করা হয় এবং কামালুদ্দীন ইবন শারীসী কায়রোর অনুপস্থিতির কারণে যায়নুদ্দীন আল ফারেধীকে নাসেরিয়ার সঙ্গে শামিয়া বারানিয়াও ফেরত দেয়া হয়।

যিলক্বাদ মাসের চৌদ্দ তারিখ : মিশরীয় অঞ্চলের নায়েব আমীর শামসুদ্দীন কারা সানকার আল মানসুরী লাজীন এবং তাঁর সঙ্গে একদল আমীরকে বন্দী করে এবং মিশর ও শাম দেশে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এবং সুলতান মিশরের নায়েব পদে সাইফুদ্দীন মনকুরতমর আল হুসামীকে নিয়োগ দান করেন। আর যে সব আমীরকে গ্রেফতার করেন তারা হচ্ছে সে সব লোক, যারা তাকে খারাপ করে এবং আপিলের বিরুদ্ধে কাতাবগায় বায়'আত করেছিল। এবং শায়খ কামালুদ্দীন শারীসী আগমন করেন এবং তার কাছে ছিল শামিয়া বারানিয়ার পরিবর্তে নাসিরিয়ায় দারস দানের নির্দেশপত্র। এবং আমীর শামসুদ্দীন মিশরের উজীর সানকার আল আশকারকে গ্রেফতার করেন ২৩ যিলহজ্জ শনিবার দিন বিভিন্ন দফতরকে পুনবিন্যস্ত করেন এবং মিশর এবং শাম দেশের তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং যিলহজ্জ মাসে মিশরে ঘোষণা জারী করা হয় যে, কোনো যিম্মী অশ্ব এবং খচ্চরের পিঠে আরোহণ করতে পারবে না এবং তাদের মধ্যে কেউ অশ্ব এবং খচ্চর পৃষ্ঠে আরোহণ করলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। আর এই বৎসর সুলতান মালেক মুয়াইয়াদ হাতীউদ্দিন দাউদ ইবন মালেক মুযাফ্ফর যার সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন তাদের অন্যতম হলো–

হাম্বলী মাযহাবের কাযী আল কুযাত ইযযুদ্দীন

ওমর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর ইবন এওয়ায আল মাগাদেসী আল হাম্বলী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং মিশরে ফয়সালা দান করেন। সিরাত এবং ফয়সালা দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রসংশার অধিকারী। সফর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আল মালকতাম কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এবং তাঁর পরে শরফুদ্দিন আব্দুল গণি ইবন্ ইয়াহহিয়া ইবন মোহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন নছর আল হাররানী মিশর দেশের কাযীর পদ গ্রহণ করেন।

শায়খ ইমাম হাফেয কুদওয়া

আফ্ফুদ্দীন আবু মোহাম্মদ আব্দুস সালাম ইবন মোহাম্মদ মাযরূ ইবন আহমদ ইবন ইযায আল মিগরী আল হাম্বলী। সফর মাসের শেষের দিকে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা ইন্তেকাল করেন। ৬২৫ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিবেশী হিসেবে ৫০ বৎসর জীবন-যাপন করেন এবং তথা থেকে একাধিক্রমে ৪০ বার হজ্জ করেন। দামেস্ক নগরীতে তাঁর গবেষণা নামাযে জানাযা আদায় করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

শায়খ শীস ইবন শায়খ আলী- আল হাবীরী

তিনি হূরানের 'বসর' জনপদে রবিউস সানী মাসের তের তারিখ শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। তার ভ্রতা এবং ফকির-মিসকীনরা দামেস্ক নগরী থেকে তদীয় ভ্রাতা হাসান তবাল আব্বারকে শান্ত্বনা দেয়ার জন্য তথায় গমন করেন।

শায়খ সালেহ আল মুকরী

জামালুদ্দীন আব্দুল ওয়াহেদ ইবন কাসীর ইবন যিরগাম আল মিসরী অতঃপর দামেস্কি। তিনি ছিলেন আসসাব' আল কাবীর এবং আল গাযালিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নকীব। তিনি সাখাবীকে হাদীস শুনান এবং তার নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। রজব মাসের শেষ দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং 'জামে' উমাবীতে' তার জানাযার নামায আদায় করা হয় এবং পরে শায়খ রাসলানের গম্বুজের নিকট তাকে দাফন করা হয়।

ওয়াকিফ আল সামিরিয়া

আল-সদর আল-কাবীর সাইফুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মোহাম্মদ ইবন আলী ইবন জা'ফর আল বাগদাদী আল সামিরী। তিনি ছিলেন সামিরিয়ার ওয়াকফদাতা যা ছিল দামেস্ক নগরীতে আল কারুসিয়ার নিকটে। আর এটা ছিল তাঁর সেই ঘর। যেখানে তিনি বসবাস করতেন। সে ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয় এবং ঘরটাকে তিনি 'দারুল হাদীস' এবং খানকা হিসেবে ওয়াকফ করে যান। তিনি দামেস্ক নগরীতে স্থানান্তর হন এবং তথায় তিনি দীর্ঘসময় সে ঘরে অবস্থান করেন। এবং প্রাচীনকাল থেকে সে ঘরটি দারে ইবন কাওয়াম নামে পরিচিত ছিল। আর সে ঘরটি প্রস্তুত করা হয় খোদাই করা পাথর দ্বারা। গোটা ঘরটাই খোদাই করা পাথর দ্বারা তৈরী করা হয়। আর সামিরী ছিল অনেক ধনী ব্যক্তি, সচ্চরিত্রের অধিকারী, সরকারের ওপর

সম্মানিত ব্যক্তি এবং সমাজে ভালো লোক বলে পরিচিত। তাঁর কিছু কবিতা রয়েছে যা উন্নতমানের এবং একক ও অনন্য। শা'বান মাসের আঠারো তারিখ সোমবার তিনি ইন্তেকাল করেন। বাগদাদে উজীর ইবন আল কামীরের নিকট তার বিরাট মর্যাদা ছিল। তিনি খলীফা মু'তাসিনের প্রসংশা করেন এবং খলীফা তাকে মূল্যবান কালো খিলাফত দান করেন। অতঃপর হালবের শাসনকর্তা নাসের এর শাসনকালে তিনি দামেস্ক নগরীতে আগমন করেন এবং সেখানেও তিনি মর্যাদা লাভ করেন। সেখানে সরকারী দলের কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করলে তিনি ব্যঙ্গ কবিতা দ্বারা তার জবাব দেন। যার মাধ্যমে তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটা দ্বার উন্মোচন করেন। তখন বাদশা তার জন্য বিশ হাজার দিনার মঞ্জুর করেন। এর ফলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাসূলের শানে তার একটা কবিতা আছে আর হাফেয দিনইয়াতি তার কবিতা থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন।

রষীফস্থ নাফীসার ওয়াকফদাতা

রঈস রফীছউদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন : মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহেদ্ বিন ইসমাঈল ইবন সালাম ইবন আলী ইবন সাদকা আল হারবানী : তিনি ছিলেন দামেষ্ক নগরীর মূল্যবান স্বাক্ষ্যদাতাদের অন্যতম। এক সময় তিনি ছিলেন এতিমখানার পৃষ্ঠপোষক। আর তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। হিজরি ৬২৮ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং গৃহকে দারুল হাদীস হিসাবে ওয়াত করেন। চৌঠা যিলক্বদ শনিবার দিন যোহর নামাযের পর তিনি ইন্তেকাল করেন এবং জামে উমাবিতে নামাযে জানাযা আদায় করার পর রোববার ভোরে কাসিউনের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ আবুল হাসান সারুর দামেস্কি নামে পরিচিত

তার লকব ছিল নাযমুদ্দীন আল- হারীরী তার দীর্ঘ জীবনী রচনা করেন এবং তার অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করেন। এবং বর্ণমালার জ্ঞান সম্পর্কে তিনি অনেক বিষয় উল্লেখ করেন। তার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

এ বৎসর কাযান আমীর নওরোজকে হত্যা করা হয়। যিনি তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই নওরেষ সেই ব্যক্তি, যে তাকে ভক্তি করতো এবং তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এবং তার সঙ্গে অধিকাংশ তাতারী ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতারীরা তার মনকে তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে। ফলে তিনি তাদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি একটানা এই অবস্থায় ছিলেন। অবশেষে তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত আরো অনেককে ও হত্যা করেন। আর কাযানের নিকট এই নওরোজ ছিলেন সর্বোত্তম তাতারী আমীর।

ইসলামের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। তিনি ছিলেন ইবাদত গুজার এবং যিকির আসগার ও নফল নামায আদায়কারী। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। তার হাতে বিপুল সংখ্যক ও ইসলাম গ্রহণ করে। যাদের সংখ্যা কেবল আল্লাহ ভালো জানেন। তাতারীরা তাসবীহ এবং হাইকাল রচনা করে এবং জুমা'আর জামাতে উপস্থিত হয় এবং কুরআন মজীদ পাঠ করে। আল্লাহ ভালো জানেন।

হিজরী ৬৯৭ সন (খ্রিস্টাব্দ ১২৯৮ সন)

এ বৎসরের শুরুতে খলীফা ছিলেন আল হাকিম এবং সুলতান ছিলেন নাজীন্ মিশরের নায়েব ছিলেন মনরুরতমর এবং দামেস্কের নায়েব ছিলেন কাবযাখ। দশ সফর জালালুদ্দীন ইবন হুসামুদ্দীন তার পিতার স্থলে দামেস্কের কাযীর পদ গ্রহণ করেন্ আর তার পিতাকে মিশরে তলব করা হলে তিনি সুলতানের নিকট অবস্থান করেন এবং সুলতান তাকে সামসুদ্দীন শাবুজীর পরিবর্তে মিশরে হানাফী মাযহাবের কাযী আল খুযাত নিয়োগ করেন এবং তার সন্তান দামেস্কে হানাফী মাযহাবের কাযী আল-কুযাত হিসাবে বহাল থাকেন।

তিনি তার পিতার দুটি মাদরাসা আল-খানতিয়া এবং আল মাগদানিয়ায় দারস দান করে এবং আল কাছাঈন মাদরাসা এবং শিবলিয়া মাদরাসা ত্যাগ করেন। দূত মারফত খবর আসে যে সুলতান সেই সংঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন যা সংঘটিত হয়েছিল ফলে আনন্দের ঢোল মিটানো হয় এবং নগরীকে সজ্জিত করা হয়। কারণ তিনি পলো খেলার সময় অশ্বসৃষ্ঠ থেকে পতিত হন। কবি তার ভাষায় এই ঘটনার বর্ণনা দেন–

حويت بطشا واحسانا ومعرفة * وليس يحمل هذا كله الفرس

তুমি একত্রে সমাবেশ করেছো পাকড়া ও অনুগ্রহ এবং মা'আরিফাতকে, একটা অশ্বও এইসব গুণ বহন করতে পারে না।

তার হাতে আসে নায়েবে সালতানাতের জন্য হুকুম এবং খিলফাত। তখন তিনি নির্দেশ পাঠ করেন এবং চৌকাঠকে চুমু খান। আর রবিউল আউয়াল মাসে ইযযুদ্দীন্ বিন কাযী আল কুখ্যাত তকীউদ্দিন সুলাইমান জাওযিয়া মাদরাসায় দারস দান করেন এবং এই সময় তার পাশে উপস্থিত ছিলেন ইমমুদ্দীন শাফেঈ এবং তদীয় ভ্রাতা জালালুদ্দীন এবং একদল পণ্ডিত ব্যক্তি। আর দারস দান শেষে তিনি তথায় বসেন এবং স্বীয় ও পিতার অনুমতিক্রমে এ ক্ষেত্রে নির্দেশ দান করেন।

রবিউল আউয়াল মাসে কাযী আল কুযাত তকীউদ্দিন ইবন দাকীক আল-ঈদ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন তিনি মিশরে বিচারকার্য সম্পন্ন করা ত্যাগ করেন। অতঃপর অনুনয়-বিনয় শেষে তিনি ফিরে আসেন এবং তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, তিনি তার পুত্র মুহিবকে নায়েব নিযুক্ত করতে পারবেন না। দশ রবিউস সানি জুমুআর দিন মুয়াযযামিয়অ মাদরাসায় জুমআর নামায আদায় করা হয এবং তথায় খুৎবা দান করেন মাদরাসা শিক্ষক কাযী শামসুদ্দীন্ বিনুল মুইয আল হানাপী। এই সময় খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, বদরুদ্দীন বায়সারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মিশরে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর সুলতান আলামুদ্দীন দুয়াইদারীর নেতৃত্বে তিল হামগুন অঞ্চলে একদল সৈন্য প্রেরণ করেরেছি। আল্লাহর অনুগ্রহে সৈন্যদল উক্ত অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হয়।

বারো রমযান দামেস্ক নগরীতে এ খবর পৌঁছে এবং খালীমিয়া অঞ্চল মুক্ত করা হয় এবং তথায় যোহর নামযের আযান দেয়া হয়। আর সাত রমযান বুধবার সে অঞ্চল দখলে আনা হয়। এরপর মারআশ অঞ্চল জয় করা হয় এবং এ উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর সৈন্যরা হামূছ দূর্গ অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং একদল সৈন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের আমীর ছিল আলামুদ্দীন

সানযার তকছবা, তিনি উরুদেশে আঘাত পান। আর আলামুদ্দীন দুয়াইদারীর পায়ে প্রস্তরাঘাত লাগে।

সতেরো শাওয়াল শুক্রবার দিন শায়খ তকীউদ্দিন ইবন তাইমিয়া জিহাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেন তিনি এজন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং মুজাহিদের ভাতা নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেননি। আর এই সময়টা ছিল খুবই জমজমাট।

এই মাসে মালেক মাসউদ ইবন খিযির ইবন যাহির বিলাদে আশকারী থেকে মিশর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আশরাফ ইবন মনসরের সময় থেকে তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। সুলতান শোভাযাত্রা সহকারে তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন এবং তাকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন। আর একই বৎসর আমীর খিযির ইবন যাহির একদল মিশরীয়কে সঙ্গ নিয়ে হজ্জে গমন করেন্ আর একই বৎসর আমীর খিযির ইবন যাহির একদল মিশরীয়কে সঙ্গে নিয়ে হজ্জে গমন করেন আব্বাসী খলীফা হাকিম বিআমরিল্লাহও বই হজ্জযাত্রী দলে ছিলেন। আর শাওয়াল মাসে মাদরাসার শিক্ষা একটা মাদরাসায় বৈঠকে মিলিত হন, যে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন মিশরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর এই বৎসর শীস অঞ্চলে দু'টি দূর্গ-'হামীমাস ও নযম' অধিকার করার ফলে আনন্দের বাজনা বাজানো হয়।

এ বৎসর মিশর থেকে একদল সৈন্য আগমন করে সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ। আর ১৫ যিলহজ্জ আমীর ইযযুদ্দীন আয়বক আল হামাবীকে গ্রেফতর করা হয। যিনি ছিলেন শাম দেশের নায়েব। তার সঙ্গি সাথী এবং আমীরদের একটা দলকেও গ্রেফতার করা হয়। আর এ বৎসর দামেস্ক নগরীতে পানির ভীষণ সংকট দেখা দেয়। কোথাও কোথাও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মানুষের হাটু পরিমাণ পানিও পাওয়া যেত না। এমনকি কোথাও কোথাও এক ফোঁটো পানিও মিলতো না। লোকজন পানির সন্ধানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করত এ সিময় শহরে বরফের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য নীলনদে পানির কোনো অভাব ছিল না। সেখানে পর্যাপ্ত পানি ছিল এবং সব সময় থাকত এ বৎসর যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেন' তাদের অন্যতম হচ্ছেন:

শায়খ হাসান ইবন শায়খ আলী আল হারীরী

তিনি রবিউল আউয়াল মাসে বছর জনপদে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তার সুন্দর স্বভাব চরিত্র এবং সামাজিক আচার আচারণের কারণে লোকজন তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ৬২১ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আল ছদর আল কবির শিহাবউদ্দীন

আবুল আব্বাস আহমদ্ বিন উসমান ইবন আবুর রাযা' ইবন আবুযহর আল তানূযী ইনি ইবন সালাউশ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন উজীবের ভ্রাতা। তিনি হাদীসে পাঠ করেন এবং কাসীর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন্ তিনি ছিলেন আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দাদের অন্যতম। অতীব নেক্কার এই ব্যক্তি প্রচুর দান-সদকা করতেন্ জুমাদাল উলা মাসে নিজ গৃহে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং জামে মসজিদে নামাযে জানাযা আদায় শেষে তাকে বাবুস সগীর গোরস্থানে দাফন করা হয়। মসজিদে হিসামে তার জন্য শোক সভার আয়োজন করা হয়। এক

সময় তিনি জামে মসজিদের দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করতেন। তার চরিত্র ছিল তার ভ্রাতার মন্ত্রিত্বকালে তিনি বিপুল সম্মানের অধিকারী হন। অতঃপর তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন এ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জানাযায় বিপুল জনতা উপস্থিত হয়।

শায়খ শামসুদ্দীন আয়কী

মোহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন মোহাম্মদ আল ফার্সী, আল আয়শী নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন সমস্যা সমাধানকারী এবং জটিলতা নিরসনকারীদের অন্যতম। বিশেষ করে কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞানে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। এছাড়া তর্কশাস্ত্র এবং অতীত ইতিহাসে বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। মিশর দেশে তিনি শায়খুল মাশায়েখের দায়িত্ব পালন করেন। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন আল গাযালিয়া মাদরাসার শিক্ষক। জুমার দিন আল সাজাহ গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন পর দিন শনিবার তাকে দাপন করা হয়। বিপুল জনতা তার বানগুমন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন কাযী আল কুখ্যাত ইমামুদ্দীন কাযবীনী। গোটা রমযানের ঘটনা। সূফীদের গোরস্থানে শায়খ শিমলার পাশে তাকে দাফন করা হয় এবং শামাতিয়াস্থ তার খানকীয় শোক সভার আয়োজন করা হয়। বিপুল লোক তার জানাযায় অংশগ্রহণ করে। অনেক আলীমের অন্তরে তিনি ছিলেন সম্মানের অধিকারী।

সদর ইবন উকবা

ইবরাহীম ইবন আহমদ ইবন উকবা ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আতা আল বাছরাকী। তিনি দারখ করেন একদা তিনি হালব অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি মিশর সপর করেন এবং তথায় একটা নির্দেশপত্র আসে, যাতে হালব অঞ্চলের কাযীর উল্লেখ ছিল। দামেস্ক নগরী ছেড়ে যাওয়ার পর একই বৎসর রমযান মাসে সেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল সাতাশি বৎসর। মানুষ বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার দু'টি স্বভাব বৃদ্ধ হয় না। একটা লোভ অপরটা দীর্ঘ আকাঙ্খা।'

আশ শিহাব আল আ'বির

আহমদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল মুনইম ইবন নি'মাত আল মাগদেসী আল হাম্বলী, শিহাবউদ্দিন যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন তিনি প্রচুর হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেন স্বপ্ন ব্যাখ্যা বিষয়ে তার একটা গ্রন্থও আছে। আর এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অতীব দক্ষ। তার একটা গ্রন্থ আছে, যাতে কোন বিস্ময়কর কথা উল্লেখ নাই যা তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়। ৬২৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বৎসর যিলক্বদ মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং বাবুস সগীর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বিপুল সংখ্যক লোক তার জানাযার উপস্থিত ছিল। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত এর সঙ্গে যুক্ত হবে চতুর্দশ খণ্ড যার শুরুতে আলোচনা করা হবে ৬৯৮ হিজরীর ঘটনাবলী।

ইফা— ২০১৯-২০২০— প্র/০৩২.১১.০৩২—(উ) — ৫২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]